সৈয়দ
গোলাম
হুসায়ন খান
তাবতাবায়ী

সিয়ারুল মুতাখ্খিরীন

সৈয়দ গোলাম হুসায়ন খান তাব্‌তাবায়ী

সিয়ারে মুতাখ্‌খিরীন

ডঃ এম, আবদুল কাদের

অনূদিত

প্রথম প্রকাশ

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫
[নভেম্বর, ১৯৭৮]

বাএ/৯৮২

পাণ্ডুলিপি

অনুবাদ বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক

ফজলে রাব্বী
পরিচালক
প্রকাশন ও বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণ

জলসিঁড়ি মুদ্রায়ণ
৩২/বি, পাটুয়াটুলী, ঢাকা

প্রচ্ছদ : রফিকুন্নবী

মূল্য : চল্লিশ টাকা

Syed Gholam Hussain Khan Tabtabaee's SEIRE MUTAKH-KHERIN, translated into Bangali by Dr. Abdul Kader and

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাদশাহ্ আলমগীরের মৃত্যু ... ১
বাহাদুর শাহের সিংহাসনারোহণ ... ৩
সিপাহসালার যুলফিকার খাঁ আমিরুল ওমরা উপাধি ও পদে ভূষিত ১৫
বাহাদুর শাহের মৃত্যু ... ২১
বাহাদুর শাহ উচ্চপদস্থ আমীর আষজদ্দৌলাহকে বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাক্ষিণাত্যে জনরব ১১৯
জাননিসার খাঁ খান্দেশের নয়া শাসনকর্তা ১১৯
বাদশাহ অস্বাভাবিক পাপে লিপ্ত ১২০
তিনজন অতীব কৃতী আমীর দরবারে অহূত ... ১২১
তাঁহাদের দুইজনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রস্তাব ১২২
সুবাদার একদল সৈন্যসহ রাজধানী গমনে কৃতসঙ্কল্প ১২৪
বাদশাহ্ আতঙ্কিত ১২৪
সুবাদারের রাজধানী গমন পথে সৈন্যদের শৃঙ্খলা রক্ষা ১৩০
একটি করুণ কাহিনী ১৩০
নূতনভাবে উজীরের সহিত বিবাদ ভঞ্জন ... ১৩৩
সুবাদার নিজেকে প্রজা মনে করেন না ... ১৩৫

জয়সিংহ সেবায়ীর সৎসাহসী উপদেশ প্রত্যাখ্যাত ১৩৬
বাদশাহের সাম্রাজ্য ত্যাগ ১৪১
শহরের সর্বত্র উত্তেজনা ১৪২
শহরে জনতাকর্তৃক একদল মারাঠা অশ্বারোহী ধ্বংস ১৪৩
দুইদফা কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধ ১৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাহজাদা রফীউদ-দরজাৎ বাদশাহ ঘোষিত ১৪৪
ইতেকাদ খাঁর প্রসাদ লুণ্ঠিত ১৪৭
বিরাট পরিবর্তন ও বাজেয়াপ্তি ... ১৪৭
ফররুখ সিয়ারের মৃত্যুর দুইটি বিভিন্ন বিবরণ ... ১৪৯
নিজামুল মুলকের প্রকাশ্য বিদ্রোহ ... ১৬৫
কাশ্মীরে প্রচণ্ড আলোড়ন ... ১৭১
বুরহানপুরের যুদ্ধ ১৭৫
ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে গুরুতর বাদানুবাদ ১৭৭
বায়াপুরের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ও দুই স্যায়িদের
সৈন্যদ্বয়ের প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট ১৮১
সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া আলম আলী খাঁ নিহত ... ১৮৪
দওলতাবাদের শাসনকর্তার সদাশয় আচরণ ... ১৮৫
অনেক আলোচনার পর হুসায়ন আলী খাঁর দাক্ষিণাত্য যাত্রা ১৮৭
হুসায়ন আলী খাঁর গুপ্তহত্যা ১৯১
তাঁহার দেহ ঘিরিয়া ভীষণ যুদ্ধ ... ১৯২
বাদশাহের পক্ষ ও সুবাদারের দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ... ১৯৪
উজীরের শিবিরে সাহায্য আসায় তাঁহার সৈন্যসংখ্যা
প্রায় দ্বিগুণ হয় ২০৫
আবদুল্লাহ খাঁ সম্পূর্ণ পরাজিত ও বন্দী ২১৪
যুদ্ধের ভাগ্য সম্পর্কে আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী ২১৬

তাঁহার মনিব ও বন্ধুর সহিত আবদুল্লাহ খাঁ কাশির ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতা ২১৭
রাজধানীতে মুহম্মদ শাহের আড়ম্বরপূর্ণ প্রবেশ ... ২১৮
বাদশাহী হারেমে তাঁহার প্রবেশকালে অসাধারণ অনুষ্ঠান ২১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইংরেজী সংস্করণের টীকা ২২০

তৃতীয় অধ্যায়

উজীর মুহম্মদ আমীন খাঁর মৃত্যু ২৩২
তাঁহার সম্পত্তির পুনরাবর্তনে বাদশাহের অসম্মতি ২৩৩
জালিয়াত সম্পর্শনে বাদশাহ ২৪৩
পানিতে কর্ণাট বিধ্বস্ত ২৫৪
আজমীরে গোলযোগ ২৫৭
নিজেকে সাধারণের অধিগম্য করার জন্য বাদশাহের বিচিত্র কৌশল ২৫৮
আজমীরে অশান্তি ... ২৫৯
আজমীরে গোলযোগের সমাপ্তি কাশ্মীরে অশান্তি ২৬৪
নিজামুল মুল্‌কের হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য বাদশাহ্ কর্তৃক তাঁহাকে গুজরাটের শাসন কর্তৃত্ব দান ... ২৬৮
বাদশাহের প্রিয়পাত্রী খুকী তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন ... ২৭১
নিজামুল মুল্‌ক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ... ২৭৩
বন্দী আবদুল্লাহ্ খাঁকে বিষদান ২৭৬
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত ২৭৮
জাফর খাঁ অপমানিত ও অর্থ প্রত্যর্পণে বাধ্য ২৭৯
নিজামের প্ররোচনায় মারাঠাদের মালব আক্রমণ ২৮৪
শাসনকর্তা কর্তৃক প্রবল উদ্যমে বাধা দান ... ২৮৫
মারাঠাদের মালব ও গুজরাট জয় ২৮৫
মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিয়া অবরুদ্ধ হন ২৮৮

তাঁহার পুত্র বীরত্বের সহিত পিতার জীবন রক্ষা করেন ... ২৮৯
১১৩৫ হিজরীর শেষে ও বৎসরের প্রথমে বিচিত্র ঘটনা ... ২৮৯
জনৈক নিহত হাজীকে উপলক্ষ করিয়া দিল্লীতে বিরাট রাজদ্রোহ ২৯০

তৃতীয় অধ্যায়

উজীর কামরুদ্দীন হাঙ্গামা শান্ত করেন ২৯১
সমগ্র হিন্দুস্থান ব্যাপী ছোঁয়াচে রোগ ... ২৯২
দিল্লীতে বিচিত্র তুষার ২৯২
শিকারের ছলে বাদশাহের অভিযানে যাত্রা ২৯৩
মারাঠারা তাহাদের জবরদখল চালাইয়া যাইতে থাকে ও তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাপতিকে অবজ্ঞা করে ... ২৯৪
বাঙ্গলায় রাষ্ট্রবিপ্লবের ভূমিকা ৩০২
আলীবর্দী খাঁর পরিবার ও শক্তির উৎপত্তি ৩০৩
আলীবর্দী নিজকে বহুবিদগুণের বিরাট যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বলিয়া প্রমাণিত করেন ৩০৪
বাঙ্গলার সুবাদার জাফর খাঁ তাঁহার নিজ দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর জন্ম সনদলাভের পরিকল্পনা করেন ৩০৫
কিন্তু তাঁহার জামাতা শুজাহ খাঁ তাঁহার স্থানাধিকার করেন ৩০৭
সরফরাজ খাঁ পিতার বশ্যতা স্বীকার করেন ... ৩০৭
তিনি আলীবর্দী আজিমাবাদের নায়েব নিযুক্ত ... ৩১১
আলীবর্দীর দৌহিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র মির্জা মুহম্মদ সিরাজুদ্দৌলার জন্ম ও আলীবর্দী কর্তৃক তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ ... ৩১২
মারাঠাদের বিরুদ্ধে খান দুরান ও উজীর উভয়ের অভিযান ৩১৬
সাহস ও প্রতিভা দুইটাতেই বাদশাহী সেনাপতিরা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত ৩১৭
উজীর খান দুরানের ঈর্ষায় তাহার উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায় ৩২২

এই অনিশ্চয়তার সুযোগে মারাঠারা বাদশাহী সৈন্যের
পশ্চাদ্ভাগে ঘুরিয়া রাজধানীর উপকণ্ঠ লুণ্ঠন করে ... ৩২২
সুপারিষদ বাদশাহের মারাঠাদের চৌথদানে সম্মতি ... ৩২৫
জানসিতাহ শহর ধ্বংস ৩২৯
ইংরেজী সংস্করণের টীকা ৩৩১

চতুর্থ অধ্যায়

নাদিরশাহ দিল্লীতে আর একটা দৌত্য ও তৎপরে দশজন
সংবাদবাহক প্রেরণ করেন ৩৬৩
কাবুলের সুবাদার জাকারিয়া খাঁ পরাজিত ... ৩৬৫
খান দুরান নিহত ৩৬৯
নাদিরশাহের মৃত্যুসংবাদে ইরানীরা আক্রান্ত ... ৩৭৪
বাঙ্গলার সুবাদার শুজা খাঁর প্রশংসনীয় চরিত্র ... ৩৮৩
সরফরাজ খাঁ শুজা খাঁর উত্তরাধিকারী হন... ... ৩৮৬
তাহার প্রতারণাপূর্ণ কপটাচরণ... ... ... ৩৯৬
সরফরাজ খাঁর মাতার নিকট তাঁহার অনুপম বক্তৃতা ... ৪০২
নূতন সুবাদারের প্রশংসনীয় চরিত্র ৪০৩
ইংরাজী সংস্করণের টীকা ৪০৬

পঞ্চম অধ্যায়

আলীবর্দী খাঁর উড়িষ্যা যাত্রা ৪২০
আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক তাঁহার জামাতাকে উড়িষ্যায়
শাসনকর্তার পদে নিয়োগ ৪২৭
শাহবাদের জমিদারদের বিরুদ্ধে আজিমাবাদের তরুণ
শাসনকর্তার সফলকাম অভিযান ৪৪৯
প্রতিপত্তিশালী আফগান রোশন খাঁর হত্যাকাণ্ড ... ৪৫১
মেহদী নেসার খাঁর প্রশংসনীয় চরিত্র ৪৫১
বর্গীয় হাঙ্গামা বা মারাঠাদের বাঙ্গলা আক্রমণ ... ৪৫৪

মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আলীবর্দী খাঁর সঙ্কল্প … ৪৫৬
কতিপয় সেনাপতির পশ্চাতে অবস্থান … … ৪৫৮
যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রের ভিতর দিয়া সুবাদারের পথ পরিষ্কার ৪৬৭
মীর হবীবের নেতৃত্বে মারাঠাদের মুর্শিদাবাদের বিশৃঙ্খলা
সৃষ্টি ও গৃহ লুণ্ঠন … … … … ৪৭৪
মারাঠাগণ কর্তৃক গঙ্গার দক্ষিণস্থ সমগ্র অঞ্চল লুণ্ঠন … ৪৭৭

পঞ্চম অধ্যায়

সেতু ভাঙ্গিয়া সুবাদারের বিপুল লোক ক্ষয় ৪৮৬
মারাঠাদের কঠোর দণ্ড … … … ৪৮৭
বাঙ্গলার সুবাদারের সাহায্যার্থে আবুল মনসুর খাঁর যাত্রা ৪৯৩
আবুল মনসুর খাঁর উদ্ধত ব্যবহার … … ৪৯৬
মারাঠাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের ঘরবাড়ী রক্ষায় ভাগলপুরের
জনৈক মহিলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ … … … ৫০৪
মারাঠা প্রধান সেনাপতির সহিত বাঙ্গলার সুবাদারের
দ্বিধামূলক সাক্ষাৎ … … … … ৫০৫
১৭৪০—১ খৃঃ … … … … ৫০৮
আলীবর্দী খাঁর পরিবারের সহিত হেদায়েত আলী খান
সম্পর্কচ্ছেদ … … … … ৫১৩
মারাঠা সেনাপতিদিগকে ফাঁদে ফেলার জন্য আলীবর্দী
খাঁর সঙ্কল্প … … … … ৫২০
সাক্ষাৎকারে আসিয়া অধিকাংশ সেনানায়কসহ মারাঠা
সেনাপতি নিহত … … … … ৫২৫
সর্বত্র নিহত হইয়া মারাঠাদের বাঙ্গলা ত্যাগ … ৫২৭
আফগান জাতির বিচিত্র চরিত্র— … … ৫২৯
শাসনকর্তার বাধাদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ … ৫৪১
তথাপি মুস্তফা খাঁর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ … … ৫৪৩
মুস্তফা খাঁর নিকট আজিমাবাদের শাসনকর্তার বুদ্ধি

কৌশলময় চিঠি ৫৪৪
আফগানদের আজিমাবাদের চতুর্দিকস্থ পরিখা আক্রমণ
ও অধিকার ৫৪৮
শাসনকর্তার সদাচরণ ৫৫৪
আফগানেরা তৃতীয়বার জয়ী হইয়াও পুনরায় পরাজিত
ও মুস্তফা খাঁ নিহত ৫৬৪
ইংরাজী সংস্করণের টীকা ৫৬৮

প্রথম অধ্যায়

বাদশাহ মুহম্মদ আওরঙ্গযীব আলমগীর তাঁহার জীবনের বড় একটা অংশ দাক্ষিণাত্য জয় ও উহা বশে আনিতে ব্যয় করার পর তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভে অসমর্থ হইয়া অবশেষে তাঁহার অভিযান পরিত্যাগ করিয়া শাহজাহানাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উহা ছিল বাবর-বংশের সাম্রাজ্যের রাজধানী ও হিন্দুস্থানের নগরাবলীর মুকুটমণি কিন্তু আহমদ নগরে তাঁহার অবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ায় তিনি স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার সময় পাইলেন না। সেখানে ৯৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ও তাঁহার রাজত্বের ৫২ বৎসরে তিনি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন; তিনি এতই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেন। দুইজন শাহজাদা তখন তাঁহার শিবিরে ছিলেন, একজন তাঁহার কনিষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র কামবখশ; অন্যজন আজমশাহ। আজমশাহ ছিলেন সাহসী, সুযোগ্য ও সামরিক যশোগৌরবের জন্য লালায়িত। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ কিশোর শাহজাদাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে বিজাপুরের সুবাদারী দিয়া যাবতীয় রাজোচিত আড়ম্বর ও পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে সোজা কর্মস্থলে যাত্রা করার আদেশ দান করিলেন। তাঁহার প্রতি নির্দেশ রহিল, দীর্ঘ মঞ্জিলে সফর করার এবং অবিরাম গতিতে আগাইয়া যাওয়ার জন্য। আদেশ ইহাও ছিল যে, তিনি যেন ১৭ই জিলকদ মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের চারি ঘণ্টা পূর্বে রওয়ানা হইয়া যান। এরূপ সঠিক উপদেশ দানের উদ্দেশ্য ছিল কিশোর শাহজাদাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আজমশাহের নাগালের ও অনুসরণের বাহিরে রাখা। এই পূর্ব-সতর্কতা অবলম্বনের সাতদিন পরে তিনি তাঁহার অপর পুত্র পূর্বোক্ত আজমশাহকে সূর্যোদয়ের চারি ঘণ্টা পরে তাঁহার মালবের সুবাদারীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আদেশ দান করিলেন; তাঁহার প্রতি উপদেশ রহিল যে, তিনি যেন নাতিদীর্ঘ মঞ্জিলে দিনে প্রায় পাঁচ মাইল করিয়া অগ্রসর হন এবং প্রতি মঞ্জিলে দুই দিন থাকিয়া কেবল প্রতি তৃতীয় দিনেই সফর করেন। এবম্বিধ আদেশ দানে বাদশাহ্ তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, সিংহাসন খালী হইলে দেশে যদি কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তবে তিনি যেন তাকে দমন করিতে পারেন এবং ইতিমধ্যে তাঁহার পিতার মৃত্যুতে তাঁহার মিরাস অধিকারের জন্য যেন তাঁহাকে হাতের কাছে পাওয়া

যায়। কিন্তু বাদশাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এমন একজন উদ্যোগী রাজপুত্রকে নিজের নিকট হইতে কতকটা দূরে রাখা—যাহাতে তাঁহার দৈহিক দুর্বলতার সুযোগে তাঁহাকে ধৃত ও বন্দী করিবার সুযোগ না পায়। অর্থাৎ নিজ পিতা শাহজাহানের সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত ঠিক সেইরূপ আচরণে শাহজাদাকে নিরস্ত রাখা। কিন্তু শাহজাদা কয়েক মঞ্জিল যাইতে না যাইতে বাদশাহ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার স্রষ্টার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিলেন। "আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক" (আমি প্রস্তুত, হে আল্লাহ প্রস্তুত) —এই ছিল তাঁহার শেষ বাণী। সে দিন ছিল শুক্রবার। মাসের ২০ তারিখ। বেলা তখন এক প্রহর তিন ঘড়ি অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পাঁচ ঘটিকা পর।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই সংবাদ আজমশাহের কর্ণগোচর হইল। তিনি দ্রুতপদে বাদশাহী শিবিরের দিকে ফিরিয়া চলিলেন এবং ২৯শে জিলকদ রবিবার সূর্যাস্তের প্রায় ১৫ মিনিট পূর্বে সেখানে প্রবেশ করিলেন। পরদিন সূর্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্বে তিনি বাদশাহের শবাধার উঠাইয়া কয়েক পদ বহিয়া নিলেন, অতঃপর তিনি উহা আওরঙ্গাবাদে পাঠাইয়া দিলেন, পরবর্তী মাসের আট তারিখে তিনি শাহী নহবৎ বাজাইবার আদেশ দান করিলেন। পরের বুধবারে ঈদুল আযহার দিনে তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আমীরদের চিত্তজয় ও প্রজাবর্গের নিকট স্বীয় শাসন জনপ্রিয় করার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পরদিন তিনি বাদশাহী ধন-দওলতের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রদেশগুলির আমীর ও সাম্রাজ্যের উচ্চ-পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে তাঁহার দরবারে আমন্ত্রণ করিলেন এবং প্রত্যেককে স্বীয় পদমর্যাদা অনুযায়ী সন্তুষ্ট করার জন্য 'বার-আমে' (সাধারণ দরবার) উপবেশন করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আসাদ খাঁকে উজীরের পদে ও তৎপুত্র যুলফিকার খাঁকে সশস্ত্র বাহিনীর সিপাহসালারের পদে বহাল করিলেন। এক কথায় রাজ পরিবর্তনে কেহই কোন পার্থক্য বুঝিতে পারিল না, প্রত্যেকেই স্বপদে বহাল রহিলেন কিম্বা যিনি যে পদের উপযুক্ত তাঁহাকে সে পদে উন্নীত করা হইল।

ইতিমধ্যে বাদশাহের অসুখের সংবাদ সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ায় প্রত্যেকেই সর্বপ্রযত্নে স্ব স্ব চাকরী বহাল রাখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই

বিশৃঙ্খলার সময় মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মুয়াজ্জম সম্রাট-প্রতিনিধি (ভাইসরয়) রূপে ইরান সীমান্তের কাবুল নগর দুর্গে বাস করিতেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই শাহজাদাই বাহাদুর শাহ নামে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ দুই পুত্র কুহোজিস্তাহ আহতার ও রেসিউল কদর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুয়াজ্জেদীন মূলতানে বাস করিতেন। তিনি ছিলেন তথাকার শাসনকর্তা। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজীমুশ্‌শান ছিলেন চারিজনের মধ্যে যোগ্যতম ও তদীয় পিতামহের অনুগ্রহভাজন। তিনি ছিলেন বাংলার সুবাদার এবং সেখানেই বাস করিতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মুয়াজ্জমকে হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য, দ্বিতীয় পুত্র আজমশাহকে দাক্ষিণাত্য রাজ্য এবং তাঁহার প্রিয় কামবখশকে বিজাপুর রাজ্য দিয়া যাওয়াই মৃত বাদশাহের অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তিন শাহজাদাই স্ব স্ব ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং প্রত্যেকেই সাধ্যমতো আল্লাহ্‌র বান্দাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়না অনুভব করেন নাই, এমন লোক কে আছে? কাজেই তাঁহার সন্তানেরা ইহা হইতে মুক্ত থাকিবেন, এমন একজন প্রবীণ বাদশাহ কিরূপে এই আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন?

কামবখশ পূর্ণ রাজক্ষমতা সহকারে বিজাপুর শাসন করিতেন, তদুপরি আজমশাহ স্বীয় জননীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আর একটা প্রদেশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া দেন এবং তাঁহাকে স্বনামে মুদ্রা প্রচলন ও খুৎবা পাঠের অনুমতি দান করেন। কাজেই কামবখশ নিজের ভাগ্যে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-দিকে ব্যাপার এত সহজ ছিল না; কেননা পিতার অসুখের সংবাদে সুলতান মুয়াজ্জম কাবুল হইতে ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজীমুশ্‌শান বাংলা হইতে বহির্গত হন। উভয় শাহজাদাই তাঁহাদের হাতের কাছে নিজ পক্ষে যত সিপাহী ও গোলন্দাজ সৈন্য পান, তাহা লইয়া প্রত্যেকেই আকবরাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। এই বিরাট নগর দাক্ষিণাত্যগামী রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত। সুলতান মুয়াজ্জম তাঁহার যাত্রাপথে পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাদশাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। সেদিন ১১১৯ হিজরীর মুহর্‌রম মাসের পহেলা বুধবার। তখন ঠিক মধ্যরাত্রি। জ্যোতিষীরা এই সময়টাকে সিংহ রাশিতে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ

কাল বলিয়া নির্দেশ করেন। এই অভিষেকের পর তিনি তাঁহার ভ্রাতা আজম-শাহকে লিখিলেন, "দাক্ষিণাত্য একটা বিরাট জনপদ, তাহাদের পিতা তাঁহার বাস হিসাবে তাঁহার জন্য উহা আলাদা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যদি এই বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকিয়া হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য লইয়া মাথা না ঘামান, তাহা হইলে এরূপ আচরণের ফলে অসংখ্য উপকার ও অফুরন্ত মঙ্গল ফলিতে বাধ্য।" এই ইঙ্গিত আজমশাহের মনে কোনই ক্রিয়া করিল না। নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে কোনই পাত্তা দিলেন না। "একই সিংহাসনে দুই রাজার পক্ষে রাজত্ব করা অসম্ভব।" এই সুপরিচিত প্রবাদবাক্যে ভ্রাতাকে উত্তর দিয়া তিনি স্বীয় দাবীর সমর্থনে সৈন্যসজ্জা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পরিণামে তাহাই ঘটিল, যাহা তিনি নিজের জন্য বাছিয়া লইয়াছিলেন।

সুলতান মুয়াজ্জম ইতঃপূর্বেই লাহোরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মুয়াজ্জেদ্দীন পিতার আদেশে অতি অল্প সময়ের ঘোষণায় যত সিপাহী ও গোলন্দাজ সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহা লইয়া মুলতান হইতে যাত্রা করিয়া অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। পিতার কদমবুছি করার সম্মান লাভের পর তিনি তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিয়া একটি বক্তৃতা দান করিলেন এবং তাঁহার দীর্ঘ রাজত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভাগ্য এই অভিষেকের অনুকূল বলিয়া মনে হইল। কারণ, আজীমুশ্‌শান এক বিরাট সুগঠিত বাহিনী লইয়া বাংলা ত্যাগ করেন। তিনি তখন আকবরাবাদের পথে। সে দেশের দিওয়ান বা রাজস্বাধ্যক্ষ রাজধানীতে এক কোটি টাকা (বাংলার রাজস্ব স্বরূপ) চালান করিতেছেন শ্রবণ করিয়া তিনি সমস্ত টাকা ছিনাইয়া লইলেন, কিন্তু তাহা স্পর্শ না করিয়া পিতার বিতরণের জন্য রাখিয়া দিলেন। আকবরাবাদ প্রদেশের শাসন-কর্তা মুখতার খাঁ ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ আমীর; তিনি শাহজাদা বেদারবখতের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন এবং মনেপ্রাণে আজমশাহের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আজীমুশ্‌শান তাঁহাকে ধৃত করিয়া কয়েদ করিলেন। সেই নগরের বাদশাহী মহলে যুগযুগান্তর ধরিয়া বিপুল ধনভাণ্ডার ও অজস্র শাহী আসবাবপত্র সঞ্চিত ছিল। এই সঙ্গে তিনি সেগুলিও হস্তগত করিয়া তাঁহার দানের শক্তি

বৃদ্ধি, ছোটখাট শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের তুষ্টি সাধন এবং আমীর ও জনসাধারণের চিত্তজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। ইহাতে তিনি এতই সফলকাম হইলেন যে, তাহার দলে ও সৈন্যদলে প্রত্যহ নূতন লোক যোগদান করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি আকবরাবাদের নগর-রক্ষী দুর্গের কিলাদারকে বশ্যতা স্বীকারে রাজী করাইতে পারিলেন না। ইনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলেন, "রাজবংশের তিনজন লোক যখন বাদশাহী তখ্‌তের দাবীতে হত্যাকাণ্ড ও শত্রুতায় লিপ্ত, তখন তাঁহাদের কেহ নিজ শাসন কায়েম না করা পর্যন্ত তাঁহার নিকট দুর্গ সমর্পণ করা আমার পক্ষে কিছুতেই ঠিক হইবে না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রজা ও ভৃত্য দুইদিক দিয়াই আমার কর্তব্য কি, তাহা আমার বেশ জানা আছে এবং তাহা সম্পাদনে আমার ভুল হইবে না।" এই উত্তর দিয়া তিনি দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং অবরোধ সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপ একটি জটিল ব্যাপারে সময় নষ্ট করা অসমীচীন মনে করিয়া শাহজাদা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতা সুলতান মুয়াজ্জম সেখানে আসিলে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিভরে সামরিক সালাম করতঃ তাঁহার দীর্ঘ রাজত্ব ও উহার সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি একত্রে যে অর্থ আনয়নে সমর্থ হন, তাহা তাঁহাকে নজর দিলেন। বেতন না পাইয়া সৈন্যরা ইতিপূর্বেই অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের এত অধিক কষ্ট হইতেছিল যে, তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় আর কোন সাহায্যই ইহা অপেক্ষা অধিক সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিতে পারিত না। এইরূপ সময়োচিত সাহায্য সুলক্ষণ মনে করিয়া সুলতান মুয়াজ্জম সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার অভিযানের সফলতা সম্পর্কে প্রিয়তম বাসনা পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র শোকর গোযারী করিয়া তাঁহার অনুচরদের মধ্যে তাহাদের প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ বিতরণ করিলেন। ফলে তাহাদের কষ্ট অতীতের বিষয়ে পরিণত হইল; আর বর্তমান হইয়া উঠিল আরামদায়ক।

আজমশাহ তাঁহার হাতের কাছে যে সুশিক্ষিত বিরাট বাহিনী প্রস্তুত পান, তাহাদিগকে আয়ত্তে আনার জন্য কয়েক দিন মাত্র বাদশাহী শিবিরে অবস্থান করেন; অতঃপর তিনিও আকবরাবাদ অভিমুখে যাত্রা করি-

লেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া তিনি তাঁহার সহিত রাজমুকুটের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ চিন্তায় তাঁহার প্রকৃতিগত স্বাভাবিক উৎসাহ উদ্দীপিত হওয়ায় তিনি এত দ্রুত অগ্রসর হইলেন যে, তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য ও প্রায় সমস্ত গোলন্দাজ বাহিনী তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। অবিরাম ও নিয়মিত অগ্রগতির পর তিনি গোয়ালিয়ার দুর্গের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া সেখানে তাঁহার সদর দফতর স্থাপন করিলেন। সেদিন ১১১৯ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ১১ তারিখ; সোমবার। সাতদিন পরে তিনি তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আকবরাবাদের নিকটস্থ যাযোর প্রান্তরে তিনি তাহাদের সাক্ষাৎ পাইলেন: তাঁহারা সেখানে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ঘটনাক্রমে তাঁহার কিছু সৈন্য শত্রুদের সমধিক নিকটে যাইয়া পড়িল। তাহারা সুলতান মুয়াজ্জমের সদর দফতরের কিয়দংশ অগ্নিস্মাৎ করতঃ তাঁহার কিছু অশ্বারোহী সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। খোদ আজীমুশ্শান সেখানে তাঁবু গাড়িয়া অবস্থান করিতেছিলেন। যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিলে তিনি তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছে দেখিয়া সুলতান মুয়াজ্জমের ভাগ্য তাঁহার কতদূর আনুকুল্য করে, তাহা দেখিবার জন্য অগ্রগমনে বিরত হইলেন। সুলতান মুয়াজ্জম তখন শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। শত্রুপক্ষ তাঁহার শিবিরের এত সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়াই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়াজ্জেদ্দীন ও তাঁহার উৎকৃষ্ট সেনাপতিগণকে তাঁহাদের সৈন্যসহ সঙ্গে লইয়া তাঁহার পুত্রের সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিলেন। তুমুল যুদ্ধের সময় একটি আকস্মিক ঘটনায় লড়াইয়ের মোড় ফিরিয়া গেল। সুলতান ইহাকে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাঁহার সাহসিক কার্যের অনুমোদন বলিয়া মনে করিলেন। সহসা এমন প্রচণ্ড ঝড় উঠিল যে, সৈন্যেরা ভয়াবহ সেরসেরের নমুনা দেখিতে পাইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সমগ্র আদজাতি এই সেরসেরের দরুন আরবের বালুর নীচে প্রোথিত হইয়া যায়। ইহা সুলতান মুয়াজ্জমের পশ্চাদ্দিকে ও আজমশাহের সৈন্যদের পুরাপুরি মুখের দিকে প্রবাহিত হইল। তাই শাহজাদা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বেদারবখতের উপর তাঁহার সৈন্যদলের বাম পার্শ্বের ও দ্বিতীয় পুত্র ওয়ালাজার উপর দক্ষিণ পার্শ্বের পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিয়া শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার

কনিষ্ঠ পুত্র আলী তেবার তখন শিশুমাত্র, তিনি তাহাকে তাঁহার হাতীর উপরে বসাইয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাঁহার মন্ত্রী আসাদ খাঁকে তিনি একদল সৈন্যসহ গোয়ালিয়রের শিবিরে রাখিয়া আসেন ; তাঁহার প্রধান সেনাপতি যুলফিকার খাঁ আওরঙ্গযীবের আমলেও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি যখন প্রবল উদ্যমে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন যুলফিকার খাঁ আসিয়া আরয করিলেন যে, যেহেতু তখন অনেক বেলা হইয়াছে এবং তাঁহার সরাসরি প্রতিকূলে এত প্রবল ঝড় বহিতেছে, পক্ষান্তরে তাঁহার সৈন্য ও গোলোন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশ তখনও পশ্চাতে দূরে রহিয়া গিয়াছে—এরূপ অসুবিধাজনক অবস্থায় সিংহাসনের জন্য এতদুর ঝুঁকি ঘাড়ে লওয়া সঙ্গত হইবে না। তাঁহার মতে শত্রুশিবিরের একাংশ পোড়াইয়া দিয়া ও শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী দলের একাংশকে পরাজিত করিয়া তিনি তাহাদের উপর যে সুবিধা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাই যুক্তিযুক্ত। আগামীকাল যখন অবশিষ্ট সৈন্য ও গোলন্দাজ বাহিনী সেখানে আসিয়া পৌঁছিবে তখন সমৃদ্ধির লাগাম স্বহস্তে ধারণ এবং সফলতা ও সৌভাগ্যের রেকাবে পদস্থাপনের উদ্দেশ্যে সমবেত প্রচেষ্টায় ইতঃপূর্বেই আতঙ্কগ্রস্ত শত্রুর উপর আপতিত হওয়ার সময় আসিবে এই উপদেশ বিচিত্র ক্রিয়া করিল। তাঁহার নিজের ও নিজ সৈন্যদলের সামরিক গুণ সম্পর্কে তাঁহার উচ্চ ধারণা থাকায় এবং তাঁহার ভ্রাতা ও তদীয় দলবলকে থোড়াই পরওয়া করায় তিনি প্রত্যুত্তরে এমন কয়েকটি কথা বলিলেন—যাহাতে তাঁহার উষ্মা ও বিরক্তি প্রকাশ পাইল। প্রধান সেনাপতি এক অতি সাহসী ও অতি বিচক্ষণ লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'যেহেতু মহামান্য বাদশাহ তাঁহার বিজ্ঞতাপ্রসূত সনির্বন্ধ উপদেশের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া অবিবেচকের ন্যায় নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতে চাহেন, তখন তাঁহার আশা, যে ব্যাপার আপতঃ দৃষ্টিতে এত অমঙ্গলজনক মনে হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে তিনি তাহার দোষ ধরিবেন না।' প্রত্যুত্তরে সম্পূর্ণ ক্রুদ্ধ শাহজাদা গভীর বিরক্তি ও মর্মবেদনায় কয়েকটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা উচ্চারণ করিয়া ভাগ্য তখন তাঁহার প্রতি যেরূপে বিমুখ হইয়াছিল, ঠিক সেভাবে ঐ কর্মচারীর নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। যুলফিকার খাঁ আর কোন কৈফিয়ৎ না

দিয়া গোয়ালিয়র শিবিরে অবস্থিত তাঁহার পিতার সহিত যোগদান করিতে গমন করিলেন। প্রধান সেনাপতির প্রস্থানের প্রতি দিকপাত না করিয়া আজমশাহ তাঁহার সর্বশক্তিতে প্রচণ্ড বেগে শত্রুপক্ষের উপর আপতিত হইলেন। উভয় দলের সাহসী সৈন্যেরা বীরত্ব প্রদর্শনে তাঁহারই ন্যায় উৎসুক ছিলেন বলিয়া দুই পক্ষেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে লাগিল। কিন্তু ঝটিকা পূর্বাপেক্ষা আরও প্রবল বেগে বহিতে থাকায় এত ধুলাবালি উত্থিত হইল যে রণক্ষেত্র সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল। সৈন্যেরা চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিল। এমনকি, শত্রুমিত্র ভেদাভেদ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই যুদ্ধে যোগদানকারী কয়েকজন চরিত্রবান লোক দৃঢ়তার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন যে, বালুকারাশি এত উত্তপ্ত ও এত বিপুল ছিল এবং উহা সৈন্যদের চক্ষু ও মুখে এত জোরে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল যে, কেহই উল্টা দিকে মাথা না ঘুরাইয়া এরূপ ঝটিকার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারিত না। ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত কোন তীর মাত্র কয়েক পদ দূরে শনাক্ত করা চলিত না এবং কয়েক পদ ছাড়াইয়া গেলে উহা আর গ্রহণ করা যাইত না। এত সব প্রতিকুলতা ও অসুবিধা সত্ত্বেও আজমশাহের সৈন্যেরা সুবিধা লাভ করিতে লাগিল, শত্রুবাহিনী বিপন্ন হইয়া পড়িল। সৈন্য ও অফিসার সকলেরই প্রচণ্ডতা এত অধিক ছিল যে, অটল দৃঢ়তা ও প্রাণহানির জন্য আকবরাবাদের এই যুদ্ধ অদ্যাবধি সমগ্র হিন্দুস্তানে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

আজমশাহের সৈন্যদলে তখন মুনাওর খাঁ নামে একজন অতি বলবান ও অত্যন্ত সাহসী আফগান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার স্বজাতির ৫,০০০ সৈন্য তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া চলিত। তিনি বলিতেন, যুদ্ধের দিন হইতেছে বহু সাহসীর পক্ষে বিবাহের দিন। তিনি নিজে জরির কাপড় পরিধান করেন এবং তাঁহার প্রত্যেকটি সৈন্যকেও একটি অনুরূপ পাগড়ী প্রদান করেন; তাহাদের প্রত্যেকেই শত্রুর শোনিতপাতের জন্য প্রস্তুত ছিল। এই কর্মচারী একটা সুবিধাজনক মুহূর্ত পাইয়া আজমশাহের নিকট গিয়া আরয করিলেন, "হুজুর, আমাকে অশ্বারোহণের অনুমতি দান করিলে আমি শত্রুপক্ষের উপর আপতিত হইয়া আমার মনিবের স্বার্থে আমি কিরূপ উৎসাহী এবং এইরূপ মহৎকার্যে আমার সৈন্যেরা শোনিতপাতে কিরূপ অমিতব্যয়ী সমগ্র জগতের নিকট তাহা প্রতি-

পাদন করিতে পারি।" এই অনুরোধের উত্তরে শাহজাদা তাঁহাকে সরকারী আস্তাবল হইতে যে হাতী সরবরাহ করা হয়, তদুপরি উপবিষ্ট থাকিতে আদেশ দান করিলেন। এই প্রত্যাখানে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া কর্মচারী তাঁহার সৈন্যদের পুরোভাগে থাকিয়া কেন্দ্রভাগ পর্যন্ত ধাওয়া করিলেন। খোদ আজীমুশ্‌শান তখন সেখানে সেনাপতি। হুসায়ন আলী খাঁ ও কয়েকজন চরিত্রবান কর্মচারী তাঁহাকে বাধা দান করিলেন; ইহারা ছিলেন আজমীরের বিখ্যাত সায়্যিদ আবদুল্লাহ খাঁর পুত্র; ইনি মীর খাঁ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। কিন্তু শত্রুরা এত প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালাইল যে, ঐ সমুদয় কর্মচারীর অধিকাংশই সসৈন্যে মৃত্যুবরণ করিল, স্বয়ং হুসায়ন আলী খাঁ কয়েকটি মারাত্মক জখম লইয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন। শত্রুগণেরও ঠিক এতগুলি লোক নষ্ট হইল। মুনাওয়র খাঁর যে অল্প কয়েক জন লোক অবশিষ্ট রহিল, তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া আজীমুশ্‌শানের হাতীর নিকট পর্যন্ত ধাওয়া করিলেন। তাঁহার হাতে একটি বর্শা ছিল। হিন্দুস্তানীরা ইহাকে 'বল্লম' বলিয়া থাকে। তিনি এত জোরে উহা হাওদার তক্তার দিকে নিক্ষেপ করিলেন যে, উহা বিপরীত দিকের তক্তা ফুটা করিয়া বাহির হইয়া গেল। শাহজাদা তাঁহার দেহ সম্পূর্ণরূপে বাম দিকে হেলাইয়া আঘাত এড়াইয়া না গেলে তাঁহার মৃত্যু অবধারিত ছিল। এরূপ অসমসাহসিক কার্য দেখাইবার পর অবশেষে এই সাহসী পুরুষ যে কয়জন নির্ভীক সৈনিক তাহাদের সেনাপতির মৃত্যুর পরে জীবিত থাকিতে অস্বীকৃত হয়, তাহাদের সঙ্গে দেহরক্ষা করিলেন।

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অজস্র লোকের মৃত্যু ঘটে। ভ্রাতা ওয়ালাজার ন্যায় বাম পার্শ্বের সেনাপতি শাহজাদা বেদারবখ্‌তও মৃত্যুমুখে পতিত হন। শাহজাদা ওয়ালাজা ছিলেন বালক মাত্র; তিনি কখনও যুদ্ধ দেখেন নাই। সেদিন ভয়াল সাকী—মৃত্যু তাঁহাকে যে তিক্ত শরাব উপহার দেয়, তিনি তাহার শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করেন।

এই দুই জনের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাদের পিতা আজমশাহের নিকট ঘোষণা করা দরকার হইয়া পড়িল। হতভাগ্য শাহজাদা তাঁহার সন্তানদের অত্যন্ত ভালবাসিতেন: জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি তাঁহার একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখন হইতে আমার নিকট জয় ও

জীবনের কোনই মূল্য নাই।" ইহা বলিয়া তিনি তাহার মাহুতকে আদেশ দিলেন, "আমাকে শত্রুব্যূহের মধ্যস্থলে লইয়া যাও।" সেখানে তাঁহার হাওদায় এত ঘন হইয়া শর বিদ্ধ হইল যে, কেহ হয়ত ভাবিতে পারিত সেদিন শরবৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট একদল নির্বাচিত সৈন্য তাঁহার অনুগমন করে; তাহাদের কেহই স্বীয় প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। নিজের নিরাপত্তার প্রতি বেখেয়াল হইলেও শাহজাদা তাঁহার শিশুপুত্র আলী তেবারের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহাকে হাওদার উপরে বসাইয়া নিজের ঢাল দ্বারা তাহার দেহ ঢাকিয়া দিলেন; ফলে তিনি নিজে অনাবৃত হইয়া পড়িলেন। তথাপি তিনি অবিশ্রান্তভাবে ধনুকের গুণ টানিতে টানিতে আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু এ সমুদয় চেষ্টা ছিল সবই পণ্ডশ্রম মাত্র। দিনমান তখন অনেকটা শেষ; নিয়তি ইতঃপূর্বেই তাহার রায় দান করিয়াছে। তরবিয়ৎ খাঁ, আমানুল্লাহ খাঁ, দুই ভ্রাতা মুনাওয়ার খাঁ ও খান আলমসহ মতলব খাঁ এবং অজস্র সৈন্যসহ হিন্দু রাজা রামসিংহ ও রাজা দিনপাত প্রভৃতি তাঁহার উৎকৃষ্ট কর্মচারীরা নিহত হইয়াছেন; শেষ ভরসাস্থল দুই পুত্রের কেউই আর নাই। কয়েকটি বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া আজমশাহ নিজেও হাওদার উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন রুস্তমদিল খাঁ নামক এক হতভাগা কর্মচারী সেই বীরপুরুষের হাতীর উপর উঠিয়া তাঁহার মস্তক কাটিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করিল না। অতঃপর সে রাজশিশু আলী তেবারকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইল এবং দুই জনকেই তাহার প্রভু সুলতান মুয়াজ্জমের নিকট লইয়া গেল। এই দৃশ্য বাদশাহের মনে গভীর রেখাপাত করিল। তাঁহার ভ্রাতার রক্তাক্ত মস্তক দর্শন তাঁহার কোমল প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি অনেক হা-হুতাশ করিয়া ভ্রাতার জন্য অশ্রুপাত করিলেন। এতীম রাজ-শিশুকে তিনি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সর্ব প্রকারে তাহাকে শান্ত করার প্রয়াস পাইলেন। পরিশেষে তাহার প্রতি তাঁহার এত মমতা জন্মে যে, নিজ সন্তানদের সহিত তিনি তাহার কোনই পার্থক্য করিলেন না। তাঁহার পুত্রেরা এত অধিক স্নেহপরায়ণতায় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একবার তাঁহারা হুজুরে হাজির হইয়া অসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "যদি সে

আমার সৌভাগ্য ও মুকুটের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হইবে মনে করিয়া তোমরা অস্থির হইয়া থাক, তবে আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিতে চাহি যে, তাহার চেয়ে বরং তোমাদের নিজেদেরই এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক এবং প্রয়োজনের সময় এই শিশু তোমাদের যে কেহ অপেক্ষা আমাকে রক্ষা করার জন্য সমধিক ব্যগ্র বলিয়া প্রমাণিত হইবে।" বাদশাহের মুখে এই উত্তর পাইয়া তাঁহারা নীরব হইয়া গেলেন।

নিয়তির বিধানে আজমশাহের রাজত্ব ফুরাইয়া গেলে এবং তাঁহার দল ভাঙ্গিয়া গেলে তদীয় মন্ত্রী ও সেনাপতিরা উজীর আসাদ খাঁ ও প্রধান সেনাপতি যুলফিকার খাঁর সহিত মিলিত হইয়া একযোগে 'সুলতান মুয়াজ্জমের বশ্যতা স্বীকার করিতে গমন করিলেন ; এই সময় তিনি বাহাদুর শাহ বা সাহসী নরপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। উজীর ও সিপাহসালার তাঁহাদের নিজ নিজ হাত একখানা রুমালে বাঁধিয়া তদবস্থায়ই হুজুরে হাজিরা দিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে কুর্নিশ করিলেন। এই দৃশ্য দর্শনে বাদশাহ ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি সিংহাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া স্বহস্তে উজীরের বন্ধন মোচন করিয়া যুগপৎ স্বীয় পুত্র মুয়াজ্জেদীনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া সিপাহ্সালারের হাত খুলিয়া দাও।" এত অধিক অনুকম্পা প্রদর্শনেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি পিতাপুত্র উভয়ের বিশেষতঃ প্রথম জনের সহিত অত্যন্ত সদয়ভাবে কথাবার্তা বলিলেন এবং নিজের এক প্রস্থ শাহী পোশাক আনাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিধান করিতে আদেশ করিলেন। প্রজার প্রতি এবম্বিধ সম্মান প্রদর্শন অতীব বিরল, ইহা উজীরকে স্বর্গীয় প্রসাদের ন্যায় সমুচ্চে তুলিয়া ধরিল। তাঁহার কাপড় পরা শেষ হইলে তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে সম্মানিত করিলেন এবং নিজের সম্মুখে বসিতে দিয়া ৯,০০০ সওয়ারের মনসবদারী মর্যাদাসহ হপ্ত হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে দুই কোটি দাম উপহার দিয়া আদেশ দান করা হইল যে, তাঁহার পাল্কী বাদশাহী বেষ্টনীর মধ্যে গোসলখানা পর্যন্ত যাইতে পারিবে (কেবল শাহজাদারাই এই সম্মান পাইতেন) এবং তাঁহার নহবৎও বাদশাহী সীমানার মধ্যে বাজাইতে পারা যাইবে। তাঁহার অনুগ্রহের শেষ নিদর্শন স্বরূপ তিনি

তাঁহাকে উকীলে মুৎলকের (সহকারী সেনাপতি ও সাম্রাজ্যের সংময় কর্তা) পদসহ 'জলীলুল কদর' উপাধি প্রদান করিলেন। একই সময় মুনাম খাঁ প্রধান মন্ত্রীর পদ ও আকবরাবাদের সুবাদারিসহ 'জুমলাতুল মুলুক' উপাধি পাইলেন। এই সুবাদারী ঐ পদের সহিত যুক্ত হইয়া গেল। কাছারীতে তাঁহার আসন আসাদ খাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে নির্দিষ্ট হইল; সমস্ত সরকারী দলীল দস্তাবেজে তিনি প্রধান মন্ত্রীর মোহরের নীচে নিজের সীলমোহর দেওয়ার অধিকার পাইলেন।

এই সকল ব্যবস্থার পরে নূতন বাদশাহ কয়েকজন হিন্দু রাজার আচরণের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তন্মধ্যে আম্বরের রাজা জয়সিংহ প্রধান। তিনি আজমশাহের, পক্ষান্তরে তাঁহার নিজ ভ্রাতা বেজী সিংহ বাদশাহের পক্ষ সমর্থন করেন। বেজী সিংহ বাদশাহের অত্যন্ত উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হন। তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতার স্থলাভিষিক্ত করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে দরবারে হাজিরা দানের আদেশ প্রদত্ত হইল। যোধপুরের জমিদার যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহও অনুরূপভাবে আজমশাহের পক্ষে যোগদান করেন; তদুপরি তিনি অবাধ্য ও বিদ্রোহী বলিয়া প্রমাণিত হন। এবম্বিধ আচরণের প্রতি তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দানের প্রয়োজন ছিল। বাদশাহ ঐ সকল দেশে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া মওরুশী রাজাদের হাত হইতে দুইটি দুর্গ কাড়িয়া লইলেন এবং নিজ কর্মচারীদের হস্তে উহাদের ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত করিলেন। পদচ্যুত জমিদারের বাদশাহী রেকাবে যোগদানের এবং এখন হইতে দরবারে বাস করার নির্দেশ পাইলেন। একই সময় আসাদ খাঁ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে গমনে আদিষ্ট হইলেন। রাজধানী ও উহার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ এখন হইতে তাঁহার বিশেষ রক্ষণা-বেক্ষণে থাকা সাব্যস্ত হইল। এইরূপে সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি অংশে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে লাগিল। বাদশাহের সদাশয়তা প্রত্যেকটি লোকের চিত্তজয় করায় সিংহাসনের শক্তি বৃদ্ধি ঘটিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আওরঙ্গযীবের অবশিষ্ট দুই পুত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধিল।

শাহজাদা কামবখ্‌শ এত উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন যে, অধীনতা সহ্য করা, এমনকি শান্তিতে বাস করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পাইবা মাত্রই তিনি বিজয়ী দলের বিরোধিতা করিতে প্রস্তুত হইলেন। নূতন বাদশাহ বৃথাই তাঁহাকে সান্ত্বনাবাণী পাঠাইয়া চুপচাপ

থাকিতে ও শান্তিতে বাস করিতে মৃদু উপদেশ দিলেন। ইহা কোমল ও শান্ত প্রকৃতির কামবখ্শের উৎসাহ বর্ধনে সহায়তা করিল মাত্র। তাঁহার উত্তরে নিছক ক্রোধ ও যুদ্ধংদেহি' মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া গেল। বাদশাহ এমনকি এ সমুদয়ও উপেক্ষা করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজ পুত্রেরা তাঁহাকে চাপিয়া ধরায় ও ভৎসনা করায় তিনি কামবখ্শের বিরোধিতা করাই স্থির করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১১১৯ হিজরীর ১৭ই শাবান সোমবার মধ্যরাত্রির অর্ধঘণ্টা পূর্বে ফতেহপুর ও আজমীরের পথে বিজাপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। পর বৎসরের ৩রা জিলকদ বুধবার উভয় বাহিনী কামবখ্শের অধিকৃত হায়দরাবাদ নগরের উপকণ্ঠে যুদ্ধে লিপ্ত হইল। পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও অনেক শোণিতপাতের পর মধ্যরাত্রে বাহাদুর শাহের সৈন্যদল শত্রুপক্ষকে রণক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়া জয়মাল্যের অধিকারী হইল। ইতিমধ্যে যাহারা ব্যক্তিগতভাবে কামবখ্শের প্রতি অনুরক্ত ছিল, তাহাদের অধিকাংশই নিহত হওয়ায় অবশিষ্ট লোক পালাইয়া গেল। ফলে শত্রুরা পূর্ণ বিজয়ের অধিকারী হইল। কয়েক বার রাজোচিত বীরত্ব প্রদর্শনের পর খোদ শাহজাদা কয়েকটা আঘাত খাইয়া অজ্ঞান অবস্থায় ধরাশায়ী হইলেন, ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস ভিন্ন তাঁহার দেহে জীবনের আর কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইল না বলিলেই হয়। বিজেতারা এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া তাঁহার পুত্রকন্যাসহ তাঁহাকে একটা হাতীর পিঠে চাপাইয়া বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া বাদশাহ (তাহাদের প্রতি) সর্বপ্রকার মান-সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুয়াজ্জেদ্দীনকে প্রেরণ করিলেন। আহত শাহজাদা উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে বাদশাহী সীমানার মধ্যে একটা নিভৃত শিবিরে রাখিবার আদেশ দান করিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি পদব্রজে সেখানে গমন করিলেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি কখনও তোমাকে এই অবস্থায় দেখিবার আশা করি নাই'। মুমূর্ষু শাহজাদা অতি কষ্টে চোখ মেলিয়া উত্তর দিলেন, "আমিও আপনাকে এ অবস্থায় দেখিবার প্রত্যাশা করি নাই" এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। এবম্বিধ দৃশ্যে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া বাদশাহ তাঁহার খাস কামরায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার এতীম বালক

ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন। আলী তেবারের ন্যায় তাহাদিগকেও তিনি একইরূপে লেখাপড়া শিখাইবার আদেশ দিলেন; তাঁহার নিজ পুত্রদের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ ও তীব্র ভৎ'সনায় তিনি কখনও কর্ণপাত করিতেন না।

এই যুদ্ধের ফলে বাহাদুর শাহ সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মালিক হইলেন। হিন্দুস্থান লইয়াও যাবতীয় প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিল। তাঁহার কর্তৃত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মনে যে কয়েকটি রদবদল প্রবর্তনের ইচ্ছা ছিল, এখন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। একদিন তিনি আসাদ খাঁ ও তাঁহার পুত্র সিপাহসালার যুলফিকার খাঁ দুইজনকেই নম্রভাবে বলিলেন, 'মুনাম খাঁ আমার পুরাতন ভৃত্য। বিশ্বস্ত বন্ধু ও অতিবড় ভক্ত। আমি যখন শাহজাদা মাত্র ছিলাম, তখন তাঁহার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলাম যে, আমি যখন রাজমুকুটের মালিক হইব, তখন তাঁহাকে আমার উজীর করিব। এখন তিনি আমাকে আমার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। কিন্তু আমি একদিকে আপনাদিগকে চটাইতে চাহি না অন্যদিকে আমার ওয়াদা খেলাফ করিতেও ইচ্ছুক নহি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা বাদশাহের মর্যাদার সহিত সঙ্গতিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এরূপ জরুরী নাজুক ব্যাপারে আমি আপনাদের উপদেশপ্রার্থী। যাহাতে আমার নাজুকতা ও মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ না হয় এবং দুই পক্ষই সন্তুষ্ট থাকে আমাকে এমন কোন পথ বাতলাইয়া দিন।" বাদশাহের ঝোঁক লক্ষ্য করিয়া আসাদ খাঁ উত্তর দিলেন, "বাদশাহদের উচিত বরাবরই তাঁহাদের জবান ঠিক রাখা; তবে অনুরূপভাবে তিনি ইহাও প্রত্যাশা করেন যে, যে দুই জন বিশ্বস্ত কর্মচারী এত দীর্ঘকাল ধরিয়া উৎসাহভরে বাদশাহী পরিবারের খেদমত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মান ও অপমানের হাত হইতে রক্ষা করা হইবে।" এই উত্তরে বাদশাহের মন শান্ত হওয়ায় তিনি নির্দেশ দিলেন যে, আসাদ খাঁ তৎক্ষণাৎ উকিলে মুৎলকের উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবেন; তাঁহাকে একটা মূল্যবান খিলাতে ভূষিত করার জন্যও হুকুম জারি হইল। মুনাম খাঁ অনেক সময় শাহজাদাদের উকীলে মুৎলক ও তাঁহার দিওয়ান হিসাবে কাজ করেন। তাঁহাকে যুগপৎ উজীরের খেলাতে ভূষিত করা হইল, বাদশাহের রত্নাধার ও সীল মোহর তাঁহার হাতে অর্পিত হইল। বাদশাহ স্বয়ং এই দুই জন বিখ্যাত পুরুষের মর্যাদাও ঠিক করিয়া দিলেন।

তিনি আদেশ করিলেন যে, আসাদ খাঁ উকীলে মুৎলকের গদীতে ও ওজারতের সামিয়ানার নীচে উপবেশন করিলে মুনাম খাঁ বিনীতভাবে পায়দল তাঁহার নিকট হাজির হইয়া যে সকল কাগজে তাঁহার দস্তখতের দরকার হইতে পারে তাহা তাঁহার নিকট পেশ করিবেন।

এই বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বয়ের উভয়েই এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা রাজকার্য পরিচালনা ও সাম্রাজ্যের মঙ্গল বর্ধনে তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা এমনভাবে নিয়োজিত করিলেন, যেরূপ আচরণ তাঁহাদের মুখ্য কর্তব্য এবং নিয়োগ ও চাকরীর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় হওয়া উচিত।

সিপাহসালার যুলফিকার খাঁ আমীরুল-ওমরা উপাধি ও পদে ভূষিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। যে সকল প্রদেশ পূর্বে বিজিত হয় বা হইবে। তৎসমুদয় এই সুবার অন্তর্ভুক্ত করা হইল। তিনি ছিলেন এই গুরুদায়িত্বের খুবই উপযুক্ত। ঐ সময় অন্য কেহ এরূপ নব বিজিত ও এত বিদ্রোহী জনপদ বশে আনিতে পারিতেন না। নূতন সুবাদার তাঁহার সুবার সামরিক অবস্থা ও রাজস্বের মনোমত ব্যবস্থা করিয়া দারুদ খাঁ পনী নামক সে দেশের একজন বিখ্যাত আফগান আমীরকে স্বীয় প্রতিনিধিরূপে সেখানে রাখিয়া দরবারে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন এতদঞ্চলের একজন অতি শক্তিশালী ব্যক্তি। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য, দৈহিক শক্তি ও ব্যক্তিগত বীরত্বের দরুন তিনি এত বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ লোক হইয়া দাঁড়ান যে, দাক্ষিণাত্যের অপর কোন আমীরকেই তাঁহার সঙ্গে তুলনা করা চলিত না। তিনি যেভাবে সঙ্গত মনে করেন, সেভাবে কয়েদ ও খালাস করার ক্ষমতাসহ তাঁহাকে কেবল যে সমস্ত সরকারী কার্যেরই সর্বময় কর্তা করা হইল এমন নহে, অর্থবিভাগের ভারও তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত, যুক্তিযুক্ত মনে করিলে যে কোন সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ণ ক্ষমতাও তাঁহার ছিল।

এই বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে নিজের মনকে নিশ্চিত করিয়া যুলফিকার খাঁ দরবারে গমন করিলেন; সেখানে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা বিস্তারে নিরন্তর আত্মনিয়োগ করিলেন। বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র এযাবত বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আজীমাবাদ (পাটনা) ও ইলাহাবাদ প্রদেশ শাসন করিয়া

আসিতেছিলেন, তজ্জন্য ঐ সকল প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীনে রাখাই সঙ্গত মনে হইল। ইহার ফলে শাহজাদা দুইজন বিখ্যাত আমীরকে মুক্তহস্তে পুরস্কৃত করার ক্ষমতা পাইলেন। তাঁহারা তাঁহার অনেক জরুরী উপকার করেন এবং আকবরাবাদের মহাযুদ্ধে অত্যন্ত সাহসের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহারা হইতেছেন আবদুল্লাহ্ খাঁ ও সায়্যিদ আলী খাঁ; উভয়েই সায়্যিদ আবদুল্লাহ খাঁর পুত্র; মিঞা খাঁ নামে তিনি আজমীরে অত্যন্ত ভক্তিভাজন ব্যক্তি ছিলেন। জ্যেষ্ঠ আবদুল্লাহ খাঁকে তিনি ইলাহাবাদের ও সায়্যিদ আলী খাঁকে আজীমাবাদের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। জাফর খাঁ ছিলেন পূর্ব হইতেই বাঙলা ও উড়িষ্যা প্রদেশের দিওয়ান, এখন এগুলির সুবাদারিও তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। এই সকল ব্যবস্থার পরে শাহজাদা তাঁহার পিতার দরবারে স্বীয় বাসস্থান নির্দেশ করিলেন। সেখানে প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাঁহার বিপুল প্রভাব ছিল।

বাদশাহ ছিলেন বেজায় সাধু প্রকৃতি এত করুণ-হৃদয় যে, এমনকি তাহা দোষের হইয়া দাঁড়ায়। একবার তিনি পরম করুণাময় স্রষ্টার নিকট শপথ করেন যে, কখনও তিনি সিংহাসনে বসিলে কাহারও অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হওয়ায় এখন তিনি তদনুযায়ী কাজ করিতে মনস্থ করিলেন। মুনাম খাঁর ন্যায় লোককে বিভিন্ন অনুরোধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ও বিশেষ বিশেষ দাবী মিটাইতে নিযুক্ত করা হইলেও উচ্চপদ, উপাধি ও চাকরী এত নির্বিবাদে ও এত অধিক মাত্রায় বিতরিত হইতে লাগিল যে, এগুলির মূল্য অনেকটা নষ্ট হইয়া গেল এবং এগুলি আর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন রহিল না। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রত্যহ ছয়, এমন কি সাত হাজারী মনসবদারী পাইতে থাকায় এবং সমস্ত নবাগত লোককে জঙ্গ, মুল্ক রায়, রাজক প্রভৃতি উপাধি প্রদত্ত হওয়ায় পরিনামে উচ্চ পদগুলির গুরুত্ব নষ্ট হইয়া গেল এবং উপাধিগুলিরও কোন মূল্য রহিল না।

ইতোমধ্যে যে সৈন্যদল হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, বর্ষাগমে তাহারা আটক পড়িল। গাযীউদ্দিন খাঁ পূর্ব হইতেই বেরারের সুবাদার ছিলেন; আওরঙ্গযীব তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করেন। এমনি দুঃসময়ে উজীর

তাঁহার উপর গুজরাটের শাসনভার ন্যস্ত করা সঙ্গত মনে করিলেন। মন্ত্রীরা এতই দুর্বল এবং শাসন কর্তৃপক্ষ এতই অবজ্ঞেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, নূতন শাসনকর্তার অনুমতি না লইয়া এমনকি, বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই কর্মস্থলে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এই উদ্ধত্য উপেক্ষিত হওয়ায় যে দুইজন গদীচ্যুত হিন্দুরাজা দরবারে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারাও অনুরূপ ধৃষ্টতা দেখাইতে প্রোৎসাহিত হইলেন। ইহারা ছিলেন রাজা জয়সিংহ কচুয়া ও অজিত সিংহ রাটোর। উভয়েই বিনানুমতিতে দরবার ত্যাগ করিলেন এবং নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়া স্বরাজ্যে পৌঁছিলেন। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শোণীতপাতের পর বাদশাহের কর্মচারীরা তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের দুর্গগুলি অধিকার করেন। রাজারা সেগুলি পুনরায় দখলে আনিয়া আপনাদিগকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এত অধিক ধৃষ্টতা অবশেষে বাদশাহকে জাগরিত করিল। হিন্দুরাজাগণকে শাস্তিদানের ইচ্ছায় তিনি মর্যাদা অতিক্রম করিলেন। তাঁহারা দরবার হইতে তাঁহাদের দূরত্ব ও তদানীন্তন অমনোযোগিতার এত অধিক সুযোগ গ্রহণ করেন যে, সায়্যিদ ভ্রাতৃত্রয়—আহ্‌মদ খাঁ, হুসায়ন খাঁ ও খয়রাত খাঁর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তিনজনে একই দিনে শাহাদৎ বরণ করেন। ইহাই বিশেষভাবে বাদশাহের ক্রোধোদ্রেক করে এবং ঐ রাজপুতদের মনেও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই সময় দরবারে এমন একটি সংবাদ আসিল, যাহার ফলে ঐ দুইজন রাজার সহিত সময়োচিত ব্যবহার করা এবং তাঁহাদের দোষ স্বীকার গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল। তিনি যখন গজারোহণে গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে অর্ঘ নিবেদন করিলেন। বাদশাহ তখন অসুস্থ কিন্তু গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিখদের সাহায্যে পাঞ্জাবে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিল, তাঁহার খাতিরে তাঁহাকে সমস্ত বিবেচনা স্থগিত রাখিতে হইল।

সেই গৃহদাহকারী ঐ তুষারাবৃত দেশের রাজা ও অধিবাসীদিগকে স্বীয় আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিয়া সেরে-হিন্দের ফওজদার ওয়াজির খাঁকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাহাদের ধ্বংসক্রিয়ায় স্তম্ভিত হইয়া বাদশাহ, অসাদ খাঁ ও যুলফিকার খাঁকে ঐ সকল পর্বতে আরোহণ করিয়া গুরু যে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন

তাহা অবরোধ করিতে আদেশ দান করিলেন। কিন্তু একটা বিশেষ পথের কথা গুরুর জানা ছিল, রাত্রিকালে তিনি শত্রুদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া সমস্ত অনুচরসহ ঐ পথে সরিয়া পড়ার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন মাত্র পথিমধ্যে ধরা পড়িল ; এই উপেক্ষার ফলে আসাদ খাঁর চরিত্র অত্যন্ত কলঙ্কলিপ্ত হইল। সেইদেশে কোন যশোলাভ সম্ভবপর নহে দেখিয়া বাদশাহ রুস্তম দিল খাঁকে একদল সৈন্যসহ সেখানে রাখিয়া লাহোরের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। এই শহরেই আসাদ খাঁ এই নশ্বর জগত ত্যাগ করিলেন। তাঁহার উকীলে মৎলুকের পদ এতেমেদুদ্দীন খাঁর পুত্র হেদায়েত আলী খাঁকে প্রদত্ত হইল। তাঁহাকে একটি মূল্যবান পোশাক পরাইয়া এই পদে অভিষিক্ত করা হইল। গাজীউদ্দীন খাঁও এইরূপে গুজরাটের সুবাদারীতে দেহত্যাগ করিলেন। বাদশাহ তখন লাহোরে প্রবাহিতা ইরাবতী নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। রুস্তম দিল খাঁ তাঁহার নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করেন, তাহাও আবার বিনানুমতিতে। এবম্বিধ-হীনতা প্রদর্শনের পর এখানে তিনি দরবারে তাঁহার মুখ দেখাইবার নিশ্চয়তা পাইলেন। তাঁহার নির্লজ্জতার জন্য তিনি ন্যায্য শাস্তি পাইলেন। তাঁহাকে তাঁহার পদমর্যাদা, কর্তৃত্ব ও জায়গীর হইতে বঞ্চিত করিয়া লাহোর দুর্গে কারারুদ্ধ করা হইল। মুহম্মদ আমীন খাঁ তাঁহার স্থানে পাঞ্জাবে প্রেরিত হইলেন।

বাদশাহের ঐ শহরে অবস্থানকালে কয়েকটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। শিক্ষিত বুদ্ধি কৌশলময় লোকদের সংসর্গ তাঁহার নিকট ভাল লাগিত। তিনি বিজ্ঞানের সূক্ষ্মবিচার, বিশেষতঃ আইন ও ধর্ম শাস্ত্র সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে নিজেকে একজন সুনিপুণ ওস্তাদ বলিয়া দাবী করিতেন (এই সমুদয় গুণে তিনি মোটামুটি তাইমুর বংশীয় সমস্ত রাজার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন) কাজেই তিনি ঐ সকল বিষয়ে দক্ষ লোকদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতে এবং তাঁহাদের সহিত তৎসম্পর্কে আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে আবিষ্কার করেন যে, ইমামিয়া মযহাবই একমাত্র সম্রান্ত মযহাব। তজ্জন্য তিনি ইহাতে তাঁহার মন-প্রাণ ঢালিয়া দেন এবং তাঁহার লাহোরে আগমনের পর শহরের আলীমমণ্ডলকে একত্র করিয়া মহামান্য, মহাসাধু আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী বিন আবু তালিবের দাবীর

ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত বাহাসে লিপ্ত হন। তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন সুন্নী। তিনি তাঁহাদের সকলেরই যুক্তি খণ্ডন করেন এবং তাঁহাদিগকে যেরূপ হতবুদ্ধি দেখিতে পান, তাহাতে পাঞ্জেগানা নামাযে ও খুৎবায় উচ্চারিত নির্দিষ্ট কলেমার আকারে "হযরত আলী আল্লাহ্‌র ওলী ও রাসুলুল্লার ওয়ারিস" কথাটা যোগ করার পরিকল্পনা করেন। এরূপ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অপ্রতিহত ক্ষমতা ও অত্যন্ত দৃঢ় চিত্ততার দরকার। কিন্তু তাইমুর বংশের, বিশেষতঃ শেষ যুগের নরপতিদের মধ্যে এই সকল গুণ কখনও প্রবল ছিল না। এতদ্‌ভিন্ন বাদশাহের সাহসী ও সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় আজীমুশ্‌শান ও খুজিস্তাহ্‌ আখতার ছিলেন সুন্নীমতের অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক। কাজেই এই নব প্রবর্তন ছিল নিতান্ত অসমর্থনীয় ও ইহা বদ্ধমূল হইতে পারিল না। এবিষয়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হইবেন এবং কাজে কাজেই তাহার বাসনা ফলপ্রদ হইবে না বলিয়া বাদশাহের নিজেরই আশঙ্কা ছিল। তথাপি তিনি ইহার সাধ্যতা কিঞ্চিৎ পরীক্ষা না করিয়া তাঁহার মতলব পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া জনৈক শিয়া ক্বারীকে প্রধান মসজিদে প্রেরণ করিলেন। নিরাপত্তার খাতিরে তাঁহাকে আজীমুশ্‌শানের সঙ্গে পাঠান হইল, কিন্তু শাহজাদা ছিলেন অন্তরে এইরূপ নব-প্রবর্তনের বিরোধী। তিনি শুধু পিতার অভিপ্রায়ের প্রতি সম্মানের খাতিরেই লোকটিকে সঙ্গে লইয়া যান। মুসল্লীদের অধিকাংশই ছিল হানাফী। এই পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়া আপত্তিকর কথাগুলি উচ্চারণের পূর্বেই তাহারা নিরীহ লোকটির উপর আপতিত হইয়া তাঁহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। শাহজাদা তখন সম্পূর্ণ নীরব দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিলেন।

ইহার পর আর একটি চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিল। সুন্নী মযহাবের আলীম ও কতিপয় প্রধান নাগরিক তৎক্ষণাৎ মসজিদে সমবেত হইয়া বাদশাহ্‌কে সত্য পথাবলম্বীদের দলে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ পাঠাইলেন এবং হিন্দু মুসলমান ভালমন্দ নির্বিশেষে সকলের নিকট তাহাদের ধর্মপ্রাণ দ্বারা (এবিষয়ে) সাহায্যের আবেদন করিলেন। কিন্তু বাদশাহ এই আমন্ত্রণের প্রতি জ্রক্ষেপ না করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল শিয়া মতবাদের উন্নতি বিধান ও অনেক সময় বিরোধীদের সহিত তর্ক বিতর্কে ব্যয় করিতে থাকিলেন; তবে তাহাতে আদৌ

কোন ফল ফলিল না। বাস্তবিক পক্ষে যদি নবনীতির প্রবর্তন সম্পূর্ণরূপে যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে যিনি, কি আরবে, কি ইরানে তদানীন্তন যমানার শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন, সেই নবীদের রাজা ও রাসুলদের সর্দার (তাঁহার ও তদীয় বংশধরদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত সালাম) সৃষ্টিকর্তার নিকট হইতে যুদ্ধ করার আদেশ পাইলেন কেন ?

বাদশাহের সিংহাসনারোহণের পর ইতিমধ্যে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয় ; এখন লাহোর শহরের সন্নিকটস্থ ইরাবতী নদীর তীরে শিবির স্থাপনের পর তৃতীয় বৎসর। এই সময় তাঁহার মনে কিছু রদবদলের খাহেশ হইল, তখন হিজরী ১১২৪ সনের মুহর্‌রম মাসের প্রায় মধ্যভাগ। একদা তাঁহার মাথায় শিবিরের ও লাহোর শহরের সমস্ত কুকুরকে হত্যা করার আদেশ দানের খেয়াল চাপিল। এরূপ সুবিজ্ঞ রাজার নিকট ঈদৃশ আদেশ নিতান্ত অদ্ভুদ বিবেচিত হইতে বাধ্য। কাজেই লোকে মনে করিতে লাগিল, কেহ তাঁহাকে যাদু-টোনা করিয়াছে বলিয়াই তিনি এরূপ করিতেছেন। শিখদের যেমন সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতেছিল, তেমনি তাহারা বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেছিল। এমতাবস্থায় এরূপ ব্যাপার নিতান্ত অপ্রীতিকর। লাহোর নগরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় দিবাভাগে সেখানে একটা কুকুরেরও দর্শন মিলিত না, কিন্তু রাত্রি হওয়া মাত্রই যে সকল গৃহে তাহারা আহার্য ও আদর-যত্ন পাইত, সেখানে প্রত্যাবর্তনে কখনও পশ্চাৎপদ হইত না। সারারাত ধরিয়া এই কাণ্ড-কারবার চলিত। প্রত্যুষে তাহারা ইরাবতী নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িত এবং সাঁতার কাটিয়া আবার তীরে উঠিয়া নিকটবর্তী প্রান্তরসমূহে লুকাইয়া থাকিত।

শিখদের এ সমুদয় রণ-কৌশল ও মসজিদে হাঙ্গামার কথা আমি সম্বলের আমীনুদ্দৌলাহ্‌ কর্তৃক তাঁহার সন্তানদের নিকট লিখিত একখানা পত্রের বলে উল্লেখ করিয়াছি। পরিশেষে আমি উহা তাঁহার সচিবের কাগজ-পত্রের মধ্যে প্রাপ্ত হই। এই পত্র হইতে জানা যায় যে, সকল আলীমের প্ররোচণায় এই হাঙ্গামা ঘটে ও কারীর জীবন নষ্ট হয়। বাদশাহ তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েক জনকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং অপর কয়েক জনকে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠাইয়া দেন। কিছুকাল পরে তিনি সামান্য অসুস্থতা বোধ করেন ; কেহই তাহাতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করে নাই। কিন্তু তিনি

তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং এই অবস্থায়ই সন্ধার প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্বে চির করুণাময়ের প্রাসাদের এক কোণে স্থান গ্রহণের জন্য ইহলোক ত্যাগ করেন। সেদিন ছিল ১৯শে মুহর্‌রম।

বাদশাহ্‌ যখন অজ্ঞান হইয়া পরেন, ঘটনাক্রমে শাহজাদা আজীমুশ্‌শান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই দৃশ্য অসহ্য হওয়ায় তিনি সেস্থান ত্যাগ করিয়া নিজ শিবিরে গমন করেন। যাওয়ার সময় তিনি এরূপ শোকাবহ ঘটনা সম্পর্কে তাঁহার নিকট সঠিক খবর লইয়া আসার জন্য আমীনুদ্দৌলাহকে আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে বলিয়া যান। সুতরাং বাদশাহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা মাত্রই ঐ আমীর শাহজাদার নিকট গমন করিয়া সংবাদ দিলেন—তাঁহার পিতা আর নাই। সব শেষ! শাহজাদা মনের দুঃখে অনেক ক্রন্দন করিলেন, কিন্তু আমীনুদ্দৌলাহ্‌ এক খানা রুমাল দিয়া তাঁহার অশ্রু মুছিয়া দিয়া বলিলেন— "উঠুন আপনার দলবল সংগ্রহ করুন, একটি মুহূর্তও নষ্ট করার মত নাই; এক্ষণি সিংহাসনে উপবেশন করুন এবং এক্ষণি বাদশাহী নহবৎ বাজাইবার ও সঙ্গীত গাহিবার আদেশ দিন।" এই অনুরোধ প্রতিপালিত হইলে ঘটনাক্রমে যে কয়জন সভাসদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে রেওয়াজ অনুযায়ী নজর দিতে ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহার দীর্ঘ ও সুখী রাজত্ব কামনা করিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে আমীনুল্লাহ্‌, নিয়ামত উল্লাহ খাঁ ও অপর কয়েক ব্যক্তি নিবেদন করিলেন যে, প্রধান সেনাপতি যুলফিকার খাঁ ও হামীদুল্লাহ খাঁ উভয়েই তাঁহার প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন; তাঁহারা স্বহস্তে বাদশাহের শব সাজাইতে ব্যস্ত; এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাহাদিগকে কবর পর্যন্ত গমন করিতে হইবে এবং ইহাতে যে মূল্যবান বিলম্ব ঘটিবে সেই ফাঁকে তাঁহাদের উভয়কেই ধৃত করিয়া আটক রাখা যাইতে পারে।" এই জরুরী উপদেশেও শাহজাদা স্পষ্টতঃ অবিচলিত থাকিয়া উত্তর দিলেন। "ব্যাঘ্র-বাগীশের ন্যায় এরূপ অশোভন কার্য করিলে বাদশাহের বে-ইজ্জতী হইবে; তাঁহার নিজের কথা বলিতে গেলে তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনার হক ও আল্লার সাহায্যের উপর ভরসা রাখেন, বিশেষতঃ সব কিছু হিসাবে ধরিলেও যুলফিকার খাঁ কি-ই বা করিতে পারিবেন?" এই উত্তরে তাঁহার উপদেষ্টারা অভিভূত ও হিতৈষীরা নির্বাক হইয়া গেলেন। তাঁহারা ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিলেন, "আল্লাহ ইহাকে কোন মঙ্গলে পরিণত করুন।" প্রকৃত পক্ষে শাহজাদা

এক বিরাট খুনের জন্য দায়ী এবং তাহাও তাঁহার রাজত্বের ঠিক স্মরণীয়। এতদ্‌সত্ত্বেও নিয়ামত উল্লাহ খাঁ স্বেচ্ছায় নিজস্ব একটা বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া সটান বাদশাহী বেষ্টনী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন; কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলেন, প্রধান সেনাপতি ইতিপূর্বেই নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তিনি শাহ্‌জাদার নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

এখানে বলা আবশ্যক যে, পিতার জীবনকালে আজীমুশ্‌শান বরাবরই অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটাইতেন। তাঁহার অধীনে কি দলীল-দস্তাবেজে স্বাক্ষর দানে, কি রাজকার্য নির্বাহে, তিনি তাঁহার উকিলে মতলুকরূপে কাজ করেন। শাহী মহলেও তিনি সর্বাধ্যক্ষরূপে কর্তৃত্ব করিতেন। তজ্জন্য সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল। কাজেই পিতার ধন-সম্পদ অধিকার ও সিংহাসনে আরোহণ করিতে তাঁহাকে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। এংকালে শিবিরের সৈন্যরা কতকটা আশ্বস্তি ও পরিতোষ লাভ করে। কিন্তু সকলের অবস্থাই এরূপ ছিল না। অনেকে ব্যাপারটা আরও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত বলিয়া অশান্তি ও শোনিতপাতের আশঙ্কা করিত। কাজেই যে কেহ এক খানা শাড়ী বা একটা ভারবাহী পশুর ব্যবস্থা করিতে পারিলেন, তিনিই তাঁহার পরিবার ও উৎকৃষ্ট মালপত্র দ্রুত লাহোরে পাঠাইয়া দিলেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য লোকে বাদশাহী বেষ্টনীর মধ্যে গমন করিয়া সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এদিকে যখন এসকল ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতে ছিল, তখন হেকিমগণ সাদিক খাঁ ও হোকিমুল মুল্‌ক এবং মহব্বত খাঁ ও সমস্ত রাজমন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারী সমভিব্যাহারে একযোগে আজীমুশ্‌শানের বশ্যতা স্বীকার করিতে গমন করিলেন। শাহনওয়াজ খাঁ ও হামীদুদ্দীন খাঁ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। পক্ষান্তরে রুস্তমদিল খাঁ ও আবার কয়েক ব্যক্তি খুজিস্তাহ আখতারের আনুগত্য স্বীকার করিল। প্রধান সেনাপতি যুলফিকার খাঁ আবার এই শাহ্‌জাদাকে দেখিতে পারিতেন না, আজীমুশ্‌শানের সঙ্গেও তাঁহার বনিবনা ছিল না। কাজেই তিনি মৃত বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র মুয়াজ্জেদীনের নিকট গিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহার কোন হুকুম আছে কিনা জানিতে চাহিলেন। শাহ্‌জাদা উত্তর দিলেন, "মোটেই না, অন্ততঃ বর্তমানে নহে; কারণ আমার অর্থ নাই, সৈন্য

নাই ; পিতার সহিত যোগাদান করিতে আসার সময় আমি যে কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিয়াছিলাম তাহারা বাদশাহী সৈন্যদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তবে আমি আমার সুলতানের সুবাদারীতে প্রত্যাবর্তনের আশা রাখি। সেখানে আমি পুনরায় জগতের রঙ্গ-মঞ্চে উপনীত হওয়ার মতো সৈন্য ও সঙ্গতি সংগ্রহের প্রত্যাশা করি ; তখন আমি ভাগ্যের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইব।" কিন্তু প্রধান সেনাপতি এরূপ দীর্ঘ-সূত্রী ব্যাপারের সমর্থন করিতে না পারিয়া নিজের ব্যক্তিগত তহবিল হইতে তাঁহাকে অর্থ, সৈন্য ও আগ্নেয়াস্ত্র দান করিতে চাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সুজিস্তাহ আখতার ও রফীউল কদরের সহিত যোগদানের প্রস্তাব করিলেন। এরূপ সম্মিলনের বদৌলতে তাঁহারা আজীমুশ্‌-শানের দলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবেন, তৎপরে তিন ভাইয়ে একত্র বসিয়া পরস্পরের সহিত আলোচনাক্রমে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিবেন। কিন্তু মুয়াজ্জেদীন এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলেন না। প্রধান সেনাপতির প্রতিশ্রুতি বা শক্তিতে বিশেষ আস্থা না থাকায় তিনি তাঁহাকে প্রথমে পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার ভ্রাতাদ্বয়ের অভিপ্রায় জানিয়া আসিতে বলিলেন। যুলফীকার খাঁ তৎক্ষণাৎ স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার বিবেচনায় (এ ব্যাপারে) যত অর্থ ও মালপত্রের দরকার ; তাহা একত্র করিয়া সমস্তই মুয়াজ্জেদীনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অপর দুইজন শাহজাদার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিগত বাদশাহের ধন-রত্ন মাল-পত্রের সমান ভাগে সম্মত করাইয়া প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহাদের চিত্ত জয় করিয়া ফেলিলেন।

এত কাণ্ডের মধ্যে আজীমুশ্‌শান সরকারী কর্মচারী, সভাসদ বর্গ ও তাঁহার দলভুক্ত সেনাপতিদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাদশাহের পূর্ণ সম্মানসহ সিংহাসনে সমাসীন থাকেন ; তবে কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইলে তিনি তাঁহাকে বাধা দানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁহার শিবির পরিখাবেষ্টিত করিয়া চতুর্দিকে কামান পাতিয়া কয়েক দিন পর্যন্ত পরিণামের প্রতীক্ষা করিলেন। তাঁহার ভরসা ছিল, অন্যান্য দাবীদারের অর্থ না থাকায় তাঁহার সৈন্যেরা স্বতঃই ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে কিম্বা তাঁহার শিবিরে চলিয়া আসিবে। কিন্তু ভাগ্য তাঁহার পক্ষে না থাকায় যাহা কিছু ঘটিল, তাহার সবই ছিল ইহার ঠিক বিপরীত। যুলফিকার খাঁ (মুয়াজ্জেদীনের) যে উপকার করেন, সর্বোপরি তাহা প্রতিদান

বলিয়া প্রতিভাত হইল। অতঃপর তিনি শাহজাদাগণকে একত্রে সমবেত হইতে আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহার সঙ্গে মুয়াজ্জেদীনের শিবিরে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা তাঁহার জন্য বাদশাহী শান-শওকতের উপযুক্ত একটি দরবার গঠন করিলেন। ইহা হিজরী ১১২৪ সালের ঘটনা। পরদিন তাঁহারা আজীমুশ্শানকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন এবং একটি শাহী যুদ্ধ হইল। কিন্তু ভাগ্য তাঁহার প্রতিকূল থাকায় তাঁহার সৈন্যেরা অল্পকাল মধ্যেই পরাজিত হইয়া পালাইয়া গেল। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, আজীমুশ্শানের দেহের জন্য সর্বপ্রকার অনুসন্ধান চালাইয়াও উহার কোনই পাত্তা মিলিল না। এই ঘটনা নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম দিন শত্রু পক্ষ হইতে সামান্য আক্রমণ হইল, কিন্তু তাহারা যেন তাহাদের মন পরিবর্তন করিয়াছে; এভাবে এক সপ্তাহ দিন ভর আজীমুশ্শানের শিবিরে কামানের গোলা নিক্ষেপ করিয়াই তৃপ্ত রহিল। তিনিও একইরূপে তাহার উত্তর দিলেন। সপ্তম দিনে নিয়ামতউল্লাহ খাঁ ও আমীন খাঁ ছড়ি রাজা খোকাম সিংহ ও জাঠ রাজা রাজসিংহকে সঙ্গে লইয়া শাহনওয়াজ খাঁর নেতৃত্বে একযোগে ঐ শাহজাদার নিকটে গিয়া বসিলেন। তাঁহার শত্রুদের সংখ্যা তখনও আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই; সুতরাং তদ্দণ্ডেই শিবিরের বাহিরে গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করা ও হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করা সম্ভবপর। প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়াই এই আদেশ পালন করিতে হইল। জাঠরাজা তুড়ামন ও বাঞ্জার'রা তখন রাস্তায় এমন হয়রানি আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, শত্রু শিবিরে কোন রসদ-পত্র পৌঁছিতে পারিতেছিল না। কাজেই তাঁহার আশা ছিল তাহারা দৈহিক খাদ্যের অভাবে ছত্রভঙ্গ হইতে বাধ্য হইবে। দীর্ঘ-সূত্রী পন্থাবলম্বনে এত অধিক আগ্রহান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সৈন্যদের চিত্ত জয়ের জন্য তিনি কোনই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। যে ধন-রত্ন অনায়াসে তাঁহার হাতে আসে; তাহা ব্যয় করিতে তিনি এত অধিক কার্পণ্যের পরিচয় দেন যে, যে ব্যক্তি তাহা নিজের সঙ্গে পরলোকে লইয়া যাইতে উৎসুক, তাঁহাকে এতুল্য বলিয়া মনে হইত। মাথায় এরূপ পরিকল্পনা থাকতে যখনই কেহ কোন অধিকতর সাহসিক প্রস্তাব পেশ করিতেন, তখনই তিনি যে "আর একটু অপেক্ষা করুন" ঠিক এই কথা কয়টি

বলিয়া সবকিছুই নষ্ট করিয়া দিবেন—তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। অষ্টম দিনে যুলফিকার খাঁ লাহোর নগর হইতে কয়েকটি বৃহৎ কামান আনাইয়া সেগুলি একটি সুবিধাজনক এক ভূমিতে স্থাপন করিয়া তাহা হইতে আজীমুশ্শানের শিবিরে অবিরাম বড় বড় গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আজীমুশ্শানের সৈন্যরা ইতিপূর্বেই তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া রহিয়াছিল। কামান আনয়নের জন্য শত্রুরা লাহোরের রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ায় এই সুযোগে তাহারা ভারী গোলার পাল্লার বাহিরে থাকিবার জন্য তাঁহার শিবিরের পশ্চাদ্দিক হইতে সরিয়া গেল। এরূপ নিষ্ক্রিয়তায় বিরক্ত হইয়া হিন্দু রাজদ্বয় সসৈন্যে শাহজাদার নিকটে গিয়া বলিলেন, "আপনার শিবিরে অপেক্ষা করার আর কোনই উপায় নাই। শত্রুদের অবিশ্রান্ত বিদ্রূপ ধ্বনি সহ্য করিতেও আর আমরা প্রস্তুত নাই। অতএব আমরা হুজুরের সমর্থন পাইবা না পাই আমাদের নিজস্ব সৈন্য লইয়া শত্রুদের উপর আপতিত হইয়া আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এরূপ তেজস্বী প্রতিবাদের উত্তরে শাহজাদা শুধু বলিলেন 'আর একটু অপেক্ষা করুন।' এবম্বিধ অভ্যর্থনায় স্তম্ভিত হইয়া সাহসী হিন্দু রাজাদ্বয় ভর্ৎসনা বাক্যে তাঁহাদের বিরক্তি জ্ঞাপন করিয়া সংগে সংগেই শিবির হইতে বহির্গত হইয়া অসি হস্তে শত্রুদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। তাহারা এরূপ আকস্মিক আক্রমণের প্রত্যাশা না করায় হতভম্ব হইয়া হটিয়া গেল। রাজদ্বয় বিস্ময়কর বীরত্ব দেখাইয়া শত্রু ব্যূহ ভেদ করিয়া উপরি উক্ত কামান শ্রেণী পর্যন্ত ছুটিয়া গিয়া সেগুলি স্বাধিকারে আনয়ন করিলেন। এই সময় ঐ বীর পুরুষদের সমর্থন করার দরকার ছিল। কিন্তু এরূপ চেষ্টা করা দূরে থাকুক যে কয়েক জন সেনানায়ক অকস্মাৎ স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, শাহজাদা বরং তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার সেনাপতির সহকারিগণকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। এই দ্বিধা-সংকোচ মুহূর্ত লক্ষ্য করিয়া সিপাহসালার (যুলফিকার খাঁ) ও রুস্তম দিল খাঁ হিন্দু রাজাদের উপর তীব্র আক্রমণ চালাইলেন। তাঁহারা অত্যন্ত বীরত্বের সহিত ইহার মুকাবিলা করায় এক প্রচণ্ড যুদ্ধের সূচনা হইল। কিন্তু হিন্দুরাজারা সংখ্যাধিক্যের নিকট হত-বল হইয়া মারাত্মকরূপে আহত হইলেন, তাহাদের সৈন্যেরা ভগ্নসাহস হইয়া লাহোরের দিকে পালাইয়া গেল। ঠিক এই মুহূর্তে সুলায়মান খাঁ পনী নামক

জনৈক সাহসী আফগান এক হাজার স্বজাতীয় সৈন্য লইয়া তাঁহাদের সাহায্যার্থে আগমন করিতেছিলেন। তিনি ঠিক এমন সময় আসি1 পড়িলেন যে, বন্দুকের গুলিতে নিজেই মারা পড়িলেন, শত্রুরা তাঁহার লাশ লাহোরে লইয়া গেল।

আজীমুশ্শানের শিবিরে প্রায় ষাট সত্তুর হাজার অশ্বারোহী ছিল; তন্মধ্যে এখন তাঁহার হাতীর চতুষ্পার্শ্বে অনুমানিক দশ বার হাজারের অধিক লোক অবশিষ্ট রহিল না। সন্ধ্যাগমনে শাহজাদা তাঁহার মহলে গমন করা মাত্রই ইহারা দলে দলে লাহোরে চলিয়া গেল। ফলে পরদিন প্রাতে দুই তিন হাজারের অধিক লোক তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়াই তিনি শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে চাহিলেন। ভৃত্যেরা তাঁহার নিকট তাঁহার অভ্যস্ত হাতী লইয়া আসিল তিনি তাহাতে আরোহণের প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু উহা কিছুতেই হাঁটু গাড়িয়া বসিতে রাজী হইল না। উহাকে বশে আনার জন্য মাহুতের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শাহজাদা আর একটা হাতী আনয়নের জন্য লোক পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। যে অত্যল্প সংখ্যক লোক তাঁহার নিকট অবশিষ্ট ছিল! ইতিমধ্যে তাহারাও গায়েব হইয়া গেল। হাতী চালাইতে গিয়া তিনি দেখিলেন তাঁহার পার্শ্বে তখন শুধু দশ জন সৈন্যসহ নিয়ামতুল্লাহ খাঁ, বিশজন সৈন্যসহ অমীনুদ্দৌলাহ, এবং এক হাজারের কিছু অধিক সৈন্যসহ রাজা জয়সিংহ হাজির আছেন; তাঁহার সর্বপ্রকার সৈন্যের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ দুই হাজারও ছিল না। তথাপি তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইতে না হইতেই এমন ভীষণ এক ঝড় উঠিল যে, ইরাবতী নদীর সমস্ত বালু উড়াইয়া দিল; এত ধূলি রাশি উত্থিত হইল যে, চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ঝটিকার বেগ হইতে মাথা ঘুরাইয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। চোখ খুলিলেই আকস্মিক ইটা দৃষ্ট হইত আর কান খাড়া করিলেই শত্রুদের কামানের গর্জন শুনা যাইত। এই সময় কয়েক জন অশ্বারোহী আসিয়া তাহাদের পশ্চাৎভাগে তীর বর্ষণ করিল। কিন্তু আজিমুশ্শানের পক্ষ হইতে কোন সাড়া না পাইয়া তাহারা তাঁহার ধন রত্ন লুণ্ঠন করিতে আগাইয়া গেল। তিনি যে সিংহাসনে আসীন ছিলেন এক মুহূর্ত পরে একটা কামানের গোলা আসিয়া তদুপরি পতিত হওয়ায় তাকিয়াগুলিতে

আগুন ধরিয়া গেল এবং প্রচুর ধূম নির্গত হইল। নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য শাহজাদা সমস্ত আসবাবপত্র মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। আমীনুদ্দৌলাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর কি আঘাত পাইয়াছেন?" শাহজাদা উত্তর দিলেন "মোটেই না, আগাইয়া যান, আগাইয়া যান।" এতদশ্রবণে সেনাপতি কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিছু অশ্রু বিসর্জন করায় শাহজাদা তাঁহাকে দৃঢ়তার অভাবের জন্য মহত্বের সহিত তিরস্কার করিলেন। এই মহানুভবতা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন। "দৃঢ়তা! উহা এখন আমাদের কি কাজে লাগিতে পারে। আমাদের আশার পাত্র পাহাড়ে লাগিয়া চুরমার হওয়ার উপক্রম হইয়াছে: এখন আমার মস্তক পাথরে হানা বা পাথর আমার মাথায় মারা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। হুজুরের সমস্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য বহির্গমন করিয়া সম্মানিতভাবে আক্রমণ পরিচালনার জন্য বৃথাই আপনাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছে, এরূপ হিতকর ব্যবস্থার জন্য বৃথাই তাহারা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়াছে। কিন্তু আপনি বরাবরই "আর একটু অপেক্ষা করুন" এই দুর্লক্ষণ যুক্ত উত্তর দিয়াছেন। অবশ্য আমাদের সর্বনাশ হওয়াই যখন সর্বশক্তিমানের হুকুম, তখন শাহানশাহ কিরূপেই বা ইহার অন্যথা করিতে পারিতেন? এখনও উহা অবলম্বনের সময় আছে; মুহূর্ত পরে তাহাও চলিয়া যাইবে। আপনি হস্তী ছাড়িয়া অশ্বে আরোহন করুন এবং আমাদের সঙ্গে বাঙ্গালায় পলায়ন করুন। সেখানে আপনার পরিবার আছে আপনার বন্ধু-বান্ধব এবং সাহায্যকারীরাও রহিয়াছেন। অন্ততঃ দাক্ষিণাত্যের আদ্যান্ত যাহার তাঁবে, সেই দায়ূদ খাঁ হুজুরের নফর। বাঙ্গালা নিরাপদ স্থান; চলুন, আমরা সেখানে যাই, সেখানে আপনার শ্রান্তি দূর করার পর নিজের দলবল সহকারে আপনি পুনরায় এখানে আসিয়া অবস্থানুযায়ী কাজ করিতে পারিবেন।" শাহজাদা উত্তর দিলেন, "এই সবই অতি চমৎকার! কিন্তু দারা শেকোহ তাঁহার পরাজয়ের পর কি করিয়াছিলেন? ঐ সবই সুজার কি কাজে আসিয়াছিল? যদি রাজত্ব এখনও আমার ভাগ্যে থাকে, তবে "অল্প সংখ্যক লোক প্রায়ই বহু লোকের উপর জয় লাভ করিয়াছে।" কুরআনের এই আয়াত আমার বেলায়ও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে আর বিজয় ও সফলতা এখনও আমাদের নিকট হইতে দূরে নহে।" এসকল উক্তির উত্তরে আমীনুদ্দৌলাহ্ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে,

তাঁহার সঙ্গে এখন কুড়িজনের অধিক ঘোড়সওয়ার নাই, সকলেই চলিয়া গিয়াছে। শাহজাদা ধীরস্থিরভাবে জবাব দিলেন, "বহুত আচ্ছা, আমাকে এই বিশজনের অর্ধেক দিন যেন আমি তাহাদিগকে লইয়া ঐ মুয়াজ্জেদীনের দিকে ছুটিতে পারি ; বাকী দশজন লইয়া আপনি ঐ খুজিস্তাহ আখতারের দিকে ধাবিত হউন।" এই সকল কথা শুনিয়া সেনাপতি প্রায় বুদ্ধিহারা হইয়া গেলেন। এমন সময় খোজা হাসানকে (বর্তমানে খানে দুরান) পশ্চাদ্দিক হইতে বলিতে শোনা গেল। "সেনাপতি ! আমি বাঙ্গালায় যাইতেছি ; বিশ্বাস করুন, চলুন আমরা একত্র যাই।" সেনাপতি উত্তর দিলেন, "কখনও না, যতক্ষণ আজ্জীমুশ্শানের দেহে নিশ্বাস থাকিবে, ততক্ষণ আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইব না।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই কামানের একটা বৃহৎগোলা আসিয়া শাহজাদার হাতীর শুঁড়ের ঠিক গোড়ায় পড়ায় উহ পাগল হইয়া গেল। জন্তুটী বিপরীত দিকে ঘুরিয়া ঘুর্ণীবাতার ন্যায় প্রচণ্ড ও বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতবেগে পানির ধারে ছুটিয়া গেল। উহার মাহুত তাহার আসনচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল। জলীল খাঁ লোদী পশ্চাতে বসিয়া ছিলেন, তিনি রজ্জু বাহিয়া নীচে নামিয়া প্রাণের দায়ে পালাইয়া গেলেন। কয়েক ব্যক্তি হাতীটিকে বাধাদানের চেষ্টা করিলেন, আমিনুদ্দৌলাহও তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তাহারা উহার নাগাল পাইলেন না। আমিনুদ্দৌলাহ দেখিলেন, মুহূর্তের মধ্যে জন্তুটি তীরের একটা খাড়া শৈলময় স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটা ঘূর্ণাবর্তে তলাইয়া গেল—ডুব দিয়াই উহা অন্তর্হিত হইল। নিকটে আসিয়া তিনি পানিতে একটা আলোড়ন অনুভব করিলেন। কতকটা কর্দমও ঊর্ধ্ব উৎক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু হাতীটিকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হাতী ও উহার আরোহী উভয়েই তলাইয়া গিয়াছে কখনও আর উঠিবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই ধরা পড়িয়া বন্দী হইলেন। তাঁহাকে নির্জন কয়েদী হিসাবে শাহজাহানাবাদ দুর্গে প্রেরণ করা হইল। ফররুখ সিয়ারের জরুরী আদেশে মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। মুয়াজ্জেদীনের উপর জয়লাভের পর ফররুখ সিয়ার শাসনকর্তা ইয়ার খাঁর নিকট এই উদ্দেশ্যে ঐ আদেশ প্রেরণ করেন। পরিণামে তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হন।

এত অল্প ক্ষতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয়লাভ ঘটে যে, উহা আল্লাহর স্বেচ্ছাকৃত

দান বলিয়াই মনে হইল। শাহজাদা মুয়াজ্জেদীনের সাহস বা গুণের অভাব ছিল না। এই জয়লাভের ফলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গেল। তিনি এখন বাঁটোয়ারা সন্ধি বাতিল করিয়া স্বয়ং হিন্দুস্তানের রাজমুকুট মাথায় পরিবার ফন্দী আঁটিলেন। এই মতলবে তিনি এমনভাবে শ্রেষ্ঠত্বের ভান দেখাইয়া বিবাদ বাঁধাইলেন যে, তিন ভ্রাতার মিলন অনৈক্য ও শোনিতপাতে পর্যবসিত হইল। ধন-রত্নের ভাগ-বন্টন লইয়াই যে এই সমুদয় কলহ বাঁধে, তাহা নিশ্চিত। এই ধন-রত্নের মধ্যে ছিল ৮০ গাড়ি আশরাফী ও ১০০ গাড়ী রৌপ্য মুদ্রা। সুজিস্তাহ্ আখতার এই সমস্ত অর্থ তুল্য তিন ভাগে বিভক্ত করিতে চাইলেন; কিন্তু যুলফিকার খাঁ এত ছল চাতুরী ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন যে, পাঁচ ভাগের তিন ভাগই মুয়াজ্জেদীনের ভাগে পড়িল, অপর দুই ভ্রাতা তাঁহাদের অংশ পাইলেন বাকী দুই ভাগ মাত্র। এবম্বিধ কার্যে তাঁহাদের ক্রোধোদ্রেক না হইয়া পারিল না। সুজিস্তাহ্ আখতার রাজমুকুট ধারণ করা স্থির করিয়া জাহাঁশাহ্ উপাধি ধারণ করিলেন। ফলে উভয়পক্ষ যুদ্ধে নামিতে উদ্যত হইল। মুহম্মদ খাঁ, রুস্তম দিল খাঁ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত সেনাপতি এই সময় এই শাহজাদার সহিত যোগদান করেন; ইহারা নরহত্যা ও শোনিতপাত ভিন্ন আর কিছুই স্বপ্ন দেখিতেন না। তজ্জন্য উভয় বাহিনী পরস্পরকে ঈর্ষার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলেও তাহারা সারাদিন, এমন কি সমগ্র রাত্রিতেও সশস্ত্র থাকিত। দুর্যজগতের পশ্চিমাংশের নিম্নে বিশ্রাম করিতে গমন করা মাত্রই উভয় পক্ষ অসংখ্য মোমবাতি ও অন্যান্য আলো প্রজ্বলিত করিত। তাহারা শুধু যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ লাভের জন্য অপেক্ষায় থাকিত বলিয়া মনে হইত। জাহাঁশাহের দলে বহুলোক ছিল, অচিরে তিনি এক বিরাট বাহিনী ও বহু সংখ্যক কামানের মালিক হইয়া বসিলেন। এই দুই বিষয়ে মুয়াজ্জেদীনও তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন না। তিনি এখন জাহাঁদার শাহ অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের মালিক উপাধি গ্রহণ করিলেন। উভয় বাহিনী দুই ভ্রাতার শত্রুতার শরীক হইল; একাদিক্রমে তিন দিন যাবৎ দিবসে খণ্ডযুদ্ধ ও রাত্রে সশস্ত্র থাকিয়া পাহারা দান ভিন্ন আর কোনও চিন্তা কাহারও মনে ঠাঁই পাইল না। চতুর্থ দিনে জাহাঁশাহের ভাগ্য মন্দ হওয়ায় তিনি তাঁহার সেনাপতিগণকে

বলিলেন, "আমি বাহির হইতে আমার শিবির পরীক্ষা করিতে চাহি; ইতিমধ্যে আপনারা আমার পরিদর্শনের জন্য আপনাদের সৈন্যগণকে অশ্বারোহণে প্রস্তুত রাখিতে যত্নবান হউন।' সুভাগ্য তিনি তাঁহার চরদিগকে পাহারায় থাকিতে এবং শত্রু পক্ষের অশ্বারোহীরা অবতরণ করিয়া ঘোড়ার জন্য দানা প্রস্তুত করিতেছে বলিয়া টের পাইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংবাদ দিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার সৈন্যগণকে অশ্বারূঢ় ও প্রস্তুত রাখা হয়। ঐ মুহূর্ত উপস্থিত হইবামাত্র তিনি শত্রু শিবিরের দিকে ধাবিত হইলেন। সামান্য যুদ্ধের পর সেখানে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল, শত্রু সৈন্যেরা এবম্বিধ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল ক্ষীণ বাধাদানের পরেই পরাজিত ও পরিণামে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। লালকুঙর নাম্নী জনৈক ভদ্র বেশ্যা ছিলেন জাহাঁদার শাহের পেয়ারী রক্ষিতা। তিনি একটি হস্তী পৃষ্ঠে পর্দাবৃত আম্বারীতে সওয়ার হইয়া সর্বত্র তাঁহার অনুগমন করিতেন। পলায়ন ও আতঙ্ক এত সর্বজনীন হইয়া দাঁড়াইল যে, লালকুঙরও জনতার সঙ্গে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন—তাহাও আবার পথব্রজে এবং বোরকা ছাড়া! তিনি রুস্তম দিল খাঁর হাতে পড়িলেন। এই কর্মচারিটী যখন বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার ইজারের নায়ারে দোদুল্যমান মুক্তার মালা উন্মোচনে ব্যস্ত তখন তাঁহাকে তাঁহার হাত হতে উদ্ধার করা হয়। এরূপ অপ্রত্যাশিত বিশৃঙ্খলার মধ্যে খোদ জাহাঁদার শাহ তাঁহার অভ্যস্ত হস্তী না পাইয়া হাতের কাছে প্রথমে যেটি পাইলেন, তাহাতেই আরোহণ করিয়া সামিয়ানা না থাকায় একখানা প্রকাণ্ড চাদর মুড়ি দিয়া রমনী বহনের ছলে তাঁহাকে শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়া যুলফিকার খাঁর নিকট লইয়া যাওয়ার জন্য মাহুতকে আদেশ দান করিলেন। যুলফিকার খাঁ জাহাঁদার শাহকে এই অবস্থায় দেখিয়া যুদ্ধের পরিণতী সম্পর্কে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া একদল উৎকৃষ্ট বন্দুকধারী তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের মধ্যে মুষ্টি মুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন 'আমার একটি মহোপকার করার দিন সমাগত; আমি তোমাদের নিকট শুধু একাজটুকু চাই। একবার তাহা সম্পন্ন হইয়া গেলে কৃতজ্ঞতার বশে আমি যে কি করিতে পারি এবং তোমাদের সৌভাগ্য তোমাদের জন্য কি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে

পাইবে।" তিনি আরও বলিলেন, "দেখ, জাহাঁদারশাহ্ এখন অজস্র কর্মচারী ও সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন; তাহারা তাঁহার বিজয়লাভের মুবারক-বাদ হিসাবে তাঁহাকে নজর দান করিতেছে। তোমরা কয়েকশত লোক একই বাহানায় সেই জনতার সহিত মিশ্রিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সবলে এক যোগে তাঁহার উপর গুলিবৃষ্টি করিবে। ইহা সহজ এবং তোমাদের নিকট আমি শুধু ইহাই চাই।" তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র তাহাদের মধ্যে তিন-চার শতলোক তাহাদের কর্মচারীদের পরিচালনায় জনতার সহিত মিশিয়া গেল। জাহাঁ-শাহ তখন তাঁহার লোকজনের সহিত নিজের সম্পর্কে আলোচনা করিতে-ছিলেন এবং যে সকল সৈন্য মুয়াজ্জীনের শিবির লুণ্ঠন করে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এমন সময় তাহারা একযোগে তৎপ্রতি গুলি বর্ষণ করিল; তিনি রক্তাপ্লুত দেহে হাত পা ছুড়িয়া পড়িয়া গেলেন; তাহাদের মনিব অপ্রত্যাশিতরূপে "বিজয় মাল্যের" অধিকারী হইলেন। এমন আকস্মিক বিজয় লাভের পর এই শাহজাদা শত্রুদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়াই তাঁহার রক্ষিতাসহ নিজ মহলে গমন করিলেন এবং মদ্য ও তাঁহার বাইজি-দের রূপসুধা পানে রাত্রি কাটাইয়া দিলেন; পক্ষান্তরে ঐরূপ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সৈন্যেরা রণক্ষেত্রে যে যেখানে ছিল সেখানেই কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণ করিল।

পরদিন প্রত্যুষে শাহজাদা রফীউল কদর মুয়াজ্জদীনের জয়লাভে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য তাঁহার হেরেমের প্রধান কর্মচারীকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু বিজেতা সারারাত সুস্বাদু মদ্যপানে কাটাইয়া দিয়া তখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; কেহই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইল না। তবে তাঁহার খোজারা শাহ-জাদার লোকে যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছে তাহা শুনিতে পাইয়া হাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে বলিল, "মস্ত বড় আহমক না হইলে তুমি এখন সংবাদ লইয়া আসিতে না; বিশেষতঃ আজীমুশশান ও জাহাঁশাহের পরিণাম দর্শনের পর তোমার মনিবের আর কোন হুঁশিয়ারীর দরকার ছিল না।" এই উত্তরে কাসিদ নিশ্চিতরূপে প্রভুর ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট ব্যাপারটা পেশ করার জন্য দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিলেন। এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ রফীউল কদরকে বিপুল তথ্য যোগাইল; স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় তিনি নাগারা পিটাইবার আদেশ

দিয়া নিছক নিজের হতাশার উপদেশের বশে গজারোহণে আগাইয়া চলিলেন। তাঁহার সৈন্যদল ও বন্ধু-বান্ধবেরা যত দ্রুত পারিল, তাঁহার অনুসরণ করিল। এই সকল গতিবিধিতে সতর্ক হইয়া যুলফিকার খাঁ তাঁহার সৈন্যদের দ্বারা ব্যূহ রচনা করিলেন; জনৈক বিখ্যাত খোজা জাহাঁদার শাহ্‌কে জানানা মহল হইতে টানিয়া আনিয়া যে কোন প্রকারে একটা বাদশাহী হাতীতে চড়াইবার জন্য আদেশ পাইল। কিন্তু তিনি তখন বদ্ধ মাতাল, নগ্ন-মস্তক, সম্পূর্ণ অসংবৃত পরিচ্ছেদ ও পরিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞ। এই অবস্থায়ই তাঁহাকে একটি হাতীর পিঠে বসাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করা হইল। সেখানে প্রধান সেনাপতি ইতিপূর্বেই রফীউল কদরের দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন। এই শাহ্‌জাদা পূর্ণ দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া বীরোচিত সাহসের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন; এই সাহস ছিল আরও ভাল নিয়তির যোগ্য। তিনি শত্রুদের নিবিড়তম অংশে প্রবেশ করেন এবং এই রক্তক্ষয়কর যুদ্ধের আদ্যোপান্ত যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দানের পর জখমে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া যান। তাঁহার সঙ্গে যে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল, তাহাদের অধিকাংশ নিহত বা আহত হইলে তিনি নিজে প্রায় একক হইয়া পড়েন। তখন তিনি তাঁহার ঢাল তলোয়ার বাহির করিয়া বিস্ময়কর বীরত্বজনক কার্য সম্পাদনের পর নির্ভীকভাবে আজরাঈল প্রদত্ত কটু-ঔষধ পান করেন।

এই জয়লাভের ফলে জাহাঁদার শাহ্ সাম্রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মালিক দখলকার হইয়া সমস্ত প্রদেশে তাঁহার সিংহাসনোরোহণের সংবাদ পাঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাহোর হইতে শাহজাহানাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং মওরশী ভূ-পতির যাবতীয় আড়ম্বর ও বিজেতার সর্বপ্রকার গর্বের সহিত সেখানে প্রবেশ করিলেন। সেদিন ১১২৪ হিজরীর ১৪ই জমাদিউল আউয়াল, সোমবার; তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ন তিনটা। বেরিলীর পথে ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা ইয়ার খাঁ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন; বাদশাহ্ তাঁহার হাতীতে চড়িয়া গমন করার সময় তৎপতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি এতদূর আগাইয়া আসেন। চারিদিন পরে প্রায় মধ্যাহ্নে সূর্য মধ্য গগনে উপনীত হইলে বাদশাহ রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া শাহীমহল অধিকার করেন।

নূতন বাদশাহ তখন সিংহাসনে বসিয়া আসাদ খাঁকে উকীলে মুতলকের উচ্চপদে ও তাঁহার পুত্র যুলফিকার খাঁকে উজীরের চাকরীতে বহাল করিলেন। কিন্তু এখানে তিনি তাঁহার হস্ত-শোণিত লিপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। আজীমুশ্শানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান করীমুদ্দীন হেদায়েত কেশ খাঁর কৌশলে লাহোরে ধৃত হইয়া বাদশাহের সম্মুখে আনীত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইল। রাজ-বংশের অন্যান্য শাহ্জাদা আজম শাহ্ বা কামবখ্শের পুত্রগণ কেহই অধিকতর ভাল ব্যবহার পাইলেন না। এসকল হতভাগ্য যুবক তাঁহাদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না করিয়া নীরবে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলকে অবিলম্বে ধৃত করিয়া কঠোরভাবে কারারুদ্ধ করা হইল। এরূপ নিরীহ লোকদের দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হইয়া ইতিহাস তাঁহাদের নাম রক্ষা করিয়াছে। ইহারা হইতেছেন আজম শাহের পুত্র আলী তেবার এবং কামবখ্শের দুই পুত্র মুহীউস্সুন্নত ও ফিরোজ মন্দ; একজন তৃতীয় পুত্রও ছিল, কিন্তু তাঁহার নাম সঠিকরূপে জানা যায় না।

এই সমুদয় পূর্ব সতর্কতা সমাপ্ত হইলে বাদশাহ্ শুধু তাঁহার আত্মীয়বর্গকে উচ্চপদে ও সম্মানে উন্নীত এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণকে যথাসাধ্য পুরস্কৃত করার কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিয়ারী রক্ষিতা লালকুঁওর ইমতিয়াজ মহল বেগম (জানানা মহলের মহামান্যা মহিলা) উপাধিতে ভূষিতা হইয়া তাঁহার প্রভুর পাশে পাশে ছত্রাবৃত হস্তী চালনার অধিকার পাইলেন; একমাত্র বাদশাহ্ই এই সম্মান ভোগ করিতেন। তাঁহার দুধ-ভাইয়ের প্রতিও তিনি অনুরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহাকে আমীরুল ওমারার পদে উন্নীত করা হইল। ইহা ছিল সাম্রাজ্যের তৃতীয় সর্বোচ্চ পদ। এমনকি তিনি তৎপ্রতি এত অধিক আসক্ত হইলেন যে, প্রত্যহ তাঁহার ক্ষমতা ও বেতন কিছু না কিছু বাড়াইয়া দিতেন। সর্বোপরি লালকুঁওরের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব এখন সীমাহীন হইয়া দাঁড়াইল; তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই তাঁহার একমাত্র কাম্য বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার ভ্রাতা খোশাল খাঁ হপ্তহাজারী মনসবদার নিযুক্ত হইলেন; তদীয় খুল্লতাত নিয়ামত খাঁ পঞ্চহাজারী মনসব পাইলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি জনৈক বিখ্যাত আমীরকে আকবরাবাদের সুবাদারীতে বঞ্চিত করিতে চাইলেন; ইহা খোশাল খাঁকে প্রদান করাই ছিল তাঁহার মতলব।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐ লোকটির তরক্কী ও বাদশাহের পক্ষপাতিত্ব অপ্রত্যাশিত-রূপে বাধা প্রাপ্ত হইল। তিনি যে ফরমান দেখাইলেন, দফতর খরচ না পাইলে উজীর সীলমোহর দিয়া তাহা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিয়া বসি-লেন। নূতন সুবাদারের পূর্ববৃত্তির প্রতি পরিহাস স্বরূপ এই খরচা নির্ধা-রিত হইল ৫০০০ তানপুরা ও ৭০০০ ঢাক। এই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গোক্তিতে মর্মা-হত হইয়া খোশাল খাঁ তাহার ভগ্নির নিকট নিজ অসন্তোষ ব্যক্ত করিলেন। বাদশাহের মনের উপর লালকুওয়ারের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। তিনি আবার প্রধান সেনাপতি—বর্তমানে তাঁহার উজীরের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ঋণী ছিলেন। তিনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কোমলস্বরে খোশাল খাঁর বিষয়ে তাহার নিকট সুপারিশ করিলেন, তৎসঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, তিনি যে অদ্ভুত খরচা দাবী করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে তাহা উপহাসমাত্র। উজীর গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, "ইহা আদৌ পরিহাস নহে। এব্যাপারে আমি মোটেই রসিকতা করি নাই, হুজুর; বরং আমি স্থিরসংকল্প ছিলাম, কারণ আপনার গোলাম আমীরেরা পুরুষানুক্রমে সুবাদারী, রাজ্য শাসন প্রভৃতি অনুরূপকার্যে রাজ সেবার অধি-কারী; আর হুজুরের পূর্বপুরুষ বাদশাহদের রীতি ছিল নর্তকী ও গায়কদের দ্বারা কেবল চিত্তবিনোদন করা। শুধু বৃত্তি ও পারিতোষিক দ্বারা তাহাদের কৃতিত্বের পুরস্কার দেওয়াই ছিল প্রচলিত প্রথা। সুতরাং এখন যদি এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের মনে উচ্চপদ ও শাসন বিভাগীয় চাকুরীর স্পৃহা জাগে এবং তাহারা সেগুলি দখল করার ফন্দি আঁটে, তাহা হইলে হুজুরের আমীরদের পক্ষে নর্তকী ও গায়কদের সম্ভ পরিত্যক্ত বৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। কেননা, মোটের উপর নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ইহাদের ন্যায় তাহা-দেরও কোন না কোন পেশা থাকা অপরিহার্য। সুতরাং আমি তখন এই ভদ্রলোকের নিকট এত হাজার তানপুরা ও ঢাক চাহিয়াছিলাম, আপনার পদচ্যুত শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যেই সেগুলি দাবী করিয়াছিলাম। কেননা সে কোন লোকের ন্যায় তাঁহাদেরও জীবিকা অর্জনের অধিকার রহিয়াছে।" এই উত্তরে বাদশাহের আর বাক্স্ফূর্তি হইল না; তিনি একটি মাত্র কথাও না বলিয়া শির ঝুকাইয়া রহিলেন। নয়া সুবাদার তাঁহার পদোন্নতি হারাইলেন।

এতদসত্ত্বেও কাজকর্ম অনেকটা একই ধাতে চলিল; একটা দুর্ঘটনার ফলে ব্যাপক অসন্তোষ সম্পর্কে বাদশাহের কতকটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ না ঘটিলে ব্যাপার আরও অনেক দূর গড়াইত।

জোহরা নাম্নী একটী মেয়ে রাস্তায় রাস্তায় শাক-সব্জী ফেরী করিয়া বেড়াইত। লালকুওঁরী যখন সাধারণ নর্তকী ছিলেন তখন তাহার সহিত তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা জন্মায়। তিনি তাহাকে তাঁহার দোগানা অর্থাৎ ধর্ম-ভগিনী করেন। [দোগানা শব্দটি হিন্দুস্তানী]। এই মেয়েটি তাহার বান্ধবীর সিংহাসনের এত সন্নিকটে উন্নতির সুযোগ গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইল না। সে (বেগমের) অনুগ্রহ ও করুণালাভের মাধ্যম হইয়া দাঁড়াইল। এই কার্যের বদৌলতে তাহার পক্ষে সর্বোচ্চপদস্থ আমীরের সমান অনুচর লইয়া রাজপথে বাহির হওয়ার সামর্থ্য জন্মিল, সে একটা মহাড়ম্বরে সুসজ্জিতা হস্তীনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিত। যখনি সে তাহার পুরাতন বান্ধবী লালকুওরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত, তখন কিল্লার ভিতর দিয়া সরাসরি বেগম মহল পর্যন্ত গমন করিত; কেবল রাজ বংশীয়া বেগম ও শাহজাদীরাই এই সুবিধা ভোগ করিতেন। তাঁহার লোকেরা তাহাদের মনিবের অনুকরণে অত্যন্ত উদ্ধত ও অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখনই সে প্রসাদে যাইত, তখনি তাহারা রাস্তায় যে সকল বৃদ্ধারমণী ও অনুরূপ নিরীহ লোকদের সাক্ষাৎ পাইত তাহাদের প্রতি নানারূপ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিত। এই আচরণ সর্বসাধারণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার না করিয়া পারিল না; আমীর ও রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ লোকদেরই ইহাতে বিরক্তির সঞ্চার হইল বেশী। রাজধানীতে তখন একজন গুরুত্বপূর্ণ আমীর বাস করিতেন। তিনি ছিলেন এক ভূতপূর্ব সেনাপতি ও বড় আমীরজাদা; তিনি জগতে গাযীউদ্দীন খাঁ ফিরোজ জঙ্গ তেওয়ারী উপাধিতে পরিচিত। তাঁহার নাম ছিল চিনকিলাজ খাঁ। তিনি আওরঙ্গযীবের প্রধান সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার হাতে অজস্র লোকের পদোন্নতি ঘটে; তিনি সেই সূক্ষ্মদর্শী ভূপতির অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। তিনি যুলফিকার খাঁকেও হিসাবে ধরিতেন না বলিলেই চলে; তিনি কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারে যাইতেন না। সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিবেন না দেখিয়া এই সেনাপতি প্রভুর মৃত্যুর পর হইতে দরবারে যাওয়া বন্ধ করেন।

তিনি নিভৃত জীবন-যাপন করিতেন ও কদাচিৎ বাইরে যাইতেন, তাহাও শুধু ধার্মিকতা ও বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ একদা তিনি যখন রাস্তায় বাহির হন তখন তাঁহার অজস্র অনুচরের সহিত সেই মেয়েলোকটির লোকজনের সাক্ষাৎ হইল। তাহারাও ছিল সংখ্যায় সম্পূর্ণ সমান, কিন্তু অনেক বেশী দাম্ভিক। সময়ের হাবভাবের প্রতি খেয়াল রাখিয়া যাহাতে তাঁহার গমন বন্ধ না হয়, তজ্জন্য তিনি তাঁহার লোকজনকে রাস্তা খালী করিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু জোহরার লোকেরা এভাবে প্রাধান্য লাভ করায় উল্লসিত হইয়া সেনাপতির অনুচরদের প্রতি কয়েকটা ব্যঙ্গোক্তি করিল। ফলে তাহাদিগকে সংযত রাখিতে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইল। সমস্তই ভালভাবে চলিতেছে বলিয়া মনে হইল; এমন সময় জোহরা তাহার হস্তীনি লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল এসকল অনুচর কাহার এবং তাহাদের মনিবেরই বা কি নাম। উত্তর পাইয়া সে পর্দার বাহিরে মাথা গলাইয়া বলিল, "ওহে চিনকিলাজ খাঁ, তুমি নিশ্চিতই কোন অন্ধ পিতার সন্তান।" এই কথায় সেনাপতির মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। না-হক গায়ে পড়িয়া সর্বসমক্ষে তাঁহাকে এরূপ অপমানজনক কথা বলায় তিনি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার লোকজনের প্রতি একটু ইশারা করিলেন। তাহারা উহাকে সেই দুর্বিনীত রমণীর অনুচরদের শায়েস্তা করার আদেশ বলিয়া মনে করিল। সঙ্কেত পাইতে না পাইতেই সেই প্রধান সৈনিকের তাহার লোকজনের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়া পরিশেষে খোদ জোহরাকেই আক্রমণ করিয়া বসিল। তাহারা তাহাকে টানিয়া হাতী হইতে মৃত্তিকায় নামাইয়া আনিল এবং প্রচুর চড় ঘুষি ও লাথি মারিল। মুহূর্তে এই মারপিট শেষ হইয়া গেল। কিন্তু এই মুহূর্তটিতেই সেনাপতি নিজেকে কি ভীষণ বিপদে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন এবং কি ভীষণ সঙ্কটপূর্ণ জমানায়ই না তিনি বাস করিতেন, তাহা ভাবাইয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া তিনি ডাইন দিকে ফিরিলেন এবং সর্বপ্রথম যুলফিকার খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাঁহার এরূপ অপ্রত্যাশিত আগমনে উজীর তাঁহার বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কি জন্য তিনি তাঁহাকে এভাবে সম্মানিত করিয়াছেন এবং তাঁহার কি হুকুম, তাহা জানিতে

চাইলেন। সেনাপতি সম্পূর্ণ ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিলে উজীর তাহাকে কেবল যে সান্ত্বনা দিলেন এমন নহে, তিনি তাঁহার আচরণের তারিফ করিয়া তাঁহাকে হৃষ্টচিত্তে বিদায় দিলেন। তিনি প্রস্থান করিবামাত্র উজীর কলম লইয়া বাদশাহের নিকট এই ক্ষুদ্র মন্তব্যটুকু লিখিলেন, "হুজুরের বিশ্বস্ত গোলাম আমীরদের যে কোন একজনের ইজ্জত সকলেরই ইজ্জত; চিনকিলাজ খাঁর সহিত বিচার্য বিষয়ে এই বান্দা তাঁহার পক্ষভুক্ত।" মন্তব্য ঠিক সময়েই পৌঁছিল; ইতিমধ্যে জোহরা জানানা মহলের সীমানার মধ্যে উপস্থিত হয়, কিন্তু সিংহদার হইতে দূরে না গিয়া মাথায় ভস্ম মাখিয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। লালকুওর এই ব্যাপারে নিজেকে জড়িত মনে করিয়া কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ম বাদশাহ্‌কে উত্তেজিত করিতেছিলেন; তাঁহার মুখ হইতে কি বাহির হইতে যাইতেছিল আল্লাহ্‌ই জানেন, এমন সময় (উজীরের) চিরকুটখানা তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল; আপাতদৃষ্টিতে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহার ফলে কোন গর্হিত আদেশ দান বন্ধ হইয়া গেল।

এই কাণ্ড ঠিক এমন সময় ঘটিল, যখন লালকুওরের সুযোগ্য ভ্রাতা তাঁহার আকস্মিক উন্নতিতে নিজেকে সংযত রাখিতে না পারিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল এবং সর্বপ্রকার বাড়াবাড়ি করিতেছিল। এই ভুঁইফোড় লোকটা ঘটনাক্রমে জনৈক ভদ্রলোকের বিবাহিতা সুন্দরী পত্নীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার রূপের মোহে পাগল হইয়া গেল। অনুরোধ ও উপহারে কোন ফল না হওয়ায় লোকটা বাহুবলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইল। মহিলাটির স্বামী উজীরের প্রসাদের নিকটেই বাস করিতেন; তিনি চীৎকার করিতে করিতে যুলফিকার খাঁর নিকট ছুটিয়া গেলেন। এই উজির ছিলেন স্বভাবতঃই একজন ন্যায়বান ও তেজস্বী পুরুষ; এরূপ ভয়ঙ্কর কার্যের কথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এবম্বিধ ঘটনা শ্রবণে তাঁহার মনে উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়ায় তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং অপরাধী খোশাল খাঁকে জীবিত বা মৃত ধরিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। যেরূপ কঠোরতার সহিত আদেশ প্রদত্ত হয়, সেরূপ কঠোরভাবেই উহা প্রতিপাদিত হইল। প্রেরিত অনুচরেরা লোকটাকে টানিতে টানিতে উজীরের মহলে লইয়া আসিল। তিনি তাহাকে দেখিবামাত্র লাঠি মারিতে আদেশ দিলেন। এত জোরে প্রহার করা

হইল যে, তাহাকে মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া রাখা হইল। যুগপৎ তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রত্যেকেই সেই ভুঁইফোড় লোকটির জোর-জবরদস্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। কাজেই তিনি তাহাকে কয়েদ রাখার জন্য সেলীমগড় দুর্গে প্রেরণ করিলেন; তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াফ্ত করার জন্যও আদেশ প্রদত্ত হইল; তৎফলে সরকারী কোষাগার ফাঁপিয়া উঠিল। উজীরের এবম্বিধ দৃঢ়তা এবং ইহার দরুন মধ্যে মধ্যে যে উৎসাহ উদ্যমের পরিচয় মিলিত, তাহা বাদশাহ্‌কে অসন্তুষ্ট না করিয়া পারিল না। এই অসন্তোষের মাত্রা এত অধিক ছিল যে, তাঁহার ও তদীয় উজীরের মধ্যে ঐক্য ও আন্তরিকতায় একাধিকবার ফাটল ধরে। কিন্তু তিনি যে তাঁহার খোদ জীবন ও সিংহাসন উভয়ের জন্যই এই উজীরের যোগ্যতার নিকট ঋণী, তাহা স্মরণ থাকায় এবং তাঁহার নির্ভীক দৃঢ়তায় আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় বিশেষতঃ এসময় সাম্রাজের পূর্বদিকস্থ প্রদেশগুলির প্রতি তাঁহার মনোযোগ সম্পূর্ণ নিবদ্ধ হওয়ায় উজীরের আচরণ সহ্য করিয়া চলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

বাঙ্গালা সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা পূর্ববর্তী প্রদেশ। কেবল উহাই ছিল সম্পূর্ণরূপে আলিসা বা খাসমহল দফতরের পরিচালনাধীন। বাদশাহ্ সেখান হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব পাইতেন; তজ্জন্য ঐ প্রদেশের দেওয়ানী বা রাজস্বাধ্যক্ষ পদটি সাম্রাজ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত। বাস্তবিকপক্ষে জাফর খাঁ এই পদ ভোগ করিতেন। তিনি আওরঙ্গযীবের রাজত্বকালে নিযুক্ত হন, কিন্তু ইহা ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ শাহাজাদা আজীমুশ্-শানের শাসনাধীন। তিনি ছিলেন ঐ প্রদেশের সুবাদার ও সৈন্যদের প্রধান সেনাপতি। তাঁহাকে সাম্রাজের ঐ সর্ব পূর্বপ্রান্তের যে কোন রাজার সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এতদ্-ভিন্ন পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা, বিহার ও এলাহাবাদ প্রদেশের উপরও তাঁহার অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল। এরূপ ভারী শাসনের ভার লাঘব এবং যে দুইজন শরীফ ভ্রাতা তাঁহার মহোপকার সাধন করেন—তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করার জন্য তিনি বিহার বা আজীমাবাদের সুবাদারী হুসায়ন আলী খাঁর ও এলাহাবাদের শাসন কর্তৃত্ব তদীয় অগ্রজ আবদুল্লাহ্ খাঁর উপর অর্পণ করেন। জাফর খাঁ ছিলেন পূর্ব হইতেই বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দেওয়ান বা রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ।

বাদশাহ্ যুগপৎ ঐ প্রদেশে দুইটীর সামরিক শাসন ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন।

এখন একথা বলা দরকার যে, আওরঙ্গযীবের মৃত্যুর পর শাহ্জাদা তাঁহার পিতা বাহাদুর শাহের সাহায্যে যাইতে বাধ্য হন। তখন তিনি তাঁহার হেরেমের কতিপয় মহিলাসহ তৎপুত্র ফর্‌রুখ সিয়ারকে আকবরাবাদে রাখিয়া যান। ইহার গ্রাম্য নাম রাজমহল এবং ইহা গঙ্গার তীরে অবস্থিত একটা বিখ্যাত নগর। আওরঙ্গযীবের ভ্রাতা সুলতান সুজা এখানে একটা মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করেন। অনুরূপভাবে তিনি কয়েকজন নামজাদা লোকের নিকট তাঁহার ধন-সম্পদ এবং কিছু মালপত্রও রাখিয়া যান। ইহারা ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার অনুগত। এগুলির এমন কি তাঁহার পিতা বাহাদুর শাহের সমগ্র রাজত্বকালে তাঁহার পুত্র যুবক শাহ্জাদার জন্য লোক প্রেরণ করাও সংগত মনে করেন নাই। এসময় তিনি প্রভুত প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। নিয়তির বিধানে আমাদের বর্ণিত উপায়ে আজীমুশ্শানের প্রভাবও জীবন সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপার ঐ অবস্থায়ই থাকে। সেই হতভাগা শাহজাদা এইরূপ বিচিত্র দুর্ঘটনায় অনন্ত পথের যাত্রী হইলে মুয়াজ্জেদীন, বর্তমানে জাহাঁদার শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার একটা প্রথম কাজ হইল শাহজাদা ফর্‌রুখ সিয়ারকে বন্দী করিয়া দরবারে পাঠাইবার জন্য বাঙ্গলার সুবাদার জাফর খাঁর প্রতি আদেশ প্রেরণ। খাঁ নিজেকে শাহ্জাদার পিতার নিকট অত্যন্ত ঋণী বলিয়া মনে করিতেন। কাজেই এই আদেশ তাঁহাকে অত্যন্ত বিপদে ফেলিল। তিনি তাঁহার নিকট একজন বিশ্বাসী লোক প্রেরণ করিলেন; সে তাঁহাকে যথা সময়ে দেশ হইতে পলায়ন করিয়া নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিল। মতান্তরে শাহ্জাদা নিজেই জাফর খাঁর প্রাপ্ত নির্দেশের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া আর সে দেশে থাকা বিপজ্জনক মনে করেন। সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, শাহ্জাদা হুসায়ন আলী খাঁর কৃতজ্ঞতার উপর ভরসা করিয়া স্বীয় পরিবার, জানানা ও মালপত্রসহ রাজমহল ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত বিষন্নচিত্তে আজীমাবাদে উপস্থিত হন। তাঁহার ভাগ্য ছিল নিতান্ত নিশ্চিত।অ। নগরে প্রবেশ না করিয়া তিনি নদীর ধারের সন্নিকটে জাফর খাঁর বাগান বলিয়া অভিহিত একটা স্থানের নিকটে এক সরাইয়ে বাসা লইলেন।

সেখান হইতে তিনি শাসনকর্তা হুসায়ন আলী খাঁর নিকট বিনীতভাবে এক সংবাদ পাঠাইলেন; তাহাতে তিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা বিপন্ন, বন্ধুহীন ও হতাশ লোকের ন্যায় চিত্রিত করিলেন। হুসায়ন আলী খাঁ ছিলেন এক বিখ্যাত বংশের আমীর এবং যেমন অত্যন্ত সামরিক কৃতিত্বের অধিকারী, তেমনি তাঁহার চরিত্র ছিল হৃদয়ের মহত্ব ও বদান্যতার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু উজীর যুলফিকার খাঁ সহ সাম্রাজ্যের সমস্ত লোক ইতিপূর্বেই জাহাঁদার শাহের বশ্যতা স্বীকার করায় তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ফর্‌রুখ সিয়ারের পক্ষ সমর্থনের মত নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে না করিয়া প্রথম হইতেই শাহ্‌জাদার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে অস্বীকৃত হন। এমনকি তিনি উত্তর দিলেন, দরবার হইতে তাঁহার প্রতি যে আদেশ আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র আচরণের নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু শাহ্‌জাদার পিতার সম্মানের খাতিরে তিনি প্রাপ্ত হুকুম অনুযায়ী তাঁহাকে ধৃত করার চিন্তা করিতে অক্ষম। তথাপি তাঁহার পক্ষে সর্ব প্রযত্নে প্রদেশের বাহিরে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত; তাঁহার পলায়নের ফলে তিনি (সুবাদার) হিংস্রুক দরবারের অনিষ্ট চিন্তা এবং প্রায় ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানহীন বাদশাহের সন্দেহের হাত হইতে আত্মরক্ষার সুযোগ পাইতে পারেন।

ফর্‌রুখ সিয়ারের সিংহাসনারোহণের পর একখানা ইতিহাস প্রকাশিত হয়; তাহাতে এই সমুদয় ব্যাপার পৃথকরূপে বর্ণিত হইয়াছে; আমরা পরিশিষ্টে এই পুস্তক খানা ব্যবহার করিব। এই গ্রন্থকারের মতে আহমদ বেগ ওরফে গাযীউদ্দীন খাঁ কোসা (অর্থাৎ ছাগলিয়া দাড়ি) ছিলেন এই প্রদেশের একজন প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি আদ্যোপান্ত এই ব্যাপারে জড়িত ছিলেন এবং পলাতক শাহ্‌জাদাকে অন্ততঃ একটিবার দর্শনদানের জন্য সুবাদারকে সম্মত করান। শাহ্‌জাদা এত অপূর্বরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন যে, কোন রাজা কোন প্রজার বা কোন মনিব কোন ভৃত্যের প্রতি কখনও তদ্রূপ ব্যবহার করেন নাই। তিনি সর্বপ্রকার দীনতা হীনতা ও আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান হন এবং নিজের সাক্ষাতে তাঁহাকে বসিতে দেন। এরূপ ভূমিকার পর তিনি কিরূপ নির্বান্ধব, নৈরাশ্যব্যাঞ্জক ও বিপদাপন্ন অবস্থায় আছেন এবং পাছে দরবারে তাঁহার প্রতি তদীয় ভ্রাতা সুলতান করীমুদ্দীনের দশা ঘটে; তজ্জন্য তিনি

কিরূপ আতঙ্কিত, তাহা বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, কিঞ্চিৎ আশ্রয় ও সাহায্য না পাইলে তাঁহার নিরাপত্তা বা জীবনের কোন আশাই নাই। তিনি তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাদিগকে ইচ্ছা করিয়া পর্দার বাহিরে বসাইয়া রাখেন। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইতে না হইতেই তাঁহারা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। শাহ্‌জাদার কনিষ্ঠা কন্যা মালিকা জমানী পর্দারত কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া সুবাদারের কোলে বসিয়া প্রশংসনীয়রূপে তাহাকে শিখান বুলি আওড়াইয়া গেল। মধুর স্বরে ও চেহারায় মর্মস্পর্শী হাবভাবে সে একটা অসহায় পরিবারের প্রতি করুণা প্রদর্শন এবং তাঁহার পিতাকে সাহায্য ও অভয়দানের জন্য কাকুতি মিনতি করিল। এই সঙ্গে সে তাঁহার কিছু তারিফ করিয়া আরও যে কথাগুলি বলিল, ইতিবৃত্ত লেখক তাহা সংরক্ষণ করিয়াছেন। সে বলিল, আপনি সত্যই রাসূলুল্লাহ্‌র বংশধর এবং তাঁহার ওলীর প্রত্যক্ষ ওয়ারিস; তদুপরি শক্তি ও উচ্চ চরিত্রবলে অর্জন করা যায় এমন সমস্ত সুবিধাই আপনি ভোগ করিতেছেন। তথাপি ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, আপনার বর্তমান সমৃদ্ধির জন্য আপনি আলীমুশ্‌শানের অনুগ্রহ ও সাহায্যের নিকট ঋণী। সুতরাং আপনি যদি আমার পিতার সাহায্যে আসিতে এবং আপনার বিখ্যাত বংশ ও বীরত্ব সাহসের জন্য আপনার সুখ্যাতি হইতে যে সকল উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে—তাঁহার জন্য সেগুলি করিতে এই সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেন—তবেই আমার পিতামহ আপনার যত উপকার করিয়াছেন, আপনি তাহার কাবেল হইবেন। পক্ষান্তরে আপনি ইহার বিপরীত কিছু করিতে চাহিলে আমাদের ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা অবশ্যই সঙ্ঘটিত হইবে; কিন্তু জগৎ আপনার কথা কি বলিবে, তাহার কোন পরওয়া রাখেন কি?" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই যে সকল মহিলা বাহিরে আসিয়া তখনও পর্দার পিছনে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সকলেই তাহার ন্যায় অনুরূপ অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিলেন; তাঁহাদের দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুপাত এখন চীৎকার ও হা-হুতাশে পরিণত হইল। সুবাদার শাহ্‌জাদাকে কুর্ণিশ করিলে তিনি তাঁহাকে নিজের এক প্রস্থ পোশাক পরাইয়া বসিতে দিলেন। ঠিক এ মুহূর্তে তিনি তাঁহার আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার নিজের তরবারি সুবাদারের কোমরে বাঁধিয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। এবম্বিধ অপ্রত্যাশিত

দৃশ্যে হুসায়ন আলী খাঁ তাঁহার পূর্বের অসন্তোষ ও আশঙ্কা ভুলিয়া গেলেন। তিনি এখন প্রজার ন্যায় বিনীত ভাষায় নিবেদন করিলেন, "তাঁহার দীন-হীন ভৃত্য এযাবৎ যাহা কিছু করিয়াছেন, তাঁহার মনিব ও প্রভুর নিকট তাহা যতই অযোগ্য বিবেচিত হউক না কেন তিনি ভৃত্য হিসাবে কর্তব্যের খাতিরেই তাহা করিয়াছেন।" তিনি আরও আরজ করিলেন, নিজ মস্তক ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই এবং ইহা আমি আপনার খেদমতে উৎসর্গ করিলাম। এই তরবারি পরিধান করিয়া আমি আমার মস্তক ও জীবনের নিকট বিদায় লইলাম এবং আমার ধন-সম্পদসহ দুটিই আপনার সেবায় নিয়োজিত করিলাম। অতএব আমাকে আদেশ করুন যেন আমি তদনুযায়ী কার্য করিতে পারি। এখন সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধ পরিচালনার সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা দরকার ; আপনি এই মুহূর্তেই সিংহাসনে উপবেশন করুন এবং শত্রুকে স্বয়ং নিজের দিকে লক্ষ্য রাখার ফুরসত না দিয়া আসুন, ভাগ্য আমাদিগকে যে ভাবে পরিচালিত করে, আমরা তাহার অনুসরণ করি।

"ইহকালের ঘটনাবলীর পরিচালকের নিকট আমাদের জন্য কি অভিপ্রেত, আসুন, আমরা তাহা দেখি।"

ফর্রুখ সিয়ারের লিখিত কৌশল সম্পূর্ণ ফলবতী হওয়ায় হুসায়ন আলী খাঁ ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, শাহ্জাদার বশ্যতা স্বীকার ও তাঁহার জন্য নিজের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এরূপ ঘোষণা সর্বশ্রেণীর লোকের বিরাট জনতার সৃষ্টি করায় জ্যোতিষী, ভাগ্যগণনাকারী ও বিদ্বান ব্যক্তিরা শাহ্-জাদার কাছে ভিড়িবার পূর্ণ সুযোগ পাইলেন। নিজে নিতান্ত নিঃসন্দিগ্ধ ও অজ্ঞ বলিয়া তাঁহার অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে তিনি নিয়ত তাঁহাদের বিজ্ঞান আলোচনা করিতে থাকায় তাঁহারা অনুকূল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ও সময়োপযোগী ভরসা দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করার সুযোগ পাইলেন। এ বিষয়ে কয়েকজন ছিলেন অকপট। অন্যেরা চাহিলেন শুধু নিজেদের রসদের যোগাড় করিতে, প্রকৃতপক্ষে ফর্রুখ সিয়ার সিংহাসনে বসিয়া তাঁহাদিগকে বৃত্তি ও বেতন দানের ক্ষমতা লাভ করিলে তাঁহাদের কয়েকজন তাহাই করেন বলিয়া প্রমাণিত হয়।

শাহ্জাদা যখন ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণে ব্যস্ত, হুসায়ন আলী খাঁ তখন তাঁহার প্রতি-শ্রুতি রক্ষার জন্য প্রত্যেকটি ব্যবস্থা অবলম্বনে বিরত। এ উদ্দেশ্যে তিনি যাহা

যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানাইয়া ও তাঁহার মঞ্জুরী প্রার্থনা করিয়া তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এলাহাবাদের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ খাঁকে এক পত্র লিখিলেন। আবদুল্লহ্ খাঁ এই সংবাদে অবাক্ হইয়া তাঁহার হঠকারিতার কঠোর নিন্দা করিয়া এবং ইহাতে যে কি ভীষণ বিপদ নিহিত আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার ভ্রাতার পত্রের উত্তর দিলেন। এই সঙ্গে এরূপ কার্যের অযৌক্তিকতার প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, ভয়ঙ্কর রকমের যাবতীয় বিপদ ভিন্ন তাঁহাদের বণিতা, সন্তান সন্ততি, পরিবারবর্গ এবং জানানা মহলের ভাগ্য ও ইহার পরিণামের সহিত জড়িত ; তাঁহারা তখন শাহ্জাহানাবাদে থাকায় তাঁহাকে সিংহাসনে বঞ্চিত করার প্রয়াস দর্শনে ক্ষুব্ধ একজন প্রায়শঃ ন্যায়ান্যায় জ্ঞানহীন ভূপতির যাবতীয় ক্রোধের ফলভোগ না করিয়া পারিবেন না। এই ভংসনার প্রত্যুত্তরে হুসায়ন আলী লিখিলেন, "তাঁহার নিজের কথা বলিতে যগলে তিনি শাহ্জাদার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন এবং যাহাই ঘটুকনা কেন, আর ফিরিতে পারিবেন না। তবে তাঁহার বড় ভাই হিসাবে তিনি যদি বড় দল অর্থাৎ মুয়াজ্জেমীনের দলে থাকেন, তবে তিনি কখনও তাহাতে আপত্তি করিবেন না।" পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ্ খাঁ নিজেই তাঁহার ভ্রাতার অনুনয় ও দৃষ্টান্তে প্রভাবান্বিত হইয়া স্বীয় সঙ্কল্প পরিবর্তন করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লেখেন, "যাহা ঘটিয়াছে ; তাহা যখন রদ করা যাইবে না, তখন তাহার যথোচিত সদ্ব্যবহার করা উভয়েরই কর্তব্য, তিনি আরও লিখে, তুমি যখন এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন সত্বর আমার সহিত যোগদান কর, কেননা রাজধানীর সন্নিকটে বসিয়া বাদশাহী বাহিনীর ক্রোধের পাত্র হওয়ার সম্ভাবনা আমার পক্ষেই অধিক। আইস, আমরা একত্রে যোগদান করি এবং কেবল একই লক্ষ্য গ্রহণ করি।"

উক্ত গ্রন্থে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা এই, কিন্তু আর এক বিবরণ আছে, তাহা নিম্নলিখিত রূপ ঃ

সম্রাট বাহাদুর শাহ, আরজুদ্দৌলাহ্ নামক জনৈক উচ্চপদস্থ আমীরকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া ফরুখ্ সিয়ারকে দরবারে হাজির হইতে আদেশ দান করেন। কিন্তু দুই ভ্রাতা সুলতান করীমুদ্দীন ও শাহজাদা হুমায়ুনের পরিণামের অনুরূপ ভাগে আশঙ্কায় তিনি বাদশাহের নিকট গমন করিতে

ভরসা না পাইয়া বিলম্বের না না ছুতা উদ্ভাবন করিয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। আজীমাবাদে পৌঁছিয়া আর অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা না থাকায় তিনি তাঁহার পত্নীর আসন্ন প্রসবের অজুহাতে সেখানে তাঁহার অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন এবং এই মর্মে দরবারে পত্র লিখিলেন। তাঁহার সেখানে অবস্থানকালে কতিপয় জ্যোতিষী, গণক ও অন্যান্য সুচতুর ব্যক্তি নিছক নিজেদের জীবিকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁহার মনে অর অল্প সিংহাসনে আরোহণের ও তাহারা নিজের নিরাপত্তা-বিধানের খেয়াল ঢুকাইবার জন্য তাঁহার চিকিৎসক হেকিম রফীহ্‌কে সম্মত করাইলেন। এসকল লোকে যখন তাঁহার দুর্বলচিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, ঠিক সেই সময় মুহম্মদ রেজা নামক জনৈক কর্মচারী আজীমাবাদে হাজির হইলেন। রাহত খাঁ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত, বাহাদুর শাহের কোপে পড়িয়া যাহারা পলায়ন করে তিনিও তাহাদের অন্যতম, এক খানা জাল ফরমান দেখাইয়া তিনি আজীমাবাদের দক্ষিণস্থ একটা সুদৃঢ় দুর্গ দখলে আনিয়া নিজের হৃতভাগ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি বাস্তবিকই তাঁহার মতলব হাসিলের ব্যবস্থা করেন এবং দখল রাখার লাভের অর্থে প্রকৃতপক্ষে রসদপত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটা ভাণ্ডার সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। বাদশাহের জনৈক সেনানী যে শাসনকর্তার আলস্য ও অযোগ্যতার দরুন এখন একটা ভাল চাকরী যোগাড়ের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছে, এমনকি বাদশাহ্‌কে পত্রদ্বারা তাহা জানাইবার মত ধৃষ্ঠতা দেখাইতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। অনুরূপভাবে ঐ অঞ্চলের সরকারী সংবাদপত্র এবং সরকারী গুপ্তচরদের দ্বারাও এই সংবাদ সমর্থিত হয়। ইহা জানিতে পারিয়া ঐ জালিয়াৎকে শাস্তিদানের জন্য বাদশাহের নিকট হইতে ফর্‌রুখ সিয়ারের প্রতি আদেশ আসে; আজীমুশ্‌শানের এক বিশেষ পদদ্বারা ইহার সমর্থন করেন। কিন্তু দুর্গে প্রবেশ লাভ সহজসাধ্য ছিলনা বলিয়া শাহজাদা ব্যাপারটা তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের নিকট উল্লেখ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কিলাচিন বেগ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন বেশ বলবান ও দৃঢ়চিত্ত; জাতিতে তিনি কালমাক। কিন্তু তিনি শাহ্‌জাদার এত বিরাগভাজন হন যে, তাঁহার পক্ষে দরবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। জনৈক প্রবীণ সভাসদ মারফতে তিনি তাঁহাকে একটা গোপনীয় সংবাদ পাঠাইবার

ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ "আমার প্রস্তাব এই ঃ শাহ্জাদা প্রকাশ করিবেন যে তিনি ঐ জালিয়াৎকে স্বপদে বহাল করার আদেশ পাইয়াছেন এবং আমিই তাঁহার নিকট অভিষেক পরিচ্ছদ লইয়া যাইব। শাহ্জাদা আমাকে পুনরায় তাঁহার অনুগ্রহ-ভাজন করুন এবং এইকার্যে আমার যোগ্যতা ও তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষা করুন। আমি আশা করি, আমার যোগ্যতা বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তবে এই চেষ্টায় আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিতে পারে ; যদি ইপ্সিত কার্যসিদ্ধির পর আমার মৃত্যু ঘটে, তবে আশা-করি সেক্ষেত্রে আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি আমরণ ভরণ-পোষণ লাভের হকদার হইবে।"

তাঁহার এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলে সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের প্রাপ্ত আদেশের মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিলেন এবং শাহ্জাদা কালমাককে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হস্তে খেলাত, পতাকা ও নিয়োগপত্র অর্জণ করিয়া তাঁহাকে সম্মান ও সুখ্যাতির সহিত বিদায় দিলেন। এইরূপে প্রস্তুত হইয়া ঐ ব্যক্তি রোটাস দুর্গ যে পর্বতের উপর অবস্থিত তাহার পাদদেশে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ জালিয়াৎকে তাঁহার প্রতি অর্পিত কার্যের সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি সর্বক্ষণ সতর্ক থাকিতেন ; অত্যন্ত সন্দেহ-পরায়ণ বিধায় তিনি সমস্ত অনুচরকে দুর্গে প্রবেশের অনুমতি দানে সম্মত না হইয়া কেবল দুত এবং আরও দুই ব্যক্তির প্রবেশপত্র প্রেরণ করিলেন। কালমাক একজনমাত্র লোক সঙ্গে লইয়া গিয়া কিলাদারের হস্তে পতাকা অর্পণ করিলেন। তিনি যখন নিবিষ্ট মনে ফরমান পাঠ করিতেছিলেন, তখন কালমাক তাঁহাকে ছোড়া মারিলেন। পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে কিলাদার পঞ্চত্ব লাভ করিলেন, তাঁহার সঙ্গীসহ কালমাক নিজেও এই সংঘর্ষে আহত হইলেন। এই দৃশ্য দর্শনে রক্ষী সৈন্যদলের কর্মচারীরা জালিয়াতের অনুচরদের উপর আপতিত হইলেন, তাহাদের কিছু নিহত, কিছু আহত ও অবশিষ্ট বন্দী হইল। মৃতের মস্তক কালমাকের হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহার' তাহাকে ফররুক সিয়ারের নিকট ফেরৎ পাঠাইলেন। তিনি তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার দানে আপ্যায়িত করিলেন। যখন এই ঘটনা সংঘটিত হয়, ঠিক সেই সময় বাহাদুর শাহের মৃত্যু সংবাদ আসিল। হুসায়ন আলী খাঁ তখন তাঁহার সুবার

কয়েকটা দূরবর্তী শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য একটা অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ফর্রুক সিয়ার এই অনিশ্চিত সময়ের সুযোগ গ্রহণ করিলেন। মৃত বাদশাহের সন্তানদের কাহারও সিংহাসনারোহণের সংবাদ আসিবার পূর্বে তিনি মসজিদসমূহে তাঁহার পিতা আজীমুশ্শানের নামে খুৎবা পাঠের আদেশ জারি করিলেন এবং তিনি সিংহাসনে বসিয়া দখল লইয়াছেন একথা ঘোষণা করিয়া তাঁহার রাজত্বের সমৃদ্ধি কামনা করিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার কার্যের গুরুতর প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এবং তাঁহার হঠকারিতার পরিণাম সম্পর্কে আতঙ্কিত হইয়া তিনি প্রদেশের শাসনকর্তা হুসায়ন আলী খাঁর নিকট অতীত ব্যাপারের কৈফিয়ৎ দিয়া এবং তৎপ্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার ভাব থাকায় যুগপৎ তাঁহার উপস্থিতি কামনা করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন। কয়েকদিন পরে শাসনকর্তা আজীমাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু ফর্রুক সিয়ারের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপনে তাঁহাকে ইচ্ছুক বলিয়া বোধ হইল না। তজ্জন্য শাহ্জাদার মাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহাকে সাম্রাজ্যের যাবতীয় কার্য নির্বাহের ক্ষমতা দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সঙ্গে একখানা কুরআন শরীফ আনয়ন করেন; উহাকে সাক্ষী করিয়া তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ও রাসূলের নামে প্রকাশ করিলেন যে, ব্যাপারের এবম্বিধ পরিণতির জন্য তাঁহাকে কখনও অনুতাপ করিতে হইবে না। এই সাক্ষাৎকারের ফলে শাসনকর্তার আশঙ্কা দূর হইল। ইহা তাঁহার হৃদয় মন সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফেলিল। এমন সময় আজীমুশ্শানের মৃত্যু ও জাহাঁদার শাহের সিংহাসনারোহণের সংবাদ আসিল; কিন্তু ইতিমধ্যে শাসনকর্তা, ফর্রুকসিয়ারের সহিত নিজেকে এত অধিক জড়াইয়া ফেলেন যে, নিরাপত্তার সহিত সরিয়া পড়া আদৌ সম্ভবপর ছিল না। তজ্জন্য সাহসের সহিত আগাইয়া যাওয়াই তাঁহার নিকট শ্রেয়তর মনে হইল। কাজেই তিনি মসজিদসমূহে ফর্রুক সিয়ারের নামে খুৎবা পাঠের আদেশ দিয়া তাঁহার নামে মুদ্রা বাহির করিলেন। এইরূপে জাহাঁদার শাহের সহিত কলহ ও প্রকাশ্য যুদ্ধের পতাকা পুরাপুরি প্রদর্শিত হইল; প্রতিদানে ফর্রুক সিয়ারও প্রত্যহ তাঁহার সহিত

মিলন দৃঢ়তর করিতে ও নিত্য তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইলেন।

শাসনকর্তা এখন দৃঢ় সঙ্কল্প হওয়ায় নগরের মহাজন ও প্রধান ব্যক্তিবর্গকে একত্র করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অবস্থানুযায়ী বিপুল অর্থ ধার করিলেন; এই টাকা তাঁহার শত্রুদিগকে বশীভূত করার পর পরিশোধের কথা হইল এবং এজন্য তিনি তাঁহাদিগকে শাহ্জাদার দস্তখতী তমসুক প্রদান করিলেন। এই টাকায় অচিরে একটা উৎকৃষ্ট সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া এক শুভদিনে তিনি শাহ্জাদাকে তাঁহার সৈন্যদের পুরোভাগে বসাইয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় সায়্যিদ খয়রাত খাঁ প্রদেশে তাঁহার সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। এই সময় একদল প্রহরী বাঙ্গালার রাজস্ব লইয়া এলাহাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে শুনিতে পাইয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ খাঁকে এই চমৎকার লুণ্ঠিত দ্রব্য বলপূর্বক কাড়িয়া রাখার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। নিজের কাজে ইহার কিয়দংশের প্রয়োজন না হইলে সম্পূর্ণ অর্থই শাহ্জাদার ব্যবহারার্থ সংরক্ষিত রাখিতে বলা হইল। বাঙ্গালার সুবাদার জাফর খাঁর জামাতা সুজা খাঁ ছিলেন এই প্রহরীদলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। আবদুল্লাহ খাঁ এ সম্বন্ধে শাহজাদার আদেশ পাইবা মাত্র উহা আটক করিয়া একাংশ তাঁহার সৈন্যদের ব্যবহারার্থে খরচ করিলেন। বাদ বাকী তাঁহার ভ্রাতার প্রয়োজনের জন্য রাখিয়া দিলেন। দুর্গ ও প্রদেশের কামানরাজি পরীক্ষা করার পর সঙ্গে লওয়ার জন্য উহাদের কড়িকাঠে আলকাতরা মাখান হইল। তিনি যখন জোরে-শোরে রণসজ্জা করিতেছিলেন, তখন জাহাঁদার শাহ তাঁহার বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সুবাদার রাজী মুহম্মদ খাঁকে প্রদান করিলেন; তাঁহার সহকারী সায়্যিদ আবদুল গাফফার খাঁ ছিলেন একজন চরিত্রবান লোক। তিনি আবদুল্লাহ খাঁকে বিতাড়িত করার আদেশ পাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ১২০০০ অশ্বারোহী ও কিছু কামান সরবরাহ করা হইল। আবদুল্লাহ খাঁ এতদিন ধরিয়া শাহ্জাদাসহ তাঁহার ভ্রাতার আগমনের প্রত্যাশায় ছিলেন। তাঁহারা না আসায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনী বাদশাহী সৈন্যদের সমকক্ষ নহে মনে করিয়া তিনি তাঁহার লোকজনের অর্ধেক বাদশাহের সৈন্যদিগকে উত্যক্ত

করিতে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং দুর্গমধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই সকল সৈন্য, অশ্বারোহী ও পদাতিকে মিলিয়া মোট ৭০০০ হইত কিনা, সন্দেহ। তাঁহার তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়্যিদ নূরুদ্দীন আলী খাঁ, নজমুদ্দীন আলী খাঁ ও সয়ফুদ্দীন আলীর উপর তাঁহাদের পরিচালনা ভার ন্যস্ত হয়। তাঁহার নিজের প্রধান সেনাপতি ও বেতনদাতা বখশী আবদুল মুহ্সিন খাঁকেও তিনি তাঁহাদের দায়িত্বের শরীক করেন। বখশী ছিলেন একজন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরে তাঁহার জন্ম। কিন্তু মূলতঃ তিনি নজফ আশরাফের বাশিন্দা। সায়্যিদ গাফ্ফার নিজের সম্বন্ধে যেমন উচ্চ, ঐ যুবকত্রয় সম্পর্কে তেমনি তুচ্ছ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগ ঘুরিয়া দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে উহা অবরোধ করিলেন; তৎপূর্বে তিনি শাসনকর্তাকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, শিশুদের সহিত খেলা করার ইচ্ছা না থাকায় তিনি তাঁহার ভাগিনেয়দিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। এই উপহাসের কথা যথাযথভাবে ঐ যুবকের নিকট ধ্বণিত হইলে তাহা তাঁহাদিগকে ঐ সেনাপতির উচ্চ অভিমত আদায়ে প্ররোচিত করিল। তিনি যখন পূর্ণ গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা তখন তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে আপতিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সৈন্যেরা সকলেই নূতন সংগৃহীত, সংখ্যাও অনেক কম; সুতরাং প্রথম আক্রমণেই তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল এবং প্রতিমুহূর্তেই পিছু হাটিতে লাগিল। ইহা বুঝিতে পারিয়া মাত্রই পরাজয়ের পরে জীবিত না থাকিতে বদ্ধপরিকর হইয়া যাহারা তখনও অটল ছিল, তাহাদের কয়েকজনকে তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সংযুক্ত বীরের একদল সায়্যিদের সহিত একত্রিত করিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও নৈরাশ্য বিস্তার করিয়া অরণ্যের অজস্র ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় শত্রুদের উপর আপতিত হইয়া ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার মত বীরত্বজনক কার্য সম্পাদন করিলেন। ভাগ্য এই যুবক বীরদের পক্ষ অবলম্বন করিবেই বলিয়া মনে হইল। সেই ঋতুতে ভীষণ ঝড় উঠা সাধারণ ব্যাপার; ঠিক এই মুহূর্তে এরূপ একটা ঝড় উঠিয়া শত্রুদের সরাসরি মুখমণ্ডলে এত ধূলাবালি উড়াইয়া লইয়া গেল যে, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হৃত হইয়া গেল। বীর যুবকেরা ইহা টের পাইয়া তাঁহাদের চেষ্টা

দ্বিগুণতর করিলেন ; আবদুল গাফ্ফারের ভ্রাতাকে নিহত করিয়া তাঁহারা প্রচণ্ড বিক্রমে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে শত্রু সেনাদলে এক জনরব উঠিল যে, তাহাদের সেনাপতি নিহত হইয়াছেন। ইহার ফলে এত নিরুৎসাহজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে, এমন কি যাহারা বীরত্বের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অটল ছিল, তাহারাও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। সেই মুহূর্ত হইতে বিশৃঙ্খলা ও পলায়ন ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইল এবং গর্বিত বাদশাহী সেনাপতি লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করিলেন। ইহার কারণ জাহাঁদার শাহের ভাগ্য তখন পতনের দিকে। এই জয়লাভের ফলে ফর্রুখ সিয়ারের দলের তেজ উদ্দীপিত না হইয়া পারিল না। কিন্তু আবদুল্লাহ্ খাঁর উপর ইহার ক্রিয়া হইল সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নূরুদ্দীন আলী খাঁ ছিলেন একজন সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময় যুবক। তিনি এই যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁহার প্রথম অভিযানেই তিনি শাহাদতের সুরা পান করিয়া তাঁহার সাহসী ও ধার্মিক পূর্ব-পুরুষদের ধারায় যোগদান করিতে গমন করেন। যুদ্ধ সঙ্গীত গাহিবার আদেশ দানে বাধ্য হইলেও এইরূপ একজন বীর পুরুষের মৃত্যুতে কিরূপে তাঁহার শোক ও অশ্রু গোপন রাখিবেন—আবদুল্লাহ্ খাঁ তাহা ভাবিয়া দিশা পাইলেন না ; তিনি এই রূপে তাঁহার প্রশংসা উচ্চারণ করিলেন ঃ

"তাহার হস্তে খুশীর পেয়ালা, কিন্তু তাহার স্কন্ধে নিজ ভ্রাতার শব।"

এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সংগ্রামের পরিণতি সম্পর্কে বাদশাহের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি চাতুরী দ্বারা কতদূর কি করা যায়, তাহার চেষ্টা করা সঙ্গত মনে করিয়া এ উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ্ খাঁকে খেলাত পাঠাইলেন এবং তাঁহার কৃতকার্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার সুবাদারি বহাল করিলেন। কিন্তু এক বিরাট বাহিনীসহ ফর্রুখ সিয়ার ইতিপূর্বেই এলাহাবাদে উপস্থিত হওয়ায় ইহাতে কোনই ফল ফলিল না। এই সৈন্য দলে সফ শিফেন খাঁ, আহমদ খাঁ কোকা, ময়জুদ্দীন কোকা ওরফে গাজী-উদ্দীন খাঁ, হালে গুলাব জঙ্গ ও খোজা হাসান, তখন খান দুরান প্রভৃতি কয়েকজন চরিত্রবান্ সেনানায়ক ছিলেন। সাহিদ্ ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন ঐ সকল জন সমবায়ের প্রাণ। অভিযান ইতিপূর্বেই এত আশাপ্রদ প্রমাণিত হওয়ায়

তাঁহারা শুভক্ষণ দেখিয়া এবং তাঁহাদের ধার্মিক ও সাহসী পূর্ব-পুরুষদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া নূতন অভিযানে বহির্গত হইলেন। অচিরে এই সংবাদ বাদশাহের নিকট নীত হইল। তিনি ফররুখ সিয়ারকে পথিমধ্যে বাধাদানের জন্য তাঁহার পুত্র আয়জুদ্দীনকে এক শক্তিশালী বাহিনীসহ প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কিশোর শাহ্জাদা নিজেই ছিলেন কোকাতাশ খাঁর ভ্রাতা খাজা আরাকেন খাঁর রক্ষণাধীন। এই আমীর পঞ্চহাজারী মনসবদার ছিলেন; তাঁহাকে এখন বাস্তবিকই ৭০০০ অশ্বারোহীর পরিচালনাভারসহ হপ্তহাজারী মনসবদারে উন্নীত করা হইল। অভিযানের সম্পূর্ণ পরিচালনভার ও শাহ্জাদার দেহের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইল। তাঁহার প্রস্থানের পর বাদশাহ্ তদীয় সৈন্যদল দ্বারা এই বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির আদেশ দিয়া চিনকিলাজ খাঁকেও যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। অনেক মঞ্জিল অতিক্রমের পর শাহ্জাদা গঙ্গা নদীর তটস্থ কেদওয়া নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, দুই ভ্রাতা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করার জন্য পূর্ণবেগে ছুটিয়া আসিতেছেন। এই সংবাদে তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল। তাঁহাদের দুইজনের চেয়েও তাঁহার অশ্বারোহীর সংখ্যাই ছিল অর্ধলক্ষাধিক বেশী। তাঁহার সৈন্য ও কামানের সংখ্যা ও অনেক অধিক হইলেও তিনি নিজেকে শত্রুর সমকক্ষ মনে না করিয়া গড়বন্দি করিয়া থাকাই শ্রেয়তর মনে করিলেন। শত্রুরা অবিরাম গতিতে তাঁহার নিকটবর্তী হইতেছে শ্রবণ করিয়া তাঁহার এই বিপুল আকুলতা আরও অধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই সংবাদে তিনি ও তাঁহার সেনাপতি উভয়েই আতঙ্কগ্রস্ত ও কাপুরুষতার সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন। আবদুল্লাহ্ খাঁ যখন আরও নিকটে আসিয়া সারা দিন তাঁহার শিবিরে গোলা বর্ষণ করিলেন, তখন তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার সেনাপতিও তাঁহারই ন্যায় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহারা যতখানি বহিতে পারিলেন, ততখানি মণিমুক্তা লইয়া শিবিরের পশ্চাদ্দিক দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং রাত্রির প্রথম ভাগে তাঁহাদের শিবির, সৈন্যদল, কামান, বন্দুক, মালপত্র, মণিমুক্তা ও সামরিক সরঞ্জাম শত্রুপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া উভয়ে একযোগে পলায়ন করিলেন। শত্রুরা তখন এ বিষয়ে ঘূর্ণাক্ষরেও জানিতে

পারিল না; কিন্তু সৈন্যেরা অচিরে সংবাদ পাইল যে, শাহ্‌জাদা বা প্রবীন সেনাপতি কেহই (শিবিরে) নাই। এরূপ নজীরবিহীন ব্যাপারে কোন পক্ষ গ্রহণও সম্ভবপর ছিলনা। শিবিরের কর্মচারী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে মতৈক্য না থাকায় তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারিয়া সারাদিন বাক্‌বিতণ্ডায় কাটাইয়া দিলেন। সন্ধ্যাবেলায় শত্রুরা এই অবস্থার খবর পাইয়া বিশৃঙ্খলভাবে বাদশাহী শিবিরে ছুটিয়া গিয়া নিতান্ত ধীরে ধীরে তাহা লুণ্ঠন করিল। এত অধিক লুণ্ঠিত দ্রব্য তাহাদের হস্তগত হইল যে, যে বিপুল সংখক লোকের কখনও নিশ্চিত জীবিকা ছিলনা, এখন তাহাদের বাকী জীবনের সংস্থান হইয়া গেল। এই লুণ্ঠন সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট রহিল। কামান বন্দুকসহ তাহা ফর্‌রুখ সিয়ারের ব্যবহারার্থ দখল করা হইল। এই শাহ্‌জাদা তাঁহার সৈন্যদলকে কিংঞ্চিৎ বিশ্রাম দানের জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা করিলেন। এদিকে আয়জুদ্দীন আকবরাবাদের দিকে পলায়ন কালে অকস্মাৎ চিনকিলাজ খাঁর পরিচালিত সৈন্যদলের সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি খামখেয়ালী-ভাবে আরও দূরে যাইতে চাহিলেন; কিন্তু এই সেনাপতি তাঁহার এরূপ গর্হিত আচরণে স্তম্ভিত হইয়া জোর-জবরদস্তিক্রমে তাঁহার গতিরোধ করিলেন এবং বাদশাহের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে তাঁহার শিবিরে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিলেন।

এরূপ নির্লজ্জ পরাজয়ে ঐ শাহজাদার সমস্ত আশা ভরসা প্রায় সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গেল। এখন আর কাহারও উপর আস্থা না থাকায় তিনি তাঁহার এত সকলকাম প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নিজেই যুদ্ধযাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। ১১২৪ হিজরীর ১২ই জিলকদ মঙ্গলবার তিনি অজস্র পদাতিক ও দুনিয়ার ভিত্তি কম্পিত করার উপযোগী এক সারি বৃহৎ কামান ছাড়াও ৭০০০০ অশ্বারোহীসহ মহাড়ম্বরে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। যুলফিকার খাঁ ছিলেন এই পরাক্রান্ত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তাঁহার অধীনে ছিলেন কতিপয় চরিত্রবান সেনানায়ক ও কর্মচারীসহ বিখ্যাত কোকালতাশ খাঁ। ইহাদের সকলেই ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়, আপন আপন বীরত্ব-পূর্ণ কার্যের জন্য প্রসিদ্ধ এবং অরণ্যে গর্জনকারী অজস্র ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় রণ পিপাসু। আজম খাঁ, আলী খাঁ, মুহম্মদ আমীন খাঁ এবং বহু সংখ্যক তুরানী ও ইরাণী

আমীর ছিলেন এমনি লোক। পথিমধ্যে কোরার শাসনকর্তা শের বুলন্দ খাঁ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তিনি তাঁহার মনিব ফর্‌রুখ সিয়ারের জন্য যে টাকা আদায় করিতেছিলেন, তাহা দখল করিয়া জাহাঁদার শাহের নিকট পলায়ন করেন। এই সামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি বাদশাহের এতই প্রিয়পাত্র হন যে, বাদশাহ তাঁহাকে গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া উহার রাজধানী আহমদাবাদে প্রেরণ করেন। পক্ষান্তরে কোরার নূতন ফওজদার চেবিল রাম ও কারতালাব খাঁর পুত্র আতাবার ফওজদার আলী আকবর খাঁ ফর্‌রুখ সিয়ারের দলে যোগদান করেন।

ইতিমধ্যে বাদশাহ আকবরাবাদের নিকটস্থ সমুগড় শহরে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি বিপক্ষের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; কেবল যমুনা নদী তাঁহার নিকট হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শত্রুদের দেখিয়া সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের মনে ও ফর্‌রুখ সিয়ারের শিবিরে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেলেও ইহাতে বাদশাহী শিবিরে অনেকটা ত্রাসের সঞ্চার হইল। ইহার কারণ সুস্পষ্ট; শত্রু শিবিরে মতৈক্য বিরাজিত ছিল। পক্ষান্তরে জাহাঁদার শাহের নির্লজ্জ ব্যবহারে তাঁহার দরবারের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ লোকের মনই বিগড়াইয়া গিয়াছিল। বিশেষ ভাবে ইরানীরা পত্রযোগেও সংবাদ পাঠাইয়া ফর্‌রুখ সিয়ারের সহিত যোগদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়; কেবল আবদুস্‌ সামাদ খাঁই এরূপ অঙ্গীকারে বিরত থাকেন। এতদসত্ত্বেও বাহ্য দৃষ্টিতে বাদশাহের পক্ষে সৈন্যদলের এত শ্রেষ্ঠত্ব ছিল যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তদ্বিরুদ্ধে কোন সুবিধালাভ করিতে পারিবে না বলিয়াই সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার প্রধান সেনাপতি যুল্‌ফিকার খাঁ ও কোকলতাশ খাঁর মেজাজে ও মতে বেজায় গরমিল ছিল; ইহার দরুন এত অধিক শত্রুতা বদ্ধমূল এবং ঘৃণার সঞ্চার হয় যে, বাদশাহের শিবিরে কোন ব্যাপারেই কোন অগ্রগতি সাধিত হইতেছিল না। বিশেষভাবে তাঁহার আস্থাভাজন কোকলতাশ খাঁ ছিলেন সদুপদেশ দান বা গ্রহণের তুল্য অযোগ্য। এত অধিক শত্রুতার দরুন কেহই কোন ব্যাপারে কোন সংশ্রব রাখিল না। ফলে সমস্তই নষ্ট হইতে বসিল। তদুপরি শত্রুপক্ষকে আক্রমণের জন্য যমুনা অতিক্রমের কোন সুনির্দিষ্ট আদেশ প্রদত্ত

হইল না। দুইজন প্রিয়পাত্র সব ব্যাপারে মতানৈক্য ভিন্ন আর কিছুতেই একমত হইতে না পারায় এবং বিপরীত উপদেশ দেওয়ায় অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, বাস্তবক্ষেত্রে বাদশাহ্ নিজেও নিজের জন্য কোন এক পক্ষ অবলম্বনে সমর্থ হইলেন না। লালকুওরের প্রেমে উন্মত্ত বাদশাহ্ হালে এক প্রকারের বিকার-গ্রস্ত—বিষাদে আচ্ছন্ন হন; ফলে তিনি কাজ-কারবারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়েন।

শত্রুপক্ষের অনেক হিতৈষী থাকায় তাহাদের নিকট এ অবস্থা গোপন থাকা সম্ভবপর ছিল না। শত্রু শিবিরের চার ক্রোশ উত্তরে একস্থানে পায়ে হাঁটিয়া নদী অতিক্রম করা যাইতে পারিত; প্রকৃতপক্ষে এই সংবাদ পাইয়া আবদুল্লাহ্ খাঁ রাত্রিকালে অপর তীরে গমন করিলেন এবং কোথাও যাত্রা বন্ধ না করিয়া কোজবিহারী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই গ্রামটি আকবরাবাদ হইতে দূরে দিল্লী গমনের রাজ-পথের উপর অবস্থিত। তিনি সেখানে তাঁহার ঘাঁটী স্থাপন করিলেন। কিছুকাল পরে ফররুখ সিয়ার স্বয়ং তাঁহার অনুসরণ করিলেন, তিনিও একইরূপে নদী অতিক্রম করিয়া তাঁহার সেনাপতির সহিত মিলিত হইলেন। শত্রুকে প্রতারিত ও তাঁহার যাবতীয় পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য হুসায়ন আলী খাঁ শত্রু শিবিরের বিপরীত দিকে যেখানে ছিলেন, সেখানেই রহিলেন। রাত্রির অন্ধকারে যখন তাঁহার গতিবিধি গোপন রাখা চলিত, কেবল তখনি তিনি নদী অতিক্রম করিলেন। চেবিলরাম নামক জনৈক হিন্দু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে এভাবে অন্ধকারে নদী অতিক্রম সমগ্র যুদ্ধের মোড় ফিরাইয়া দেয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বিধাতার অঙ্গুলীর ছাপও পরিলক্ষিত হয়। কারণ, প্রত্যূষে ফররুখ সিয়ারের সৈন্যদল যখন শত্রুপক্ষের পশ্চাতে হাজির হইল, তখন তাহাদের শিবিরে যুদ্ধের সমস্ত ব্যবস্থা পাল্টাইতে, নূতনভাবে সৈন্য সাজাইতে ও সম্মুখ হইতে কামান সাজাইতে হইল। সমস্ত বিশৃঙ্খলা না কাটাইয়া এ সমুদয় কার্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর হইল না। ইহা ঘটিল ঐ বৎসরের ১৪ই জিলহজ। দুইটি বাহিনী একটি শৃঙ্খলার সহিত আর একটি অর্থাৎ বাদশাহের সেনাদল অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও হতোদ্যম মনোভাবাপন্ন অবস্থায় পরস্পরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। একদল পরীক্ষিত অনুচর ও কয়েকদল উৎকৃষ্ট সৈন্য পরিবৃত হইয়া এই শাহজাদা

কেন্দ্রে স্থান গ্রহণ করিলেন। তাহাদের সম্মুখে এক সারি বৃহৎ কামান স্থাপিত হইল। যুদ্ধ ও রাজনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে তিনি যুলফিকার খাঁ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবেন বলিয়া বোধ হইলেও বাদশাহ্ তাঁহার দৃঢ়তায় অসন্তুষ্ট হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার আস্থাভাজন রহিলেন না। তিনি একদল পুরাতন সৈন্য, কিছু কামান বন্দুক এবং বাদশাহী রণ-ভেরী শানাই ও দামামার সঙ্গীতসহ শাহ্জাদার সম্মুখে স্থান গ্রহণ করিতে আসিলেন। কোকলতাশ খাঁ, আলী খাঁ, আজম খাঁ ও তাঁহার দলের অন্যান্য আমীরসহ দক্ষিণ পার্শ্বে এবং মুহম্মদ আমীন খাঁ, আবদুল সামাদ খাঁ ও চিনকিলাজ খাঁ প্রভৃতি তুরানী আমীরেরা বামপার্শ্বে স্থান লইলেন। হাফিজুল্লাহ্ খাঁ ও অপর কয়েকজন সেনাপতিসহ কাবী মুহম্মদ খাঁ নিজ নিজ দলবল লইয়া লঘুভাব সৈন্য হিসাবে স্থাপিত হইলেন। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ রেযা কুলি খাঁ অভিনিবেশ সহকারে স্বীয় কর্তব্য পালনের আদেশ পাইলেন। অবশিষ্ট সৈন্য ময়দানের অবস্থানুযায়ী স্থাপিত হইল।

বিরোধীদলে ফর্‌রুখ সিয়ার বাদশাহী রীতি অনুযায়ী একটা উচু হাতীতে চড়িয়া কেন্দ্রে স্থান গ্রহণ করিলেন। অপর অনেক সেনানায়কসহ আবদুল্লাহ খাঁ তাঁহার সম্মুখে যুলফিকার খাঁর মুখোমুখী স্থান লইলেন। খান জমান ও আলী আসগর খাঁ চেবিলরামসহ কোকলতাশের বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। আবদুল্লাহ খাঁই যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সুশৃঙ্খলভাবে নিজ সৈন্যদের লইয়া তিনি প্রথমে শত্রুপক্ষের তুরানী আমীরদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তৎপরে তাঁহার গতিবিধিতে দৃশ্যতঃ অনিশ্চয়তা দেখাইয়া বাদশাহের গোলন্দাজদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া শত্রুপক্ষের কেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হওয়ার ব্যবস্থা করিলেন; জাহাঁদার শাহ সেখানেই হাজির ছিলেন। পক্ষান্তরে ফর্‌রুখ সিয়ারের গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি ফতেহ্ আলী খাঁ বাহাদুর খাঁ রোহিলার পুত্র জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁ এবং দুই জন বিখ্যাত ভ্রাতা মীর আশরাফ ও মীর মুশরেফের সাহায্যে হুসায়ন আলী খাঁ যুলফিকার খাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা কড়া অভ্যর্থনা পাইয়া অচিরে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল ও দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার যে সকল অতি সাহসী কর্মচারী ও প্রধান সৈন্যের উপর অত্যধিক

ভরসা রাখিতেন তাহারা বিপুল সংখ্যায় তাঁহারই সম্মুখে কাছকাটা হইতে লাগিল এবং জীবনের মূলধন খোয়াইয়া তাহাদের দেহদ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিয়াফেলিল। তাঁহার তেজস্বী সৈন্যেরা কিরূপে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, হুমায়ন আলী খাঁ তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ হিন্দুস্তানের বীর পুরুষদের রীতি বিসর্জন দিয়া তাঁহার হাতী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কয়েকজন সাহসী সেনানী সর্বত্র তাঁহার অনুগমন করিল। তাহাদের সাহায্যে তিনি অনেক সাহসিক কার্য সাধন করিলেন। এমন সময় তীর, তরবারি ও বন্দুকের কয়েকটা আঘাত পাইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন; তাঁহার দেহ পদতলে বিমর্দিত হইতে লাগিল। তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌ খাঁর ভাগ্যও ভাল ছিল না; তুরানীদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে তীর দ্বারা অভ্যর্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা বিশৃঙ্খল হইয়া কয়েকটা দলে বিভক্ত হইল; উহাদের প্রত্যেকটি সামনা-সামনি থাকিয়া এক এক দল শত্রুর সহিত লড়িতে লাগিল। যেখানে সর্বাপেক্ষা ঘোর যুদ্ধ হইতে ছিল, তিনি যখন সেখানে বীরত্ব প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন ভীড়ের ঠেলায় যে কোথায় নীত হইলেন, বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে দেখিতে পাইলেন, তিনি পতাকাধারী হাতী হইতে বিচ্ছিন্ন-প্রায় ৩০০ সৈন্যের একটা দলের মধ্যে তাঁহার কয়েকটা সৈন্যদল হইতে দূরে রহিয়াছেন। ঠিক এই মুহূর্তে একজন শত্রু সেনাপতি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। দেখা গেল, এলাহাবাদে যিনি এত নির্লজ্জভাবে পরাজিত হন, তিনি সেই আবদুল গাফ্‌ফার। তিনি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াই আবদুল্লাহ্‌ খাঁর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিলেন। আবদুল্লাহ্‌ খাঁও ছিলেন ত্বরিত কর্মা; তিনি ইহার বুকে একটি শরনিক্ষেপ করিলেন। ঐ সেনাপতি গুরুতররূপে আহত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু এই কার্যের দরুন আবদুল্লাহ্‌ খাঁর কোনই লাভ হইলনা। জনতা আবার তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল; তিনি কোথায় পৌঁছিলেন, বুঝিতে পারিলেন না। এত বিপুল বিশৃঙ্খলার পরিণাম কি হইবে, তাহা অনুমান করাও তাঁহার সাধ্যে কুলাইলনা। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে তাঁহার একদল সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। তাহাদের সাহায্যে তিনি একটা উচ্চস্থান অধিকার করিলেন। সেখান হইতে

যেইমাত্র তিনি জাহাঁদার শাহ্‌কে তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যস্থানে দেখিতে পাইলেন, অমনি শর বৃষ্টিদ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া সেদিকে ধাবিত হইলেন। শত্রুরা যে বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হয়, তিনি এত চমৎকাররূপে উহাকে নিজের উপকারে লাগাইলেন যে, জানানা মহলের হস্তিনী গুলির কাছাকাছি পর্যন্ত হাজির হইলেন। বাদশাহের হস্তী অবাধ্য হইয়া তাঁহাকে দূরে লইয়া গেল। শত্রুপক্ষের তীরের পাল্লার বাহিরে যাওয়ার জন্য দলে দলে লোক উহার অনুসরণ করিল। যে দুইটা সৈন্যদল তখনও স্বস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের উপর আপতিত হইয়া ইহারা প্রথমে তাহাদের ব্যূহে বিশৃঙ্খলা ঘটাইল, পরে তাহাদিগকে একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। আবদুল্লাহ্ খাঁ নিবিড়ভাবে অবাধ্য হস্তীর উপর থাকিয়া বাধাদানে অক্ষম বাদশাহের অনুসরণ করিলেন। তাঁহার সমগ্র বাহিনী তাঁহার সহিত যোগদান করিতে লাগিল। এই সেনাপতি শত্রুকে প্রকৃতিস্থ হওয়ার সময় না দিয়া এতজোরে আক্রমণ চালাইলেন যে, বাদশাহের সৈন্যদের মধ্যে ইতিপূর্বেই (বিজয়) সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া থাকিলেও এখন তাহারা চতুর্দিকে পালাইতে লাগিল। কোকলতাশ খাঁ তাঁহার সৈন্যদের দ্বারা জাহাঁদারশাহ্‌কে আশ্রয় দানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু খান জমান ও চেথিল রায়ের নিকট বাধা পাইলেন। যুদ্ধের প্রথমেই তাঁহারা একটা স্থান নির্বাচন করেন; এখন সেখান হইতে বহির্গত হইয়া কোকলতাশের সৈন্যগণকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে কয়েকস্থানে আহত করিলেন। আলী খাঁ ও মুখতার খাঁ ইতিপূর্বেই নিহত হন। এখন বাদশাহী গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি বেয়াকুলী খাঁ এখানে নিহত হইলেন। ইতিমধ্যে কোকলতাশ খাঁর ভ্রাতা আজম খাঁ আহত হইয়া বাদশাহের হস্তীর নিকটে আসিলেন। অবস্থা তখন প্রতিকারের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া এই শাহজাদা লালকুঁওরের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে আকবরাবাদ অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। বাদশাহের অবস্থা যখন এইরূপ, যুলফিকার খাঁর অবস্থা তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্যাপক পরাজয়ে হতাশ না হইয়া সেনাপতি একখণ্ড ভূমিও না হারাইয়া স্বস্থানে অটল থাকেন। বাদশাহ্ বা তাঁহার পুত্র আয়জুদ্দীনকে আনিতে পারিবা মাত্র তিনি এমনকি নূতনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিতেও মনস্থ করেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

তাঁহার নিকট অর্থ ও প্রতিশ্রুতি পাইয়া কয়েকজন সুচতুর ব্যক্তি এই কার্যে সম্মত হয়; কিন্তু তাহারা তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া ফিরিয়া আসিল, ফলে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বরবাদ হইয়া গেল।

এদিকে আনন্দ ও বিজয় সঙ্গীতে শত্রু শিবিরের আকাশ-বাতাস ইতিপূর্বেই মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, সর্বশ্রেণীর কর্মচারী তাঁহাদের মুবারকবাদ ও নজর লইয়া ফর্‌রুখ সিয়ারের নিকট ছুটিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু একদল প্রবীণ সৈন্য ও বহু কামান লইয়া যুলফিকার খাঁ এখনও লড়াইর ময়দান হইতে নড়িতেছেন না দেখিয়া তিনি অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিলেন। এত আনন্দের মধ্যেও এই অস্থিরতা দূর হইল না। এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখভাবে অত্যন্ত প্রভুত্বব্যঞ্জক কিছু নিহিত ছিল। এত গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঐ সেনাপতির যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানের কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে—তিনি কঠোর ভাষায় তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে এই সংবাদ পাঠাইলেন, "যিনি সাম্রাজ্য দাবী করিতেন, তিনি সিংহাসন ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি নিজে তাহা দাবী করেন যে, তাঁহার পরেও এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন? কিন্তু যদি আপনার এমন কোন দাবী না থাকে এবং আপনি শুধু আওরঙ্গযীবের বংশের কোন বাদশাহের সমর্থক হন, তবে মুয়াজ্জেদীনের পরিবর্তে আমার সেই বাদশাহ্‌ হইতে আপনার কি আপত্তি থাকিতে পারে?" এরূপ ভাষায় এরূপ সংবাদ পাঠাইয়া তিনি কি জানিতে চাহেন, যুলফিকার খাঁ তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিলেন। অবস্থা প্রতিকারের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি সুশৃঙ্খলভাবে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া যথানিয়মে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চেহারা এত সম্ভ্রমব্যঞ্জক ছিল যে, কেহই তাঁহাকে বাধা দানের চিন্তা করিল না।

ইতিমধ্যে বাদশাহ্‌ আকবরাবাদে রাত্রি যাপন করিলেন। সেখানে তিনি হিন্দুর ন্যায় তাঁহার দাড়ি কামাইয়া ফেলিলেন এবং নিজের পরিচ্ছদ বদলাইয়া দীন-হীনের বেশ ধারণ করিয়া লাল কুওরকে সঙ্গে লইয়া শেষ রাত্রে রাজধানীর দিকে পলায়ন করিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার অনুরক্ত সর্বশ্রেণীর একদল লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। কিন্তু তিনি কিল্লায় না গিয়া বৃদ্ধ উজীর আসাদ খাঁর গৃহে অবতরণ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধৃত করিয়া বন্দী

করিলেন। তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে না করিতেই খোদ যুলফিকার খাঁ সেখানে হাজির হইলেন।

এদিকে রণক্ষেত্র শত্রুহীন দেখিয়া আবদুল্লাহ্ খাঁ তাঁহার ভ্রাতার জন্য কঠোরভাবে অনুসন্ধান চালাইবার আদেশ দিলেন। অবশেষে দেখা গেল, তিনি বাক্যহীন ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিয়াছেন। এই শুভ আবিষ্কারের কৃতিত্ব ঐ সাহসী আমীরের দুইজন ভৃত্যের। তাহাদের একজন তাঁহার কাছে রহিল আর একজন সংবাদ লইয়া ছুটিল। এই সংবাদে আবদুল্লাহ খাঁ এতই উৎফুল্ল হইলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পরিধানে তখন যত জহরত ছিল, তাহার সমস্তই খুলিয়া লইয়া তিনি লোকটাকে উপহার দিলেন। ইহার আর এক বিবরণ আছে; উহার মতে ভৃত্যেরা তাহাদের মনিবের সন্ধানে গিয়া দেখিতে পাইল যে, দুইজন কর্মচারী একদল সৈন্য লইয়া তাঁহাকে পাহারা দিতেছে। ইহারা ছিলেন হুসায়ন আলী খাঁর ব্যক্তিগত অনুচর লশকর আলী খাঁ ও মুহীইয়ার খাঁ। ইহার পরেও হাশিম আলী খাঁ যসীর আত্মবিবরণীতে তৃতীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিখ্যাত আমীর ও তাইমুর বংশীয় বাদশাহ্‌দের ইতিবৃত্ত লেখক। তিনি দৃঢ়তার সাহিত বলেন যে, হুসায়ন আলী খাঁ কয়েকটি বিপজ্জনক আঘাত পাইয়া অজ্ঞান অবস্থায় ভূপাতিত হন। সেখানে তাঁহাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া ফেলা হয়। তাঁহার ভৃত্যেরা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য অনুসন্ধানের পর ঐ অবস্থায়ই তাঁহাকে দেখিতে পায়। কিঞ্চিৎ সাহায্য লাভের পর তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে এবং তিনি আনন্দের সহিত তাঁহার পক্ষের জয়লাভের কথা শ্রবণ করেন; তথাপি তাঁহাকে পাল্কীতে তুলিতে কিছুটা কষ্ট হয়। তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতার নিকট লইয়া গেলে তিনি এত অপ্রত্যাশিতরূপে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া মাটিতে পড়িয়া সিজদা করেন এবং এরূপ জাজ্বল্যমান মেহেরবাণীর জন্য আল্লাহর শুকুরগুজারী করেন।

পিতার প্রাসাদে পৌঁছিয়াই যুলফিকার খাঁ বাদশাহ্‌কে ধৃত করার নিন্দা করিলেন। তিনি পুনরায় তাঁহাকে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইয়া আবার যুদ্ধের ভাগ্য পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। জাহাঁদার শাহকে সিংহাসনে বসাইবার ও ফর্‌রুখ সিয়ারের পিতা আজীমুশ্‌শানের সর্বনাশ সাধন করার তিনিই ছিলেন প্রধান সাহায্যকারী। কাজেই তাঁহার ভয় হয়, শত্রুতা ভিন্ন

পুত্রের নিকট হইতে তিনি আর কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে দাক্ষিণাত্য সমৃদ্ধ দেশ; সেখানে তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সেখানে তিনি নূতন বাদশাহ্‌কে বাধাদানে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবেন। সুতরাং, যাহাই হউক না কেন, তিনি সেখানে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু পিতা তাঁহার পিতৃ সমুচিত কৃতিত্ব প্রয়োগ করিয়া উভয় প্রস্তাবই নাকচ করিলেন, এবং অনুরোধ উপরোধের জোর খাটাইয়া বিরোধিতার যাবতীয় চিন্তা বিসর্জন দিতে ও শান্তভাবে নূতন বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে পুত্রকে সম্মত করাইলেন। ভাগ্য এই দিনগুলিকে আসাদ খাঁর সমৃদ্ধির শেষ মুহূর্ত এবং তদীয় পরিবারের অস্তিত্ব লোপ ও তাঁহার প্রিয় পুত্রের সর্বনাশের কাল বলিয়া নির্ধারিত করে। বাস্তবিকপক্ষে অদৃষ্টের চাপ ভিন্ন তিনি এরূপ মারাত্মক প্রস্তাবে কখনও সম্মতি দিতেন না এবং আসাদ খাঁর ন্যায় এত সুবিজ্ঞ লোক কখনও এরূপ চিন্তা করিতেন না। সাদর অভ্যর্থনা লাভের কোনই স্থিরতা ছিলনা, অথচ তাঁহার নিজের জীবন ও তাহার পুত্রের জীবন বিপন্ন হওয়া সঙ্গত কারণ ছিল; ইহা জানিয়াও বৃদ্ধ উজীর অওরঙ্গযীবের পরিবারে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং সেই বাদশাহ্‌ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট তিনি বরাবর যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা লাভ করেন, তাহার উপর ভরসা করিয়া কোন অনুচর সঙ্গে না লইয়াই তিনি পুত্রের হাত ধরিয়া ফররুখ সিয়ারের প্রতি সম্মান দেখাইতে ও তাঁহার পুত্রের জন্য সুপারিশ করিতে গমন করিলেন।

শাহ্‌জাদা তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে। ইহাকে অনুকূল দিন মনে করিয়া এবং সম্মুখে কোন বাধা দেখিতে না পাইয়া তিনি রাজমুকুট পরিধান করিতে মনস্থ করিলেন। ১১২৪ হিজরীর ১৫ই জিলহজ্জ প্রত্যুষে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্বসাধারণকে দর্শন দান করিলেন। এই অভিষেকের অব্যবহিত পরেই আবদুল্লাহ্‌ খাঁ, চিনকিলাজ খাঁ, আবদুস সামাদ খাঁ ও মুহম্মদ আমীন খাঁকে তাঁহাদের দলের সমস্ত আমীরসহ দরবারে হাজির করিলেন। এই সমুদয় সেনাপতি নূতন বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন ও সমৃদ্ধ রাজত্ব কামনা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের অতীত আচরণের ভুলচুক মাফ করিয়া দিলেন। একই সময় লুৎফুল্লাহ্‌ খাঁ সাদিক ও অপর কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান

ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তথাকার লোকের মন শান্ত করিতে এবং সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে আবদুল্লাহ্ খাঁর প্রতি তৎক্ষণাৎ রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আদেশ প্রদত্ত হইল। তদনুরূপভাবে তিনি শাহী প্রাসাদ ও দুর্গ, বিশেষতঃ সেখানে বন্দী রাজবংশীয় শাহ্জাদাদের খবরদারি করারও নির্দেশ পাইলেন। ১৪ই মুহর্রম রাজধানীর সন্নিকটস্থ বড় পান্নায় তাঁহার শিবির পড়িল; আবদুল্লাহ্ খাঁকে সেখানে ডাকাইয়া আনিয়া তিনি তাঁহাকে হপ্তহাজারী মনসবদারি ও কুতীবুল মুলুক উপাধি প্রদান করিয়া উজীরে-আজম বা প্রধানমন্ত্রীর পদে উন্নীত করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা হুসায়ন আলী খাঁকে এতেমাদুদ্দৌলাহ্ উপাধিতে ভূষিত করিয়া হপ্তহাজারী মনসবদারি ও আমিরুল ওমারার গৌরবান্বিত মর্যদাসহ সৈন্যদলের বকশীর পদে নিযুক্ত করা হইল। মুহম্মদ আমীন খাঁর বাস্তব পদমর্যাদার সহিত এক হাজারি মনসব বাড়াইয়া দিয়া ও তাঁহাকে এমাদুদ্দৌলাহ উপাধি প্রদান করিয়া দ্বিতীয় বক্শী নিযুক্ত করা হইল। চিনকিলাজ খাঁ ইতিপূর্বেই পঞ্চহাজারী মনসবদার ছিলেন; তিনি এখন হপ্তহাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত ও যুলফিকার খাঁর ভূতপূর্ব সহকারী দায়ুদ খাঁর স্থলে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। দায়ুদ খাঁ ছিলেন এই সময় বুরহানপুরের প্রধান সুবাদার। সেখান হইতে তাঁহাকে গুজরাটের সুবাদারিতে বদলি করা হইল। খোজা হাসানকে শামসুদ্দৌলাহ্ উপাধি, খান-ই-দুরান উপনাম ও ৬০০০ অশ্বারোহীর সেনাপতিসহ হপ্তহাজারী মনসবদারি দানে সম্মানিত করা হইল। আহমদ বেগ কোকাই মুয়াজ্জেদীন অনেক কার্যদক্ষতা দেখাইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তিনি এখন গাযীউদ্দীন খাঁ ফিরোজজঙ্গ উপাধিতে ভূষিত, ৫০০০ সওয়ারের সেনাপতিত্বসহ ছ-হাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত ও তৃতীয় বকশীর পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু যে লোকটা সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় উন্নীত হন এবং যাঁহার উন্নতি এখন হইতে ফর্রুখ সিয়ারের আমলের রাজনীতিতে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করেন, তিনি হইলেন কাযী আবদুল্লাহ্। এসময় জাহাঙ্গীরনগর ঢাকার কাযীউল-কুযাত এই ব্যক্তি ইতিপূর্বেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ভারপ্রাপ্ত হন এবং তাহা সফলতার সহিত সম্পাদন করিয়া সুপরিচিত হন। তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য

কাজ হইল গোপনে রাজধানীতে গমন করিয়া তুরানী আমীরদিগকে (এবং তিনি নিজেও ছিলেন তুরানী) ফর্‌রুখ্ সিয়ারের দলে আনয়ন করেন। এখন তিনি জাঁকজমকের সহিত দরবারে আগমন করিলেন; সেখানে তাঁহাকে খান-ই-খানান আমীর জুমলা এই উচ্চ উপাধিতে ভূষিত এবং হপ্তহাজারী মনসবদারের পদ ও মর্যাদায় উন্নীত করা হইল। বাদশাহ্ ইতিপূর্বেই তাঁহার ভিন্ন আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না বলিয়া বোধ হয়। এখন তিনি তাঁহার উপর সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থা স্থাপন করিয়া সম্মানিত করিলেন। এখনও ঢাকার পদ ভিন্ন তাঁহার আর কোনও চাকরী আছে বলিয়া দেখা না গেলেও বাদশাহ্ নিজের ব্যক্তিগত মোহর তাঁহার নিকট আমানত রাখিলেন। মুনশী মুহম্মদ জাফরের ইতিপূর্বেই কয়েকটি চাকরী ছিল; এখন তিনি তুকুর্‌রুব খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার বর্তমান পদগুলির সহিত বাবুর্চিখানার প্রধান পরিদর্শকের পদও যোগ করা হইল। আবদুল্লাহ্ খাঁর আত্মীয় সায়ক খাঁ হইলেন প্রধান অশ্বপাল। ঐ মন্ত্রীর দুইজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ যাঁহাদের সহিত ওয়াদা করা হয়, তাঁহাদের সকলেই এখন চাকরী অনুগ্রহ ও শাসনকর্তৃত্ব পাইলেন। এই সমুদয় তরক্কী শেষ হইলে নূতন উজীর আবদুল্লাহ্ খাঁ অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার পদের কর্তব্যে নিরত হইলেন। তন্মধ্যে একটি হইল গৃহযুদ্ধের অপরিহার্য বিশৃঙ্খলার সময় সাম্রাজ্যের উচ্চ পদস্থ আমীরেরা যে স্বাধীনতার ভাব অবলম্বন করেন, তাহার খর্বতা সাধন। বাদশাহ যদি সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত বুনিয়াদী পরিবার, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যের সর্বত্র এত সম্মানিত শ্রদ্ধেয় পুরাতন মন্ত্রী আসাদ খাঁর পরিবার ধ্বংস করিয়া নিজের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করার পরিবর্তে এই প্রশংসনীয় কার্যে স্বীয় মন নিয়োজিত রাখিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে তাহা সুখের বিষয় হইত।

আমরা তাঁহাকে স্বপুত্রক বড় পালায় বাদশাহী শিবিরে মুসাফিরী হালে রাখিয়া আসিয়াছি। সেখানে পৌঁছিবামাত্র উভয়ে নূতন বাদশাহ্‌কে তাহাদের সম্মান জ্ঞাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার নূতন প্রিয়পাত্র আমীর জুমলা ঠিক এ অবস্থার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঐ লোকটি সমস্ত প্রবীণ পরিবারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদের ধ্বংসস্তূপের উপর নিজের কতিপয় বন্ধুবান্ধবকে উন্নীত করার জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকটিকে ভূমিস্যাৎ

করার একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই ব্যক্তি ইতিপূর্বেই প্রধান সেনাপতির স্পষ্টভাষী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ চরিত্রের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা পোষণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাকে খতম করিতে চাহেন। ঐ সেনাপতির বিরুদ্ধে ফররুখ সিয়ারের মনও কিঞ্চিৎ বিরূপ ছিল; এই লোকটা তাহাতে ইন্ধন যোগাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু আমীরুল ওমারা হুসায়ন আলী খাঁর প্রস্তাবানুযায়ী কার্য করার সৌভাগ্য যদি যুলফিকার খাঁর হইত, তবে আমীর জুমলার শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসিত না বলিলেই হয়। হুসায়ন আলী খাঁ সদাশয়তার সহিত তাঁহার জন্য মধ্যস্থতার প্রস্তাব করেন এবং তাঁহাকে যথাবিধি নিশ্চয়তা দেন যে, যদি তিনি তাঁহার মারফতে পরিচিত হওয়া পছন্দ করেন, তবে তাঁহার মস্তকের একটি কেশও কেহ স্পর্শ করিবে না।

এরূপ কোন প্রস্তাব দীর্ঘকাল গোপন থাকিতে পারে না। ইহাতে যে সকল নিশ্চিত ফল ফলিবে আমীর জুমলা তাহা বুঝিতে পারিয়া এই সুযোগ বিনষ্ট করার জন্য যত্নবান হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নবনিযুক্ত প্রধান পাকশালা পরিদর্শক তুকুররুব খাঁকে যুলফিকার খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আশা ছিল, উভয়েই মোগল বলিয়া তুকুররুব ঐ সেনাপতির মনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। এই আমীর ঠিক ঐ কারণেই প্রধান সেনাপতির নিকট সমধিক সাদর অভ্যর্থনা পাইয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন যে, সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয় অত্যধিক ক্ষমতা গ্রহণ করায় বাদশাহ গোপনে তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আছেন। এরূপ অবলম্বনের উপর নির্ভর করা ও তাঁহাদের মধ্যস্থতায় বাদশাহের সহিত তাঁহার সোলেহ্ করা পঁচা গাছে ঠেস দেওয়ার তুল্য; তাহাতে অনুতাপ ও নৈরাশ্য ভিন্ন আর কোনই ফল হইবে না। অন্যের দ্বারস্থ হওয়ার দরকারই বা কি আর মধ্যস্থতারই বা কি প্রয়োজন? আপনার প্রতিভা সম্পর্কে বাদশাহের ধারণা অতি উচ্চ; তিনি এই প্রতিভা কাজে লাগাইতে চাহেন এবং আপনার অনুরাগ হইতে সর্বোচ্চ উপকার লাভের প্রত্যাশা করেন। কাজেই আপনি যেই মাত্র তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া নিজের মন শান্ত করিবেন, তখন আপনার পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি অবশ্যই বর্ধিত করা হইবে। তখন আপনি নিজেই এমন লোক হইবেন যে, যাবতীয় সভাসদ ও সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমীরেরা আপনার দ্বারে ধর্ণা

দিবেন। তুকুরুব খাঁর এই বক্তৃতা সর্বাপেক্ষা পবিত্র হলফ-যুক্ত উক্তি দ্বারা সমাপ্ত হইলে—এবং উভয় পক্ষ আল্লাহের গৌরবান্বিত কালাম স্পর্শ করিয়া শপথ বিনিময় করিলে পিতা পুত্র উভয়েই দূতের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন অকপট, কিন্তু বাদশাহের বিশেষতঃ তাঁহার মন্ত্রীর অকপটতা সম্পর্কে পুত্রের মনে কিছু সন্দেহ রহিয়া গেল। তিনি তাহা দূর করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহার হৃদয় আকাশে তখনও যে মেঘমালা ঘুরাফিরা করিতেছিল, তাহা দূর করার জন্য আমীর জুমলা স্বয়ং প্রধান সেনাপতির গৃহে গমন করিলেন এবং নূতনভাবে প্রতিজ্ঞা ও ইঙ্গিত করার পর একখানা শাল দ্বারা তাঁহার দুই হাত বাঁধিয়া তাঁহাকে বাদশাহের নিকট হাজির করিলেন, ঐ অবস্থায়ই তিনি নূতন বাদশাহকে কুর্নিশ করিলেন। শ্রদ্ধেয় আসাদ খাঁ তখন তাঁহার পুত্রের ভ্রান্ত অতীত আচরণের দোষ স্খলনার্থ কয়েকটি কথা বলিয়া তাঁহার পক্ষ হইয়া বাদশাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহ্ যতদূর কল্পনা করা যায়, বাহিরে ততদূর দয়ার ভাব দেখাইয়া তাঁহার হাত উন্মোচনের এবং যথোপযুক্ত জহরতসহ এক প্রস্থ সর্বোচ্চ সম্মানজনক খেলাত আনয়নের আদেশ দান করিলেন। অতঃপর তিনি অত্যন্ত বার্ধক্যের দরুন পিতাকে বিদায় দিয়া তাঁহার পুত্রকে বাহিরের একটি তাঁবুতে কয়েক মিনিট রাখিয়া যাইবার জন্য তাঁহার নিকট অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। কারণস্বরূপ তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁহার উপদেশ লইতে চাহেন। এই অপ্রত্যাশিত মোড় পরিবর্তনে বৃদ্ধ আমীর অস্বস্তি বোধ করিলেন এবং নিতান্ত অস্থিরচিত্তে স্থান ত্যাগ করিলেন। পুত্র এখন নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হইলেন, কিন্তু তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, আর পশ্চাদ্বর্তন সম্ভবপর ছিল না। কাজেই তিনি আদেশ অনুযায়ী কার্য করিলেন কিন্তু তিনি আসন গ্রহণ করিতে না করিতেই বাদশাহ্ প্রেরিত কয়েকজন লোক তাঁবুটি ঘিরিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গেই বাদশাহ্ তাঁহাকে কয়েকটি শ্লেষাত্মক বার্তা পাঠাইলেন; তাহাতে ক্রোধপূর্ণ ভাষায় তাঁহাকে তাঁহার পিতা আজীমুশ্‌শানের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হইল। হৃদয়ের যাবতীয় সহজাত মহত্ত্ব ও সদাশয় মনোবৃত্তি সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নির্ভীক, সাহসী ও কড়া মেজাজের লোক। কালমাক দিলাচিন বেগ (এ

সময় বাহাদুর দিল খাঁ) তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি ভৎর্সনা ও ঔদ্ধত্যের সহিত উত্তর দেওয়ায় দিলাচিন বেগ অনুকুল সুযোগে তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া চামড়ার একটি সরু ফালি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যখন সেনাপতির সহিত সজোরে টানাহেঁচড়া করিতেছিলেন, তখন কয়েকজন লোক ছুটিয়া আসিয়া ছোরা মারিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। একই দিনে কয়েক ব্যক্তি শাহ্‌জাহানাবাদের দুর্গে প্রেরিত হইল; তাহারা জাহাঁদার শাহের গলায় চামড়ার সরু ফালি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকেও ধ্বংসের রাজ্যে প্রেরণ করিল।

এরূপ ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শেষ হইলে তবে দুর্গে ও বাদশাহী মহলে বিজয় গৌরবে প্রবেশের চিন্তা বাদশাহের মনে স্থান পাইল। লোকের বিশ্বাস ছিল, এখানেই এরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্যের যবনিকাপাত হইবে। কিন্তু যেই মাত্র তিনি প্রাসাদে কায়েম হইয়া বসিলেন (এবং সেদিন ১১২৫ হিজরীর ১৭ই মুহর্‌রম, মঙ্গল বার) অমনি তিনি নির্দেশ দিলেন যে, জাহাঁদার শাহের মস্তক একটি বর্শায় গাঁথিয়া ও তাহার শব একটি হস্তীর পিঠে ফেলিয়া এবং যুলফিকার খাঁর লাশ উহার লেজে বাঁধিয়া উভয় দেহ নগরের সর্বাপেক্ষা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়া বহিয়া নিয়া পরিশেষে পঁচিবার জন্য কিল্লার প্রধান ফটকের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এত করিয়াও তাঁহার মন ভরিল না; তিনি আদেশ দিলেন যে, খোদ শ্রদ্ধেয় আসাদ খাঁকে ধৃত করিয়া প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিঠে যতটুকু বস্ত্র থাকা উচিত, কেবল ততটুকু রাখিয়া তাঁহাকে পাল্কিতে পুরিয়া তদবস্থায় উক্ত হস্তীর অনুগমন করাইতে হইবে। তাঁহার পরিবারের সমস্ত মহিলা বস্ত্রাবৃত শিবিকায় তখন তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন। অতঃপর তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্য খান জাহানের প্রাসাদে আটক রাখা হইবে এবং তাঁহার ও তদীয় পুত্রের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত হইবে। এই শোকাবহ মিছিল যখন প্রধান রাস্তাসমূহ টহল দিতেছিল, তখন বাদশাহের মনে পড়িল যে, শুভ সিংহ নামক জনৈক বিখ্যাত হিন্দুরাজা হালে অত্যন্ত অসংযত বাক্ হইয়া পড়িয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার জিহ্বা কর্তন করিয়া তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করার আদেশ জারি হইল। লোকটি সর্বপ্রকার কঠোরতার সহিত সম্পাদিত এই অস্ত্রোপচার নীরবে সহ্য করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইহার পরেও তিনি পূর্বের ন্যায় স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলিতে থাকেন।

"কখনও ভুলিয়া যাইওনা যে, প্রতিশোধের দিন সমাগত।"

"কদাচ ইহাও ভুলিওনা যে, গম হইতে গম ও যব হইতে যবই জন্মে।" নিষ্ঠুরতার সহিত ফররুখ সিয়ারের রাজত্বের প্রথম ভাগের সূচনা। কেবল যুলফিকার খাঁই তাঁহার ক্রোধ বা ভয়ের একমাত্র লক্ষ্যস্থল নহেন। পুরাতন দরবারের অধিকাংশ পদস্থ আমীরের সঙ্গেই অনুরূপ ব্যবহার করা হয় এবং চামড়ার ঐ ক্ষুদ্র ফালিতে তাঁহাদের সকলেরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়। রাজবংশীয় শাহজাদাদের সঙ্গেও অনুরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়। মরহুম জাহাঁদার শাহের পুত্র আয়ায্দীন, মৃত আজম শাহের পুত্র আলী তেবার, এমন কি ফররুখ সিয়ারের সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুমায়ূন বখতের চক্ষের উপর আড়াআড়িভাবে একটা বৃহৎ উত্তপ্ত সূঁচ টানিয়া তাঁহাদিগকে আলোর উপকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। একটা রাজত্বের ঠিক প্রারম্ভেই এত অধিক নিষ্ঠুরতা ও এত অধিক নিরর্থক হত্যাকাণ্ড উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্যন্ত প্রত্যেকটি লোকের মনে এত অধিক আতঙ্কের সঞ্চার করে যে, তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে নিয়ত সন্ত মৃত্যুর ছায়া ভাসিতে থাকে। কেহ এক দিনের তরেও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে করিত না। ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, যে সকল লোককে তাঁহাদের পদ বা চাকরীর কর্তব্যের খাতিরে প্রত্যহ দরবারে হাজিরা দিতে হইত—তাঁহারা সন্ধ্যা দিকে সুস্থাবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সমকক্ষদের অভ্যর্থনা ও অধস্তনদের নজর লাভে কখনও বঞ্চিত হইতেন না। নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া অধিক রাতে দুঃস্থদিগকে অর্থ ও ক্ষুধার্তকে শুকরিয়া খানা দানের চেয়ে আর কিছুই এত সচরাচর দৃষ্ট হইত না। কোন আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলে এরূপ করাই লোকের প্রচলিত প্রথা।

ঈদৃশ নিষ্ঠুর সূচনার মধ্যে লোকে বাদশাহ ও সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে একটা উদাসীন ভাব ও পরে অত্যন্ত তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করিল। এই দুইজন শক্তিশালী আমীরই নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন ও পরে তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করান। এই অসন্তোষ অচিরেই অত্যন্ত তীব্র হইয়া দাঁড়ায়, এত বেশী তীব্র হইয়া দাঁড়ায় যে, তৎফলে পরিণামে বাদশাহী বংশ ধ্বংস ও সমগ্র সাম্রাজ্য উৎসন্ন হইয়া যায়। সেই অগ্নির প্রথম শিখা, যাহা পরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমগ্র হিন্দুস্তানে ঈদৃশ অগ্নিকাণ্ড ঘটায়, নিম্নলিখিত ব্যাপারে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে: আগ্রার যুদ্ধের অব্যবহিত

পরেই আব্দুল্লাহ খাঁ রাজধানীতে প্রেরিত হন। তথাকার লোকের মন শান্ত করা এবং রাজকার্য অভ্যস্ত প্রণালীতে পুনরায়ণের জন্য তৎপ্রতি বাদশাহের আদেশ ছিল। এই কার্যে লুৎফুল্লাহ খাঁ সাদিক তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। তিনি বহুলোকের পদোন্নতি করেন। খলিসা দফতরের দিওয়ানের পদ তখন খালী ছিল, তিনি তাহা এই লুৎফুল্লাহ খাঁকে প্রদান করেন। আমীর সায়্যিদ আমজাদ খাঁ বাহাদুর শাহের আমল হইতে সদরুস্‌সদরের পদে অভিষিক্ত ছিলেন; তিনি তাঁহাকে ঐ পদে বহাল রাখিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি যখন তাঁহার প্রাপ্ত কার্যভার ও তাঁহার উজীরী ক্ষমতার বলে এই সকল চাকরী প্রদান করিতেছিলেন, আকবরাবাদের প্রান্তরে বাদশাহও তখন এগুলি বিতরণ করিতেছিলেন। প্রথম পদ দিলেন তিনি চেথিল রামকে এবং দ্বিতীয়টি তাঁহার সন্তানদের এককালীন গৃহশিক্ষক আফজল খাঁকে। কয়েক দিন পরে বাদশাহ রাজধানীতে পৌঁছিয়া কয়েকটি সরকারী চাকরী, কয়েকটি পদোন্নতি, বিশেষতঃ ঐ দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদের বিষয় অবগত হইলেন। ইহা লইয়া বাদশাহ ও উজীরের মধ্যে এক দীর্ঘ কথোপকথন হইল। শেষোক্ত ব্যক্তি মন্তব্য করিলেন, 'যদি তাঁহার শাসনের প্রথমেই তাঁহার কর্তৃত্বের প্রতি আঘাত হানা হয়, তবে তিনি নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন ও সাধারণের উপকারজনকরূপে এত গুরুত্বপূর্ণ পদের কাজ আর চালাইতে পারিবেন না।'' পক্ষান্তরে আমীর জুমলা বাদশাহকে উপদেশ দিলেন যে, রাজারা তাহাদের কোন ভৃত্যকে সময় সময় সাময়িকভাবে যত পূর্ণ ও যত অসীম ক্ষমতা প্রদানই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করুন না কেন, তদ্বারা কখনও এমন বুঝায় না যে, ভৃত্য এতই আত্মবিস্মৃত হইবেন যে, প্রভুর অনুমতির তোয়াক্কা না করিয়া নিজের খুশীমত এরূপ গুরুত্বপূর্ণ পদ বিতরণ করিবেন। তৎসঙ্গে তিনি কবির এই দুইটি বয়াৎ যোগ করিলেন ঃ

> ''মনিব যতই অসীম ক্ষমতা ন্যস্ত করুন না কেন, ভৃত্যের পক্ষে কখনও নিজের দূরত্ব বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।''

অবশেষে স্থির হইল যে, খালিসা লুৎফুল্লাহ খাঁ সাদিক ও সদরুস্‌সদরের পদ আফজল খাঁর হাতে থাকিবে। এই মতৈক্যের ফলে মতানৈক্যের তীব্রতা ও অসন্তোষ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও ইহা উভয় পক্ষেই গভীর দাগ রাখিয়া যাইতে ব্যর্থ হইল না। এতদসত্ত্বেও সাম্রাজ্যে এ সমুদয়

গোলমালের ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অবাধ্যতার (যে গোলমাল সায়্যিদদের কুখ্যাতিতে পরিণত হয় এবং পরিণামে তাঁহাদের নিজ বংশ ও পরিবার ধ্বংস করে) মূল কারণ আমি বলি, সাম্রাজ্যে গোলমালের মূল কারণ নিহিত ছিল বাদশাহের অযোগ্যতায় ও তাঁহার প্রতিভার বিশেষ গড়নে। যতটুকু প্রতিভা, মেজাজের দৃঢ়তা ও অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা একজন সম্রাটের থাকা দরকার, ফর্রুখ সিয়ারের মধ্যে তাহার কিছুই ছিলনা। তিনি ছিলেন হীনতেজা ক্ষুদ্রমনা ও লুব্ধ প্রকৃতির লোক। যদি দৈবাৎ তাঁহার মেজাজে কোন সদাশয়তা পরিলক্ষিত হইত, তাহা হইত যখন তিনি তাঁহারই ন্যায় নৈতিকতাবর্জিত ও যোগ্যতাহীন কোন নীচ, পাপিষ্ঠ লোকদের সংস্রবে কালযাপন করিতেন, তখন তিনি যে উপহার দিতেন, তাহারা তাহার ব্যবহার জানিত না এবং যে সকল চাকরী দিতেন, তাহারা তাহা চালাইতে পারিত না। এরূপ মনোবৃত্তি নিঃসন্দেহ আমিতব্যায়িতার নিকটবর্তী; তথাপি ইহাতে কিছু উপস্থিত সুবিধা পাওয়া যাইত। চাটুকার এবং ঐ প্রকৃতির অন্যান্য লোকে উহা লুফিয়া লইত ও করতালি দ্বারা তাঁহার সর্বোচ্চ প্রশংসা করিত। কিন্তু এরূপ প্রশংসা কখনও উত্তর পুরুষদের নিকট পৌঁছিবেনা। ফর্রুখ সিয়ার যদি রাস্তার সাধারণ জুয়াচোরদের সংসর্গে কালকাটাইতে ভালবাসেন, অতঃপর তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। জনৈক ইতিমাদ খাঁ এবং তাঁহার (ইতিমাদ খাঁর) তুল্য একদল লোকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ইহাই কারণ। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সাম্রাজ্য পরিচালনার সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং প্রকৃতপক্ষে যে কোন প্রকার নেতৃত্বেরই অযোগ্য বলিয়া তিনি কিভাবে তাঁহার সময় কাটাইবেন, দিশা পাইতেন না। তাঁহার পক্ষে আরও অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহার বিশ্বস্ত, স্বমতে অনড় ঐ আমীর জুমলা লোকটি এত অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এরূপ মিথ্যা দাবীদার এবং এত অধিক একগুঁয়ে ও কুটিল হইলেও নিজে ছিলেন যে কোন উচ্চপদের অযোগ্য। এতদসত্ত্বেও তিনি সাম্রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মাথা ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে চাহিতেন। আসাদ খাঁ ও যুলফিকার খাঁ—এই দুই ব্যক্তির বংশ ছিল দেড়শত বৎসর ধরিয়া অসীম ধন-সম্পদ এবং সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চপদ ও চাকরীর মালিক। আসাদ খাঁ ও যুলফিকার খাঁর ন্যায় যোগ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গ

ধূলিসাৎ ও ধ্বংস করা ছাড়া এই অযোগ্য প্রিয়পাত্রটি আর কিছুই করেন নাই। এখন এরূপ দুইজন আমীর—সায়্যিদদের সর্বনাশ করার মত চিন্তা তাঁহার মাথায় ঠাঁই পাইল। অথচ এই লোক দুইটিই তাঁহার প্রভুকে সর্বাপেক্ষা অধিক ঋণজালে আবদ্ধ করেন এবং তাঁহারাই এখন সাম্রাজ্যের দুইজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া সর্বত্র পরিগণিত ছিলেন। কিন্তু ঠিক ইহাই তাঁহার ঈর্ষাপরায়ণ চিত্তে ঘা দেয় এবং তাঁহার বিদ্বেষপূর্ণ চিত্তে ছোরা হানে। সে যাহাই হউক, সাম্রাজ্যের জীবনীশক্তিতে যে রোগে ধরে—সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহের পরিচালনকার্য যদি যাহারা সাম্রাজ্যের কর্ণধার, তাঁহাদের দ্বারা বিচিত্ররূপে উপেক্ষিত না হইত, তবে তাহা কখনও এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতনা। উজীর আবদুল্লাহ খাঁ ছিলেন বাস্তবিকই একজন যোগ্যতাসম্পন্ন লোক। কিন্তু সুন্দরী রমণীর এত প্রগাঢ় ভক্ত—ভোজদান, নৃত্যগীত ও অন্যান্য সর্বপ্রকার স্ফূর্তির প্রতি এত অনুরক্ত এবং কাজে কাজেই এত আরামপ্রিয় যে, তাঁহার বিশাল হেরেম ও উচ্চপদ—দুইটিরই সম্পূর্ণ পরিচালনা ভার তাঁহার দিওয়ান রতনচাঁদের উপর ছাড়িয়া দেন। এই লোকটা ছিলেন এককালে দোকানদার, কিন্তু তাহার মিথ্যাধর্মে সর্বপ্রকারে এত উৎসাহী যে, ঐ গুরুত্বপূর্ণ কার্যের সমস্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অনুরূপভাবে তিনি এতই সঙ্কীর্ণচিত্ত ছিলেন যে, নিজের গুরুত্ব অনুভব করিতে কিংবা তদুপযোগী মেজাজের সহিত কাজ করিতে পারিতেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও এরূপ ব্যক্তিই তাঁহার প্রভুর নামে জোর-জবরদস্তিতে সবকিছু সম্পন্ন করিতেন এবং সমগ্র হিন্দুস্তান সাম্রাজ্যের উপর অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করিতেন। একপক্ষে এত অধিক অযোগ্যতাও এত অধিক আলস্য এবং অপরপক্ষে যোগ্যতার প্রতি এত উপেক্ষার দরুন প্রত্যহ শত্রুতা বর্ধিত হইতে ও সাগ্রহ বিদ্বেষানলে ইন্ধন যোগাইতে থাকে। এই সকল শত্রুতা পরিণামে এত বিস্ময়কর রূপে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায় যে, তাই ঘুরিয়া সিংহাসনের মহান স্তম্ভরাজি ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বে উঠে এবং পরিণামে উহাদের ভারের চাপে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পতনে সায়্যিদদের পরিবারগুলিও বিপন্ন হইয়া পড়ে। উহারা এগুলি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, এমনকি পরিণামে সাম্রাজ্যের গঠনতন্ত্র পর্যন্ত বদলাইয়া ফেলে।

বাদশাহ ও অপর কয়েকজন লোকে আমীর জুমলার নিকট বিরাটকার্যের প্রত্যাশা করেন। সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলন ও উপস্থিতি দুর্দমনীয় হইয়া পড়ায়

অবশেষে বাদশাহ, আমীর জুমলা ও অপর কয়েক ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য এক-ফন্দী উদ্ভাবন করেন। অন্ততঃ উদ্ভাবন করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। কনিষ্ঠ হুসায়ন আলী খাঁর নিকট রাজা অজিত সিংহ রাঠোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তাব করা হইল। আওরংজীবের মৃত্যুর পর হইতে এই শক্তিশালী হিন্দু রাজা স্বাধীনতার গর্বিত ভাবভঙ্গী অবলম্বন করেন। তিনি কতকগুলি গর্হিত কার্যের জন্য দায়ী ছিলেন; তন্মধ্যে মসজিদ ভাঙ্গিয়া উহাদের ধ্বংসস্তূপের উপর মন্দির নির্মাণ অন্যতম। এ সমুদয় ঘটে ঠিক তাহার রাজধানী উদয়পুরের মধ্যস্থলে। বাহাদুর শাহ অবিশ্রান্ত গৃহযুদ্ধে লিপ্ত বা শিখদের ধ্বংসসাধনে ব্যাস্ত থাকায় এরূপ সামান্য ব্যাপারে মন দেওয়ার সময় পান নাই। একটা ভিক্ষুক সঙ্ঘ হইতে শিখেরা তাঁহার আমলে একটা আস্ত দস্যু-দলে পরিণত হইয়া সমগ্র লাহোর প্রদেশ বিধ্বস্ত ও উৎসন্ন করিতে থাকে। তজ্জন্য অজিতের ঈদৃশ বাড়াবাড়ি তাঁহার রাজত্বে অলক্ষিতভাবে উপেক্ষিত হয়। হুসায়ন আলী খাঁ ছিলেন যশ ও সামরিক বীরত্বপূর্ণকার্যের অনুরাগী। তজ্জন্য তিনি অচিরে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া একটি সুশিক্ষিত বিরাট বাহিনী ও পশ্চাতে একদল সুব্যবস্থিত গোলন্দাজ লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। রাজার রাজ্যে পৌঁছিয়া দেখিলেন, রাজা নিজেকে এরূপ শক্তিশালী সৈন্যদলের সমকক্ষ মনে না করিয়া একটি দুর্গম পার্বত্য জনপদে প্রস্থান করিয়া সেখানে তাঁহার পরিবার, ধন-সম্পদ, এমনকি সৈন্যদের পর্যন্ত লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় ও দরবারের প্রকৃতির দৃঢ় বৈশিষ্ট্য এই যে, রাজধানী হইতে হিন্দু রাজার নিকট বাস্তবিকই পত্র আসিতেছিল। তাহাতে বাদশাহ তাহাকে আত্মরক্ষার্থ বাধা দানে ও তাহার আয়ত্তাধীন প্রত্যেকটি উপায় আক্রমণকারীকে ধ্বংস করিতে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ঐ হিন্দু রাজা কিন্তু এই সকল দুর্বল-উৎসাহ বাক্যে বিভ্রান্ত না হইয়া সন্ধিস্থাপন করিয়া ক্ষমালাভ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। ঠিক এই সময় হুসায়ন আলী খাঁ যদি সংবাদ না পাইতেন যে, তাঁহার পরিবারের প্রতি ঈর্ষান্বিত ও বিদ্বেষপরায়ণ লোকেরা তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল্লাহ খাঁকে ফাঁদে ফেলার ও ধৃত করার জন্য ফন্দী আঁটিয়াছেন, তাহা হইলে রাজা আদৌ ক্ষমা পাইলেও সহজে পাইতেন না। আবদুল্লাহ খাঁ সঠিক খবর না পাইলেও অনিষ্টের

আশঙ্কায় তাঁহার ভ্রাতাকে তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্রের পর পত্র পাঠাইতে থাকেন। এ সকল পত্র পাইয়া হুসায়ন আলী খাঁ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন এবং কয়েকটি শর্তে রাজার প্রার্থনা মঞ্জুর করাই সমধিক শ্রেয় মনে করেন। এগুলি হইল রাজা তাঁহার নামে নতি স্বীকারের জন্য তাহার পুত্রকে বাদশাহের সেনাপতির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং প্রচুর অর্থ ও যথোপযুক্ত উপঢৌকনসহ তাহার কন্যাকে বাদশাহের হেরেমে পাঠাইবেন। হুসায়ন আলী খাঁ এই অভিযান শেষ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে সেখানে তাঁহার উপস্থিতি নূতন কলহের সৃষ্টি না করিয়া পারিলনা। সাম্রাজ্যের দুইটি সর্বোচ্চ পদ ভোগ করায় দুই ভ্রাতা সামরিক, বেসামরিক প্রত্যেকটি ব্যাপারে অসীম প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। ওদিকে আমীর জুমলা তাঁহাদিগকে ঘৃণাভাজন জনসাধারণকে তুষ্ট করিতে চাহিতেন বলিয়া তাঁহার নিকট যে কোন দরখাস্ত পড়িত, তাহাতে খুব তাড়াতাড়ি হুকুম দেওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। বাদশাহের ব্যক্তিগত মোহররক্ষক হওয়া ব্যতিরেকে তিনি তাঁহার এতদূর স্নেহ লাভ করেন যে, বাদশাহ একাধিকবার পূর্ণ দরবারে ঘোষণা করেন, "আমীর জুমলার কথা ও হাতের দস্তখতই ফররুখ সিয়ারের কথা ও হাতের দস্তখত।" আমি বলি, লোকের কাজ ত্বরান্বিত করিয়া আমীর জুমলা এত অধিক লাভবান হন যে, তিনি উজীর আবদুল্লাহ খাঁ, বরং তাঁহার মন্ত্রী রতনচাঁদের চক্ষুশূল হইয়া পড়েন; কোন কিছুতে আমীর জুমলার সংশ্রব বা কোন সনদে তাঁহার দস্তখত আবিষ্কার করিতে পারিলেই তিনি যে তাহা বাতিল করিয়া দিতেন, তাহা অবধারিত। পক্ষান্তরে যে কেহ তাঁহাকে একটি ও তাঁহার মনিবকে আর একটি যথোপযুক্ত উপহার দিত তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি ছিল স্থির-নিশ্চিত তাহাও বেশ তৎপরতার সঙ্গে।

ঈদৃশ আচরণে বাদশাহের হৃদয়ে ছোরা না বিঁধিয়া পারিত না। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নিজের বিপুল অর্থ ও তাঁহার প্রভুর অসীম প্রতিপত্তির দরুন এই লোকটি নিজের সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন যে, তৎফলে তিনি উদ্ধত ও অসহনীয় হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ আমীর জুমলার দ্রুত কার্য সম্পাদন ও সহজলভ্যতাকে মতলববাজী ও চাতুরীপূর্ণ বলিয়া চিত্রিত করিয়া তিনি তাঁহাকে উভয় ভ্রাতার নিকট ঘৃণিত করিয়া তোলেন। এ সকল কারণে তিনি লোকের নিন্দা ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন।

আমীর জুমলা নিজের তরফে বাদশাহের সাক্ষাতে অবিশ্রান্ত যে সকল কথা ও বাক্য বলিতেন, ভ্রাতৃদ্বয়ের গুরুত্ব হ্রাসই ছিল তাহার লক্ষ্য। তাঁহারা দাম্ভিক এবং তাঁহাদের ব্যবহার ও আচরণ এমনি যে, তাহা হইতে তাহাদিগকে কর্তব্যে নিতান্ত অমনোযোগী ও দৃঢ়রূপে স্বাধীনতার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। এভাবে তাঁহাদিগকে চিত্রিত করা তিনি নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তদুপরি তাহারা যে সকল উচ্চপদ পূরণের ভাণ করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাদের পর্যাপ্ত যোগ্যতা ছিল না বলিয়াও তিনি সময় সময় তাঁহাদের নিন্দা করিতেন। এরূপ এবং অনুরূপ প্ররোচণার দরুন বাদশাহ্ এত সন্দিগ্ধ ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন যে, আবদুল্লাহ্ খাঁকে ধৃত করার জন্য একটি ফন্দী আঁটেন। ইহার খাতিরেই তিনি অনেক সময়—কখনও শিকারের ছলে, কখনও বা উপনগরগুলির শোভাবর্ধক ও আনন্দদায়ক স্থানসমূহে বিশেষতঃ মুহ্সিন খাঁর বাগানে হাওয়া খাইবার ছলে দুর্গের বাহিরে গমন করিতেন। নিজের ছল ও ফন্দিকে অঙ্করূপ দানের মত যোগ্যতা থাকিলেও তিনি এত ভীরু ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন যে, কোন মতলবই সফল করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত ফন্দী বিতৃষ্ণার উপর বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষের উপর বিদ্বেষ স্তূপীকৃত করা ভিন্ন আর কোনই কাজে আসে নাই। কিন্তু যাহা সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এবং এতদসত্ত্বেও সকলেই যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই ঃ আজীমাবাদে কুরআন স্পর্শ করিয়া তিনি যে হলফ লন, তাহার খাতিরে ও বিবেকের তাড়নায় খোদ বাদশাহের জননী তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাস্তবিকপক্ষে যে যে মতলব আঁটা হইত, গোপনে এই ভ্রাতাকে তাহার সংবাদ পাঠাইতেন।

এরূপ অবস্থার মধ্যে হুসায়নুদ্দীন খাঁ বাদশাহের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার যে আদৌ সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তাহা নহে, এমন কথা তাঁহার কল্পনায়ও স্থান পায় নাই। এরূপ সমৃদ্ধ সুবাদারির বিপুল আয়ে তিনি দরবারে তাঁহার স্থান রক্ষায় সমর্থ হইবেন—ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র আশা এবং বিখ্যাত দায়ূদ খাঁ পনীকে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে প্রেরণ করাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। দায়ূদ খাঁ তাঁহার ভূতপূর্ব মনিব যুলফিকার খাঁকে যে কর দান করিতেন, তাঁহাকেও তাহা পাঠাইবার কথা হইল। ইহা ছিল বাদশাহ্ ও তাঁহার প্রিয়পাত্রের

ইচ্ছার ঠিক বিপরীত, তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, তিনি ঐ সঙ্গে, অথচ সুদূর দেশে গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা নিঃসঙ্গ হইবেন। ইহা হুসায়ন আলী খাঁর মনঃপূত হইল না। বাদশাহের সমস্ত ক্রোধ ও তাঁহার মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রের পাত্রে পরিণত হওয়ার জন্য তাঁহার ভ্রাতাকে সেখানে একাকী রাখিয়া যাওয়া তাঁহার নিকট নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইল। এরূপ মতানৈক্যের ফলে সম্পূর্ণ ঔদ্ধত্য ও ভৎর্সনাপূর্ণ কয়েকটি বিরক্তিজ্ঞাপক মনের কথা প্রকাশ পাইলে অবস্থা তৎক্ষণাৎ এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, দুই ভ্রাতা এখন হইতে দরবারে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের বাসস্থানে সৈন্য দ্বারা ভর্তি করিয়া সুরক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এতচ্ছ্রবণে বাদশাহ্ আমীর জুমলা, মুহম্মদ আমীন খাঁ, খান দুরান ও অপর কয়েক ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রতিদিন, প্রতিরাত্রে তাঁহাদের সহিত তাঁহার মন্ত্রণা চলিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহারা কোনই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলেন না। প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ্ এতই ভীরু ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন যে, কোন কিছুই কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। ইতিমধ্যে এই সকল বিরোধের কথা দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ায় রাজধানীতে সর্বপ্রকার খাদ্য-দ্রব্যের এত টান পড়িল যে, এ বিষয়ে বাদশাহ্ ও দুই ভ্রাতার মধ্যে অবিরত পত্র ও সংবাদ বিনিময় হইতে থাকা সত্ত্বেও নাগরিক ও মুসাফিরদের প্রাণ ধারণ দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। তাহাদের দুর্দশার কথা শুনিতে পাইয়া বাদশাহের মাতা এতই ব্যথিত হইলেন যে, তিনি প্রাসাদের বাহিরে গিয়া আবদুল্লাহ্ খাঁকে দর্শন দান করিলেন; নতুবা দরিদ্র লোকের দুর্দশা কতদূরে পৌঁছিত, আল্লাহ্ই জানেন। তিনি তাঁহার এতদূর চিত্তজয় করিলেন যে, আবদুল্লাহ্ খাঁ বাদশাহের সহিত মিটমাটে সম্মত হইলেন। শর্ত হইল, বাদশাহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে গমনকালে দুই ভ্রাতা তাঁহাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যেরূপ পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন পর্যাপ্ত মনে করিবেন তাহা গ্রহণে তাঁহাদের পূর্ণ অনুমতি থাকিবে। অতঃপর তাঁহারা পূর্বের ন্যায় দরবারে হাজিরা দিবেন। এই সন্ধি পুরাপুরি কার্যে পরিণত করা হইলে দুই ভ্রাতা বাদশাহের হুজুরে হাজির হইয়া তাঁহাদের অতীত আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে কয়টি প্রস্তাব ও ইঙ্গিত বাদশাহের বক্ষ সন্দেহে পরিপূর্ণ করে এবং তাঁহার উৎসাহী ও বিশ্বস্ত ভৃত্যদের প্রতি

তাঁহার বাদশাহী চিত্ত বিরূপ করিয়া তোলে এতদ্সম্বন্ধে তীব্র অভিযোগ করিলেন। এই উপলক্ষে উৎসাহিত হইয়া দুই ভ্রাতাই তাঁহাদের পার্শ্বদেশ হইতে তাঁহাদের তরবারী খুলিয়া তাহা বাদশাহের পদতলে রাখিয়া দিলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই বক্তৃতা দান করিলেন, "আমরা অপরাধী হইলে এখানে আমাদের দুইটি মস্তক ও ওখানে দুইখানা তরবারী রহিয়াছে; অথবা যদি আমাদের অতীত খেদমতের দরুন আমাদিগকে হত্যা করা প্রার্থনীয় বিবেচিত না হয়, তবে মেহেরবানী করিয়া আমাদিগকে আমাদের পদ হইতে ছাড়াইয়া দিন এবং হুজুরের চাকরী হইতে একেবারে বরখাস্ত করুন। তাহা হইলে আমরা মানব জাতির রাজার (আমাদের গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষ, তাঁহার উপর চিরন্তন শান্তি হউক) কবর জিয়ারত করিয়া আমাদের মস্তকোপরি সম্মান স্তূপীকৃত করার জন্য আল্লাহ্‌র ঘরে সফর করার অবসর পাইব, কিংবা যদি মহামান্য বাদশাহ্ আমাদের নিকট হইতে আরও কিছু খেদমত আদায় করিতে চাহেন এবং আমাদিগকে হুজুরের বদন মুবারকের নিকট রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে মেহেরবানী করিয়া হুজুরের সন্দেহ দূর করুন এবং যে একদল লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ ও মতলববাজ গল্প-কথক বাদশাহের খাতিরে আমরা যে কত শোণিতপাত করিয়াছি, একবারও তাহা স্মরণ না করিয়া অবিশ্রান্তভাবে আমাদের ন্যায় বিশ্বস্ত গোলামের প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে. হুজুর তাহাদের প্রস্তাবে কর্ণপাতে বিরত হউন। হুজুর তাঁহার এই দুই অনুমোদিত ভৃত্যের সহিত পুনরায় মিলিত হউন এবং সদাশয় হৃদয়মুক্ত কৃতজ্ঞতা ও ভীষণতম প্রতিজ্ঞা দ্বারা পবিত্রকৃত চুক্তির প্রতিকূল মনোভাবের প্রশ্রয়দানে বিরত হউন।" বাদশাহ্ এই দৃশ্যে অভিভূত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল এবং ইহার ফলে তাহাদের সাময়িক পুনর্মিলন ঘটিল। অনেক সম্মেলনের পর স্থির হইল যে, সন্দেহ ও বিরোধের সমাপ্তি ঘটাইবার একমাত্র উপায় হইল দুই শত্রুকে পৃথক করা। আমীর জুমলা দরবার ছাড়িয়া আজীমাবাদে গমন করিতে আদিষ্ট হইলেন; সম্মানিত নির্ধারণ হিসাবে তাঁহাকে উহার শাসন কর্তৃত্ব প্রদত্ত হইল। হুসায়ন আলী খাঁ তাঁহাদের দাক্ষিণাত্যের সুবাদারীতে যাত্রা করিতে সম্মত হইলেন। সেখানে তাঁহার উপস্থিতি ভিন্ন আর কিছুই ঐ অঞ্চলের বিদ্রোহীদের দমন ও যাহারা বশ্যতা

স্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না। উভয়পক্ষই এই চুক্তিতে সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু দুই ভ্রাতার ক্রোধের নিকট তাঁহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে মনে করিয়া আমীর জুমলা ইহাতে খুশী হইতে পারিলেন না। অথচ বাদশাহের সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল তাঁহার প্রিয়পাত্রের শক্তির উৎস বর্ধিত করা ও তাঁহাকে উত্তেজিত করা। হুসায়েন আলী খাঁর সনদও এই সময় লিখিত হইতেছিল। ঐ অঞ্চলের প্রদেশসমূহ ও দুর্গরাজির শাসনকর্তা ও সেনাপতি এবং দাক্ষিণাত্যের সকল সুবার সমস্ত কর্মচারীর প্রতি, তাঁহারা যে যেখানেই থাকুকনা কেন, নূতন সুবাদারের বশ্যতা স্বীকারের এবং এখন হইতে তাঁহার আদেশ পালনের হুকুম জারি হইল। অনুরূপভাবে দুইখানা পুনরাহ্বান পত্রও লিখিত হইল—একখানা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার চিনকিলাজ খাঁ নিজামুল মুলকের নিকট তাঁহার পদত্যাগ করিয়া হুজুরে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়া, আর একখানা গুজরাটের শাসনকর্তা দায়ূদ খাঁ পনীর নিকট তাঁহাকে বুরহানপুরে গিয়া নূতন সুবাদারের আগমনের অপেক্ষা করার ও তাঁহার আদেশ পালনের জন্য। ইহা ছিল প্রকাশ্য পত্র; একটি শক্তিশালী বাহিনী লইয়া বুরহানপুরে থাকিয়া হুসায়ন আলী খাঁ ও তাঁহার সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে কোন প্রকার ত্রুটি না করার জন্য আদেশ দিয়া তাঁহার নিকট যুগপৎ আর একখানা পত্র প্রেরিত হইল। তাহাতে ইহাও বলা হইল যে, সেক্ষেত্রে তিনি নিজেই দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইবেন এবং আরও সম্মান ও অনুগ্রহ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। এই সকল গোপনীয় উপদেশ জানাইবার পরে অজিত সিংহের কন্যার সহিত তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের চিন্তা বাদশাহের মনে স্থান পাইল; এ বিষয় শীঘ্রই বিবৃত হইবে। কিন্তু দায়ূদ খাঁ আমাদের ইতিহাসে একজন অতি বিশেষ ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছেন বিধায় তাঁহার অবিবেচকতা ও পক্ষপাতিত্বের দরুন তদীয় রাজধানী আহমদাবাদে যে অশান্তি ও গোলমালের সৃষ্টি হয়, তাহার বিবরণ দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের আভাস দান এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ঐ কর্মচারীটির শাসনকালের দ্বিতীয় ও বাদশাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরে যে রাত্রে হোলিদাহ করা হিন্দুদের রীতি, সে রাত্রে তাহাদের মধ্যে একব্যক্তি নিজ উঠানে ঐ অনুষ্ঠান পালন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু উঠানের এক ক্ষুদ্র

অংশ কতিপয় মুসলমানের বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া তাহারা ইহাতে আপত্তি করিল। প্রত্যেকেই নিজ গৃহের মালিক, এই যুক্তি দেখাইয়া হিন্দুটি তাহাদের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া হোলিদাহ করিল। কিন্তু পরদিন আশরাফুল মখলুকাতের মৃত্যু দিবস বিধায় মুসলমানটি তাহার বিরুদ্ধে হিন্দু লোকটির যুক্তির সুযোগ লইয়া সকলে মিলিয়া যাইবার ও দরিদ্রদিগকে কিছু খানা খাওয়াইবার উদ্দেশ্যে সেখানে একটি গরু জবাই করিল। এই কার্যে ঐ মহল্লার সমস্ত হিন্দু মুসলমানদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া প্রাণ ভয়ে আপন আপন গৃহে আত্মগোপন করিতে বাধ্য করিল। ধর্মোন্মাদনায় মত্ত হইয়া অতঃপর তাহারা যে কসাইটি গরু জবাই করিয়াছিল, তাহার খোঁজে বাহির হইল, কিন্তু তাহাকে না পাইয়া তাহার ১৪ বৎসর বয়স্ক নিরীহ পুত্রকে ঠিক ঐ উঠানে টানিয়া আনিয়া এবং তাহাদের বিবেচনায় পবিত্র বস্তু অপবিত্র করার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে বলিদান করিল। এরূপ (ভয়াবহ) দৃশ্যে স্তম্ভিত হইয়া মুসলমানেরা সমগ্র শহরে ব্যাপক হৈ-চৈ আরম্ভ করিল এবং দলে দলে মুসলমান অধিবাসী ছাড়াও দায়ূদ খাঁ পনীর কয়েক হাজার আফগান সৈন্যকেও তাহাদের দলে ভিড়াইল। ইহারা সকলে মিলিয়া কাযীর বাড়ীতে গমন করিল। কাযী জানিতেন, এই ব্যাপারে শাসনকর্তা হিন্দুদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন! কাজেই তিনি ইহাতে মাথা গলাইতে চাহিলেন না, বরং তাহাদের সম্মুখে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। মুসলমানেরা ইহাতে স্বভাবতঃই চটিয়া গিয়া নিজেদের পূর্ব সংস্কারের বশে কিংবা খোদ কাযীরই গোপন হস্তের নির্দেশে তাঁহার দ্বার ভাঙ্গিয়া উহা অগ্নিসাৎ করিল। অতঃপর যেন তাহাদের কাজ অনুমোদিত করাইবার জন্য তাহারা কাযীকে তাহাদের দলে লইয়া বাজারের হিন্দু দোকানগুলিতে ও তাহাদের পথের ধারে যতগুলি হিন্দুবাড়ী পড়িল, তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। কোপর চাঁদ নামক জনৈক বিখ্যাত জহুরীর নিকট বাধা না পাইলে তাহাদের অগ্নিকাণ্ড ও ধ্বংসক্রিয়া চলিতেই থাকিত। তিনি ছিলেন শাসনকর্তার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। কিন্তু ঘোর মুসলমান বিদ্বেষী এই লোকটি দেখিলেন, তাঁহার নিজ গৃহও বিপন্ন: কাজেই তিনি বন্ধু বান্ধবসহ স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করতঃ আত্মরক্ষার প্রস্তুত হইলেন। তিনি দ্বারদেশে বন্দুকটি বসাইয়া ঘুলঘুলী, (আলোবাতাস গমনাগমন

ছিদ্র) উন্মুক্ত করিলেন। দুই দলে বিবাদ বাঁধিল কিছু সংখ্যক লোকের প্রাণ নষ্ট হইল। কয়েক দিন ধরিয়া হাঙ্গামা চলিল। সেই মহানগরীর দোকান পাট ও কাজ কারবার বন্ধ হইয়া গেল। গোলমাল থামিলে মুসলমানেরা আপনাদিগকে মজলুম মনে করিয়া তিনজন বিখ্যাত লোককে তাহাদের প্রতিনিধিরূপে আদালতে নালিশ দায়ের করিতে প্রেরণ করিল। ঠিক এই সকল লোককেই পূর্বে এক পক্ষে মুসলমান ও অন্য পক্ষে হিন্দুদের মধ্যে মিটমাটের ব্যবস্থা করার জন্য নির্বাচিত করা হয়। ইহারা ছিলেন শায়খ আবদুল ওয়াহিদ, বিখ্যাত বক্তা শায়খ মুহম্মদ আলী ও আবদুল আযীয। খোদ দায়ূদ খাঁ এই ব্যাপারে নিজেকে জড়িত দেখিয়া কোপর চাঁদের হাতে একখানা সুরতহাল বা শাসন-কর্তা, কাযী, প্রধান সেনাপতি ও সমস্ত কর্মচারীর স্বাক্ষরিত বিবরণ-পত্র দিয়া তাঁহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে হিন্দুদের সাফাই গাহিয়া বলা হইল যে, হিন্দুদের কোনই দোষ নাই এবং মুসলমানেরাই প্রথম আক্রমণকারী। কিন্তু প্রতিনিধিত্রয় রাজধানীতে পৌঁছিবামাত্রই রতনচাঁদের চাতুরীতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী লোকটি তাঁহাদের দরখাস্তগুলিও ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। দরবেশ খোজা মুহম্মদ জাফর ঘটনাক্রমে তাঁহাদের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের দুর্ভাগ্য-জনক ব্যাপারে নিজেকে জড়িত না করিলে তাঁহারা কত কাল যে কারাগারে থাকিতেন, আল্লাহ্ই জানেন। ইনি দরবারের অন্যতম প্রধান আমীর খান দুরানের ভ্রাতাবই আর কেহ নহেন, খোদা প্রেমে অনুরাগী এই ধার্মিক পুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়া নিভৃত জীবনযাপন করিতেন। স্বীয় নির্জন-বাসে থাকিয়াই তিনি রতনচাঁদের নিষ্ঠুর পক্ষপাতিত্বের কথা শ্রবণ করেন এবং ঐ দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদিগকে কারামুক্ত করাইবার জন্য সেখান হইতে তাঁহার ভ্রাতাকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। এত বড় মেহেরবানি তাঁহাদের অন্যতম ওয়ারেজ শায়খ মুহম্মদ আলীর মনে এত গভীর রেখাপাত করিল যে, সেই মুহূর্ত হইতে তিনি তাঁহার উপকারীর অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। কয়েকজন সাধারণ গায়ক ও বিয়োগান্ত নাট্যকার নিয়মিতভাবে তাঁহার হুজরায় সমবেত হইয়া মখলু-কাতের তাজ (হযরত মুহম্মদ (সঃ)) ও তাঁহার দ্বাদশ উত্তরাধিকারীর সম্মানার্থ বয়াৎ গাহিয়া তাঁহাদের গভীর উৎসাহ প্রকাশ ও সেই বিখ্যাত দরবেশের

অনির্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করিতেন। ওয়ায়েজ এখন প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করিতেন বলিয়া বক্তৃতা দানের পর রসুলের সম্মানার্থ কয়েকটি বাক্য বলিয়া তাঁহার ধার্মিক উত্তরাধিকারী বার ইমামের প্রশংসাকীর্তনের নিয়ম করেন। এই অভিনব নিয়মের দরুন রাজধানীতে আলোড়ন সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমরা শীঘ্রই দেখাইব যে, ইহাতে কোনই উত্তেজনার সঞ্চার হয় নাই। বর্তমানে আমাদের কাজ হইল বাদশাহের ইপ্সিত কনে হিন্দুরাজা অজিত সিংহের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা। তাঁহাকে বিদায় দানকালে তাঁহার পিতা তাঁহার হস্তে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র অর্পণ করেন; এগুলি ছিল তাঁহার আয়ত্তাধীন যে কোন উপায়ে হুসায়ন আলী খাঁকে বাধাদান ও ধ্বংস করার জন্য প্রাপ্ত পত্রাবলী ও সংবাদ। রাজকন্যাকে এগুলি সম্রাটের হস্তে অর্পণ করিতে বলা হয়। ঐ আমীরের দরবারে প্রত্যাবর্তনকালেই হউক, কিংবা তাঁহার প্রাসাদে রাণীর অবস্থানকালেই হউক, ইহা নিশ্চিত যে হুসায়ন আলী খাঁ কোন উপায়ে এই সকল কাগজ-পত্র হস্তগত করেন, এবং এগুলি তাঁহার হাতে দেখিয়া রাণী যে উদ্বেগ বোধ করেন, তিনি তাহার প্রশংসা করেন। ভ্রাতৃদ্বয় অবশ্য এই সকল কাগজ-পত্র বাদশাহের খেদমতে পেশ করেন। তিনি এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাঁহার মাতা নিজ পুত্র ও তাঁহাদের মধ্যে একটা চুক্তির ব্যবস্থা করেন। এই কৈফিয়তে মতভেদ ও বিবাদ দূর হইল এবং দরবার হইতে আমীর জুমলার নির্বাসনের ফলে শান্তি আরও দৃঢ়তর হইল। ইহাও স্থির হইল যে, বাদশাহের বিবাহানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর হুসায়ন আলী খাঁ তাঁহার দাক্ষিণাত্যের সুবাদারিতে যাত্রা করিবেন। অতএব বাদশাহ রাণীর সহিত তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন, তাঁহার হেরেমের কর্মচারীরা এই শুভ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার আদেশ পাইলেন। তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিলেন। কিন্তু হুসায়ন আলী খাঁ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। রাজকন্যা তাঁহারই সাহায্যে দরবারে আনীতা হইয়া এতকাল তাঁহার প্রাসাদে অবস্থান করায় তাঁহাকে তাঁহার পালীতা কন্যা বলিয়া গণ্য করা চলিত। কাজেই ইহাতে নিজের ইজ্জত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া যে সকল আড়ম্বর ও সমারোহের জন্য হিন্দুস্তানের সুনাম আছে, তিনি এই শুভ

কার্যে তৎসমুদয়ের অনুষ্ঠান করা স্থির করিয়া বর-কনে উভয়ের জন্যই এমন আয়োজন করিলেন যে, রাজধানীতে পূর্বে যত আড়ম্বরের কথা শুনা গিয়াছিল এবং দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ রাজা ও নরপতিদের বেলায় কিম্বা এমন কি হিন্দুস্তানের মহামান্য বাদশাহ্‌দের জন্যও যত আড়ম্বর অনুষ্ঠিত হয়, ইহা তাহার সমস্তই ছাড়াইয়া যায়। তাঁহার আসবাবপত্র জহরত ও আলোকসজ্জা ছিল খোদ বাদশাহ্‌ এগুলি যেরূপ করেন, তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। রাত্রি আরম্ভ হইবামাত্র অজস্র আতসবাজি ও নকল তারা এরূপ অগ্নিশিখা বিকীরণ করিতে লাগিল যে, মনে হইল যেন এগুলি আকাশের অনন্ত তারকারাজির সহিত প্রাধান্যের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহাদিগকে উহাদের নিকট ঝিকিমিকির জন্য ভৎর্সনা করিতেছে। পক্ষান্তরে নানা ধরনের কৃত্রিম রকমারি রঙ ও উহাদের প্রতিবিম্বিত বিভিন্ন প্রকারের ছায়া দেখিয়া দর্শকেরা ইরানের বিখ্যাত উদ্যানের আভাস লাভ করিল। আমোদ-প্রমোদ সর্বপ্রকার প্রদর্শনী ও জাঁকাল ভোজ এত একটানা প্রাচুর্যের সহিত পর পর সমাগত হইল যে, দীনতম হইতে উচ্চতম নাগরিক পর্যন্ত সকলেই তাহাতে শরীক হইতে পারিল। বিস্ময়, আনন্দ ও উল্লাস কোন পশুপ্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত অজস্র প্রাণীর ন্যায় প্রত্যেকটি দর্শকের পশ্চাতে ধাওয়া করিল। এত ভীড়, অনুষ্ঠানে উপস্থিতি এত অধিক ও দর্শকদের এত সমাগম হইল যে, মনে হইল যেন রাজপথ ও বাজারগুলি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং উহাদের প্রত্যেকটি ব্যর্থ-প্রেমিকের অন্তরের চেয়েও অধিক আকুলি-বিকুলি করিতেছে। পক্ষান্তরে আমোদ-আহ্লাদ এত উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় হওয়ায় প্রত্যেকটি মুখমণ্ডলকে এত সজীব করিয়া তুলিতেছিল যে, পুষ্পোদ্যানগুলিতে ঈর্ষার যাতনার হুল ফুটিল এবং গোলাবগুলি আপনাদিগকে হিংসার কণ্টকের উপর উপবিষ্ট বলিয়া অনুভব করিল। অবশেষে কয়েকদিনের এত সজীব দৃশ্যের পর বাদশাহ্‌ তাঁহার সমগ্র দরবার পরিবেষ্টিত হইয়া হুসায়ন আলী খাঁর প্রাসাদের এক মহাড়ম্বর বৃহৎকক্ষে গমন করিলেন, একটা বিখ্যাত জমায়েত সেখানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিবাহের ক্রিয়া-পদ্ধতি পাঠের পর বাদশাহ্‌ তাঁহার কনেকে স্বীয় অনুচরবর্গের মধ্যে গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গীতের মধুর সুরে বায়ুমণ্ডল আনন্দে মুখরিত করিয়া তাঁহার বাদশাহী মহলে গমন করিলেন। সে দিনটি ছিল ১১২৭ হিজরীর ২২শে যিলহজ, বৃহস্পতিবার।

এরূপ আমোদ আহ্লাদের দৃশ্যের অব্যবহিত পরেই ধর্মনৈতিক গোলযোগ দেখা দিবে, কে এমন চিন্তা করিতে পারিয়াছিল। মুলতানের একজন বিখ্যাত মোল্লা শায়খ আবদুল্লাহ বিশেষ কোন কার্যোপলক্ষে রাজধানীতে আসিয়া মসজিদের নিকটে বসিলেন। তিনি প্রায়ই মসজিদের মুসল্লিদের নিকট বক্তৃতা করিতেন। অচিরে তিনি তাহাদের নিকট এত অধিক খ্যাতিলাভ করেন যে, মসজিদের পথগুলি পর্যন্ত নিয়ত ভিড় জমিয়া থাকিত। একদা তিনি আমাদের পূর্বোক্ত ধর্মনিষ্ঠ আমীর খোজা জাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার কতিপয় অনুচর ও শাগরিদ বরাবর মৃত্তিকাচুম্বন করিয়া সিজদার সহিত তাঁহাকে সালাম করিতেছে এবং যে সকল গায়ক ও বিয়োগান্ত নাট্যকার সেই পবিত্র খানকায় গমন করিত, তাহারা রসূলে মকবুল ও তাঁহার সন্তানদের নিষ্কলঙ্ক আত্মার সম্মানার্থ কবিতা আবৃত্তিকে অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে। তিনি ইহার নিন্দা করিয়া বলিলেন, "এই সিজদা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র জনাই স্বতন্ত্র করিয়া সংরক্ষিত এবং কাজে কাজেই অপর যে কোন ব্যক্তির জন্য ইহা অবৈধ ও অশোভন। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে সঙ্গীত ও কবিতা শ্রবণ নিন্দিত ও নিষিদ্ধ এবং মখলুকাতের তাজের বংশধরদের তারিফ আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্মানার্থ অল্প কয়েকটি প্রশংসা বাক্যে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখা, অথচ তাঁহার চারিজন শ্রদ্ধেয় উত্তরাধিকারী সম্পর্কে একটি মাত্র কথাও না বলা মুসলমানী রেওয়াজের খেলাফ।" "খোজা জাফর উত্তর দিলেন: "যেহেতু ধার্মিক লোক ও তাঁহদের অনুচরেরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোন বর্তমান জীবের সর্বব্যাপকতা স্বীকার করেনা—কাজেই তাহারা অন্য কোন প্রাণীকে সিজদা করিবে, ইহা অসম্ভব এবং তাহাদের পথ প্রদর্শকেরা ইহার প্রশ্রয় দিবেন, ইহাও অসম্ভব। সে যাহাই হউক; যে সকল লোক তাহাদের উৎসাহের উন্মাদনায় অভিভূত হইয়া তাহাদের ভক্তি ও প্রেমের পাত্রকে সর্বত্র উপস্থিত মনে করে এবং সেই স্থানে সিজদা করিয়া উহাকে ভক্তিভরে চুম্বন করে, তাহারা কাহারও অনুরোধে তাহাদের অভ্যাস ত্যাগ করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। এমতবস্থায় তিনি কিরূপে ইহা বন্ধ করিবেন এবং ইহা বন্ধ না করায় তাঁহার অপরাধই বা কোথায়? পরিশেষে তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন।

"মুসাফির, তোমার পাশের বন্ধু ও তোমার প্রতিবেশী সবাই তাঁর,
ভিক্ষুকের কম্বলের নীচে বা রাজাদের কিংখাবের তলে তাহারা সবাই তাঁর।
দূরত্ব দ্বারা বিভক্ত বা একই ছাদের নিম্নে সমবেত—
প্রকৃতপক্ষে তাহারা সবই তাঁর।"

বিয়োগান্ত নাট্যকারদের গান গাওয়া ও সাধারণ গায়কদের কবিতা সম্পর্কে বক্তব্য "এই যে, এই সকল লোক তাহাদের ওস্তাদের নিকট যাহা শিক্ষা করে তদভিন্ন আর কিছুই গান করে না। তাহাদের সঙ্গীত চর্চার বাধা দেওয়াও আমি পছন্দ করি না; কারণ ইহা আমার কাজ নহে। আপনার নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (বক্তব্য এই যে,) যদি চারি আসহাবের প্রশংসাত্মক কোন কবিতা আপনার জানা থাকে। এই লোকগুলিকে তাহা শিক্ষা দিন, যেন তাহারা তাহা গাহিতে পারে এবং তাহা যেন সর্ব যুগে সর্বত্র তাহাদের রীতি হইয়া দাঁড়ায়।"

শায়খ আবদুল্লাহ্ এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। শিয়া মযহাবের প্রতি যাঁহার ঝোঁক আছে, তিনি ভিন্ন আর কাহারাও মুখ হইতে ইহা বাহির হইতে পারে না। এইরূপ দৃঢ় সন্দেহপোষণ করিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। পরবর্তী বক্তৃতার দিনে তিনি খোদ জাফরের কথাগুলির শিয়ামতের সহায়তাকারী বলিয়া তাহার নিন্দা করিলেন এবং প্রকাশ্যে তাহা দোষাবহ বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। এসঙ্গে তিনি কয়েকটি অস্বস্তিজনক উক্তিও জুড়িয়া দিলেন।

"দৃষ্টান্তস্থলে (বলা যায় যে) আবুতালিবের পুত্র আলী মুর্তজা পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে ছিলেন না; তাহাকে সাহিবে বলা ভুল এবং 'পঞ্চতন পাক' (পবিত্র দেহ পঞ্চতক) কথাটা ইসলামী নীতির বিপরীত; কারণ, যে কেহ ইহা স্বীকার করিবে সে অপর তিনজন ইমামকে তুল্য পবিত্র নহে বলিয়া বাদ দিয়া যাইবে।" ইমামিয়া সম্প্রদায়ের নিন্দার উদ্দেশ্যে তিনি আরও কয়েকটি কথাও উক্তি করিলেন; তাহাদের ধর্মনীতি ও আচার ব্যবহারের নিন্দা ও বিরূপ সমালোচনাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া বোধ হইল।

খোজা জাফর এই বক্তৃতার কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন, মিম্বর হইতে এরূপ উক্তি করা প্রচলিত বিশ্বাসের খেলাফ এবং সুন্নী মযহাবের প্রথা ও রীতি-নীতির বিপরিত। এ গুলি সম্ভবতঃ লোকের মনে পীড়া ও কল

উস্কানি দিতে পারে। যদি তিনি তাঁহার গরীবখানায় বা অপর যে কোন স্থানে তশ্‌রিফ আনা সঙ্গত মনে করেন, তবে সেখানে কয়েকজন আলিমকে একত্র করা যাইতে পারে। এবং তাঁহার বিশ্বাস, তিনি যে তক্‌লিফ স্বীকার করিলেন, তাহা বিনা লাভে যাইবে না। কারণ, তখন তিনি যুক্তির নিয়ম ও হাদীসের সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তাঁহার সন্দেহ নিরসনের সুযোগ পাইবেন। কেননা, সেক্ষেত্রে সেগুলির নিষ্পত্তির জন্য সুন্নী মযহাবের সর্বাপেক্ষা অনুমোদিত দলীলপত্র ও স্থায়ী হাদীস সংগ্রহের বরাত দেওয়া সম্ভবপর হইবে।

এই সংবাদ পাইয়া ওয়ায়েজ ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কয়েকদিন পরে একদল নির্বোধ ইরানী যুবক খুৎবার সময় মসজিদে সমবেত হইয়া তাহাদের তসবীহ্ ও কারবালার খাদিমের কবচ সম্মুখে রাখিয়া বক্তার ঠিক মুখোমুখি হইয়া বসিল। এই সময় তাহারা কথাবার্তায় ও আকার-ইঙ্গিতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভয়ও দেখাইল। তাঁহার দুই তিন হাজার সুন্নী অনুচর ইহাতে রুষ্ট হইয়া উঠিল। খোজা জাফর ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এসবই তাহাদের বক্তার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অভিপ্রেত, এই সন্দেহ করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ গরম হইয়া উঠিল এবং অধর্মাচরণ ও অপবিত্র ভাষা ব্যবহারের জন্য ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঐ যুবকদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিল। ব্যাপারটির হয়ত সেখানেই ইতি হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, জনৈক হিন্দুও সেদিন বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কতকটা সুখ্যাতিসম্পন্ন একজন সৈনিক। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি তাহাদের অব্যবহিত পরেই বাহির হইয়া গেলেন। কয়েক ব্যক্তি, বিশেষতঃ মসজিদের জনৈক ভৃত্য ইহা লক্ষ্য করিয়া যাহারা এইমাত্র এত অপরাধ করিয়াছে তাহাকে তাহাদেরই একজন মনে করিয়া তাহাকে আটক বা হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু লোকটি পিছনে ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবণকারীকেই হত্যা করিলেন। অপর কয়েক ব্যক্তি শীঘ্রই তাহাকে দৌড়াইয়া ধরিল এবং কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। কেহ তাহার লাশ নিতে আসিলে তাহার নিকট হইতে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে মনে করিয়া জনতা তিনদিন পর্যন্ত তাহার দেহের সৎকার

করিতে দিলনা। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর বক্তার সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ভক্তদের কয়েকজন কতিপয় সভাসদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সাহায্যে দরবারে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহারা একযোগে বাদশাহের নিকট গিয়া অভিযোগ করিলেন যে, বাহাদুর শাহ্ তাঁহার রাজত্বকালে মুসলমানী কলেমায় "আলী রসুলুল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারী" কথাটা প্রবর্তনের চেষ্টা করিলে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, খোজা জাফর সুন্নী মযহাবে অনুরূপ ধর্মনৈতিক মতভেদে উস্কানি দিতে চাহেন। তাহারা আরও বলিলেন যে, এতদপেক্ষাও কোন গুরুতর ব্যাপারের জন্য আন্দোলন চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়, কাজেই অপরাধীর প্রতি রাজধানী পরিত্যাগের আদেশ জারি হওয়া কর্তব্য।

এরূপ সামান্য আন্দোলন হইতে সেই বিশাল নগরে এত উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে, একথা সহজে কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহিবে না। পেশাদার গায়ক ও অন্যান্য লোকে নিষ্পাপ ও পবিত্র উত্তরাধিকারীদের প্রশংসাত্মক গান গাহিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত, এরূপ দৃশ্য ছিল এযাবৎ নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। অজস্র আলিম পর্যন্ত অনেক সময় ক্ষণকাল থামিয়া তাহাদের কবিতা ও সঙ্গীত শ্রবণে আনন্দ লাভ করিতেন। এখন অবস্থার এত অধিক পরিবর্তন ঘটিল যে, এরূপ গায়কদের পক্ষে বিকৃত এবং অধর্ম ও অপবিত্র ভাষা ব্যবহারের জন্য অভিযুক্ত হওয়া অবধারিত হইয়া দাঁড়াইল। কাযী শরিয়তুল্লাহ খাঁ ছিলেন দরবারে যাতায়াতকারী সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ আলিম। বাদশাহ এই নূতন গোলমালের কথা শুনিয়া এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিলেন। ধর্মশাস্ত্রবিদ উত্তর দিলেন, "শায়খ আবদুল্লাহ যাহা বলিয়াছেন, সুন্নী ধর্মনীতির উৎকৃষ্ট কিতাবের সাহায্যে বিরোধিতার পরীক্ষায় তাহা টিকিবে না; কাজেই খোজা জাফরকে ধর্ম-বিরোধী মতের জন্য শাস্তিদান কঠিন হইবে। কিন্তু পক্ষান্তরে এই আলোড়ন বন্ধ করা সঙ্গত বিধায় খোজা সাহেবকে তাঁহার বাসা বদলাইয়া উপনগরে সরিয়া যাইতে অনুরোধ করা তাঁহার উচিত। তাহা হইলে তাহাতে কোন ক্ষতি বা বিপদ ঘটিবেনা।"

এই সিদ্ধান্তের কথা লোকমুখে প্রচারিত হইবামাত্র অন্যতম প্রধান পরিষদ ও রাজমন্ত্রী খান দুরান বক্তাকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি

কি উদ্দেশ্যে এতদূরে রাজধানীতে আসিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি তাঁহার কোন হুকুম আছে কিনা জানিতে চাহিলেন। বক্তা তদনুযায়ী উত্তর দিলে খান দুরান কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার কার্য সমাধা করিয়া দিয়া তাঁহার জন্মভূমি মুলতানে তাঁহার সার্থক সফর কামনা করিলেন। যুগপৎ তিনি পবিত্র খোজা জাফরকে সম্মানজনক দর্শন দান করিয়া এ বিষয়ে কথা প্রসঙ্গে বিনীত ভাষায় তাঁহার অনুকম্পা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, তিনি যদি কিছুকালের জন্য তাঁহার বাসা বদলাইয়া শহরতলীতে নিজামুদ্দীন আওলিয়ার স্মৃতিসৌধে তাঁহার আস্তানা গাড়েন, তাহা হইলে এরূপ ত্যাগের ফলে বিরুদ্ধবাদীদের মুখ কার্যকরীরূপে বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপে যে আন্দোলন ভীতপ্রদ আকার ধারণ করে, তাহা তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।

কিন্তু ইহা ছিল বিপজ্জনক কাল ; সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে তখন অতিগুরুতর গোলযোগ দেখা দিতেছিল।

হিজরী ১১২৮ সনে অর্থাৎ ফররুখ সিয়ারের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে পাঞ্জাবের প্রান্তরে শিখ ও বাদশাহী বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। ইহাতে শেষোক্ত দল ঐ প্রদেশের জনৈক বিখ্যাত সুবাদার আবদুস সামাদ খাঁর পরিচালনায় ঐ সকল অমানুষিক লুণ্ঠনকারীদিগকে গুরুতররূপে পরাজিত করিল। তাহাদের সেনাপতি বান্দা বিজেতার হাতে ধরা পড়িল। প্রকৃতির হাতে কসাইয়ের উপাদানে গড়া এই বর্বর লোকটি তাহার নেতৃত্বাধীন ঐ সমুদয় অন্য কসাইদের সংখ্যা ও পুনঃপৌনিক সফলতার উপর নির্ভর করিয়া সমগ্র লাহোর প্রদেশ উৎসন্ন করতঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর যে সকল নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান করেন, তাহা যাবতীয় বিশ্বাসের অতীত। জয়লাভে উল্লসিত হইয়া তিনি এমন কি রাজমুকুট পরিধানের আকাঙ্ক্ষা করেন। আমরা তাহার ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছুটা বর্ণনা করিব। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসে শিখ অর্থাৎ গুরু গোবিন্দের ধর্মমতের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিদের অন্যতম। শিখেরা তাহাদের জন্ম বা (ধর্মে) প্রবেশের মুহূর্ত হইতে তাহাদের দাড়ি, গোঁফ বা যে কোন চুল কখনও কাটেনা বা কামায় না। তাহারা একটি বিশেষ সমাজ ও সম্প্রদায় গঠন করে ; সর্বদা নীলবস্ত্র পরিধান ও নিয়ত সশস্ত্র ভ্রমণ তাহাদের বৈশিষ্ট্য। যেকোন গোত্র উপজাতি বা জাতির লোক হউকনা

কেন, একবার ঐ সমাজে প্রবেশলাভের পর এ সমুদয়ের দরুন পরস্পরের সহিত মেলামেশা বা ভাবের আদান-প্রদান করিতে এ যাবৎ কখনও তাহাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। এ পর্যন্ত তাহাদের ধর্মমত, নীতি বা সাধারণ জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই বিভিন্নতা ও বিরোধ থাকুক না কেন, যে সকল সংস্কার-পূর্ব সতর্কতা ও বিদ্বেষ হিন্দুদের মনে বদ্ধমূল, তাহাদের মধ্যে কখনও সেগুলি পরিদৃষ্ট হয় নাই। এই সমাজ বা সংঘ আওরঙ্গযীবের রাজত্বের প্রায় শেষ ভাগে দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। তাহারা গুরু গোবিন্দকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মান্য করে। তিনি ছিলেন এই সম্প্রদায়ের ধর্মাধ্যক্ষ নানক শাহের অন্যতম শিষ্য। আমরা এই নানক শাহ্ সম্পর্কে যাহা জানি, তাহা এই ঃ তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়কুলের জনৈক শস্য ব্যবসায়ীর পুত্র। বাল্য-কালে তিনি সদাচরণ ও প্রশংসনীয় চরিত্র এবং তাঁহার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য ও উপস্থিত ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত সঠিক প্রত্যুত্তরের জন্য তুল্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অর্থেরও তাঁহার অভাব ছিলনা। সে সময়ে ঐ অঞ্চলে সায়্যিদ হাসান নামে এক ফকির বাস করিতেন। তিনি ছিলেন একজন বক্তা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার নিজের কোন সন্তান-সন্ততি ছিলনা। ঘটনাক্রমে বালক নানকের উপর নজর পড়ায় তিনি তাঁহার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট ও তৎপ্রতি স্নেহা-ভিভূত হইয়া তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। যথাসময়ে মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থাবলীর জ্ঞানের সহিত বালকের পরিচয় ঘটে এবং তিনি সর্বাপেক্ষা অনুমোদিত সুফী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতে দীক্ষিত হন। পড়াশুনায় তিনি এত উন্নতি করেন এবং তাঁহাদের পুঁথি-পুস্তকের প্রতি তিনি এত আসক্ত হন যে, অবসর সময়ে যে সকল নীতি তাঁহার হৃদয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক দাগ কাটিত, অন্তরের প্রেরণা অনুযায়ী তাঁহার মাতৃভাষা পাঞ্জাবীতে সেগুলির হুবহু বা কবিতায় অনুবাদ করা তাঁহার অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়। অল্পে অল্পে ঐ সকল আলগা বাক্যকে একত্রে গাঁথিয়া তিনি উহাদের কতকটা শৃঙ্খলা বিধান করেন এবং ঐ গুলিকে কবিতায় পরিণত করেন। শৈশবে হিন্দু ধর্মের যে সকল কুসংস্কার তাঁহার অন্তরে স্থান লাভ করে, ইতিমধ্যে তিনি সেগুলি এতদূরে নিক্ষেপ করেন যে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোক হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার সঙ্কলন অনেক হইয়া পড়ায় পুস্তকের আকার ধারণ করে; উহার

নাম রাখা হয় 'গ্রন্থ'; সুলতান বাবরের আমলে ইহা এত বিখ্যাত হইয়া পড়ে যে, ইহার গ্রন্থকার যশস্বী হইয়া দাঁড়ান। তখন হইতে দলে দলে দর্শক বা হিতৈষী তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকে। শিখদের মধ্যে অদ্যাপি এই পুস্তকখানাকে এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা হয় যে, সম্মানজনক ভাবভঙ্গী অবলম্বন না করিয়া তাহারা ইহা স্পর্শ বা অধ্যয়ন করে না। তিনি যে সকল পুস্তক পাঠ করেন, তাহাতে যাহা কিছু সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দেখিতে পান, প্রকৃতপক্ষে ইহা সেগুলির সমষ্টি মাত্র। ইহা আন্তরিকতা ও বাক পটুতার সহিত লিখিত এবং কাজেকাজেই ইহাতে সত্য ও নিখুঁত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যসূচক যাবতীয় গুণ ও আকর্ষণ বিদ্যমান।

অতীতকালে ঐ ভ্রাতৃসঙ্ঘের ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বা রীতিনীতিতে মুসলমান ফকিরদের সহিত পার্থক্য করা চলিত না; অদ্যাপি তাহাদের পার্থক্য সহজে বুঝা যায় না। যাহারা গ্রামে ও শহরে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদের বসতিকে সঙ্গৎ বলে; সেখানে বরাবর একজনকে অন্যান্যের উপর কর্তৃত্ব করিতে দেখা যায়। তাহাদের ধর্মাধ্যক্ষ নানক মাত্র দুইটি সন্তান রাখিয়া যান। ইহাদের একজন পরিণত বয়সে মৃগয়া ও উচ্চ জীবনের অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ দ্বারা নিজের চিত্ত বিনোদন করিতেন; এ বিষয়ে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা অদ্যাপি তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের সকলেই তাঁহার কর্তৃত্বের ওয়ারিশ ও অংশীদার বলিয়া খ্যাত। অপর পুত্র ধর্মনৈতিক জীবন ও উহার বেশভূষা গ্রহণ করায় তাঁহার অনুচরেরাও তাহাই করিয়াছেন। সর্ববিষয়ে তাহাদিগকে অজস্র মুসলমান ফকীরের ন্যায়ই দেখায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নানক শাহ্ তাঁহার সন্তানদের একটিকে বা অপরটিকে নিজের অব্যবহিত উত্তরাধিকারী নিযুক্ত না করিয়া করেন শুধু অঙ্গদ নামক তাঁহার এক ভৃত্যকে। তিনি পূর্ণ কর্তৃত্বের সহিত ধর্মাধ্যক্ষের গদীতে উপবেশন করেন। এই অঙ্গদ হইতে ক্রমান্বয়ে নবম ছিলেন জনৈক তেগ বাহাদুর। তিনি এত অসাধারণ চরিত্রের লোক ছিলেন যে, দলে দলে লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়; তাহারা ও তাহাদের নেতা নিয়ত সশস্ত্র থাকিতেন। এই ব্যক্তি এত হাজার হাজার লোকের নেতৃত্ব পাইয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠেন এবং হাফিজ আদম নামক জনৈক মুসলমান ফকিরের সহিত তাঁহার স্বার্থ

সমন্বিত করেন। যাহারা আপনাদিগকে শায়খ আহ্‌মদ সরহিন্দীর সমাজভুক্ত বলিয়া আখ্যাত করিত, ইনি ছিলেন তাহাদের অন্যতম। এই দুই ব্যক্তি যেই মাত্র দেখিতে পাইলেন যে, দলে দলে লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে এবং তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের সর্দারের ইচ্ছার পায়রবি করিতেছে—অমনি তাঁহারা সমস্ত সাধুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লুণ্ঠন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ তাঁহাদের হাতে উৎসন্ন হইয়া গেল। তেগ বাহাদুর যখন হিন্দুদের উপর চাঁদা বসাইতেন হাফিজ আদমও মুসলমানদের উপর তাহাই করিতেন। এই সমুদয় বাড়াবাড়ি অচিরে সরকারী কর্মচারী, সরকারী সংবাদপত্র সম্পাদক ও গুপ্তচরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাঁহারা বাদশাহ্‌ আওরঙ্গযীবকে লিখিলেন, "এই দুই ব্যক্তি লুণ্ঠন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাকে তাঁহাদের অভ্যাসে পরিণত করিয়াছেন।" পাঞ্জাবের সুবাদার লাহোরে বাস করিতেন; এই সংবাদের উত্তরে বাদশাহ্‌ তাঁহাকে আদেশ দিলেন, "এই দুর্বৃত্তদ্বয়কে ধৃত করিয়া মুসলমানটিকে হিন্দুস্তানের শেষ সীমা আটক নদীর বাহিরে আফগানদের দেশে পাঠাইয়া দিবেন; তাহাকে বলিবেন, পুনরায় ইহা অতিক্রম করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। অন্য লুণ্ঠনকারী তেগ বাহাদুরকে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করিবেন। সুবাদার যথারীতি তাঁহার হুকুম তামিল করিলেন। কয়েক দিন পরে তেগ বাহাদুরকে হত্যা করিয়া তাহার দেহ চারিটুকরা করিয়া দুর্গের চারিধারে টাঙ্গাইয়া রাখিবার জন্য গোয়ালিয়রের শাসনকর্তার প্রতি আদেশ আসিল। ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইল। কিন্তু এই প্রাণদণ্ডের পরিণাম হইল শোকাবহ। এ যাবৎ সাধারণ শিখেরা শুধু ধর্মীয় পোশাক পরিধান করিত, আদৌ অস্ত্র ধারণ করিত না। কিন্তু পিতার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হইয়া গুরু গোবিন্দ তাঁহার অজস্র অনুচরকে সৈন্যদলে বিভক্ত করিয়া তাঁহার উৎকৃষ্ট-বন্ধুদের অধীনে স্থাপন করিলেন; তাহারা নিজেদের অস্ত্র ও অশ্ব সংগ্রহের আদেশ পাইল। তাহাদিগকে রণসাজে সজ্জিত ও অশ্বারূঢ় দেখিতে পাওয়া মাত্রই তিনি দেশ লুণ্ঠন ও চাঁদা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল বিনাদণ্ডে রহিলেন না। প্রদেশের ফওজদারেরা একত্র হইয়া ঐ সমুদয় লুণ্ঠনকারীর ঘাড়ে পড়িয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন, কিন্তু গুরু গোবিন্দের

দুই পুত্র তাহাদের হস্তে জীবন্ত ধরা পড়িয়া নিহত হইলেন। পিতার অবস্থা এখন সম্পূর্ণ বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইল। বন্য পশুর ন্যায় সর্বত্র পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তিনি একটা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার দেহ আপাততঃ নিরাপদ হইল, কিন্তু মধ্যবর্তী জনপদ সৈন্য ও দুর্গরক্ষী সৈন্যে ভর্তি ছিল বলিয়া তিনি সরহিন্দের বাহিরে নিজ দেশে পরিজনদের নিকট পলায়ন করিতে পারিলেন না। নিজের সঙ্কটজনক অবস্থায় বিচলিত হইয়া তিনি সরহিন্দের বাহিরে বসবাসকারী পার্বত্য আফগানদের নিকট আবেদন করিলেন এবং তাহারা তাঁহাকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে পারিলে তাহাদিগকে বিপুল অর্থদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহাদের একদল এই লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিল। নিজেদের পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া তাহারা তাঁহাকে তাহার দাড়ি-গোঁফ ও শরীরের অন্যান্য পশম লম্বা করিতে নিয়োজিত করিল। যখন তাহারা দেখিল, এগুলি যথেষ্ট বড় হইয়াছে, তখন তাহারা তাঁহাকে ঐ গিরিবাসীদের মধ্যে ব্যবহার্য নীল পোশাকের অনুরূপ একটা পরিচ্ছদ পরাইয়া নিজেদের ভিতরে লইয়া তাহাকে দুর্গের বাহিরে আনয়ন করিল এবং কেবল নিরাপদে নহে, সসম্মানে সমগ্র দেশ পার করিয়া দিল। যখনই কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত, যে লোকটিকে তাহারা এত সম্মান করিতেছে, তিনি কে, তখনই তাহারা উত্তর দিত, তিনি তাহাদের একজন পীরজাদা—ওছের পীরজাদা। এত বড় বিপদ হইতে মুক্তি লাভের মত এত সৌভাগ্য হওয়ায় গুরু গোবিন্দ ঐ ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ ঐ আফগান পোশাক গ্রহণ করিলেন; এমন কি তিনি এখন হইতে ইহাকে তাঁহার অনুচরদের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক পোশাকে পরিণত করিলেন। কেহ তাহার দাড়ি-গোঁফ নির্দিষ্ট পরিমাণে বড় না করিলে ও নির্দিষ্ট নমুনার পোশাক পরিধান না করিলে শিখ ধর্মের দীক্ষা পাইত না। কিন্তু তাঁহার সন্তানদের মৃত্যু তাঁহার মনে এত গভীর দাগ কাটে যে, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিল; শোকে-দুঃখে অল্পকাল পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন। বান্দা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। এই কসাই প্রকৃতির লোকটির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই নারকীয় লোকটা তাঁহারই ন্যায় অজস্র ধর্মোন্মাদ, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও নির্ভীক লোক সমবেত করিয়া এরূপ নিষ্ঠুর

বর্বরতার সহিত দেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন যে, ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। নর-নারী বা শিশু কোন মুসলমানই তাঁহার হাতে রেহাই পাইত না। গর্ভবতী রমণীদের পেট চিরিয়া তাহারা তাহাদের মুখমণ্ডলে বা দেওয়ালে তাহাদের শিশুদের মাথা ঠুকিত। বাদশাহ্ (এবং তিনি ছিলেন কোমল প্রাণ বাহাদুর শাহ্) এই সকল নিষ্ঠুর কাণ্ডের কথা শুনিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া তিনি ঐ সমুদয় বর্বরের বিরুদ্ধে কেবল ঐ প্রদেশের সৈন্যদল নহে, আস্ত বাহিনীই প্রেরণ করিলেন; সেগুলিও আবার আমীরুল ওমরা মুনাম খাঁ প্রভৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতিদের দ্বারা পরিচালিত হইল। ৩০,০০০ অশ্বারোহী লইয়া তিনি সেই দুর্বৃত্তকে লোহাগড় দুর্গে অবরোধ করিলেন। লোকটি কিছুকাল আত্মরক্ষার পর তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিলেন; এ উদ্দেশ্যে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেন, তাহা হইতে একাধারে যেমন তাঁহার যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা, তেমনি পাশব সাহস ও বীরত্বের পরিচয় মিলে। এতদ্‌সত্ত্বেও মুসলমানরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করিল না। তিনজন সেনাপতি তাঁহাদের সৈন্যদল একত্র করিয়া পুনরায় তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। ইহারা ছিলেন মুহম্মদ আমীন খাঁ, আমীর খাঁ ও রুস্তম দিল খাঁ। কিন্তু কৌশল উদ্ভাবনের উর্বর বুদ্ধিবলে তিনি আবার আপনাকে ছাড়াইয়া নিলেন। তিনি যে বাদশাহের সৈন্যদের মুকাবিলা করিতেন, তাহা নহে। তিনি কদাচিৎ তাহাদিগকে তাহার মুখদর্শনের সুযোগ দিতেন। অবিশ্রান্তভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি তাহাদের নাগালের বাহিরে থাকিতেন এবং তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া শিকারীর জাল হইতে পলায়িত কোন বন্য পশুর ন্যায় অকস্মাৎ সবেগে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সবকিছু অগ্নি ও তরবারির মুখে নিক্ষেপ করিতেন। প্রত্যেকটি মুসলমান তাঁহার হস্তে নিহত হইল; যত মসজিদ মকবরা তাহার নজরে পড়িল, সমস্তই তিনি ধ্বংস করিয়া দিলেন। তাহার লুণ্ঠন ও বর্বরতা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই বোধ হইল। এইরূপ অবস্থায় বাহাদুর শাহ্ ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্রেরা সিংহাসনের জন্য বিবাদে লিপ্ত হওয়ায় বাংলার দিকে মনোযোগ দেওয়ার অবসর পাইলেন না। কাজেই অবশেষে তাহার শক্তি দুর্দমনীয় হইয়া দাঁড়াইল। ফররুখ সিয়ার সিংহাসনে উপবেশন করিলে

লাহোরের সুবাদার আসলাম খাঁ ঐ লুণ্ঠনকারীদিগকে ধ্বংস করার আদেশ পাইলেন, কিন্তু ঐ লুটেরারাই একটা খুঁটিগাড়া যুদ্ধে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল এবং সুবাদার তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য হারাইয়া পূর্ণ-লজ্জার সহিত লাহোরে প্রস্থান করিলেন। এইরূপ অপ্রত্যাশিত সফলতা লাভে উৎসাহিত হইয়া বান্দা পূর্বাপেক্ষাও প্রচণ্ডতার সহিত পুনরায় তাহার বর্বরতার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। এই যুদ্ধের কিছুকাল পরে সরহিন্দের ফওজদার বায়েজিদ খাঁ বান্দার নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ পাইয়া মাঝামাঝি পথে তাঁহার সম্মুখীন হওয়াই ভাল মনে করিলেন। সেখানে প্রাচীরের বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থানকালে একদা অপরাহ্নে তিনি একটা নিজস্ব তাঁবুতে গমন করিলেন। সেখানে তিনি যখন একটা ক্ষুদ্র জমাতের সহিত আসরের নামাজ আদায় করিতেছিলেন, তখন নির্ভীক হাসান আল সাবাহ্‌র অনুরক্ত তরুণদের ন্যায় একজন শিখ দেওয়ালের নীচে হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে ঢুকিল এবং তিনি যখন সিজদা দিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে মারাত্মকরূপে ছোরার আঘাত করিল। ইহাতে যে বিশৃঙ্খলা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হইল, সেই ফাঁকে লোকটি অক্ষত দেহে তাহার ভ্রাতৃবর্গের নিকট ফিরিয়া গেল। এই সংবাদ অচিরে রাজধানীতে পৌঁছিলে বাদশাহ্ কাশ্মীরের তুরানী সুবাদার আবদুস সামাদ খাঁর প্রতি ঐ দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার আদেশ দান করিলেন। তিনি তাঁহার দেশের কয়েক হাজার লোক পুষিতেন। তাঁহাকে এই অভিযানে উৎসাহিত করার জন্য বাদশাহ তাঁহার পুত্র জাকারিয়া খাঁর নামে লাহোরের শাসন কর্তৃত্বের সনদ পাঠাইলেন। এই সেনাপতি এই সময় হইতে অত্যন্ত বিখ্যাত হন। স্বজাতীয় কয়েক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ভিন্ন কমরুদ্দীন খাঁ, মুহম্মদ আমীন খাঁ ও আমীর খাঁ প্রভৃতি সর্বোচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন সেনাপতি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের নিজস্ব সৈন্যদল ছিল, তৎসঙ্গে বাদশাহ ওয়ালাশাহী, আহাদী প্রভৃতি কয়েকটি স্বকীয় দেহরক্ষী দলও যোগ করিয়া দিলেন।

আবদুস সামাদ খাঁ শুধু এক সারি কামানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সৈন্যেরা শহরে ছাউনি ফেলিয়া রহিল। এরূপ সাহায্যকারী সৈন্য পাইয়া তিনি ক্রীতদাস আরিফ খাঁকে কাশ্মীরে নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া

শিবিরস্থ সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া বর্বরদের খোঁজে যাত্রা করিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট বাহিনীতে তাঁহার নিজের দেশের কয়েক হাজার লোকও ছিল। এ সকল সৈন্য এত প্রচণ্ড বেগে ঐ সমুদয় বন্য পশুর উপর আপতিত হইল এবং এত নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের সহিত পুনঃ পুনঃ আক্রমণ চালাইল যে, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া অনুপরমাণুতে পরিণত করিল। তাহাদিগকে একেবারে খতম না করা পর্যন্ত সেনাপতি কিছুতেই তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করিলেন না। সেই দুর্বৃত্ত বান্দা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া স্বস্থানে অটল রহিলেন এবং প্রথম যুদ্ধে এত বীরত্বের সহিত লড়াই করিলেন যে, বাদশাহী সেনাপতির প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়ার উপক্রম হইল। পরাজিত এবং জোরেশোরে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াও অরণ্যের অসভ্য লোকেরা যেমন এক ঝোঁপ হইতে অন্য ঝোঁপে গমন করে—তিনিও তেমনি এক আড্ডা হইতে অন্য আড্ডায় গমন করিতেন। ইহাতে তাঁহার অসংখ্য লোক নিহত হয়, তিনিও তাঁহার অনুসরণকারীদের যথেষ্ট ক্ষতি করেন। অবশেষে অবিশ্রান্ত পশ্চাদ্ধাবনে ক্লান্ত হইয়া তিনি গুরুদাসপুরে প্রস্থান করিলেন, উহা ছিল ঐ সমুদয় বর্বরের অধিকাংশেরই জন্মভূমি। সেখানে তাহাদের সর্দার দীর্ঘকাল পূর্বে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, অভিযানের সময় তাহারা যেসকল লুণ্ঠিত দ্রব্য পাইত, তৎসহ তাহাদের স্ত্রী-পরিবার তাহারা সেখানেই রাখিত। বাদশাহের সেনাপতি তৎক্ষণাৎ ইহা অবরোধ করিলেন। কিন্তু যতলোক দলে দলে ক্রমান্বয়ে ভিতরে গমন করে, তাহাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অধিক, অবরোধকারীরাও এত সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছিল যে, এক গাছা তৃণ বা এক দানা শস্যও ভিতরে যাওয়ার পথ পাইল না। বহুদিন ধরিয়া অবরোধ চলায় অবশেষে ভিতরের ভাণ্ডারের দ্রব্যজাত ফুরাইয়া গেলে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে দুর্ভিক্ষের ধ্বংসক্রিয়ার সূচনা হইল। তাহারা গাধা, ঘোড়া, এমনকি বলদ পর্যন্ত আহার করিল। অবিশ্বাস্য হইলেও এমন কি গাভী পর্যন্ত তাহাদের উদরস্থ হইল। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ সকল বন্য পশুর বিদ্বেষ এত অধিক এবং তাহারা যাহা পাওয়ার উপযুক্ত, তৎসম্বন্ধে তাহারা এত সজ্ঞান ছিল যে, তাহাদের একজনও আত্মসমর্পণের কথা মুখে আনিতে চাইল না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভক্তিভাজন হইতে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত জন্তু সব

কিছুই ইতিপূর্বেই খাদ্যে পরিণত ও ভক্ষিত হওয়ায় রক্তপাতঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিল। ইহাতে ঝাঁকে ঝাঁকে লোকের মৃত্যু ঘটিলে জীবিতেরা দয়া ভিক্ষা চাহিল এবং দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিল। বাদশাহী সেনাপতি একটা উচ্চভূমিতে এক জোড়া পতাকা পুতিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে সেখানে গিয়া তাহাদের অস্ত্র ও পোশাক জমা রাখিয়া তৎপরে তাঁহার শিবিরে গমন করিতে আদেশ করিলেন। এই আদেশে আদৌ কোন ভাবী মঙ্গলের ইঙ্গিত না থাকিলেও অনাহারক্লিষ্ট হতভাগারা তাহাদের সর্বশেষ ফিকিরে উপনীত পশুর ন্যায় যথাযথরূপে তাহা প্রতিপালনে বাধ্য হইল। তখন তাহাদের হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার মোগল বা তাতার সৈন্যদের হস্তে অর্পণ করা হইল। তাহারা তাহাদিগকে তাহাদের প্রাচীরের নিম্নে প্রবাহিত নদীর ধারে নিয়া সকলকে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত করিয়া দেহগুলি নদীতে নিক্ষেপ করার আদেশ পাইল। কর্মচারী ও প্রধান ব্যক্তিগণকে পঙ্গু, ক্লান্ত ও ক্ষতযুক্ত গাধা ও উটের পিঠে বসাইয়া প্রত্যেকের মাথায় একটা কাগজের টুপি পরাইয়া একত্রে যাত্রা করার আদেশ প্রদত্ত হইল। এরূপ অনুচরবর্গ লইয়া সেনাপতি লাহোর নগরে প্রবেশ করিলেন, সেখানে পৌঁছিতে তাঁহার অল্প কয়েকদিন লাগিল। বায়েজিদ খাঁর মাতা ছিলেন এক বৃদ্ধা তুরাণী মহিলা। ঘটনাক্রমে তিনি তখন ঐ শহরে বাস করিতে ছিলেন। সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার পুত্র-হন্তা ঐ বন্দীদের মধ্যে আছে জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার অনুচরবর্গকে বলিলেন, "লোকটাকে আমায় দেখাইয়া দিও।" এরূপ দুঃসাহসিক কার্যের দরুন লোকটি তাহার সহকর্মীদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহাদের দ্বারা রাজসিংহ এই ব্যঙ্গনামে অভিহিত হইয়া সে একটি গণ্যমান্য পদে উন্নীত হয়। বৃদ্ধা মহিলাটি পূর্বাহ্নে একখানা বৃহৎ প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন এবং রাস্তার উপরস্থ একটি সমতল ছাদের উপরে উঠিয়া প্রস্তরখানা সেখানে তোলাইয়া লইলেন ও (তিনি অন্ধ বলিয়া) শব্দ লক্ষ্য করিয়া উহা গড়াইয়া ফেলিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ উহা এমনভাবে পড়িল যে, লোকটা তৎক্ষণাৎ নিহত হইল। এই কার্যের পর বৃদ্ধা মহিলাটি বলিলেন, "প্রতিশোধ গ্রহণ করায় এখন আমি হৃষ্টচিত্তে মরিতে পারিব।" কিন্তু এই ব্যাপারকে সঙ্কেত বিবেচনায়

সেই শহরের লোকেরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেনাপতির মনে হইল, জনতার প্রকোপে সমস্ত বন্দী তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে। তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে মালপত্রের মধ্যে একটি নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়ার আদেশ দিলেন। সেখানে তাহাদিগকে হাতীর সঙ্গে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে পারে, এরূপ প্রত্যেকটি বস্তুর নিম্নে লুকাইয়া রাখা হইল। পরদিন প্রত্যুষে তিনি একই পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া নগরের বাহিরে গমন করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বাদশাহের নিকট তাহাদিগকে জীবন্ত উপহার দেওয়া। আরও সতর্কতার খাতিরে তাহাদিগকে কামরুদ্দীন খাঁ ও তাঁহার নিজ পুত্র জাকারিয়া খাঁর তত্ত্বাবধানে স্থাপন করিয়া একটি শক্তিশালী প্রহরীদলের পাহারায় রাজধানীতে প্রেরণ করা হইল। তাহারা সওয়ার হইলেও তাহাদের সম্মুখে বর্শাগ্রে কয়েকটি ছিন্ন মুণ্ড ছিল। তাহারা শহরে পৌঁছিবামাত্র বাদশাহ্ তাহাদিগকে ভিতরে আনয়নের আদেশ দিয়া মুহাম্মদ আমীন খাঁকে বাহিরে পাঠাইলেন। বান্দার মুখে কালি মাখাইয়া ও তাহার মাথায় একটি কাঠের টুপি পরাইয়া তাহাকে তাহাদের মধ্যে রাখিতে বলা হইল। সেই হতভাগাকে বাদশাহের হুজুরে হাজির করা হইলে তাহাকে দুর্গে নিয়া তাহার পুত্র ও দুই তিন জন প্রধান সেনানায়কসহ আটক রাখার আদেশ হইল। অন্যেরা প্রত্যহ একবারে একশত করিয়া কাযীর আদালতে নীত হইত, সেখানে তাহাদের সমস্ত লোক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত করা হইত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ফাঁসীর সময় তাহারা শান্ত ব্যবহার করিত, শুধু কে অগ্রে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিবে, তাহা লইয়া তাহাদের মধ্যে বাক্ বিতণ্ডা হইত, কেবল এই উদ্দেশ্যেই তাহারা জল্লাদের সহিত ভাব করিত, এইরূপে এক এক করিয়া এই হতভাগাদের গণনা শেষ হইলে এবং তাহাদের প্রত্যেকে এতকাল ধরিয়া যাহার উপযুক্ত, তাহা প্রাপ্ত হইলে খোদ বান্দাকে হাজির করা হইল। তাহার পুত্রকে তাহার কোলে বসাইয়া পিতাকে তাহার গলা কাটিতে বলা হইলে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর কাযীর আদালতের সন্নিধানে আনীত হইলে তিনি উত্তপ্ত চিমটি দ্বারা তাহার মাংস তুলিয়া লওয়ার আদেশ দিলেন। এইরূপ যাতনায় তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার পাপিষ্ঠ

আত্মা ঐ সকল ছিদ্রের একটি দিয়া তাহাকে যে অঞ্চলের অধিক উপযুক্ত মনে হয়, সেদিকে উড়িয়া গেল।

এরূপ বর্নিত হইয়াছে যে, মুহম্মদ আমীন খাঁ কৌতুহলবশে নিকটে আসিয়া লোকটির দিকে চাহিয়া তাহার চেহারার আভিজাত্যে আবাক হইয়া যান। এইরূপ চেহারায় আশ্চর্যম্বিত হইয়া তিনি সেই হতভাগা লোকটিকে এই কথা-গুলি না বলিয়া পারেন নাই। তিনি বলেন, "যাহার চেহারায় এত সুক্ষ্মবুদ্ধি ও যাঁহার আচরণে এত অধিক মহত্ত্ব দৃষ্ট হয়, তিনি যে, যাহা তাহাকে ইহকালে ও পরকালে অব্যার্থরূপে ধ্বংস করিবে এবং যাহা পরিণামে তাহার এত যন্ত্রণাদায়ক পরিণতি আনয়ন করিয়াছে, তাহার মাথার উপর এরূপ অজস্র অপরাধ জমা করিবেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়।" লোকটি অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত এই সকল কথায় তাহার জবাব দিলেনঃ হুজুর, আমি আপনাকে বলিতেছি যে, মানুষ যখন ভ্রষ্ট ও দুষ্ট হইয়া ন্যায়পরায়ণতার পথ পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকার বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, তখন সর্বদেশে ও সর্বধর্মে এমন ঘটে যে আমার ন্যায় নরহন্তাই যার একমাত্র কাজ—যে জাতি সম্পূর্ণরূপে অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে শাসন করা। আল্লাহ্ কখনও সে জাতিকে শাস্তিদানে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু যখন শাস্তির মাত্রা পূর্ণ হয়, তখন কসাইয়ের কাজ ফুরাইয়া যায় ও তাহার উদ্দেশ্য শেষ হয়। তখন বিধাতার অমোঘ বিধান আপনার ন্যায় এরূপ পরাক্রান্ত লোক, যাহার কাজ হইল ঐ বর্বরকে ধৃত করিয়া শাস্তিদান তাহাকেও শাস্তি দানে কুণ্ঠিত হয় না।"

এই জালিমের ঔদ্ধত্য ও জুলুম এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল কেন? ইহা কি সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্র চাবুক নীরবে আঘাত হানে বলিয়াই নহে?

শিখদের সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় এইরূপে আমরা দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। তবে পাঠকদের জন্য ইহা আমাদের দায়িত্ব মনে হইয়াছিল। অতঃপর ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক যে, আমরা আমাদের ইতিহাসের মূল বক্তব্য বিষয়ে ফিরিয়া যাইব। দরবারে কলহ-বিবাদ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক আকার ধারণ করায় এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে অমঙ্গলের পূর্বসূচনা করে বলিয়া বোধ হওয়ায় ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। কিরূপে

দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদমান দলের মধ্যে স্থির হয় যে, আমীর জুমলা দরবার ত্যাগ করিলে হুসায়ন আলী খাঁ দাক্ষিণাত্যে তাঁহার চাকরীতে গমন করিবেন এবং কিরূপে কোন বিশেষ কারণে তাঁহার যাত্রায় বিলম্ব ঘটে, ইতঃপূর্বেই তাহা বিবৃত হইয়াছে, অবশেষে তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে সুবাদার সেখানে যাত্রা করিলেন কিন্তু তৎপূর্বে দরবারে গিয়া বাদশাহ্ ও তাঁহার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদিগকে খোলাখুলি বলিলেন: তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লার কোন ক্ষতির চেষ্টা করা হইলে শাহান শাহ্ নিশ্চিত জানিয়া রাখিতে পারেন যে, ঊর্ধ্বপক্ষে বিশদিনের মধ্যে তিনি রাজধানীতে অবস্থানের উদ্দেশ্যে সব কিছু ত্যাগ করিবেন। সুবাদার নিজেকে কত শক্তিশালী মনে করেন, এই ভীতি প্রদর্শন দ্বারা বাদশাহের নিকট শুধু তাহাই প্রমাণিত হইল। কাজেই তাঁহার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই মন্ত্রীরা গুজরাটের শাসনকর্তা দায়ুদ খাঁর নিকট পত্রের পর পত্র লিখিতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন একটা বিখ্যাত বংশের আফগান, তাঁহার বিপুল দৈহিক শক্তি ও বীরজনোচিত সাহসের দরুন তিনি ঐ সকল দক্ষিণী প্রদেশে অতি উচ্চ খ্যাতি লাভ করেন; সে অঞ্চলের সর্বত্র তাঁহাকে ভক্তি করা হইত; মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজণ্যবর্গ ও সেনাপতিরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে নিরীক্ষণ করিতেন। ঐ সকল পত্রে তাঁহার বর্তমান পদের সহিত তাঁহাকে বুরহানপুরের শাসনকর্তার পদেও নিয়োগনামা প্রেরিত হয় এবং ইহা দাক্ষিণাত্যের রাজপথে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে সেখানে গিয়া তাঁহার আয়ত্তাধীন যে কোন উপায়ে হুসায়ন আলী-খাঁ ও তাঁহার সৈন্যগণকে ধ্বংসের আদেশ প্রদত্ত হয়। ইহাও বলা হয় যে, এভাবে ঐ সুবাদারী খালি হইলে তিনি স্বতঃই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। দায়ুদ খাঁ শত্রুকে হিসাবে ধরিতেন না বলিলেই হয়। এই সকল উপদেশ পাইয়া তিনি বুরহান পুরে গমন করিয়া নিঃসঙ্কোচে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের যাবতীয় মর্যাদা গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদ অচিরে হুসায়ন আলী খাঁর নিকট নীত হইলে তিনি ঐ আফগানকে লিখিলেন, "যেহেতু হুসায়ন আলী খাঁ বাস্তবিকই সুবাদারিতে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহার—দায়ুদ খাঁ পনীর উচিত তাঁহার উপরস্থ কর্মচারীকে সম্মান দেখাইতে আসা এবং

তিনি যে তাঁহার আদেশ পালনে প্রস্তুত, তাহা প্রমাণিত করা নতুবা তাঁহার উচিত ঐ সকল বিদ্রোহী জনপদে এরূপ অসঙ্গত দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া এবং শুধু অশান্তি ও কলহে পরিণতি লাভ করিতে পারে, এরূপ কার্যের জন্য নিজেকে অপরাধী না করিয়া বরং তৎক্ষণাৎ বাদশাহের দরবারে গমন করা।" এই পত্র দায়ুদ খাঁর উপর বিন্দুমাত্রও ক্রিয়া করিল না। তিনি প্রবল উদ্যমে বাধা দানে সম্পূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বুরহানপুর ত্যাগ করিয়া ময়দানে ছাউনী ফেলিলেন। কয়েকজন মারাঠা সেনাপতি বাহাদুর শাহের আমলে পঞ্চ-হাজারী, হপ্ত-হাজারী প্রভৃতি সম্মানজনক ও লাভজনক পদমর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত হইয়া রাজকর্মচারী নিযুক্ত হন। তিনি এখন তাঁহাদিগকেও আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিম্ব সিন্ধিয়াই ছিলেন সর্বাপেক্ষা গণ্যমান্য। বেতনের পরিবর্তে তিনি সমগ্র আওরঙ্গাবাদ রাজ্য ভোগ করিতেন। ইহাদের সকলেই আসিয়া শিবির গাড়িয়া ২৫শে রমযান পর্যন্ত দায়ুদ খাঁর সহিত অবস্থান করিলেন। হুসায়ন আলী খাঁ সেদিন ২৬,০০০ অশ্বারোহী লইয়া সেখানে হাজির হইলেন; কেবল ইহারাই তাঁহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া আসিতে সমর্থ হয়, কিন্তু তাহাদের সকলেই ছিল তাঁহার পরিচালনায় সফলতা ও জয়লাভে অভ্যস্ত প্রবীণ সৈনিক। ইহা ঘটে ফর্‌রুখ সিয়ারের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে, শত্রুকে নজরে পড়ে, এমনস্থানে পৌঁছিয়া সুবাদার সেই গর্বিত অপরিণামদর্শী আফগানকে সংশোধন করার জন্য কয়েকটি নিতান্ত প্রলোভনজনক সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু সমস্ত কিছুতে তাঁহাকে অমনোযোগী দেখিয়া কিরূপে তাঁহাকে বলে বশীভূত করিবেন, ইহাই হইল তাঁহার একমাত্র চিন্তা। কাজেই তিনি তাঁহার সৈন্যদের দ্বারা ব্যূহরচনা করিয়া হাতীপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ শত্রুর দিকে ধাবিত হইলেন। দায়ুদ খাঁও নিজের তরফে তাহাই করিলেন, একদল আফগান তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত হইল, তাহাদের সকলেই ছিল তাঁহার স্বদেশবাসী এবং প্রত্যেকেই আপনাকে রুস্তমের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিত। যুদ্ধে একগুঁয়ে ও শোণিত ক্ষয়কারী বলিয়া প্রমাণিত হইল। উভয়পক্ষের বীরপুরুষেরা কিয়ামতের দিনের ন্যায় ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া সম্মুখে ছুটিয়া চলিল। কিরূপে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী লোককে যুদ্ধে নিরত করিবে, তা ভিন্ন আর কোন কিছুর প্রতিই তাহাদের

খেয়াল ছিল না। মুহূর্তে মস্তক বৃষ্টি আরম্ভ হইল, এগুলি উত্তোলিত করবাল দ্বারা উত্থিত মেঘমালা হইতে শিলার ন্যায় ভূপাতিত হইতে লাগিল। এত প্রচণ্ড বীরদের হাত হইতে নির্গত শোণিত স্রোত শুষ্ক ও তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিল। কঠিন রক্তাক্ত ভূমি সেদিন এযাবৎ আরাম ও সুখাস্ত খাদ্যে অভ্যস্ত কত লোকের বিছানা হইল। ডাঁটার উপর অবস্থিত পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাবের ন্যায় কত রক্তাক্ত মস্তক বর্শাগ্র রঞ্জিত করিল। মুহুর্মুহু কামান গর্জনে নিরন্তর কম্পমান গুরুভার পৃথিবী আকাশের ন্যায় চলৎশক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হইল। পক্ষান্তরে এত অধিক শোণিত-পিপাসু যোদ্ধার উপস্থিতিতে খোদ ধরিত্রী অকস্মাৎ গতিরোধ করিয়া ভারী মৃত্তিকার চাকার ন্যায় গতিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দূর হইতে হুসায়ন আলী খাঁকে দেখিতে পাইবামাত্র দায়ুদ খাঁ তাঁহার মাহুতকে আদেশ দান করিলেন। হীরামন নামক জনৈক সাহসী হিন্দু আফগান বাহিনীর অগ্রগামী সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি শত্রুপক্ষের কামানরাজি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া বিরাট হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিয়া দেন, কিন্তু বারের একদল সায়্যিদ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল; তাঁহার প্রত্যেকটি অনুচর তাহাদের হস্তে নিহত বা আহত হইল, তিনি নিজেও তাহাদের ক্ষুধার্ত তরবারির খোরাকে পরিণত হইলেন। কিন্তু এই ক্ষতিতে দায়ুদ খাঁর মতলবের কোন পরিবর্তন ঘটিল না, তাঁহারই ন্যায় আরূঢ় একদল কর্মচারী লইয়া তিনি উৎসাহভরে সম্মুখে ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কুরআন শরীফে উল্লিখিত ত্রাস-সঞ্চারকারী ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার ভয়াবহ মূর্তি উর্ধ্বে শোভা পাইতে লাগিল। তিনি সর্বত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। রণ কুঠারধারী ৩০০ বলিষ্ঠ আফগান তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া পথে যাহা কিছু পাইল, তাহাই খণ্ড-বিখণ্ড করিতে লাগিল। এই দুর্ধর্ষ সৈন্যদল শত্রু ব্যূহে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। সুবাদারের সৈন্যদলের সর্বাপেক্ষা সাহসী সৈনিক, তাঁহার গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি মুহম্মদ ইউসুফ এবং রুস্তম বেগ ও বসালত খাঁ এখানেই নিহত হইলেন। শেষোক্ত দুইজন তখন তাঁহাদের সৈন্যচালনা করিতেছিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুহস্তে কর্তিত হইয়া তাঁহারা এখন তাঁহাদের শোণিত স্রোতে প্রভুর ঋণ পরিশোধ করিলেন। খান জমান

ও কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিসহ আলম আলী খাঁ এখানেই গুরুতররূপে আহত হইলেন। আফগানেরা যখন এরূপ নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল, তখন দায়ূদ খাঁ অবশেষে মীর মুশর্‌রফের সম্মুখীন হইলেন। তিনি ছিলেন হুসায়ন আলী খাঁর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট একজন প্রবীণ সেনাপতি। আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত থাকায় তাঁহাকে পিঞ্জিরা-বদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। দায়ূদ খাঁ তাহাকে সুবাদার ভ্রমে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে এবং কেনই বা তিনি "রমণীর ন্যায় পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন।" "জনাব, আপনার মুখোস খুলিয়া ফেলুন, যেন আমি চিনিতে পারি—আপনি কে?" আফগানেরা যুদ্ধের দিনে একটি মাত্র মসলিনের জামা ব্যতিরেকে আর কিছুই পরিধান করে না, তজ্জন্য দায়ূদ খাঁ অবজ্ঞাভরে একথা বলিলেন। বলিয়াই তিনি ধনুকে তীর জুড়িয়া মীর মুশর্‌রফের ঘাড়ে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। ঐ কর্মচারীটি ভীষণ যন্ত্রণা ও রক্তপাতের দরুন অজ্ঞান হইয়া তাহার হাওদা হইতে পড়িয়া গেলেন, এক হাত দ্বারা তিনি কোনরূপে উহা ধরিয়া রহিলেন। এই অবস্থায় দায়ূদ খাঁর মাহুত তাহার অঙ্কুশ দ্বারা তাঁহার পিঠে এমন জোড়ে দুই, তিনটা আঘাত করিল যে, ঐ আমীর বাকী জীবনে তাহা ভুলিতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর পরে এই সমুদয় ব্যাপার স্মরণ হইলে তিনি তাহার পিঠে হাত না বুলাইয়া এবং একথা না বলিয়া পারেন নাই যে, আঘাতগুলি ছিল বাস্তবিকই কঠিন এবং তিনি তখনও তাহা অনুভব করিতেছেন। যখন এই ভয়াবহ কাণ্ড চলিতেছিল, মীর মুশর্‌রফের মাহুত সেই সুযোগে দুইটি জন্তুকে পৃথক করিয়া ফেলিল। তিনি তখনও হাওদা ধরিয়া ঝুলিয়া থাকায় সমগ্র সৈন্যদলে সংবাদ রটিল যে, তিনি নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদে আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইল মাত্র। আফগান বীর এখন হুসায়ন আলী খাঁর হস্তীর নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, ইহাতে লোকে মনে করিল, সব শেষ। অনেকে ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, অন্যেরা নির্দ্বিধায় পলায়ন করিল। একটা গুরুতর পরাজয় ঘটিতে যাইতেছিল, একদল বিখ্যাত ব্যক্তি ভিন্ন অল্প লোকেই তাহাদের সেনাপতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে চাহিল। ইহারা কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করার চাইতে মৃত্যুবরণ করাই

স্থির করিল। ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বিশৃঙ্খলা কিয়ামতের দিনের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এমন সময় যেন জরুরী আদেশে একটা বন্দুকের গুলী দায়ুদ খাঁর কপালে লাগায় তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার জীবন ও যশের উষা চিরন্তন সন্ধ্যায় পরিণত হইল। মাহুত তাহার মনিবের মধ্যে জীবনের লক্ষণ নাই দেখিয়া তাহার হাতীটিকে উল্টোদিকে ঘুরাইয়া যাহারা পশ্চাদ্ধাবণকারীদের তরবারির ধার পরিহার করিতে চাহিল, তাহাদের সঙ্গে পালাইয়া গেল। এতদ্দর্শনে হুসায়ন আলী খাঁ জয়লাভ ও আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ সামরিক সঙ্গীত গাহিবার আদেশ দান করিলেন। আফগান বীরের হাতীর পিছনেও তিনি লোক পাঠাইলেন। তাহারা শীঘ্রই উহার নাগাল পাইল। তিনি তাহার লাশ ঐ জন্তুটির পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া সমগ্র বুরহানপুরের আস্তন্ত টানিয়া নেওয়ার হুকুম জারি করিলেন।

বিশ্বজী ও তাঁহার মারাঠা অশ্বারোহীদের সম্বন্ধে আমরা একটা কথাও বলি নাই, তাহাদের কি হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। উত্তর সংক্ষিপ্ত। প্রকৃত মারাঠার ন্যায় লোকটি যুদ্ধের প্রথমে চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়াই তৃপ্ত রহিল। তৎপরে যে কোন সাধারণ দর্শকের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। যখন দেখিল হুসায়ন আলী খাঁ জয়লাভ করিয়াছেন, তখন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া তাঁহাকে নজর দান করিল, তাঁহার সমস্ত কর্মচারীও তাহাই করিল। এদিকে তাঁহার মারাঠারা বলপূর্বক শত্রু (দায়ুদ খাঁর) শিবিরে ঢুকিয়া যাহা কিছু ধরিতে পারিল, তাহাই লুটিয়া আনিল। তথাপি বিজয়ীদলের জন্য অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য রহিয়া গেল, দায়ুদ খাঁর সমস্ত সাজ-সজ্জা, অর্থ, অশ্ব ও হাতী সুবাদারের ব্যবহারার্থে ধৃত করা হইল। ইহার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র তিনি মেহেরবানী করিয়া বাদশাহ্‌কে পাঠাইতে সম্মত হইলেন, তাহাও বহুদিন পরে।

আহ্‌মদাবাদে দায়ুদ খাঁ এক পত্নী রাখিয়া যান, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি ছিলেন সেই রাজ্যের এক হিন্দু জমিদারের কন্যা। সেখানে স্থায়ী আইন ছিল যে, কয়েকজন রাজাকে পদাসীন সুবাদারের করে কন্যা দান করিতে হইবে। এই মহিলাটিকে হেরেমে প্রবেশের সময় ইসলামে দীক্ষিত করা হয়। এই সময় তিনি সাতমাসের গর্ভবতী ; স্বামীর

সঙ্গে গমনের জন্য তিনি তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করেন। যুদ্ধ-যাত্রার প্রাক্কালে দায়ুদ খাঁ তাঁহাকে তাঁহার প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ একখানা তীক্ষ্ণধার ছোরা উপহার দিয়া যান। জয়লাভের মুহূর্তে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ এখন আহমদাবাদে পৌঁছিল। মহিলাটি ঐ ছোরাখানা লইয়া এত সতর্কতা ও নিপুণতার সহিত নিজের তলপেট ফাঁড়িয়া ফেলিলেন যে, প্রত্যেকেই বিস্মিত হইয়া গেল। অতঃপর তিনি সযত্নে শিশুটিকে বাহির করিয়া উপস্থিত মহিলাগণকে তাহার যত্ন গ্রহণের জন্য স্নেহভরে অনুরোধ করিলেন; দুই একটা কথা বলার পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

এই জয়লাভের সংবাদ এখন রাজধানীতে পৌঁছিল। লক্ষ্য করা গেল যে, বাদশাহ নিজের উদ্বেগ ও দুঃখ গোপন রাখিতে পারিলেন না। এমনকি তিনি উজীর আবদুল্লাহ খাঁর সাক্ষাতেই বলিয়া উঠিলেন, দায়ুদ খাঁর ন্যায় এমন একজন বীরপুরুষের মৃত্যু নিতান্ত শোচনীয় দুঃখের বিষয়। তিনি আরও বলিলেন, "তাঁহার সহিত অনুচিত ব্যবহার করা হইয়াছে।" উজীর এই কথাটা বুঝিয়া লুফিয়া লইয়া বলিলেন, "ঐ অসভ্য আফগানের হস্তে আমার ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, আমার মনে হয় তাহা খুব সঙ্গত বোধ হইত এবং হুজুরের নিকট অধিকতর পছন্দনীয় হইত।"

বাদশাহ ও উজীরের মধ্যে কথোপকথন এত অধিক রুক্ষতা দ্বারা দূষিত হইলে ব্যাপার কত দূর গড়াইতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এই কথাবার্তার অব্যবহিত পরে সংঘটিত দুইটি ঘটনা দ্বারা অচিরে ইহার পরীক্ষা হইয়া গেল। এগুলি হইল একদল উৎকৃষ্ট সৈন্যের আকস্মিক বরখাস্ত। বাদশাহ উচ্চ বেতনে মাসিক ৪০ টাকা হইতে ৯০০ টাকা বেতনে তাহাদিগকে সংগ্রহ করার আদেশ দেন। এই বেতন খালসা জমি বা জায়গীরের উপর বরাদ্দ করা হয়, এই প্রত্যাশায় তাহাদিগকে নগদ আরও ৫০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়। কিন্তু ঐ চাকুরী সৃষ্টির পর ইতঃপূর্বেই ১২ মাস অতিবাহিত হইয়া যায়, অথচ তাহারা এযাবৎ কিছুই স্পর্শ করে নাই। এমন সময় অকস্মাৎ ঐ দল ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদিগকে জবাব দেওয়া হইল। তাহাদের বখ্শীদিগকে বলা হইল, বর্তমানে রাজকোষে কোন টাকা নাই। দ্বিতীয় ঘটনা হইল—আজীমাবাদ হইতে আমীর জুমলার

আকস্মিক আগমন। সেখানে তাঁহার সুবাদারীর স্থায়ী সৈন্যদল ছাড়াও তিনি বিরাট একদল মোগল ও বৈদেশিক সৈন্য সংগ্রহ করেন। দেশটি তিনি অত্যন্ত মন্দরূপে শাসন করেন ; কাজেই উহার রাজস্ব দ্বারা ঐ সকল অতিরিক্ত সৈন্যের ব্যয়নির্বাহ করা সম্ভবপর হইল না। অগত্যা তাহারা সমতলভূমি লুণ্ঠন করিয়া, এমনকি উহার রাজধানীতেও জুলুমবাজি করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করিল। রাজধানীতে তাহারা গরীব ও আমীর সকলের উপরই একটা চাঁদা বসাইল। এবম্বিধ বিপুল বিশৃঙ্খলার দরুন আমীর জুমলার শাসন সার্বজনীনভাবে ঘৃণিত না হইয়া পারিল না। কিন্তু তিনি নিতান্ত অমিতব্যয়িতার সহিত সরকারী অর্থ উড়াইয়া দেওয়ায় ঐ লোকগুলির ঔদ্ধত্য দমনের জন্য তাঁহার আর কোনই ক্ষমতা রহিল না। তাহারা এমনকি তাঁহার দেহে হস্তার্পণ করার ধমক দেওয়ায় তিনি মনে করিলেন, হঁা, একটি কৌশল তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারে। রমণীবহনের জন্য যে সকল পর্দাবৃত কুর্সী ব্যবহৃত হয়, তিনি তাহার একটিতে বসিয়া একদা দিল্লীর দিকে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট বন্ধু বা নিম্নশ্রেণীর ভৃত্যরাও ইহার আভাস পাইল না। আতঙ্ক তাঁহার পলায়নে পাখা সংযোগ করায় সেখানে পৌঁছিতে তাঁহার পনর দিন মাত্র লাগিল। এক অন্ধকার রাত্রির ঠিক মধ্যভাগে কবর হইতে উত্থিত প্রেতাত্মার ন্যায় তিনি হঠাৎ প্রাসাদের দ্বারে হাজির হইলেন। এমন সময় তিনি আসিলেন যখন শহরের সর্বত্র ভয়ঙ্কর সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মনে হইল যেন উজীরকে হত্যা করার পরিকল্পনা বাস্তবিকই কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইতেছিল। প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ্ এই সময় দুই ভ্রাতার বিরুদ্ধে বদ্ধমূল ঘৃণা পোষণ করিতেছিলেন বলিয়া এক জনরব উঠিল যে, আমীর জুমলাকে গোপনে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তবে এতটুকু সত্য যে, দরবারে হাজির হইলে শাসনকর্তা বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিলেন। তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে জগতে যে মন্দ ধারণা জন্মিয়াছিল, এই অভ্যর্থনার ফলে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল মাত্র। ফলে তিনি এখন আবদুল্লাহ খাঁর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার অন্তরঙ্গতা কামনা করিতে লাগিলেন। ইহার কারণ স্বরূপ তিনি বলিলেন যে, এখন হইতে তিনি একমাত্র তাঁহার পরিবারেরই অনুরক্ত হইবেন।

কিন্তু জনসাধারণ এই সকল প্রতিশ্রুতিকে প্রতারণা, এমনকি উজীরকে ধৃত করার সম্মিলিত ফন্দী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। যে আট হাজার সৈন্যকে অকস্মাৎ জবাব দেওয়া হয়, তাহারা ব্যতীত বিপুল সংখ্যক মোগল ও অন্যান্য বরখাস্ত সৈন্য আজীমাবাদ হইতে প্রত্যহ দলে দলে (রাজধানীতে) আসিয়া অশ্বারোহণে সশস্ত্র অবস্থায় রাস্তার চারিধারে টহল দিতে লাগিল। প্রধান বখশী মুহম্মদ আমীন খাঁ, আমীর জুমলা ও খান দুরানের প্রসাদেই তাহাদের আনাগোনা ছিল অধিক। এমনকি এমনও সন্দেহ হইতে লাগিল যে, এ সমস্ত কেবল উজীরকে বেষ্টন করার কৌশল বই আর কিছুই নহে। তাহারা প্রত্যেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক করিল যে, অকস্মাৎ তাঁহার প্রাসাদে আপতিত হওয়া ভিন্ন এসকল কৌশলের আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। আবদুল্লাহ্‌ খাঁ নিজেও পরিণামে এরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। এখন আতঙ্কে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তিনি তাঁহার বাড়ী ও বাসাতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার ও কিছু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিবার আদেশ দান করিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় খয়রাত খাঁ নার্নুলের ফওজদার নিযুক্ত হইয়া দখল লওয়ার জন্য এক বিরাট বাহিনীসহ নগরের বাহিরে গমন করেন। এই সকল গোলমালের কথা শুনিতে পাইয়া শীঘ্রই তিনি (রাজধানীতে) ফিরিয়া আসিলেন; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সঙ্গে যে সকল সৈন্য ছিল তদ্ভিন্ন পথে তিনি আরও কিছু নূতন সৈন্য সংগ্রহ করেন। বারের সায়্যিদেরা উজীরকে কেবল তাঁহাদের স্বদেশবাসী নহে, আত্মীয় বলিয়াও মনে করিতেন। কাজেই তিনি শত্রুহস্তে বিপন্ন হইয়াছেন শ্রবণ করিয়াই তাহাদের একটা বিরাট দল শহরে সমবেত হয়। এ সমুদয় লইয়া তিনি (খয়রাত খাঁ) উজিরের প্রাসাদের চতুষ্পার্শে তাঁহার বাসা লইলেন। আবদুল্লাহ্‌ খাঁর বন্ধুরাও তাঁহার গৃহে বা উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিজেদের সুরক্ষিত করেন। সর্বত্র এত আতঙ্ক বিস্তৃত ও এত আশঙ্কা অনুভূত হয় যে, তাঁহারা হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়া সশস্ত্র অবস্থায় সারাদিন ও সারারাত কাটাইতে লাগিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে বরখাস্ত সৈন্য এখন সশস্ত্র ও আরূঢ় অবস্থায় প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান রাস্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহাই এরূপ সতর্কতার প্রধান কারণ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ অবিশ্বাস ও বিশৃঙ্খলার সময় আমীর জুমলা নিজের

নির্বোধ ব্যবহারে আপনাকে কেবল বিরক্তিকর নহে—ঘৃণিত ও হাস্যাস্পদ করার পর কিরূপে নিজের নিরাপত্তা বিধান করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া মুহম্মদ আমীন খাঁর গৃহে আশ্রয় গ্রহণই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। এবম্বিধ নীচাশয় আচরণের পরে এবং দেহ-মনের এত হীন অবস্থায়ও তিনি বিজয়ী হুসায়ন আলী খাঁ, সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড উজীর আবদুল্লাহ্ খাঁ ও বিগত আমীরুল ওমরা যুলফিকার খাঁ প্রভৃতি শক্তিশালী লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার, এমনকি রাষ্ট্রে তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া উঠিবার চিন্তা পোষণ করিতেন। বাদশাহ নিজের অক্ষমতা ও আমীর জুমলার অযোগ্যতা বুঝিতে পারিতেন। নিজের অন্তর্জাত চিত্ত-চাঞ্চল্যের দরুণ ইতঃপূর্বেই তিনি এই সকল আলোড়ন ও প্রস্তুতিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সমুদয় আন্দোলন ও অশান্তির মধ্যে তিনি আমীর জুমলাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ব্যাপারের উপর যবনিকাপাত করিতে চাহিলেন। তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমি মূলতানে গমনের জন্য বিদায় দেওয়া হইল এবং সরবুলন্দ খাঁ তাঁহার আজীমাবাদ (পাটনার) সুবাদারিতে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এইসব অনুতাপ ও এই সমুদয় পরিবর্তন সূক্ষ্মদর্শী লোকদের কাহারও মনে কোন আস্থা উৎপাদনে সমর্থ হইল না। বাদশাহ শিকারে বাহির হইলে, কিম্বা তাঁহার গৃহস্থালীতে সামান্য মাত্র নড়াচড়া পরিলক্ষিত হইলেও তৎক্ষণাৎ সংবাদ রটিত যে উজীর গ্রেফতার হইয়াছেন। ইহার পরেও যদি ঐ মন্ত্রী সৈন্য সংগ্রহ করিতে ও আত্মরক্ষার জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হইতে থাকেন, তবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। এত অশান্তি ও বিরোধের জন্য বিখ্যাত এই বৎসরটি আওরঙ্গযীবের দীর্ঘকালের উজীর, রাষ্ট্রের সুবিজ্ঞ শাসক, শ্রদ্ধেয় আসাদ খাঁর মৃত্যুর জন্যও স্মরণীয়। ৯৫ বৎসর ধার্মিক ও কৃতিত্বপূর্ণ জীবন পূর্ণ করার পর তিনি অনন্ত করুণা সৌধে গমন করেন। ইহা ফর্‌রুখ সিয়ারের রাজত্বের ৬ষ্ঠ বৎসর ও হিজরী ১১২৯ সন। হিন্দুস্তানের যে সকল বুনিয়াদী শরীফ সাম্রাজ্যের অধিক সম্মান বৃদ্ধি করেন, তাঁহাকে তাঁহাদের মোহর ও সর্বশেষ সদস্য বলা যাইতে পারে। যেসকল গুণে প্রকাশ্য জীবন যেমন বিখ্যাত, গার্হস্থ্য জীবনও তেমনি কমনীয় হয়, তিনি তাহার প্রত্যেকটিতে বিভূষিত ছিলেন। তিনি এত প্রশংসনীয় মেজাজ ও এত ভালবাসা-প্রবণ সদয় প্রকৃতির লোক ছিলেন

যে, অদ্যাপি প্রত্যেকে আদবের সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। হালের দরবারসমূহের কোন আমীরের নিকট কখনও হীনতা স্বীকার না করিয়া এবং সাম্রাজ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বীয় অসীম প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মর্যাদা ও আড়ম্বরের সহিত বাস করেন। বন্ধু বা অপরিচিত যে কেহ তাঁহার নিকট আসিত, তিনি তাহাকে তাঁহার সাধু চরিত্র ও অর্থ দ্বারা বাধিত করিতে কখনও বিরত হন নাই। ইহাতে সমসাময়িক ব্যক্তিরা যেমন উপকৃত, তিনিও তেমনি অমর খ্যাতির অধিকারী হন। "গুণ বা দোষ, আমরা যাহা কবরে লইয়া যাইতে পারি—উহাই সব, যিনি গুণের খুশবুসিক্ত হইয়া সেখানে গমন করিতে পারেন, তিনিই সুখী। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁহার আত্মার প্রতি সদয় হউন। —আমীন।"

ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, সেই শ্রদ্ধাস্পদ সর্দারের প্রকৃত নাম ছিল ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার পুত্রের নাম ইসমাইল (আঃ)। তিনি ফর্‌রুখ সিয়ারের অন্যায় আদেশে তাঁহার রাজত্বের প্রথমে এত অবিচার ও এত অমানুষিকতার সহিত নিহত যুলফিকার খাঁ ভিন্ন আর কেহই নহেন। লোকে স্মরণ রাখিয়াছিল যে, পুত্র নূতন বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন। নিজের স্বাধীনতা রক্ষার সম্পূর্ণ সামর্থ্যও তাঁহার ছিল, কিন্তু পিতার অনুরোধ উপরোধে শান্ত এবং পিতার কর্তৃত্বের চাপে সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া তিনি বাধা দানের সমস্ত চিন্তা বিসর্জন দিয়া ফর্‌রুখ সিয়ারের বাসায় গমন করেন। তখন তৎসম্বন্ধে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী দুইটি ছত্র রচিত হয়; সেগুলি সংরক্ষণের যোগ্য ও নিম্নলিখিত রূপঃ

> "ইহার চক্ষু হইতে নির্গত শোণিতাশ্রুসহ সন্ধ্যার
> প্রতিধ্বনি পুনরায় বলিতেছে, দেখ! ইব্রাহীম তাহার
> ইসমাইলকে বলির পাথরের দিকে লইয়া যাইতেছে।"

বাদশাহের শাসনের প্রধান পাপ ছিল তিনি কখনও প্রকৃতি গুণ যাচাই করিতে পারিতেন না। এই শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া সেই অসহায় পরিবারকে পুনরায় তাহার শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ এখন তিনি ইহার মারাত্মক পরিণাম বুঝিতে পারিয়া নিজেই নিজের অবিমৃষ্যকারিতায়

বিস্ময় বোধ করিতেছিলেন। আসাদ খাঁ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এই সংবাদ পাইয়া তিনি একজন নামজাদা ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহার নামে নিজেকে নত করিলে বাদশাহ্ তাঁহাকে আদেশ দিলেন, আপনি আমার পক্ষে তাঁহাকে সান্ত্বনাসূচক দর্শন দান করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন, "ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা আপনার বিখ্যাত পরিবারের গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম না এবং এরূপ মারাত্মক অজ্ঞতার দরুন যাহা কখনও সংঘটিত হওয়া উচিত হয় নাই—এমন শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা এখন অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছি। কিন্তু এ সকল এত বিলম্বে আসিয়াছে যে, তাহাতে কোনই কায়দা হইবে না। এতদসত্ত্বেও মহোদয়ের উন্নত চরিত্র, বিশেষতঃ পরোপকার সম্পর্কে আমাদের এত উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছে যে, এবং আমাদের অবস্থার এমনি জরুরী গরজ যে, সায়্যিদদের সম্বন্ধে আমাদের কি কর্তব্য আপনি যদি এ বিষয়ে আমাদিগকে কিছু উপদেশ দানে অসম্মত না হন তবে আমরা বাধিত হইব।" শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ লোকটি মনোযোগের সহিত এই উক্তি শ্রবণ করিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, "আপনি একটা বিরাট ভুল করিয়াছেন, কিন্তু ইহাই ছিল নিঃসন্দেহে আমাদের ভাগ্য এবং আপনি স্বয়ং ভাগ্যের বাস্তব তাড়ণার বশীভূত ছিলেন। কিন্তু এখন আমার আশঙ্কা, প্রতিশোধের দিন সমুপস্থিত, আপনি পুরাপুরি ইহার পথে এবং আমার ভয় হয়, পাছে এই সমুদয় কলহ-বিবাদের ফলে তাইমুর বংশের সিংহাসনের স্তম্ভের নিম্নে ধ্বংস ও সর্বনাশ অতর্কিতে প্রবেশ করে। এখন আপনি যখন এত দুর্ভাগ্যজনক রূপে আপনার কর্তৃত্ব ও সাম্রাজ্য সায়্যিদদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তখন আর প্রত্যাবর্তনের সময় নাই। বরং তাঁহাদিগকে শান্ত ও সন্তুষ্ট রাখিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিবেন না। নতুবা এই সমুদয় বাদ-বিসম্বাদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া গুরুতর রকমের সমস্যার সৃষ্টি করিতে এবং আপনার স্বাধীনতার বল্গা সম্পূর্ণরূপে আপনার হাত হইতে খসিয়া পড়িবার মত দুর্দশা ভোগের জরুরী অবস্থার উদ্ভব ঘটাইতে পারে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

[তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাকারী সায়িদ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিপুল ক্ষমতায় ফর্‌রুখ সিয়ার চিন্তান্বিত হন। উজীর ও রাজস্ব মন্ত্রীর মধ্যে ভীষণ কলহ, বাদশাহ্ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ভাঙ্গন—মারাঠা কুন্দবিহারীর লুণ্ঠন ও সফলতা—সুবাদার ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন এগুলি খতম করার ভার গ্রহণ করেন—তাঁহার বিরুদ্ধে দরবার হইতে গোপনীয় আদেশ—মারাঠারা এই সকল বিবাদের সুযোগে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে দুই ভাগে কর ধার্য করে—কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার দরবারের প্রত্যেকটি আদেশ অগ্রাহ্য করেন—বাদশাহের প্রিয়পাত্র ও এখন হইতে ইতিমাদ খাঁ নামে অভিহিত সুবাদারের অভ্যুদয়—অস্বাভাবিক পাপে বাদশাহের দৃঢ় আসক্তি—সায়িদ ভ্রাতৃদ্বয়ের অতিরিক্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে তিনজন বিখ্যাত সেনাপতির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রস্তাব—বাদশাহের বিচিত্র উত্তর—তাঁহার ভীরুতা, দৃঢ়তার অভাব ও চঞ্চলতা—একদল সৈন্য লইয়া সুবাদারের দরবারে গমন, একজন বাদশাহের হাবভাব গ্রহণ—ফর্‌রুখ সিয়ারকে ভীতিপ্রদর্শন—একটা মর্মস্পর্শী কাহিনী—উজীরের অস্ত্রধারণ বিজয়ীবেশে তাঁহার ভ্রাতার রাজধানীতে প্রবেশ—উজীর কর্তৃক দুর্গ ও প্রাসাদ দুইটিরই দখল গ্রহণ—বাদশাহের পদচ্যুতি—জনতা কর্তৃক নগর মধ্যে একদিন মারাঠা অশ্বারোহী বিনাশ—বাদশাহের পক্ষভুক্ত লোক ও উজীরের ভক্তদের মধ্যে রাজপথে কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধ—শাহ্‌জাদা রফিউদ দরজাত বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষিত—তাঁহার ভ্রাতা উজীরের নিকট সুবাদারের ভয়ঙ্কর পত্র—অজস্র অপমানের সহিত ফর্‌রুখ সিয়ারকে বাদশাহী হেরেম হইতে টানিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ—উপস্থিত দুইজন বিখ্যাত সমসাময়িক গ্রন্থকার কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুর পদ্ধতি দুটি বিভিন্নরূপে বর্ণিত—উভয় ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক প্রাসাদের প্রত্যেকটি জিনিস অধিকার—যুবক রাজার মৃত্যু—তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রফীউদ্দৌলা তদীয় উত্তরাধিকারী হন—তৎপরে নিকোসিয়ার—ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক

রোশন আখতার, তখন হইতে মুহম্মদ শাহ বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষিত—কাশ্মীরে ভীষণ গোলযোগ—ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে নিজামুল মুলকের বিদ্রোহ—সৈন্য চালনার গুণে তাহাদের আত্মীয় ও পক্ষভুক্ত লোকদের বিরুদ্ধে তিনটি বিরাট যুদ্ধে জয় লাভ—দৌলতাবাদের জনৈক শাসনকর্তার মহৎ কর্মে—ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে দরবারে একটি ষড়যন্ত্র—গুপ্ত ঘাতকের হস্তে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু—তিরিশ ঘন্টাব্যাপী একটি খণ্ড যুদ্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরাজিত ও বন্দী—সিংহাসনে মুহাম্মদ শাহের দখল লাভ]

মরণোন্মুখ আমীরের উপদেশের চেয়ে বিজ্ঞতর আর কিছুই হইতে পারিত না; কিন্তু তাহা বাদশাহের মনে সাময়িক রেখাপাত করিল মাত্র, তিনি পূর্বের ন্যায়ই অবিবেচকতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার ওমারারা ছিলেন তাঁহারই ন্যায় অবিবেচক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাঁহাদের অবিশ্রান্ত তোষামোদে আত্মহারা হইয়া তিনি তাঁহাদের সুপারিশক্রমে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত নিম্নতর পদ ও চাকরী বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন পদের জন্য অনুরোধ করা মাত্রই সনদ লিখিত হইয়া তাহার করে অর্পিত হইত। ইহাতে প্রকৃত শাসনকর্তা হুসায়ন আলী খাঁ অত্যন্ত বিরক্তবোধ করিতেন। তিনি এই সমুদয় তরক্কীকে তাঁহার কর্তৃত্বের পক্ষে ক্ষতিজনক এমনকি, নিজের নিরাপত্তার পক্ষেও ক্ষতিকর বলিয়া মনে করিতেন। তরক্কীপ্রাপ্ত লোকগুলিকে মিষ্ট কথায়, এমনকি সময় সময় উপহাস করিয়া বিদায় দিয়া সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিজের হাতের লোককে নিযুক্ত করাই ছিল তাঁহার চিরন্তন প্রথা। এরূপ আচরণ দরবারে সীমাহীন মনঃপীড়ার কারণ না হইয়া পারিত না। অপর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ও অধিকতর ধর্মভীরু ছিলেন না। প্রভুর অসীম প্রভাবে গর্বিত হইয়া তাঁহার দেওয়ান রতনচাঁদ মুৎসুদ্দী বা বাদশাহের কর্মচারী ও ভৃত্যদিগকে পরওয়া না করিয়া খেয়াল খুশীমত বাদশাহী খাতাপত্রে অযথা হস্তক্ষেপ করিতেন। অথচ সেই সকল খাতাপত্র রাখা ছিল তাঁহাদেরই কর্তব্য। খালিসা দপতরের দিওয়ান ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রাজস্বমন্ত্রী বা অন্ততঃ প্রধান হিসাবরক্ষক ঃ এমনকি তিনিও নিছক শূন্যে বা আত্মাহীন দেহে পরিণত হন। রাজস্ব ও শাসন সংক্রান্ত প্রত্যেকটি বিষয় ঐ হিন্দু ভদ্রলোকের হাত ঘুরিয়া যাইত, কয়েক

ঘণ্টার মধ্যেই তিনি কয়েক লক্ষ টাকার কারবার করিতেন। খান দুরানের সুপারিশে এহ্তিশাম খাঁ খালিসা বিভাগের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন। রায়রায়ান বা প্রবীণ উপদেষ্টা ছিলেন সমস্ত সৈন্যসংগ্রহের দেওয়ান বা প্রধান পরিদর্শক। এরূপ উদ্ধত ও চূড়ান্ত কার্যের দরুন ইহারা দুইজনেই হতবুদ্ধি না হইয়া পারিতেন না। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, ইহাদের একজন ছিলেন বাদশাহের ও আর একজন উজীরের অনুরক্ত। কাজেই ইহা দুইরকমে দুইজনের গায়ে লাগিত, এই দ্ব্যর্থক আচরণের ফলে তাহারা দুই পক্ষেরই বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহারা একমত হইয়া উভয়ে পদত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিলেন। তৎফলে ঐ দুইটি পদই খালী হইল। এমন সময় এনায়েতউল্লাহ্ খাঁ অকস্মাৎ দরবারে হাজির হইলেন। এই আমীর বাদশাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরে তাঁহার কোপে পড়িয়া মক্কায় হজে গমন করেন। এখন তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আওরঙ্গযীব ও বাহাদুর শাহের আমলে শাসন ও রাজস্ববিভাগের কতিপয় পদে কাজ করিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিশ্বস্ততার জন্য অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেন এবং একজন সুযোগ্য মন্ত্রী ও চমৎকার হিসাববিদ বলিয়া পরিচিত হন। অতএব বাদশাহ্ এমন একজন লোকের উপস্থিতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া পারিলেন না। আমীর জুমলার অযোগ্যতার দরুন যে সকল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাহার প্রতিকারের জন্য তিনি তাঁহার প্রতিভা কাজে লাগাইতে চাহিলেন। প্রাচীন অভিজাত পরিবারগুলি ধ্বংস করিয়া তিনি যে কিরূপ অপূরদৃশিতার পরিচয় দেন, তিনি নিজেই এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন। অবিরত দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হইয়া এবং বাদশাহ্ ও উজীরের দলের ন্যায় দুইটা বিরুদ্ধ দলের পরিচালনা করা অসম্ভব দেখিয়া এহ্তিশাম খাঁ যে দুইটা চাকরী ছাড়িয়া দেন সেখানে বসাইবার যোগ্যতম লোক হিসাবে এনায়েত উল্লাহ্ খাঁর উপর বাদশাহের দৃষ্টি নিপতিত হইল। এই দুইটা পদে ইহ্তিশাম খাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করিয়া এবং বিনিময়ে তাঁহাকে কাশ্মীরের সুবাদারি দিয়া বাদশাহ্ এনায়েতুল্লাহ্ খাঁকে তৎক্ষণাৎ শূন্য পদে নিযুক্ত করিলেন। যে পর্যন্ত আবদুল্লাহ্ খাঁ বা তাঁহার মন্ত্রী সমস্ত ব্যাপারে জবরদস্তি দেখাইতে থাকিবেন, সে পর্যন্ত তিনি নিজের বা নিজের প্রভুর সন্তুষ্টির সহিত কখনও কার্যসম্পাদন করিতে

পারিবেন না জানিয়া এই আমীর ঐ দুইটি পদ গ্রহণে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আওরঙ্গযীবের আমলে একাধিকবার তাঁহার কঠোরতা টের পাওয়ায় এই শেষোক্ত মন্ত্রী নিজেও তাঁহার নিয়োগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সৌভাগ্যবশতঃ এখলাস খাঁ এই মতানৈক্যের অবসান ঘটাইলেন। তিনি ছিলেন বাহাদুর শাহের আমলের একজন নব-দীক্ষিত হিন্দু—একজন জ্ঞানী, পণ্ডিত ও বুদ্ধি-কৌশলময় ব্যক্তি; বব্যসায়ী হিসাবে সায়্যিদদের প্রতি অনুরক্ত হইলেও সময়ের হালচালে তিনি এত অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, নিজে কোন চাকরী গ্রহণ করেন নাই। তিনি অবসর জীবন যাপন করিতেন; বাদশাহের আদেশে 'ফর্‌রুখ সিয়ার নামা' বা 'ফর্‌রুখ-সিয়ারের ইতিবৃত্ত' তাঁহার সময়ের একখানা ইতিহাস লিখিতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত থাকিতেন। উভয় পক্ষের সহিত এই আমীরের সংস্রব ছিল এবং উভয় পক্ষই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথমে আবদুল্লাহ্ খাঁর সহিত আলোচনা না করিয়া এনায়েতুল্লাহ খাঁ কখনও বাদশাহের নিকট কিছু প্রস্তাব করিবেন না, এই শর্তে তাঁহাকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এতদ্ ভিন্ন আরও দুইটি শর্ত ছিল। প্রথমটি হইল, রতনচাঁদ এনায়েতুল্লা খাঁর কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না; দ্বিতীয়টি হইল উজীরের কর্তব্য সম্পাদনে আবদুল্লাহ খাঁ আরও অধিক যত্ন ও পরিশ্রম করিবেন; তাঁহার সিলমোহর বা দস্তখতের অভাবে অসংখ্য কাজ-কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; তাহাদের চীৎকার বন্ধ করার ইহাই ছিল একমাত্র উপায়। স্থির হইল যে, আবদুল্লাহ খাঁ সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন কিল্লায় গিয়া উজীরের সামিয়ানার নীচে বসিয়া আবেদন শ্রবণ ও বিবাদের মীমাংসা করিবেন। উজীর এই চুক্তি অনুযায়ী কিছুকাল কাজ করিলেন; কিন্তু বাদশাহের হুজুরে থাকা মোটেই তাঁহার পছন্দ হইত না; তাহাছাড়া তিনি রমণীর, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির এত অনুরক্ত ছিলেন যার ফলে অচিরেই তিনি পূর্বের আলস্য ও উপেক্ষায় ফিরিয়া গেলেন; ফলে সরকারী কার্যনির্বাহের জন্য তাঁহার সময় মিলিত না।

উজীরের স্ত্রৈণ আচরণে যখন প্রত্যেকটা ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এনায়েতুল্লাহ্ খাঁ তখন সততা ও কঠোরতা দ্বারা বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করিতে

লাগিলেন, অথচ বর্তমানে ইহা কিরূপ অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক, তাহা তাঁহার অনুধাবন করা উচিত ছিল। যমানার বাস্তব হালচাল বা রতন চাঁদের অসীম প্রভুত্বের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিয়া তিনি হিন্দুদের উপর ধার্য জিজিয়া সম্পর্কে কয়েকটা আইন বলবৎ করার জন্য বাদশাহের নিকট প্রস্তাব করিলেন, তিনিও তাহা মঞ্জুর করিলেন। পক্ষান্তরে দরবার ও প্রাসাদ খোজা, হিন্দু ও কাশ্মীরীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছিল। উজীরদের শাসনের শিথিলতার সুযোগে তাহারা অত্যধিক বেতন আদায় ও উৎকৃষ্ট জায়গীরগুলি দখল করিয়া বসে, অপেক্ষাকৃত ভাল সত্ত্বের জোরে যাহারা এরূপ পদের প্রত্যক্ষ আকাঙ্ক্ষা করিত, তাহারা তাহাদের দাবী নস্যাৎ করিয়া দিত কিম্বা অত্যন্ত অনিশ্চিত করিয়া তুলিত। তজ্জন্য রাজস্ব মন্ত্রী এই সকল অতিরিক্ত জায়গীর ও বেতনের একাংশ বাজেয়াপ্ত করায় ও একাংশ ন্যায়সঙ্গত গণ্ডীর মধ্যে আনয়নের অথবা সরকারী খাতাপত্রের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী তাহাদিগকে এগুলি মঞ্জুর করিতে প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব দুইটি রতনচাঁদ এবং সমস্ত লুণ্ঠনকারী ও তহবিল তছরুপকারীর নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর বিবেচিত হওয়ায় তাহারা আবদুল্লাহ্ খাঁর নিকট নালিশ করিল। তাঁহার নিকটও এগুলি অনুরূপ অবাঞ্ছনীয় মনে হইল। সমস্ত অপরাধী প্রস্তাবকের বিরুদ্ধে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় এমন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতে লাগিল যে, উজীর ও রাজস্ব মন্ত্রীর মধ্যে যে, কয়টি শর্ত নির্ধারিত হয়, তাহা উপেক্ষিত হইতে লাগিল। দৈনিক কোন্দলের ফলে দৈনিক বিরক্তির উদ্ভব হইত। পরিশেষে নিম্নোক্ত ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া প্রকাশ্যে ভাঙ্গন ধরিল।

জনৈক হিন্দু কিছু খাস জমি পরিচালনা করিত। খাজাঞ্চী খানার নিকট তাহার অনেক টাকা ধার রহিয়াছে দেখিয়া এরূপ নির্লজ্জ ব্যাপারে রতন চাঁদের পুনঃপুনঃ দরখাস্ত করার ধৃষ্টতা সত্ত্বেও তাঁহাকে আটক করা হইল। নিজের অপরাধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় লোকটা প্রহরীদিগকে ঘুষ দিয়া রতন চাঁদের গৃহে পালাইয়া গেল, সেখানে তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হইল। এনায়েতুল্লাহ খাঁ ব্যাপারটা বাদশাহের হুজুরে পেশ করিলে তিনি অপরাধীকে ধরিয়া আনার জন্য প্রাসাদ হইতে একদল সৈন্য পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে

আদেশ দান করিলেন। কিন্তু রতন চাঁদের লোকেরা বাধা দানে প্রস্তুত হওয়ায় কথা কাটাকাটি হইতে হাঙ্গামা বাঁধিবার উপক্রম হইল। এরূপ দুঃসাহসে স্তম্ভিত হইয়া বাদশাহ্ উজীরের প্রতি তাহার দেওয়ানকে বরখাস্ত করার জন্য আদেশ দান করিলেন। উজীর তাহাতে প্রতিশ্রুত হইলেও প্রকৃত-পক্ষে এই আদেশ পালনের চিন্তা কখনও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু বিরোধের যে প্রধান ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া সমস্ত হৃদয়-জ্বালা চরমে উঠে ও যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাদশাহ্ সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা হইল জাঠ চূড়ামনের ব্যাপার।

ইনি ছিলেন আকবরাবাদের নিকটের একজন শক্তিশালী জমিদার বা হিন্দু রাজা। তিনি যে পরিবারের লোক, তাহারা বরাবরই এত বিরক্তিজনক লোক বলিয়া প্রমাণিত হন যে, কয়েকজন বাদশাহ্ স্বয়ং তাহার পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাদিগকে বশে আনিতে অবজ্ঞা বোধ করেন নাই। তাহার বিদ্রোহী অশান্ত প্রকৃতি অপমান সৃষ্টি করিতে নিয়ত তৎপর থাকিত বলিয়া তাহাকেও একবার শাস্তি প্রদত্ত হয়। এই ব্যক্তি আবার গোলযোগের সৃষ্টি করায় বাদশাহ্ ১১২৯ হিজরীর শওয়ালের প্রথমে রাজা জয়সিংহ ওরফে রাজাধিরাজকে তাঁহাকে শাসনে আনিতে নিযুক্ত করিলেন। ঐ অভিযানের সেনাপতির পদে নিযুক্ত করার সময় বাদশাহ্ তাঁহার সামরিক পদমর্যাদা বৃদ্ধি করিলেন এবং তাঁহাকে একটা হাতী, এক প্রস্থ জওহেরাত ও কয়েক লক্ষ টাকা উপহার দিলেন। তাঁহার গমনের পরে আবদুল্লাহ্ খাঁর ভ্রাতা সায়্যিদ খান জাহানের পরিচালনায় তাঁহার সাহার্য্যার্থে এক বিরাট বাহিনী প্রেরিত হইল।

ইতঃমধ্যে ঐ হিন্দু রাজা জাঠ দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বহু সময় ও শোণিতপাতের সংঘাত কাটিয়া স্থানটির নিকটবর্তী হন। ঠিক এই সময়ে নূতন সেনাপতি সেখানে হাজির হইলেন। যুবক ও তেজস্বী বলিয়া এই সকল পরিখা খননে কালক্ষেপন তাঁহার মনঃপুত না হওয়ায় তিনি কয়েকবার আক্রমণ চালাইলেন। এগুলি এত ব্যর্থ প্রমাণিত হইল যে, আহত লোকে শিবির পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু ইতঃপূর্বে সারা বৎসর ধরিয়া অবরুদ্ধ থাকায় এবং প্রত্যেকটা জিনিষের অভাবে কষ্ট পাওয়ায় দুর্গটির আর প্রতিরোধের

ক্ষমতা ছিল না। কাজেই তিনি তাঁহার উকীল বা দরবারে তাঁহার গোমস্তাকে বশ্যতা স্বীকারের পেশকুশ বা নগদ অর্থ উপহার দানের এবং বাদশাহ্ মেহেরবাণী করিয়া তাঁহার অতীত আচরণের ভুল ক্ষমা করিলে দরবারে হাজির হওয়ার জন্য প্রস্তাব করিয়া উজীর আবদুল্লাহ্ খাঁর নিকট দরখাস্ত করিতে পত্র লিখিলেন। কিন্তু এই সমুদয় এই সুস্পষ্ট শর্তে যে, আলোচনার কথা জয়সিংহকে জানান হইবে না এবং তাঁহার শত্রু সেই রাজাকে সন্ধিতে পক্ষভুক্ত করা হইবে না। উজীর এই সমুদয় প্রস্তাবে সম্মত হইবা মাত্র হিন্দুরাজা তাহার সংবাদ পাইলেন এবং তাঁহাকে বর্জন করায় মনে ভয়ানক আঘাত পাইয়া সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া দরবারে গিয়া বাদশাহের নিকট তাঁহার মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি ইহাতে নিজেকে অপদস্থ ও অপমানিত বোধ করিলেন। এত কাণ্ড কারখানার পরে চূড়ামন স্বয়ং রাজধানীতে আসিয়া উজীরের প্রাসাদের নিকটে বাসা লইলেন। এই সকল প্ররোচণার পরে তিনি বাদশাহের হুজুরে হাজিরা দেওয়ার নিশ্চয়তা পাইলেন; কিন্তু তিনি তৎপ্রতি অবজ্ঞা বশতঃ আর তাহার মুখ দর্শনে সম্মত হইলেন না। দাক্ষিণাত্য হইতে যখন প্রত্যহ কেবল দুঃসংবাদ আসিতে ছিল বিশেষভাবে তখন এই ব্যাপারটা এতদুর গড়াইল বলিয়া বাদশাহ্ অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। সেখানে যে গণ্ডগোল দেখা দেয়, বাদশাহ ও সাম্রাজ্য দুইই তাহার প্রভাবে জড়াইয়া পড়িল।

আমরা হুসায়ন আলী খাঁকে সমস্ত প্রতিকুল অবস্থার বিরুদ্ধে বিজয়ী একদল সৈন্যসহ রাখিয়া আসিয়াছি। কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভের পর তিনি তাঁহার রাজধানী আওরঙ্গাবাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্বত্র শৃঙ্খলা ও আজ্ঞানুবর্তিতা প্রবর্তনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। এমন সময় খান্দেশ হইতে সংবাদ আসিল যে, কুন্দবিহারী সেখানে ভীষণ অত্যাচার চালাইতেছে। ইনি ছিলেন রাজা শাহুর অধীনে একজন প্রধান মারাঠা সেনাপতি। সেখানে তাঁহার বিরাট বাহিনী ছিল। এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, দেশটি দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের এবং কাজে কাজেই হুসায়ন আলী খাঁর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও সেখানেও সেই বিশাল জনপদের অন্যান্য প্রদেশে খোদ বাদশাহী সুবাদারের সমকক্ষ একজন মারাঠা সেনাপতি

থাকিতেন; তাঁহার কাজ ছিল সন্ধি সূত্রে তাঁহাকে প্রদত্ত চৌথ বা নিট্ রাজস্বের এক চতুর্থাংশ সংগ্রহ করা। বাদশাহ্ আওরঙ্গযীবের মৃত্যুর ১০/১২ বৎসর পরে অশান্তি ও গৃহযুদ্ধের সময় যখন রাজবংশীয় শাহজাদারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিবাদে সম্পূর্ণ ব্যস্ত থাকায় ঐ সকল সুদূর জনপদ লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় পাইতেন না, তখন এই বিচিত্র প্রথা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে প্রবর্তিত হয়। এই মারাঠা সেনাপতি • বুরহানপুর হইতে ভারতের প্রধান বন্দর সুরাট পর্যন্ত রাস্তায় কতকগুলি কর্দম দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেগুলিতে সৈন্য-স্থাপন করেন এবং বণিকগণ ও গোটা কাফেলা হইতে বলপূর্বক তাঁহাদের মালপত্রের এক চতুর্থাংশ আদায় করিতে থাকেন। তাঁহারা এই অন্যায় দাবী মানিয়া লইলে ভাল কথা, নতুবা তিনি পথিমধ্যে তাহাদের মালপত্র লুণ্ঠন করাইতেন এবং তাহাদের নিকট হইতেও মাথাপ্রতি একটা কর আদায় করিতেন। এরূপ খামখেয়ালী কার্যের দরুণ তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠিলে সুবাদার তাঁহার নিজস্ব বক্শী' জুলফিকার বেগকে অশ্বারোহী ও পদাতিকে মিলাইয়া আট হাজার সৈন্যের একটা বাহিনীসহ এই সমুদয় লুটপাট বন্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন। আওরঙ্গাবাদে ছাড়াইয়া যে সকল কঠিন গিরি-সঙ্কট অবস্থিত, বহু কষ্টের সহিত সেগুলি অতিক্রম করিয়া জুলফিকার বেগ খান্দেশ ও সুরাট রাজ্যের প্রান্তবর্তী পার্বত্যভূমি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এমন সময় কুন্দ বিহারীর সন্ধান পাইলেন। তাঁহার সঙ্গে ৮/৯ হাজার প্রবীণ অশ্বারোহী ছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা পনর ষোল হাজার বলিয়া প্রচারিত হইল। স্থানটি বুগলনা সীমান্তে আওরঙ্গাবাদের প্রায় ৭০ ক্রোশ পশ্চিমে। জুলফিকার তৎক্ষণাৎ আক্রমণে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু মারাঠা সেনাপতি কেবল নিজের সুবিধামত যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া যুদ্ধে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি পশ্চাদ্বর্তী হইতে হইতে শত্রুপক্ষকে ঝোঁপ ঝাড়পূর্ণ এক কঠিন বন্ধুর জনপদে লইয়া গেলেন। জুলফিকারের হরকরা ও গুপ্তচরেরা বৃথাই তাহাদের প্রভুকে বলিল ইহা মারাঠাদের ন্যায় ঝানু লুণ্ঠতরাজকারীদের সহিত যুদ্ধ করার উপযুক্ত স্থান নহে। তিনি তাহাদের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া নিজের বীরত্ব গর্বিত হইয়া তাঁহার অনুসরণকারী বারের কতিপয় সাথিদের

ন্যায় সম্পূর্ণ চিন্তাহীনভাবে সটান তাহাদের উপর আপতিত হইলেন এবং ঐ সকল খৎনাহীন লোকদের কয়েক জনকে হত্যা করিয়া দোযখের তলদেশে পাঠাইয়া দিলেন। মারাঠারা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে তৎক্ষণাৎ পিছু হটিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের সেনাপতিকে অনুরূপভাবে পাঁচ শতের অধিক লোক লইয়া পালাইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হইল। আসলে এই গতি পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদিগকে সেই বিপজ্জনক দেশের আরও অনেক ভিতরের দিকে লইয়া যাওয়া, প্রত্যেকটি মোড়ে গভীর সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট ও ঝোঁপের দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা কয়েকটি স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হইতে বাধ্য হইল। কুন্দবিহারীর উদ্দেশ্যও ছিল ঠিক ইহাই। তাঁহার শত্রুরা এরূপ জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিতে পাইবা মাত্রই যে অল্পকয়েকটি গিরিসঙ্কট দ্বারা তাহারা পুনরায় একত্র হইতে পারিত, তিনি সেগুলি হস্তগত করিয়া চতুর্দিক হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাদের উপর আপতিত হইলেন। প্রথম আক্রমণেই তিনি তাহাদের সেনাপতিকে নিহত করিলেন; যে কেহ তাঁহার পথে পড়িল সে-ই নিহত বা আহত হইল। কিছুক্ষণ ধরিয়া এই হত্যাকাণ্ড চলিল, অতঃপর যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা সাম্প্রতিক ঔদ্ধত্যের পরিবর্তে এখন দীনতা-হীনতা দেখাইয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া বন্দীদশা বরণের শর্তে প্রাণে রক্ষা পাইল।

এরূপ অপমানজনক পরাজয়ে স্তম্ভিত হইয়া সুবাদার তাঁহার প্রধানমন্ত্রী মোহ্‌কাম সিংহকে প্রচুর প্রবীণ সৈন্যসহ তাঁহার অস্ত্র-বলের সম্মানের প্রতিশোধ গ্রহণে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি তাহার নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সয়ফুদ্দীন আলী খাঁকে বুরহানপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে মোহকাম সিংহের পশ্চাতে আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উভয় সেনাপতি একযোগে কার্য করিতে আদিষ্ট হইয়া মারাঠাদিগকে খতম করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু কুন্দবিহারী এরূপ অসুবিধাজনক অবস্থায় যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহার সমস্ত লোকজন লইয়া দক্ষিণদিকে পশ্চাৎবর্তন করিয়া তাহাদিগকে রাজা শাহুর রাজ্যে কয়েকটি দুর্গে স্থাপন করিলেন। কোন একদল সৈন্য তাঁহার কর্দমদুর্গগুলির কোন একটা অবরোধ করিতেই রক্ষী সৈন্যরা তাহা খালি করিয়া দিত, কিন্তু আক্রমণকারীরা দূরে সরিয়া

গেলেই তাহারা আবার ফিরিয়া আসিত। আর এক দল লুটেরা লুণ্ঠন ব্যাপদেশে আহমদনগর হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। মোহকাম সিংহ তাহাদিগকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া সাতারার দ্বার পর্যন্ত অবিশ্রান্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেও যুলফিকার বেগের পরাজয় ও মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হইয়া উঠিল না।

এরূপ অপমানে সুবাদারের মর্যাদা ও তাঁহার সরকারের সম্মানের হানি না ঘটিয়া পারিল না। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, এতদঞ্চলের লোকেরা ছিল বরাবরই অবাধ্য। বাদশাহের সহিত তাহাদের সুবাদারের মনোমালিন্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইয়া তাহারা এখন অদম্য ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দরবারী পত্রও এই মনোভাবে কম ইন্ধন যোগাইল না। সেখানে কেবল রাজা শাহু নহেন, সমস্ত সরকারী নওকর ও দাক্ষিণাত্যের নিম্নতর শাসনকর্তারা হুসায়ন আলী খাঁর প্রভুত্ব অস্বীকার করার এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সৈন্যদলকে যথাসাধ্য ধ্বংস করার নির্দেশ পাইলেন। এরূপ গোপনীয় আদেশ আপত্তি ও প্রতিরোধের উস্কানি না দিয়া পারিত না। হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসনকর্তা মুবারিজ খাঁ ছিলেন এতদঞ্চলের একজন বিখ্যাত আমীর। ঠিক এই সময় তিনি সুবাদারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মহাসম্মানে অভ্যর্থিত ও ঐ পদে বহাল হইলেন। তথাপি ঐ রাজ্য কিংবা বিজাপুর বা কর্ণাট রাজ্য সম্পূর্ণরূপে সুশৃঙ্খলাধীন বা আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হইল না। কোন দিক হইতে বাতাস বহিতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া এবং গোপনে তাঁহার ক্ষতি করাই এই সকল নৌযানের উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুবাদারও প্রত্যহ দরবার হইতে তাহার নিকট যে সকল দেওয়ান বা রাজস্ব পরিদর্শক প্রেরিত হইতেন তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া হয় অন্তহীন বিলম্ব ঘটাইয়া তাঁহাদিগকে হয়রান করিয়া তুলিতেন, নতুবা সোজা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া সংক্ষেপে বিদায় দিতেন।

যুদ্ধবাজ বিজয়ী আওরঙ্গযীব জীবনের এতবড় একটা অংশ যে সকল দেশে ব্যয় করিয়া এবং তাঁহার পিতা দ্বিতীয় সাহেব কুরন[১] বাদশাহ্ শাহজাহানের সঞ্চিত সমস্ত ধন-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া সেখানে এত কষ্টে যে সামান্য শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন, সুবাদার ও দরবারের মধ্যে ঠাণ্ডা

যুদ্ধের ফলে তাহার ভিত্তি না ধ্বসিয়া পারিল না। অশেষ পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত মেহনতে পঁচিশ বৎসর ব্যাপী একটা অভিযানে তিনি মারাঠাদের হাত হইতে ত্রিশ চল্লিশটি দুর্গ কাড়িয়া লন এবং সেই অশান্ত জাতিকে তাহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া গুপ্ত গহ্বর ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করেন। কিন্তু তাঁহার সেই ত্যাগের কয়েক বৎসর পরে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ ও গোলমালে সাম্রাজ্যের দাবীদারদের মনোযোগ নানা দিকে আকৃষ্ট হইলে এবং অবশেষে বাহাদুর শাহ্ সিংহাসনে বসিয়া সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইতে দূরবর্তী এবং যে সকল বিপজ্জনক সীমান্ত তখন অত্যধিক যুদ্ধের দৃশ্য হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইতে আরও অধিক দূরবর্তী লাহোর শহরকে স্বীয় বাসস্থান বলিয়া মনোনীত করায় মারাঠারা এই অসতর্কতা ও ব্যাপক অমনোযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের দুর্গরাজি হইতে বাহির হইয়া সমস্ত নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে ছড়াইয়া পরে। সেখানে তাহারা ক্রমে ক্রমে কেবল তাহাদের নিকট হইতে অধিকাংশ বিজিত জনপদসহ কয়েকটি দুর্গই পুনরুদ্ধার করিল না, বরং বাদশাহী রাজ্যে এমন ধ্বংসক্রিয়া আরম্ভ করিল যে, ঐ সকল জনপদকে বার্ষিক কররূপে উহাদের রাজস্বের পূর্ণ এক চতুর্থাংশ তাহাদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করিতে হইল; ইহার নাম চৌথ।[৩] যে সকল অঞ্চল এরূপ অপমানজনক জোঁয়ালের নীচে মাথা নত করিতে রাজী হইল না, উহা-দিগকে প্রতিবৎসরই অগ্নি ও তরবারির যাবতীয় নৃশংসতা ভোগ করিতে হইত। কয়েকটি বিশেষ স্থানে তাহারা যে প্রবল বাধা পাইত না, এমন নহে; কিছুকাল অবরোধের পর তাহারা সেখান হইতে অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইত, কিন্তু শুধু পুনরায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে। এরূপ স্থায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে মারাঠারা নিজেরাও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আওরঙ্গযীবের রাজত্বের শেষভাগের মত প্রাথমিক সময়েই রাম রাজার বিধবা পত্নী রানা বাঈ তাঁহার সমস্ত দাবীর বিনিময়ে তাঁহাকে একটা দেশমুক্ষী[৪] অর্থাৎ যে স্থায়ী প্রদেশ লইয়া দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী গঠিত, উহাদের রাজস্বের এক দশমাংশ প্রদান করিয়া জনগণের দুর্দশার সমাপ্তি ঘটাইবার ঐ জন্য বাদশাহের নিকট আবেদন করেন। অর্থগৃধ্নুতা ও

কৃপণতার খাতিরেই হউক কিংবা মর্যাদার নীতি ও এরূপ অপমানজনক প্রস্তাবে সম্মত হইলে মুসলমান ধর্মের যে অগৌরব হইবে, তাহার খাতিরেই হউক, এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়। রাজার দূতগণ কিন্তু এখন শাহ রাজার দূতদের সহিত মিলিত হইয়া বাহাদুর শাহের দরবারে সমধিক সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিলেন। এই বাদশাহ্ চাহেন কিছুটা শান্তি; কিন্তু অচিরে রাজার বিধবা পত্নী ও রাজত্বকারী রাজার মধ্যে যে গোলযোগ বাঁধিল, তাহাতে তিনি আশায় নিরাশ হইলেন। বিখ্যাত দায়ুদ খাঁ পনীর পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপারটা এরূপ অনিশ্চিত অবস্থায়ই বিরাজমান ছিল। বিখ্যাত এই দায়ুদ খাঁ উজীর যুলফিকার খাঁর সহকারী হিসাবে ঐ সকল প্রদেশ শাসন করিতেন। তাঁহার দৈহিক শক্তি ও বীরত্বের প্রতি মারাঠারা সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পোষণ করিত। তাহারা তাঁহার সহিত সদ্ভাবে ভ্রাতৃবৎ কালযাপন করিত। তিনি কোনরূপে তাহাদিগকে এই যুক্তিতে রাজী করাইলেন। "রাজবংশের শাহ্জাদারা তাঁহাদের ভরণপোষণার্থে যে সকল স্থান ও রাজ্য ভোগ করিতেন, তাহারা এখন হইতে তাহার উপর কোন দাবী উত্থাপনে বিরত থাকিবে। কিন্তু দরবারের আমীরেরা বা অন্যান্য ব্যক্তি জায়গীররূপে বা অপর যে কোন শর্তে যাহার মালিক, দায়ুদ খাঁর সহকারী হিরামন স্বয়ং তাহার চৌথ আদায় করিবেন, মারাঠারা কোন প্রকারেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।"

এই ভূমি সমস্ত কলহ ও দাবীর অবসান ঘটাইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও ইহা লইয়াও অনন্ত কলহ ও যোগাযোগের সূত্রপাত হইল; তৎফলে বরাবরই কিছু-না-কিছু রক্তপাত হইত। নিজামুল মুলকের শাসন এক বৎসর কয়েক মাসের বেশী স্থায়ী হয় নাই* যে চৌথ এ যাবৎ আপোষে আদায় হইত, তাহা লইয়া তখন যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটে। তিনি একবার মারাঠাদিগকে শায়েস্তা করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে বহু সংখ্যক ঘোটকী ও দুই তিনটা হাতী কাড়িয়া লয়; হাতীগুলি তিনি মির্জা বেগের তত্ত্বাবধানে বাদশাহ্কে প্রেরণ করেন। এই সুবাদার ছিলেন একজন তেজস্বী লোক; কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী হুসায়ন আলী খাঁর মনোযোগ সর্বদা দরবারের সহিত তাঁহার ভুল বুঝাবুঝির প্রতি নিবদ্ধ থাকিত বলিয়া সময় এত প্রতিকুল

প্রমাণীত হয় যে, একাদিক্রমে দুই বৎসর যাবত কোন মতৈক্যে পৌছা সম্ভবপর হয় নাই এবং মারাঠাদিগকে কার্যকরীভাবে বাধাদান করিতেও পারা যায় নাই। তাঁহার মনোযোগ থাকিত বরাবর কপট দরবারের ষড়যন্ত্রের দিকে। অবিশ্রান্তভাবে শাহ রাজাকে তাঁহার সর্বনাশ সাধনে এবং ঐ সকল দূরবর্তী অঞ্চলের রাজণ্যবর্গ ও শাসনকর্তাদিগকে অবাধ্যতা প্রদর্শনে উৎসাহিত করিয়া তিনি যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন, কার্যতঃ তৎসমুদয় নষ্ট করিয়া দেন। মনিবের মতলব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার তাঁহার সর্বপ্রকার কারণ বিদ্যমান ছিল; তাঁহার সহায়তায় বঞ্চিত ও নিজেকে তদীয় ব্যক্তিগত শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি সেদিকে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা প্রকৃষ্ট বিবেচনায় মারাঠাদের সহিত নিম্নলিখিত শর্তে এক চুক্তি করিলেন।

> "দায়ুদ খাঁ পনীর আমল তাহাদের যে প্রাপ্য সাব্যস্ত হয়, তদুপরি তাহারা দাক্ষিণাত্যের সাড়ে ছয় প্রদেশের সমস্ত রাজস্বের দেশমুক্ষী বা দশমাংশ পাইবে; শাহ রাজার প্রতিনিধি হিসাবে মারাঠা সেনাপতি যশোবন্ত ও চিমন-রা বিরাট একদল প্রবীন সৈন্যসহ আওরঙ্গাবাদে সুবাদারের নিকট বাস করিয়া জায়গীরদারদের নিকট হইতে তাহাদেয় চৌথ ও রায়ত বা সাধারণ কৃষকদের নিকট হইতে তাহাদের দেশমুক্ষী বা দশম মুষ্টি আদায় করিতে পারিবেন।"

যে ঝগড়া-বিবাদ লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের এত বড় একটা অংশ উজাড় হইতেছিল ও যাহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুনির্দিষ্ট সন্ধির ফলে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল। অধিবাসীরা এখন মনে মনে শান্তি উপভোগের চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু এখন হইতে রাজস্ব সংগ্রাহক বা তহসিলদার, শাসন কর্তা বা ভাড়াটিয়াদের সকলেই যুগপৎ তিনটিপদে বাদশাহী-রাজস্ব-আদায়কারী চৌথ, সংগ্রাহক ও দেশমুক্ষীর তহসিলদার হিসাবে কার্য করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহাদের কার্য বিরক্তিকর, জটিল ও অনন্ত হৃদয়-জ্বালার উৎসস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। হুসায়ন আলী খাঁ এই সন্ধিপত্রের অনুমোদন বিনিময় করিয়া এবং তাঁহার বিশাল সুবার সমস্ত নগরে মারাঠাদিগকে প্রবেশ করিতে দিয়া বাদশাহের অনুমোদন চাহিয়া একখানা পত্রসহ তাঁহাকে ইহার সংবাদ পাঠাইলেন।

ইহা প্রতিপালনের জন্য প্রত্যেকের নিকট তাঁহার আদেশ পত্রও প্রেরিত হইল। বাদশাহ্‌ তাঁহার পার্শ্বচরদের প্ররোচণায় 'সাম্রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত মর্যাদা হানিকর এবং বাদশাহের রাজ্য মধ্যে গোটা দস্যুদলকে স্থান দানকারী ও সন্ধিকর্তার গায়ে যে অধিক মাত্রায় যে স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, তাহার দৃঢ় পরিপোষক বলিয়া গোটা সন্ধি নামঞ্জুর করিলেন। যুগপৎ তিনি জাননিসার খাঁকে খান্দেশ প্রদেশে সুবাদারের সহকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। সাহস ও বিজ্ঞতার জন্য এই প্রবীণ আমীরের অত্যন্ত সুনাম ছিল। সায়িদ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের পিতা আবদুল্লাহ্‌ খাঁ ওরফে মিঞা খাঁর সহিত এক সময় পাগড়ী বিনিময় করায় তিনি এক প্রকারের নূতন মর্যাদা লাভ করেন। বিদায় দান কালে বাদশাহ্‌ তাঁহাকে এক প্রস্থ জমকালো সম্মানজনক পরিচ্ছদ, একটি হাতী একটা সরপেচ বা কপালে পরার জড়োয়াগহনা উপহার দিলেন। ইহা হইল প্রকাশ্যে। এই প্রবীণ আমীর হুসায়ন আলী খাঁর চাচা বলিয়া পরিচিত ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিও তাঁহাকে চাচা বলিয়াই বিবেচনা করিতেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন; কাজেই তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভুত্বের প্রভাবে তাঁহাকে বাদশাহের প্রতি আরও বশ্যতা-মূলক ব্যবহারে সম্মত করাইতে পারেন, এই ভরসায় এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বাদশাহ্‌ হুসায়ন আলী খাঁ সম্পর্কে তাঁহার নিকট কিছু অনুযোগ করিলেন। ইহা ঘটিল তাঁহার রাজত্বের ষষ্ঠ হিজরী ১১৩০ সনে। একই সময় তিনি মুহম্মদ আলী খাঁকে মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কথা হইল, উহার সীমান্তে পৌঁছিলে তিনি রাজা জয়সিংহ সেবাইর প্রত্যাহার-পত্রসহ তাঁহার নিয়োগের সনদ পাইবেন। কিন্তু সাধারণ্যে সংবাদ রটিল যে, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে ইহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই জনরবের দরুন জাননিসার খাঁ দাক্ষিণাত্যের প্রথম সীমা নর্মদা সীমান্তে নিজের গতিরোধ করিলেন। যে প্রদেশের জন্য বাস্তবিকই তাঁহাকে নিয়োগপত্র প্রদত্ত হয়, সেখানে তিনি আদৌ প্রবেশ করিতে পারিবেন কিনা, তৎসম্বন্ধে সন্ধিহান থাকায় তিনি একদল সৈন্যসহ উহার সীমান্তে উপস্থিত হইয়া নিজেকে সন্দেহ ভাজন বা বিরক্তিকর করার মত নির্বোধ ছিলেন না; কাজেই

তাঁহার সঙ্গে মামুলী অনুচর ভিন্ন আর কোন লোক ছিল না বলিলেই হয়। পক্ষান্তরে মুহম্মদ আমীন খাঁ মালবের প্রথম বড় শহর সেরোঞ্জ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিলেন। তৎক্ষণাৎ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে সংবাদ রটিল যে তিনি ৫০ হাজার অশ্বরোহী লইয়া আওরঙ্গাবাদ যাত্রা করিয়াছেন এবং আট হাজার অশ্বারোহী এবং আরও সৈন্য দ্বারা গঠিত তাঁহার পশ্চাদগামী বাহিনী জাননিসার খাঁর অধীনে আগাইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাজধানীতেই ঔপন্যাসিকের দল থাকে; তাঁহাদের মারফতে এই সংবাদ সেই মহানগরে প্রচারিত হইল। অবশেষে খোদ সুবাদারের মনেও আতঙ্ক জন্মিল। কিন্তু খোদ জাননিসার খানের পত্রে এই সকল সন্দেহের নিরসণ ঘটিল; তাহাতে তিনি তাঁহাকে কয়েকটা সঙ্কীর্ণ ও কঠিন পথের ভিতর দিয়া আগাইয়া নেওয়ার জন্য অল্প কিছু সৈন্যের জন্য অনুরোধ করিলেন; সিন্তা নামক জনৈক দস্যু নিজের স্বার্থের জন্য সেখানে দস্যুতা ও লুঠন কার্য চালাইতেছিল। তাহার প্রভু রাজা শাহুর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। যাহোক, জাননিসার খাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রহরী প্রেরিত হইল; তাহারা জাননিসার খাঁকে লইয়া আসিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুবাদার জানিতেন, খান্দেশ ছিল দরবারের তরফ হইতে আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁহার উত্তর সীমান্ত; কাজেই তিনি বাদশাহের সুপারিশ প্রাপ্ত কোন লোকের হাতে এরূপ দেশের ভারার্পণ করিতে চাহিলেন না? পক্ষান্তরে তিনি স্বয়ং তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রতি সর্বপ্রকার সম্মান প্রদর্শনের দিকে লক্ষ্য রাখিলেন এবং কয়েকটা অতি মূল্যবান উপহার দিয়া তাঁহার উপস্থিতিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। ঠিক এই সময় দাক্ষিণাত্যে দুইটি উচ্চপদের জন্য দরবার হইতে নিয়োগপত্র লইয়া আরও তিন জন গুরুত্বপূর্ণ লোকের উপস্থিতিতে বাদশাহের মতলব সম্পর্কে সুবাদার কিরূপ সন্দিহান ছিলেন এবং রাজধানী হইতে প্রেরিত আদেশকে তিনি কত সামান্য তোয়াক্কা করিতেন, কেবল তাহাই ধরা পড়িল। ইহাদের একজন জিয়াউদ্দিন খাঁ ছিলেন পারসিক-জাত খুরাসানী শরীফ[*]; আমানত খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দিয়ানত

দাক্ষিণাত্যে জনরব

জাননিসার খাঁ খান্দেশের নয়া শাসনকর্তা

খাঁর মৃত্যুতে ইহাকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান বা রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। আর দুইজন ছিলেন বুরহানপুরের নিযুক্ত দেওয়ান জালালুদ্দীন খাঁ ও ঐ অঞ্চলের সৈন্যদলের অভিপ্সিত বখ্‌শী ফয়জুল্লাহ খাঁ। জিয়াউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌ খাঁর নিকট হইতে সুপারিশ-পত্র লইয়া আসায় সেই উচ্চপদের ভার গ্রহণের অনুমতি পাইলেন; বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া তিনি বরাবরই সুবাদারের খুশীমত কাজ করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট রাখিতেন। খান্দেশের দেওয়ানীদানে সুবাদারের আপত্তি থাকায় জালালুদ্দীনকে কিছু কালের জন্য বেরারের দেওয়ান নিযুক্ত করা হইল, কিন্তু সৈন্য দলের অভিপ্সিত বখ্‌শীকে সালামের জওয়াব পর্যন্ত দিতেও সুবাদারের মর্জি হইল না। এই সকল সংবাদ অচিরে দরবারে পৌঁছিলে বাদশাহের দুঃখ ও বিরক্তি চরমে উঠিল। কিন্তু তাঁহার জীবন যাপনে কোনই পরিবর্তন ঘটিল না; তদুপরি তখন তাহাকে যে সকল ঘৃণিত পাপের প্রতি দৃঢ়রূপে অনুরক্ত দৃষ্ট হইল, জনসাধারণের দৃষ্টি হইতে তাহা লুকিয়ে রাখার জন্যও তাঁহার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। ইহা ঘটে নিম্নলিখিত উপলক্ষে: মুহাম্মদ মুরাদ নামক জনৈক কাশ্মীরী তাহার পাপিষ্ঠ জীবনের জন্য নিয়ত নিন্দিত হইত; এখন দেখা গেল যে, সে অস্বাভাবিক পাপেও অত্যন্ত উন্মুখ; তজ্জন্য সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। তাহার জনৈক দেশবাসী তাহাকে রাজমাতা সাহিবান্‌নিস্‌ৱানকে উপহার দেয়; তিনি দেন আবার তাঁহার পুত্র বাদশাহকে। বাদশাহ্‌ তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ দান করিলে লোকটি তাঁহাকে বলিল: 'আবদুল্লাহ্‌ খাঁকে গেরেফতার ও তাঁহার ভ্রাতাকে ধ্বংস করার জন্য সে নানা ফন্দী-ফিকিরের কথা চিন্তা করিয়াছে; এজন্য প্রকাশ্যে বলপ্রয়োগ বা কোন প্রচণ্ড উদ্যমের দরকার হইবে না'। বাদশাহ্‌ এত দুর্বলচিত্ত ছিলেন যে, কোন তেজস্বী পন্থা অবলম্বনে সাহস পাইতেন না; কাজেই তাঁহার শত্রুদিগকে বোকা বানাইবার কোন ফিকিরের কথা শুনিলে তিনি আনন্দিত হইতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উপদেশ সহৃদয়ে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার উপদেশের গুরুত্ব অনুযায়ী উপদেষ্টার প্রতিও তাঁহার স্নেহ বাড়িতে লাগিল। তিনি তাহার নাম বদলাইয়া ইতিকাদ খাঁ অর্থাৎ বিশ্বস্ত প্রভু নাম

বাদশাহ্‌ অস্বাভাবিক পাপে লিপ্ত

রাখিলেন এবং স্বয়ং অস্বাভাবিক অভ্যাসে অত্যাসক্ত ছিলেন বলিয়া এরূপ সুযোগ্য জুড়ি পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইলেন; এখন হইতে সে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হইল; ইতঃপূর্বেই তিনি তাহাকে তাহার দেহ অর্পণ করেন, তখন করিলেন তাঁহার মন।

এই লোকটা উত্তরোত্তর বাদশাহের অনুগ্রহভাজন হইয়া অচিরেই তাঁহার যাবতীয় কার্যের প্রাণ ও সায়্যিদদের বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত পরিকল্পনার আমানতদার হইয়া দাঁড়াইল এবং এখন উপাধি, পদ-মর্যাদা ও সম্মান তাহার উপর বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে লাগিল। তাহার নাম ও উপাধি লম্বা হইয়া ইতেকাদ খাঁ ফর্রুখশাহী রুকনুদ্দৌলায় পরিণত হইল, ইহার অর্থ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ও বাদশাহ্ ফর্রুখ সিয়ারের আস্থাভাজন। এই সকল উপাধির পরে তাহাকে দশহাজারী মনসবদারের পূর্ণ বেতন ও সেনাপতিত্বসহ হপ্তহাজারী সওয়ারের মনসব প্রদত্ত হইল। তদুপরি প্রত্যহ তাহাকে বিপুল মূল্যের উপহার দ্রব্য, অপরূপ জওহেরাত ও বাদশাহের আলমারী হইতে বিচিত্র মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইতে লাগিল। এ সমুদয় দ্রব্য তাহাকে এত বেহিসাব পরিমাণে প্রদত্ত হইল যে, সে নিজেই তাহাতে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িল এবং এই উপহার-বন্যা দিয়া কি করিবে দিশা পাইল না। বিশেষভাবে বাদশাহ্ তাঁহার নূতন প্রিয়পাত্রের সহিত প্রত্যহ সভানুষ্ঠান করিতে থাকায় ইতোমধ্যে রাজনীতি সমগ্র দরবারের আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। পরিশেষে এক সভায় স্থির হইল যে, তিনজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোককে তাঁহাদের বিভিন্ন কার্যস্থল হইতে সরবুলন্দ খাঁকে তাঁহার আজিমাবাদের সুবাদারি হইতে নিজামুল মুলককে মুরাদাবাদ ও রাজা অজিত সিংকে গুজরাট হইতে দরবারে ডাকিয়া আনা হইবে। উদ্দেশ্য তাহাদের উপর সম্মান স্তূপিকৃত করিয়াও তাহাদিগকে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাদিগকে পক্ষভুক্ত করা। তাঁহারা সকলেই ছিলেন প্রতিভাবান সামরিক সুখ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু নিজামুল মুল্ক আসিতে না আসিতেই তাঁহায় মুরাদাবাদের ফৌজদারী ঐ প্রদেশে তিনি যে মূল্যবান জায়গীর ভোগ করিতেন, তৎসহ দুইটাই ইতিকাদ খাঁর নিকট হস্তান্তরিত হইল; তদুপরি মুরাদাবাদের নাম পরিবর্তন

তিনজন অতীব কৃতী আমীর দরবারে আহূত

করিয়া রুকুনাবাদ বা রুকুনুদ্দৌলার উপনিবেশ নাম রাখা হইল। সবকিছুই তাহাকে অপরিবর্তনীয় স্থায়ীভাবে প্রদত্ত হইল। এই সমুদয় মূর্খতা সত্ত্বেও বাদশাহ্ মধ্যে মধ্যে এরূপ দুর্ব্যবহার দ্বারা শক্তিশালী লোকদিগকে বিগড়াইয়া দেওয়ার নির্বুদ্ধিতার কথা চিন্তা করিতেন। হিন্দু রাজাকে অন্ততঃ মহারাজা বা বড় রাজা উপাধি দিয়া এবং তিনি সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের ধ্বংস ও সর্বনাশ সাধনে সক্ষম হওয়া মাত্র কত সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী হইবেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার ক্ষতিপূরণ করা তাঁহার নিকট সঙ্গত মনে হইল। কিন্তু হিন্দুরাজা বাদশাহের চপলতা ও ভীরুতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন বলিয়া এরূপ কোন ব্যাপারের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে অসম্মত হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্দোষিতা ও বিপুল শক্তি অনুভব করিতে সক্ষম ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদের পক্ষে যোগদান করিয়া আবদুল্লাহ্ খাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হইলেন। নিজামুল মুল্‌ক ও সরবুলন্দ খাঁ প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বখ্‌শীর পদে উন্নীত হওয়ার প্রতিশ্রুতিতে এত দূর-দারাজ হইতে আগমন করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা কেবল ঐ প্রতিশ্রুতিতেই নিরাশ হইলেন না—তাঁহারা এযাবত যে সকল পদ ও সুবিধাভোগ করিতেন, তাহাতেও বঞ্চিত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের বিস্ময় ও অসন্তোষের সীমা রহিল না। কিন্তু তাঁহারা মনে প্রাণে ঐ সকল পদের কামনা করায় এবং সাহসী ও কৃতী লোক বিধায় তাঁহারা বাদশাহের নিকট আবেদন করিলেন যে, আবদুল্লাহ্ খাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতা ও প্রভাব নষ্ট করিতে চাহিলে তিনি যেন তাঁহার উপস্থিত দুই বিশ্বস্ত ভৃত্যের একজনকে ওজারতির মনিবন্ধ দান করেন; এই রদবদলের পরেও আবদুল্লাহ্ খাঁ অবাধ্যতা ও অহঙ্কার প্রদর্শন করিতে থাকিলে ঐ আমীরই তাহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিবেন। তাঁহারা নিজেরা ইহার ভার গ্রহণ করিতেছেন। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রস্তাবের জওয়াবে বাদশাহ এই বিচিত্র প্রত্যুত্তর দিলেন—"ইতেকাদ খাঁর চেয়ে উজীর হওয়ার অধিকতর কোন উপযুক্ত লোক আছে বলিয়া আমি জানিনা!" দরবারে তখন কতিপয় বড় বড় ইরানী ও তুরানী আমীর ছিলেন যাঁরা সুপরিচিত চরিত্রবান ও কৃতীপুরুষ। কিন্তু যেইমাত্র তাঁহাদের কেহ ওজারতি পুরস্কার লাভের শর্তে বাদশাহ্‌কে

তাঁহাদের দুইজনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রস্তাব

সায়্যিদদের হাত হইতে মুক্তি দানের প্রস্তাব করিতেন, অমনি তিনি এই হাস্যাস্পদ উত্তর দিতেন, "উজীর হওয়ার জন্য ইতেকাদ খাঁ অপেক্ষা কোন যোগ্যতর লোকের কথা আমার জানা নাই।' এইরূপ বুলি প্রতিবারে শ্রুত হওয়ায় প্রত্যেকেই বিরক্ত না হইয়া পারিল না; কেহই এরূপ শিশু-সুলভ মনীবের জন্য জীবন বিপন্ন করা বা এরূপ কুখ্যাত উজীরের অধীনে চাকরী করা কাহারও মনঃপুত না হওয়ায় বিরক্তিভরে প্রস্থান করিল। ঐ কঠিন কার্যে এই সকল আমীরের প্রচেষ্টার প্রস্তাবে এত অগ্রণী হওয়ার কারণ আসন্ন কুরবান বা বলিদান উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত অনুকুল সুযোগ; তখন সমস্ত নাগরিক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শহরতলীর বাহিরে খোলা ময়দানে নামাজ পড়িতে যাইত। এই দুইজন আমীর ও হিন্দু রাজাদের আনীত অনুচর ও সৈন্যগণ বাদশাহের দেহরক্ষকদের সহিত মিলিত হইলে তাহাদের মোট সংখ্যা ৭০।৮০ হাজার শক্তিশালী অশ্বারোহীর কম হইত না। অথচ আবদুল্লাহ্ খাঁর নিকটে ৪।৫ হাজারের অধিক সৈন্য ছিল না বলিয়া সকলেরই জানা ছিল; ইহাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ঠিক সেই দিন আবদুল্লাহ্ খাঁ ধৃত বা নিহত হইতে যাইতেছেন বলিয়া সমগ্র শহরে এক ব্যাপক জনরব ছড়াইয়া পড়ে। এই সমুদয় অনুকুল অবস্থা এবং এত অনুকুল সুযোগ সত্ত্বেও কিছুই করা হইল না। একটি লোকেও তাহার আওয়াজ তুলিল না। বরং এই জনরব আবদুল্লাহ খাঁকে আরও অধিক সতর্ক করিল মাত্র। বারের সৈন্যেরা সকলেই তাঁহার ন্যায় সায়্যিদ বলিয়া তিনি তাহাদিগকেই সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতেন; তজ্জন্য এ যাবত তিনি তাহাদের ছাড়া আর কাহাকেও তাঁহার সৈন্যদলে ভর্তি করেন নাই। এখন তিনি জাতি-দেশ নির্বিশেষে তৎক্ষণাৎ ২৫০০০ অশ্বারোহী সংগ্রহের আদেশ দান করিলেন। জনরবটি এতই প্রবল ছিল যে, ইতঃপূর্বেই তাহা অন্য ভ্রাতা দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের কানে পৌঁছিল। তিনি তাঁহার পরিবার ও ধনরত্ন রাজধানীতে রাখিয়া আসেন; তাহাদের ও তাঁহার ভ্রাতার নিরাপত্তার জন্য ন্যায়সঙ্গত আশঙ্কার অভিভূত হইয়া তিনি অন্যান্য প্রত্যেকটি কার্য স্থগিত রাখিয়া দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া ঐ নগরে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেখানে গিয়া তাঁহাদের পরিবার ও ক্ষমতার সমস্ত শত্রুকে তৎক্ষণাৎ

বিনাশ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য নিজকে যাবতীয় ভাবনা মুক্ত করাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা।

এই মতলব তাহার মন জুড়িয়া বসিলে মুয়াজ্জেদীনের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। এই উপেক্ষিত যুবক তখন আওরঙ্গযীবের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌জাদা আকবরের পুত্ররূপে পরিচিত হইয়া শাহ রাজার দরবারে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাকে আনয়নের জন্য একদল প্রহরী পাঠাইলেন এবং জমকালো অনুচরবর্গ পরিবৃত অবস্থায় তাঁহাকে আওরঙ্গাবাদে আনাইলেন। কিন্তু এমন ভাবে যে, কেহই যুবকের চেহারা পরখ করিতে পারিল না। বাদশাহের নিকট লিখিত তাঁহার পত্রে তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তৎসম্পর্কে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন; তৎসঙ্গে তিনি নিজের একটা ব্যক্তিগত আবেদনও জুড়িয়া দিলেন; তাহাকে তিনি জানাইলেন যে, "দাক্ষিণাত্যের আব্-হাওয়ায় এবং এরূপ অবিশ্রান্ত ও ক্লান্তিকর অভিযানের শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট ও ভগ্ন হওয়ায় তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি তাঁহার কার্যস্থল ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে যাইতে বাধ্য হইতেছেন।" এই সকল পত্র পাঠে বাদশাহ্ ভয় পাইলেন। তাঁহার স্বাভাবিক ভীরুতা আরও বাড়িয়া গেল। এক ভ্রাতা যখন শক্তিশালী সৈন্যদলসহ শহরে আসিতেছিলেন ও আর এক ভ্রাতা চতুর্দিকে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন নিজের অস্থিরতা দূর করার জন্য তিনি এরূপ একটা শক্তিশালী পরিবারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে মনস্থ করিয়া হিন্দু রাজা অজিত সিংহকে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আবদুল্লাহ্ খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। এই দূত ছিলেন অকপট চরিত্রের লোক এবং উভয় পক্ষেরই আদরনীয়। তিনি জীবনের তরে উজীরের অনুরাগী বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহার সুপারিশে অনেক উপকার লাভ করেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার প্রতি বাদশাহের সুমত নষ্ট হয় নাই। কাজেই তিনি অচিরে বাদশাহ্ ও তাঁহার উজীরের ভিতরের পার্থক্য দূরীভূত করিতে সমর্থ হইলেন। শওয়ালের শেষ ভাগে এই পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা পাকা করিবার জন্য বাদশাহ্ তাঁহার প্রিয়পাত্র ইতিকাদ খাঁ ও মন্ত্রী খান দুরানসহ কিল্লার বাহির মহা ধুমধামে

সুবাদার একদল সৈন্যসহ রাজধানী গমনে কৃতসঙ্কল্প

বাদশাহ্ আতঙ্কিত

রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত আবদুল্লাহ খাঁকে দর্শনদানে গমন করিলেন। তাহার নিকট তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এখন হইতে তিনি কোন মনোভাব গোপন বা হিংসা বিদ্বেষ অবশিষ্ট না রাখিয়া সম্পূর্ণ অকপটে তাঁহার বন্ধু হইবেন। এই সকল প্রতিবাদের ফলে অতীত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও ভবিষ্যত অনুরুক্তির জন্য গুরুগম্ভীর প্রতিজ্ঞার দৃশ্যের অবতারণা হওয়ায় বাদশাহ্ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তিনি এতই অস্থিরচিত্ত ও চঞ্চল মেজাজী ছিলেন যে, কিছুকালের জন্যও তাঁহার মন কখনও একই ভাবে থাকিত না, বরং অবিশ্রান্ত ঘুরিতে থাকিত—কখনও তিনি নীরবে তাঁহার ভাগ্যের উপর হাল ছাড়িয়া দিতেন এবং নিজের তরফে কপটতা ও মৌন সম্মতি অবলম্বন করিতেন, আবার পরক্ষণেই সায়্যিদদের সম্পর্কে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এবং তাঁহাদিগকে বাদশাহের বিরাগভাজন হওয়ার পূর্ণ প্রতিফল দিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেন। তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও প্রিয়পাত্রদের বিভিন্ন মত তাঁহার মনের উপর যখন যেভাবে প্রভাব বিস্তার করিত, তাহারই ফলে পালাক্রমে এই সমুদয় পরিবর্তন ঘটিত। তাঁহারই ন্যায় সঙ্কীর্ণ-চিত্ত ও ভীরু বলিয়া তাহারা যে সকল সাহসী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক কঠোরতম আদেশ প্রতিপালনে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন, তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ করিত। বাদশাহ্ যে সকল নীচ লোকের কথায় কান দিতেন, অবশ্য শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গও তাহাদের নির্দেশে চালিত হইত, এমনকি তাহাদের সহিত আদৌ কোন সম্পর্ক রাখিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে যে সকল অযোগ্য লোক বাদশাহের সান্নিধানে থাকিত; তাহাদের বিপুল মর্যাদা দর্শনে সম্পূর্ণ বিরক্ত হইয়া তাহারা একে একে তাঁহাদের গৃহে চলিয়া গেলেন। এমন কি যে সকল লোকের সাহস ও উপদেশে নিজের দল ভারী করার জন্য বাদশাহ্ তাঁহাদিগকে দূর-দূরান্তর হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারাও এযাবত যে সকল চাকরী ভোগ করিতেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহারা এখন উপেক্ষিত হইয়া রহিলেন। কেহ তাঁহাদের কথা চিন্তাও করিত না। দৃষ্টান্তস্থলের সরবুলন্দ খাঁ ও নিজামুল মুলকের কথা বলা যাইতে পারে। তাহার সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে ও স্পষ্ট নির্দেশে তাঁহারা রাজধানীতে আসেন। বাদশাহের স্বহস্ত-লিখিত প্রতিশ্রুতি তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। একদা

এই দুইজন সেনাপতি মুবারুজুল মুলক ও রাজা জয় সিংহ সিবায়ীর সহিত মিলিত হইয়া একযোগে বাদশাহের নিকট গমন করিয়া প্রস্তাব করিলেন; "খোলস ছাড়িয়া প্রকাশ্যে কাজ করিলেই সমস্ত ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত হইতে পারে। সুতরং আবদুল্লাহ্ খাঁকে তদ্দণ্ডেই পদচ্যুত করা উচিত। অতঃপর তাঁহাকে ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সহজেই বিনাশ করা যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে তাঁহারা হয় দুই ভাইকে যুক্তি দ্বারা তখন হইতে কর্তব্য-পরায়ণ প্রজার ন্যায় ব্যবহার করিতে রাজী করাইবে, নতুবা অসংখ্য ঔদ্ধত্য ও অপমানের জন্য অপরাধী ও অসংশোধনীয় বিদ্রোহী হিসাবে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন।" এরূপ সাহসিক ঘোষণাও বাদশাহ্কে উদ্দীপিত করিতে পারিল না। তিনি তাঁহার প্রিয়পাত্রের কথায় চলিতে থাকায় সেনাপতিদ্বয় নিরাশ ও বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। তদুপরি তিনি যেন এখনও তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতি করেন নাই, এভাবে সরবুলন্দ খাঁর একটা মূল্যবান জায়গীর কাড়িয়া নিয়া আমীর জুমলাকে প্রদান করিয়া কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিলেন। অথচ এই পাপিষ্ট কপটচারীই আসাদ খাঁর পরিবার ধ্বংস করেন এবং অনুরূপভাবে সাম্রাজ্য ধুলিস্যাৎ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন।

প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাদশাহ্ এখলাস খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁহার জানা ছিল। তিনি আবদুল্লাহ্ খাঁকে গোলমালে উস্কানি দানে নিবৃত্ত রাখিবার এবং তাঁহার ভ্রাতার দাক্ষিণাত্য ত্যাগ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার মন শান্ত করিতে তাঁহাকে আদেশ দান করিলেন। হুসায়ন আলী ইতঃপূর্বেই পুরাপুরি যাত্রা করিয়াছেন বলিয়া প্রবল জনরব উঠিয়াছিল। তবে ইতঃপূর্বেই তিনি তাঁহার ভ্রাতা সয়ফুদ্দীন আলী খাঁকে শিবিরের সাজ-সজ্জা ও এক সারি কামান প্রস্তুতের আদেশ দিয়া চার পাঁচ হাজার অশ্বারোহীসহ বুরহানপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, অন্ততঃ এটুকু সত্য। রাজধানিতে যে গোলমাল দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তিনি তাহাতে উত্তেজিত হন। তিনি যখন যাত্রা করিতে মনস্থ করেন, তখন সংবাদ পাইলেন যে, সমস্ত অতীত বিস্মৃতির তলে চাপাদানের এবং তদীয় পরিবারের সহিত স্থায়ী শান্তির প্রতিজ্ঞা লইবার

জন্য বাদশাহ্ আবদুল্লাহ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছেন। এই পরস্পর-বিরোধী সংবাদে তাঁহার মন কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হইয়া পারিল না, তথাপি তিনি যাত্রার জন্য যে রণসজ্জা করিতেছিলেন, তাহা স্থগিত রাখিলেন এবং রাজধানী হইতে আরও সংবাদ লাভ সাপেক্ষে অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার মন যখন সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান তখন মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবদুল্লাহ্ খাঁর নিকট হইতে একখানা জরুরী পত্র লাভে বিস্মিত হইয়া তিনি আবার জাগিয়া উঠিলেন। যুগপৎ আওরঙ্গাবাদে ব্যাপক সংবাদ রটিল যে, তাঁহার ভ্রাতা উজীর রাজধানীতে নিদারুণ সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা চলিবে না। বাদশাহ তাঁহার আবেদনের যে উত্তর দেন, তাহাতে তাঁহার অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। কেবল হাওয়া বদলই তাঁহার বাসনা হইলে তাঁহার পক্ষে আহমদাবাদে যাওয়াই সমধিক প্রশস্ত হইবে; নতুবা তিনি রাজধানীতে আসিতে পারেন। সেখানে বাদশাহ আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। এ তৎসঙ্গে শাহজাদা আকবরের ভাণকারী পুত্রকে দরবারে পাঠাইবার জন্যও আদেশ আসিল।

সুবাদার যখন তাঁহার যাত্রার জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ খাঁ তখন রাজধানীতে তাঁহার সর্বশক্তিসহকারে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। রাজধানীতে কেবল গোলন্দাজ বাহিনী নহে সেই বিশাল শহরের ভিতরে-বাহিরে যে সমস্ত বাদশাহী সৈন্য দুরাবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল, এমনকি সমগ্র বাদশাহী গৃহস্থালীসহ দেহরক্ষীরা পর্যন্ত বেতন ও খোরপোষের অভাবে যে ভাবে কষ্ট পাইতেছিল, তাহা এই কার্যে তাঁহার অনেকটা সহায় হইল। আবদুল্লাহ্ খাঁর উপেক্ষায় অথবা সম্ভবতঃ তাঁহারই নিজ কৌশলে তাহাদের পুরা নয়-মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল—এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইহার প্রতিকার করার কিম্বা তাহাদিগকে প্রতিকারের পথ দেখাইবার কেহই ছিলনা। কাজেই এই সময়ের মধ্যে আবদুল্লাহ খাঁর নব-সংগৃহীত সৈন্য-সংখ্যা পুরাপুরি ২০০০০ হাজারে উঠিল। তদুপরি ব্যবহারের

গুণে অন্য লোককে স্বপক্ষে টানিয়া আনিয়া শক্তিবৃদ্ধি করার কৌশলও তাঁহার জানা ছিল। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ঃ

এই সময়ের মধ্যে সরবুলন্দ খাঁর দুর্দশা চরমে উঠিয়াছিল ; ইহার কারণ এই নহে যে, তিনি বরাবর দরিদ্র ছিলেন এবং সম্প্রতি তাঁহার জায়গীরও কাড়িয়া নেওয়া হয় ; বরং ইহার বিশেষ কারণ এই যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে যে সকল সৈন্য লইয়া আসেন, তাহাদের ভরণ-পোষণে তাঁহার সর্বস্ব ফুরাইয়া যায়। তাহারা এখন তাঁহাকে তাহাদের বকেয়া পাওনা ও বেতনের জন্যে উৎপীড়ন করিতেছিল। নিজেকে একেবারে ফতুর করিয়া ও তাঁহার নিজ তহবিল হইতে তাহাদের বিপুল দাবী মেটান তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। হতাশ হইয়া তিনি তাঁহার সৈন্যদের চীৎকার ও অন্যান্য মহাজনের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য যতদুর কুলায় তাহাদিগকে তাঁহার হাতী, অশ্ব, সৈন্যদলের সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ও জাওহেরাত ছাড়িয়া দিতে মনস্থ করিলেন। অতঃপর তিনি ধর্মনৈতিক পোশাক পরিয়া ফকীর সাজিতে চাহিলেন। নিজামুল মুল্‌কের অবস্থাও তাঁহার চেয়ে ভাল ছিল না। ঐ সেনাপতিকে নিতান্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া ও ওজারতের রত্নাধার দানের পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিয়া ডাকিয়া আনা হয়। তিনি শুধু তাহাতেই নিরাশই হন নাই, তাঁহার দখলী মূল্যবান জায়গীরও তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। ইহা বাদশাহের নুতন প্রিয়পাত্র ইতিকাদ খাঁকে প্রদান করায় তিনি বিরক্ত হন। বাদশাহ্ এই লোকটির প্রতি এত অধিক আসক্ত ছিলেন যে, এভিন্ন আর কাহারও জন্য তাঁহার চক্ষুকর্ণ ছিলনা বলিয়াই মনে হইত। তিনি তখন অবসর জীবন যাপন করিতেন, কখনও দরবারে যাইতেন না ; অন্নকষ্টে তিনি শুকাইয়া যাইতেছিলেন। এই সকল ব্যাপার উজীরের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রাসাদে গমনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিলে তিনি সরবুলন্দ খাঁর সামরিক কর্মচারী ও তাঁহার অন্যান্য মহাজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাদের সমস্ত পাওনা হিসাব করিয়া নিজের ব্যক্তিগত কোষাগার হইতে তাহা মিটাইয়া দিলেন ; তদুপরি কাবুলের শাসনকর্তার শূন্য পদে নিয়োগের জন্যও তাঁহার নাম সুপারিশ করিলেন। অতঃপর তিনি নিজামুল মুলকের প্রতি

মনোনিবেশ করিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে মালবের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া ভরসা দিলেন। এই দুইটি কার্যের দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ-রূপে ঐ দুইজন আমীরের চিত্তজয় করিয়া ফেলিলেন। ঠিক এই সময় মুহম্মদ আমীন খাঁ কোন ছুটি না লইয়া বা কোন পুনরাহ্বান পত্র না পাইয়াই মালব হইতে অকস্মাৎ দরবারে হাজির হইলেন। এই মতলববাজ শাসনকর্তা সেরোঞ্জ পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানে দরবার হইতে আর কোন উপদেশ না পাইয়া এবং দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হুসায়ন আলী খাঁ রাজধানী যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাঁহার কার্যস্থল ত্যাগ করিয়া দরবারে গমন করিলেন। বাদশাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজী না হইয়া, বরং তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। যেইমাত্র ইহা আবদুল্লাহ্ খাঁর কর্ণগোচর হইল, অমনি তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং উপহার ও অনুগ্রহ বিতরণে তাঁহাকে নিজের দলভুক্ত করিলেন। এই প্রকারের যুদ্ধে তিনি এতই সফলকাম হইলেন যে, খোদ খান দুরান পর্যন্ত এখন উজীরের পক্ষে গমন করিলেন এবং তাঁহার সমস্ত গোপনীয় ব্যাপারে তদীয় আস্থাভাজন হইলেন। অথচ আমীর জুমলার সহযোগিতায় কলহ অঙ্গারে ফুৎকার দিতে ইনিই ছিলেন প্রধান সহকারী।

এতগুলি দলত্যাগে বাদশাহের মন অপ্রসন্ন না হইয়া পারিল না। এই সকল দলত্যাগীকে শাস্তিদানের জন্য তিনি প্রত্যহ ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন। একদিন বাদশাহ্ একদল শিকারী লইয়া বাহিরে চলিলেন। তাঁহার পরিষদ-বর্গের সহিত স্থির হইল যে, প্রত্যাবর্তনকালে তিনি উজীরের বাড়ীতে গমন করিবেন; মহারাজা অজিত সিংহের বাসা রাস্তার উপরে এবং উজীরের প্রাসা-দের নিকটে বলিয়া তাঁহারা আশা করিলেন যে, হিন্দু রাজা কুর্নিশ করিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবেন ও তাঁহাকে নজর দিবেন; তাহা হইলে সহজেই তাঁহাকে গ্রেফতার করিতে পারা যাইবে, অথচ বাদশাহ্ ষড়যন্ত্রে আছেন বলিয়া বুঝা যাইবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ, সায়িদদের প্রতি অনুরক্তির জন্য তিনি কত অধিক বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা হিন্দু রাজার জানা ছিল, অথবা হয়তো তিনি সময় মত প্রকৃত মতলবের সংবাদ পাইয়া থাকিবেন; কাজেই তিনি ভাবী বিপদাশঙ্কায় উজীরের প্রাসাদে গমন করা সঙ্গত মনে করিয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অকৃতকার্যতার ফলে

বাদশাহের মন দমিয়া গেল। তাঁহার অনুচরদের কিয়দংশ ইতঃপূর্বেই উজীরের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিল এবং উজীর নিজেও বাহিরে আসিয়া কুর্নিশ করার মুহূর্তের অপেক্ষায় নদীর ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। তথাপি বাদশাহ্ বিপরীত তীরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন এবং তাঁহার মাঝিদিগকে মধ্য-নদী দিয়া নৌকা চালাইবার আদেশ দিয়া শীঘ্রই প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন।

ইতোমধ্যে হুসায়ন আলী খাঁ আওরঙ্গাবাদ ত্যাগ করিয়া পূর্ণ গতিতে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার সৈন্য ছিল অজস্র। শিবিরের অনুচরদের সংখ্যা ছিল আরও অধিক। তথাপি তিনি এত কঠোরভাবে শৃঙ্খলা রক্ষায় বাধ্য করেন যে, প্রতিরাতে তাঁহার শিবির-বেষ্টনীর মধ্যে বহু গ্রাম পড়িলেও কেহ উহাদের কোন লোকের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতেও সাহসী হইত না। এক দরিদ্র বিধবার মেয়ে কদাচিৎ খাইতে পাইত। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া সে একদা রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ লইয়া কিছু সাহায্যের সন্ধানে তাঁবুগুলির আশেপাশে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল। এক ব্যক্তি বাস্তবিকই কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিতেছিল। কেহ তাহার যত্ন করিলে সে তাহার সঙ্গে যাইতে রাজী আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে মেয়েটি তাহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া লোকটার পাশেই ঘুমাইয়া পড়িল; লোকটিও দীর্ঘপথ অতিবাহনের ক্লান্তিতে অভিভূত হইয়া সারারাত গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিল, মেয়েটির কথা তাহার মনেও হইল না। প্রত্যুষে সে তাহাকে তাহার মালবাহী উটের পিঠে বসাইয়া মালপত্রের সঙ্গে পাঠাইয়া দিল। ইতোমধ্যে বিধবাটি বৃথাই গভীর রাত্রি পর্যন্ত মেয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া এক মুহূর্তও ঘুমাইতে পারিল না। সুবাদার একটা উচ্চস্থানের নিকট দিয়া যাইবে জানিয়া প্রত্যুষে সে তাঁহার উপরে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল। দূর হইতে তাহার হস্তী দেখিতে পাইয়া সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, একটা কুমারী কন্যা—সুবাদারের দুঃখিনী বাঁদীর একমাত্র অবশিষ্ট সম্পত্তি গত রাতে কিছু খাদ্যের সন্ধানে শিবিরের পাশে ঘুরাফিরা করিতেছিল; বাহ্য লক্ষণ দ্বারা যত দূর বুঝা যায়, তাঁহার কোন লোকে তাহাকে ভাগাইয়া নিয়াছে।" অশ্রু বন্যা বহাইয়া সে আরও বলিল, "একমাত্র সন্তান ভিন্ন

সুবাদারের রাজধানী গমন পথে সৈন্যদের শৃঙ্খলা রক্ষা

একটি করুণ কাহিনী

তাহার পক্ষে প্রাণধারণ করা অসম্ভব; কাজেই তাহার আশা, দুঃখিনী বিধবা ও যাবতীয় মজলুমের প্রতি করুণাবশতঃ তাহার মেয়ের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে থামিতে মর্জি করিবেন।"

মেয়েলোকটির অশ্রু দর্শনে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া সুবাদার তাহার গতি-রোধ করিলেন এবং তাহার অভিযোগের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত পানা-হার করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া সমগ্র বাহিনীতে কড়া অনুসন্ধান চালাইবার আদেশ দান করিলেন। এই আদেশ পাইয়া বখ্শীরা তাঁহাদের তালিকা উপস্থিত করিলেন এবং সর্বত্র তাঁহাদের কর্মচারী পাঠাইয়া সঠিক-ভাবে অনুসন্ধান চালাইবার জন্য প্রত্যেক সেনাপতিকে সৈন্যদলের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করিতে হুকুম করিলেন। উচ্চপদস্থ ধার্মিক লোকদের ইচ্ছায় সাহায্য করার জন্য ফিরিশতারা নিয়ত প্রস্তুত থাকেন বলিয়া কিয়ামতের দিনের জনতার সমকক্ষ ও সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় সঞ্চরণশীল এই বিশাল জনসঙ্ঘেও তল্লাশীর ব্যাপারে কোনই প্রতিবন্ধক হইল না। সামান্য অনুসন্ধানের পর ঐ ব্যক্তি ও মেয়েটি দুইজনকেই দেখিতে পাইয়া তাহারা তাহাদিগকে সেনাপতির নিকট লইয়া আসিল। তিনি মেয়েটির দিকে চাহিয়া কিরূপে সে বিপথগামিনী হয় ও কেহ তাহার দেহে হস্তার্পণ করিয়াছে কিনা, জানিতে চাহিলেন। মেয়েটি বলিল, প্রত্যহ ক্ষুধার জ্বালা ও অনাহারের চিন্তা অসহ্য হওয়ায় তাহার কষ্টের শেষ হইবে আশায় সে স্বেচ্ছায় লোকটার অনুগমন করিয়াছে। উভয়ই সারারাত গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত থাকায় সে তাহার গাত্র স্পর্শ করে নাই। তাঁহার শিবিরে মেয়েটির সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকায় এবং শোকাভিভূতা জননীকে সান্ত্বনা দানের সামর্থ্য হওয়ায়—এই উত্তরে তিনি আল্লাহতা'লার নিকট শুকুরগুজারি করিলেন। যুগপৎ তিনি সমগ্র বাহিনী দূরে না যাওয়া পর্যন্ত তাহাকে তাহার গৃহ ত্যাগ না করার জন্য আদেশ দিয়া তাহার সঙ্গে তাহার একজন প্রহরী পাঠাইয়া দিলেন।[৮]

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হুসায়ন আলী খাঁ শিবিরের সরঞ্জাম ও এক সারি কামান প্রস্তুত করার জন্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাইফুদ্দীন আলী খানকে বুরহানপুরে প্রেরণ করেন। সেদিন ১১৩১ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল। কিন্তু ঐ নগর শাহজাহানাবাদের রাজপথের উপর অবস্থিত বলিয়া তিনি রাজধানী

হইতে আর একখানা পত্রের জন্য অপেক্ষা করিলেন এবং উহা পাইলে শেষ সিদ্ধান্ত করিতে মনস্থ করিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার ভ্রাতার বিপদের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। কিছু কাজ করার জন্য সেই রাজ্যে কয়েক দিন মাত্র অবস্থানের পরেই তিনি যাত্রা আরম্ভ করেন। তখন বাদশাহের রাজত্বের সপ্তম বৎসর মোতাবেক ১১৩২ হিজরীর মুহররমের প্রথম ভাগ। তাঁহার নিজের এক চাচাত ভাইসহ বহু সংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। তাঁহার এই চাচাত ভাইকে নওয়াব আউলিয়া বলা হইত, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম আসাদুল্লাহ্ খাঁ। এতদ্ব্যতীত সেই আমীরের সমস্ত সন্তান, জাননিসার খাঁ, বেরারের শাসনকর্তার সহকারী এখলাস খাঁ; আলী মর্দন খাঁর আত্মীয় লুলা আসাদ আলী খাঁ, সাদেকের ভ্রাতা পানিপথের দিলরী খাঁ, খান আলমের ভ্রাতুষ্পুত্র একতিসাম খাঁ, হাজী সয়ফুল্লাহ্ খাঁ, সমগ্র দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান যয়নুদ্দিন খাঁ এবং বারের অন্যতম বিখ্যাত সয়্যিদ বখ্শী ফিরোজ আলী খাঁও তাঁহার পক্ষে ছিলেন। রাজা প্রতাপ সিংহ বুন্দেলা, সুবাদারের দরবারের অন্যতম বিখ্যাত আমীর রাজা মোহকাম সিংহ প্রভৃতি কতিপয় হিন্দুরাজাও এ ভাবে স্বেচ্ছায় তাঁহার সহগামী হন। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত সরকারী কর্মচারীর কিছু স্বেচ্ছায়, কিছুটা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। সমুদ্র লহরীর ন্যায় তাঁহার অজস্র সৈন্যে ময়দান ভরিয়া যায়। দশ বার হাজার মারাঠাসহ তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যাই ছিল পুরা ত্রিশ হাজার। মনসবদার বা সামরিক কর্মচারীরা ইতঃপূর্বে সুবাদার বা শাহ্জাদার পক্ষে কখনও তাঁহাদের গৃহ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের অনেকেই এখন সঙ্গে আসিতে বাধ্য হওয়ায় পদাতিকের সংখ্যা অগণিত হইয়া দাঁড়ায়। আহ্মদাবাদ প্রভৃতি কতকগুলি দুর্গে তিনি নিজে সৈন্য রাখেন। কতকগুলিতে তিনি মারাঠাদিগকে সৈন্য রাখিতে দেন।

এ সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া গেলে বুরহানপুরের চতুষ্পার্শ্বে কর্তব্যকার্য সম্পাদনে কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন। অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইয়া তিনি আকবরপুরের পার্শ্ববর্তী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। হুসায়ন আলী খাঁর মন শান্ত করিতে এবং তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তনে রাজী করাইতে বাদশাহ্ এখলাস খাঁ নামক যে আমীরকে প্রেরণ

করেন, মাণ্ডুতে পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। "কিরূপে দুইবার বিবাদভঞ্জন হইয়া দুইবারই ভাঙ্গিয়া যায়, কিরূপে সর্বত্র অসন্তোষ ও বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিরূপে সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ লোকেরা রাজধানীতে সমবেত হইতেছিলেন, নিজামুল মুল্‌ক ও মুহাম্মদ আমীন খাঁ উভয়েই কিরূপে বিরক্তিভরে রুষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, এবং বাদশাহ্‌ই বা কিরূপে ইতিকাদ খাঁর প্রতি পূর্বাপেক্ষা আরও আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন"— এই আমীর এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তাহা (হুসায়ন আলী খাঁর নিকট) বর্ণনা করিলেন। এই সমুদয় ব্যাপার উহাদের স্বাভাবিকরূপে প্রদর্শিত হইলে সুবাদার তাঁহার ভ্রাতার ভাগ্যের জন্য অধীর না হইয়া পারিলেন না। পথিমধ্যে সমস্ত শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের বশ্যতা ও অভিনন্দন গ্রহণ করিতে করিতে তিনি উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু মান্তর যশস্বী সেনাপতি মরহামাৎ খাঁ তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করায় তিনি অপ্রসন্ন হইলেন। সেই দেশের বিদ্রোহী জমিদারদিগকে বশে আনিবার জন্য দরবার হইতে প্রেরিত হইয়া তিনি ঐ কার্য সম্পাদন করতঃ কৃতিত্ব লাভ করেন। এই কর্মচারীটি সুবাদারকে দর্শনদানে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধী ও বিরক্তিকর হইয়া পড়েন। তাঁহাকে পরিণামে ইহার ফল ভোগ করিতে হয়। তাঁহার সৈন্যদল যখন উজ্জয়িনীর নিকটে পূর্ণ গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, তখন সংবাদ আসিল যে, সুবাদারের রাজধানী যাত্রায় ভয় পাইয়া বাদশাহ্‌

নূতনভাবে উজীরের সহিত বিবাদভঞ্জন

উজীর আবদুল্লাহ্‌ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত নূতন সন্ধি করায় সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে। তিনি আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম স্পর্শ করিয়া এখন হইতে তদীয় পরিবারের বন্ধু হইবেন বলিয়া যথাবিধি হলফ লইয়াছেন এবং অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ নিজের মাথা হইতে পাগড়ী খুলিয়া তাহা উজীরের মাথায় পরাইয়া দিয়া তাহার আপত্তি শেষ করিয়াছেন। এই সকল প্রতিকারেও সন্তুষ্ট না হইয়া বাদশাহ্‌ ইতিকাদ খাঁ ও তাঁহার অন্যান্য প্রিয়পাত্রকে সমস্ত অসন্তোষ বিস্মৃতির নিম্নে কবর দিতে, যে সকল বিরোধের ফলে তাঁহার দরবারে ফাটল ধরিয়াছে এই দিনকে তাহার শেষ দিন বলিয়া গণ্য করিতে এবং এখন হইতে তাঁহার উজীরের সহিত সদ্ভাবে

কালযাপন করিতে দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ করিয়াছেন। এই বর্ণনায় হুসায়ন আলী খাঁ দৃশ্যতঃ অভিভূত হইয়া নিজ দরবারের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বাদশাহ্ যখন অকপটে তাঁহাদের (দুই ভ্রাতার) সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, তাঁহাদের তরফ হইতে তাঁহারাও এখন হইতে কর্তব্যপরায়ণ প্রজারূপে ব্যবহার করিবেন; এখন বাদশাহের প্রতি আমার সম্মান জানাইয়া তৎপরে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন ভিন্ন আর কিছুই আমার কাম্য নহে।" দরবারের অধিকাংশ লোকই ছিল দক্ষিণী। তাহাদের প্রত্যেকেই অচিরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের আশায় ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু সুবাদারের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এই উক্তির অত্যন্ত পৃথক অর্থ করিলেন। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, তাঁহাদের সহিত গোপনে মিলিত হইলে তাঁহাকে বলিতে শুনা গেল: "বাদশাহের এই সমস্ত সাক্ষাৎকার প্রহসন বই নহে। তাঁহার সমস্ত প্রতিকার শুধু তাঁহাকে ঘুম পাড়াইবার[২] বা অন্ততঃ তাঁহার যাত্রা বন্ধ রাখিবার গল্প মাত্র। তাঁহার প্রতিশ্রুতিতে বিন্দুমাত্রও সত্য নাই, তিনি তাঁহাকে এত ভালভাবে জানেন যে, তাঁহার উপর আদৌ কোন আস্থাজ্ঞাপন করা যায় না। তিনি আরও বলিলেন, "আপনারা নিশ্চিত জানিয়া রাখুন যে, তিনি যদি আমাদিগকে তাঁহার থাবায় পাওয়ার কোন সুযোগ লাভ করেন, তবে কিছুতেই তাহা নষ্ট করিবেন না। এবং আমাদের সম্মান বা প্রাণ রক্ষাও সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত জানুন যে, তিনিও আমাদের মুঠির ভিতরে পড়িলে আমরাও তাঁহার সহিত অধিকতর ভাল ব্যবহার করিব না।"

অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এই সকল কথা বলিয়া তিনি শিবির ভাঙ্গিয়া রাণার রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কয়েকটি গ্রাম লুণ্ঠিত ও কিছু ধ্বংসক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু হিন্দু রাজার উকীল বা দূত কিছু পেশকুস বা অর্থ লইয়া আসিলে রাজ্য রক্ষা পাইল। এ বিষয়ে এত কঠোর আদেশ প্রদত্ত হইল যে, আর কোনই ক্ষতি করা হইল না। কিন্তু রাজা জয়সিংহ সিবায়ীর রাজ্যের অবস্থা হইল স্বতন্ত্র। ইহার অধিপতি বাদশাহের দৃঢ়সমর্থক ছিলেন বলিয়া সমগ্র দেশ লুণ্ঠিত হইল। রাজার প্রধান গোমস্তা যথাই সুবাদারের নিকট দীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে

প্রচুর অর্থ উপহার দিলেন। কিন্তু এই শিষ্টাচার প্রত্যাখ্যাত এবং তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেকটি বস্তু সৈন্যদের লোলুপতা ও প্রচণ্ডতার নিকট পরিত্যক্ত হইল। অসংখ্য ফসলের মাঠ বিধ্বস্ত ও যুবক-যুবতীদের বন্দী করা হইল; এই সকল অত্যাচারের সম্পর্কে কোনই তদন্ত করা হইল না। অত্যল্পকাল মধ্যে সৈন্যদল রাজধানী হইতে মাত্র ৩।৪ দিনের পথ দূরে উপস্থিত হইল। সর্বোচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এত শক্তিশালী সুবাদারকে তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করিতে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের অনুচরে রাজপথগুলি ভর্তি হইয়া গেল। জাফর খাঁ ও রতন চাঁদ ছিলেন এই বড় লোকদের অন্যতম। বিপুল সংখ্যক সর্বাপেক্ষা ধনবান ব্যক্তিসহ এই সমুদয় লোক সম্মানজনক ব্যবহার করায় সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। কিন্তু জাফর খাঁ তাঁহার অজস্র অনুচর প্রদর্শন করায় এবং একারণে তাঁহাকে কতকটা গর্বিত বোধ হওয়ায় উপেক্ষিত, এমনকি উপহাস্যাস্পদ হইলেন; ইহা তাঁহার প্রাণে বাজিল। সুবাদার ও তাঁহার ভ্রাতা উজীরের এই ঔদ্ধত্য অজস্র কথকের দ্বারা অবিশ্রান্ত পুষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা নিজেদের খাতিরে নূতনত্ব চাহিত বলিয়া সত্য মিথ্যা বিবরণ দ্বারা তাঁহাদের মন বিষাক্ত করিতে লাগিল। এরূপ বিরোধের পরিণাম কি মারাত্মক হইতে পারে, তৎসম্পর্কে ওয়াকিফ হাল না থাকায় তাহারা বাদশাহ ও সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভিতরের চিরন্তন ভাঙন প্রশস্ত করার জন্য নিত্য-নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিত। রতন চাঁদ ছিলেন তাহাদের সেরা। সাধারণভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁহার ধর্মনৈতিক উৎসাহ ও বিশেষভাবে বাদশাহ ও সাম্রাজ্যের অজস্র উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদের প্রতি শত্রুতা দ্বারা তাড়িত হইয়া তিনি এরূপ বিষাক্ত বিবরণ দেন ও সুবাদারের মন এত অধিক পরিমাণে উত্তেজিত করেন যে, ইহা সম্পূর্ণ দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। অপরিমিতরূপে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া তিনি নগর সন্নিধানে আগাইয়া আসিয়া ফিরোজ শাহের বুরুজের নিম্নে শিবির স্থাপন করিলেন। ইহা ছিল রবীউল আউয়ালের প্রথম দিন। তাঁহার তাঁবুর নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার জন্য নহবত বাজান হইল; খোদ বাদশাহ ব্যতিরেকে আর কাহারও খাতিরে এমন করা হয় না। প্রকৃত শাহী শান-শওকত ও অনুচরবর্গের সহিত তাঁবুতে প্রবেশ

সুবাদার নিজেকে প্রজা মনে করেন না

করার পর তাঁহাকে বলিতে শোনা গেল গেল: 'যেহেতু আমি নিজেকে প্রজা বলিয়া মনে করিনা। কাজেই আমার মতে শিষ্টাচারের আর এত বাড়াবাড়ি নিষ্প্রয়োজন'।

এমনকি এত কিছুতেও ভীরু বাদশাহের জড়তা ভাঙ্গিল না। চিরন্তন অসংলগ্ন ও অব্যবস্থিত চিত্ত বলিয়া আজ বাদশাহী রোষ ও ইহার পরিণামজাত শাস্তির কথা বলিলেও, পর দিন তাঁহার মুখে শুধু ধৈর্য ও কপটতার কথাই শোনা গেল; এমন কি তিনি পুনর্মিলন ও নূতনভাবে প্রতিজ্ঞা ও শর্ত নির্ধারণের দিকেও কতকটা অগ্রগতি সাধন করিলেন। এত অধিক দুর্বলতায় এমনকি তাঁহার সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ভৃত্যেরাও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। এত অধিক অনিশ্চয়তায় ক্লান্ত হইয়া একবার রাজা জয়সিংহ তাঁহার নিকট দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত দুর্গের বাহিরে আসিয়া স্বয়ং তাঁহার গৃহস্থালী ও সৈন্যদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ ঐ বিদ্রোহী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর আপতিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনার সৈন্য ও বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা গণনায় মোটামুটি আপনার শত্রুদের অনুচর সংখ্যার দ্বিগুণের চেয়ে কম হইবে না। যেই মাত্র তাহারা দেখিতে পাইবে যে, আপনি প্রকাশ্যেও উদ্যমের সহিত কাজ করিতেছেন, তাহারা সর্বস্থান হইতে আপনার নিকট সমবেত হইবে এবং আপনাকে আপনার শত্রুদিগকে শাস্তি দান করার মত শক্তিশালী করিবে। আমি এমনকি ইহাও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক যে, যে সকল লোক দুই ভ্রাতার পতাকার অনুসরণ করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে, এরূপ দৃশ্য দর্শনে তাহাদের অনেকেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের বৈধ মনিবের নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে সাহায্য করিবে। তৎফলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আশার তুঙ্গ স্থান হইতে নিপতিত হইয়া হুজুরের মর্জি মোতাবেক চলিতে বাধ্য হইবেন।"

জয়সিংহ সেবায়ীর সৎসাহসী উপদেশ প্রত্যাখাত

এই সৎসাহসী উপদেশে কোনই ক্রিয়া হইল না। তাঁহার মেজাজের চপলতা ও তাঁহার অযোগ্য প্রিয়পাত্রদের খাতিরে তাঁহার হতবুদ্ধিতা দেখিয়া দরবারের আমীরদের কেহই নিজের মনোভাব ঘোষণা করা বা

যে ব্যাপারে তিনি নিজেই সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহাতে অগ্রগামী হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জয়সিংহের উপদেশে যখন কর্ণপাত করা হইল না, অন্ততঃ অকপটে বিবাদ মিটাইবার জন্যও কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গৃহীত হইল না। রাজমুকুটের সম্মান রক্ষায় আগ্রহান্বিত বহু আমীরের ধীরস্থির উপদেশও উপেক্ষিত হইল। তাঁহার মনের খেয়াল বা তাঁহার নির্বোধ প্রিয়পাত্রদের প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই বাদশাহের মনঃপুত না হওয়ায় সর্বত্র নিরুৎসাহ ছড়াইয়া পড়িল এবং তাঁহার নিজের স্বার্থ নষ্ট হইতে বসিল। এমতাবস্থায় তিনি যে পরিশেষে শেষ পরিণতি দেখিতে পান, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। তেমনি জ্ঞানী ও সাহসী শত শত আমীর অবশিষ্ট শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অধৈর্য ও বিরক্তির অনলে পুড়িয়া মরিতেছিলেন। তাঁহাদের হাত বদ্ধ এবং তাহারা নিষ্কর্ম থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের কান্না পাইতেছিল। এমনকি যাঁহারা এ যাবৎ উজীরের পরিচালনাধীনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঔদ্ধত্য কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ স্বেচ্ছায় তাঁহার দলত্যাগ করিলেনা। বস্তুতঃ, অবস্থার মোড় ফিরিতে পারিত; এমন সময় উজীর নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া ও সঙ্কটকাল ত্বরান্বিত করিতে বাধ্য হইয়া বাদশাহ্‌কে নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠাইলেন—"হুজুর মেহেরবানী করিয়া পরিবারের সেই পরিচিত শত্রু জয় সিংহকে আপনার দরবার হইতে বরখাস্ত করিয়া তাঁহার স্বরাজ্যে ফেরৎ পাঠাইলে এবং সেই অনুগ্রহের সহিত আরও দুইটি যোগ করিলে অর্থাৎ গোলান্দাজ বাহিনীর মীর আতেশ ও দুইটি দেওয়ানের[১০] পরিদর্শকের পদ দুইটি আমাদের বন্ধুদের প্রতি অর্পণ করিলে এবং শাহী দুর্গে আমাদের নিজস্ব পূর্ব-সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আমাদিগকে অনুমতি দিলে আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য আমরা দুই ভাই আমাদের আশঙ্কামুক্ত হইয়া পূর্বের ন্যায় আপনার সেবা করিতে থাকিব।" এইরূপ সংবাদে বাদশাহ্ তাঁহার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিলেন, ঐ পদ দুইটি প্রকৃত-পক্ষে উজীরের বা তাঁহার বন্ধুদের দখলেই ছিল। শ্রমসাধ্য অংশ সম্পাদন ভিন্ন কিছুই তাঁহাদের নিকট হইতে বন্ধ রাখা হয় নাই। উজীরের সহকরী

হিসাবে অবশ্য তাহা এতিকাদ খাঁর উপর বর্তে। সে যাহা হউক, নববর্ষ দিনে এই সহকারীর পদ আপনা-আপনিই শেষ হইয়া যাইবে। জয়সিংহকে ইতঃপূর্বেই—৩রা রবীউল আউয়াল তৎক্ষণাৎ স্বরাজ্যে গমনের আদেশ প্রদত্ত হয়; তদনুসারে তিনি দরবার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।''

এত কোমল উত্তরে ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহস আরও বাড়িয়া গেল মাত্র; ইহার বিশেষ কারণ এই যে, দিন দিন ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ফররুখ সিয়ারের মনে বিন্দুমাত্রও সাহস নাই। তিনি সায়্যিদদিগকে ঘৃণা এবং তাঁহাদের ধ্বংস কামনা করিতেন সত্য, কিন্তু তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ এই বিদ্রোহীদের ঘাড়ে পতিত হওয়ার জন্য তাঁহার সর্বাপেক্ষা সাহসী ভৃত্যেরা তাঁহাকে বরাবর উৎসাহিত করা সত্ত্বেও তিনি এতই ভীরু ছিলেন যে, দুর্গের বাহিরে গিয়া তাঁহার শত্রুদিগকে আক্রমণ করা দূরের কথা, নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতেও সাহসী হন নাই। নিজের দৃঢ়বিশ্বাস ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি উজীরের প্রার্থিত বিষয়ে সম্মতি প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে ৫ই রবীউস্সানী ঐ উজীর তাঁহার স্বার্থের প্রতি অনুরক্ত একদল খ্যাতনামা ব্যক্তি পরিবৃত হইয়া দূর্গে গমন করিলেন। এই সকল লোকের মধ্যে অজিত সিংহ সর্বপ্রধান। উজীর বাদশাহের সৈন্য ও কর্মচারীদিগকে তাহাদের সমস্ত পদ ও চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়া তৎপরিবর্তে নিজের লোক নিযুক্ত করিলেন। ফলে যে সকল অজস্র বিখ্যাত লোক প্রত্যহ বাদশাহের খেদমতে হাজির থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার প্রিয়পাত্র এতিকাদ খাঁ, জেনানার অধ্যক্ষ ইমতিয়াজ খাঁ, (বাদশাহ্ সমীপে দর্শনার্থীদের) পরিচয় দানকক্ষে জাফর খাঁ ও উজীরের চক্ষে সম্পূর্ণ নগণ্য অপর কয়েক ব্যক্তি এবং অল্প কিছু নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য ও খোজা ছাড়া আর কেহই অবশিষ্ট রহিল না। কয়েক ঘণ্টা পরে সুবাদার প্রকৃত বাদশাহী আড়ম্বরের সহিত তাঁহার সৈন্যদের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করতঃ যুদ্ধের ব্যূহ রচনা করিয়া শহরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলেন। তোরণ ও দুর্গ প্রাচীরগুলি দখলে আনিয়া তাঁহার সৈন্যেরা চতুর্দিকে এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িল যে, কয়েকটা রাস্তা আবৃত হইয়া গেল। দুর্গ পর্যন্ত গমন করিয়া তিনি সেখানে অবতরণ করিয়া অতি অল্পকালের জন্য বাদশাহকে দর্শনদান করিলেন। সকলেই লক্ষ্য

করিল যে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্পই বাক্য বিনিময় হইল। বাদশাহ্ তাহাকে বহু হাতী, অশ্ব ও মণিমানিক্য উপহার দিলেও তিনি তাহার অল্প কয়েকটি মাত্র গ্রহণ করিতে মর্জি করিলেন ও অবশিষ্টগুলি সম্পর্কে মাফ চাহিলেন। বিদায় বেলায় তিনি এত অমনোযোগের সহিত কুর্নিশ করিলেন যে, সকলেই তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল। এমনকি এবম্বিধ দৃশ্যও ফর্‌রুখ সিয়ারকে উত্তেজিত করতে পারিল না। তিনি নিশ্চল বসিয়া রহিলেন এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজ প্রাসাদের মধ্যেই নিজেকে তাঁহার মর্যাদা ও পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইতে দেখিলেন। দুইদিন পরে উজীর দুর্গে ফিরিয়া আসিয়া যে অল্প কয়েকজন লোক তখনও বাদশাহের সহিত সংলগ্ন ছিল, তাহাদিগকেও বরখাস্ত করিয়া সর্বত্র নিজের লোক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধুকে দুর্গদ্বারগুলির ভার প্রদান করিয়া তিনি গুপ্ত সিঁড়ির অর্থাৎ শয়নাগার ও সমস্ত বিচারালয়ের চাবি চাহিয়া পাঠাইলেন। সুবাদারের সৈন্যেরা এই দুইদিন ধরিয়া কয়েকটা রাস্তা ভর্তি করিয়া রাখিয়াছিল। যেইমাত্র তিনি অবগত হইলেন যে, দুর্গমধ্যে সব শান্ত, অমনি তিনি পূর্বের ন্যায় রাজকীয় আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সহিত বাহির হইয়া উক্ত রাস্তা কয়টি ঘুরিয়া দুর্গ সন্নিহিত তাঁহার প্রাসাদে গমন করিলেন। ইহা শায়েস্তা খাঁর বার-দুয়ারী[১১] নামে অভিহিত হইত। আশ্চর্যের বিষয়, শাহজাদা আকবরের ভাগ্যকারী পুত্রও তাঁহার সঙ্গে ছিল। তবে তিনি তাঁহাকে এমনভাবে হাতীতে বসাইয়া রাখিতেন যে, কেহই তাঁহার মুখ চিনিতে পারিত না। পরদিন প্রাতে উজীর দুর্গে গমন করিলেন এবং একবার যে পদগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন, পুনরায় সেগুলি প্রার্থনা করিয়া তিনি ও তাহার ভ্রাতা এই কয় বৎসর যাবৎ যে সকল অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ইতিহাসে তাঁহার কথাগুলি হুবহু রক্ষিত হইয়াছে, তাহা এই—

"আপনার অক্ষমতা ও বিপদের সময় আমরা আপনার যে গুরুত্বপূর্ণ উপকার করিয়াছিলাম, ইতঃপূর্বে আপনার পিতা ও পিতামহের ন্যায় আপনার সেবায়ও আমরা যে শোনিতপাত করিয়াছিলাম, আমাদের ন্যায় বিশ্বস্ত-ভৃত্যেরা তাহার বিনিময়ে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও আমাদের জীবন ও ইজ্জতের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ভিন্ন কিছুই পায় নাই। এই উক্তির প্রমাণের জন্য আমার

ভ্রাতার ন্যায় এত কৃতিত্বপূর্ণ ও এত নিরীহ একজন ভৃত্যকে ধ্বংস করার জন্য আপনি সেই অসভ্য দায়ুদ খাঁ পনিকে অস্ত্রধারণে উৎসাহিত করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এই সেই পত্র ভিন্ন আর কিছুরই দরকার নাই। আমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশ সাধনে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে আপনি দাক্ষিণাত্যের সমস্ত বড় লোকের নিকট অবিশ্রান্তভাবে বারংবার যে সকল জরুরী আদেশ প্রেরণ করেন—এই সেগুলি ব্যতিরেকে অন্য দলীলও আমাদের নিষ্প্রয়োজন। এখন আমাদের—আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের মন শান্ত করিতে পারে, এমন একটি মাত্র উপায় অবশিষ্ট আছে—তাহা হইল ইতঃপূর্বে আমরা যে দুইটি পদের জন্য অনুরোধ করিয়াছি, যে সকল বিদেশী আপনার মন বিপথে চালিত করিতে চাহে, তাহা এখনও তাহাদের হাতে না রাখিয়া আমাদের দখলে ছাড়িয়া দেওয়া। কারণ ঐ দুইটি অনুগ্রহ না পাইলে প্রজাহিসাবে দুর্গে আসা আমাদের পক্ষে নিরাপদ হইবে না, ভৃত্য হিসাবেও মনে কিছুমাত্র শান্তি লইয়া আমাদের প্রভুর সেবা করা অসম্ভব।"

বাদশাহ্ পুরাপুরিরূপে দেখিতে পান যে, অবস্থা যেরূপ সঙ্কটপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সায়্যিদিগকে তাঁহার প্রভু বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন চিরদিনই অসতর্ক ও নির্বোধ। এই বক্তৃতার উত্তরে তিনি শুধু শীঘ্রই তাঁহাদের সমস্ত অনুরোধ প্রতিপালিত হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইতঃমধ্যে কথোপকথন অপ্রত্যাশিতরূপে দীর্ঘ হওয়ায় বাক-বিতণ্ডায় নামিয়া গেল, তাহাতে বড় বড় কথা ও কর্কশ বাক্য বিনিময় হইল। বাদশাহ আত্ম-সংবরণে অসমর্থ হইয়া উজীর ও এতিকাদ খাঁ উভয়কেই গালাগালি করিলেন এবং অভদ্রোচিত ভাষা ব্যবহার করিলেন। এতিকাদ খাঁ আহমকের ন্যায় তাঁহাদিগকে শান্ত করার চেষ্টা করিলে উজীর তাহাকে সর্বাপেক্ষা কুৎসিৎ গালাগালি করিয়া থামাইয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুর্গের বাহিরে লইয়া যাওয়ার আদেশ দান করিলেন। এরূপ অপ্রত্যাশিত আদেশে বজ্রাহত হইয়া ইতিকাদ খাঁর উপস্থিত বুদ্ধি লোপ পাইল। অনেকটা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি তখন তাহার প্রাণ রক্ষার সঠিক মুহূর্ত উপস্থিত মনে করিয়া পশ্চাদ্বর্তন করিলেন এবং তাঁহার মুসায়েব বা প্রধান হিসাবরক্ষক কেরাণীর পাল্কী দেখিতে পাইয়া তাহাতে চাপিয়া বসিয়া

তাঁহার বেহারারা যত দ্রুত দৌড়িতে পারে, তত দ্রুত পালাইয়া গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে শহরের প্রত্যেকটা অংশে হাঙ্গামা বাঁধিল। যে সকল লোক দলে দলে প্রত্যেকটি রাস্তা ও গলির ভিতর দিয়া ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, তাহারাই এই হাঙ্গামার কারণ। তাহা হইতে বাদশাহ দিব্যচক্ষে তাঁহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন এবং পবিত্রস্থান (হেরেম) বা অন্তঃপুরে গমন করিয়া সেখানে তাঁহার বাসা লইলেন! অথচ "তুমি লোহার বুরুজে থাকিলেও মৃত্যু তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে।"—আল্লাহ্‌র কালামের এই ভীষণ বাক্য বরাবরই তিনি ভুলিয়া রহিয়াছিলেন এবং এই সময়ও ইহা তাঁহার মনে পড়িল না।

বাদশাহের সাম্রাজ্য ত্যাগ

এই গোলমাল ও এই আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যে সমস্ত উজ্জ্বলকারী সূর্য তাহার কপালে ধূলা মাখিয়া ফররুখ সিয়ারের নক্ষত্রের ন্যায় দিকচক্রবালের নিম্নে অবতরণ করিল এবং ভীতিপ্রদ রজনী তাঁহার কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন পরিয়া স্বর্গের প্রাচীর হইতে ক্রমশঃ গড়াইয়া পড়িয়া প্রত্যেকটা বস্তু অন্ধকার ও বিভীষিকায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দুর্গের যে সকল দ্বার ছিল একদা নিরাপত্তার দ্বার ও মনের শান্তি, সেগুলি বন্ধ হইয়া গেল; সেগুলি রুদ্ধ হইল—চিরতরে রুদ্ধ হইল! অজিত সিংহসহ উজীর সেই রাত্রে কেল্লার ভিতরে শয়ন করিলেন। পক্ষান্তরে বাদশাহের ভক্ত-ভৃত্যেরা বাহিরে তাহাদের বাসা লইতে বাধ্য হইল!

"অন্তঃসত্ত্বাকালের উদর হইতে আর কি কি দৃশ্য বহির্গত হয়,
তাহা দর্শনের জন্য প্রত্যেকেই হতভম্ব, নিশ্চল ও অধীর হইয়া রহিল।"

সেই চীৎকার ও বিশৃঙ্খলার রাত্র কিয়ামতের দিনের পূর্ববর্তী অন্ধকারের ন্যায় উহার কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে সমগ্র শহর আচ্ছন্ন করিয়া থাকায় বিশৃঙ্খল গণ্ডগোল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুত হইল না। কেল্লার ভিতরে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটিতেছিল, তাহাও কেহ জানিতে পারিল না। কেননা, সুবাদারের সৈন্যেরা শহরের সমস্ত বড় রাস্তা, বাজার ও দরজা অধিকার করিয়া সমগ্র রাত্রি সশস্ত্র অবস্থায় অতিবাহিত করিল। পক্ষান্তরে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে আহূত

হওয়ার প্রত্যাশায় মারাঠা কর্মচারীরা তাঁহাদের অশ্বারোহীসহ অশ্বপৃষ্ঠে রহিলেন। কিন্তু প্রত্যুষকাল আরম্ভ হওয়া মাত্র প্রত্যেকটা নাগরিক অনিশ্চিত অবস্থায় ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দোদুল্যমানচিত্তে গাত্রোত্থান করিল। সূর্য যখন উজীরের সুবর্ণ পতাকার উপরে তাহার প্রথম কিরণ বর্ষণ করিতেছিল, তখন একটা জনরব উঠিল যে, তিনি নিহত হইয়াছেন; রাস্তায় ও বাজারে চীৎকার ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শুনা গেল না। ঠিক এই অনিশ্চয়তার মুহূর্তে কেবল সার্বজনীন গুজব হইতে ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা শ্রবণে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া কয়েকজন গণ্যমান্য আমীর বাদশাহের সাহায্যে ও তাঁহাদের অনুমিত তদীয় সমর্থকদের সমর্থনে গমন করা নিজেদের কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। ইহারা ছিলেন তাঁহার শ্বশুর সাদত খাঁ, ছাগলদাড়ি গাযীউদ্দীন খাঁ ও সাহসী তুর্ক আগীর খাঁ। এই তিন ব্যক্তি যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহাদের লইয়া অশ্বারোহণে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নিজামুল মুল্‌ক ও খান দুরান গৃহে বসিয়া থাকাই বিজ্ঞোচিত হইবে বলিয়া মনে করিলেন। পক্ষান্তরে মুহম্মদ আমীন খাঁও অশ্বারোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল উজীরের সাহায্যে গমন। কিন্তু কম্বল-পোষ বা কম্বল পরিধানকারী[১২] নামে অভিহিত একদল সৈন্য তাহাদের সেনাপতি খান দুরানের সহিত যোগদান করিতে যাইতেছিল। তাহারা হঠাৎ একদল মারাঠা অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ পাইল। ইহারা তাহাদেরকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে নিষেধ করায় তাহারা তীর বৃষ্টি করিয়া এই ভীতি প্রদর্শনের উত্তর দিল। এমন সময় মুহম্মদ আমীন খাঁর পতাকারাজি বিপরীত দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। মারাঠারা তাহাদের সকলকেই শত্রু মনে করিয়া এবং কেবল রাস্তায় ও গলিতে যুদ্ধ করিতে পারিত না বলিয়া নগর প্রাচীরাভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকা পছন্দ না হওয়ায় আর কোন খোঁজ-খবর না লইয়াই আতঙ্কে ঘোড়ার পিঠে জুতার কাঁটা মারিয়া চতুর্দিকে পলাইয়া গেল। যে সকল অলস ব্যক্তি ও শঠ রাস্তায় ভিড় জমাইয়াছিল, তাহারা এবং মোগল ও অন্যান্য বরখাস্ত সৈন্যেরা ইহাতে অনির্বচনীয়রূপে সন্তুষ্ট হইল। ঐ সকল বিধর্মীর ঔদ্ধত্যে ইতঃপূর্বেই ক্রোধোদ্দীপ্ত হওয়ায় তাহারা বিশৃঙ্খলভাবে তাহাদের ভিতরে ছুটিয়া গিয়া পলাতকদিগকে হত্যা

শহরের সর্বত্র উত্তেজনা

করিতে আরম্ভ করিল। প্রতি রাস্তায় ও প্রতি দরজায় শত্রু ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না পাইয়া তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া আরও দূরে তাহাঁদের শিবির পর্যন্ত গেল; তাহাদের ১৫০০ লোক ঘটনাস্থলে পড়িয়া রহিল। ইহারা এবং জনৈক সিন্তা এবং আরও ২/৩ জন কর্মচারীর গোটা সৈন্যদল খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। তাহাদের অনেকে আহতও হইল। সমস্ত নিহত ব্যক্তির অশ্বগুলি বিজেতা ও জনতার হস্তগত হইল। তাহারা দৈবক্রমে কয়েকটি জিন ভাঙ্গিয়া ভিতরে মোহর ভর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

শহরে জনতা কর্তৃক একদল মারাঠা অশ্বারোহী ধ্বংস

ঠিক এই মুহূর্তে মুহম্মদ আমীন খাঁ স্বসৈন্যে সুবাদারের শিবিরে উপস্থিত হইলেন; সেখানে তৎপরতার জন্য সর্বোচ্চ প্রশংসার সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইল। রাস্তার যখন এ সমুদয় ব্যাপার সম্বটিত হইতেছিল, সাদৎ খাঁ তখন তাঁহার পাঁচ পুত্রসহ একদল সৈন্য লইয়া দুর্গের নিকটে উপস্থিত হইলেন, গাযীউদ্দীন খাঁও আর একদল লইয়া আসিলেন। বাদশাহের প্রিয়পাত্র এতিকাদ খাঁ ও গোলোন্দাজ বাহিনীর ভূতপূর্ব মীর আতেশ সায়িদ খাঁর আনীত সৈন্য দ্বারা বিপরীত দিকের রাস্তাগুলি পূর্ণ হইয়া গেল। ইহাদের পরে আসিল মনহর নামক জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীর অধীনে বাদশাহের বেতনভোগী ৩০০০ হিন্দু। ইহাদের সকলেই সাদুল্লাহ্ খাঁর বাজারের ভিতরে ও আশেপাশে স্থান গ্রহণ করিয়া আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। লোকমুখে এই সমুদয় গতিবিধির এবং উজীরের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ সুবাদারের শিবিরে পৌঁছিলে এবং মারাঠাদের বিশৃঙ্খল পলায়ন ও জখম হইতে এই বিবরণের সত্যতা সাব্যস্ত হইলে তাঁহার সৈন্যদলে কোলাহল উঠিল। আর একটা জনরব আসিলেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ এই সঙ্কটময় মুহূর্তে উজীরের জীবিত ও নিরাপদ থাকার সংবাদ আসিল। ইহাতে সুবাদারের তেজঃ পুনরুজ্জীবিত হইলে তিনি যাহারা সাদুল্লাহ খাঁর বাজারে সমবেত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বিতাড়িত করার জন্য তাঁহার উৎকৃষ্ট সৈন্যদের একটা নির্বাচিত দল প্রেরণ করিলেন। এই সকল সৈন্য মহোৎসাহে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শত্রুদের ঘাড়ে পড়িয়া তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ

দুই দফা কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধ

করিয়া দিল। ভীষণ অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে একটা হাউই বাজি পড়ায় গাযীউদ্দীন খাঁর হস্তীটি স্কন্ধে আহত হইয়া উল্টা দিকে ফিরিয়া তাহার আরোহীসহ পলাইয়া গেল। একই সময় সাদৎ খাঁও তাঁহার পাঁচ পুত্রসহ আহত হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইতিকাদ খাঁর আদৌ হাতাহাতি করার ইচ্ছা না থাকায় কয়েকবার ঘোড়ামুড়ি দিয়া তাঁহার গৃহে ফিরিয়া গিয়া উহা পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করিলেন। তাঁহার দেহের মূল্য ছিল সামান্য মাত্র; কিন্তু এখানে তাঁহার ত্রাস ও পলায়ন সাদুল্লাহ্ খাঁর বাজারের আশ-পাশের কয়েকটি দোকান ও রাস্তা আক্রমণের সঙ্কেত হইয়া দাঁড়াইল; এগুলির সমস্তই লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইল। একদল মোগল ও অন্যান্য বৈদেশিক সৈন্য লইয়া সাহসী আগীর খাঁ তখন শহরতলী হইতে আসিয়া দেখিলেন লাহোর দ্বার-রুদ্ধ ও প্রাচীরের উপরে সৈন্য বসাইয়া রাখা হইয়াছে; এরূপ নৈরাশ্যে দমিয়া গিয়া তিনি প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হলেন। বস্তুতঃ ফররুখ সিয়ারের পক্ষে কোন চেষ্টাই যেন সাফল্যমণ্ডিত হইবে না বলিয়া মনে হইল। ইহার পরেও রাস্তায় ও গলীতে কিছু গুলিবৃষ্টি ও কিছু যুদ্ধ চলিতে থাকিল। এমন

শাহ্ জাদা রফীউদ্-দরজাৎ বাদশাহ্ ঘোষিত

সময় কয়েকজন সাধারণ ঘোষণাকারী ঘোষণা প্রচার করিল যে, ফররুখ সিয়ার অবরুদ্ধ হইয়াছেন ও শাহজাদা রফীউদ-দরজাৎ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহী নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সর্বত্র ধন প্রাণের নিরাপত্তা ঘোষিত ও প্রত্যেকে স্বগৃহে গমনে আদিষ্ট হইল। ইহার ফলে পরাজিতেরা তাহাদের নৈরাশ্য হইতে মুক্তিলাভ করিল। নাগরিকেরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল এবং গোলযোগ প্রশমিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

আমরা ফররুখ সিয়ারকে জানানামহলে রাখিয়া আসিয়াছি। হিন্দু রাজাসহ উজীর তাঁহাদের আর কি বলিবার আছে, তাহা শ্রবণের জন্য তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। গণ্ডগোল থামিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও আবার আরম্ভ হইয়াছিল এবং লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল। কাজেই (তিনি বাহিরে আসিলে) তাঁহারা তাঁহাকে ধৃত করার সুযোগ পাইতেন। কিন্তু ফররুখ সিয়ার বাহিরে আসিলেন। মুহূর্তের বিলম্বের

পরিণাম সম্পর্কে সচেতন থাকায় সুবাদার সংবাদের পর সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন, গণ্ডগোল বাড়িয়া চলিয়াছে সশস্ত্র লোকের সংখ্যা নিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে, একটা ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটিতে যাইতেছে ; তাহা এক বিরাট অগ্নিশিখা না উঠাইয়া ছাড়িবে না ; মুহূর্তের বিলম্ব অপ্রতিবিধেয় বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। সুতরাং কোন না কোন প্রকারে কার্য সমাধা করিতেই হইবে। উজীরের ছোট ভাই নজমুদ্দীন আলী খাঁর গৃহ ছিল বাদশাহী জানানা মহলের সংলগ্ন। সর্বশেষ সংবাদ প্রদানের সময় একদল আফগান সৈন্য উজীরের কয়েকজন ক্রীতদাসের সহিত মিলিত হইয়া এই গৃহের ছাদ হইতে বাদশাহী জানানা মহলের প্রাঙ্গণে অবতরণের ব্যবস্থা করিল। কিছু সংখ্যক হাব্‌শী, জার্জিয়ান ও কালেমুক[১৩] তাহা রক্ষা করিতেছে দেখিতে পাইয়া তাহারা দরজার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল এবং ফর্‌রুখ সিয়ারের সন্ধানে প্রত্যেকটি কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া কয়েকজন কোমলাঙ্গী রমণী ফর্‌রুখ সিয়ার যেখানে আটক ছিলেন তাহা দেখাইয়া দিলে সৈন্যেরা তাঁহার নিকট দৌড়িয়া গেল। এরূপ দৃশ্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বাদশাহের মাতা, তাঁহার বেগম ও দুহিতা অপর কয়েকজন শাহজাদী ও প্রথম শ্রেণীর মহিলাসহ তাঁহার সাহায্যে ছুটিয়া গেলেন। তাঁহার চতুর্দিকে এক বৃত্ত রচনা করিয়া তাঁহারা (আক্রমণকারীদিগকে) প্রার্থনা ও অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু সৈন্যদের নিকট অশ্রুপাতে কি লাভ হইতে পারে? আর এমন সময় তাঁহারা কাহার করুণার উদ্রেক করিতে পারিতেন? অবশেষে অনেক টানা-হেঁচড়ার পর তাহারা তাঁহাকে ঐ সকল রমণীর নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইল এবং মাটির উপর দিয়া টানিয়া নিয়া তিন পোলিয়ার[১] উপরে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করিল। এত অত্যাচার ও অপমানের সহিত এই সকল কার্য অনুষ্ঠিত হইল যে, বাদশাহের দেহের প্রতি আর কখনও তদ্রূপ করা হয় নাই।

মুয়াজ্জেদীন জাহাঁদার শাহের তরক্কী হইতে অতিবাহিত সময় বাদ দিয়া ফর্‌রুখ সিয়ারের রাজত্ব ছয় বৎসর চারিমাস কাল স্থায়ী হয়। পূর্ব-বর্ণিত সমস্ত বৃত্তান্ত ঠিক ঐ সময়ে বিশ্বাসী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের লিখিত ইতিবৃত্ত বা

স্মারকলিপি হইতে সংগৃহীত। তাঁহাদের কেহ ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী; কেহ বা সম্পাদনকারী। ইহাদের কেহ কেহ বিদ্বান ও কৌশলী ছিলেন।

"তোমাদের মধ্যে যাহারা চক্ষুষ্মান, তাহারা সতর্ক হও"

কুরআনের এই বাক্যে তাঁহারা এই ঘটনার ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছেন। ফর্‌রুখ সিয়ারের হাত হইতে এভাবে উদ্ধার পাইয়া সমগ্র নগরে তখনও গোলমাল চলিতে থাকায় উজীর মনে করিলেন, আর এক জনকে বাদশাহ্‌ ঘোষণা করা তাঁহার কর্তব্য। তদনুযায়ী তিনি রফীউল কদরের কনিষ্ঠ পুত্রকে শামসুদ্দীন আবুল বরকত রফীউদ দরজাৎ[১০] উপাধি দিয়া বাদশাহ্‌ ঘোষণা করাইলেন; রফীউল কদর ছিলেন আওরঙ্গযীবের কনিষ্ঠ পুত্র শাহজাদা আকবরের দৌহিত্র ও বাহাদুর শাহের ভাগিনেয়। সেদিন ১১৩২ হিজরীর রবিউস্‌সানীর বুধবার। পূর্বাহ্নে বেলা প্রায় ৯টা। কিশোর শাহ্‌জাদার বয়স তখন ২০ বৎসর। সমগ্র শহরে চীৎকারের দরুন তাঁহাকে হাম্মামে পাঠাইবার, এমন কি তাঁহার পোশাক বদলাইবারও সময় না পাওয়ায় তাঁহাকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি তাঁহার কয়েদখানা হইতে টানিয়া নিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সিংহাসনে বসাইলেন। তাঁহার পরিধানে তখন যে পোশাক ছিল, তাহার উপর উজীর বৃহৎ মুক্তার একটা মালা নিক্ষেপ করার সময় পাইলেন মাত্র। এই ঘটনা লোকের নিকট ঘোষণা করার জন্য তৎক্ষণাৎ বাদশাহী নহবৎ বাজান হইলে তদ্দণ্ডেই লোকের চীৎকার ও হৈ চৈ থামিয়া গেল; অল্পকতক্ষণের মধ্যে সর্বত্র গণ্ডগোল প্রশমিত হইল।

এরূপ সঙ্কটপূর্ণ ও বিপদজনক দিনের পরে উজীর তাঁহার সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বিশ্বস্ত অজস্র বন্ধুদল পরিবৃত হইয়া কিল্লায় রাত্রি যাপন করাই সঙ্গত মনে করিলেন। উহার একটি দরজা খোলা রাখা হয়। সেখানে ইতঃপূর্বেই তিনি যাহাদের উপর আস্থা রাখিতে পারেন, এমন একদল প্রহরী স্থাপন করেন। এই সকল পূর্ব-সতর্কতায়ও সন্তুষ্ট না হইয়া যখন কিশোর বাদশাহের জন্য একটা গৃহস্থালী গঠনের দরকার হইল, তখন তিনি খোযা, কোষাধ্যক্ষ, নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য, বাবুর্চি ও পাল্কী বাহক পর্যন্ত সমস্ত লোককে নিজের সংসার ও অশ্রিতদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করিলেন। আরও সতর্কতা হিসাবে তিনি সর্বত্র তাহার নিজস্ব প্রহরী স্থাপন করিলেন

এবং প্রাসাদের, এমন কি অন্তঃপুরেরও সমস্ত পথ তাঁহার আশ্রিতদের দ্বারা পূর্ণ করিলেন। পর দিন প্রাতে নূতন বাদশাহ্ রীতি অনুযায়ী সর্বসাধারণকে দর্শনদান করিলেন; অজিত সিংহ ও রতন চাঁদ সমগ্র সাম্রাজ্যের হিন্দু-দিগকে জিময়ার[১৩] অপমান হইতে অব্যাহতি দানের আবেদন করিলে তাহা মঞ্জুর করা হইল। সমস্ত শাসনকর্তা, সেনাপতি, সুবাদার ও সরকারী কর্মচারীদিগকে তাঁহাদের চাকরীতে বহাল রাখিয়া যুগপৎ সর্বত্র আদেশ প্রেরিত হইল। ইতঃমধ্যে বিখ্যাত এতিকাদ খাঁকে যথেষ্ট অপমানের সহিত আটক করিয়া তাঁহার জায়গীর বাজেয়াফ্ত করা হইল। তিনি তাহার প্রাসাদে স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান রত্ন ও মনোরম বস্ত্রে বিপুল অর্থ সঞ্চিত করেন; এখন তাহা দান করা হইল। আশ্চর্যের বিষয়, অর্থের জন্য সন্ধান চালাইয়া তাঁহার আর একটা গুপ্ত ধনাগার পাওয়া গেল। উহা শুধু বিস্ময়কর মূল্যের মানি-মানিক্য দ্বারা গঠিত হয়; এগুলির সবই ফররুখ সিয়ার প্রদত্ত উপহার। এখন এগুলি শুধু তাঁহার অপমান বৃদ্ধির ও তাঁহার সহিত অনেক অবমাননাকর ব্যবহারের সহায়তা করিল। সমস্তই উজীরের ব্যবহারার্থ বাজেয়াফ্ত হইল। এগুলির বিগত মনিবের উপর যে অত্যাচার ও অপমান করা হইল, তিনি তৎপ্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ কবিলেন না। ফররুখ সিয়ার তাঁহার মোসাহেবদের যে সকল জায়গীর ও ভূমি প্রদান করেন, সঙ্গে সঙ্গে তৎসমুদয়ও বাজেয়াফ্ত করা হইল। পদচ্যুত বাদশাহের বিগত মহিষী-রাণীর জায়গীর ভিন্ন আর কিছুই রক্ষা করা হইল না, ইহাও বরং তাঁহার পিতা অজিত সিংহের প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে। মনসবদার ও বালাশাহী নামক দেহরক্ষীরা নগদ টাকায় বেতন না পাওয়া পর্যন্ত জমি ও জায়গীর ভোগ করিতেন; তাহারাও একইরূপে বঞ্চিত হইলেন। সাধারণ সৈন্যদিগকে বুঝিতে দেওয়া হইল যে, চাকরী চাহিলে তাহাদিগকে সুবাদারের প্রাসাদে যাইতে হইবে; সেখানে তাহাদিগকে মাসিক নগদ পঞ্চাশ টাকা বেতনে ভর্তি করা হইবে। মুহম্মদ আমী নখাঁ ছিলেন পূর্ব হইতেই দ্বিতীয় বখ্শী; তাঁহার পদ পাকা করা হইল। সয়ফুল্লা খাঁর পরিবর্তে জাফর খাঁ তৃতীয় বখ্শী নিযুক্ত হইলেন। সময়ের হাল-চালে

ইতেকাদ খাঁর প্রাসাদ লুণ্ঠিত

বিরাট পরিবর্তন ও বাজেয়াপ্তি

বিরক্ত হইয়া নিজামুল মুল্ক মালবের সুবাদারী গ্রহণে পুনঃ পুনঃ অস্বীকৃত হইলেও তাঁহাকে সেই পদে নিযুক্ত করা হইল। বিপ্লবের কিছুকাল পূর্বে সরবুলন্দ খাঁকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। বিপ্লবের দরুন সাম্রাজ্যের কি দশা হয়, তাহা দেখিবার জন্য তিনি রাজধানী হইতে ১৫ ক্রশ দূরে অপেক্ষা করেন। তাহাকে এখন ডাকাইয়া আনিয়া নূতনভাবে ঐ শাসনকর্তৃত্বের পদ ও অভিষেক-পত্র প্রদত্ত হইল। এই অনুষ্ঠানের পর তিনি সম্মান ও সুনামের সহিত বিদায় পাইলেন। সুবাদারের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়ফুদ্দীন খাঁকে মুরাদাবাদের লাভজনক ফৌজদারী প্রদত্ত হইল। মুহম্মদ রেজা নামক জনৈক অনভিজ্ঞ লোক প্রধান বিচারপতি ও আদালতের ধর্মবিষয়ক বিচারক নিযুক্ত হইলেন। আকবরাবাদের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা আমীর খাঁ আলমগীরকে সদরুস্সুদুর[১৭] নিযুক্ত করা হইল। দিয়ানত খাঁ রাজস্ব দফতরের ও রাজা ভক্তমল সামরিক তহবিলের দেওয়ান বা পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু রাজস্ব ও শাসনতৈতিক বিভাগের প্রত্যেকটা কর্মচারীসহ এই সমুদয় লোক রতন চাঁদের সহকারী সঙ আর কিছুই ছিলেন না। উজীরের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু হিম্মত খাঁ খাস তহবিলের অধ্যক্ষ ও তদুপরি কিশোর বাদশাহের ওস্তাদ নিযুক্ত হইলেন। ইহার পরেও তাঁহাকে কয়েকটা লাভজনক পদ প্রদত্ত হইল রাজধানী হইতে দূরবর্তী স্থানের সমস্ত প্রভুত্ব বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে তথাকার দফতর ও সরকারে আদৌ কোন রদবদলের চেষ্টা করা হইল না। কেবল মণ্ডের কৃতী শাসনকর্তা মরহামৎ খাঁ সুবাদারের ঐ জিলা হইয়া আগমন কালে তাঁহাকে উপেক্ষা করায় তাঁহার চাকরী কাড়িয়া লইয়া তাহা কাজেম কুলী খাঁ নামক জনৈক তুরানী বা তাতারকে প্রদত্ত হইল। কিন্তু জনতার অবিশ্রান্ত অভিশাপ ও ধিক্কার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য রাজা অজিত সিংহ[১৮] গুজরাট তাঁহার সুবাদারিতে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে অনুমতি পাইলেন না; তিনি রাজধানীতে থাকিতে অনুরুদ্ধ হইলেন।

পদচ্যুত বাদশাহের নির্গমণের বিবরণ দুইজন বিখ্যাত ও গুণবান প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি দুইটা বিভিন্নরূপে বর্ণনা করায় আমরা দুইটাই লিপিবদ্ধ করিব; প্রত্যেকটা বর্ণনার সত্য-মিথ্যার দায়িত্ব যথাক্রমে ঐ গ্রন্থাকারের পদগুণের উপর ছাড়িয়া দিতেছি। সম্মানিত ও সত্যবাদী লোকেরা আমার নিকট বর্ণনা

করিয়াছেন যে, ভ্রাতৃদ্বয় আদৌ ফর্‌রুখ সিয়ারের প্রাণহাণির চেষ্টার ইচ্ছা পোষণ করেন নাই কিংবা তাঁহার সহিত কোন দুর্ব্যবহার করিতে চাহেন নাই।[১৯] তাহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্যে ছিল তাঁহার দেহ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থাকা; এ উদ্দেশ্যে তাহারা তাঁহাকে একজন বিশ্বাসী আফগান কর্মচারীর হেফাজতে রাখেন। দিবারাত্রি তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা ছিল তাঁহার কর্তব্য।

ফর্‌রুখ সিয়ারের মৃত্যুর দুইটি বিভিন্ন বিবরণ

তথাপি একদা ফর্‌রুখ সিয়ার তাহার পাহারাদারের মুহূর্তের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিলেন। তিনি সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তাহার অগোচরে চুপি চুপি সরিয়া পড়িলেন এবং এক ছাদ হইতে অন্য ছাদে গিয়া নীচে নামিয়া পড়িতে চাহিলেন। তাঁহার কয়েদখানা হইতে ইতিমধ্যেই তিনি দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন এমন সময় আফগানটি ফিরিয়া আসিল। তাহার বন্দীকে দেখিতে না পাইয়া ও নিজের জীবন বিপন্ন দেখিয়া সে সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার খোঁজ করিল এবং দূরে কেহ প্রাচীরের ছায়ার নিম্নে ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া সেখানে ছুটিয়া গেল। লোকটা তাহারই বন্দী দেখিয়া সে তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আনিল। সেই পাপিষ্ঠ যেই মাত্র তাঁহাকে আবার তাঁহার কয়েদখানায় দেখিল, তখনই তাঁহাকে মেজের উপর বসাইয়া আফগান জাতির স্বভাবসিদ্ধ মানসিক নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার সহিত নির্দয়ভাবে পিটিতে ও ঘুষি মারিতে লাগিল। এরূপ হীন আচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া ফর্‌রুখ সিয়ার সর্বশক্তি সহকারে দেওয়ালের দিকে ছুটিয়া গেলেন এবং তাহাতে এত অধিক জোরে মাথা ঠুকিলেন যে, তাঁহার মস্তক খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি চিরন্তন আবাসে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু খাজা মীরের পুত্র ঐতিহাসিক হাশেম আলী খাঁ খাসী[২০] ভ্রাতৃদ্বয়ের স্পষ্ট আদেশে ফর্‌রুখ সিয়ার নিহত হন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের ও তাহাদের পরিবারের বিরুদ্ধে তাঁহার ইতিহাসের আদ্যন্ত তিনি যুগপৎ সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা ও শত্রুতার পরিচয় দেন। পক্ষান্তরে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে তাঁহাদের জন্য কিছু পক্ষপাতিত্বের বদনাম-ভাগী হওয়া সম্ভবপর বিধায় আমি তাঁহার পুস্তকের মূল লেখার বরাত দেওয়াই প্রকৃষ্ট

মনে করিয়াছি। লেখকের ভুলে অথবা নকল নবিশের অজ্ঞতার দরুন রচনার কিছু ভুল ঢুকিয়া পড়ায় আমি তাহা সংশোধন করিয়াছি। এতদ্‌ভিন্ন তাহাতে আদৌ হাত দেই নাই। কাজেই নিম্নোক্ত বিবরণের সত্যতার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থকারের। ইহা এইরূপ ঃ

সেই হতভাগ্য শাহজাদা ঐ সঙ্কীর্ণ অন্ধকার স্থানে আবদ্ধ হওয়ার পর ইতঃমধ্যেই দুই মাস অতিবাহিত হয়। সেখানে তিনি নানাবিধ কষ্ট ভোগ করেন; তাঁহার চক্ষুর উপর দিয়া একটা উত্তপ্ত সুচঁ টানিয়া নেওয়া হয়। এই নিষ্ঠুর অস্ত্রোপচারে কিন্তু তিনি দিনের আলো হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন নাই। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত বর্বরতার দৃশ্যে অস্থির হইয়া সেই হতভাগ্য শাহজাদা বিশ্বস্ত লোকের পক্ষে স্বাভাবিক মস্তিষ্কের সরলতায় এবং যে হুকুম-প্রিয়তা মানুষকে এত অসতর্ক করিতে ও অপর প্রত্যেকটি নীতি আগ্রহ্য করিতে সমর্থ, তাহার বশে তাঁহার যাতনা শেষ করার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিলেন। এক সময় তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব শত্রুদের নিকট তাঁহার অতীত আচরণের জন্য ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইতেন এবং তাঁহারা শুধু তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলে তাহাদিগকে সাম্রাজ্য পরিচালনার অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দিতেন! অন্য সময় সেই জীবন্ত-প্রোথিত হতভাগ্য লোকটি আফগান আবদুল্লাহ্ খাঁর (ইহাই ছিল তাঁহার পাহারাদারের নাম) দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে শুধু রাজা জয়সিংহ সিবায়ীর রাজ্য পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারিলে তাহাকে অজস্র অর্থদানের প্রলোভন দেখাইতেন। এই সমুদয় যথাযথভাবে দুই ভাইয়ের কানে না পৌঁছিয়া পারিত না। তাহাদের চাটুকারদের দ্বারা অবিশ্রান্ত উত্তেজিত ও নিজেদের ভয়ে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা এরূপ বিপজ্জনক জীবন শেষ করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত বলিয়া মনে করিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাহারা তাঁহার খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে দুইবার বিষ মিশ্রিত করাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না বা অতি সামান্যই ফল হইল; কিন্তু তৃতীয় বারে তাহা কার্যকরী হইল। কিরূপে সেই হতভাগ্য ব্যক্তির দেহ হইতে প্রাণ বাহির হয়, ভ্রাতৃদ্বয় তাহা দেখিতে গেলে তাঁহার সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ টুটিয়া গেল। তাঁহাদের ভয়াবহ অকৃতজ্ঞতা এবং পুনঃ পুনঃ আল্লার কালাম সাক্ষী করিয়া ও তাঁহাদের বিশ্বস্ততার জন্য

বারংবার পবিত্র কোরআন জামিন রাখিয়া যে অঙ্গীকার করেন, তৎপ্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহাদিগকে কঠোর তিরস্কার করিয়া তিনি সেই পবিত্র গ্রন্থকেই সম্বোধন করিলেন এবং এত অধিক বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দানের জন্য কেন যে তাহা তৎক্ষণাৎ কোন অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করে নাই, তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। এরূপ বিশ্বাসঘাতক লোকদিগকে তখনও উপেক্ষনীয়ভাবে জীবিত রাখায় তিনি এমনকি আল্লার ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধেও তিরস্কারবাক্য উচ্চারণ করিলেন। তিনি এরূপ ভৎর্সনামূলক বাক্যে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে থাকায় উজীর অধৈর্য হইয়া তাহার কথা বলা শেষ করাইবার জন্য তাহার গলার চতুর্দিকে এক গাছা চর্মরজ্জু ফেলিয়া তাঁহা জোরে টানিতে বলিলেন। কিন্তু হতভাগ্য শাহজাদা দুই হাতে তাহা ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহার গলদেশ হইতে তথা দূরে রাখায় এবং তাঁহার দুই হাত ও দুই পা দ্বারা কঠোরভাবে যুঝিতে থাকায় এত অধিক বাধাদানে বিরক্ত হইয়া সেই বর্বরদ্বয় আঘাত দ্বারা তাঁহার হস্তদ্বয় ছিন্ন করিতে আদেশ করিলেন। শাহজাদা বহুক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী মৃত্যুর যাবতীয় যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অবশেষে এই নশ্বর জগত ত্যাগ করিলেন।

"কালের প্রসারিত টেবিলের উপরস্থ প্রত্যেকটা গ্রাস খাদ্য মারাত্মক বিষলিপ্ত; অতএব সাবধান! সে দিকে এত সহজে তোমার হাত বাড়াইওনা।"

ইহা সত্য যে, মরণোন্মুখ শাহজাদার প্রাণত্যাগে বেজায় বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া দুই ভাই তাঁহার পেটে খঞ্জর[২১] মারিয়া তাঁহার দফারফা করেন—এই মর্মে তখন এক জনরব উঠে। এই জনরব অদ্যাপি এভাবে প্রচলিত আছে। তথাপি যে ব্যক্তি এই প্রাণদণ্ড তদারক করেন, তিনিই এই বিবরণের প্রতিবাদ করিয়াছেন; অথচ ইনি প্রচুর অশ্রু বিসর্জন ও অত্যন্ত দুঃখের সহিত আফসোস না করিয়া কখনও ঐ শোচনীয় ঘটনা বর্ণনা করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে দৃঢ়তার সহিত বলিতে শোনা গিয়াছে যে, আদৌ ছুরি মারা হয় নাই। সে যাহাই হউক, তাঁহার দেহ অযত্নে অসমাহিত অবস্থায় ৩৬ ঘণ্টা যাবত পড়িয়া রহিল; এত অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই এ বিষয়ে কর্তাদের খেয়াল হইল। কেবল তখনই ধর্মপদ্ধতি অনুযায়ী তাহা পবিত্র করিয়া শবাধারে স্থাপন করতঃ হুমায়ুনের মকবরায় নীত

হইল। ২/৩ হাজার দরিদ্র নারী তাঁহার সদাশয়তায় প্রতিপালিত হইত; তাঁহার শব বাহির করিয়া আনিলে তাহারা তাহাদের কাপড় ছিঁড়িয়া, মাথায় ও মুখে ধুলি মাখিয়া শবাধার বেষ্টন করিয়া প্রচুর অশ্রুপাত করিতে করিতে এবং তাঁহার শত্রুদিগকে সর্ব প্রকার অভিসম্পাৎ দিতে দিতে ও গালি-গালাজ করিতে করিতে সমস্ত পথ উহার অনুগমন করিল। দিলাওর আলী খাঁ ও সয়িদ আলী খাঁ নামক দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন ভ্রাতৃদ্বয়ের বখশী; প্রধান শোককারীরূপে তাঁহারা শবের সহগমন করিতে প্রেরিত হইলেন; অজস্র প্রধান নাগরিক দরবিগলিতভাবে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে তাহাদের অনুগমন করিলেন। কিন্তু মিছিল শহরতলী অতিক্রম করামাত্র লোকে প্রধান শোককারীদের ধিক্কার দিয়া কয়েকবার তাড়া করিল এবং কয়েক বার লাঠি, ইটের টুকরা ও মাটির ঢেলা দ্বারা আক্রমণ করিল। সেই অজস্র দরিদ্র লোকের কেহ বিতরণের জন্য তাঁহাদের আনীত টাকা গ্রহণ কিম্বা রীতি অনুযায়ী তাঁহাদের প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণের হীনতা স্বীকারেও প্রস্তুত হইল না। কিন্তু তৃতীয় দিনে বহু সংখ্যক লোক ও ভিক্ষুক যেখানে ফর্রুখ সিয়ারের দেহ ধৌত ও সুগন্ধি যুক্ত করা হয়, শৃঙ্খলার সহিত সেখানে সমবেত হইয়া নিজেদের মধ্য হইতে চাঁদা তুলিয়া তদ্দারা বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহা অন্যান্যের নিকট বিতরণ করিল। অনুরূপভাবে তাহারা কয়েকজন ক্বারী জানাইয়া তাঁহাদের সহিত নামাজ পাঠে ও হা-হুতাশে সারা রাত কাটাইয়া শৃঙ্খলার সহিত প্রস্থান করিল।

বিস্ময়জনক আল্লাহ্! তোমার স্বর্গীয় ন্যায়বিচার এই বিপ্লবের কয়েকটি ঘটনায় কেন আত্মপ্রকাশ করিল না! তাড়াতাড়ি তাঁহার দফারফা করার জন্য তাঁহার শত্রুদের অনেক কারণ ছিল। তাঁহাকে নিরতিশয় ঘৃণা করারও হেতু ছিল। এমনকি, এই ঘৃণার পরিপ্রেক্ষিতে যে কেহ মনে করিতে পারে, তাঁহাকে দ্রুত ও তৎক্ষণাৎ এই নশ্বর জগত হইতে পরলোকে চালান দেওয়া ছিল তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু না, ফর্রুখ সিয়ার তাঁহার ক্ষমতার দিনে তাঁহার কচি কচি ভ্রাতাদের গলা টিপিয়া হত্যা করেন। অজস্র নির্দোষ লোককে হত্যা ও অপর কিছু লোককে অন্ধ করেন। কাজেই পরলোক গমনের অনুমতি লাভের পূর্বে তাঁহাকে এই সমুদয় নিষ্ঠুরতার স্বাদ চাখিতেই হইবে।

অন্যেরা তাঁহার হাতে যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করে, তাঁহাকেও অন্যের হাতে তাহা ভোগ করিতেই হইবে। দুই ভাইও প্রতিফলের দিক এড়াইতে বা নিজেরা দণ্ডপ্রাপ্ত না হইয়া মরিতে পারে নাই। তাঁহারা অন্যান্য লোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, অত্যল্পকাল পরে নিজেরাও একই ব্যবহার প্রাপ্ত হন।'' হাশেম আলী খানের প্রদত্ত বিবরণ এই পর্যন্তই।

এখন আমাদের বর্ণিত বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাউক। ফর্‌রুখ সিয়ারকে খতম করিয়া দুই ভাই বাদশাহী ভাণ্ডার ও ধনসম্পদ দখল করিলেন। হাতি, ঘোড়া, মূল্যবান আসবাবপত্র, নগদ টাকা, অপরূপ মনিমানিক্য, এক কথায় যাহা তাঁহাদের মনে জাগছিল তাহাই বহিয়া নিয়া সবকিছু নিজেদের মধ্যে ভাগযোগ করিয়া যেভাবে সঙ্গত মনে হইল, সেভাবে নিজেদের ভাণ্ডারের সহিত মিশ্রিত করিলেন। রমণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়া আবদুল্লাহ্ খাঁ এমনকি কয়েকজন অতুলনীয়া রূপসীকেও বাদশাহী হেরেম হইতে টানিয়া লইয়া যান বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্ই ইহা অবগত আছেন!

এই মারাত্মক ঘটনার অল্পকাল পরে দুই ভাইর মধ্যে সমস্ত আন্তরিকতা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া কথিত আছে। এই ঔদাসীন্য প্রকাশ্যে দৃষ্ট না হইলেও তাঁহাদের যেসকল বন্ধু তাঁহাদের নিজ নিজ মেজাজ জানিতেন, তাঁহারা শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারেন; দর্শকেরা ক্রমাগত কিন্তু নীরবে এ সম্পর্কে কয়েকটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে যোগ্যতায় ও কিছু অসমতা ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহা সর্ববাদী সম্মত যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুসায়ন আলী খাঁ বিচক্ষণতা, সাহস ও অপর বহু মূল্যবান গুণে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ্ বদান্যতার সহিত এগুলি তাঁহার দেহে প্রোথিত করেন। শক্তিতে তিনি সমসাময়িক সমস্ত নরপতি, এমনকি, রাজ্য ও রাজমুকুট দান এবং সাম্রাজ্য জয় করেন বলিয়া ইতিহাসে যে কয়-জনের সুখ্যাতি আছে, তাহাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার শক্তি বা তাঁহার জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। থাকিলে খুব সম্ভবতঃ যে সময় দেখিবার দুর্ভাগ্য আমাদের হইয়াছে, তাহা এত অপমানজনক ও এত শোচনীয় হইত না, হিন্দুস্তানের মান-ইজ্জতও রসাতলে

যাইত না। ভারতীয় শরীফ ও ভদ্রলোকগণকে আমরা যেরূপ অধঃপতিত দেখিতেছি, তাঁহারাও সেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইতেন না। কিন্তু সমগ্র জাতির নৈতিক আচার-ব্যবহার সংশোধনের লৌহ হস্তের সরকার রাখিত বলিয়া সেই বীরপুরুষের দেহ ও শক্তি যে জগতকে শুধু দেখান হইবে মাত্র, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। সুতরাং আমাদের ভাগ্যের নিকট আমাদের নতি স্বীকার করাই শ্রেয়; কারণ, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা, আদেশ করেন এবং যেরূপ ইচ্ছা, কাজ করেন।

দুই ভাইয়ের ও তাঁহাদের অবলম্বিত ব্যবস্থার দুর্ভাগ্য যে, কিশোর বাদশাহ রফীউদ্-দরজাৎ ক্ষয়রোগে ভুগিতেছিলেন ও রক্ত বমন করিতেছিলেন; তৎফলে শীঘ্রই তাঁহার রাজত্ব ফুরাইয়া গেল। সিংহাসনারোহণের নিন্দাভাগী হওয়ার মাত্র তিন মাস কয়েকদিন পরে ২১শে রজব শনিবার তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রফীউদদৌলা তৎক্ষণাৎ আনীত ও তৎপরিবর্তে সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন; দুই সায়্যিদ পূর্বের ন্যায় সর্বেসর্বা থাকিয়া সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটা বিষয়ের ববস্থা করিতে লাগিলেন। এই দুইজন রুগ্ন কিশোর শাহজাদা তৎক্ষণাৎ অপমৃত হওয়ার জন্য বাদশাহ্ উপাধি মাত্র লইয়া পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হওয়ায় তাঁহাদিগকে চিরন্তন আবাসে যাত্রা চালাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষণকালের জন্য সিংহাসনে অপেক্ষাকারী দুইজন পর্যটকের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নাই বলিলেই চলে। শাহজাদা আকবরের পুত্র ও আওরঙ্গযীবের পৌত্র কিশোর শাহজাদা নিকোসিয়র তখন আকবরাবাদে কারারুদ্ধ ছিলেন; রফীউদদৌলার জীবন কালেই তাঁহার উত্থান ঘটায় আমরা তাইমুর বংশের এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমাদের ইতিহাসের মূল বিষয়ের সহিত তাহা যুক্ত করার এবং সমগ্র বিষয়কে একটা সুশৃঙ্খল বাহ্যরূপ দানের উদ্দেশ্যে আমরা উহাকে এক মতে আনা সঙ্গত মনে করিয়াছি। তাঁহাদের জীবন এত অস্পষ্ট ও এত কম আলোচনার বিষয় যে, তাঁহাদের নাম পর্যন্ত অদ্যাপি জানা নাই বলিলেই চলে। তথাপি পাঠক নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে, এই ইতিহাসে কিশোর শাহ্জাদাদের যে সামান্য কিছু দান আছে; তাহা সযত্নে নিরূপিত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহা এইটুকু মাত্র—

বাদশাহী পরিবারের আর একজন কিশোর শাহ্‌জাদা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী আকবরাবাদের দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন। রফীউদ্‌দৌলাকে কারাগার হইতে সিংহাসনে আনয়নের অল্পকাল পরে ঐ স্থানের শাসনকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ ও ঐ দুর্গের উপর নির্ভরশীল গ্রামরাজির সৈন্যগণ এবং প্রদেশের শাসনকর্তার আশ্রিত মনসবদারগণ ও অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাঁহাকে বাদশাহ্‌ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা সকলেই অচিরে তাঁহাকে ঘিরিয়া এক দরবার গঠন করিলেন। আকবরাবাদ নগরের অধিবাসীরা তাঁহাদের সাহায্য করিল। যে সকল গোলমালে বাদশাহী পরিবার উৎসন্ন হইয়া যাইতেছিল, তদ্দর্শনে তাহারা স্বেচ্ছায় তাঁহার দলে যোগদান করিল। তাঁহার নাম নিকো-সিয়ার[২২], তিনি ছিলেন শাহ্‌জাদা আকবরের অন্যতম কনিষ্ঠ পুত্র। এরূপ ঘটনার পরিণাম বিপজ্জনক হইতে পারিত বলিয়া দুই ভাই প্রারম্ভেই ইহা দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিশোর শাহ্‌জাদা রফীউদ্‌দৌলা, নগরের প্রধান ব্যক্তিবর্গ ও সভাসদ্‌দের সঙ্গে লইয়া তাঁহারা রাজধানী ত্যাগ করিয়া আকবরাবাদ যাত্রা করিলেন এবং (সেখানে পৌঁছিয়া) উহার দুর্গ অবরোধ করিলেন। নিকোসিয়ার সাহস বা নগর-রক্ষায় যোগ্যতার অভাব না দেখাই-লেও শীঘ্রই দ্বার উন্মুক্ত এবং তিনি ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন। রক্ষী সৈন্যদল পরিবর্তিত এবং দুর্গের কর্মচারী ও গ্রাম্য সৈন্যদলের সেনাপতিরা যথোপযুক্ত-রূপে দণ্ডিত হইলেন; উহারাই সমগ্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এই সামান্য সফলতা ভ্রাতৃদ্বয়ের মন বিশেষ শান্ত করিতে পারিল না। বীর্যপাত ও ক্ষয়রোগে কিশোর বাদশাহ রফীউদ্‌দৌলা ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিলেন। উজীর সাম্রাজ্যের সেরা চিকিৎসকদের সমবেত করিতে কসুর না করিলেও তাঁহার যত্ন ও অধীরতা কোনই কাজে আসিল না। তাঁহার পূর্ববর্তীদের চেয়েও স্বল্পকাল নাম মাত্র রাজত্বের পর শাহজাদার অন্তিমদশা নিকটবর্তী হওয়ার নির্দশন প্রকাশ পাইল। অল্পকাল মধ্যে সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিল। সিংহাসনে একটা প্রদর্শনীর দরকার থাকায় দুই ভাই শাহজাহানাবাদ দুর্গের অংশ সলিম গড় দুর্গ হইতে আর একজন শাহজাদাকে আনয়নার্থ দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন; ইহারা ছিলেন তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নজমুদ্দীন খাঁ ও গোলাম আলী খাঁ। মতান্তরে দিল্লী প্রদেশের শাসনকর্তা

হিসাবে শুধু প্রথমোক্ত ব্যক্তিই এই কার্যের ভারপ্রাপ্ত হন, অপর ব্যক্তি ঐ আমীরের সহগমন করেন মাত্র। আদেশ ছিল বাহাদুর শাহের পুত্র খোজেস্তা; আখতার ওরফে জাহান শাহের পুত্র রোশন আখতারকে [২৩] আনয়নের। এই কিশোর শাহজাদার বয়স তখন ১৮ বৎসর; জাহাঁদর শাহ নামে মুয়াজ্জেদীনের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতেই তিনি বরাবর সলিমগড় দুর্গের [২৪] একটা কক্ষে অজ্ঞাত হওয়ায় আটক অবস্থায় বাস করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি ছিলেন চিত্তাকর্ষক আকৃতির যুবক; তাঁহার শ্মশ্রু সবেমাত্র উদগত হইতেছিল; তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল, হাবভাবে ও কপালে অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি দীপ্তি পাইতেছিল। এগুলি তাঁহার যাবতীয় ভাবী উন্নতি জ্ঞাপন করিতেছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল। তিনি তখনও আকবরাবাদে উপস্থিত না হইতে, বরং রাজধানীর উপকণ্ঠে থাকিতেই সংবাদ আসিল যে রফীউদ্‌দৌলা এই নশ্বরজগত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন এবং ইতঃপূর্বেই জ্ঞান হারাইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ তাঁহার উত্তরাধিকারীকে নিকটে না পাওয়া পর্যন্ত পূর্ণ এক সপ্তাহকাল, মতান্তরে দশ দিন গোপন রাখা হইল। তিনি আসিলে মৃত শাহজাদার শবাধার খাজা কুতবুদ্দীনের সমাধি-ভবনে নিয়া তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় একইরূপে সমাহিত করা হইল। এই মৃত্যুতে রোশন আখতারের জন্য সিংহাসন উন্মুক্ত হইল।

এই কিশোর শাহজাদা তাঁহার উদীয়মান ভাগ্য দ্বারা চালিত হইয়া ফতেহ্‌পুরে [২৫] পৌঁছিলেন এবং ১১৩১ হিজরীর একই মাসের ১৫ তারিখের প্রাতঃকালে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘণ্টার প্রায় ৪টায় একটা বিজয় শুভ ঘণ্ট ও সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যজনক মুহূর্তকে নিজের উপকারে আনিয়া জগতের রঙ্গমঞ্চে পদক্ষেপ ও তাঁহার সুন্দর দেহের যাবতীয় মাধুর্য দ্বারা সিংহাসনের শোভাবর্ধন করিলেন। এই শুভ সময়েই খোতবায় তাঁহার নাম উল্লেখে সেই সর্বত্র রাজত্বের সম্মান বৃদ্ধি ও গৌরবান্বিত হইল এবং এতদুপলক্ষে বিতড়িত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলির মূল্য তাঁহার মোহরের ইজ্জতে বর্ধিত হইল। তিনি অবুল ফাতাহ্ নাসীরুদ্দীন মুহম্মদ শাহ এই সৌভাগ্যবান উপাধি [২৬] গ্রহণ করিলেন। রসদ-পত্রের মূল্য বেজায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল; সেই মুহূর্ত হইতে তাহা সস্তা হইতে আরম্ভ হইল এবং প্রত্যেক বাজারে পুনরায় প্রাচুর্যের

মুখ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার মাতা নওয়াব কাদোসিয়া[৭] ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অত্যন্ত জ্ঞানবতী শাহ্জাদী ; গোপনীয়তা ও নীরবতার ছায়ায় তিনি খুজিস্তা আখতারের সেই সোহাগের পাত্রকে রক্ষা করিতে যত্ন গ্রহণ করেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। যমানার হালচালে ও তাঁহার অবস্থার গরজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকায় তিনি দুই ভাইয়ের মন যোগাইয়া চলিতে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহারা তখন সাম্রাজ্যের সর্বশক্তিমান ব্যবস্থাকারী হওয়ায় তিনি এত অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, রাজধানী ত্যাগ করিয়া তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আকবরাবাদে গমনকালে এত অল্প অনুচর লইয়া যাত্রা করিতেন এবং তাঁহার কার্যে এত অধিক সংযম দেখাইতেন যে, তাঁহার মৃত স্বামী জাহান শাহের অধীনে চাকরী করিতেন, এরূপ বহু বিখ্যাত লোক স্বেচ্ছায় তাহার অনুগমন করিতে চাহিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হন। তাঁহারা তাহার অনুগমন করিয়া তাঁহার অনুচর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত হইতেছেন শুনিতে পাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। এমনকি তাঁহার মহলের দ্বারদেশে আসিতে ও নজর নেয়াজ পাঠাইতে নিষেধ করিয়া দেন।

তাঁহার পুত্রের সিংহাসনারোহণে দেখা গেল যে, পূর্ববর্তী তিনটি রাজত্ব এত স্বল্পকাল স্থায়ী ও এত বিশৃঙ্খল যে, তাহাতে ইতিহাস বিশৃঙ্খল হইবে মাত্র ; তজ্জন্য দলীল-দস্তাবেজে যাবতীয় বিশৃঙ্খলা রোধের উদ্দেশ্যে ঐ তিনজন রাজপুত্রের ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব একদম বাদ দিয়া তাহা মুহম্মদ শাহের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করার এবং তাহার রাজত্বে ফররুখ সিয়ারের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়ার জন্য এক আইন জারি হইল। তাহার মাতার রমণী মহলের কয়েকটা সর্বাপেক্ষা জরুরী খরচ যোগাইবার জন্য যুগপৎ ১৫০০০৲ টাকা বরাদ্দ হইল। কিন্তু গোলাপ পাড়ার কর্তৃক ও গৃহস্থালীর নজুর বা তত্ত্বাবধায়কের পদ উজীরের আশ্রিত বিশ্বাসী খোজাদের উপর অর্পিত হইল। পূর্ববর্তী তিনজন শাহজাদার (তাহাদের উপর চিরতরে শান্তি হউক) বেলায়ও তাহাই করা হয়। খোজা প্রহরী, গৃহসজ্জাসরবরাহক, হাতীর মাহুত, নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য বাবুর্চি এমনকি পাল্কিবাহক নিয়োগের বেলায়ও যাহাতে নিজস্ব ভৃত্য ভিন্ন অন্য লোক নিযুক্ত করা না

হয়, উজীর তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। হিম্মত খাঁ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন উজীরের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু এবং ইতঃপূর্বেই ৫।৬টা চাকরীর মালিক, একই নীতিতে তাঁহাকে নূতন ভূপতির শিক্ষকরূপে তাঁহার নিকটে রাখিবার এবং খাস তহ্‌বিল ও প্রাসাদের কোষাগারের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব হইল। কিশোর বাদশাহ্ ধৈর্যসহকারে এই সমুদয় মাথা পাতিয়া লইলেন। তাঁহার সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি উজীরের কোন ইচ্ছারই প্রতিবাদ করিলেন না, তদুপরি তৎপ্রতি সর্বপ্রকার সম্মান ও ভক্তি দেখাইবার সুবুদ্ধিও তাঁহার ছিল। কিন্তু ইহার দরুন যে ঈর্ষার সহিত তাহাকে পাহারা দেওয়া হইত, তাহা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাইলনা। বায়ু সেবনের জন্য তিনি মাসে দুই, একবার বাহিরে যাইতেন; তখন একদল সায়্যিদ তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিত; তাঁহারা তাঁহাকে কখনও দৃষ্টির বাহিরে যাইতে দিত না, কিম্বা তাঁহাকে কখনও শহরতলির বাসস্থান ও বাগান হইতে দূরে লইয়া যাইত না। এগুলি দুর্গ হইতে বড় জোর এক বা দুই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল; সেখান হইতে তাঁহারা সর্বদাই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের পূর্বে ফিরিয়া আসিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ করিত। কিন্তু উজীর যখন রাজধানী শান্ত করিতে ব্যস্ত, নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে তখন গোলমাল পাকিয়া উঠিতেছিল।

এলাহাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তা চেবিল রাম নাগর তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকারে অস্বীকৃত হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি তাঁহার কোন অসঙ্গত কার্যের দরুন এমন কি তাহা নিরাপদও বিবেচিত হইল না। প্রতিদানে ইহারা তাঁহাকে শিক্ষাদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হুসায়ন আলী খাঁ ইতঃপূর্বেই তাঁহার শিবিরের সরঞ্জাম সম্মুখের দিকে প্রেরণ করেন; এমন সময় সংবাদ আসিল বিরক্তিকর শাসনকর্তা সহসা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই সংবাদে সুবাদার সন্তুষ্ট না হইয়া পারিলেন না। কিন্তু এতদ্দ্বারা তিনি খ্যাতি লাভের সুযোগে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহাকে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে শোনা গেল; 'সেই গর্বিত ব্যক্তির মস্তক বর্শাগ্রে দেখিবার মুখে বঞ্চিত হওয়া কি দুঃখের বিষয় নহে, ঐ সংবাদের অব্যবহিত পরেই খবর আসিল যে, চেবিলরামের খুল্লতাত ভ্রাতা দিয়া বাহাদুরের পুত্র ও তাঁহার তরবারী বাহক গুদহর বাহাদুর তাঁহার খুল্লতাতের মৃত্যুর পরে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া সৈন্য

সংগ্রহ এবং এলাহাবাদের বুরুজ ও প্রাকার মেরামত করিতেছেন। এই সংবাদে সুবাদার যমুনার উপরে একটা নৌ-সেতু নির্মাণের আদেশ এবং মুহম্মদ শাহের জন্য আকবরাবাদে লোক পাঠাইলেন। তিনি এলাহাবাদে যাইতেছেন বলিয়া ঘোষিত হইল; তাঁহার সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগ যুগপৎ তদন্তেই যাত্রা করার আদেশ পাইল। এই সন্ধিক্ষণে সদরুস্‌সুদুরের পদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য আমীর জুমলা পুনরায় বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু ইহাতে রাজার প্রশাসন, এমন কি বিচার ব্যবস্থা ও ধর্মনৈতিক ব্যাপারেও পূর্বের ন্যায় রতনচাঁদের হস্তক্ষেপ বন্ধ হইল না। তিনি এত অসীম প্রভুত্ব দেখাইতেন যে, তাঁহার সাক্ষাতে মুৎসুদ্দী ও সরকারী কর্মচারীরা প্রাণহীন জড়পিণ্ড বলিয়া বোধ হইত। পরিশেষে এমনকি বিচার বিতরণের ব্যাপারও তাঁহার আওতাভুক্ত হইল। এমনকি পূর্বে তাঁহার কৃপা লাভ করিতে না পারিলে কোন নগরের কাজী হওয়া কিম্বা বিচার বা ধর্মনৈতিক বিভাগের কোন চাকরী পাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। এক ব্যক্তিকে তিনি কোন নগরের কাযী নিযুক্ত করেন; একদা তিনি তাঁহাকে উজীরের নিকট লইয়া আসিলেন। উজীর এই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার সম্মুখস্থ একজন আমীরের দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছেন, আমাদের রতন চাঁদ কাযীও বানাইতে পারেন এবং অনুরূপভাবে ধর্মনৈতিক চাকরীর জন্যও তিনি সুপারিশ করেন। অপর ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "জি হুজুর" রাজা হুজুর দুনিয়াদারির কাজ শেষ করিয়া এখন ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে মনোনিবেশ করিয়াছেন।"

এই সময় এত প্রবল উদ্যমের সহিত অবরোধের প্রস্তুতি চলিতেছিল যে, গুর্দহরের উপনিত বা গোমস্তা শিবিরে আসিয়া তাঁহার মনিবের দুষ্কার্যের জন্য সুবাদারের ক্ষমা প্রার্থনা করার উপযুক্ত সময় হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহাকে তাঁহার শাসনকার্যে বহাল রাখিলে কিম্বা তৎপরিবর্তে অন্যত্র শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করিলে এবং তাঁহার ক্ষতিপূরণার্থ তাঁহাকে কোন সম্মানজনক উপাধি দিলে তিনি বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইলেন। এই শর্তগুলি গৃহীত হইলে স্থির হইল, গুর্দহর এলাহাবাদ দুর্গের বাহিরে আসিয়া স্থানবীসহ তাঁহার শাসনকর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিবেন এবং বাহাদুর বা সাহসী উপাধিপ্রাপ্ত

হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্তার পদে বদলি হইবেন। এই চুক্তির আলোচনা চলিতে থাকা কালে কিছু বিবাদের ফলে একটি মওরসী সামন্ত রাজ্য বুন্দি অঞ্চলে গোলমাল ও কলহের সৃষ্টি হইতেছিল। বেধ সিংহ নামক জনৈক উত্তরাধিকারী রাজা ভীমসিংহ নামক আর একজন উত্তরাধিকারীকে রাজ্য হইতে উচ্ছেদ করেন। বিতাড়িত রাজপুত্র সুবাদারের শিবিরে গমন করিয়া স্বাধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার আশায় নিবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে তিনি ৬০০০ অশ্বারোহীর একদল সৈন্য পাইলেন; ইহাদের সকলেই ছিলেন প্রধান সৈনিক ও বারের সায়্যিদ; তাঁহারা নিজে-দের ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বদেশবাসীও জ্ঞাতি বলিয়া মনে করিতেন। প্রধান বখ্শী সায়্যিদ দিলাওয়ার আলী খাঁ ছিলেন তাহাদের সেনাপতি। তিনি হিন্দু রাজাকে স্বপদে পুণঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে ও গুজসিংহ নামক আর একজন হিন্দুরাজাকে সঙ্গে লইয়া মালব সীমান্ত পর্যন্ত গমন করিয়া নূতন আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে আদিষ্ট হইলেন। পক্ষান্তরে গুর্দহরের সমস্ত প্রতিশ্রুতির উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন না করায় সন্ধি প্রতিপালন বলবৎ করার জন্য হায়দর আলী খাঁর অধীনে একদল উৎকৃষ্ট সৈন্য এলাহাবাদ অভিমুখে প্রেরিত হইল। হায়দর আলী খাঁ ছিলেন একজন চরিত্রবান ও সুযোগ্য ব্যক্তি। তিনি ঐ দুর্গ অবরোধ করিয়া খাদ কাটিয়া ও প্রাচীর তুলিয়া সম্মুখে আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু তিনি একমাত্র সেনাপতি ছিলেন না বলিয়া অবরোধের কোন উন্নতি হইলনা বলিলেই হয়। শাসনকর্তা স্থানবী সমর্পণ করার জন্য একবার আলোচনা চালাইতেন, পরক্ষণেই পুনরায় আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া অবরোধকারীদিগকে তাহাদের খাতবপ্রাদ্দি হইতে তাড়াইয়া দিতেন। ইহা তাঁহার অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়। অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় হুসায়ন আলী খাঁ যমুনা অতিক্রম করিয়া এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করিলেন। অবরুদ্ধ গুর্দহর তাঁহার যুদ্ধযাত্রার সংবাদে ভীত হইয়া এবং সমতল ভূমিতে অবস্থান এখন নিরাপদ নহে দেখিয়া তাঁহার দুর্গাভ্যন্তরে গমন করিয়া সেখানে বিপুল পরিমাণে রণ-সম্ভার ও বহুবিধ রসদপত্র জমা করিলেন। তাঁহার পরিবার যুগপৎ ঐ প্রদেশের বিদ্রোহি প্রবণতায় প্রেরণা যোগাইল; এই সুযোগে বিশেষ করে জায়গীর ভূমির মালিকেরা তাঁহাদের খাজনা দান বন্ধ

করিয়া দিলেন। এবম্বিধ অবস্থার প্রতি সুবাদারের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি দুইটি বিরাট নদীসঙ্গমে অবস্থিত[২৮] স্থানটির স্বাভাবিক শক্তি, গুর্দহরের সাহস ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ অবরোধে তাঁহাকে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে, এ বিষয়ে চিন্তা করিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, এই একটিমাত্র অভিযানেই তাঁহার যে মূল্যবান সময় নষ্ট হইবে, সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে; তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁহার পরিবারের শত্রুরা সেখানে গোলমাল বাঁধাইতে পারেন; তাহা এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হইতে পারে। তাঁহার অবস্থার সমস্ত অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন থাকা ছাড়াও তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উজীর আবদুল্লাহ্ খাঁর মধ্যে কিছু অনৈক্যের সৃষ্টি হওয়াতেও তিনি অনুরূপভাবে নিরুৎসাহ বোধ করেন। এই অনৈক্য দেখা দেয় আকবরাবাদের দুর্গে প্রাপ্ত মনিমাণিক্য ও ধনসম্পদ বণ্টন লইয়া। এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিরক্তিপূর্ণ পত্র বিনিময় হইতেছিল। অবশ্য গোপনে রতনচাঁদ এই মতানৈক্য জনসাধারণের দৃষ্টি হইতে গোপন রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিভাবে কাজ করিবেন, সুবাদার যখন মনে মনে তাহা চিন্তা করিতেছিলেন তখন শাসনকর্তা গুর্দহরের নিকট হইতে পত্র আসিল—তাহাতে তিনি তাঁহার পূর্বের দাবী পূরণ ও তাঁহার দেহের নিরাপত্তা বিধানের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া রতনচাঁদকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে বশ্যতা স্বীকারে প্রতিশ্রুত হইলেন। যে অগ্নিশিখা বৃহদাকার ধারণ করিতে পারিত তাহা নির্বাপণের এমন চমৎকার সুযোগ পাইয়া দুই ভাই আনন্দের সহিত রতনচাঁদকে বিদায় দিলেন। বেশ বড় একদল সৈন্য লইয়া রতনচাঁদ রবিউস্‌সানির শেষভাগে যাত্রা করিয়া অচিরে এলাহাবাদে পৌঁছিলেন। সেখানে দুর্গের শাসনকর্তা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে এই দুই হিন্দুর মধ্যে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শীঘ্রই এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল; ইহাই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র প্রতিজ্ঞা। এই সন্ধি দ্বারা এলাহাবাদ দুর্গ পরিত্যাগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় ফৌজদারীসহ উহার শাসনকর্তৃত্ব গুর্দহরকে প্রদত্ত হইল। তদনুযায়ী ইহা খালি করা হইলে ইহা পুনরায় ভ্রাতৃদ্বয়ের আয়ত্তে আসিল

ও ইহাতে নূতন রক্ষীদল স্থাপিত হইল। রতনচাঁদ এই সন্ধির কাজ সুসম্পন্ন করিয়া তাঁহার দুই প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলে সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইলেন।

তাঁহারা যখন সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে একটা বিপর্যয় প্রতিরোধ করিতেছিলেন, তখন দাক্ষিণাংশে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির অসন্তোষ ও গোলমাল দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। আমরা ইতঃপূবেই বর্ণনা করিয়াছি যে, নিজামুল মুল্‌ক অনিচ্ছাসত্ত্বে মালবের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি দেখিলেন, আস্ত এক দস্যুদল প্রদেশবাসীকে উত্যক্ত করিয়া বেড়াইতেছে এবং বিদ্রোহী জমিদারেরা তাহাদের শান্তি ভঙ্গ করিতেছেন। এই সমুদয় পরিপূর্ণরূপে বশে আনিতে যথেষ্ট কষ্ট ও অধ্যবসায়ের দরকার হইল। কিন্তু যে প্রজ্জ্ব অগ্নিকণা আবিষ্কার করিয়া সর্বত্র স্তূপীকৃত সমস্ত দাহ্যপদার্থে আগুন ধরাইয়া দেন, তিনি হইলেন মাণ্ডুর পদচ্যুত ফৌজদার ও শাসনকর্তা মরহামাৎ খাঁ। হুসায়ন আলী খাঁ যখন তাঁহার প্রাচীর ঘেষিয়া গমন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে এত উপেক্ষা করেন যে, দর্শন দানেও কুণ্ঠিত হন। এই উপেক্ষার দরুণ তাঁহাকে চাকরী হারাইতে হয় এবং খাদেম কুলী খাঁ নামক জনৈক তুরানী তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হন; কিন্তু মরহামাৎ খাঁ নানা ওজরে দুর্গ সমর্পণ করিতে বিলম্ব করায় তিনি দখল লইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি এই ইচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য অভিযোগ করিয়া দরবারে পত্র লিখিলেন। সেখান হইতে তাঁহাকে পথে আনার জন্য ঐ প্রদেশের সুবাদার নিজামুল মুল্‌কের প্রতি আদেশ আসিল। মরহামাৎ খাঁ সম্পর্কে নিজামুল মুলকের ভাল ধারণা থাকায় তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শান্তভাবে দুর্গ সমর্পণে সম্মত করাইলেন। ঐ কর্মচারীর মধ্যে যথেষ্ট সাহসসহ প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহাকে নিজের চাকরীতে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রতি অকপট শ্রদ্ধা থাকায় তিনি তাঁহার যোগ্যতা কাজে লাগাইবার জন্য প্রত্যেকটা সুযোগ গ্রহণ করিতেন। দরবারের অমনোযোগিতার দরুণ প্রদেশটিতে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করায় নিকটবর্তী অঞ্চলের জনৈক বিদ্রোহী জমিদার রৎগুর দুর্গ হস্তগত করেন। নিজামুল মুল্‌ক এখন ফতেহ্‌জঙ্গ উপাধিতে ভূষিত হইয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি বড় একদল সৈন্যসহ

মরহামাৎ খাঁকে সেখানে পাঠাইলেন। ঐ কর্মচারীটি তাঁহার স্বাভাবিক উত্তম ও তৎপরতার সহিত এই কার্য সম্পাদন করিলেন। তিনি মনে মনে নিজকে সান্ত্বনা দিলেন যে, ইহা তাঁহার অনুকূলে ভ্রাতৃদ্বয়ের দিল নরম করিবে; কিন্তু তাঁহারা ছিলেন অপুনর্মিলনীয়। তাঁহার কথঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে নিজামুল মুল্ক তাঁহাকে প্রদেশ হইতে গুপ্ত দস্যুদল নির্মূল করিবার ও জমিদার-দিগকে সম্পূর্ণরূপে বশে আনিবার ভার দিলেন। ঐ কর্মচারীটা এ কার্যও সফলতার সহিত সম্পাদন করিলেন। এতদ্‌ভিন্ন তিনি চান্দেরী জেলায় কয়েকটা কঠিন গিরিসঙ্কট এবং কয়েকটা দুর্গও বশে আনিলেন। কিছুসংখ্যক দস্যু সেখানে লুকাইয়া থাকিত।

তাঁহার শাসনে সবকিছু সুব্যবস্থিত হইয়া গিয়াছে দেখিবা মাত্র নিজামুল মুল্ক তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি, অস্ত্রাগার পূরণ, কর্মচারী ও সৈন্যদিগকে শিক্ষা দান ও বিদ্রোহী চান্দেরী প্রদেশ হইতে অবিরত নূতন রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

এরূপ রণসজ্জা আবদুল্লাহ্ খাঁর নিকট গোপন রাখা চলিত না। তিনি সংবাদদাতা ও সরকারী কর্মচারীদের নিকট হইতে প্রত্যহ সংবাদ পাইতেন। কিন্তু আরও নিকটে তাঁহার এক অশান্তির কারণ জুটিল। তিনি সংবাদ পাইলেন যে, বাদশাহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করার জন্য মুহম্মদ আমীন খাঁ মধ্যে মধ্যে তুর্কি ভাষা[29] ব্যবহার করেন; তিনি ইহাও জানিতেন যে, নিজামুল মুল্কের সহিত গোপনে তাঁহার পত্র বিনিময় হইত। লোকে দেখিতে পাইত যে, নিজামুল মুলকের যত সৈন্যের দরকার, তদপেক্ষা বেশী সৈন্য রহিয়াছে, অসন্তুষ্ট কর্মচারী মরহামাৎ খাঁর সঙ্গে তিনি সৈন্য রাখিতেন আরও অনেক বেশী। এই সমস্ত সংবাদে দুই ভাই কিছু অস্বস্তি বোধ করায় ছোটভাই দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হুসায়ন আলী খাঁ নিজামুল মুল্ককে লিখিলেন: 'দাক্ষিণাত্যের চিরন্তন অশান্তি দূর করার জন্য তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়ে দাক্ষিণাত্য ও রাজধানীর মধ্যপথে অবস্থিত বলিয়া মালবে তাঁহাদের বসতি স্থাপন করিতে চাহেন; কাজেই তাঁহাদের দুই জনেই আশা করেন যে, তাঁহাদিগকে সাহায্য করার জন্য তিনি মূলতান, খান্দেশ, আকবরাবাদ ও এলাহাবাদ এই চারিটি শাসনকর্তার পদের একটা বাছিয়া লইবেন'। যে বিবাদ

বন্ধ করার জন্য এই পত্র অভিপ্রেত, ইহা ঠিক তাহাই ঘটাইল। দিলওয়ার আলী খাঁ একদল সৈন্য লইয়া তাঁহার প্রদেশের সীমান্তে শিবির স্থাপন করার এবং (তাঁহার প্রতিবেশী) হিন্দুরাজা রাজা ভীমসিংহ ও রাজা গজ-সিংহের সহিত মিলিত হওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় নিজামুল মুল্‌ক পূর্ব হইতেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে মালবে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু এই দুইজন রাজার নিকটবর্তিতার দরুণ ইতোমধ্যেই তাঁহার সীমান্তের জমিদারদের মধ্যে মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কাজেই নিজামুল মুল্‌ক উদ্ধত ও শ্লেষাত্মক ভাষায় হুসায়ন আলী খাঁর নম্র-ভাষায় লিখিত পত্রের উত্তর দিলেন। তাঁহার মতলব গোপন রাখার যে তাঁহার প্রায় আদৌ ইচ্ছা নাই, তাহা প্রদর্শনের জন্য তিনি পত্রের নীচে স্বহস্তে তাঁহার এই দুইটি ছত্র কবিতা যোগ করিয়া দিলেন:

"আমি এরূপ অবিশ্বাসী মিথ্যাবাদী লোক নই যে তোমাদের
নিকট কসম করিব কিন্তু আমি আবার তোমাদের মতও নহি
বলিয়া এখন তোমাদের নিকট কসম করিতেছি।"

দুই ভাই শীঘ্রই এই শ্লোক দুইটির অর্থ অনুধাবণ করিয়া তাঁহার প্রধান গোমস্তাকে দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন; তাহার সহিত তাঁহাদের খুব উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা হইল। আলাপ শেষ হইল তাঁহার প্রভুকে ভয় দেখাইয়া। নিজামুল মুল্‌ক শীঘ্রই ইহা অবগত হইলেন। তিনি যুগপৎ ইহাও জানিতে পারিলেন যে, মুহম্মদ আমীন খাঁ কিশোর বাদশাহের বুকে বিরক্তির অগ্নিকণা প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টায় আছেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের গর্বে তাঁহার মনে আঘাত লাগে, তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা ও দাবীতে তাহাদের অধীনস্থ লোক ভিন্ন আর কাহারও নিরাপত্তা ছিল না। রতন চাঁদ ও অজিৎ সিংহের ঔদ্ধত্য ও অসহনীয় ব্যবহারেও তিনি অত্যধিক স্তম্ভিত হন। কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহার এবং সমস্ত মোগল আমীর ও অজস্র বিখ্যাত ব্যক্তির সম্মান, শক্তি ও জীবন দুই ভ্রাতার পতনের উপর নির্ভর করে। এই সকল ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ সেনা-পতিদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন: তিনি তাঁহার ব্যাপার তাঁহার নিজের ভাগ্যের উপর

ছাড়িয়া দিতে এবং সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে বাধা ও বিরোধিতার পতাকা প্রদর্শন করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তিনি দুই ভাইকে একটা সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিলেন এবং আবদুর রহীম খাঁ, মরহামাৎ খাঁ ও রহীম খাঁ সহ তাঁহার প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া তাঁহার সৈন্যদলের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুরাতন সৈন্য ও নবসংগৃহীত সৈন্য মিলিয়া ইহাদের সংখ্যা হইল সর্বশুদ্ধ বার হাজার অশ্বারোহী। তখন ১১৩২ হিজরীর জমাদিউস সানির[৩০] প্রায় মধ্যভাগ ও মুহম্মদ শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসর। তিনি তখন সেরোঞ্জশহরের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে এতদিন ধরিয়া তাঁহার শিবির স্থাপন করিয়া থাকার উদ্দেশ্য ঐ সীমান্তের কয়েকটা বিদ্রোহী জিলাকে ভয় দেখাইয়া বশে আনা। এখন তাঁহার উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ায় তিনি অকস্মাৎ শিবির ভাঙ্গিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ অল্প কয়েক দিনেই আকবরাবাদে পৌঁছিল এবং মুহূর্তে তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। উজীর তৎক্ষণাৎ দিলওয়ার আলী খাঁ ও হিন্দু রাজাদ্বয়ের নিকট ক্রমে ক্রমে নিজামুল মুল্‌কের অনুসরণ করার জন্য পত্র লিখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিকট সুপারিশ করিলেন যে, দাক্ষিণাত্যের আদ্যন্ত যে অজস্র আফগান গোত্র বসতি স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে তাঁহাদের পক্ষভুক্ত করার জন্য তাঁহারা যেন চেষ্টার কোনই ত্রুটি না করেন।

নিজামুল মুলকের প্রকাশ্য বিদ্রোহ

সাম্রাজ্যের গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা এরূপ প্রকৃতির বলিয়া কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন চলিত। হীনতম ব্যক্তিদের পক্ষেও নিছক দূরত্ব ও অজ্ঞাত অবস্থার সুযোগ লইয়া স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করা ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক।

হুসায়ন খাঁ নামক জনৈক আফগান খোইস্কী ছিলেন পাঞ্জাবের কাসুর শহরের সর্দার। এই কয়েক বৎসরে তিনি কাসুর ও লাহোরের পার্শ্ববর্তী উৎকৃষ্ট জিলাগুলি দখলে আনিয়া তদঞ্চলের মৌরসী আমীর হইয়া বসেন। সুবাদার আবদুস সামাদ খাঁ যখন শিখদের বিরুদ্ধে ব্যস্ত তখনই এই সমুদয় অশান্তির সূচনা। আফগানটি প্রথমে রাজস্ব আদায়কারী ও সরকারী কর্মচারী-দিগকে তাঁহার শহর হইতে তাড়াইয়া দেন। এই উদ্যোগের পরে তিনি সৈন্য সমবেত করেন এবং কুতবুদ্দীন নামক জনৈক চরিত্রবান কর্মচারী একদল

সৈন্যসহ তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া অর্ধপথে তাঁহার সম্মুখীন হন এবং সেই সেনাপতিকে নিহত ও তাঁহার অশ্বারোহীদিগকে ধ্বংস বা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া তাঁহার বোঝাপত্র হস্তগত করেন। এই জয়লাভের ফলে তাঁহার সুনাম বর্ধিত এবং তাঁহার আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; অচিরে তাঁহার অশ্বারোহীর সংখ্যা ৮।৯ হাজারে দাঁড়াইল। সুবাদারের সঙ্গে তখন মাত্র ৭।৮ হাজার অশ্বারাহী ছিল। তখনি তিনি স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করা দরকার মনে করিলেন। দুইটি বাহিনী লাহোর হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দূরস্থ চাওনীতে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। আবদুস সামাদ খাঁ তাঁহার বখশী করীম কুলী খাঁকে তাঁহার কেন্দ্র এবং জানীর খাঁ ও খাজা রহমতুল্লাহ্ নামক তাঁহার দুইজন আত্মীয় ও পরিচিত সাহসী ব্যক্তিকে তাঁহার দক্ষিণ ভাগ পরিচালনার ভার প্রদান করিলেন। শেষোক্ত দুইজন খান মির্জার ভ্রাতা হাফেজ আলী খাঁর অধীনে স্থাপিত হইলেন। ১০০০ রোহিলা আফগানের একটি দল তাহাদের অগ্রে প্রেরিত হইল। তিনি জানিতেন যে, ইহারা বিদ্রোহীর ব্যক্তিগত শত্রু। তাঁহার নিজ সহকারী আরিফ খাঁ আগির খাঁকে লইয়া তাঁহার বামপার্শ্বে স্থাপিত হইলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহাদের সম্মুখে স্থান গ্রহণ করিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষে হুসায়ন খাঁ, রহমৎ খাঁ, বহলুল খাঁ, সায়িদ খাঁ ও অপর কয়েকজন আফগান সেনানায়কসহ নিজে ভ্রাতুষ্পুত্র মোস্তফা খাঁকে তাঁহার প্রথম সারিতে স্থাপন করিলেন। ইহাদের সকলেই ছিলেন গজারোহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পরীক্ষিত সাহসী ব্যক্তি। গুলীবৃষ্টি দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হইবা মাত্রই হুসায়ন খাঁ পূর্ণবেগে শত্রুপক্ষের কামানরাজির দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন। এগুলি পিছনে ফেলিয়া তিনি করীম কুলী খাঁর দিকে ধাবিত হইয়া প্রথম আক্রমণেই তাঁহাকে অশ্বচ্যুত ও তাঁহার বহু সৈন্য নিহত করিলেন। অতঃপর আক্রমণ চালাইয়া তিনি আগির খাঁর উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা প্রধানতঃ নব সংগৃহীত বলিয়া এত প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর্দিকে পলাইয়া গেল। কেবল ৫/৬ শত পুরাতন সৈন্য আগির খাঁর সঙ্গে রহিল। ইহাদের সকলেই ছিল তুরানী বা তাতার তীরন্দাজ। তাহাদের সেনাপতিকে পরিত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া তাহারা এমন তীর নিক্ষেপ করিল যে, আফগানেরা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল ও তাহাদের

উৎসাহে ভাটা ধরিল। আগির খাঁ ইহা লক্ষ্য করিবামাত্রই শত্রুপক্ষের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটা তীরে এক একজন ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তাঁহার কথায় ও দৃষ্টান্তে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া তিনি আফগানদের মধ্যে এত অধিক ধ্বংসক্রিয়া চালাইলেন যে, তাঁহার তিন হাজার অনুচরের উৎকৃষ্ট অংশসহ মোস্তাফা খাঁ নিহত হইলেন। এই ক্ষতির জন্য পরওয়া না করিয়া হুসায়ন খাঁ। খোদ আবদুস সামাদ খাঁর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি এত তেজস্বিতার সহিত তাঁহার উপর আপতিত হইলেন যে, মোগল সেনাপতির পরাভূত হওয়ার উপক্রম হইল; তাঁহার হাতীর আশেপাশে তখন আহত বা নিহত লোক ভিন্ন আর কেহই রহিল না। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে আমির খাঁ তাঁহার বিজয়ী মোগল সৈন্যসহ সেখানে হাজির হইলেন। সেখানেও তিনি পুনরায় যুদ্ধের গতি বদলাইয়া দিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে হুসায়ন খাঁর হাতীর মাহুত নিহত হইয়া তাহার আসন হইতে পতিত হইল। জনৈক শাহ্ বোলোক ছিলেন তাঁহার আধ্যাত্মিক গুরু। তিনি বরাবর তাঁহাকে নিজের ডাইন পাশে বসাইয়া লইয়া যাইতেন; তিনিও নিহত হইলেন। হাফেজ আলী খাঁর নিক্ষিপ্ত একটা গুলী কপালে লাগিয়া ঐ সাহসী বিদ্রোহী নিজেও অনুরূপভাবে ভূপাতিত হইলেন। এই মুহূর্ত হইতে তাঁহার সৈন্যেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। যুগপৎ হাতীর হাওদা ও আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়া গেল। প্রায় সমস্ত কর্মচারী হারাইয়া আফগানেরা তাহাদের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং পরিশেষে প্রকাশ্যে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। এই পলায়নের ফলে আবদুস সামাদ খাঁ পূর্ণ বিজয়ের অধিকারী হইয়া তাঁহার সেনানায়কগণকে যুদ্ধক্ষেত্রেই পুরস্কৃত করিলেন। আগির খাঁ যুদ্ধের সফলতায় এত অধিক সাহায্য করায় তিনি তাঁহার মনসব ৫০০ সওয়ার দ্বারা বাড়াইয়া দিলেন। তিনি পূর্বে ৬০০ সৈন্য চালনা করিতেন। এখন তাহাদের সহিত আরও ২০০ যোগ করা হইল। এতদ্ভিন্ন তিনি একটা হস্তী, একখানা ঘোড়া ও একখানা তরবারি উপহার পাইলেন। এই বিজয়বার্তা রাজধানীতে পৌঁছিলে দুই ভাই সুবাদারকে প্রশংসা-সূচক পত্র লিখিলেন এবং তিনি পূর্বে যে সকল উপাধি ভোগ করিতেন, তদসঙ্গে 'সায়ফুদ্দৌলা' বা সাম্রাজ্যের তলোয়ার উপাধি যোগ করিয়া দিলেন।

পাঞ্জাবে যখন এই সমুদয় ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল, দাক্ষিণাত্য তখন সর্বাপেক্ষা গুরুতর আলোড়নের দৃশ্যে পরিণত হইতেছিল। সায়্যিদদের বশ্যতা স্বীকার না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নিজামুল মুল্‌ক সেই বিশাল সুবাদারীর উত্তর সীমা নর্মদা নদী অতিক্রম করিলেন। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেন। অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি এত শীঘ্র প্রসন্ন হইল যে, তিনি আকবরপুরে পদব্রজে নর্মদা অতিক্রম করিলে আসির দুর্গ বিনা বাধায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল; অথচ ইহা জয় করিতে বিজয়ী সুলতান আকবরের বহু বৎসরের অবরোধ ও পরিশ্রমের দরকার হয়। কিল্লাদার তালেব খাঁ তাঁহার নিয়োগ ও সৌভাগ্যের জন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ জনের নিকট দায়ী। এখন তাঁহার প্ররোচণায় রক্ষী সৈন্যদলের সৈন্য ও কর্মচারীরা একত্র হইয়া নিজামুল মুল্‌কের হাতে চাবি তুলিয়া দিল; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের দুই বৎসরের বাকী বেতন পরিশোধ করিলেন; এতদ্ভিন্ন তাহারা আরও নানা প্রকারে অনুগৃহীত হইল। অনেকটা একইরূপে বুরহানপুর দুর্গও তাঁহার হাতে পড়িল। বেরারের শাসনকর্তা গাওস খাঁ ছিলেন একজন সাহসী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং নিজামুল মুল্‌কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এরূপ সুখকর প্রারম্ভ সমাপ্ত করিবার জন্য তিনি বৃহৎ একদল সাহসী সৈন্য ও এক সারি কামান লইয়া নিজামুল মুল্‌কের সহিত যোগদান করিতে আসিলেন। তিনি শিবিরে আসিতে না আসিতেই দিস্ত নামক জনৈক মারাঠা কর্মচারী তদীয় প্রভু শাহ রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় তাঁহার চাকরী ত্যাগ করিয়া তাঁহার অধীন ২০০০ অশ্বারোহীসহ নিজামুল মুল্‌কের সহিত যোগদান করিলেন। ঐ অঞ্চলের কয়েকজন জমিদারও এই দীর্ঘকাল যাবত সে দেশে বসতি স্থাপন-কারী কতিপয় আফগান সর্দার একই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। খান্দেশ প্রদেশ বা বুরহানপুরের শাসনকর্তা আনওয়ার খাঁ তাঁহার সব কিছুর জন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম আবদুল্লাহ খাঁর নিকট ঋণী হইলেও দলত্যাগ সংক্রামক হইয়া পড়ায়—এমনকি তিনিও অনুরূপভাবে নিজামুল মুল্‌কের দলে ভিড়িলেন। সায়্যিদ দ্বয়ের ভাগিনেয় বলিয়া আযম আলী খাঁ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের সহকারী নিযুক্ত হন। অনেকটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আনওয়ার খাঁ বাস্তবিকই এই আযম আলী খাঁর শিবিরে ছিলেন। সেখানে তিনি নিজামুল

মুল্‌কের অগ্রগতি ও উদ্দেশ্যের কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট তাঁহার যাবতীয় ঋণের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং বুরহানপুরের জন্য ব্যবস্থাবলম্বনের স্থলে তিনি তাঁহার উপকারীর শত্রুপক্ষ বনিয়া গেলেন। নিজামুল মুল্‌কের (এই সময় তিনি আসফ জা বলিয়া অভিহিত হইতেন) ন্যায় এরূপ সফলকাম সেনাপতির আগমন সেই অঞ্চলে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করিল যে, যে সকল মারাঠা সেনানায়ক তাঁহাদের সৈন্য লইয়া শাহ রাজার পক্ষে সর্বত্র চৌথ আদায় করিতেছিল, তাঁহারা ক্রমশঃ সাতারায় চলিয়া গেলেন। নিজামুল মুল্‌ক যখন দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন একটা ঘটনা সংঘটিত হইল। তাহা তাহার চরিত্রের উপর অত্যন্ত শুভকর আলোকপাত করিল। সর্বোচ্চ খ্যাতিসম্পন্না জনৈক মহিলা উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। বিপ্লবের কথা কিছুই তাঁহার জানা ছিল না। তিনি ছিলেন সায়ফুদ্দীন আলী খাঁর মাতা, সুতরাং সায়্যিদদ্বয়ের ভগিনী। তিনি পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য রাজধানীতে যাইতেছিলেন। সায়ফুদ্দীন খাঁর স্ত্রী ও কয়েকটা ছোট ছোট বালক-বালিকাও তাঁহার সঙ্গে ছিল। বুরহানপুরে পৌঁছিয়া তিনি শত্রু জনপদে আছেন শুনিয়া ও নিজামুল মুল্‌ক সেই পথে অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। দুরাবস্থায় পড়িয়া তিনি তাঁহার নিকট যে টাকাকড়ি ও ধনরত্ন আছে, তাহা দানের প্রস্তাব করিয়া একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি বিনীত ভাবে আশা করিলেন যে, এরূপ ত্যাগে সন্তুষ্ট হইয়া নিজামুল মুল্‌ক তাঁহাকে সসম্মানে ও নিরাপদে তাঁহার সফরে অগ্রসর হইতে দিবেন। পত্র পাঠে নিজামুল মুল্‌কের মুখে মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটা সম্মানজনক পরিচ্ছদ আনাইয়া তাঁহার পরিচয় দানকারীকে তাহা মহিলাটির উকীলের গায়ে পরাইয়া দিতে বলিলেন। ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি কিছু ফল পাঠাইলেন এবং উকীলকে এগুলির দিকে খেয়াল রাখিতে বলিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এক দুই শতী মনসবদারকে ডাকিয়া তাঁহার সৈন্যদলসহ ভৃত্যের ন্যায় মহিলাটির নিকট হাজির থাকিতে বলিলেন এবং যে পর্যন্ত তিনি নিরাপদে দিলওয়ার আলী খাঁর শিবিরে না পৌঁছেন, সে পর্যন্ত তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিবার জন্য কঠোর উপদেশ দিলেন। দিলওয়ার আলী খাঁ।

তখন উজীরের সৈন্যদল পরিচালনা করিয়া তাঁহাকে আক্রমণার্থে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই সেনাপতিকে প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়া নিজামুল মুল্‌কের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ধ্বংস করার আদেশ প্রদত্ত হয়। স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাত্রার উদ্দেশ্যে হুসায়ন আলী খাঁ শুধু তাঁহার নিকট হইতে পত্রলাভের অপেক্ষায় ছিলেন। অবশ্য রতন চাঁদ নিজামুল মুল্‌ককে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারি হইতে অব্যাহতি দিয়া তাহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য একাধিক বার প্রস্তাব করেন। কিন্তু দাক্ষিণাঞ্চলের ন্যায় সাম্রাজ্যের উত্তরাংশেও অনুরূপ আলোড়ন দেখা দিয়াছে বলিয়া বোধ হইলেও এরূপ প্রস্তাবে তাঁহার মনিবদের সমস্ত অনুভূতিতে আঘাত করিল। ইতিমধ্যে কাশ্মীরে ভীষণ আলোড়ন ও রক্তাক্ত হাঙ্গামা দেখা দিয়াছিল। আবদুন্নবী নামক জনৈক কাশ্মীরী মুহতাবী খাঁ উপাধিতেই সমধিক পরিচিত ছিল। এই লোকটাকে এত দিন ধরিয়া সমস্ত হিন্দুকে ঘৃণা করার মূর্খোচিত ঝোঁকে পাইয়া বসে। সে তাহার বিতৃষ্ণা প্রকাশের জন্য সময়ের বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইল। এক-দল অলস, উচ্ছৃঙ্খল ও বিবেচনাহীন মুসলমান সমবেত করিয়া সে তাহাদের নেতারূপে সহকারী শাসনকর্তা মীর আহমদ ও কাযী বা প্রদেশের প্রধান বিচারপতির নিকট গমন করিয়া প্রস্তাব করিল, এখন হইতে সর্ব প্রকারের হিন্দুর অশ্ব, জামা, সবুজ পাগড়ী ও অস্ত্র ব্যবহার[৩১] নিষিদ্ধ হওয়া এবং তাহা-দিগকে তাহাদের নির্ধারিত সময়ে বাগানে ও স্নানের ঘাটে[৩২] যাইতেও নিষেধ করা উচিত। শাসনকর্তা ও প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "মহামান্য বাদশাহ তাঁহার দরবারে শিক্ষিত আলিমদের উপদেশানুযায়ী ঐ সকল ব্যাপারে তাঁহার সাম্রাজ্যের সমস্ত হিন্দুর জন্য স্থায়ী নীতি হিসাবে যে সকল আইন পাশ করা উচিত মনে করিবেন, সেগুলি অবশ্য কাশ্মীরেও প্রবেশ করিবে; তখন তাঁহার খাস গোলাম হিসাবে তাঁহাদের কাজ হইবে সেগুলি কার্যে পরিণত করা।" এই উত্তর সন্তোষজনক প্রমাণিত না হওয়ায় এখন হইতে যে কোন হিন্দুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত তাহাকেই আক্রমণ করিয়া তাহার সহিত নিজের বিচিত্র ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করা মুহতাবী খাঁর অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। একদা সাহাব রায় নামক জনৈক নামজাদা হিন্দু শহরতলীর এক বাগানে একটা ভোজ দিতেছিলেন; এমন সময় ঐ

শয়তানের অনুচর তাহার মনিবের প্ররোচণায় অপ্রত্যাশিতভাবে এই নিরীহ লোকগুলির উপর আপতিত হইয়া যত লোককে পাইল নিহত, আহত ও ছিন্নভিন্ন করিল। নিজেও আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম দেখিয়া সাহাব রায় শাসনকর্তা মীর আহমদ খাঁর বাড়ীতে পালাইয়া গেলেন। তিনি সেখানে লুক্কায়িত থাকার সময় শহরস্থ তাঁহার বাড়ী মুহ্‌তাবী খাঁ ও তাঁহার অনুচরদের হাতে ধীরে ধীরে লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইল। অনুরূপভাবে তাহারা ঐ সমগ্র হিন্দু পাড়াও লুণ্ঠন করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল; যত হিন্দু তাহাদের করুণা ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া আসিল, তাহারা কেবল তাহাদিগকেই নিহত ও ছত্রভঙ্গ করিল না—যত মুসলমান তাহাদের পক্ষে সুপারিশ করিতে চাহিল তাহাদিগকেও হত্যা করিল ও তাড়াইয়া দিল। এই কার্যে উত্তেজিত হইয়া তাহারা শাসনকর্তার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল; তাহারা প্রথমে পাথর ও ইটের টুকরা, শেষে তীর ও বন্দুকের গুলী দ্বারা উহা আক্রমণ করিল। যে কেহ উহার বাহিরে আসিল বা অন্য কোনরূপে তাহাদের হাতে পড়িল, তাহাদের নিহত বা অকুস্থলে উলঙ্গ করা না হইলেও তাহাদের অপমানিত ও লুণ্ঠিত হওয়া নিশ্চিত ছিল। সহকারী শাসনকর্তা পূর্ণ এক দিবারাত্র অবরুদ্ধ রহিলেন। তিনি কয়েকটি কৌশলের ঝুঁকি ঘাড়ে না লইলেও, সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক সঙ্কটের সম্মুখীন না হইলে তাঁহার পক্ষে পলায়ন করাও সম্ভবপর হইত না। পর দিন তিনি কিছু সৈন্য ও অপর কিছু লোক একত্র করিয়া তাঁহার ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার বখ্‌শী শাহযোর খাঁ এবং কতিপয় মনসবদার ও সরকারী কর্মচারীর সহায়তায় সেই হতভাগা বিদ্রোহীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সেই নারকী শাসনকর্তার অভিসন্ধির সংবাদ পাইয়া বাধাদানের উদ্দেশ্যে তাহারই প্রায় স্বভাব-বিশিষ্ট বিপুল সংখ্যক লোক একত্র করিল এবং সহকারী শাসনকর্তা একটা সেতুর এপারে অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া তাহার কিছু অনুচর পাঠাইল। তাহারা সেতুটাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া তাহাদের আঘাতের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে ও পশ্চাতে সমস্ত রাস্তায় আগুন লাগাইয়া দিল। পক্ষান্তরে তাহার আর একদল লোক ধ্বংসস্তূপের ভিতরে ঢুকিয়া এবং গৃহের ছাদে উঠিয়া অবিশ্রান্ত গুলী, তীর, পাথর ও ইটের

কাশ্মীরে প্রচণ্ড আলোড়ন

টুকরা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা বিষ্টা ও অন্যান্য আবর্জনা ঢালিয়া দিয়া এবং তাহাদের মাথায় আসিল, এরূপ প্রত্যেকটা ক্ষেপনীয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকেও ডিঙ্গাইয়া যাইতে চাহিল। এভাবে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সহকারী শাসনকর্তার ভ্রাতুস্পুত্র সায়্যিদ ওলী ও কোতওয়ালের সহকারী যুলফিকার বেগ আরও কিছু লোকজনসহ নিহত হইলেন; আরও অধিক সংখ্যক লোক মারাত্মকরূপে আহত বা অক্ষম হইল। মীর আহমদ খাঁ দেখিলেন, তিনি প্রায় একাকী। পিছনে হটিতে অসমর্থ এবং সম্মুখে অগ্রসর হইতে বা থামিতে ভীত হইয়া তিনি অনুনয় বিনয়ের শরণ লইলেন। মৃত্যুর চেয়ে নৃশংসতর সর্বপ্রকার অত্যাচার ও অপমান সহ্য করার পর তাঁহাকে পলাইতে দেওয়া হইল। মুহতাবী খাঁ এখন পূর্বাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়া শাসনকর্তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। সর্বশ্রেণীর অজস্র হিন্দুসহ সাহাব রায় যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। চোখের নিমিষে সে সবলে ভিতরে ঢুকিয়া তাহাদের প্রত্যেককে ধৃত করিয়া কিছু লোককে হত্যা ও অন্যান্যের নাসিকা কর্তন করিল; যাহাদিগকে সে রক্ষা করিতে চাহিল তাহাদের খৎনা করিল। কিন্তু এই সমুদয় এত নিষ্ঠুর তৎপরতার সহিত অনুষ্ঠিত হইল যে, কাহারও কাহারও লিঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরদিন সে বহু লোকজন লইয়া প্রধান মসজিদে গমন করিল এবং নিজের কর্তৃত্বে সহকারী শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করিয়া আমীরুল মু'মেনীন ও দিলদার খাঁ উপাধি ধারণ করতঃ নিজেকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিল। আর একজন সহকারী শাসনকর্তা না আসা পর্যন্ত কাযী বিচার বিভাগ সংক্রান্ত সমস্ত মামলা শ্রবণ ও নির্ধারণের আদেশ পাইলেন। একাদিক্রমে পাঁচ মাস যাবত মীর আহমদ খাঁ নিজ রাজধানীতে বে-সরকারী লোক হইয়া রহিলেন; মুহতাবী খাঁ প্রত্যহ রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত মসজিদে বসিয়া রাজস্ব, প্রশাসন, এমন কি বিচার বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিবাদ শ্রবণ ও নিষ্পত্তি করিতে থাকিলেন।

এই সকল হাঙ্গামা দরবারে লক্ষ্য করা হইলে ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা এনায়েতুল্লাহ্ খাঁর পক্ষে মুমিন খাঁ সহকারী (নায়েব) হিসাবে কাশ্মীরে প্রেরিত হইলেন। মুহতাবী খাঁ ইতোমধ্যে বেজায় ঠাণ্ডা হইয়া পড়ায় নিজের

কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই এই সংবাদে যে ভয় পাইল। খাজা আবদুল্লাহ্ ছিলেন নগরের একজন প্রধান ধার্মিক ব্যক্তি। তাঁহার সহিত তাহার পরিচয় ছিল। সে যে প্রথম আবেগ অনুভব করিল, তাহার বশে সে নিজের ছোট ছোট দুইটা শিশুর হাত ধরিয়া তাহাদিগকে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল। প্রধান আলিম ও প্রধান নাগরিকদের লইয়া তিনি নুতন নায়েবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহিরে যাইতে চাহেন শুনিয়া সে-ও ঐ দিন তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিল। সাধু ব্যক্তিটি উত্তর দিলেন, ইহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রথমে বখ্শী মীর শাহ্ খুরের নিকট গিয়া অতীত ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাই হইবে তাহার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। মুহতাবী খাঁ একমত হইয়া বখ্শীর গৃহে গমন করিলেন; খাজার উপদেশে তিনি নগরের সেই বেজায় ক্ষতিগ্রস্ত পাড়া শুদবোলের কিছু লোককে সেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কক্ষে প্রবেশ করিলে তাঁহার সহিত তাহার কিছু কথা কাটাকাটি হইল, এমন সময় বখ্শী তাঁহার দেহাভ্যন্তরে কিছু জরুরী প্রয়োজন বোধ করায় মাফ চাহিয়া চলিয়া গেলেন। ইহা স্বীকৃত চিহ্ন বলিয়া লুক্কায়িত লোকেরা গৃহকোণ হইতে ছুটিয়া আসিয়া সর্বপ্রথমে তাহারই সম্মুখে তাহার দুইটা শিশুর উদর চিড়িয়া ফেলিল। তৎপরে তাহারা তাহার উপর আপতিত হইয়া প্রতিহিংসা যত প্রকার নির্যাতন উদ্ভাবন করিতে পারে, তত নির্যাতন সহকারে তাহাকে হত্যা করিল। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে না হইতে তাহার অনুচরেরা তাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইল এবং শুদবোলে ছুটিয়ে গিয়া অধিবাসীদের হত্যা, যখম, মারপিট ও ছিন্নভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল; অতঃপর তাহারা গৃহগুলিতে আগুন লাগাইয়া দিল। এই পাষণ্ডেরা প্রায় ৩০০০ লোককে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিল; ইহাদের অধিকাংশই মোগল, বণিক ও বাণিজ্য ব্যপদেশে আগত বৈদেশিক বলিয়া প্রমাণিত হইল। অজস্র রমণী ও শিশুকে তাহারা অনুরূপভাবে রমণীয় লুণ্ঠিতদ্রব্য হিসাবে ধরিয়া লইয়া গেল। কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি অনুরূপভাবে লুণ্ঠিত বা সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট করা হইল। এই নরাধমেরা যে সকল অসহায় লোককে

ধরিয়া লইয়া গেল, তাহাদের সহিত তাহারা যে ব্যবহার করিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই নারকীরা ইহাকে তাহাদের ধর্মযুদ্ধের প্রথম পর্ব বলিয়া অভিহিত করিল। ইহা সমাপ্ত হওয়ার পর তাহারা দ্বিতীয় পর্বে অগ্রসর হইল অর্থাৎ তাহারা সদলবলে কাযী ও বখ্শীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। বখ্শী লুকাইয়া থাকার ব্যবস্থা করিলেন; কাযী তাঁহার বেশ বদলাইয়া চুপিচুপি সরিয়া পড়িলেন। পাষণ্ডেরা তাঁহার পলায়নে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার গৃহ ভিত্তি হইতে উৎপাটিত করিয়া উহার উপকরণ-রাজি চতুর্দিকে ছড়াইয়া ফেলিল; একখানা ইষ্টকও তাহারা সেখানে রাখিল না। এই ধ্বংসযজ্ঞের কয়েক দিন পরে নূতন সেনাপতি মুমিন খাঁ সেখানে আসিলেন। তাঁহার প্রথম কাজ হইল মীর আহমদ খাঁকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করা। দ্বিতীয় কাজ হইল শৃঙ্খলা ও বশ্যতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সে দেশের অধিবাসীরা ছিল দুষ্ট ও হাঙ্গামা বাধাইতে পটু; কাজেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোককে কখনও নতিস্বীকার করিয়া, কখনও কঠিন হইয়া বাস করিতে হয়।

সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চল যখন আলোড়নের অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করিতেছিল, দক্ষিণাংশ তখন একটা অতি বিপজ্জনক যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ হইয়া উঠিতেছিল; ইহা দুই সায়্যিদের অস্তিত্বে পর্যন্ত আঘাত হানিল। আমরা দিলওয়ার আলী খাঁকে বুরহানপুরের পথে পূর্ণবেগে যাত্রারত অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি। তাঁহার গতিবিধির সংবাদ পাইয়া নিজামুল মুল্ক তাঁহার উৎকৃষ্ট সৈন্যসহ তাঁহার কয়েকজন উৎকৃষ্ট সেনাপতিকে গতিরোধে প্রেরণ করিলেন; অচিরে এক সারি কামান ও শিবিরের সাজসজ্জাসহ গওস খাঁর অশ্বারোহী দলকে ইহাদের সহিত যোগ করা হইল; সকলের পরিচালনা ভার ন্যস্ত হইল তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু এনায়েৎ খাঁর উপর। তিনি নিজে তাঁহার হস্তীতে আরোহণ করিয়া তাঁহার জ্ঞাতি গওস খাঁ ও তাহার অবশিষ্ট সৈন্যদল সহ নগরের বাহিরে আসিয়া এনায়েৎ খাঁর সাহায্যার্থ প্রস্তুত থাকার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শিবির স্থাপন করিলেন। শত্রুদের খোঁজ পাওয়া মাত্র এনায়েৎ খাঁ তাঁহার সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নিজামুল মুল্কের উপদেশ অনুযায়ী তিনি তাঁহার অধিকাংশ লঘু ও ভারী কামান একটা গুল্মাবৃত ভূমির পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিলেন। সেখানে এগুলিকে

ছরা ভর্তি করিয়া রাখা হইল। স্থানটি ছিল একটা ছায়াদার স্রোতস্বতীর তীর। তাহা এগুলিকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে অভিপ্রেত বলিয়া মনে হইল। সেনাপতির ইচ্ছাও ছিল তাই। তাঁহার অধীনে অজস্র পরীক্ষিত সাহসী সৈন্য ছিল; নিজামুল মুল্‌ক জানিতেন, ভয় ও বিপদের মুহূর্তে তাহারা তাহাদের উপস্থিত বুদ্ধি রক্ষায় সমর্থ হইবে। পক্ষান্তরে দিলওয়ার খাঁ তাঁহার নিজের বিশিষ্ট তেজোদ্দীপ্ত সাহস ও বারের লোকদের সর্বজনকথিত স্থূলবুদ্ধি লইয়া আফগান সেনানায়ক দোস্ত মুহম্মদ খাঁ সহ সশস্ত্র ও আরূঢ় অবস্থায় অগ্রসর হইলেন। তিনি এইভাবে তাঁহার সৈন্য সাজাইলেন: ১১০০০ অশ্বারোহী লইয়া তিনি সর্বাগ্রে রহিলেন; নিবিড় একদল রাজপুত লইয়া হিন্দু রাজদ্বয় ভীমসিংহ ও গজসিংহ তাঁহার পশ্চাতে স্থান লইলেন। ইহাদের পিছনে রহিল তাঁহার কামানরাজি ও সকলের শেষে তাহার রণ হস্তীযূথ। এরূপ যুদ্ধ শৃঙ্খলার সহিত ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিলেন—যাহারা অটলভাবে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পক্ষান্তরে এনায়েৎ খাঁ তাঁহার শত্রুদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। গুলী ও হাউইবাজি নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুদর্শনে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া ও আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া দিলাওয়ার খাঁ পশ্চাদ্বর্তনকারী শত্রুদের ধাওয়া করিয়া দূর হইতে আরও দূরে আগাইয়া চলিলেন; তাহারা যে তাঁহার জন্য লুক্কায়িত স্থানে ওৎপাতিয়া বসিয়া রহিয়াছিল, এই সন্দেহ তাঁহার মনেও স্থান পাইল না। অবশেষে তিনি নিতান্ত বন্ধুর ভূমিতে একত্রিত হইলেন; সেখানে তাঁহার সৈন্যেরা বাধা হইয়া ব্যূহ ভাঙ্গিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এই বিশৃঙ্খলার দিকে দিকপাত না করিয়া তিনি আগাইয়া চলিলেন; পরিশেষে তিনি যেখানে একদল অটল লোক লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহার জন্য প্রতিক্ষা করিতেছিল, সেই গুল্মময় স্থানে উপনীত হইলেন। তাহারা ধীরে ধীরে লক্ষ্য ঠিক করিয়া একযোগে বন্দুক, কামান ও হাউই বাজি ছুড়িল। তৎফলে যাহারা এত আগ্রহভরে তাঁহার অনুগমন করিতেছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই ভূতলশায়ী হইল। যাহারা পশ্চাতে ছিল, তাহারা এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডে আতঙ্কিত হইয়া ময়দান আচ্ছন্নকারী

বুরহানপুরের যুদ্ধ

ধুম্রজালের আড়ালে যুদ্ধ ছাড়িয়া এত অধিক সংখ্যক পশ্চাদ্বর্তন করিল যে, দিলওয়ার খাঁ প্রায় একাকী হইয়া পড়িলেন। দুইজন হিন্দুরাজা ও ৪/৫ শত লোক ভিন্ন কেহই তাঁহার নিকট অবশিষ্ট রহিল না। ভূমি নিতান্ত বন্ধুর বলিয়া ঘোড়া বা হস্তী সেখানে আরামে ঘুরাফিরা করিতে পারিত না; রাজপুতগণসহ অধিকাংশ অশ্বারোহী মৃত বা আহত হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। অবশিষ্ট লোক চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল; এমনকি এত বড় সাহসী এত বড় চরিত্রবান দোস্ত মুহম্মদ খাঁ পর্যন্ত সম্মান জ্ঞানের চেয়ে আতঙ্কভাব অধিক হওয়ায় পলায়ন করাই সঙ্গত মনে করিলেন। ইহা অহেতুক ছিল না; ভাগ্য ইতঃপূর্বেই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল। তাঁহাদের সম্পর্কিত কোন কিছুই আর অনুকুল পরিবেশে আনয়ন করা যাইত না। তাঁহার সমগ্র বাহিনীর পরাভব দর্শনে হতাশ হইয়াও দিলওয়ার আলী খাঁ রাজদ্বয় ও তাঁহার সাহসী সৈন্যদের লইয়া এই অপমানের পরে জীবিত না থাকিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আগাইয়া চলিলেন। এতগুলি লক্ষ্যের অসংখ্য গুলী খাইয়া ইহাদের সকলেই সর্বশেষ প্রাণীটি পর্যন্ত নিহত হইল। এই বিজয়ে শত্রু-বাহিনী প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইলেও নিজামুল মুল্‌কের কোন ক্ষতি হয় নাই বলিলেই চলে। ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, তাঁহার একজন কর্মচারীও নিহত হন নাই। শত্রুরা সর্বত্র পালাইয়া গেল। বিজয়ী বাহিনীতে জয়-রব উত্থিত হইল। দিলওয়ার আলী খাঁর সামরিক তহবিল, বোঝাপত্র, কামান ও সাজসজ্জা প্রভৃতি প্রত্যেকটা বস্তুর যাহা কিছু ব্যাপক লুণ্ঠনের হাত হইতে রক্ষা পাইল, তাহা নিজামুল মুল্‌কের ব্যবহারার্থ দখল করা হইল। এই সেনাপতি পূর্ণ জয়লাভ করিয়া এখন বুরহানপুরে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে তিনি প্রজাপালন করিয়া এবং তাঁহার সৈন্যদিগকে হস্তী, সম্মানজনক পরিচ্ছদ, মূল্যবান অস্ত্র ও অন্যান্য অনুগ্রহ দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া এবং যখমীদের অর্থ ও ঔষধ দানে সাহায্য করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।

এই বিজয় লাভের সংবাদ অচিরে রাজধানীতে পৌঁছিলে বাদশাহ্, মুহাম্মদ আমীন খাঁ এবং ঐ শাহ্‌জাদার প্রতি অনুরক্ত সমস্ত লোকেই গোপনে অকপট অনন্দ অনুভব করিল; কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়ের মন ভয় ও অধীরতায় পূর্ণ

হইয়া গেল। তাঁহারা প্রত্যহ আলোচনা করিতে লাগিলেন। কখনও তাঁহারা একযোগে নিজামুল মুল্‌কের বিরুদ্ধে যাত্রা করার প্রস্তাব করিতেন। কখনও বা বাদশাহ্‌কে রাজধানীতে লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কনিষ্ঠ হুসায়ন আলী খাঁর পক্ষে দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত বিপজ্জনক শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উত্তম মনে হইত। বাদশাহ যাহাতে তাঁহাদের নিজস্ব বিজয়ে শরীক হইতে পারেন, তজ্জন্য এক সময় তাঁহারা তাঁহাকে যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চেও লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। আর এক সময় সর্বপ্রথমে হুসায়ন আলী খাঁর পত্নী ও সন্তানদের জন্য লোক পাঠাইয়া তৎপরে নিজামুল মুল্‌কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার কথা চিন্তা করাই তাঁহাদের নিকট শোভনীয় মনে হইল। তাঁহাদের মধ্যে আলোচনার আর এক বিষয় ছিল মুহম্মদ আমীন খাঁ; তিনি যে তাঁহাদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরও কোন সন্দেহ ছিল না। এমনকি তিনি সায়্যিদদের হস্তে নিহত বা অন্ততঃ গেরেফতার হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ্য জনরব উঠিল; আর এক সংবাদ রটিল যে তাঁহাদের মধ্যে পুনর্মিলন সাধিত ও শত্রুতার প্রত্যেকটা বিষয় বিস্মৃতির নিম্নে সমাহিত হইয়াছে। লোকে বলে, ছোট ভাই তাঁহাকে হত্যা করার পক্ষে মত দেন, কিন্তু বড় ভাই আপত্তি করিয়া বলেন যে, তাঁহার ও তুরানী আমীরের মধ্যে হলফ ও প্রতিশ্রুতি বিনিময় হইয়াছে; কাজেই এরূপ কার্য অনুদার এবং যে কোন অবস্থায় অসম্মানজনক; এমনকি অযৌক্তিক হইবে। এই একটি মাত্র বিষয়ে বাকবিতণ্ডা তীব্র হইয়া উঠিল; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিতে শুনা গেলঃ 'আমার জীবন তাঁহার প্রাণের সাথে ওতপ্রোত জড়িত; তুমি যদি তাঁহাকে হত্যা করার জন্য জিদ ধর, তবে আমাকেও বধ কর। নতুবা আমাকে আত্মহত্যা করতে দাও।' এরূপ বাদানুবাদের পরেই অবশেষে তাঁহার জীবন রক্ষা করা হইল; বস্তুতঃ তিনি যখন খোদ হুসায়ন আলী খাঁকেই হত্যা করিবেন বলিয়া পূর্ব হইতেই নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছিলেন, তখন তিনি কিরূপে তাঁহার হস্তে নিহত হইতে পারেন?

ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে গুরুতর বাদানুবাদ

সময়ের গর্ভে যে সকল প্রতিকূল ঘটনা প্রচ্ছন্ন ছিল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন তাহারই আভাস দিয়া যায়। ১২০৩ হিজরীর পবিত্র রমজান মাসের[৩৪]

২২ তারিখে বেলা ১২ টার সামান্য পরে লোকে যখন মধ্যাহ্নের নামায আদায় করিতে ও খুৎবা শুনিতে বড় মসজিদে সমবেত হইয়াছিল, তখন অকস্মাৎ ভীষণ ভূমিকম্পে সমগ্র সৌধ কাঁপিয়া উঠিল; গম্বুজ হইতে ইট খসিয়া পড়ায় সমবেত মুসল্লীরা অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, এরূপ ঘটনা কোন গুরুতর ও অসাধারণ ব্যাপারের পূর্বাভাস অথবা ইহা তাহাদিগকে কোন অতীত ব্যাপার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শাহ-জাহানাবাদ ও পুরাতন দিল্লীর অধিকাংশ গৃহ ভূপাতিত হইল কিম্বা ভিত্তিমূল পর্যন্ত প্রকম্পিত হইল। অজস্র লোক ধ্বংসস্তূপের নিম্নে বিধ্বস্ত এবং অজস্র লোক আহত বা অঙ্গহীন হইল। ভূগর্ভে পুনঃ পুনঃ এত ভীষণ গুড় গুড় শব্দ হইতে লাগিল যে, প্রত্যেকের হৃদয়ে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হইল। সেদিন ক্রমাগত নয় বারের কম এরূপ কম্পন হইল না; তাহাতে নগরের অধিকাংশ গৃহ উল্টিয়া পড়িল। একাদিক্রমে ৪০ দিন ৪০ রাত্রি পর্যন্ত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প চলিল, প্রতিদিনই ভগ্ন অট্টালিকাগুলির কোন নূতন ক্ষতি হইতে লাগিল। ভূগর্ভ হইতে মধ্যে মধ্যে গোলমাল, আওয়াজ ও আর্তনাদ শ্রুত হইত। আতঙ্কিত নাগরিকেরা এত ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল যে, কেহ সজ্ঞানে কোন বদ্ধস্থানে বা ছাদের নিম্নে নিদ্রা যাইতে সাহস পাইত না। এই ৪০ দিন অবিরত কম্পনের পরে পৃথিবী বাস্তবপক্ষে স্থির হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু পরবর্তী ৪/৫ মাসেও মধ্যে মধ্যে সামান্য আলো-ড়ন হইত। আলোড়ন অব্যাহত থাকিতেই ১লা জিলক্বাদ এক বিরাট দরবারে স্থির হইল যে, উজীরের শিবিরের সরঞ্জামের সহিত বাদশাহের শিবিরের সরঞ্জামও আকবরাবাদের উপকণ্ঠ হইতে রাজধানীতে নীত হইবে; যুদ্ধ-প্রিয় ছোট ভাই হুসায়ন আলী খাঁ শিবির-জীবনে অভ্যস্ত কতিপয় আমীর সহ এক বিরাট বাহিনী লইয়া দাক্ষিণাত্যে অভিযানে বাহির হইবেন।

এই অভিযানের জন্য প্রস্তুতির কার্য চলিতে থাকাকালে গল্প-কথকদের প্রচারিত গুজবে সমস্ত তুরানী সম্পর্কে সন্দেহ এত বদ্ধমূল হইয়া পড়িল যে, মুহম্মদ আমীন খাঁর জীবন-মৃত্যু আবার তর্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার ভাগ্য সম্পর্কে তর্কবিতর্ক উঠিল; মতানৈক্য বাহিরে প্রকাশ পাওয়ায় সমগ্র শহরে তাহা সাধারণ আলোচ্যবিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অবস্থা এত গুরুতর

হইয়া দাঁড়াইল যে, প্রতি মুহূর্তে নিজ দেহের উপর আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি বর্ম পড়িয়া নিদ্রা যাইতেন এবং তাঁহার স্বার্থের প্রতি অনুরক্ত একদল তুরানী দ্বারা দিবারাত্র পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। অবশেষে যখন সর্বাপেক্ষা মারাত্মক রকমের নিদারুণ সঙ্কটের প্রত্যাশা করা হইতেছিল, তখন উভয় পক্ষে বিবাদভঞ্জন হইল। ছল ও বিশ্বাসঘাতকতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অকপটতার পবিত্র শপথউক্তিসহ্ পারস্পারিক প্রতিশ্রুতি এবং পবিত্র ও ভীষণ হলফ বিনিময় হইল। দুইদলের প্রত্যেকের বেলায় এই সকল প্রতিশ্রুতি কতদূর আন্তরিক ছিল, শীঘ্রই আমরা তাহা দেখিবার সুযোগ পাইব। ইতোমধ্যে আমরা দাক্ষিণাত্যে পরিকল্পিত অভিযানের বর্ণনা পুনরারম্ভ করিব।

বিজিত বাহিনী প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় যে অল্পসংখ্যক লোক বধ্যভূমি হইতে পালাইতে পারিল, তাহাদের সংখ্যা ২/৩ হাজারের বেশী হইবে না। যতদূর কল্পনা করা যায়, ততদূর দুরাবস্থার সহিত তাহারা ছুটিয়া গিয়া আলম আলী খাঁর সৈন্যবলে যোগদান করিল। এদিকে নিজামুল মুলক তাঁহার অবসর কালে তাঁহার কামান ও শিবিরের সরঞ্জাম মেরামত, গোলাবারুদ সংগ্রহ এবং তাঁহার যখমী সৈন্যদিগকে ঔষধ বিতরণ, নাগরিক-দের মনে সান্ত্বনা দান এবং নূতন সৈন্য সংগ্রহে ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে প্রত্যেকটা উপায়ে তিনি তাহাদের চিত্তজয় করিতে-ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কিরূপে আলম আলী খাঁর সৈন্য ও কর্মচারীদিগকে বিপথগামী করিবেন ও ভাগাইয়া আনিবেন, তাহাই ছিল তাঁহার প্রধান কার্য, অবশ্য গোপনে। ইহা বিশেষভাবে এজন্য যে, তিনি যখন অন্যের সৈন্যদের বিপথগামী করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিজেরও কিছু সৈন্য হারাইতেছিলেন। যে অকৃতজ্ঞ আনওয়ার খাঁ দুই ভাইয়ের নিকট তাঁহার সমস্ত কৃতজ্ঞতার কথা ভুলিয়া গিয়া নিজামুল মুলকের দলে যোগদান করেন, তিনি এখন আবার অন্য দিকে ভিড়িলেন; মনে হয় যেন একটা মাত্র বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার সুবিধা হয় নাই। তিনি আলম আলী খাঁকে লিখিলেন, "নিজামুল মুলক এত শক্তিশালী হন নাই যে, যথাসময়ে পরিশ্রম ও দ্রুত যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাকে ধ্বংস করা চলিবে না। তিনি যখন ঔষধ সংগ্রহ ও চাঁদা ধার্য করিতে তাঁহার সময় ব্যয় করিতেছেন, এই নিষ্ক্রিয়তা যে সুযোগদান করিতেছে, প্রতিভাশালী

লোকেরা তাহা তাহাদের হাত হইতে খসিয়া পড়িতে দিবেনা।'' এই পত্র ধরা পড়ায় তাহা শুধু লেখককে ঘৃণাভাজন ও তাঁহার সমুচিত দণ্ডবিধান ত্বরান্বিত করে। আলম আলী খাঁর এরূপ প্ররোচনার দরকার ছিল না; রমজানের প্রথমে তিনি ২৫ হাজার অশ্বারোহীর একটি বাহিনী লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন; তন্মধ্যে কুন্দু বিহারী ও শম্ভরাজ মনহরের অধীনে শাহ রাজার ১০/১২ হাজার মারাঠা সৈন্যও ছিল। কয়েক জন চরিত্রবান সেনা-নায়কও অনুরূপভাবে তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন; হুসায়ন আলী খাঁর পরিচালনায় তাঁহারা একাধিকবার তাঁহাদের শোনিতপাত করেন। ইহা স্মরণ রাখিয়া তাঁহারা তাঁহার স্বার্থ ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। অপর কয়েকজন কর্মচারী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিও তাঁহার সৈন্যদলে ছিলেন, কেহ ছিলেন অকপট আগ্রহে, কেহ বা ছিলেন সময়োচিত ব্যবহারকারী নীতিতে। এই সকল সৈন্য লইয়া আলম আলী খাঁ নিজেকে শত্রুর সমকক্ষ বলিয়া মনে করিলেন। কিছুটা কষ্টের সহিত তাঁহার সৈন্যদলকে খান্দেশ ও আওরঙ্গাবাদের মধ্যপথে অবস্থিত কঠিন ফরিদাপুর গিরিসঙ্কট অতিক্রম করাইয়া তিনি শেষোক্ত নগরের নিকট শিবির স্থাপন করিলেন; সেখানে তাঁহার মারাঠা অশ্বারোহীরা তাহাদের অভ্যস্ত নীতিতে সমগ্র প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িল ও সমস্ত গ্রাম লুণ্ঠন করিল। এই সকল লুণ্ঠনের দরুন নিজামুল মুলককে প্রথমে তাঁহার পরিবার ও ভারী বোঝাপত্র আসির দুর্গের অভ্যন্তরে পাঠাইয়া তৎপরে ময়দানে শত্রুর মুকাবিলা করিতে হইল। বুরহানপুর হইতে প্রায় ১৭ ক্রোশ দূর দিয়া পূর্ণ নদী প্রবাহিত হইতেছে। উহা তখন বৃষ্টিতে ফুলিয়া উঠায় অনেক বিলম্ব ঘটিতে পারিত; কিন্তু গউস খাঁ তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। দেশের অবস্থা জানা থাকায় এই সেনাপতি বামদিকে প্রায় ১৮ ক্রোশ উজান দিকের একটি স্থান দিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন; সেখানে একটা উত্তরণ স্থান ছিল বলিয়া তাঁহার জানা ছিল। সে দেশের জমিদারেরা ঝাঁড়ি-কাটা পথ দেখাইয়া দেওয়ায় তাঁহারা প্রত্যাশিত সময়ের পূর্বেই সেখানে পৌঁছিলেন। শত্রুপক্ষ তাঁহার নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়ার পূর্বেই নিজামুল মুলক পদব্রজে নদী পার হইয়া পূর্ণ গতিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে আলম আলী খাঁ সংবাদ পাইয়া তাঁহার শত্রুর

দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার মারাঠা অশ্বারোহীরা লুণ্ঠিতদ্রব্যের লোভে অগ্রেই সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিল এবং দেশে দ্রুত ধাবন করিয়া নিজামুল-মুলকের বাহিনীতে অভাব ও দুষ্প্রাপ্যতা ঘটাইল। বিশেষতঃ প্রত্যহ মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তা নষ্ট হইয়া গেল। মারাঠা অশ্বারোহীরাও চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে এত উত্যক্ত করিতে লাগিল যে, স্থানান্তর গমন কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। এক্ষেত্রেও গউস খাঁ তাঁহার অত্যন্ত উপকারে লাগিলেন। যে সকল মারাঠা সওয়ার নিজামুল মুলকের বাহিনীতে কাজ করিত, তাহাদের কয়েক হাজার সৈন্য লইয়া তিনি অন্যান্য লুণ্ঠনকারীর ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া অগ্রসর হইলেন; নিজামুল মুলক তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন; কিন্তু তাঁহাকে অবিশ্রান্ত খণ্ড যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে হইল। নিজের মনোমত যুদ্ধক্ষেত্র না পাওয়া পর্যন্ত বড় যুদ্ধ এড়াইয়া যাওয়া ছিল তাঁহার ইচ্ছা। অবশেষে বালাপুর শহরের নিকটে এরূপ স্থানের সন্ধান পাইয়া তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। উভয় বাহিনী পরস্পরের সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র আলম আলী খাঁ শত্রু পক্ষকে আক্রমণে প্রস্তুত হইলেন। সেদিন ৫ই শওয়াল। তাঁহার প্রথম সারি আনওয়ার খাঁ ও দক্ষিণে গফুর আলী খাঁর পরিচালনায় স্থাপিত হইল। খান আলমের ভ্রাতা আমিন খাঁ, মরহুম দায়ুদ খাঁ পনীর খুল্লতাত ভ্রাতা উমর খাঁ, শমসের খাঁ, আশরাফ খাঁ ও মুত্তেহী খাঁর দেওয়ান ফিদাই খাঁ দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি সৈন্যদল দ্বারা তিনি তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্বের সাহায্য করার ব্যবস্থা করিলেন। ঐ কর্মচারী ও তাঁহার ভ্রাতা মুহম্মদী বেগ সাহস ও সামরিক প্রতিভার জন্য বিখ্যাত দুইজন সম্মানী সেনানায়ক। তাঁহার বাম পার্শ্ব রেফায়েৎ তালেব খাঁ, খাজা রহমত খাঁ ও অপর কয়েক জন খ্যাত-নামা কর্মচারী পরিচালিত কয়েকটি সৈন্যদল দ্বারা গঠিত হইল; তাহাদের সঙ্গে তিনি সমস্ত মারাঠা অশ্বারোহী যোগ করিয়া ছিলেন; কিন্তু তাহাদের সারিগুলি মিশ্রিত না করার জন্য কঠোর আদেশ প্রদত্ত হইল। আলম আলী খাঁ কেন্দ্রে স্থান গ্রহণ করিলেন; গায়স খাঁকে তিনি তাঁহার হাতীপৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন। ১০/১২ বন্দুকধারী কর্ণাটি সৈন্যবেষ্টিত হইয়া তাঁহার গোলন্দাজ বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হইল; কতকগুলি রণহাতী তাহাদের

বাযাপুরের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ও দুই সাম্রিাদের সৈন্যদ্বয়ের প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট

সাহায্যে চলিল, সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কতকগুলি পর্বতের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। সেনাপতিকে তাঁহার যুদ্ধের ব্যূহ রচনা পরিদর্শনের পর তাঁহাকে সন্তুষ্টচিত্ত বলিয়া মনে হইল, তিনি প্রফুল্লবদনে অগ্রসর হইলেন। তিনি যে যুদ্ধে যাইতেছেন, তাহা চূড়ান্ত প্রমাণিত হওয়া সম্ভবপর দেখিয়া তিনি খুশী হইলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সেদেশে সম্পূর্ণ নবাগত, দেশের প্রকৃতির সহিত অপরিচিত ও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। দিলওয়ার আলী খাঁ তাঁহার মেজাজের উৎসাহের বশীভূত হইয়া দুঃসাহস সহকারে লুক্কায়িত শত্রুসৈন্যের ঘাঁটিতে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার জীবন ও সৈন্যদল দুইই বিনষ্ট হয়; অথচ আর একটু সামান্য পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করিলেই তিনি সময় মত ইহার সংবাদ পাইতে পারিতেন। আলম আলী খাঁকে ইহা অবগত করান সত্ত্বেও তিনি নিজেও অবিবেচনাপূর্বক একই ফাঁদে পড়িলেন এবং সেখানে অসাধারণ সাহস ও কার্যতৎপরতা প্রদর্শনের পর যৌবনের উৎকৃষ্ট অংশে তাঁহার মধুর জীবন কর্তিত হইয়া গেল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তিনি ছিলেন ভাগ্যের তাড়নার অধীন।

"কোন পরিকল্পনা বা কোন ফন্দী দ্বারাই ভাগ্যলিপি এড়ান যায় না।
সে পক্বকেশ বৃদ্ধই হউক, আর অনভিজ্ঞ যুবকই হউক।"

৬ই শাওয়াল ৩০/৪০ জন গজারূঢ় সেনানায়ক পরিবেষ্টিত হইয়া অন্ধ-নিরাপত্তার সহিত আলম আলী খান শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন; ইতিহাস সেই অন্ধ নিরাপত্তা গোপন বা মুছিয়া ফেলিতে পারে না।

নিজামুল মুল্‌ক তাঁহার তরফে তাঁহার প্রথম সারির সেনাপতিত্ব দিলেন সাহসী মরহামাৎ খাঁকে; তাঁহার পুত্র সায়ীদউদ্দীন খাঁর ভাগ্য পরীক্ষার্থে তাহাকে ঐ বিখ্যাত কর্মচারীর সহিত যুক্ত করা হইল। আবদুর রহীম খাঁ, রাইয়াৎ খাঁ, সাহদ্দীন খাঁ, দবর খাঁ, কমিয়র খাঁ, এনায়েৎ খাঁ স্ব স্ব সৈন্যদলে এবং কাদির দাদ খাঁ, ইহ্‌তিসান খাঁ, রুহুল্লাহ্ খাঁ, খিযির খাঁ, ও আনওয়ার খাঁ পরিচালিত সৈন্যদলগুলি তাঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে বিতরিত হইল। কয়েকজন রাজা পরিচালিত সমস্ত রাজপুত সৈন্য এবং সয়িদদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট যুদ্ধপ্রিয় কয়েকজন সেনানায়ক আনীত সৈন্যদেরও তিনি এই সমুদয় সৈন্যের সহিত যোগ করিয়া ছিলেন। তিনি নিজে কেন্দ্রে স্থান নিলেন এবং গউস খাঁকেও তাঁহার পার্শ্বে রাখিলেন। কতিপয় জমিদার

কর্তৃক আনীত সৈন্যগণ ও কয়েক হাজার মারাঠা অশ্বারোহীকে তিনি তাহাদের সেনাপতি রেনবাহের অধীনে তাঁহার শিবিরে রাখিয়া যাওয়াই উত্তম মনে করিলেন; শত্রুপক্ষের মারাঠা সওয়ারের হাত হইতে তাঁহার শিবির নিরাপদ রাখার জন্য তাহাদের প্রতি আদেশ রহিল। তাঁহার বহু সংখ্যক কামান ছিল; আসির ও বুরহানপুরের দুর্গ হইতে আনীত, বিশেষত তাঁহার বিগত বিজয়ের পরে প্রাপ্ত, আস্ত, কামানশ্রেণী দ্বারা এগুলির সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বর্ধিত হয়। এই সমুদয় তিনি তাঁহার সমুদয় শত্রুদের পূর্ণ দৃষ্টিসীমার মধ্যে স্থাপন করিলেন, কিন্তু অন্ধকার হওয়া মাত্রই ইহাদের অধিকাংশ তাঁহার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে পেরণ করিলেন; সেখানে একটি গুল্মময় ভূমি দ্বারা এগুলি শত্রুর দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রহিল, পরীক্ষিত সাহসী যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা কৌশলের সহিত এগুলি বিন্যস্ত করিল; এগুলি আংটা, রকেট, হাউইবাজি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত ছররা দ্বারা ভর্তি করিয়া তাঁহার বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী স্থাপন করা হইল। তাঁহার কাজ শেষ হইতে না হইতেই দেখা গেল, আলম আলী খাঁর সৈন্যেরা গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে। ১০/১২ হাজার অশ্বারোহী দ্বারা গঠিত বাহিনী দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হইল; মুনওয়ার খাঁর পরিচালনায় তাহারা শত্রুপক্ষের কামানের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু প্রথম গোলা নিক্ষেপেই বার বা দাক্ষিণাত্য হইতে আগত তাঁহার কতিপয় সর্বাপেক্ষা সাহসী লোকসহ তিনি নিহত হইলেন। এতদ্দর্শনে প্রধানতঃ মোগলদের দ্বারা গঠিত নিজামুল মুল্‌কের প্রথম সারি শত্রু ব্যূহ আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পূর্ণ বিশৃংখল করিয়া ফেলিল। ইহা অবগত হইয়া আলম আলী খাঁ কিছু নির্বাচিত সৈন্য লইয়া তাঁহার কেন্দ্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল, তাহা দূর করার জন্য দ্রুত ধাবিত হইলেন। তিনি ছিলেন প্রত্যেকটা আক্রমণেই অগ্রগণ্য; যেখানে যুদ্ধ জাঁকিয়া উঠিল সেখানেই তিনি শত্রুদিগকে পরাজিত ও তাহাদের ব্যূহ ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিলেন। এই সফলতায় উল্লসিত হইয়া তিনি উৎসাহভরে আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র সতর্কতাও অবলম্বন করিলেন না। শত্রুরা পিছনে হটিয়া চলিল, আলম আলী খাঁ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। যেই মারাত্মক স্থানে অসংখ্য কামান লুকাইয়া রাখা

হয় উভয় দলই তাহার নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। এই সমুদয় কামানের পরিচালন ভার দুই সায়্যিদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন একদল পরীক্ষিত লোকের হাতে ন্যস্ত ছিল। তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলে গুলি ভর্তি সকল কামান এবং ঐ সমুদয় আংটা ও হাউইবাজি যুগপৎ ছুটিয়া গিয়া কিয়ামতের দিনের নমুনা প্রকাশিত করিল। ধূম্রজালে সূর্যের আলো অন্ধকার হইয়া গেল এবং দিবস রজনীতে পরিণত হইল। একটু পরিষ্কার হইলে দেখা গেল, গফুর খাঁ, সামসের খাঁ, আশরফ খাঁ, খাজা রহমত খাঁ, ও মুত্তেহী খাঁ সহ পশ্চাদ্ভাগের সেনাপতি মুনওয়ার খাঁ এবং বিপুল সংখ্যক সর্বাপেক্ষা সাহসী সেনানায়ক ও সৈন্য নিহত হইয়াছেন বা রক্তাপ্লুত দেহে হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। অশ্বারোহীদের উৎকৃষ্ট ও বৃহত্তম অংশ বিধ্বস্ত বা অকর্মণ্য হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতেও আলম আলী খাঁ নিরুৎসাহ হইলেন না। আহত হইলেও তিনি রুখিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার চতুর্দিকে একদল প্রধান সৈন্য একত্র করিলেন। ইহাদের সকলেই ছিল যুদ্ধে অভ্যস্ত, সকলেই তাহার কার্যে নিজেদের রক্তপাতে প্রস্তুত এবং সকলেই অরণ্যে অজস্র সিংহের মুকাবিলা করিতে সমর্থ। ইহাদের লইয়া তিনি আগাইয়া চলিলেন। এমন সময় ইহ্‌তিসান খাঁ, বক্ষে সদ্য শরাহত এনায়েৎ খাঁ ও অজস্র সৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিল। তাঁহারা এই বীর যুবকের সাহসের সশ্রদ্ধ প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। এখানে এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হইল; ইহ্‌তিসান খাঁ আলম আলী খাঁর সহিত মুখোমুখি হইয়া এক আঘাতে তাঁহার এক বাহু কর্তন না করিলে ইহা শেষ হইত না। এই যখমের দরুন তিনি অক্ষম হইলে কয়েকজন সর্বাপেক্ষা সাহসী শত্রুসৈন্য তাঁহাকে পরাভূত করিল। ১৯ জন নামজাদা সেনানায়ক ও যে সাহসী সৈন্যদল তাঁহার সঙ্গে সমান তালে চলিয়াছিল, তাহাদের বৃহত্তম অংশসহ তিনি সেখানেই নিহত হইলেন। যুবক সায়্যিদ আনন্দের সহিত তাঁহার সমস্ত শোণিতপাত করিলেন। এবং বিজয়োজ্জ্বল বদনে তাঁহার পবিত্র ও সাহসী পূর্বপুরুষদের[৫৫] সহিত যোগদান করিতে গমন করিলেন। মারাঠা সেনাপতি মোস্করজী স্বজাতির একদল সর্বাপেক্ষা সাহসী সৈন্য লইয়া আলম আলী খাঁর পরেই

সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া আলম আলী খাঁ নিহত

আসিতেছিলেন; তিনি আহত হইয়া তাঁহার সাহসী সৈন্যগণসহ বন্দী হইলেন।

প্রত্যেকেই যখন এরূপ হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য লইয়া ব্যস্ত, তখন মরহুম দায়ুদ খাঁ পনীর ভ্রাতা ওমর খাঁ ও খান আলমের ভ্রাতা আমীন খাঁ ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া ৩/৪টা হাতী ও ৩/৪ লক্ষ টাকা দখল করিয়া তাঁহাদের বিবেচনায় নিজের সম্মান ও চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শঠতা-পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন; নিজেদেরই ন্যায় একদল বিশ্বাসঘাতক সৈন্য সহ তাঁহারা ঘুরপাক খাইয়া নিজামুল মুলকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে গমন করিলেন; অথচ এই দুইজন সেনানায়ক তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আলম আলী খাঁর অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ঐ সেনাপতি শত্রুর কামান, সামরিক তহবিল, শিবিরের সরঞ্জাম ও যুদ্ধে নিহত সেনা-নায়কদের সমস্ত দ্রব্য বা অন্ততঃ ব্যাপক লুণ্ঠনের হাত এড়াইয়া যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহা নিজের ব্যবহারার্থে ধৃত করার আদেশ দিলেন। প্রথম যুদ্ধের ন্যায় এই দ্বিতীয় যুদ্ধেও বিজেতার সৈন্যদের ক্ষতি এত কম হইল যে, তাঁহাদের মধ্যে একজন নামজাদা সেনাপতিও নিহত হন নাই। তাঁহার কোন আহত ছিল না বলিলেই হয়। যে কয়জন নাগরিক ও কর্মচারী আহত হন, তাহারা অচিরে তাঁহার সদাশয়তার প্রলেপ এবং তাঁহার প্রশংসা ও অনুগ্রহের মলম দ্বারা নিরাময় হন।

এই সর্বনাশের সংবাদ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট আনীত হইলে তাহাদের যে দুর্দশা হয়, তাহা বর্ণনা করা কঠিন। বিশেষতঃ এরূপ ভাগ্য বিপর্যয় গভীর-ভাবে উপলব্ধি করিয়া দুঃখে ও অস্থিরতায় ছোট ভাই ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতে লাগিলেন। যখনই তাহার মনে হইত যে, তাঁহার স্ত্রী ও পরিবার তখনও দাক্ষিণাত্যে, তখন তিনি মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতেন।

দওলতাবাদের শাসনকর্তার সদাশয় আচরণ

তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকদিন পরেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, দুই সায়্যিদের নিকট দুর্ব্যবহার পাইলেও এবং তাঁহাদের কার্যাবলীতে অসন্তুষ্ট হইলেও দওলতা-বাদের ৩৬ শাসনকর্তা নিজামুল মুল্‌কের আওরঙ্গবাদের নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই সদাশয়তা দেখাইয়া সেই অসহায় পরিবারকে

তাঁহাদের সমস্ত আশ্রিত লোক ও মালপত্রসহ ঐ দৃঢ় দুর্গের অভ্যন্তরে গ্রহণ করেন। এই শাসনকর্তার চরিত্রের বিরল বৈশিষ্ট্য এই যে, যাহার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য ও যথাসাধ্য সর্বপ্রকার সুবিধা প্রদান করিতেছিলেন, সেই ব্যক্তির সঙ্গে বাস্তবিকই তাঁহার অসদ্ভাব ছিল। এক কথায়, একটি সর্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক মুহূর্তে তিনি দুই সায়্যিদের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকার সাধন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

"অন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায় করা সময় সময় খুবই সহজ কাজ ;
যদি মানুষ হও, তবে অন্যায়ের পরিবর্তে উপকার কর।"

এরূপ সান্ত্বনাদায়ক সংবাদ শ্রবণে হুসায়ন আলী খাঁ তাঁহার স্বাভাবিক দৃঢ়তা ফিরিয়া পাইলেন, তাঁহার মনও শান্ত হইল ; তবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসনকর্তা মুবারুজ খাঁ ও তাঁহার ভগিনীপতি দিলওয়ার আলী উভয়েই ৭/৮ হাজার অশ্বারোহী-সহ নিজামুল মুল্‌কের দলে যোগদান করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যহ অধিকতর গুরুতর সংবাদ আসিতে থাকায় ভ্রাতৃদ্বয় এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ একত্রে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক পরীক্ষা ও তর্কবিতর্কের পর অবশেষে স্থির হইল যে, আবদুল্লাহ্ খাঁ তাঁহার পদাধিকার বলে বাদশাহের সহকারী বলিয়া অধিবাসীদিগকে ভয়াভিভূত ও শান্ত রাখার জন্য রাজধানীতে গমন করিবেন এবং হুসায়ন আলী খাঁ এক বিরাট বাহিনী লইয়া বাদশাহ্সহ দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিবেন। এই সিদ্ধান্ত কয়েকবার পরীক্ষা ও বহাল করার পর সুবাদার তাঁহার সৈন্যদল ও গোলন্দাজ বাহিনীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি করার জন্য সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সায়্যিদ মুহম্মদ খাঁকে অর্থ ও সুলিখিত পত্রসহ বারের সাহসী অধিবাসীবৃন্দ এবং তাহাদের নিকট হইতে ও দূরে বসবাস করিয়া আফগানদের নিকট প্রেরণ করিলেন। আফগানদের সর্বাপেক্ষা সাহসী সেনানায়কেরা তাঁহার চাকরী গ্রহণার্থে নিমন্ত্রিত হইলেন। ইহাতে এত সাড়া মিলিল যে, অত্যল্পসময়ের মধ্যেই তাহার পতাকা তলে ৫০,০০০ অশ্বারোহী সমবেত হইল : তদুপরি ছিল বাদশাহের দেহরক্ষী দল ও তাঁহাদের রাজপুত সহ

কতিপয় রাজা। অসংখ্য বিখ্যাত ব্যক্তি এরূপ সেনাপতির অধীনে খ্যাতিলাভের আশায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহার গোলান্দাজ বাহিনী এত বড় বড় কামান লইয়া গঠিত হয় যে, সেগুলি পৃথিবীকে উহার ভিত্তিমূল পর্যন্ত প্রকম্পিত করাইবার জন্য অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হইল। এগুলির চালনা ভার ছিল তাঁহার নিজের দ্বারা গঠিত অজস্র বন্দুকচির উপর; তাহাদের অব্যর্থ গুলী ভাগ্য প্রেরিত এতগুলি জরুরী সংবাদ বলিয়া বোধ হইত। শওয়ালের শেষভাগের কাছাকাছি সময় এই সমস্ত সৈন্য পরিদর্শন করার পর হুসায়ন আলী খাঁ দাক্ষিণাত্যের রাজপথে তাঁহার সরঞ্জাম প্রেরণ করিয়া একই দিনে বাদশাহ্ সমভিব্যবহারে আকবরাবাদ হইতে দুই ক্রোশ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যনির্দিষ্ট অন্তিম মুহূর্ত নিকটবর্তী বলিয়া তিনি কয়েকটি অসঙ্গত কার্যের জন্য অপরাধী হন; এগুলি অদৃষ্টের ফের ভিন্ন আর কিছুর প্রতি অরোপ করা চলেনা। গোলন্দাজ বাহিনীর মীর অতিশের পদ ছিল একটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চাকরী। বাদশাহের গৃহস্থালি, পরিবার, এমনকি দেহের ব্যবস্থা পর্যন্ত বরাবর ইহার হাতে থাকিত। তিনি সায়্যিদ খাঁ জেহানের হাত হইতে এই পদ কাড়িয়া নিয়া হায়দার খাঁকে প্রদান করেন। ঐ শিবিরে আরও কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তী জিলকদ মাসের ৯ই তারিখে বাদশাহ্ আকবরাবাদের বাদশাহী নিবাস ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্যের রাস্তায়[৭] তিন ক্রোশ দূরে একটি স্থানে আগাইয়া গিয়া উহাকে তাহার উপস্থিতি দ্বারা গৌরবান্বিত করিলেন। উজীর আবদুল্লাহ্ খাঁ তাঁহার সহগমন করেন—রাজধানী অভিমুখে যাত্রারম্ভ করার উদ্দেশ্যে তিনি শুধু বিদায় গ্রহণের জন্য উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাদশাহের রাজ্যাভিষেক বার্ষিকী নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল; ইহা ১৫ই তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা; তিনি এতদুপলক্ষে চিরাচরিত অনুষ্ঠান ও আনন্দোৎসবে সাহায্য করিয়া তবেই যাত্রারম্ভ করিতে চাহেন[৮]। হুসায়ন আলী খাঁ এত অধিক বিলম্বে আপত্তি করিয়া উজীরকে আরও আগে বিদায় দেওয়ার জন্য বাদশাহকে চাপিয়া ধরিলেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং বাদশাহের সহিত শিবির ভাঙ্গিয়া ১৪ই

অনেক আলোচনার পর হুসায়ন আলী খাঁর দাক্ষিণাত্য যাত্রা

তারিখে আর একটা পূর্ণ মঞ্জিল অগ্রসর হইয়া ফতেহ্পুরে থামিলেন। বাদশাহের রাজ্যাভিষেক আনন্দোৎসবের জন্য তিনি এখানে ৩/৪ দিন অপেক্ষা করিলেন। এগুলি শেষ হইলে কেবল দীর্ঘ মঞ্জিলে দাক্ষিণাত্যে যাত্রার চিন্তাই তাঁহার মনে স্থান পাইল। কিন্তু তাহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ খাঁ নিজামুল মুলকের খুল্লতাত হামিদুল্লাহ্ খাঁ, হাম্মিদ উদ্দীন খাঁ গাযীউদ্দীন খাঁ, গালেব খাঁ, নিয়ামতুল্লাহ্ খাঁ, ইব্রাহীম খাঁ, মীর খাঁ এবং সৈয়দ সালাইয়াত খাঁ প্রভৃতি পক্ষপাতহীন কয়েকজন আমীর ও অন্যান বহু লোকসহ সেখানে আরও ২/৩ দিন অপেক্ষা করিলেন; ইহার কারণ কেহ অনুমান করিতে পারিল না। এই অপেক্ষার পরে তিনি রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। রাস্তায় মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাস নামক জনৈক আফগানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। স্বজাতীয় সৈন্যদল লইয়া ইনি হুসায়ন আলী খাঁর অনুসরণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার নিকট হইতে কয়েক লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু টাকার টান পড়িয়াছে বলিয়া বাহানা করিয়া ইনি উজীরের নিকট হইতে আরও ৫০,০০০ টাকা আদায় করিলেন। উজীর তাঁহার রাজধানীর দিকে আগাইয়া চলিলেন আর তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন দাক্ষিণাত্য যাত্রায় ব্যস্ত।

উজীর অগ্রসর হইতে হইতে রাজধানী হইতে দুইটি ক্ষুদ্র মঞ্জিল দূরে থাকিতে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নূরুদ্দীন আলী খাঁ ও ভ্রাতুষ্পুত্র গয়রাৎ খাঁ সহ তাঁহার ভ্রাতা হুসায়ন আলী খাঁ নিহত হইয়াছেন। প্রথম হাঙ্গামার সময় রতন চাঁদ একজন উষ্ট্রারোহী সংবাদদাতা মারফতে তাড়তাড়ি একখানা চিরকুট প্রেরণ করেন; তাহাতে এই সংবাদ লিখিত ছিল। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ এই ঃ

বাদশাহ্ নিজরাজ্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন ছিলেন বলিয়া তাঁহার অবস্থা নিজামুল মুল্ক, মুহাম্মদ আমীন খাঁ এবং আওরঙ্গযীবের পুরাতন দরবারের আরও কতিপয় শরীফ ও আমীরের বুকে ছোরার ন্যায় বিঁধিতেছিল; তাহারা ভ্রাতৃদ্বয়ের বিপুল ক্ষমতা দর্শনে বিরক্তিবোধ করিতেছিলেন; এই ক্ষমতা ছিল বাদশাহী পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর; এবং সায়্যিদদের দলের প্রত্যেকটা লোক তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত। কাজেই এই অসীম

ক্ষমতা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করার বিভিন্ন উপায় তাঁহাদের মনে অবিরত ঘুরপাক খাইতে লাগিল। কড়া নজর রাখিলেও মুহম্মদ আমীন খাঁ কোন প্রকারে তুর্কী ভাষায় বাদশাহকে অল্প কয়েকটা কথা বলার সুযোগ প্রাপ্ত হন। উদ্দেশ্য তাঁহার সম্মতিলাভ ও তাঁহাকে সতর্ক করা। এই সম্মতি নিজামুল মুল্‌কের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে ও ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে সমগ্র দাক্ষিণাত্য কাড়িয়া লইতে প্ররোচিত হন। দরবারে এই সকল ষড়যন্ত্র এবং রণক্ষেত্রে ঐ সেনাপতির উদ্যমই দিলওয়ার আলী খাঁ ও আলম আলী খাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। অবশ্য ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, মোটের উপর সব কিছুই ঘটে এক অপরিহার্য ভাগ্যের প্রত্যক্ষ তাড়নায়। মুহাম্মদ আমীন খাঁ দেখিতে পান যে, সুবাদার তাঁহার মিত্র নিজামুল মুল্‌কের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর, অথচ শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার শত্রুর সমকক্ষ নহে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়; কাজেই তাঁহার পতনের পরে তাঁহার নিজের ও সমস্ত তুরানীর পতন অবধারিত। এই ধারণার বশে তিনি দিবারাত্র তাঁহার মিত্রদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ হুসায়ন আলী খাঁর উপর আপতিত হইয়া তাঁহাকে খতম করিয়া দেওয়ার সুযোগের সন্ধানে রহিলেন। কোন শক্তিশালী দল তাঁহাদিগকে দৃঢ় সমর্থনের নিশ্চয়তা না দিলে তাঁহারা এরূপ প্রচণ্ড সঙ্কল্প করিবেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। প্রত্যহ তাঁহারা দল বৃদ্ধি করিতেছিলেন। প্রথমে তাঁহারা যে লোকটিকে দলভুক্ত করা স্থির করেন, তাঁহার নাম সয়্যিদ মুহম্মদ আমীন; সাদৎ খাঁ নামেই তিনি সমধিক সুপরিচিত; তিনি ছিলেন ইরানী; খোরাসানের নিশাপুরে তাঁহার জন্ম। ওয়ালাশাহী নামক বন্দুকধারী প্রহরী দলের কর্নেল বা হাজারী হিসাবে জগতে এই লোকটার প্রথম উত্থান। ইহা ঘটে ফর্‌রুখ সিয়ারের আমলে। কিছুকাল পরে তিনি হিন্দন বিয়ানার ফৌজদারের পদে উন্নীত হন; ইহা আকবরাবাদ প্রদেশের একটা প্রধান ও সর্বাপেক্ষা অবাধ্য জিলা। এখানেই তিনি প্রথম তাঁহার সাহস ও যোগ্যতার নমুনা দেখান। উজীর আবদুল্লার নিকট হইতে প্রাপ্ত কয়েকজন সৈন্যের সহিত নিজের আরও কয়েকজন সৈন্য একত্র করিয়া তিনি সেই সমগ্র জনপদে শৃঙ্খলা ও প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হন। এই কৃতিত্বের দরুন তাঁহার মনসব ৫০০

সওয়ার দ্বারা বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং এখন হইতে তিনি একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ও সুযোগ্য সেনাপতি বলিয়া দরবারে পরিচিত হন। এই সময় তিনি নিজের কোন মতলবে শিবিরে আসেন। তাঁহার দৃষ্টি হইতে মুহাম্মদ আমীন খাঁ বুঝিতে পারেন যে, এই লোকটাই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ঠিক উপযোগী। তজ্জন্য তিনি ধীরে ধীরে এত কৌশলে তাঁহার মন জুড়িয়া বসিলেন যে, এখন হইতে তিনি হইলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচর ও তাঁহার যাবতীয় গোপন বিষয়ের ভাণ্ডার। উভয়েই মোগল[৩৯] বলিয়া তাঁহাদের এই মিলামিশার খুব সুবিধা হওয়ায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ঠিক উপযোগী একজন তৃতীয় মোগলের উপর তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয়। ইনি ছিলেন মীর হায়দার খাঁ, তুরানের অন্তর্গত কাশগড়ের একজন চুঘতায়ী কালমুক।[৪০] তাঁহার পরিবার এত কাল ধরিয়া সেই উত্তর মুল্লুকের রাজার মীর শামসের বা তরবারি বাহকের পদ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা মীর বা মীরানী উপাধি গ্রহণ করেন মীর হায়দার ছিলেন একজন নির্ভিক সাহসী প্রকৃতির লোক। কোন বিপদকেই তিনি পরওয়া করিতেন না। কাজেই মিত্রদ্বয় কথাটা তাঁহার কানে তুলিলে তিনি কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে নহে, ধর্মনৈতিক উৎসাহের বশেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। কারণ, সুবাদার ছিলেন একজন উৎসাহী শিয়া। অপরপক্ষে তিনি ছিলেন তেমনি একজন উৎসাহী সুন্নী। তিনি এমনকি স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এরূপ হঠকারী প্রচেষ্টার কথা কখনও কাহারও মাথায় ঢুকিত না। এই তিনজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি চরিত্র-সাদৃশ্য ও মতৈক্যের নিবিড়তায় একত্র সংলগ্ন ছিলেন বলিয়া কে প্রথম আঘাত করিবে ও কি ভাবে করিবে, নিজেদের মধ্যে তাহা আলোচনা করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কুরআনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহা মীর হায়দারের ভাগে পড়িল। লোকটা ছিল কি ইহকালে, কি পরকালে বাঁচিবার অযোগ্য। তাঁহার নিজের মৃত্যু যে কত নিকটবর্তী, সে বিষয় কোনই সন্দেহ না করিয়া সে মুহম্মদ আমীন খাঁর বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগপূর্ণ একখানা দরখাস্ত লিখিল। তাহা পেশ করিবার জন্য সে তাঁহারই ন্যায় বলবান ও সাহসী তাহার এক স্বদেশী বিশিষ্ট বন্ধুকে সহকর্মী মনোনীত করিল। সেদিন ১১৩২ হিজরীর ৬ই জিলহজ মঙ্গলবার। সৈন্যদল আকবরাবাদের ৫০

ক্রোশ দক্ষিণে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। বাদশাহ তাঁহার মহলে গমনের জন্য সবেমাত্র (হাতী হইতে) অবতরণ করিতেছিলেন। মুহম্মদ আমীন খাঁ এই সুযোগে তুর্কি ভাষায় কয়েকটি কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রস্তুত ও সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়া কুর্নিশ করার পর অন্যতম প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হায়দার আলী খাঁর আবাসে গমন করিলেন। তিনি যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, সুবাদার তখন আগাইয়া আসিয়া বেগম মহলের বেষ্টনীর প্রথম দ্বার পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন তাঁহাকে যেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি নিজ মহলের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত বলিয়া উহার দুরত্ব এক ক্রোশের কম হইত না। তিনি যখন গোলাল পাড়া নামে অভিহিত বাদশাহী বেষ্টনীর নির্গমন পথের নিকটবর্তী হইতেছিলেন, তখন মীর হায়দার তাঁহার দরখাস্ত খানা যথাসাধ্য উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিল। নিজেকে দেখাইবার ও কুর্নিশ করার জন্য ইতোমধ্যে সে একটি উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল; কিন্তু চোপদার ও ক্রীতদাস প্রহরীরা তাহাকে নিকটে আসিতে নিষেধ করায় ভাগ্যের অনিবার্য পরিণতিতে সুবাদারের মনে তাহাকে সঙ্কেতে আহ্বানের ইচ্ছা হইল। তিনি তাহাকে নিকটে আসিতে দেওয়ার জন্য তাঁহার লোকজনকে আদেশ করিলেন। মীর হায়দার এই অসাধারণ শিষ্টাচারকে শুভ সূচনা মনে করিয়া নিকটে আসিয়া তাহার দরখাস্ত পেশ করিল। সুবাদারের পাল্কী চলার সময় সে এক হাতে উহার পায়া ধরিয়া চলিল (ঐ সমুদয় উপলক্ষে ইহাই রেওয়াজ) আর এক হাতে সে তাহার অভিযোগের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল। কিন্তু যেই মুহূর্তে সে দেখিল, সুবাদার দরখাস্তের বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন; অমনি সে তাহার ছোরা বাহির করিয়া সেই সাহসী নির্দোষ সায়্যিদকে এমন ভীষণ খোঁচা মারিল যে, তিনি পাল্কীর উল্টাদিকে পড়িয়া গেলেন। সেখানে আর্তনাদ না করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল; মুহূর্ত মধ্যে তিনি শাহাদাৎ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এমন কি বিপরীত দিকে পড়ার সময়ও তিনি তাঁহার ঘাতকের বুকে এত জোরে এক লাথি মারিলেন যে, পাল্কী উল্টিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার দেহও স্পন্দনহীন অবস্থায় ভূমিসাৎ হইল। নূরুল্লাহ খাঁ নামে সুবাদারের জনৈক আত্মীয়ও

হুসায়ন আলী খাঁর গুপ্তহত্যা

অনুরূপভাবে পাল্কী ধরিয়া গমন করিতেছিলেন। আঘাত দেখিয়া তিনি তলোয়ার বাহির করিয়া ঘাতককে কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। তিনি নিজেও মোগল বা দ্বিতীয় সহযোগী কর্তৃক নিহত হইলেন। মীর মুশরফ আবার ইহার টুটি ধরিয়া ইহাকে হত্যা করিল। হাতাহাতির মধ্যে গুরুতররূপে আহত হইলেও তিনি কোন রূপে জান লইয়া পালাইয়া গেলেন। সে মুহূর্ত হইতে পাল্কীর চতুপার্শ্বে এলোমেলো হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। কিন্তু একজনের পর একজন করিয়া বহু সংখ্যক মোগল সেখানে উপস্থিত হওয়ায় স্থানটি পরিষ্কার হইয়া গেল। হুসায়ন আলী খাঁ ও নূরুল্লাহ্ খাঁর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাদশাহের মহলে নীত হইল। এই দৃশ্য সুবাদারের হারেমের তত্ত্বাবধায়ক খোজা মকবুলের মনে এত গভীর দাগ কাটিল যে, নৈরাশ্যের মধ্য হইতেও সাহস সঞ্চয় করিয়া তিনি তরবারি বাহির করিয়া প্রবল উদ্যমে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা তাঁহাকে কয়েক স্থানে জখম করিল; তৎফলে ৩।৪ দিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। হুসায়ন আলী খাঁর দেহ ঘিরিয়া যখন এত অধিক মহান রক্তপাত হইতেছিল, তখন তাঁহার প্রধান ভিস্তিওয়ালা ও প্রধান ঝাড়ুদার তাহাদের তরবারি ও ঢাল লইয়া সর্বশক্তি সহকারে বাদশাহী তাঁবুশ্রেণীর খুঁটির বেড়ার দিকে ধাবিত হইলেন এবং দুঃসাহসের সহিত দেহরক্ষীদের মধ্যে আপতিত হইয়া পথ কাটিয়া বাদশাহের দিকে তুজবিগ খানা নামে অভিহিত স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হইল; সেখানে তাঁহারা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। অন্যান্যের মতে, সাদাৎ খাঁ নিজ দেহ দ্বারা তাহাদের পথরোধ করেন ও তাহাদিগকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলেন। নিহত সুবাদারের দেওয়ান মোহ্‌কাম সিংহের প্রতি অনুরক্ত একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক প্রথম হাঙ্গামার সময়ই উন্মুক্ত তরবারি হাতে গোলাল পাড়া পর্যন্ত ছুটিয়া যায়। তাহাদের অনেকে গোলাল পাড়ার ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া প্রধান দরবার—তাঁবু পর্যন্ত অগ্রসর হয়। বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অনেকে আহত হইলেও তাহাদের মনিব আরোগ্য লাভ করিবেন না শুনিয়া তাহারা পুনরায় পথ কাটিয়া ফিরিয়া গেল। হুসায়ন আলী খাঁর বন্দুকধারীরা পূর্বেই গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু শীঘ্রই তাহাদিগকে থামাইয়া দেওয়া হয় অথবা সব শেষ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহারা স্বেচ্ছায় ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

তাঁহার দেহ ঘিরিয়া ভীষণ যুদ্ধ

হুসায়ন আলী খাঁর মৃত্যু-সংবাদ সরাসরি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র খয়রাত খাঁর নিকট নীত হইল ; তিনি তখন শিবিরে আহার করিতেছিলেন। সেই সাহসী যুবক তাঁহার সৈন্যদের না ডাকিয়া বা তাঁহার কামান না আনাইয়া এমনকি তাঁহার বন্ধুদের তাঁহার চতুর্দিকে জড় হওয়ার সময় না দিয়া, তাহাদের সংবাদ না পাঠাইয়া তাহাদের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ খানা ছাড়িয়া উঠিয়া একখানা রুমাল[১২] দ্বারা হাতমুখ মুছিয়া তাঁহার হস্তীতে চড়িয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেই বাদশাহ ও তাঁহার চাচার সমস্ত হত্যাকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। পথে একে একে প্রায় ৩০০০ সওয়ার ও পদাতিক তাঁহার সহিত যোগদান করিল। তাহাদিগকে লইয়া তিনি এত প্রচণ্ডবেগে শত্রুপক্ষের দিকে ধাবিত হইলেন যে, কেবল বিদ্যুতের দ্রুতগতি বা ঝড়ের প্রচণ্ডতার সঙ্গেই তাহার তুলনা করা চলিতে পারে। তিনি যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন সাদৎ খাঁ, মুহম্মদ আমীন খাঁ ও হায়দর কুলী খাঁ বাদশাহের বিপদ বুঝিতে পারিয়া নির্ভীকভাবে একদল শত্রুর মধ্যে ছুটিয়া গেলেন। তাহারা বেগম মহলের বেষ্টনী পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া সেখানে ভিড় জমাইয়া প্রবেশপথ পর্যন্ত বন্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। নিছক দৈহিক শক্তি ও প্রবল হত্যাকাণ্ডের জোরে তাঁহারা পথ পরিষ্কার করিয়া বাদশাহকে ডাকিয়া দর্শন দান করিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার গায়ে গা মিশাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন ; একদল রমণীও তাঁহার দেহ ধরিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। সাদৎ খাঁ সময়ের গুরুত্ব অনুধাবণ করিয়া ও শিষ্টাচারের নীতি প্রতিপালন তখন সঙ্গত নহে ভাবিয়া সাহসের সহিত দরজার ভিতরে ছুটিয়া গেলেন এবং যে সকল বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁহার স্বার্থে তাহাদের রক্ত দানে প্রস্তুত, তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণার্থ অনুরোধ করিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। নিছক দৈহিক শক্তির বলে তাঁহাকে মহিলাদের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া তিনি তাঁহাকে বাহিরে মুহম্মদ আমীন খাঁর নিকট লইয়া আসিলেন। মুহম্মদ আমীন খাঁ তাঁহাকে তাঁহার হস্তীর পৃষ্ঠে বসাইয়া তাঁহার দেহরক্ষার জন্য স্বয়ং তাঁহার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিলেন। বাদশাহের দেহ-রক্ষীদল ও অপর কয়েকটা সৈন্যদলের প্রত্যহ প্রভাতে বাদশাহী মহলের

বেষ্টনীর দ্বারে সমবেত হওয়া ছিল প্রচলিত প্রথা; সেদিন তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সেখানে গমন করে। পক্ষান্তরে কিছু মোগল সৈন্য তাড়াতাড়ি সাদৎ খাঁর নিকট গমন ও আর কিছু সৈন্য পৃথক পৃথক দলে মুহম্মদ আমীন খাঁর সহিত যোগদান করিতেছিল। একটা সম্মানজনক সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ বাদশাহকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হায়দর কুলী খাঁ কার্যতৎপরতা না দেখাইলে তখনও তাঁহার বিপদ গুরুতর থাকিত। এরূপ সঙ্কটজনক অবস্থা নিকটবর্তী বুঝিতে পারিয়া তিনি প্রত্যহ গোলন্দাজ বাহিনীকে কুচকাওয়াজ করাইতেন; ইত্যবসরে তাহার সদাশয়তাবলে তিনি তাঁহাদের চিত্ত জয় করিতেছিলেন। হাঙ্গামার প্রথম সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি বাদশাহের মহলে গমন করিলেন। খয়রাত খাঁ যখন একদিকে একদল বিশৃঙ্খল লোকসহ অগ্রসর হইতেছিলেন, তিনি তখন অপরদিকে শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ধীর পদবিক্ষেপে গমন করিতেছিলেন। ইহাদের দ্বারা তিনি বাদশাহের দেহ বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নিজ বেষ্টনীর বাহিরে তিনি কামান ও রণহস্তী দ্বারা আর একটা বেষ্টনী গঠন করিলেন। ইহা শেষ হইলে তিনি নিজস্ব একদল অশ্বারোহীর নিকট গমন করিয়া স্বয়ং সর্বাগ্রে থাকিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। তখন চরম মুহূর্ত। ইতঃপূর্বেই কিয়ামতের দিনের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

বাদশাহের পক্ষ ও সুবাদারের দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

খয়রাত খাঁ ক্ষুধার্ত সিংহ বা উপবাসক্লিষ্ট ব্যাঘ্রের ন্যায় সমস্ত প্রচণ্ডতা লইয়া আগমন করেন; কাজেই তিনি অগ্নির উপরে ধূপধুনার ন্যায় অধৈর্যের অনলে পুড়িতেছিলেন। আগ্রহের দরুন তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় পান নাই। তাঁহার সমস্ত আগ্রহ যে তাঁহাকে শুধু পরলোকের অতলস্পর্শ গর্তে নিক্ষেপ করিবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না বলিলেই হয়। তিনি নিজের জীবন ইস্তেফা দেন; শুধু তাঁহার চাচার হত্যার প্রতিশোধ লইতে ও বাদশাহের বা মুহম্মদ আমীন খাঁ ও হায়দর কুলী খাঁর দেহ খতম করিতে পারিলে তিনি প্রাণত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন। দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত এই সেনাপতির কামান ও বন্দুকরাজি ইতঃপূর্বেই স্থিরভাবে গুলী নিক্ষেপ করিতেছিল। গুলীগুলি শিলাবৃষ্টির ন্যায় পুরু হইয়া পড়িতে-

ছিল। দুইটি বিরুদ্ধ দল এত প্রচণ্ডতার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল যে, মরণোন্মুখ লোকের আর্তনাদ এবং আহতের চীৎকার ভিন্ন আর কিছুই শুনা যাইত না। এই সময়ের মধ্যে বাদশাহের দলের আমীরেরা সমস্ত স্থান হইতে তাঁহার দেহের চতুর্দিকে সমবেত হইতেছিলেন। খয়রাত খাঁর সৈন্যেরাও অনুরূপভাবে তাহাদের প্রভুর সাহায্যার্থে ছুটিয়া যাইতেছিল। দুই দলই এখন পূর্ণ বাহিনীর আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। তাহারা ইতঃপূর্বেই হাতাহাতি ও লাগালাগি হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই খয়রাত খাঁ হায়দর কুলী খাঁর অত্যন্ত নিকটে আসিয়া তাঁহাকে এক তীর মারিলেন; উহা এত জোরে শেষোক্ত ব্যক্তির ধনুকে প্রবেশ করিল যে, পরে উহা টানিয়া বাহির করিতে অত্যধিক বল প্রয়োগের দরকার হয়। সাদৎ খাঁ ও কমরুদ্দীন খাঁ ইহা দেখিতে পাইবামাত্র তাহার সাহায্যে ছুটিয়া আসিলেন; তাঁহারা যে সকল সাহসিক কার্য সম্পন্ন করিলেন, তাহা বাদশাহের প্রতি তাঁহাদের অনুরক্তিরই উপযুক্ত। এই শাহজাদা নিজেও অবিশ্রান্ত ধনুক পূর্ণ করিয়া চতুর্দিকে তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। উভয় পক্ষ যখন পরস্পরের ধ্বংসসাধনে সম্পূর্ণ ব্যগ্র, তখন দুই দলের চোর, জুয়াচোরেরা হুসায়ন আলী খাঁর বাসায় আপতিত হইল এবং তাহাতে ও তাঁহার সায়্যিদ দলের সমস্ত তাঁবুতে আগুন লাগাইয়া দিল। ভৃত্যেরা যখন আগুন নিভাইতে ব্যস্ত, তাহারা তখন সুবাদারের তাঁবুগুলি হইতে কয়েক কোটী টাকা মূল্যের অর্থ ও মণি-মানিক্য লুণ্ঠন করিল। এমন সময় খান দুরান বাদশাহের সাহায্যে আসিলেন। যুদ্ধ তখন একদিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে মনে হইতেছিল। খয়রাত খাঁ পূর্বেই দুইটা আঘাত পাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তিনি আর একটা আঘাত পাইলেন। হায়দর কুলী খাঁর পশ্চাতে উপবিষ্ট জনৈক হাবশীর গুলীতে তিনি নিহত হইলেন। একটি বারও আর্তনাদ না করিয়া যুবক সায়্যিদ তাঁহার গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষ, ধার্মিকদের রাজা আল্লামা আলীর (রাঃ) সন্নিধানে উপবেশন ও তাঁহার পরিচর্যা করিতে গমন করিলেন। এতক্ষণ ধরিয়া সুবাদারের মালপত্র ধীরে ধীরে লুণ্ঠিত হইতেছিল; বাদশাহের ব্যবহারার্থ রক্ষা করার জন্য ইহার অতি সামান্য মাত্রই অবশিষ্ট রহিল।

এখন জয়লাভ ঘটিলে হায়দর কুলী খাঁ হুসায়ন আলী খাঁর দেওয়ান মোহকাম সিংহকে সংবাদ পাঠাইলেন: 'বাদশাহ্‌ আপনার ধনপ্রাণ রক্ষার আদেশ দিয়াছেন; কাজেই আমার উপদেশ আপনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করুন।' তিনি আসিয়া কুর্নিশ করিলে বাদশাহ তাঁহার অতীত আচরণের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করিয়া তাঁহার মনসব ছয় হাজার সওয়ারে বাড়াইয়া দিলেন। রতন চাঁদের নিকটেও সংবাদ প্রেরিত হইল। কিন্তু তিনি কিরূপ ঘৃণাভাজন, তাহা জানা থাকায় রতন চাঁদ আবদুল্লাহ্‌ খাঁর নিকট একজন উষ্ট্রারোহী সংবাদদাতা পাঠাইয়া তাঁহার পাল্কীতে চড়িয়া তাড়াতাড়ি নিজের বাসার দিকে চলিলেন। কিন্তু কিছু মোগল ও জনতা শীঘ্রই তাঁহার গতিরোধ করিল এবং তাঁহার এতদিনের উদ্ধত ব্যবহার ও অত্যাচারে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং পাল্কী হইতে টানিয়া আনিয়া গুরুতর মারপিট করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় মুহম্মদ আমীন খাঁর বাসায় লইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কিছু কাপড় আনিয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় শৃঙ্খলিত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। আবদুল্লাহ্‌ খাঁর প্রধান গোমস্তা রায় সিরোমন দাস ছিলেন অধিকতর ভাগ্যবান। অবস্থা কিরূপ তাহা দেখিয়া তিনি তাঁহার দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া বেশ বদলাইয়া তাঁহার মালপত্র লুণ্ঠিত হওয়ার সময় চোরের ন্যায় নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া কিছু মণিমানিক্য লইয়া পর পর তাঁহার কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু মীর আলী খাঁ এত সৌভাগ্যবান ছিলেন না। তিনি ছিলেন এত দিন ধরিয়া হুসায়ন আলী খাঁর ভৃত্য। তিনি তাঁহার চাকরী এত মূল্যবান মনে করিতেন যে, তাঁহাকে দাগ তেমুয়া প্রভৃতি তুল্য লাভজনক ও সম্মানজনক কয়েকটি পদে উন্নীত করেন। ঐ সমুদয় অনুগ্রহের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি এখন নিজেকে খয়রাত খাঁর একজন সাহসী সুযোগ্য সহচর বলিয়া প্রমাণিত করেন। অন্যান্যের বেলায় এত উশৃঙ্খলতা দেখাইলেও একই জনতা তিন দিন যাবত তৎপ্রতি সম্মান দেখাইল। অতঃপর তিনিও অপরাপর ব্যক্তির সহিত লুণ্ঠিত ও কারাগারে প্রেরিত হইলেন। হুসায়ন আলী খাঁ নিহত হইলে মীর মুশররফ অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেন।

তাঁহাকে এখন চাকরী এমনকি অর্থ দানেরও প্রস্তাব হইল। কিন্তু তিনি দুইটিই প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত মনে করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। সেখানে তিনি বহুকাল অজ্ঞাত বাসে কাটাইলেন। কেহ তাঁহার কথা চিন্তাও করিল না। অবশেষে বাদশাহ স্বেচ্ছায় তাঁহাকে ডাকাইয়া নিয়া নিজের চাকরীতে গ্রহণ করেন।

মুহম্মদ আমীন খাঁর আদেশে হুসায়ন আলী খাঁ, নূরুদ্দীন আলী খাঁ ও খয়রাত খাঁর মৃতদেহ সোনালী কাপড়ে আবৃত করিয়া যথোপযুক্তরূপে শবাধারে স্থাপিত হইলঃ ঐ আমীরের উদ্দেশ্য ছিল এভাবে নিজেকে জনসাধারণের ভৎর্সনা হইতে বাঁচাইয়া রাখা। যেখানে তাঁহারা আড়ম্বরের সহিত পড়িয়া রহিয়াছিলেন, তিনি এমনকি সেখানেও গমন করিয়া তাঁহাদের পদতলে বসিয়া দুআ পাঠ করিলেন এবং নির্দিষ্ট ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এখানে তিনটি সাহসী সিংহ নিদ্রিত রহিয়াছে।" অতঃপর তিনি শবাধার উঠাইয়া লইয়া আজমীরে পারিবারিক স্মৃতিস্তম্ভে লইয়া যাওয়ার আদেশ দান করিলেন। সেখানে ঐ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মহান আবদুল্লাহ্ খাঁ ওরফে মিঞা খাঁ সমাহিত আছেন। নিঃসন্দেহে সোনালী কাপড় ও অন্যান্য মূল্যবান অলঙ্কারের উদ্দেশ্য ছিল দস্যু-ডাকাতের লোভোদ্রেক করা। তাহারা যেন সমুদয় লুণ্ঠন করিয়া ও বিবিধ অশোভনীয় কার্য করিয়া মিছিলকে উপহাস্যাস্পদ করে। কিন্তু তাঁহার ধারণা এরূপ থাকিলেও তাঁহাকে নিরাশ হইতে হয়; দূর হইতে শবাধারগুলি দেখিতে পাইলেই সর্বশ্রেণীর লোকে সেখানে একত্রিত হইয়া সম্মানজনক ভক্তির বশে বহুদূর পর্যন্ত সঙ্গে গমন করিল। এরূপ অনুচরবৃন্দসহ এগুলি আজমীরে পৌঁছিলে পারিবারিক স্মৃতিস্তম্ভে সমাহিত করা হইল।

"হে আমার পুত্র জগত স্থায়ী-সম্পত্তি নহে,
ইহা একই স্থানে স্থায়ী হইতে পারে, কখনও এমন আশা করিও না।"
তুমি কি সুলায়মানের[৪২] শক্তির উত্থান-পতন দেখ নাই;
তাঁহার এবং আরও অনেকের সাম্রাজ্য কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই?
তুমি কি দেখ নাই যে, শেষে তিনি নিজেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হন!
কি সুখের কথা! তিনি নিজের জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের কৃতিত্ব
সঙ্গে লইয়া যাইতে সমর্থ হন।

আল্লাহ্‌ তা'লাকে ধন্যবাদ যে, হুসায়ন আলী খাঁর চরিত্রে এই দুইটি গুণ উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায় বলিয়া শত্রুরাও স্বীকার করিয়া থাকে। প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত ও অপ্রতিবাদ্য সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, ফর্‌রুখ সিয়ার ও তাঁহার অপর কয়েকজন শত্রুর ভাগ্যে যাহা ঘটে, তাহা তিনি ও তাঁহারা নিজেরাই যাচিয়া লন এবং নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে ভিন্ন তিনি কখনও তাহা করেন নাই। আর প্রকৃতপক্ষে নিজের প্রাণ ও সম্মান রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে না, এমন লোক কোথায়? এগুলি রক্ষা করার সামর্থ্য থাকিতে পৃথিবীর কোন লোক এগুলির একটা ত্যাগ করিয়াছে—অদ্যাপি এমন কথা শোনা যায় নাই। এমনকি, আল্লাহ্‌ ও রসূলের খাতিরে নিজেদের প্রাণ ও সম্মান বিসর্জন দিয়াছে এরূপ নির্দোষ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম; অথচ এরূপ মহৎ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে দুইটির একটি বা দুইটিই বর্জন স্বর্গীয় দায়িত্ব এবং পরলোকে কখনও তাহা সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখ ও গৌরবদায়ক না হইয়া পারে না। পক্ষান্তরে আমাদের নিজ জাতির বেলায় অনুরূপ ত্যাগ কখনও এরূপ গৌরবজনক প্রতিদান দিতে সমর্থ নহে। যে সকল লোকের দ্বারা কখনও কোন দরবার কলঙ্কিত হয়, আমীর জুমলা ও ইতিকাদ খাঁ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও সবাপেক্ষা লম্পট। অথচ এত শোণিতপাত ও সম্পত্তি নষ্ট করিয়া দুই ভাই ফর্‌রুখ সিয়ারের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপকার করেন, তিনি তাহার পুরস্কার দেন তাঁহাদিগকে এরূপ ঘৃণিত পাপিষ্ঠের বলিতে পরিণত করার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া; এমতাবস্থায় মানুষের বেলায় ত্যাগের পরিণাম গৌরবজনক হইবে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে?

সায়্যিদদের প্রতি অনুরক্ত লোকজনের প্রতি বাদশাহ্‌ যেরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, বিজেতার দয়া কখনও এত সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই।

পরাজিতের প্রতি বাদশাহের অনুকম্পা

হুসায়ন আলী খাঁর চাচাত ভাই আসাদুল্লাহ্‌ খাঁ ওরফে নওয়াব আওলিয়ার সমস্ত মালপত্র, শাসন ও প্রতিপত্তি এই ব্যাপক বিশৃঙ্খলায় বিনষ্ট হইয়া যায়; তিনি দরবার ত্যাগের অনুমতি লাভ করিয়া মক্কাশরীফে বয়তুল্লায় হজ করিতে গমন করেন। যে দুই ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে সেলিমগড় দুর্গ হইতে আনয়ন করিতে গমন করেন,

গোলাম আলী খাঁ ছিলেন তাঁহাদের একজন ; এই গৌরবের খাতিরে তাঁহার সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষা করা হয়। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আজাদ দেখিতে পাইয়াই আবদুল্লাহ্ খাঁর নিকট পালাইয়া যান। বারের অন্যতম প্রধান সায়্যিদ নসরতুল্লাহ্ খাঁ আবদুল্লাহ্ খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকিলেও তাঁহার অশ্বারোহী দল লইয়া সদাশয়তাবশতঃ তদীয় ভ্রাতার সাহায্যার্থ যাত্রা করেন। তিনি ইতঃপূর্বেই তিন ক্রোশ দূরে উপস্থিত হন; সব শেষ হইয়াছে দেখিয়া তিনি খান দুরানের নিকট দরখাস্ত করেন; তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌজন্যের সম্পর্ক থাকায় সেই আমীর তাঁহাকে ডাকাইয়া নিয়া বাদশাহের খেদমতে হাজির করিলেন। তিনি কুর্নিশ করিলে তাঁহাকে পঞ্চহাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করা হইল। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও ২০০০ সৈন্যের পরিচালনা ভার পাইলেন। এই মেহেরবানি ও বিবিধ তরক্কী সম্মুখে আনয়নের ইঙ্গিতরূপে কাজ করে বলিয়া মনে হয়। মুহম্মদ আমীন খাঁ পূর্বেই আট হাজারী মনসবদার ছিলেন। এখন তাঁহাকে জনপ্রতি দুইটি অশ্ব হিসাবে বিপুল সৈন্যের প্রত্যক্ষ সেনাপতিত্ব দানে সম্মানিত করা হইল। এতদ্ভিন্ন তিনি আড়াই কোটি দাম[৩৮] পুরস্কার পাইলেন এবং উজীরুল মুমালিক জাফর জঙ্গ[৩৯] উপাধিতে ভূষিত হইলেন। আট হাজারী মনসবদারের পদ ও আমীরুলওমারা বা রাজার রাজা উপাধিসহ খান দুরানকে প্রধান বখ্শী নিযুক্ত করা হইল। প্রকৃত উজীরের পুত্র কমরুদ্দীন খাঁকে দ্বিতীয় বখ্শী ও গোসল খানার অর্থাৎ অন্দর মহলের তত্ত্বাবধায়কের পদ প্রদত্ত হইল; তাঁহাকে আরও কয়েকটা পদ দ্বারা সম্মানিত করা হইল। এতদ্ব্যতীত তিনি হপ্ত হাজারী মনসবদারের পদসহ ৫০০০ অশ্বারোহী চালনার ভার প্রাপ্ত হইলেন। যে হায়দর কুলী খাঁ এত প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তিনিও একই পদে উন্নীত হইয়া কার্যতঃ জন প্রতি এক ও দুই অশ্বের ৬০০০ সৈন্যের সেনাপতিত্ব পাইলেন। তদুপরি তাঁহাকে নাসির জঙ্গ বা যুদ্ধে সাহায্যকারী উপাধি প্রদত্ত হইল। সাদৎ খাঁ পঞ্চহাজারী মনসবদারের পদে ও সেনাপতিত্বে উন্নীত এবং একটি নাগারা বা সেনাপতিত্বের বৃহৎ ঢাকসহ বাহাদুর বা সাহসী উপাধিতে সম্মানিত হইলেন। সংক্ষেপে, বাদশাহ্ তাঁহার নূতন বা পুরাতন কোন বন্ধুকেই ভুলিলেন না—প্রত্যেকেই তাঁহার

গুণ বা দরবারে তাঁহার স্বার্থ অনুযায়ী পদ-মর্যাদা ও চাকরী দ্বারা পুরস্কৃত হইলেন।

আবদুল্লাহ খাঁ ৪০ ক্রোশ অগ্রসর হন এবং তিনি রাজধানী হইতে মাত্র দুইটি ক্ষুদ্র মঞ্জিল দূরে ছিলেন, এমন সময় তিনি হাঙ্গামার প্রথম দিকেই রতন চাঁদ কর্তৃক তাড়াতাড়ি প্রেরিত চিরকুটখানা প্রাপ্ত হন। সেই শোকাবহ চিরকুট পাইয়া তাঁহার জন্য দিনের আলো অন্ধকার হইয়া যায়; তাঁহার চোখের তারকা অন্ধ হয় ও তাঁহার জীবন ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে। অশ্রুপূর্ণ চক্ষু ও পর্বত-প্রমাণ দুঃখ বুকে লইয়া তিনি যাত্রা বন্ধ রাখা নিরাপদ মনে করিলেন না। রাজধানীর দিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল তাঁহার মত। তাঁহার কতিপয় বন্ধু ইহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, প্রাদেশিক সৈন্যদলগুলি এখনও বাদশাহের সহিত যোগদান করে নাই। তাহার মরহুম ভ্রাতার বহু সহস্র সৈন্যের ইচ্ছা যাচাই করারও তিনি সময় পান নাই। কাজেই আকবরাবাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাদশাহ তাঁহার দল শক্তিশালী করার পূর্বেই তাঁহার উপর আপতিত হওয়া কর্তব্য। এই উপদেশে আবদুল্লাহ খাঁ খুশী হইতে পরিলেন না, তিনি বলিলেন, "দৃঢ়রূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত এবং ঘনিষ্ঠরূপে একতাবদ্ধ অজস্র আমীর ও সেনাপতি-বেষ্টিত বাদশাহকে হতোদ্যম সংখ্যার সৈন্যদল দ্বারা আক্রমণ করিয়া সফলতা লাভের প্রত্যাশা করা যায় না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রতিযোগিতা নিতান্ত অসম্মান ও অশুভ হইবে; তবে তিনি আওরঙ্গযীবের বংশের কোন শাহজাদাকে তাঁহার দলের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলে জনসাধারণ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে এবং প্রাচীন দরবারের যে বহু সংখ্যক আমীর এখন রাজধানীতে বাস করিতেছেন, তাহাদের মনও তুষ্ট হইতে পারে; তাহা হইলে তাঁহারা নূতন রাজার দরবার গঠন করিয়া তাঁহাকে সৈন্য ও কামান বন্দুক সংগ্রহের সময় দিতে পারেন।" উজীরের এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে তিনি রাজধানী অভিমুখে আগাইয়া চলিলেন; কিন্তু সেখানে পূর্বেই অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল।

বিপ্লবের সংবাদ দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িবামাত্রই কৃষকেরা দস্যুদলে যোগদান করিল; যে সকল লোক ঘটনাক্রমে পিছনে পড়িত, তাহাদের প্রত্যেককে, এমনকি, কোন মাল-পত্র প্রধান অংশ হইতে খানিকটা দূরে

পড়িলে তাহাও লুণ্ঠন করা তাহাদের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। একাধিক বার তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইলেও তাহাদের এরূপ অভ্যাস দূর করা গেল না। একদা আবদুল্লাহ্ খাঁর বাসার নিকটে প্রায় তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে একদল পদাতিক তাহাদের কর্মচারীবর্গসহ কর্তিত হইল। আর এক দিন হুসায়ন আলী খাঁর জন্য বিপুল পরিমাণ দ্রব্যাদি লইয়া রাজধানী হইতে একটা প্রহরীদল আসিতেছিল, তাহারা তাহাদের বেষ্টন করিয়া প্রত্যেকটা লোককে বিবস্ত্র করতঃ সমস্ত মাল-পত্র লুণ্ঠন করিল। স্থানটি ছিল আবদুল্লাহ্ খাঁর শিবির হইতে মাত্র দুই ক্রোশ দূরে। পক্ষান্তরে জমিদারেরা দুই ভাই, তাঁহাদের ভক্তদের সম্পত্তি ও জায়গীর ধৃত ও এগুলির রাজস্ব দখল করিয়া লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, যে পর্যন্ত তাহারা জানিতে না পারেন, কে সেগুলির মালিক থাকিবে, সে পর্যন্ত সেগুলি তাঁহাদেরই দখলে থাকিবে। এ সমুদয় নিতান্ত নগণ্য বিষয় বলিয়া উপেক্ষা করতঃ আবদুল্লাহ খাঁ শুজাউদ্দৌলাহ্ খাঁ ও মুর্তজা খাঁ নামক দুইজন গুরুত্বপূর্ণ আমীরকে রাজধানী হইতে একজন বাদশাহী বংশের শাহজাদাকে আনয়নের জন্য সেখানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার ছোট ভাই নজমুদ্দীন খাঁ ছিলেন দিল্লী প্রদেশের বড় লাট, রাজধানীও তন্মধ্যে অবস্থিত। তিনি তাহাকে যত পারেন, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যসহ শিবিরের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পত্র লিখিলেন।

৮ই জিলহজ সন্ধ্যায় অর্থাৎ কোন সঠিক সংবাদ শহরে পৌঁছিতে পারার কিছুকাল পূর্বে পত্র পৌঁছিল। কিন্তু ইতঃপূর্বেই সেখানে কিছু জনবর পৌঁছায় মুহম্মদ আমীন খাঁর প্রাসাদ দখল করার জন্য তিনি শহর কোতওয়ালের[৫০] অধীনে এক দল সশস্ত্র লোক প্রেরণ করেন। তাহারা রাত্রির অধিকাংশ সময় উহা ঘিরিয়া রাখিল। ভিতরের লোকদের তখন আত্মরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দৃষ্ট হইল। কিন্তু প্রাতঃকালে শাসনকর্তা তাঁহার নিজের ইচ্ছায়ই হউক কিংবা আবদুল্লাহ্ খাঁর আদেশের দরুনই হউক, কোতওয়ালকে ফিরাইয়া নিলেন এবং এরূপ ঝুঁকিজনক কার্য হইতে বিরত হইলেন। তদুপরি তাঁহার মনোযোগ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের দিকে পরিবর্তিত হইল। দুই দিন পরে অর্থাৎ কুরবানীর চিরন্তন তারিখ ১০ই জিলহজ তিনি বিরাট একদল

লোক লইয়া প্রথানুযায়ী শহরের বাহিরে ময়দানে নামায পড়িতে গমন করিলেন। সেখান হইতে শহরে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সটান দুর্গে গমন করিলেন। বাদশাহী পরিবারের শাহ্‌জাদারা সেখানে পাহারাধীন থাকিতেন। আবদুল্লাহ্‌ খাঁর দুইজন দূত তাঁহার অনুগমন করিলেন; মুয়াজ্জেদীন জাহাঁদার শাহের পুত্রেরা যে কক্ষে বাস করিতেন, দূতদ্বয়কে লইয়া উঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। কিন্তু এরূপ অনুরোধে সম্মত হওয়া দুরের কথা, তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। নিকোসিয়ার নামক তাঁহাদের একজন এমনকি পালাইয়া গিয়া আত্মগোপন করিলেন। এরূপ অস্বীকৃতিতে হতভম্ব হইয়া দূতদ্বয় রফীউল কদরের পুত্র ও বাহাদুর শাহের খুল্লতাত ভ্রাতা কিশোর শাহজাদা সুলতান ইব্রাহিমের কক্ষে গমন করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত করাইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া পরদিন আবুল ফতেহ্‌ জহীরুদ্দীন মুহম্মদ ইব্রাহীম[৪৩] নামে ও উপাধিতে সিংহাসনে বসাইলেন। আবদুল্লাহ খাঁ দুই দিন পরে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নতুন বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে গমন করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে তিনি গাযীউদ্দীন খাঁর জন্য আট হাজারী মনসবদারি ও আমীরুল ওমারা উপাধিসহ প্রথম বখ্‌শীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। নজমুদ্দীন আলী খাঁকে দ্বিতীয়, সলাবৎ খাঁকে তৃতীয় ও বৈরাম খাঁকে চতুর্থ বখ্‌শী করা হইল। তাঁহাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের প্রতিও অনুরূপভাবে অনুগ্রহ ও উন্নতি মঞ্জুর করা হইল। অতঃপর উজীর রফীউদ্‌দরজাতের দরবারের বহু প্রাচীন আমীরের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারা এখন বিনাকার্যে বিনা চাকরীতে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও বিস্মৃত হইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া সসম্মানে বরণ করিয়া কাজ ও চাকুরী প্রদত্ত হইল; তদুপরি তাহারা তাঁহাদের যাবতীয় অভাব অনুপাতে প্রত্যেকে ৫০,০০০ হইতে একলক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ সাহায্য পাইলেন। কয়েকজন পূর্বে সুখ্যাতির সহিত চাকরী করায় তাঁহাদিগকে কয়েকটি নূতন সৈন্যদলের সেনাপতিত্ব দানের প্রস্তাব হইল; কথা হইল সৈন্যপ্রতি মাসিক ৮০ টাকা বেতনে তাঁহারা নিজেরাই ইহাদের সংগ্রহ করিবেন। নিজামুল মুল্‌কের সহিত তাঁহার চাচা হামীদ

খাঁর অসদ্ভাব ছিল; তিনি যে জায়গীর ভোগ করিতেন, তাহা ছাড়াও তাঁহাকে একটি নূতন জায়গীর ও বিপুল অর্থ দ্বারা সাদর অভ্যর্থনা করা হইল। এতিকাদ খাঁ, শাহিস্তা খাঁ, সফী খাঁ, ইসলাম খাঁ প্রভৃতি ফর্‌রুখ সিয়ারের প্রতি অনুরক্ত কতিপয় শরীফ ও আমীর এবং আরও অনেকে এই দীর্ঘকাল যাবত উপেক্ষিত জীবনযাপন করিতেছিলেন; তাঁহাদের ভাগ্যও ছিল অনিশ্চিত। তাঁহারা এখন দরবারে যোগদান করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। কিশোর বাদশাহের পক্ষে আসিলে তাঁহাদিগকে সম্মান ও মনসবদারের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইল। ইসলাম খাঁ, মুহম্মদ খাঁ ও সফী খাঁ প্রভৃতি তাঁহাদের কেহ কেহ স্বাস্থ্যহীনতার অজুহাতে ক্ষমা চাহিলেন এবং সম্মান, মর্যাদা বা কাজ লইয়া মাথা ঘামাইতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এতিকাদ খাঁ ও সয়ফ খাঁ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাদের জরুরতের জন্য কিছু অর্থ গ্রহণ করিলেন; প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ইচ্ছা কিন্তু অকপট ছিল না। এই দুইজন আমীর এবং ওয়ালাশাহী প্রহরী দলের অপর কতিপয় সেনা-নায়ক শিষ্টাচারের খাতিরে দুই, একদিনের পথ পর্যন্ত আবদুল্লাহ খাঁর সঙ্গে গিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ৫০০ হইতে ১০০০ সওয়ার পর্যন্ত নিম্নতর শ্রেণীর মনসবদারেরা তাঁহাদের অনুরক্তিতে অধিকতর অকপট বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গুণানুযায়ী উন্নীত করা হইল। সাধারণ সৈন্যদের বেতন মাসে ৫০ হইতে পুরা ৮০ টাকায় বৃদ্ধি করা হইল। কিন্তু প্রবীণ সৈন্যদের যথোচিৎ প্রাধান্য না দিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সৈন্য ও অশ্বারোহী ভর্তি করায় ইহারা ও যাহারা সুবিধাজনকরূপে আরূঢ় ও সশস্ত্র ছিল, তাহারা তাহাদিগকে অপর্যাপ্ত নব-সংগৃহীত সৈন্যদের সহিত মিশ্রিত করায় এই পার্থক্যহীন অমনোযোগিতায় দোষ ধরিয়া অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু সময়ের জরুরতের খাতিরে শাসকেরা তাহাদের অসন্তোষের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে না পারায় নূতন বা পুরাতন সৈন্যের পার্থক্যের প্রতি নজর না দিয়াই সৈন্য সংগ্রহ চলিতে লাগিল। গোত্র ও জাতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইল আরও কম; এত কম যে, কেহ একটি ঘোড়া লইয়া আসিলেই তাহার জাতি বা গোত্র সম্পর্কে বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া তাহাকে অবশ্যই ভর্তি করা হইত। এইরূপে এক

কোটি টাকা সংগ্রহ অর্থ[৫৭] হিসাবে ব্যয় করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রাজধানিতে ৯০,০০০ অশ্বারোহী সংগৃহীত হইল।

২৯শে জিলহজ অর্থাৎ রাজ্যাভিষেকের পাঁচ দিন পরে আবদুল্লাহ খাঁ এত অল্প সময়ের মধ্যে যত অধিক অনুচর ও যত অধিক শাহী আড়ম্বরের সমাবেশ করা যায়, এত অধিক অনুচর ও সমারোহের সহিত নূতন বাদশাহকে কিল্লার বাহিরে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে লইয়া শহরের বাহিরে ঈদগাহের[৫৮] দিকে রওয়ানা হইলেন। সেখানে তাঁহার শিবির স্থাপিত হইল। কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাদশাহী সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সৈন্য সহ তাঁহার সহিত যোগদান করিল। রাজধানীকে শান্ত ও হাঙ্গামামুক্ত রাখিবার জন্য আদেশ দিয়া গোলাম আলী খাঁ ও নজাবৎ আলী খাঁ (আবদুল্লাহ্ খাঁর সাক্ষাৎ চাচাত ভাই, বয়স মাত্র ১৪ বৎসর) যুগপৎ পুনরায় সেখানে প্রেরিত হইলেন। এখন তিনি যে সংবাদ পাইলেন তাহাতে তিনি নিশ্চিত হইলেন যে, মুহম্মদ শাহ জাঠ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কাজেই তিনি তাঁহার পথে পড়ার জন্য কুতবুদ্দীন আওলিয়ার সমাধির পথে চলিলেন। কিন্তু আরও সঠিক সংবাদ পাইয়া তিনি বামদিকে ফিরিয়া ফরীদপুরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মুহম্মদ শাহ তখন আকবরাবাদের ভিতর দিয়া আসিতেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁহার ছোট ভাই সয়ফুদ্দীন আলী খাঁ ও সায়্যিদ মুহম্মদ খাঁ এবং তাঁহাদের নিজস্ব সৈন্য ও বারের একদল সায়্যিদসহ আরও কতিপয় আমীর ও সেনাপতির যোগদানের আশায় কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন। এই স্বল্পস্থায়ী অবস্থান তাঁহার পক্ষে উপকারজনক বলিয়া প্রমাণিত হইল। প্রত্যহই কোন সৈন্যদল ও সর্বাপেক্ষা সাহসী আফগানেরা তাঁহার সহিত যোগদান করিতে লাগিল। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে কতিপয় বিশিষ্ট জমিদারও তাঁহাদের লোকজন লইয়া তাঁহার দলে ভিড়িলেন। হুসায়ন আলী খাঁর প্রবীণ সৈন্যদের এক মাসের বেতন দিয়া মুহম্মদ শাহের সৈন্যদলে ভর্তি হইতে সম্মত করান হয়ঃ এক একবারে একশত বা দুইশত করিয়া পালাইয়া আসা তখন তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইল। ইহাদের সকলেই ছিল সশস্ত্র সওয়ার। এইরূপে শক্তিশালী হইয়া আবদুল্লাহ্ খাঁ পেলোলে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার দুই ভাই ও অপর কয়েকজন

সেনাপতি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। নিজেদের সৈন্য ভিন্ন তাঁহারা ১৫০ গরুর গাড়ী বোঝাই বারের সায়্যিদ লইয়া আসেন। ইহাদের এক একজন নিজেকে রুস্তম ও আফরুসিয়ারের সমকক্ষ মনে করিতেন। তাহাদিগকে আবদুল্লাহ্ খাঁর হস্তীর চতুষ্পার্শ্বে একটি বৃত্ত গঠন করিতে বলা হইল। কেবল পদোন্নতির আশায় নহে, সায়্যিদ হিসাবেই উজীরের সহিত জ্ঞাতিত্ব ও ভ্রাতৃত্বের অধিকার দাবী করিতেন বলিয়া তৎপ্রতি তাঁহাদের ভক্তির খাতিরেও তাঁহারা এই নির্দিষ্ট স্থানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের আনীত প্রবীণ সৈন্যের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না; তাহারা শিবিরে আসিতে না আসিতেই আকবরাবাদ প্রদেশের শক্তিশালী জমিদার ও মুহম্মদ শাহের পর্যটন-ভূমির মালিক জাঠ চূড়ামন (বেদুন সিংহের পিতা ও বরচাঁদের পিতামহ) তাঁহার পশ্চাতে হাজির হইলেন। অব্যবহিত পরেই আসিলেন হুসায়ন আলী খাঁর ভূতপূর্ব দেওয়ান মোহকাম সিং। এই লোকটার সঙ্গেই মুহাম্মদ শাহ্ অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। কিন্তু ঐ সকল নূতন বন্ধনের চাইতে তাঁহার মনের ঝোঁক প্রবলতর হওয়ায় তিনি ঐ শিবির হইতে পলায়ন করিয়া কয়েকজন প্রবীণ কর্মচারী ও সেনাপতিসহ বড় একদল সৈন্য লইয়া আবদুল্লাহ্ খাঁর নিকট চলিয়া আসেন। পর পর আগত এই সকল বাহিনী ছিল রাজধানী হইতে আনীত সেই বিশাল সৈন্যদলের অতিরিক্ত

উজীরের শিবিরে সাহায্য আসায় তাঁহার সৈন্যসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়

তাঁহারা এত বিশাল স্থান জুড়িয়া বসিল যে, এত অধিক অশ্বারোহী ও পদাতিকের পদতলের মৃত্তিকা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল; কিছু অনুসন্ধান ভিন্ন তাহার পাত্তা মিলিত না। দুইটি শত্রুবাহিনী অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িল; মুহম্মদ শাহ শাহ্‌পুরের নিকটে শিবির স্থাপন করেন; মুলতানের শাসনকর্তা বিখ্যাত আবদুস সামাদ খাঁ ও রাজা দেহিরাজ জেহি সিং-এর জন্য তিনি সেখানে না থামিলে দুই শিবিরের মধ্যে কোনই দূরত্ব থাকিত না; রাস্তা খারাব বলিয়াই হউক কিম্বা অপর কোন কারণেই হউক, জেহি সিং আসিলেন না। তখন মুহর্‌রমের ৯ তারিখ। কিন্তু ইত্যবসরে মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাস ৩০০০ অশ্বারোহী এবং রোহিলা খয়রাত খাঁ ও বায়জিদ

খাঁ মেওয়াটি তাঁহাদের স্ব স্ব সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন। আরও অল্প কিছুকাল পরে রাজা জেহি সিং-এর সেখান হইতে ৪০০০ হাজার শক্তিশালী সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

ইতোমধ্যে নিকটত্বের দরুন দুই বাহিনীর মধ্যে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ ঘটিল। তাহাতে উভয়পক্ষ পরস্পরকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। একবার আবদুল্লাহ্ খাঁর নির্দেশে চূড়ামন শত্রুপক্ষের তোপখানায় প্রায় অগ্নিদানের উপক্রম করেন, আর একবার তিনি ফাঁদে ফেলিয়া তাহাদের শকটশ্রেণীর সমস্ত বলদ লইয়া আসার যোগাড় করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ১০ই মুহর্‌রমের পূর্বে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইতে পারিল না; অতঃপর তাহাদের তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল। গোলান্দাজ বাহিনীর সেনাপতি হায়দর কুলী খাঁ ছিলেন চূড়ামনের আক্রমণ হইতে কামানরাজি রক্ষার উপলক্ষ; তিনি প্রথম সারির অগ্রে স্থাপিত হইলেন; মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাসসহ সাদৎ খাঁ দক্ষিণ পার্শ্ব পরিচালনা করিলেন। নসরৎ ইয়ার খাঁ ও অপর কয়েক খ্যাত-নামা সেনানায়কসহ খান দুরান পরিচালনা করিলেন বামপার্শ্ব। একদল প্রবীণ সৈন্যসহ আজম খাঁ বাম পার্শ্বের মধ্যস্থলে স্থান লইলেন। হাদী খাঁ, কমরুদ্দীন খাঁ, আজিমুল্লাহ খাঁ এবং প্রথম শ্রেণীর অপর কয়েকজন সেনানায়ক সহ মুহাম্মদ আমীন খাঁ সমগ্র বাহিনীর কেন্দ্রভাগে রহিলেন। বাদশাহের দেহের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট ও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যুদ্ধেখ্যাতি সর্বোচ্চ পদস্থ অজস্র লোক এবং শের এহসান খাঁ ও তরবিয়ৎ খাঁ পরিচালিত সৈন্যদল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মুহম্মদ শাহও সেখানে স্থান গ্রহণ করেন। মীর জুমলা ও রাজা গোলাল সিং বুহদিয়া সহ অপর কয়েকজন সেনাপতিরা দুই পার্শ্বের সাহায্যে আদিষ্ট হন। সয়ফ খাঁ ও রাজা দেহির রাজসহ আসাদুল্লাহ খাঁ কতকটা সংরক্ষিত সৈন্যদলরূপে কাজ করার ও বাদশাহের মহিলামহলের উপর লক্ষ্য রাখার জন্য স্থাপিত হন। পর্বত-প্রমাণ রণহাতীগুলিকে শৃঙ্খলিত করিয়া সর্বাগ্রে কিন্তু কামান শ্রেণীর পশ্চাতে স্থাপন করা হইল। এগুলিকে কিছু লঘুভার অশ্বারোহীর সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইল; ইহারা এককভাবে অথবা দলে দলে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করিত।

আবদুল্লাহ খাঁ নিজ তরফে ১২ই মুহর্‌রম শত্রুশিবির হইতে তিন ক্রোশ দূরে হুসায়নপুরে পৌঁছিয়া তাঁহার সৈন্যদের দ্বারা ব্যূহ রচনা করিলেন। কিন্তু বারের সায়্যিদেরা তাঁহার সহিত জ্ঞাতিত্বের দাবী করিত বলিয়া এক প্রকারের সমকক্ষতাও দাবী করায় অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অবাধ্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। তাহাদিগকে কতকটা শৃঙ্খলায় আনয়ন করিতে তাঁহারা এত সময় নষ্ট করিলেন যে, তাহাদিগকে পৃথকভাবে তিনবার শ্রেণীবদ্ধ করার দরকার হইল। অবশেষে তাহাদিগকে তাহাদের তিনজন সেনাপতি—সয়ফুদ্দীন আলী খাঁ, সায়্যিদ মুহম্মদ খাঁ ও শহমৎ খাঁর অধীনে আবদুল্লাহ্ খাঁর হস্তীর সম্মুখে থাকিতে সম্মত করান হইল; কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেই তাহাদের যে কোন লোকের ন্যায় সম্পূর্ণ উগ্রস্বভাব বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। বারের সায়্যিদ বলিয়া তাঁহারা এতই গর্বিত ছিলেন যে, প্রাচীনকালের রুস্তম ও আফরুসিয়ারের[১৭] সমকক্ষতা দাবী করিতেন। হামিদ খাঁ, সয়ফ খাঁ এবং রোহিলা বইরাম খাঁ ও এখলাস খাঁ, ওমর খাঁ আফগান ও শুজা খাঁ পিনোলী, আবদুল্লাহ্ খাঁ তিরিন প্রভৃতি ৭০ জন গজারূঢ় আফগান ও রোহিলা জমিদারসহ সসৈন্যে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে স্থাপিত হইলেন। কিন্তু প্রধান ব্‌খশী আবদুল মুহসিন খাঁ, নিয়মিত সৈন্যদ্বয়ের বখ্‌শী সইদ আলী খাঁ ও বারের সৈন্যদের বখ্‌শী হিরোমন আবদুল্লাহ্ খাঁর ব্যক্তিগত বেতনভোগী ২৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও তাঁহার সমস্ত প্রবীণ সৈন্যসহ তাঁহার হস্তীর সম্মুখে স্থাপিত হইল; একদল লোক—সমস্তই বারের সায়্যিদ ও সবই পদাতিক পূর্ব হইতেই উহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের আবদুল্লাহ খাঁর বেতনভোগী সৈন্য অপেক্ষা বরং দেশীয় লোক ও জ্ঞাতি বলিয়াই মনে করিতেন। সৈন্যদল এইভাবে সজ্জিত হইয়া ১৩ই তারিখের সমগ্র রাত্রি সশস্ত্র অবস্থায় রহিল। রাজা মোহকাম সিং মৃত হুসায়ন আলী খাঁর দেওয়ান হইলেও মুহম্মদ শাহ্ তাহার সহিত অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। এমন কি, পঞ্চহাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত করিয়া অনুগৃহীত করেন। তথাপি তিনি অনুকূল সুযোগ পাইয়া ৮০০ অশ্বারোহী এবং খোদাদাদ মির্জা ও খান মির্জা নামক দুইজন বিখ্যাত কর্মচারীসহ সেই রাতে তাঁহার নিকট চলিয়া আসেন। প্রত্যুষে ঢাক বাজিবা মাত্র নকীবেরা

যথারীতি তিন বার ঘোষণা করিল। 'সাহস বরাবরই ভীরুতার চেয়ে অধিকতর নিরাপদ।' তখন দুই পক্ষের সর্বাগ্রবর্তী সৈন্যেরা পরস্পরকে সালাম করিয়া পরস্পরকে সম্বর্ধনা ও পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করার জন্য তীরের শন্‌শন্ ও গুলীগোলার সোঁ সোঁ শব্দ কানে লাগাইল। তখন সৈন্যদলের মধ্যভাগে অবস্থিত মুহম্মদ শাহ্ রতন চাঁদের অবমাননার জন্য ঠিক এই মুহূর্তই নির্ধারিত করিয়া রাখেন। রতন চাঁদের মস্তক তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা তাঁহার হাতীর পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলেন, বাদশাহী পোশাকে তিনি ইহার উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। ইহাতে যেন ইঙ্গিত পাইয়া অজস্র সৈনিক সমুদ্রের তরঙ্গরাজি অথবা সমস্ত প্রান্তর নিমজ্জনকারী বন্য জন্তুর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের শত্রুদের ভারাপন্ন দেহ হইতে যন্ত্রণা দিয়া তাহাদের আত্মা টানিয়া বাহির করিবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া অগ্রসর হইল। যাহারা যোদ্ধাদের চরম ঘৃণা দেখিল এবং ঢাক-ঢোলের বিশৃঙ্খল আওয়াজ শুনিল, তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, সেদিন কোন পক্ষই পানা চাহিবে না বা দিবে না। কামানরাজি ইতঃপূর্বেই গোটা দল বিনষ্ট করিতেছিল। অপরিহার্য ভাগ্য-প্রেরিত এতগুলি কামান যেন তাহাদের মুখব্যাদান করিয়া সর্বাপেক্ষা সাহসী লোকদের হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। পক্ষান্তরে অবিশ্রান্ত হাউইবাজি ছুটিয়া সর্বাপেক্ষা নির্ভীক লোকের গর্ব খতম করিয়া দিল। হায়দর কুলী খাঁর আদেশে অটলভাবে কামান দাগিতে অভ্যস্ত একদল প্রবীণ লোক ছিল। তাঁহার ন্যায় কর্মঠ লোকের পরিচালনায় গোলন্দাজ বাহিনী সেদিন যে বিস্ময়কর কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহাতে বিরুদ্ধ পক্ষ ভয় পাইল না বলিলেই হয়। তাহাদের হাজার হাজার সৈন্য দলীয় তেজে উদ্দীপিত হইয়া উড্ডীয়মান সর্পের হৃদপিণ্ড বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে অগ্নি ও মৃত্যুবরণকারী ঐ সকল নারকীয় মুখের সম্মুখে নির্ভীকভাবে নিক্ষেপ করিল। প্রতি মুহূর্তে বহুসংখ্যক লোক বিনষ্ট হইলেও হাজার হাজার লোক বেগে সম্মুখে অগ্রসর হইতে ও দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া আসিতে লাগিল। ফলে মুহম্মদ শাহের দুর্বলচিত্ত গোলন্দাজেরা স্থানচ্যুত হইতে ও অবশেষে প্রকাশ্যে পালাইতে লাগিল। বিশেষতঃ নজমুদ্দীন আলী খাঁ বিজ্ঞতার সহিত

পরিকল্পিত ও সাহসের সহিত সম্পাদিত একটা গতিবিবর্তনের দ্বারা যুদ্ধের গতি বদলাইয়া দিলেই এমন ঘটে। ১২,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া তিনি মূল সৈন্যদল হইতে পৃথক হইয়া একটা গ্রামের পার্শ্বস্থিত একটা কুঞ্জ দখলে আনিলেন; উহার আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি এত প্রচণ্ডরূপে অবিরাম কামান দাগিতে লাগিলেন যে, খোদ কল্পনার ডানারও পালক পুড়িয়া গেল। যুদ্ধের মোড় ফিরাইয়া দেওয়াই যদি তাহার অভিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা সিদ্ধ হয়। তাঁহার কামান দাগা এত বিরক্তিকর হয় যে, বাদশাহী সৈন্যদের পক্ষে রণক্ষেত্র নিতান্ত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। সর্বাপেক্ষা সাহসী লোকদের গোলাপগণ্ডের রক্তিমাবিবর্ণ, এমনকি, লজ্জা-জ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহাদের এমন কাঁপনি ছুটিল যে, হস্তপদের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া ব্যূহ ভাঙ্গিয়া প্রকাশ্যে পলায়নের জন্য উদ্যত হইল। এই দুরবস্থা হায়দর কুলী খাঁ ও খান দুরানের নজরে পড়িলে তাহারা নসরৎ ইয়ার খাঁ, সাবুৎ খাঁ ও অপর কতিপয় তেজস্বী সেনানায়ককে সঙ্গে লইয়া মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে উচ্চমাটির বাঁধ হইতে নজমুদ্দীন আলী খাঁ ধ্বংসানল ঢালিতেছিলেন, সাহসের সহিত সেদিকে অগ্রসর হইলেন। কামানের গোলা ছুঁড়িয়া তাঁহারা একটা স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং চীৎকার করিতে করিতে তদাভিমুখে আক্রমণে অগ্রসর হইয়া সম্মুখস্থ সবকিছু দখলে আনিলেন। ফলে শত্রুরা ভগ্ন প্রাচীর ও ভূপতিত বৃক্ষরাজির পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া কামান দাগিতে বাধ্য হইল, পরিশেষে তাহারা সেখান হইতেও বিতাড়িত হইল। ফলে হায়দর কুলী খাঁ সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের প্রভু হইয়া রহিলেন। এমতাবস্থায় রক্তক্ষয়ী অমীমাংসিত যুদ্ধের পর উভয় পক্ষ সন্ধ্যা বেলায় রণক্ষেত্রে রহিল; আবদুল্লাহ খাঁ যেখানে ছিলেন, সেখানে তাঁহার জন্য একটা ক্ষুদ্র তাঁবু খাটাইবার আদেশ দিলেন; কিন্তু নিজের ক্ষতির কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমার জন্য ইহকালে আর বিশ্রাম নাই," এই বলিয়া তিনি তাঁবু স্থাপনের আদেশ রহিত করিলেন।

অন্ধকার হইবামাত্র বাদশাহী গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি হায়দর কুলী খাঁ তাঁহার কামান চালু করার ব্যবস্থা করিলেন। কামান দাগিতে দাগিতে ও স্থান দখল করিতে করিতে তিনি একটু সুবিধাজনক স্থান প্রাপ্ত

হইলেন; সেখান হইতে সারারাত অবিশ্রান্ত কামান দাগিয়া তিনি অজস্র লোককে হতাহত করিলেন। এরূপ ধ্বংসাত্মক গোলাবর্ষণ সহ্য করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আসল সৈন্যদলগুলি ইহার প্রচণ্ডতা সহ্য করিতে না পারিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল; সেখানেও গোলাবৃষ্টির সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া তাহারা আরও দূরে পালাইয়া গেল। যে সকল সাহসী সেনাপতি দিবাভাগে হস্তীপৃষ্ঠে থাকিয়া এত সুখ্যাতি অর্জন করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখন নিরাপত্তার খাতিরে নির্লজ্জভাবে পালাইয়া গেলেন। কিন্তু শিবির হইতে পলায়নকালে সশস্ত্র কৃষক দল তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইল। প্রত্যুষের কিঞ্চিৎ পূর্বে একটা কামানের গোলা পড়িয়া মোহকাম সিং-এর হাঁওদা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি আতঙ্কে লাফাইয়া পড়িয়া এত আকুল হইয়া পলায়ন করিলেন যে, তিনি জীবিত না মৃত, বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর হইল না। ইতোমধ্যে সূর্যোদয় হইল, সেদিন ১১৩৩ হিজরীর ১৪ই মুহর্রম। তখন দেখা গেল, যে ১৫/১৬ হাজার অশ্বরোহী রাত্রিকালে সেই ভীষণ গোলাবৃষ্টি সহ্য করিয়াছিল, তাহাদের একজনেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন খাদ্য গ্রহণ করে নাই। নিকটে না থাকায় এবং একলক্ষ জাঠের দখলে থাকায় এমনকি পানিও পান করে নাই। তাহাদের সম্মানজ্ঞান ও উৎসাহবোধ এত অধিক ছিল যে, সমগ্র দলের মধ্যে একটি লোকেও তাহার স্থান ত্যাগ করে নাই। তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁহাদের দেশবাসী পরিচালিত বারের সাদাত এবং তাঁহাদেরই ন্যায় আত্মসম্মান সম্পর্কে তুল্য ঈর্ষান্বিত ও আবদুল্লাহ খাঁর দেহের উৎসাহী অনুরক্ত।

অপর পক্ষেও তুল্য অটলতা প্রদর্শিত হয়। যে অজস্র কর্মচারী, সেনাপতি ও বিখ্যাত স্বেচ্ছাসেবক তাঁহার সিংহাসন বেষ্টন করিয়া রাখেন, মুহম্মদ শাহ তাঁহার প্রিয়হস্তী শাহপছন্দে আরূঢ় থাকিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রভাবে তাঁহাদের সকলকে অনুগৃহীত করিতেছিলেন। সারারাত ও পূর্ববর্তী সারাদিন তিনি বসিয়া কাটাইয়াছিলেন। প্রত্যুষেই শত্রুপক্ষ সবল হইয়া উঠিল।

জয়লাভ করিতে বা উহার চেষ্টায় ধ্বংস হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নজমুদ্দীন আলী খাঁ বারের একদল সাদাত ও আর একদল বিশ্বস্ত সৈন্য লইয়া

পুনরায় আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। যে সাংঘাতিক কামানরাজি সারারাত এত অধিক ধ্বংসক্রিয়া চালাইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকারের জন্য প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইলেন। তাহাতে রোজ কিয়ামতের নমুনা প্রকাশ পাইল। হায়দর কুলী খাঁ ও খান দুরানের নিকট তিনি বাধা পাইলেন। এমতাবস্থায় দৃষ্টান্তের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকায় তাহারা শত্রুর মুকাবিলা করিবার জন্য তাঁহাদের আবদ্ধ উচ্চ প্রাচীরের বাহিরে আসিলেন। সাহসী সৈন্য ও নির্ভীক সেনাপতিরা তাঁহার সাহায্যে আসিলেন। শেষোক্তদের মধ্যে নসরৎ ইয়ার খাঁ অন্যতম; বারের সাদ্যিদ হইলেও এবং নজমুদ্দীন আলী খাঁ ও আবদুল্লাহ খাঁর সহিত আত্মীয়তার গর্ববোধ করিলেও তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে খাতিলাভে মনস্থ করেন। এখানেও যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী ও একগুঁয়ে হয়। উভয় পক্ষের সাহসী সেনাপতিরা নিজেদের বক্ষকে এতগুলি নিশানা করিয়া বীরত্বসহকারে নিজেদের উত্তম প্রদর্শন করিলেন; মনে হইল যেন, পরস্পরের বীরত্ব সম্পর্কে তাহাদের মনে কোন সন্দেহ থাকিয়া থাকিলে তাহারা শুধু তাহাদের তরবারি হইতে প্রবাহিত তরঙ্গ[৬৬] দ্বারা তাহা ধৌত করিতেই সচেষ্ট। উভয় পক্ষই প্লাবন হইতে নির্গত অজস্র কুম্ভীর বা গর্জনকারী ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন। সর্বত্র এত চীৎকার ও এত সোরগোল উঠিল যে, রোজ কিয়ামতের গোলমালও তাহার নীচে ডুবিয়া যাইত। এত নির্ভীক সেনানায়কের কঠোর দৃঢ়তার বিরুদ্ধে এতগুলি ইস্পাতের তরবারির পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইতে যে আগুন প্রকাশিত হইল, তাহা বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া ঐ সকল সাহসী লোককে দলে দলে পুড়িয়া মারিল ও তাহাদের হাজার হাজার অসহায় পরিবার তাহাতে ধ্বংস হইয়া গেল।

এই বিপজ্জনক সংঘর্ষ দর্শনে সম্মানলাভে অভিলাষী হইয়া সাদৎ খাঁ যাহারা বাদশাহের খাতিরে তাহাদের শোনিতপাত করিতেছিল, সজমেচ্ছু হস্তীর ন্যায় কয়েকবার তাহাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া গেলেন। তিনি কয়েকবার প্রবল আক্রমণ চালাইলেন; বাদশাহের স্পষ্ট আদেশে শের একিন খাঁও তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি শত্রুদের তীক্ষ্ণবর্শা ও ভীতিপ্রদ বল্লমের উপর শিকারীদের উপেক্ষাকারী ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায়

ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তথাপি বাদশাহের পক্ষ হারিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইল। খান দুরানের গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি দরবেশ আলী খাঁ, হায়দর কুলী খাঁর মীর আতিশা আবদুল গনী খাঁ, তাঁহার কাতিব মিঞারাম, হুসায়ন খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ জাফর প্রভৃতি অন্যান্য অজস্রলোকসহ ইতঃপূর্বেই গতায়ু হইয়া মৃত্তিকায় ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল। নসরৎ কুলী খাঁর দেহে তীর বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। আরও বহু সংখ্যক লোকসহ দোস্ত আলী খাঁ আহত ও অক্ষম হন। আবদুল্লাহ্ খাঁর পক্ষে অতি বিখ্যাত সেনানায়ক শাহামৎ খাঁ কাজী, মীর বাহাদুর শাহীর ভ্রাতা আবদুল্ কাদির খাঁ এবং তাঁহার ভ্রাতা ফতেহ্ ইয়ার খাঁ ও তহোওয়ার আলী খাঁ নিহত হন। আবদুর রহিম খাঁ আওরঙ্গযীবীর[৫৭] পুত্র আবদুল গনী খাঁ এবং গোলাম মহীউদ্দীন খাঁ, সবকতুল্লাহ্ খাঁ ওরফে শয়কা ও বিখ্যাত যোদ্ধা গোলাম আলী খাঁর ভাগ্যেও একই দশা ঘটে। শেষোক্ত তিনজন ছিলেন সহোদর ভ্রাতা ও আবদুল্লাহ্ খাঁর বাহিনীতে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি। ইহাদের সকলেই বেলোলীর পুত্র শুজাউদ্দীন খাঁ সহ সেই কঠিন সঙ্কটে নিহত হন। সর্বাপেক্ষা সাহসী লোক ভিন্ন আর কেহই সেখানে তাহাদের মুখ দেখাইতে পারে নাই। দর্শকদের বিস্ময়োৎপাদক বীরত্ব ও প্রভুভক্তিজনক কার্যাবলী প্রদর্শনের পর তাহাদের সকলেই হাসিমুখে তাহাদের ভাগ্যের নিকট নতি স্বীকার করেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁহাদের শত্রুদের প্রাণ বাহির করিতে চেষ্টা করার পর নিঃসঙ্কোচে তলা পর্যন্ত মৃত্যুপ্রদত্ত তিক্ত ঔষধ পান করেন। তাঁহাদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য সেই হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যে ও শোনিতপাতের প্রতিযোগিতা-খেলায় তাহাদের জীবনের মূলধন খোয়াইয়া দ্রুত পৃথিবী ত্যাগ করে এবং সর্বহারা দেউলিয়াদের ন্যায় পরলোকের অতল স্পর্শে একেবারে ডুব দেন। সাহসী নজমুদ্দীন আলী খাঁ ছিলেন সেই মৃত্যু ও হত্যার বাজারে সর্বোচ্চ নীলাম খরিদ্দার; হাতের আঘাতে কয়েকটা যখম হওয়ার পর অবশেষে তাঁহার চক্ষে একটা তীরের আঘাত লাগায় তিনি দৃষ্টির আনন্দজনক পরিচ্ছদে বঞ্চিত হন; ইহাতে তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ খাঁ অনির্বচনীয় ব্যাথা পান। অবস্থা গুরুতর দেখিয়া তিনি তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বীরের সমস্ত বীরপুরুষকে লইয়া তাঁহার সাহায্যে যাত্রা করেন। সকলের মনোযোগ যখন

ব্যাপারের গুরুতর অবস্থার প্রতি নিবদ্ধ, ঠিক সেই মুহূর্তে আবদুল্লাহ্ খাঁর সেরা ভক্ত জাঠ চূড়ামন ঘুরপাক খাইয়া বাদশাহের পশ্চাতভাগে আপতিত হন; অচিরে তাহা বিশৃঙ্খলা ও আর্তনাদে পূর্ণ হইয়া যায়। বাদশাহের গোলন্দাজ বাহিনীর ১০০০ অতিরিক্ত বলদ ও রান্নাঘরের দ্রব্যাদি বোঝাই কিছু উট যমুনার তীরে চরিতেছিল; তিনি এগুলি ধৃত করিয়া আরও আগাইয়া বাদশাহী শিবির পর্যন্ত গমন করিয়া অবশেষে দেখিলেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য সেখানে লোক রহিয়াছে। বাদশাহ স্বয়ং তৎপ্রতি একটা তীর নিক্ষেপ করিলেন; মুহম্মদ আমীন খাঁ ও হাদী খাঁ বাদশাহের চতুষ্পার্শ্বস্থ পদাতিকদের লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। আবদুল্লাহ খাঁর সম্মুখে যাহা ঘটিতেছিল, তিনি কেবল তাহা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন; তিনি তাহার লোকজনের সাহায্যার্থ যাত্রা করিবেন এমন সময় সাদৎ খাঁ, হায়দর কুলী খাঁ ও মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ তাঁহার পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। এই গতি পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আবদুল্লাহ খাঁ ঘুরপাক খাইয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হায়দর কুলী খাঁর ধনুক নিয়ত কার্যরত থাকিত; তিনি ও তাঁহার নিজের দ্বারা শিক্ষিত বন্দুকধারী দল আবদুল্লাহ খাঁর লোকদের অত্যন্ত জ্বালাতন করিতেছিল। এই আক্রমণে তিনি দুইজন কৃতী কর্মচারী হারাইলেন—তাঁহার মীর আতিশা শেহ-হবিলা ও তাঁহার প্রধান বখ্‌শী আবুল মুহসিন খাঁর ভ্রাতা সঈদ আলী খাঁ। এই আক্রমণে হায়দর কুলী খাঁর লোকজনের মধ্যে কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ায় তিনি পুনরায় ব্যূহ রচনা করিলেন। খান দুরান বেশ কিছু সৈন্য লইয়া আসিলে তিনি এত প্রবল উদ্যমে তাঁহার নূতন আক্রমণ চালাইলেন যে, আবদুল্লাহ্ খাঁর স্বাভাবিক উপস্থিত বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গেল। বিপদকালে হিন্দুস্তানী সেনাপতিরা হস্তী ত্যাগ করিয়া জনতার সহিত মিলিয়া পদাতিকের ন্যায় যুদ্ধ করিতেন। আবদুল্লাহ্ খাঁ বহু যুদ্ধ দেখেন এবং ইহার অনেকগুলিতেই নিদারুণ সঙ্কটে নিপতিত হন; কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় কখনও অবিবেচকতার অপরাধে অপরাধী না হওয়াই ছিল তাঁহার অবধারিত নীতি। তিনি বরাবরই এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার উপস্থিতবুদ্ধি রক্ষা করিতেন। অনুচিত সাহস ও প্রচণ্ডতার চেয়ে দৃঢ়তা ও স্থিরতা অবলম্বনেরই তিনি ছিলেন বিশেষ পক্ষপাতি। শিকারের ঘাড়ে

লাফাইয়া পড়িবার মুহূর্তের অপেক্ষারত সিংহের ন্যায় তিনি শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্যের পতাকা জাঁকের সহিত প্রদর্শন করাইতেন (মোটের উপর, তাহাই বীরত্বের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ) এবং উৎসাহ ও প্রচণ্ডতার চেয়ে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়কেই যুদ্ধজয়ে সমধিক সাহায্যকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তথাপি তাঁহার সৌভাগ্যের ভাণ্ডার ইতোমধ্যে ফুরাইয়া যাওয়ায় এবং অদৃষ্ট তৎপ্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করায় তিনি নিজস্ব নীতি ভুলিয়া গিয়া বিনা প্রয়োজনে হস্তী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঢাল-তলোয়ার লইয়া জনতার সহিত মিশিয়া গেলেন। তাঁহার একবারও খেয়াল হইল না যে, তখনও তাঁহার দেহের পার্শ্বে ৩০০ বারের সায়্যিদ বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারা শেষ পর্যন্ত তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিবে বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া এখন তাঁহার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দিতে ইচ্ছুক বলিয়া বোধ হওয়ার তিনি অবতরণ করিতে না করিতেই তাঁহার অধিকাংশ কর্মচারী ও সৈন্য ধরিয়া নিলেন যে, তিনি নিহত, অক্ষম বা জয়লাভে নিরাশ হইয়াছেন। কাজেই তাহারা দূরে ও নিকটে তাহাদের স্থান ত্যাগ করিয়া পালাইতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য কয়েকটা বিবরণ অনুযায়ী তাঁহার আপন ভাগিনেয় ও একজন উৎকৃষ্ট সেনাপতি তাহার লাফাইয়া পড়ার খেয়াল হওয়ার পূর্বেই নিজস্থান ত্যাগ করেন এবং অপর সকলে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। সে যাহাই হউক, আবদুল্লাহ্ খাঁ তাঁহার দলত্যাগে বিস্মিত হইলেও স্বয়ং তেজস্বিতার সহিত অটল রহিলেন। কিন্তু এখন চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত ও বর্মভারে কার্য তৎপরতা ব্যাহত হওয়ায় তাঁহার কপালে একটা তীর লাগিল, তৎপরে একাদিকক্রমে তাঁহার ঘাড়ে ও হাতে দুইটি করবালাঘাত পড়িল। নিবিড় চাপে পড়িয়া ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া তিনি ভাগ্যের থাবায় ধৃত ও বন্দী হইলেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে তাহার ঘনিষ্ঠ ভ্রাতা নজমুদ্দীন আলী খাঁ তাহার ভাগ্যবরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার দিকে ভিড়িতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই নিহত হইতেছিলেন এমন সময় আবদুল্লাহ্ খাঁর কথা হায়দার কুলী খাঁর স্মরণ হওয়ায় তিনি দুইজনকেই সৈন্যদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন।

আবদুল্লাহ্ খাঁ সম্পূর্ণ পরাজিত ও বন্দী

অসংখ্য লোক ঐ মহাপ্রাণ ব্যাক্তিদের ভাগ্যে অভিভূত হইল ; তাঁহারা মনে করিল, নিম্নোক্ত বয়াতগুলিতে তাঁহাদের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে ঃ

"আমি সেই লোক যে-কোন আক্রমণ আমার বর্শার তীক্ষ্ণাগ্র
স্বর্ণ অঙ্গুরীয়কের ভিতর দিয়া ছুড়িতে পারিতাম ;
কিন্তু এখন আমার সৌভাগ্য-তারকা কর্তৃক পরিত্যক্ত ও ভাগ্য
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আমি নিজেই অঙ্গুরীয়ক বেষ্টিত ও
বন্দীকৃত হইয়াছি।
আমার সৌভাগ্য আমাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার পর আমার শিরস্ত্রাণ
ও উরস্ত্রাণ কি কাজে লাগিবে ?
বিজয়ের কলকাঠি কাহারও হাতে না থাকিলে বাহুর সাফল্য—হার
ভঙ্গের চেষ্টায় কোনই ফায়দা হইবে না।"

হায়দার কুলী খাঁ দুইজন আহত আমীরকে একই হস্তীতে চড়াইয়া বাদশাহের নিকট লইয়া গেলেন ; এই শাহজাদা ছিলেন অনেকটা সদয় প্রকৃতির লোক। তিনি তাঁহাদের দিকে একবার করুণার সহিত চাহিয়া উভয়কেই হায়দর কুলী খাঁর হেফাযতে দিয়া এরূপ স্মরণীয় বিজয়ের জন্য বাদশাহী নহবৎ বাজাইবার আদেশ দান করিলেন। পরাজিত বাহিনীর কোন কোন দল পালাইয়া গেল, কেহ কেহ বা বিজয়ী দলের শামিল হইল। এই অনিশ্চয়তার মুহূর্তের সুযোগ লইয়া গাযীউদ্দীন খাঁ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আবদুল্লাহ খাঁর মালপত্রের মধ্যে যাহা তখনও লুণ্ঠিত হয় নাই, তাহার যতটা পারিলেন, বোঝা বাঁধিয়া লইয়া দিল্লীর দিকে পালাইয়া গেলেন। অথচ সেই মুহূর্তে বিজয়ী দলের সেনাপতিবৃন্দ ও কর্মচারীরা তাঁহাদের নজর দিতেছিলেন এবং এরূপ গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভের জন্য পরস্পরকে অভিনন্দিত ও আল্লাহ্‌র শুকরগুজারি করিতেছিলেন। শত্রুর শিবির ও মালপত্রের যাহা কিছু ব্যাপক লুণ্ঠনের হাত এড়াইতে পারে, তাহা বাদশাহের ব্যবহারার্থ রক্ষিত হইল।

বিশ্বাসী ও প্রামাণিক ব্যক্তিরা এক বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করিয়া থাকেন ; উহা তখন সাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। সায়্যিদ ও তুরানী দলের মধ্যে দলাদলির সূচনায় আবদুল্লাহ খাঁর জনৈক ভক্ত জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণীতে দক্ষ কোন বিদ্বান লোকের গৃহে গমন করিয়া এই বিরোধের ভবিষ্যৎ ও এই অভিযানের সফলতা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করেন। সেই

দার্শনিক ব্যক্তি কোন অভিসন্ধি না করিয়া প্রশ্নকর্তার ব্যবহৃত শব্দগুলি হইতেই তাহার উত্তর বাহির করেন; তাহা নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি বলিয়া দেখা যায়ঃ গাইন, লাম, বে, আইন, দাল, ওয়াও ও কাফ। স্বাভাবিক নিয়মে এগুলি একত্র করিলে 'গালুব আদুবুকা' শব্দ পাওয়া যায়। ইহার অর্থ তোমার শত্রু জয়ী হইবে। উল্টাইয়া পড়িলে ইহার অর্থ দাড়ায়, তোমার শেষ সময় উপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী ঘটনায় এই শব্দগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই। খুব কম ভবিষ্যদ্বাণীই এত সৌভাগ্যজনক প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, সুলতান ইব্রাহীম পলাইয়া গেলে শত্রুরা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় তাহার পূর্ব কক্ষে পাঠাইয়া দেয় এবং ৩০ ঘণ্টার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পূর্ণ জয়লাভ ঘটে।

যুদ্ধের ভাগ্য সম্বন্ধে আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী

এরূপ একটা চূড়ান্ত যুদ্ধের সংবাদ ১৪ই মুহর্‌রম শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে পৌঁছিলে অসংখ্য লোক তাহাতে উল্লসিত হইল, পক্ষান্তরে অজস্র অন্য লোক বিস্ময়ের সমস্ত ক্ষণিক যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইল। বাদশাহের ভক্তবৃন্দ ঐ সুখকর সংবাদ জনসাধারণের নিকট বিজ্ঞাপিত করার জন্য কেল্লার বাদশাহী নহবৎ বাজাইবার আদেশ দিল। পক্ষান্তরে নিহত তিন সায়্যিদের পরিবার ও গৃহবাসীরা তাহাদের শোকানুষ্ঠান [৩৮] পুনরারম্ভ করিল। ব্যক্তিগতভাবে আবদুল্লাহ্ খাঁর তিন ভ্রাতার রমণীরা বিষাদ ও অনির্বচনীয় দুঃখের সর্বাপেক্ষা ক্লেশকর চিত্র প্রদর্শন করিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীরা (বিশৃঙ্খলার ফলে এত অধিক সুযোগ ছিল যে) মূল্যবান যাহা কিছু সম্মুখে পাইল, তাহাই দুহাতে লইয়া নোংরা কাপড় ও সাদাসিদা বোরকা পড়িয়া পালাইয়া গেল। পুলিশ গৃহ দখল করার বিষয় চিন্তা করার কিঞ্চিৎ পূর্বেই তাহারা পলায়ন করিল। এই সকল রমণীর কয়েক জন তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ পুলিশ কর্মচারীদের হাতে পড়িল, কয়েক জন নিরাপদে পালাইয়া গেল। আবদুল্লাহ্ খাঁর বংশ বা শয্যাসঙ্গিনী মহিলাদের কেহ গৃহ হইতে নড়া দূরের কথা, তাঁহারা বরং সতীত্বের আশ্রয়স্থানে গমন করিলেন। ভদ্রতা ও লজ্জাশীলতার অবগুণ্ঠনে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া তাঁহারা চক্রাকারে ক্রন্দন করিতে বসিলেন। তাঁহাদের কেহই নড়িতে চাহিলেন না; এখন

যে দুঃখময় দৃশ্যের অবতারণা হইল, তাহার সুযোগ লইতে চাহিলেন না। আবদুল্লাহ্ খাঁ ছিলেন আবদুল্লাহ্ খাঁ কাশীর পুরাতন বন্ধু ও হিতৈষী মনিব। এই লোকটির উপর তিনি তাঁহার স্ত্রীগণ, মহিলাবৃন্দ ও হারেমের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করেন। কিন্তু সে তাহার উপকারকের সর্বনাশের কথা শুনিতে পাইবামাত্র এমন কি সাধু ব্যক্তি ও ভদ্রলোক হিসাবেও তাহার নিকট যাহা প্রত্যাশা করা হয়, তাহার সমস্তই ভুলিয়া গেল এবং এত দুঃসাহসের পরিচয় দিল যে, ঐ সমুদয় পবিত্রসীমার মধ্যে অপবিত্র পদক্ষেপ করিল। যুগপৎ তাহার কুখ্যাত লালসা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ অর্থলিপ্সা প্রকাশ করিল। অচিরে প্রহরীদের হিন্দু[৫৩] সর্দারের সহিত তাহার একটা বুঝাপড়া হইয়া গেল। মহিলা মহলের ভিতর প্রবেশ করিয়া এই দুই হতভাগা যে সকল লোক ও জিনিসপত্রের উপর তাহাদের থাবা বসাইতে পারিল, তাহাই ধৃত করিয়া বহিয়া লইয়া গেল। সেই মুহূর্ত হইতে এই নরাধম ঘৃণার অঙ্গুলী দ্বারা তাহার আল্লাহ্‌র নিকট স্বধর্মত্যাগী, তাহার মনিব বন্ধুর নিকট বিশ্বাসঘাতক এবং মানব জাতির সর্বাপেক্ষা পবিত্র অধিকারের উপর আক্রমণ-কারীরূপে বরাবর নির্দেশিত হইয়া থাকে। যে ভাগ্য এখন এই অসহায় পরিবারের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহা ইহার যে কোন সদস্যের চেষ্টা নিষ্ফল করিতে অভিলাষী বলিয়া বোধ হইল। গোলাম আলী খাঁ ও নজাবত আলী খাঁ নামক আবদুল্লাহ্ খাঁর দুইজন ভাগিনেয় তাঁহাদের পোশাক বদলাইয়া ও মুখমণ্ডল পরিবর্তন করিয়া তাঁহাদের জন্মস্থান জানমিতা শহরে পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহারা বাধাপ্রাপ্ত ও বাদশাহের নিকট নীত হন।

তাঁহার মনিব ও বন্ধুর সহিত আবদুল্লাহ্ খাঁ কাশীর ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতা

অপরিবর্তনীয়রূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত এবং যাবতীয় অধীরতা ও চিন্তা বিমুক্ত হইয়া এই শাহজাদা এখন যে সকল সেনাপতি ও আমীর এত চমৎকার-রূপে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন, তাহাদিগকে পুরস্কৃত করার উপায়ের দিকে তাঁহার চিন্তা নিয়োজিত করিলেন। যাহাদের সোনালী স্বভাব ও নির্ভে-জাল বিশ্বস্ততা বিগত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জ্বলন্ত মৃন্ময় মুঠিতে পরীক্ষিত হয় এবং বিশুদ্ধ মানের বলিয়া দৃষ্ট হয়—তাঁহারা এখন প্রতিষ্ঠা ও অনুগ্রহের সূর্য্যালোকে

উদ্ভাসিত, বিবিধ উপাধি ও পদ দ্বারা সম্মানিত এবং শ্রেষ্ঠতর পদমর্যাদা দ্বারা পুরস্কৃত হইলেন। ১৬ই মুহর্রম সেই চিরস্মরণীয় স্থান হইতে বাদশাহের শুভ-যাত্রার তারিখ নির্ধারিত হওয়ায় তিনি বিজয়ের শুভ্রঅশ্বে আরোহণ করিলেন এবং ইহার বল্গা তাঁহার সাম্রাজ্যের রাজধানীর দিকে ফিরাইলেন। তিনি এত ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁহার দূরত্ব হ্রাস ও যাত্রা ত্বরান্বিত করিলেন যে, ১৯শে তারিখেই তিনি নিজামুদ্দীন আওলিয়ার স্মৃতিসৌধে পৌঁছিলেন; এই পীঠস্থানে তিনি নামাজ আদায় করিলেন এবং তাঁহার প্রত্যেকটা অনুচরকে অনুগ্রহ ও সদাশয়তা প্রদান করিলেন। শুভক্ষণের প্রত্যাশায় এখানে তাঁহার দুই দিন কাটিল। এই সময় তিনি হায়দর কুলী খাঁর পদমর্যাদা এক হাজার সওয়ার দ্বারা বাড়াইয়া দিলেন; ফলে তিনি কার্যতঃ ৭০০০ সৈন্যের সেনপতিত্ব-সহ আট হাজারী মনসবদার হইলেন। সাদৎ খাঁ বাহাদুর জঙ্গ বা যুদ্ধে সাহসী উপাধিতে ভূষিত এবং মাহী বা মৎস্য[৬০] চিহ্ন দ্বারা শোভিত হইলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকটা বন্ধু ও অনুচরের উপর বিবিধ সম্মান ও পদ বর্ষিত হইল। বাদশাহ যখন শ্রেষ্ঠতর পদ মর্যাদা ও প্রাধান্য অর্পণ করিতেছিলেন, তখন নজাবত আলী খাঁ তাঁহার নিকট আনীত হইলে তিনি করুণ দৃষ্টিপাত দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে হায়দর কুলী খাঁর হেফাজতে প্রদান করিলেন।

এই সমস্ত বিষয় শেষ হইলে এবং রাজধানীতে বাদশাহের প্রবেশানুষ্ঠান ঠিক করা হইলে তিনি মনে করিলেন প্রজাদিগকে দর্শন দানের এখনই উপযুক্ত সময়। এই শুভ ঘটনা ঘটিল ১১৩৩ হিজরীর ২২শে মুহর্রম শনিবারে। এত ধুমধাম ও আড়ম্বরের সহিত ইহা সম্পন্ন হইল যে, নির্মল দিনের সূর্যকিরণের মধ্যেও সমস্ত দর্শকের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল; পক্ষান্তরে

রাজধানীতে মুহম্মদ শাহের আড়ম্বরপূর্ণ প্রবেশ

অসংখ্য ঢাক ও দামামার মিশ্রিত শব্দে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া গেল। বাদশাহের অনুচরদের অগ্রপশ্চাতে চলিল স্বর্ণ-রৌপ্যের সাজসমুজ্জল উচ্চ হস্তী, স্বর্ণ-বস্ত্র পরিহিত সুন্দর দাস—বালক ও যুবক; স্বর্ণ-সিংহাসন ও বাদশাহী কুরসী এবং মণিমুক্তার কাজ সমন্বিত শিবিকা; বুটিদার চিহ্ন এবং তুল্য চমৎকার ও মনোরম পতাকা এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের কিংখাব পরিহিত

দলে দলে ভৃত্য ; এই সমুদয় কিংখাব হইতে এমন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল, যার তুলনায় সূর্যকিরণের মূল্য কমিয়া গেল। এ সমুদয় যুদ্ধের ব্যূহে সজ্জিত কুচকাওয়াজকারী সৈন্যদল ও সারি সারি সেনাপতি ও আমীরের পৃথক পৃথক দলের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহাদের সকলেই ছিলেন সুবিধাজনকরূপে আরূঢ় এবং তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রের উজ্জ্বলতা ও তাঁহাদের পোশাকের মহার্ঘতায় প্রসিদ্ধ। স্বর্ণ ও মণিমুক্তার কলাই করা জিনশোভিত সর্বাপেক্ষা সুদর্শন কতকগুলি অশ্ব ইতঃপূর্বেই দূর হইতে বাদশাহের আগমনবার্তা ঘোষণা করিতেছিল। এখন এই শাহজাদা যৌবন ও রূপের সমস্ত মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া একটা পর্বতপ্রমাণ হস্তীতে আরোহণ করিয়া এবং প্রচুর মণি-মাণিক্য ও মনোরম অলঙ্কারে সমুজ্জ্বল সিংহাসনে বসিয়া দর্শন দিলেন। মুঠি মুঠি স্বর্ণমুদ্রা ছিটাইতে ছিটাইতে তিনি আজমীর-দ্বার দিয়া অগ্রসর হইলেন। অজস্র দরিদ্র লোক এরূপ শুভলগ্নের প্রত্যাশায় এত দিন ধরিয়া চক্ষুস্থির করিয়া রাখিয়াছিল ; এবম্বিধ দীর্ঘ-বিস্মৃত বদান্যতায় এখন তাহারা ধনবান হইয়া গেল। দিনের বেলা ৫টার বিজয়ী মুহূর্তে তিনি বাদশাহী দুর্গে উপনীত হইয়া তাঁহার মহিমান্বিত মহলে অবতরণ করিলেন। তাঁহার মাতা কাদেসিয়া সাধ্বী শাহজাদীও উচ্চতম খ্যাতিসম্পন্না মহিলা সহচরী লইয়া হারেমের ভিতর দরজায় তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাজ্ঞী-মাতা কয়েক প্রকারের স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা ও বিবিধ রত্ন ও মূল্যবান মণি-মুক্তাপূর্ণ স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসনে লইয়া তাঁহার মস্তকের তর্পণ স্বরূপ সমস্ত ঢালিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার দীর্ঘ সমৃদ্ধিশালী রাজত্ব কামনা করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে পবিত্র বাদশাহী-ভবনে প্রবেশ করাইলেন।

বাদশাহী হারেমে তাঁহার প্রবেশকালে অসাধারণ অনুষ্ঠান

ইংরেজী সংস্করণের টীকা

(১) সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে বখশীর পদ যুগপৎ সামরিক ও বে-সামরিক এবং ইউরোপে মেজর জেনারেল পদের তুল্য।

(২) সাহেব কুরণ অর্থ বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের সম-সূত্রে অবস্থানের মালিক; ইহা বরাবরই বিজয়-সূচক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই গ্রহদ্বয়ের এরূপ সম-সূত্রে অবস্থানকালে কেহ ভূমিষ্ট হইলে তিনি সফলকাম নরপতি বলিয়া পরিচিত হন। ইতিহাসে সাহেব কুরণ নামে বিখ্যাত মাত্র তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা হইতেছেন—প্রথম তাইমুর, দ্বিতীয় ভারত সম্রাট শাহজাহান ও তৃতীয় নাদীর শাহ্। ইউরোপে তাইমুর (তৈমুর লং) অর্থাৎ খোঁড়া তাইমুর হইতে তেমার লেন নামে পরিচিত।

(৩) চৌথ শব্দের অর্থ এক-চতুর্থাংশ।

(৪) দেশ মুষ্কী—অর্থ দশম মুষ্টি।

(৫) নিজামুল মুল্‌কের প্রথমবার দাক্ষিণাত্যে গমনের কথাই এখানে বলা হইতেছে; দ্বিতীয় বারে তিনি নিরঙ্কুশ রাজা হিসাবে ৩৮ বৎসরের কম রাজ্য শাসন করেন নাই।

(৬) পিতা যে কেহ হউক না কেন, সায়্যিদানীর সন্তানকে শরীফ বলে। পক্ষান্তরে মাতা যে-ই হউক না কেন, সায়্যিদ পিতার ঔরষজাত হইলেই সে সায়্যিদ হয়। খোরাসানের নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা ইরান বা পারস্যের সর্বপূর্ব প্রদেশ এবং সাম্রাজ্যের ছয়টি বৃহৎ বিভাগের অন্যতম।

(৭) সেদিন সমস্ত লোকে শহরের বাহিরে খোলা মাঠে গিয়া মুক্ত বায়ুতে প্রার্থনা করে।

(৮) কিছু স্বর্ণমুদ্রা সহ মেয়েটিকে তাঁহার মায়ের নিকট ফেরৎ দেওয়ার বিষয়টি গ্রন্থকার বর্ণনা করেন নাই।

(৯) উপমহাদেশে এক প্রকারের নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য আছে; তাহাদের কাজ হইল কোন গল্প-উপাখ্যান বলিয়া লোককে ঘুম পাড়ানো; এগুলি

তাহারা মুখে মুখে শিক্ষা করে। হারেমে ইহা মেয়েদের কাজ; সর্বোচ্চ সমাজে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে বলিয়া তাহারা পুরুষের চেয়ে অধিক মর্যাদার চক্ষে নিরীক্ষিত হয়।

(১০) দুইটি দর্শনাগার (দেওয়ান) ছিল—একটা আম (সাধারণ) ও আর একটা খাস (বিশেষ)। শেষোক্তটি ছিল গোসল খানায় বা স্নানাগারে অর্থাৎ অন্দর মহলে। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ; সময় সময় তাঁহাকে মীর-আতিশা বা আগুনের আমীর বলা হইত, কিন্তু সর্বদা নহে। দিল্লী দুর্গের চতুর্দিকে তিনি প্রহরী বসাইতে পারিতেন; বাদশাহের প্রাসাদ এই দুর্গাভ্যন্তরেই অবস্থিত ছিল।

(১১) বারটি স্তম্ভের উপর নির্মিত একটা পটমণ্ডপ হইতে (উপমহাদেশে ইহা সাধারণ) অথবা যেদিক হইতেই আসুক না কেন, টাট্‌কা বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে বারটি খোলা বারান্দাযুক্ত ছিল বলিয়া প্রাসাদটির এই নাম হয়; ইহার নামের অর্থই তাই।

(১২) কম্মুল শব্দের অর্থ মোটা পশমী কাপড়; কিন্তু ইহা উরস্ত্রানও বুঝায়। উপমহাদেশে তরবারির খাপসহ বালাপোষের উরস্ত্রান আছে, পশমেরও আছে; কতকগুলি কাঁচা রেশমের পরিত্যক্ত অংশে ভর্তি; এগুলি কেবল তরবারি ও বর্শা নহে, গুলীও প্রতিরোধ করিতে পারে।

(১৩) এই প্রহরিণীদের সংখ্যা ছিল কয়েক শত; তাহাদের অধিকাংশেরই অস্ত্র ছিল তরবারি ও ক্ষুদ্র ঢাল, কিন্তু কয়েকজন ছিল তীরন্দাজ বা বন্দুকধারী। সমগ্র তুরস্কে ও পারস্যে জর্জিয়ার মেয়েদের সৌন্দর্য লইয়া এত বেশী হৈ চৈ করা হইলেও অত্যন্ত বলিষ্ট ও মাংসল বলিয়া উপমহাদেশে তাহারা সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হয় না। সবেমাত্র মোটা হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এরূপ ক্ষুদ্রকায় কোমলাঙ্গিনী রমণীই এতদঞ্চলে বিশেষ পছন্দ সই। কিছু কালমুক বা তাতার ও জর্জিয়ান রমণী এবং কিছু কাফ্রী ও হাবসী রমণী লইয়া এই প্রহরিণীদল গঠিত হইত; উপমহাদেশে শেষোক্তদের বিশৃঙ্খলভাবে হাবেসী উপাধি দেওয়া হয়। বাঙ্গালায় সিরাজুদ্দৌলার হারেমে এরূপ একটা নারী প্রহরীদল ছিল।

(১৪) ইহা কোন বাজারের মধ্যস্থলে অথবা কোন দুর্গ বা প্রাসাদের উপরে নির্মিত একটা উচ্চ অট্টালিকা; বরাবর পাঁচটি পাকা গাঁথুনীর উপর নির্মিত হয় বলিয়া ইহাতে তিনটি বারান্দা থাকে; এজন্য ইহার নাম তিন পোলিয়াহ্‌; ইহা ইতর উচ্চারণ। অট্টালিকাটি ঠিক বিজয়-মিনারের ন্যায় দেখায়।

(১৫) এই শব্দগুলির অর্থ ধর্মের সূর্য, বৃদ্ধির জনক, রফীউদ্‌ দরজাৎ (উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন)।

(১৬) মাথা গুণতি কর ফ্রান্সে ২০ সোল হইতে ২০০০ লিভরে উঠে; খোদ যুবরাজকে ২০০০ লিভর ট্যাক্স দিতে হয়। কনভেনশনে অর্থাৎ মাথা গুন্‌তি কর নামে পাদ্রীদেরও ইহাও দান করিতে হয়; রুশিয়ায় ইহা একটা প্রধান কর, তুরস্কে ইহার পরিমাণ ৩½ হইতে ১১ ক্রাউন। ভারতে ইহা ছিল নগণ্য ব্যাপার, এখানে ইহাকে যিজিয়া বলা হইত এবং ইহার পরিমাণ কখনও প্রায় ৩½ ক্রাউনের বেশী ছিল না। মোগল আমলের শেষ ভাগে সমগ্র ভারতে ইহা উঠিয়া যায়; তখন হিন্দু বা কাফেরদের পার্থক্য করা হইত তাহাদের জামা দ্বারা; উহার ভাঁজ হইত বুকের উপরে বাম দিক হইতে ডাইনে, পক্ষান্তরে মুসলমানদের হইত ডাইন দিক হইতে বামে।

(১৭) সদরুস্‌সদুরের পদ ফ্রান্সের প্রধান ভিক্ষাদাতা, আরও যথাযথ-ভাবে রাজার পাপশ্রোতা পুরোহিতের পদের তুল্য; কেননা, যাজন-বৃত্তি ও ভূমি বিতরণের ভার শেষোক্ত ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত। ভারতবর্ষে সদরুস্‌সদর ছিলেন দাতব্যভূমি অর্থাৎ দুঃস্থ পরিবারগুলির জন্য আলাদা করা জমির তত্ত্বাবধায়ক। সমগ্র সাম্রাজ্যের এই সকল ভূমির মোট আয় কয়েক কোটি টাকার কম।

(১৮) তিনি ছিলেন রাণী বা ফর্‌রুখ সিয়ারের হিন্দু মহিষীর পিতা; জামাতার বিরুদ্ধে যোগদান করায় তিনি আরও ঘৃণিত হন।

(১৯) ইহা এক সায়্যিদের পক্ষে আর এক সায়্যিদের ও এক শিয়ার পক্ষে আর এক শিয়ার কথা। কিন্তু আমরা কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে দেখিয়াছি যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুসায়ন আলী খাঁ এই উক্তির ঠিক

বিপরীত মন্তব্য করেন; আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, তিনি অবিশ্রান্ত তাঁহার সেই ধারণা অনুযায়ী কার্য করিয়া যান; শুধু তাঁহার দেহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন অভিপ্রায় না থাকিলে তাঁহারা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া এত নিষ্ঠুররূপে মারপিট করার ও এত অযোগ্যভাবে আটক রাখার আদেশ দিতেন না।

(২০) ঐ আমীর আওরঙ্গযীবের দরবারে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেই বাদশাহের সহিত বন্ধু সম্পর্কে বাস করিতেন। তাঁহার ইতিহাসের লেখন-পদ্ধতি প্রদর্শনের জন্য তিনি খাসী বা ভীরু ও সতর্ক বা গুপ্ত উপাধি গ্রহণ করেন।

(২১) খঞ্জর তুর্কীদের বাঁকা ফলকযুক্ত বিশিষ্ট ছুরিকা; তাহারা ডাইন পাশে খাড়াভাবে ঝুলাইয়া ইহা বহন করে; তবে সময় সময় পারসিক এবং উপমহাদেশের লোকেরা ইহা বহন করে; শেষোক্ত লোকেরা বহন করে বাম পার্শ্বেও হেলাইয়া।

(২২) নিকোশিয়ার নামের অর্থ ফর্‌রুখ সিয়ারেরই অনুরূপ অর্থাৎ ধার্মিক প্রকৃতির।

(২৩) রওশন আখতারের অর্থ উজ্জ্বল তারকা অর্থাৎ উজ্জ্বল ভাগ্য।

(২৪) সলিমগড় দিল্লী দুর্গের মধ্যে ও এক কোণে একটি প্রকৃত দুর্গ ও প্রাকার।

(২৫) গ্রন্থকার ঐ শহরের নামের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন; ইংরেজীতে ইহার অর্থ বিজয়নগর।

(২৬) বিজয়ের জনক ও ধর্মের সাহায্যকারী।

(২৭) কাদেসিয়া শব্দের অর্থ সাধু। নওয়াব আরবী নায়েব বা সহকারী শব্দের বহুবচন মাত্র; ইহা প্রথমে শাসনকর্তা বুঝাইত, পরে শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা, এমন কি দরবার হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে ইহার অর্থ দাঁড়ায় রাজা। সুতরাং কয়েকজন ইংরেজ 'রাজা' শব্দ দ্বারা ইহার অনুবাদ করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। আমরা এখানে দেখিতে পাই যে, ইহা রাণীও বুঝায়।

(২৮) গঙ্গা ও যমুনা নদী। কোন ইউরোপীয় পাঠক যেন উপমহাদেশের এই সব নদীকে হেলা না করেন। বিশেষভাবে কেবল উপমহাদেশের সীমানার মধ্যেই গঙ্গার খাত ১৪০০ মাইলেরও অধিক; বিশেষতঃ বর্ষাকালে ইহার স্রোতের বেগ ঘণ্টাপ্রতি দশ মাইল, গভীরতা ৬।৭ বা ১০ ফ্যাদম (৪ হাত) ও অসংখ্য স্থানে প্রশস্ততা কয়েক মাইল।

(২৯) তুর্কি ভাষা ছিল তাইমূর বা তৈমূর লঙ্গের (খোঁড়া তাইমূর) মাতৃ-ভাষা আর হিন্দুস্থানী বাদশাহেরা ছিলেন তাঁহারই উত্তরাধিকারী ও বংশধর। কাজেই তাহাদের পক্ষে ইহা বুঝিতে পারায় অসাধারণ কিছুই নাই। মুহম্মদ আমীন খাঁ জাত তুর্ক (অর্থাৎ উজবেক তাতার) বা তাতার বলিয়া ইহা ছিল তাঁহার মাতৃভাষা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মোগল আমলে তুর্কির পরিবর্তে ফারসী হয় হিন্দুস্তানের সরকারী ভাষা, পক্ষান্তরে ঐ কয়েকশত বৎসর ধরিয়া ফারসীর বদলে তুর্কি হয় সমগ্র ইরান বা পারস্যে সরকারী ভাষা; সেখানে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটা প্রদেশে তুর্কি মাতৃভাষাও বটে।

(৩০) মুসলমানী বৎসরে দুইটি জমাদী ও দুইটি রব আছে; এগুলী ও অন্যান্য মাস চান্দ্র মাসের ন্যায় ২৯ হইতে ৩০ দিনে হয় (বৎসর হয় ৩৫৫ দিনে)।

(৩১) সবুজ পাগড়ী ও রঙ লইয়া তুর্কীরা এত ঢাকঢোল পিটাইলেও তাহা হযরতের পোশাকের রঙ ছিল না। দামেস্কের শাসনকর্তার নিকট হইতে তিনি যে জামা উপহার প্রাপ্ত হন, তাহা ছিল লাল ও শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত এবং তাঁহার দেহাবরক পরিচ্ছদ ছিল কাল; ইহা তাঁহার পোশাকের প্রধান মাপকাঠি ছিল না, ইাহা লালও ছিল না। উপমহাদেশে সবুজ ও লাল রঙ হইল শোকচিহ্ন। ধরা কঠিন এবং কখনও স্থায়ী হয় না বলিয়া হিন্দু বা অন্যেরা এরূপ রঙ পরিধান করা পছন্দ করে না। জামা বুক ঢাকে, কিন্তু নিমায় নহে। ইহা পেটিকোটের চেয়ে ৭।৮ বা ১০।১৫ গুণ প্রশস্ত; কলিকাতার দোস্ত মুহম্মদ খাঁর জামা ছিল মলমলের ওসবের ১০১ গুণ।

(৩২) ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইত। কারণ গরম আবহাওয়ার জন্য স্নানের প্রয়োজন; তদুপরি নরনারী নির্বিশেষে দিনে কয়েকবার হস্তমুখাদি প্রক্ষালন হিন্দুদের ধর্মের বিধান। পূর্বে প্রক্ষালন না করিয়া তাহারা মাংস ভক্ষণ বা পূজার্চনা করিতে পারে না।

(৩৩) ধার্মিক প্রভু।

(৩৪) রমযান মুসলমানদের রোযার মাস।

(৩৫) তিনি ছিলেন সায়িদ কাজে কাজেই হযরত আলীর বংশধর; শিয়ারা তাঁহাকে "সাহসীদের রাজা" বলিয়া ডাকিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ প্রাচীনকালের সমস্ত মুসলমান দরবেশই ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক লোক ও নির্ভীক যোদ্ধা। মুসলমানেরা রণ-বিমুখ দরবেশ পছন্দ করে না।

(৩৬) গোয়ালিয়র, গণ্ডিকোটা প্রভৃতি ভারতের আরও বহু দুর্গের ন্যায় সমগ্র জগতে জিব্রাল্টার ও মল্টোর যে সুবিধা, দওলতাবাদেরও সেই সুবিধা। এগুলি অনাক্রমণীয়। দওলতাবাদ একটা পর্বত লইয়া গঠিত; ইহা একটার উপর আর একটা, এরূপ তিনটা বেষ্টিত স্থানে বিভক্ত। পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত একটা ভূগর্ভস্থ পথ ভিন্ন এগুলির কোনটিতেই প্রবেশের উপায় নাই; একখানা মঠ ও একটা লোহার জাফরির সাহায্যে একজন মাত্র লোক ঐ গুপ্তপথে উপরের তলায় বা বেষ্টিত স্থানে উঠিতে পারে। নীচের তলা পাহাড়ের সহিত সমতলভাবে ভিতরে ও বাহিরে, ১০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত ইহা দুরারোহভাবে ক্রমনিম্ন; এই ভয়ঙ্কর দুর্গ-প্রাকার ৬০ বা ১০০ ফুট গভীর ও তুল্য প্রকাণ্ড কুম্ভীরপূর্ণ একটা পরিখা দ্বারা রক্ষিত। রক্ষী সৈন্য, পানি ও রসদ-পত্র এবং বোমাভেদ্য ও মাইন-অভেদ্য দ্রব্যের স্থান সংকুলানের জন্য সমগ্র পর্বত কাটিয়া ভূগর্ভে অনেক কক্ষ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(৩৭) এই মন্থর গতি ও মঞ্জিলের দূরত্বের স্বল্পতা এতদঞ্চলীয় মানুষের ধারণায় বড় লোকের আড়ম্বরের অপরিহার্য অঙ্গ, তাঁহার সঙ্গের অজস্র অনুচর তাঁহাকে নিরন্তর ধূম্রজালে জড়িত রাখে। কিন্তু বৃটিশ বিজেতারা এই

সমুদয় ধারণা উল্টাইয়া দিয়াছেন ; আদৌ কোন অনুচর না লইয়া যথাসাধ্যে তৎপরতার সহিত স্থান ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা ভারতীয়দিগকে ধূম্রমুক্ত আবহাওয়া উপভোগ করিতে শিখাইয়াছেন।

(৩৮) এই সমুদয় অনুষ্ঠানের একটা হইল বাদশাহের দেহ এক জোড়া সোনার পাল্লায় ওজন দেওয়া। আর এক পাল্লায় থাকে সোনা, পারদ, কৃত্তিম সুগন্ধ দ্রব্য, মেশ্‌ক, তুঁতিয়া, মত্ততাজনক ঔষধ (যথা আফিঙ, ভাঙ ইত্যাদি) গম যব, চাউল, বজরা, ডাল প্রভৃতি কয়েক প্রকার শস্য, লবণ, সিদ্ধ মাখন, লৌহ প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য ; পরস্পরের সহিত বিসদৃশ বলিয়া এগুলির কোন গূঢ় অর্থ বা এই সমুদয় বাহ্য সাদৃশ্যের নিম্নে কোন অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন থাকিতে বাধ্য।

(৩৯) সমস্ত সুদর্শন বহিরাগত লোককেই উপমহাদেশে মোগল বলা হয়। চেঙ্গীস খাঁ ও তাইমূর লঙ্গের অধীনে যে মোগল বাহিনী ভারত আক্রমণ করে, তাহাতে অসংখ্য ইরানী বা পারসিক থাকায় তাহা হইতে এই ভুলের উৎপত্তি। এতাবৎকাল পর্যন্ত ভারতীয়েরা উত্তরাঞ্চলের সমস্ত লোককে তুর্ক বলিত ; ইহাকে উচ্চারণ করিত তাহারা তোর্ক বলিয়া এবং সকলকে একই জাতির লোক বলিয়া বিবেচনা করিত। এখন হইতে তাহারা তাহাদিগকে মোগল উপাধি দেয় ; অবশ্য সময় সময় মোগল, তুরানী ও ইরানী বলিয়া পার্থক্যও করিত। বর্তমানে এশিয়ার লোকদের নিকট রোমান সাম্রাজ্যের যে অংশ পরিচিত, সেখানে যেসকল তুর্ক বাস করে, তাহারা রুমী বা রোমী বলিয়া অভিহিত হয় ; কিন্তু তুর্কেরা নিজেরা এই উপাধি দেয় রোমানিয়া ও আনাতোলিয়ার অধিবাসীদিগকে। ইউরোপীয়দের সকলেই অভিহিত হয় ফিরিঙ্গী বা ফরাসী বলিয়া।

(৪০) তাইমূর লঙ্গ ও চেঙ্গিস খাঁ বা উভয়েই চুঘতাই গোত্রের লোক।

(৪১) এশিয়াবাসীদের মধ্যে তুর্কীরা খাইতে বসিবার পূর্বে হাত ধুইয়া লয়। তাহাদের একখানা তোয়ালে থাকে ; আহারান্তে তাহারা সাবান দিয়া আবার ধোয়। কিন্তু ভারতীয় ও পারসিকদের তোয়ালে থাকে না ; তাহারা খাওয়ার পূর্বে ধোয়, পরেও ধোয়, কিন্তু কলাইর

ছাইলের গুঁড়ি দিয়া, তাহাতেই স্নানের সমস্ত কাজ সারে। খয়রাত খান এত অধীর হইয়া পড়েন যে, পানি ও কলাইর গুঁড়ার জন্ম তাঁহার তর সহে নাই; একখানা সাদা রুমালে তাঁহার কলমতরাশ ও ঘড়ী বা অনুরূপ কোন জিনিস বাঁধা থাকিত; তিনি তাহাই টানিয়া লইয়া তাহাতে মুখ মুছিয়া লন।

(৪২) সুলায়মান ইবনে দায়ুদ; দায়ুদের পুত্র সুলায়মান।

(৪৩) দাম বা পয়সা খুব পুরু তাম্র-মুদ্রা; বাজারে ইহার নানাপ্রকার মূল্য ছিল, কিন্তু খাজাঞ্চীখানায় ছিল বরাবরই এক টাকার $\frac{1}{40}$ ভাগ।

(৪৪) যুদ্ধে বিজয়ী।

(৪৫) কোতয়াল আংশিক সামরিক ও আংশিক বেসামরিক কর্মচারী—এক প্রকারের সাধারণ শান্তিরক্ষক বিচারপতি; কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা অনেক বেশী বলিয়া তাঁহার পদ প্যারিসের পুলিশের সহকারীর সমতুল্য। রাখিতে হইবে যে, দিল্লীর প্রাসাদগুলি ছাদ পর্যন্ত প্রস্তরনির্মিত: কড়িকাঠ ও আরকাঠগুলি প্রস্তরমণ্ডিত, প্রাচীর ও সাচ্ছদ্র প্রাচীর বেষ্টিত; এবং কারাগারের স্থায় রুদ্ধদ্বার ও সুরক্ষিত বলিয়া সবগুলিই প্রতিরোধে সমর্থ।

(৪৬) আবুল ফতেহ জহিরুদ্দীন তাঁহার উপাধি।

(৪৭) এই সমুদয় সৈন্ত সংগ্রহের দ্রুততা ও সফলতা হইতে আমরা দিল্লীর আকার ও জনপূর্ণতার অনুমান করিতে পারি। ইউরোপের কোন দেশই দশ বৎসর পূর্বে সংবাদ দিয়াও ৯০,০০০ অশ্বারোহীর একটা সৈন্তদলের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হইত না। তথাপি এই ৯০,০০০ সৈন্ত ছিল তাহাদের দুই লক্ষ খেদমতগার ছাড়া। আরও যে দুই লক্ষ লোক বাদশাহ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে শহরের বাহিরে আসে, তাহারা ছাড়া; আরও যে অজস্র লোক নিরপেক্ষ ছিল, তাহারা ছাড়া; ইহাদের সকলেই ছিল অন্যান্য শ্রেণীর যে অসংখ্য লোক সেই বিশাল নগরে জমা হয়, তাহারা ছাড়া এবং রমণী ও শিশু ভিন্ন কেবল সামরিক লোক। কাজেই যাহারা বলেন, দিল্লীর লোকসংখ্যা বিশ লক্ষ, তাঁহারা অতিশয়োক্তি করেন নাই; পর্যটকদের মধ্যে

যীশুইটরাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান লেখক; তাহাদের মতে ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে চীনের দুই রাজধানী পিকিং ও নানকিং এবং দিল্লী ও আগ্রার ইহাই ছিল জনসংখ্যা।

(৪৮) ঈদগাহ—ঈদের নামায আদায়ের স্থান।

(৪৯) রুস্তম ছিলেন ইরানের রাজাদের সেনাপতি ও আফরাসিয়ার তুরানের রাজা। দুইজনেই ছিলেন স্বনামধন্য বীর পুরুষ, কিন্তু রুস্তম ছিলেন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ; আফরাসিয়াব ইরান আক্রমণ করিতে আসিয়া বহুবার রুস্তমের হাতে নাকাল হন; অপরপক্ষে রুস্তম একাধিকবার তুরানে হানা দিয়া আফরাসিয়াবকে জব্দ করেন।

দ্রষ্টব্য: ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ও ৫৫ নং টীকা বাদ দেওয়া হয়েছে।

(৫৬) যে সকল তরঙ্গবৎ আন্দোলন বাঁট হইতে আগা পর্যন্ত পারসিক বা ভারতীয় করবাল হইতে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় বলিয়া মনে হয়, এখানে পুনরায় তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে; এগুলি একটি বৃটিশ টাবীর পানির চেয়ে অনেক অধিক নিকটতর।

(৫৭) বাহাদুর শাহী ও আওরঙ্গজীবী উপাধির অর্থ তাঁহারা ঐ নামীর বাদশাহের অধীনে চাকরী করেন।

(৫৮) এই সমুদয় শোকানুষ্ঠান মুহর্‌রমের সপ্তম রাতে শেষ হওয়া উচিত। এই রাত্রকে শব-ই কতল বা হত্যা-রজনী বলে; এই সময় প্রথম সায়্যিদ হুসায়নের মৃত্যু নাটকীয় পদ্ধতিতে নাটকীয় দৃশ্যে প্রদর্শিত হয়। ভক্তদের হাহুতাশে এবং শবাধার, বরং গোঁয়ারা কবরে বহিয়া নিতে আরও দুই দিন এবং রন্ধন করা খাদ্য নিজেদের ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণে আরও তিন দিন লাগায় সর্বশুদ্ধ ১২/১৩ দিনের দরকার হয়।

(৫৯) গোত্রের বাহিরের রমণী সংসর্গ করিলে পরলোকে হিন্দুদের সমস্ত নরকবাসের আদেশ হয় এবং ইহকালে অগ্নি ও জল নিষিদ্ধ হয়; তাহারা এমনকি তাহাদের জল, জল পাত্র বা তাহাদের ছুরি স্পর্শ করিতে বা তাহাদিগকে পরিবেশন করা হইয়াছে, এমন কিছু স্পর্শ করিতে পারে না; তজ্জন্য ভারতের বড় লোকেরা অপর যে

কোন লোক অপেক্ষা তাহাদের রমণীদের জন্য হিন্দু প্রহরীই সমধিক পছন্দ করিত।

(৬০) এই চিহ্ন হিন্দুস্তানে অত্যন্ত বিরল হইলেও দাক্ষিণাত্যে সমধিক সাধারণ। ইহা হইল বর্শাগ্রে সমতলভাবে স্থাপিত ৪ ফুট লম্বা একটা গিল্টি করা তাম্র নির্মিত মৎস্য; এই চিহ্ন বরাবরই আর একটা চিহ্নের সহিত যুক্ত থাকে; তাহা হইল একটা নরমুণ্ড, উহাও তাম্র নির্মিত, গিল্টি-করা; অনুরূপভাবে বর্শাগ্রে সমতলভাবে বাহিত।

তৃতীয় অধ্যায়

[দরবারে পদোন্নতি—উজীরের মৃত্যু—মৃতের বিপুল সম্পত্তির সরকারে পুনরাবর্তনে বাদশাহের অস্বীকৃতি—জনৈক পারসিক ভাগ্যান্বেষী কর্তৃক একটি অদ্ভুত নব ধর্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা—বন্যায় কর্ণাট বিধ্বস্ত—গুজরাটে, আজমীরে, কাবুলে ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অশান্তি—অধিকতর সহজলভ্য হওয়ার জন্য বাদশাহের বিচিত্র কৌশল—তাঁহার দ্বার পরিগ্রহ—উজীর নিযুক্ত হইয়া দরবারে সংস্কার প্রবর্তনের জন্য নিজামুল মুল্‌কের ব্যর্থ চেষ্টা—তাঁহার গাম্ভীর্য হইতে উদ্ধার লাভের জন্য তাঁহাকে গুজরাটের শাসন কর্তৃত্ব দান—খুকী নামক জনৈক মেয়ে নারী-মন্ত্রী হইয়া বাদশাহ্‌কে উপহাস করেন—দরবারে স্ত্রৈণতা ও বিশৃংখলা—বাদশাহের উপেক্ষা পরায়ণতা—একদিকে বাদশাহ্‌ ও অন্য দিকে তাঁহার সহকারী নিজামুল মুল্‌কের মধ্যে তলে তলে যুদ্ধ—নিজামুল মুল্‌ক কর্তৃক মুবারিজ খাঁর পরাজয় ও যেন বাদশাহী পক্ষের জয়লাভ হইয়াছে এমনভাবে দরবারে সম্ভাষণমূলক নজর প্রেরণ—ভূতপূর্ব উজীর আবদুল্লাহ খাঁকে বিষ দান—দরবার হইতে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া সরবুলন্দ খাঁ কর্তৃক নিজামুল মুল্‌কের সৈন্যদের পরাজয় ও তাঁহার হস্ত হইতে গুজরাট অধিকার—সরবুলন্দ খাঁর সহকারী নজমুদ্দীন আলী খাঁ কর্তৃক মারাঠাদের সহিত কঠোর আচরণ—কতিপয় প্রিয়পাত্রের বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াফত—বিজয়ী সরবুলন্দ খাঁ উপেক্ষিত ও অন্য লোকের দ্বারা গদীচ্যুত—তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া একাকী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন—নিজামুল মুল্‌কের প্ররোচণায় হিন্দুস্তানে মারাঠাদের রাজ্য জয়—মালবের শাসনকর্তা কর্তৃক প্রবল উদ্যমে তাহাদের প্রতিরোধ—মারাঠাদের গুজরাট ও মালব জয়—রহিম খাঁ কর্তৃক বীরত্বের সহিত আসন্ন বিপদ হইতে তাঁহার পিতা মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের উদ্ধার—হিন্দুদের হস্তে জনৈক হাজীর হত্যার দরুন দিল্লীতে রাজদ্রোহ—মারাঠাদের লুণ্ঠন অব্যাহত—সমগ্র হিন্দুস্থানে এক ছোঁয়াচে পূঁতিগন্ধের বিস্তার—দিল্লীতে ভীষণ তুষারপাত ও নদীর পানি জমাট—মারাঠাদের বিরুদ্ধে হাস্যকর অভিযান—দিল্লী ও

উহার উপকণ্ঠে তিনঘণ্টা ব্যাপী ভীষণ বৃষ্টিপাত—কোরার জমিদার আজাজোর সহিত অত্যাচার—তাঁহার শাস্তি—বাঙ্গালায় বিপ্লবের ভূমিকা—আলীবর্দী খাঁর পরিবারের উৎপত্তি ও উত্থান—চরম দুর্দশাপন্ন হইয়া অতিকষ্টে অর্থ সংগ্রহ করিয়া উড়িষ্যার শুজা খাঁর দরবারে গমন—সেখানে চাকরী লাভ এবং নিজেকে ভাল সৈনিক ও ভাল অর্থবিদ বলিয়া সপ্রমাণ—বাঙ্গালার সুবাদার জাফর খাঁ কর্তৃক স্বীয় দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর জন্য সনদ আনয়নের বাসনা, কিন্তু তাঁহার জামাতা শুজা খাঁ কর্তৃক তদীয় স্থানাধিকার—সরফরাজ কর্তৃক পিতার বশ্যতা স্বীকার—শুজা খাঁর চমৎকার চরিত্র—আলীবর্দীর আত্মীয়দের সরকারী চাকরীতে পদোন্নতি দান—আলীবর্দী খাঁ আজিমাবাদের নায়েব নাজিম নিযুক্ত ও নিজ দৌহিত্র মির্জা মুহম্মদ ওরফে সিরাজুদ্দৌলাকে দত্তক গ্রহণ—তাঁহার চমৎকার শাসন—উজীর ও খান দুরান কর্তৃক মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান—সাহস ও প্রতিভায় তাঁহাদের হীনতা—মারাঠাদের বিরুদ্ধে কেবল সাদৎ খাঁরই সাফল্য লাভ—বাদশাহী সেনাপতিদ্বয় কর্তৃক তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ—বাদশাহী বাহিনীর পশ্চাৎদিক ঘুরিয়া মারাঠাদের রাজধানীর শহরতলী লুণ্ঠন—সমস্ত পরিষদসহ মারাঠাদিগকে কর দানে বাদশাহের সম্মতি—সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রবীণ অনুচর সইফ খাঁ জায়গীর হইতে বিতাড়িত ও নিহত—জানমিতা শহর উৎসন্ন—ইহার মর্মস্পর্শী বিবরণ—বায়ুমণ্ডলে আল্লাহ্‌র ক্রোধজ্ঞাপক ভয়াবহ নিদর্শন।]

লাহোরের সুবাদার আবদুস সমদ খাঁ, তাঁহার পুত্র যাকারিয়া খাঁ, তাঁহার সেনাপতি ও সহকারী আমীর খাঁ এবং আরও কতিপয় শরীফ ব্যক্তিসহ পূর্বেই যাত্রা করেন, কিন্তু যথা সময়ে পৌঁছিতে পারেন নাই। এই অনুষ্ঠানের অল্পকাল পরে তিনি কুর্নিশ করায় সম্মানের অনুমতি পাইলেন। তাঁহাকে এক প্রস্থ খেলাত, একটা রত্নমালা, একখানা ছোরা ও অপর কয়েকটা শ্রেষ্ঠ উপহার দানে প্রসিদ্ধ করা হইল। জয় সিং ও রাজা গুর্দ-হরও সময়মত পৌঁছিতে পারেন নাই ; সকলের প্রথম ভাগে তাঁহারা বাদশাহের হুজুরে ভূমি চুম্বকের সুখের অধিকার পাইলেন ; তাঁহাদের অপরাধ ও অতীতের ভুলত্রুটি ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করা হইল। অল্পকাল পরে হিন্দুদের

উপর যিজিয়া কর বলবৎ করার জন্য ফরমান জারি করা হইল, কিন্তু জয়সিংহ তাহাদের পক্ষে পরিপাটিরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাহা মাফ করা হইল। বাদশাহকে তাঁহার জয়লাভে আনন্দিত এবং তাঁহার দীর্ঘ জীবন ও সমৃদ্ধ রাজত্ব কামনা করিয়া প্রেরিত নিজামুল মুল্কের পত্র তিনি এক নজর দেখিয়া সম্মানিত করিলেন; বাঙ্গালার সুবাদার মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁহার জয়লাভে মুবারকবাদ দিয়া তাহার দীর্ঘ জীবন ও রাজত্ব কামনা করিয়া এবং ঐ প্রদেশের রাজস্ব ও নজর স্বরূপ আর একটা মোটা অঙ্কের আগমন সংবাদ দিয়া অপর একখানা আরজী প্রেরণ করেন; তাঁহার উপরও বাদশাহ চোখ বুলাইয়া লইলেন। কয়েকজন আমীরকে সেদিন সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করা হইল। হায়দর কুলী খাঁ ইতঃপূর্বেই নাসিরজঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত হন। তদুপরি এখন তাঁহাকে মুবেজুদ্দৌলার [১] উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হইল। জাফর খাঁও অনুরূপভাবে রোশনুদ্দৌলাহ্ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সাদৎ খাঁ দেহরক্ষী দলের তত্ত্বধায়ক পদ পাইলেন; পদচ্যুত এনায়েত খাঁর স্থলে যাকারিয়া খাঁ কাশ্মীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ২২শে রবিউল আউয়াল মঙ্গলবার বাদশাহ একদল শিকারীর সহিত বাহিরে গমন করিলে একজন হরকরা সংবাদদাতা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, তাঁহার উজীর মুহম্মদ আমীন খাঁ অকস্মাৎ তাঁহার পেটে এত যন্ত্রণাদায়ক ব্যথায় আক্রান্ত হইয়াছেন যে, বাদশাহের লাগাম ধরিবার সৌভাগ্য তাহার হইবে না। মুহূর্তে মুহূর্তে বেদনা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এত অধিক হইয়া দাড়াইল যে, চিকিৎসক ও কৌশলী লোকদের রোগ-নিবারক ঔষধে কোনই ফল হইল না। তাঁহার ভীষণ বমি হইল; তিনি শূন্যতার দিকে তাঁহার বিদ্যমানতার পোশাক নিক্ষেপ করিলেন। তিন মাস ২২ দিনের ক্ষণস্থায়ী ওজারতের পর ঐ একই মাসের ২৯ তারিখে তিনি চিরস্থায়ী নিবাসের দিকে গমন করিলেন। হুসায়ন আলী খাঁর ঐশ্বর্য বাজেয়াপ্ত ও তাহার সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত হস্তগত করায় এবং কয়েকটি সঞ্চয় ও লাভের দরুন তাঁহার ভূসম্পত্তি বিপুল পরিমাণে ফাঁপিয়া উঠে; উহা এত বিস্ময়কর রূপে বৃহৎ ছিল যে, কেবল কোটী কোটী টাকা দ্বারাই উহার মূল্য হিসাব করা চলিত; তথাপি উহা সম্পূর্ণরূপে তাহার উত্তরাধিকারীদের দখলে

উজীর মুহম্মদ আমীন খাঁর মৃত্যু

রাখা হয়। তবে তাঁহার মৃত্যুতে আল্লার বান্দারা এক সম্ভাব্য অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি লাভ করে। লোকে বলে, তাঁহার প্রাসাদ বর্ধিত এবং আরও অধিক জমি উহার প্রাঙ্গণের অন্তর্ভুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া তিনি তাঁহার একটিমাত্র আদেশে তাঁহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের[২] ৭০০ গৃহস্বামীকে বেদখল করেন। তাহাদের গৃহের চাবিগুলি তাঁহার কর্মচারীদের হস্তে অর্পণ করেন। তথাপি তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র কমরুদ্দীন আলী খাঁ এগুলি উহাদের মালিকদের ফিরাইয়া দেন। পিতার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার পরে তিনি এই ঘৃণাজনক হুকুম দখল পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিনিময়ে মানব-জাতির প্রশংসা ও আল্লার করুণা লাভ করেন। মুহম্মদ শাহকে সাধারণতঃ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও কৃপণতার জন্য দোষ দেওয়া হয়; কিন্তু এরূপ ব্যাপার উপলক্ষে কেহ হয়ত লক্ষ্য করিবেন যে, তিনি বাস্তবিকই সে প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয় সাম্রাজ্যে সর্বাংশ হইতে যে বিপুল অর্থ আমদানী করেন, তাঁহাদের বিপুল সৈন্যসংগ্রহ ও রণ-সজ্জায় তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়; তাঁহাদের সম্মুকে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সৈন্য দলের লুণ্ঠনকারিরা ও তাঁহার নিজ সেনাপতিরা তাহা লুটিয়া নেওয়ায় তিনি তদ্দ্বারা অতি সামান্যই উপকৃত হন। মুহম্মদ আমীন খাঁর মৃত্যুতে বাদশাহী কোষাগার অনেকটা শূন্য হইয়া যায়। ফলে দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান ই-খাসের শোভাবর্ধক স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রসাধনগুলি খুলিয়া নিয়া সেই বিপদের দিনে মোহরাঙ্কিত মুদ্রা তৈয়ার করিতে হয়; সেগুলির স্থান তখন পর্যন্ত পুরণ করা হয় নাই; অন্যান্য কক্ষগুলিসহ দেওয়াল দুইটিরও তৎক্ষণাৎ আগাগোড়া মেরামতের প্রয়োজন ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মৃত উজীরের সম্পত্তির তালিকা বাদশাহের হুজুরে দাখিল করা হইলে (কেবল স্বর্ণ রৌপ্য, মণিমুক্তা ও মূল্যবান বস্ত্র ধরিয়াই তাহার মূল্য কয়েক কোটি টাকা) তিনি তৎপ্রতি মনোনিবেশ না করিয়া সমস্তই স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীদের দখলে রাখার আদেশ দেন। তথাপি বাবর পরিবারের, বরং তাইমুর বংশের[৩] সমস্ত বাদশাহের অবধারিত প্রথা ছিল স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীদিগকে বাদ দিয়া তাঁহাদের মৃত মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য দখল করা; উত্তরাধিকারীগণকে

তাঁহার সম্পত্তির পুনরাবর্তনে বাদশাহের অসম্মতি

তাঁহারা যতটুকু অংশ পাওয়ার উপযুক্ত মনে করিতেন, অনুগ্রহ স্বরূপ বা তাহাদের মর্জি মাফিক ততটুকুই দান করিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা এমন এক প্রথা ও এমন এক আইন যাহা কোন মানুষ কোন ধর্ম, কোন ন্যায়বিচার অনুমোদন বা স্বীকার করিতে পারে না। যে লোকটি নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ও শোনিতপাত করিয়া জীবনভর তাঁহাদের চাকরী করিয়া, কেবল তাহাই নহে তাঁহাদের পদতলে ও তাঁহাদের স্বার্থে নিজের প্রাণপাত করিয়া, তাহার জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ এমনকি সমগ্র জীবন তাহাদের আদেশ পালনে পরিশ্রম ও সর্বপ্রকার কষ্ট স্বীকারে কাটাইয়া দেয়, তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পরিশ্রমের যাবতীয় সঞ্চয় দরবারে লইয়া গিয়া বাজেয়াফত করিবে, তাহার পুত্র-কন্যা, স্ত্রী, উত্তরাধিকারী, আশ্রিত লোকজন ও বন্ধু বান্ধবেরা আসন্ন দারিদ্র্যের চিন্তায় মগ্ন হইবে এবং তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের চেয়ে পরদিন কি খাইবে, তজ্জন্য উদ্বিগ্ন থাকিবে, ইহা এমনি ভীষণ অবিচার যে, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ লোকের মনও ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া বসিবে। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে অজস্র নজির থাকায় ঐ বংশে আজম শাহই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণরূপে ঐ রেওয়াজ পরিত্যাগ, এমনকি তৎপ্রতি ঘৃণা জ্ঞাপন করেন। তাঁহার একজন সর্বাপেক্ষা ধনবান মন্ত্রীর মৃত্যু হইলে প্রতিষ্ঠিত প্রথানুযায়ী তাঁহার সম্পত্তির একটি তালিকা বা হিসাব আজম শাহের খেদমতে পেশ করা হয়; কেবল রত্ন ও টাকায়ই ছিল তাহা বিপুল অঙ্ক। কাগজখানা দেখিয়া বাদশাহ স্তম্ভিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল; তিনি দৃঢ় ভাবানুবেগের সহিত তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ঐ প্রথা ও পাঠক উভয়ের প্রতিই ঘৃণা প্রকাশ করিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ কাগজ ও এরূপ বিবরণী তাঁহার নিকট পেশ করিয়া তাঁহার ঘৃণার সঞ্চার করিতে যে কোন লোককে নিষেধ করিয়া দিলেন। যুদ্ধ ও শোনিতপাত লইয়া এত অধিক ব্যাপৃত থাকার পর আমাদের মনোযোগ অবিলম্বে কতকগুলি ন্যূনতর মর্মন্তুদ, অথচ কৌতূহলোদ্দীপক প্রকৃতির ঘটনার প্রতি নিবদ্ধ হইতেছে।

ইরানের পবিত্র মেশহেদ[৪] নগরের অধিবাসী জনৈক মীর মুহম্মদ হুসায়ন নিজেকে যে সকল সায়্যিদ সেখানে রুজুভী বলিয়া অভিহিত হইতেন তাঁহাদের একজনের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন; সম্ভবতঃ ইহাতে সত্য

থাকিতে পারে। তাঁহার স্বদেশবাসী ইরানীদের প্রতি কাবুলের শাসনকর্তা উমাদুল মুল্‌ক আমীর খাঁর অত্যধিক সদাশয়তা ও দানশীলতার কথা (যে সদাশয়তার কথা লোকে অদ্যাপি সশ্রদ্ধ প্রশংসা ও বিস্ময়ের সহিত বলিয়া থাকে) শ্রবণ করিয়া শ্রেষ্ঠতর পদমর্যাদা ও অধিকতর ভদ্রোচিত জীবন যাপনের আশায় তিনি তাঁহার দেশীয় নগর ছাড়িয়া কাবুলে আগমন করেন। আরবী ভাষা, দর্শন এবং জ্ঞানের আরও কয়েকটা শাখায় শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া লোকে শীঘ্রই তাঁহার গুণের কথা বলাবলি করিতে আরম্ভ করে। তাঁহার শিক্ষায় উপকৃত হইতে ইচ্ছুক হইয়া আমীর খাঁর মুনশীর পুত্র নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাহাকে কিছুটা প্রসিদ্ধি দান করে। এভাবে ওস্তাদের নাম প্রায়ই আমীর খাঁর সাক্ষাতে প্রশংসার সহিত উল্লিখিত হইতে থাকে। কাজেই এরূপ লোককে দেখিবার জন্য তাঁহার বাসনা জন্মে এবং তিনি তাঁহার বেগম ও আলী মর্দন খাঁর° কন্যা সাহেবজীর নিকট তাঁহার নাম উল্লেখ করেন। এই উল্লেখের কারণ এই—সাহেবজীর নিজের কোন সন্তান ছিল না। এই অভাব হইতে নিজেকে সান্ত্বনা দানের জন্য তিনি তাঁহার স্বামীর দীর্ঘকালের কর্মচারী জনৈক সায়্যিদের কন্যাকে দত্তক গ্রহণ করেন; মেয়েটিকে তিনি বেশ যত্ন ও আগ্রহের সহিত শিক্ষাদান করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার স্বদেশ ইরানের কোন ধর্মনিষ্ঠ ভদ্রলোক ঘটনাক্রমে যখনই সেখান হইতে আসিবেন, তখন তাঁহার সহিত ইহার বিবাহ দেওয়া; তাঁহার ও তদীয় স্বামীর মধ্যে স্থিরীকৃত হয় যে, তাঁহাদের দুই জনের কেহ এরূপ কোন লোকের সন্ধান পাইলেই এই সংবাদ অন্যকে জ্ঞাপন করিবেন। সাহেবজী স্বয়ং স্বামীকে বিষয়টা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলেন। ঐ আমীর লোকটিকে কয়েকবার ডাকাইয়া আনিয়া তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পাল্লায় তাঁহার মূল্য ওজন করিয়া তৎপ্রতি এত স্নেহানুভব করেন যে, তিনি তাঁহার পত্নীর নিকট প্রশংসার সহিত তাঁহার নাম উল্লেখ করেন। এই বিবরণীতে সন্তুষ্ট হইয়া সাহেবজী তৎক্ষণাৎ বিবাহের আয়োজনের আদেশ দেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার কন্যাকে ঐ ধূর্ত লোকটির করে সম্প্রদান করেন। এই ঘটনায় আমীর খাঁর পরিবারে প্রবেশ লাভ করিয়া তিনি তাঁহার দরবারের প্রধান ব্যক্তিদের সহিত পরিচিত হন এবং কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন, এমন কি

একটি চাকরী ও প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পরে আমীর খাঁর সুপারিশক্রমে তাঁহাকে দরবার হইতে প্রসাধন দফততরের ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি নিজেও সাহেবজী ভিন্ন আমীর খাঁর অন্যান্য পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের সহিত হৃদ্যতা স্থাপন করেন। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনের কৃত্রিম গতির তুল্য বলিয়া তিনি অবশেষে অসাধারণ লোক বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকেন। তাঁহার পবিত্রতায় ও অলৌকিক ক্ষমতায় বহু লোকের বিশ্বাস জন্মে। আমীর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাদী আলী খাঁ ও অপর কয়েক ব্যক্তি ছিলেন ইহাদের মধ্যে—তাঁহাকে এমনকি তৎপ্রতি সর্বাপেক্ষা অনুরক্ত বলিয়া বোধ হয়। প্রায় এই সময় আমীর খাঁ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় দয়ার বাহুতে গ্রহীত হইলে তাঁহার পত্নী ও পরিবার দরবারে চলিয়া গেলেন। কিন্তু চাকরীর দরুন কাবুল শহরের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় মীর মুহম্মদ হুসায়ন সেখানেই রহিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে তিনি বাদশাহ্ এবং দরবারের প্রধান আমীর-ওমরাহদের ব্যবহারার্থ পেশোয়ারের[৬] গোলাব হইতে কিছু আতর, প্রচুর গোলাব-জল ও অন্যান্য সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাদশাহের সহিত পরিচিত হওয়ার ও দরবারে তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষার আশায় এগুলি লইয়া তিনি রাজধানীতে যাত্রা করিলেন। মনস্থির করিয়া তিনি কাবুল হইতে যাত্রা করিয়া লাহোরে গিয়া শুনিলেন, বাদশাহ্ আওরঙ্গযীব আর নাই। ঐ অপ্রত্যাশিত সংবাদে ঐ দিকে তাঁহার উচ্চতর পদ লাভের আশা বিনষ্ট হওয়ায় তিনি সেই শহরেই তাঁহার সুগন্ধিদ্রব্য উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিলেন। ইহাতে ৬০।৭০ হাজার টাকার মত মোটা অঙ্ক তাঁহার হাতে আসায় তিনি উহাকেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের জন্য পর্যাপ্ত মনে করিলেন। ফকিরী লেবাস পড়িয়া এবং গম্ভীর পবিত্র ভাব ধারণ করিয়া তিনি একটা নিজস্ব নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিলেন। পূর্বোক্ত মুনশীর পুত্রের মধ্যে অনেক বুদ্ধি ও বহু প্রতিভা আবিষ্কার করিয়া সর্বাগ্রে তিনি তাঁহাকে স্বীয় উদ্দেশ্যের সহকারী করিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, "একটা নূতন মযহাব উদ্ভাবনে আমাদের সমবেত প্রতিভা নিয়োজিত করিলে এরূপ কার্যের ফলে আমাদের বহুবিধ উপকার সাধিত হইবে। ইহা করিতে সর্বাগ্রে দরকার হইবে এমন একটা নূতন ভাষা উদ্ভাবনের যাহা উহার অসাধারণত্ব বলে লোককে অভিভূত

করিতে এবং ঊর্ধ্বলোক হইতে প্রত্যাদেশ ও নূতন শব্দরাজী দ্বারা স্বর্গ হইতে সংবাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। এভাবে আমাদের চরিত্র উন্নত করিতে পারিলে আমরা অতীতে নবী ও অতীতে স্বর্গ হইতে প্রেরিত রসুলের মধ্যবর্তী প্রকৃতি ও মর্যাদার লোক বলিয়া বিবেচিত হইব। প্রত্যাদেশ আমাদের উদ্দেশ্যের প্রমাণরূপে খাড়া হইলে তখন হইতে আমাদের সম্মান, মর্যাদা ও শক্তি এত অধিক বর্ধিত হইবে যে, তাহা কল্পনার অতীত। একবার আমরা জনতার সশ্রদ্ধ প্রশংসা ও সাধারণের স্থিরদৃষ্টি লাভ করিতে ও আমাদের চতুষ্পার্শ্বে ইতর লোকদিগকে সর্বদা জমাইতে পারিলে বিদ্বান ও উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা কালক্রমে অবশেষে জনতার বিশ্বাস দ্বারা আলোড়িত হইয়া আমাদের উপর আস্থা স্থাপন করিবে ও তাহাদের পরে দলে দলে আসিতে থাকিবে ; এরূপ ক্ষেত্রে উপর নীচ উভয়ের উপর আমাদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির সীমা থাকিবে না।''

উভয়ের মনের গতি অনুরূপ বলিয়া ওস্তাদের প্ররোচণা সাগরীদের মনে বদ্ধমূল হইল। এই দুই জনের সমবেত প্রচেষ্টায় একটা নূতন ভাষা আবিষ্কৃত ও উহার নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হইল ; তাঁহারা এই ভাষায় তাঁহাদের নিজস্ব কতকগুলি বিচিত্র কথা ও অদ্ভুত কল্পনাপূর্ণ একখানা পুস্তক লিখিয়া ফেলিলেন। পালাক্রমে সংশোধন ও উন্নত করিয়া তাঁহারা একখানা পুস্তক সম্পূর্ণ করিয়া উহার নাম রাখিলেন আকোজা মুকদ্দস[৭] বা পবিত্র আকোজা। ওস্তাদ অশিক্ষিত ছিলেন না বলিয়া আধুনিক সমাজে বিরল কতকগুলি প্রাচীন পারসিক শব্দ এবং অধুনা বিরল-শ্রুত আরও বহু কথা আমদানী করতঃ সেগুলির অনুবাদ করিয়া কিম্বা উহাদের বিশেষ অর্থ দিয়া সেগুলি তাঁহার রচনার আদ্যন্ত ছড়াইয়া দিলেন ; একটু একটু করিয়া পুস্তকখানাকে কবিতায় পরিণত করা হইল। সব কিছুকে এক নূতন পোশাকে ভূষিত করিয়া তিনি তাঁহার এই 'যাবড়া' কে এক অতি অসাধারণ রূপ দান করিলেন। কিন্তু তাঁহার দাবীগুলি ছিল আরও অধিক অদ্ভুত এবং এত উচ্চশ্রেণীর যে, তাহাদের কোন বোধগম্য বিবরণ দান কদাচিৎ সম্ভবপর। সংক্ষেপে তিনি নিজেকে বেকোকিয়েত বা বেকোকিয়েতি বলিয়া ভাণ করিতেন ; এই অভিনব শব্দটার তিনি এই ভাবে ব্যাখ্যা দেন ; ইহা নবী ও ইমামের মধ্যে মধ্যম মর্যাদা ও

প্রকৃতি বুঝায়; তবে সমস্ত নবী বেকোক ছিলেন না। কিন্তু সর্বশেষ নবী দুই-ই ছিলেন; সরলভাবে বলিতে গেলে প্রথম বেকোক ছিলেন উত্তরাধিকারীদের রাজা—আওলিয়ার নরপতি অর্থাৎ মহামান্য হযরত আলী বিন্ আবু তালিব। ইমাম রেজা অষ্টম বেকোক। অষ্টম ইমাম ও রক্ষাকারী পর্যন্ত রসুল ও বেকোকিয়েতীর পদ একই লোকের হাতে যুক্ত ছিল; অবশেষে দুই প্রকৃতি পৃথক হইয়া একদিকে বেকোকিয়েতীর পদ আমার (মুহম্মদ হুসায়ন) নিকট অবতীর্ণ হয়, অন্য দিকে রসুলের পদ মহামান্য ইমাম মুহম্মদ তকীর হস্তগত হয়; তাঁহার নিকট হইতে ইহা হুকুমের মালিক[৮] পর্যন্ত চালু থাকিবে আর আমি সর্বশেষ বেকোক।" যখন তিনি ইমামিয়াদের[৯] পক্ষে থাকিবেন, তখন এইভাবে বেকোকিয়েতীর গুণবিশিষ্ট লোকদের গণনা করিতেন; কিন্তু সুন্নী ও অন্য সাধারণ লোকদের[১০] নিকটে গেলে প্রথম চারি খলিফা হইতে তাঁহার হিসাব আরম্ভ করিতেন, তৎপরে উমাইয়া ও আব্বাসীয় পরিবারগুলি হইতে আরও চারিজনকে যুক্ত করিতেন (অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে যে অত্যল্প কয়েকজনের[১১] কিঞ্চিৎ নৈতিক গুণ ছিল এবং যাঁহারা তাঁহাদের অবশিষ্ট জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত সচ্চরিত্র ছিলেন)। অতঃপর তিনি নিজেকে নবম বেকোক বলিয়া গণ্য করিতেন। এরূপ বিবরণ দানের পর তিনি বলিতেন, "ভদ্র মহোদয়গণ! কাহারও ধর্মের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমি জলন্ত মশালের ন্যায় প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আলোকিত করিতে আসিয়াছি। সুতরাং আমার চরিত্র সর্বোচ্চ প্রকৃতির; কারণ, আমি নবম বেকোক ও সর্বশেষ বেকোক; আমাকে একখানা পুস্তক লেখার, সমস্ত জাতিকে আমার বিশ্বাস গ্রহণে নিমন্ত্রণ করার এবং ঐ নব বিধানের ক্রিয়া-পদ্ধতি প্রচার করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে; এই নূতন আইনের উদ্দেশ্য হইল কতকগুলি রীতিনীতি ও বিশেষ ধর্মনীতি পাল্টাইয়া দেওয়া ও সতেজ করা। কাজেই আমি স্বয়ং সরাসরি উর্ধ্বলোক হইতে প্রেরণার অধীন এবং উর্ধ্বলোক হইতে আমার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ঐ সমুদয় ধর্মনীতি প্রকাশের জন্য দায়ী।"

তিনি তাঁহার অনুচরদের ফারবোদ বলিয়া অভিহিত করিতেন। এরূপ দাবী স্থাপনের পর তিনি কয়েকটি পবিত্র ইসলামী উৎসবে (বিখ্যাত

দ্বীনদারদের [১২] দ্বারা অনুষ্ঠিত ও মুসলমানদের দ্বারা ভক্তির সহিত নিরীক্ষিত) তাহাদিগকে সমবেত করিয়া তাহাদের নিকট তাঁহার উপদেশ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্মৃতিবার্ষিকী ও অনুষ্ঠান করিতেন। মা'সীরে নববীতে [১৩] লিখিত আছে যে, হযরতের উপর যে সকল ওহী নাযিল হইত, তাহা ছিল দুই প্রকারের; এই লোকটি সাদৃশ্যের কৃতিত্বলাভের জন্য বলিতেন, তিনিও একই দশায় নিপতিত হন; একবার তিনি এরূপভাবে প্রেরণা লাভ করেন যে, আকাশে অনেকটা পূর্বের অনুরূপ একটা উজ্জ্বল গোলক বা চক্র দৃষ্ট হয়; তাহাতে তাঁহার বক্তব্য বিষয় লিখিত রহিয়াছে দেখা যায়। অবশেষে সেই উজ্জ্বলচক্র তাঁহাকে আলোক-মালা দ্বারা বেষ্টন করায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন; ঐ অবস্থায় তিনি ইহার উপস্থিতিতে এত বেদনা অনুভব করেন এবং ইহার ক্রিয়ায় এত কষ্ট পান যে, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, অপর কোন ব্যক্তি তদ্রূপ ব্যথা সহ্য করিতে পারিত না। আর এক সময় ওহী একটা কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাইত; তাহা তাঁহার 'খয়ফ শান নোমোদ-বোদ হইতঃ [১৪] এই হাস্যোদ্দীপক রহস্যময় শব্দ-গুলি উচ্চারণ করিত; এই শব্দগুলি তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিষ্যদের নিকট উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়পদ্ধতিও কম বিচিত্র ছিল না। তাঁহার ফারবোদেরা তাহাদের সভায় মুসলমানদের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে সালাম আলাইকুম [১৫] শব্দ দ্বারা অভিবাদন করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের পবিত্র বাক্য অর্থাৎ খয়ফ শান-নোমোদ-বোদ ইত নিম্নস্বরে উচ্চারণ করিত। যেদিন সর্বপ্রথম তাঁহার নিকট ওহী নাযিল হয় বলিয়া তিনি বলেন, তিনি তাহার রাখেন 'উজ্জ্বল দিন'। ইহার স্মৃতি-বার্ষিকীতে অজস্র-লোক জমা হইতঃ তাহাদের মধ্যে তিনি সুগন্ধি আতর বিতরণ করিতেন; তাহারা পরস্পরের মুখমণ্ডল ঘঁষিয়া গান গাহিত ও আমোদ-প্রমোদ করিত। এ সকল প্রাথমিক কার্যদ্বারা তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে তিনি দুইখানা পতাকা দেখাইতেন এবং আর্মেনিয়নদের মত, কিন্তু তদপেক্ষা লম্বা একটি টুপী [১৬] পরিয়া তাহার ফারবোদদের লইয়া তিনি লাহোরের পার্শ্ববর্তী পর্বতগুলি অভিমুখে গমন করিতেন; সেখানে দিবল রাণীর প্রাচীন অট্টালিকারাজি দৃষ্ট হয় বলিয়া তাহা দিবল বখতিয়ারী

নামে পরিচিত তিনি বরাবরই রাত্রি বেলায় এই সফর করিতেন। তিনি বলিতেন যে, হেরা গুহার[১৭] স্থায় এক স্থানে তিনি তাঁহার প্রথম প্রত্যাদেশ লাভ করেন। উজ্জ্বল দিনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের আমোদ-প্রমোদের পূর্ববর্তী ছয় দিন তিনি রোজা করিতেন; এই ছয় দিন তিনি নীরব থাকিতেন। তিনি বলিতেন, যদি তিনি কোন স্মৃতি-বার্ষিকী বা দিনের কথা ভুলিয়া গিয়া থাকেন, একে এইরূপে তাহা স্মরণ করিবেন এবং তদনুযায়ী তাঁহার অনুচরদের একটা সম্মেলনীর আদেশ দিবেন।

আল্লাহর নির্দেশিত দৈনিক নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ভিন্ন তিনি একই উদ্দেশ্যে[১৮] তাঁহার অনুচরদের আরও তিনবার একত্র করিতেন। তাঁহার প্রথম বেলা ছিল মুসলমানী প্রাতঃকালীন নামাযের পরে সূর্যোদয়ের সময়, দ্বিতীয় বেলা মধ্যাহ্নে সূর্য মধ্য-গগনে আসিলে ও তৃতীয় বেলা সূর্যাস্তে যখন পশ্চিমদিকে দিগমণ্ডলে তখনও কিছু লালিমা থাকে! তাঁহার এই সমুদয় নূতন উদভাবিত জমাতের ক্রিয়াপদ্ধতিগুলি এই: তিনি নিজে অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি মধ্য ভাগে দাঁড়াইতেন; তাঁহার ফার-বোদেরা গৃহের চারিটি দেওয়ালের স্থায় তাঁহার চতুর্দিকে একটি পূর্ণ বর্গ-ক্ষেত্র গঠন করিয়া চারি সারিতে দণ্ডায়মান হইত; প্রত্যেক সারির মুখ থাকিত দিক-চক্রবালের এক চতুর্থাংশের দিকে, তৎপরে সম্মুখে প্রত্যেকেই তাহার ওস্তাদের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নূতন উদভাবিত শব্দাবলী উচ্চারণ করিয়া যুগপৎ তাহার মাথা অত্যন্ত নত করিত এবং তাহার দেহ এমন ভাবে তাহার বামদিকে ঘুরাইত যে, উত্তর দিকে যাহাদের মুখ থাকিত, তাহারা উত্তর পশ্চিমে, পশ্চিমমুখীরা দক্ষিণ পশ্চিমে, দক্ষিণ মুখীরা পূর্ব দিকে ও পূর্ব-মুখীরা উত্তর দিকে ফিরিত। এইভাবে স্থান পরিবর্তনের পর তাহারা মৃত্তিকার দিকে তাকাইত। তৎপরে উপরের দিকে মাথা তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া প্রতিবারে তাহাদের ঐ বিশেষ শব্দগুলি আবৃত্তি করিত। জমাতকে তাহারা দিদ বলিত; এই স্থায়ী বিবর্তনের পরে জমাত শেষ হইত; অতঃপর তিনি তাঁহার চতুর্দিকে একটা মণ্ডলী জমা করিয়া বলিতেন, কনিষ্ঠা ফাতেমার (তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) অকাল প্রসব হইলে যে মুহসিন (উপকারী ব্যক্তি) ভূপতিত হয়[১৯] আমি সেই ব্যক্তি (দয়ালু

আল্লাহ্; তোমার কি নিন্দা!) ইহা ব্যরাও তাঁহার মুখে আরও কিছু আল্লাহ্-নিন্দা ও অধার্মিকতা প্রকাশ পাইত, তবে সেগুলি আমার স্পষ্ট স্মরণ নাই। মুহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রায় শেষে ও আহমদ শাহের রাজত্বের প্রথম আমি প্রথম যখন শাহ্‌জাহানাবাদে যাই, তখন তাঁহার দুই পুত্র শাহ ফেগা-রুল্লাহ্ ও শাহ দিদ এবং তাঁহার প্রধান অনুচরদের সহিত আমার কয়েকবার কথাবার্তা হয়; আমি যাহা বলি, তাহা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার দুই পুত্রের নিকট হইতে আমার নিজের সংগৃহীত। মুসলিম ইতিহাসে অতি বিখ্যাত চারি খলিফার অনুকরণে এই জালিয়াত্‌ তাঁহার নিজের চারিজন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের প্রথম জন ছিলেন তাঁহার ঐ বিশ্বস্ত বন্ধু নরশিদ; তাঁহার জন্য তিনি তাঁহার নূতন উদভাবিত ভাষায় 'তেজ্বিবার'—এই নূতন নাম উদ্ভাবন করেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন আমীর খাঁর জামাতা মীর বাকীর। অপর দুই জনের জন্য তিনি নোমোদুল্লাহ ও নোমোদা-নোমোদ নাম তৈয়ার করেন; একইরূপে তিনি তাঁহার সন্তান ও অনুচরদের নূতন নাম দেন। এই সমুদয় নামই তাঁহার নবাবিষ্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত। যে কেহ ভক্তি হইতে আসিত, তাহারই একটা নূতন নাম লাভ নিশ্চিত ছিল; তিনি ইহাকে চিহ্ন বলিতেন; আর কোন শর্তে প্রবেশ লাভ ঘটিত না। তাঁহার তিন পুত্রের প্রথমটির নাম বা চিহ্ন দেন তিনি নেমা-নোমোদ বলিয়া। দ্বিতীয়টির ফেগার ও তৃতীয়টির দিদ। তাঁহার দুই কন্যা বড় নেমানা ও ছোট নেমানা বলিয়া অভিহিতা হইতেন। তাঁহার স্ত্রীর (ইহার নাম বদ-লাইরা তিনি হকনেমা নাম রাখেন) পক্ষের আত্মীয়দের তিনি নেমা-ইয়ার, নোমোদ-ইয়ার ও ফার-নোমোদ নাম দেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ফেগারের তিনি আর এক নাম রাখেন নোমোদ-দিদ।[২০] অন্যান্যেরও এভাবে নাম রাখা হয়। মোট কথা, কিছুকাল পরে সেই অপদার্থ মিথ্যাবাদী তাঁহার বাসস্থান লাহোর ত্যাগ করিয়া শাহজাহানাবাদে আসিয়া বাসা নিলেন। বাহাদুর শাহ দূরে প্রথমোক্ত নগরে থাকিতেন বলিয়া তাঁহার নির্বোধের দল প্রত্যহ বাড়িয়াই চলিল। তিনি যাহার নাগাল পাইতে পারিতেন, এরূপ প্রত্যেকটা আহম্মককে তাঁহার জালে টানিলেন। ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা থাকায় তিনি নিঃস্বার্থ পরায়ণতার ভাণ করিতেন; এবং কথনও

কিছু চাহিতেন না বা গ্রহণ করিতেন না। এরূপ অদৃশ্য উপায়ে তাঁহাকে নিজের জীবিকা নির্বাহ করিতে দেখিয়া জনতা বিস্মিত ও অশেষ আনন্দিত হইয়া তিনি নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিতেন, না বুঝিয়া তৎপ্রতি আরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করিত। অল্পে অল্পে তাঁহার অনুচরদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল এবং তাহারা অন্যান্য লোককে জালে ফেলিতে এত উৎসাহ দেখাইত যে, অবশেষে তাহারা বিরাট জনতায় পরিণত হইল। প্রায় এই সময় বাহাদুর শাহের মৃত্যু হওয়ায় রাজবংশের শাহজাদাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল; ফলে প্রত্যেকটা নগরে ও শহরে বিরোধ দেখা দিল। এই সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করিয়া ঐ জালিয়াত তাঁহার জাল আরও প্রসারিত করিলেন। এখন নির্ভীক ও সাহসী হইয়া তিনি তাঁহার মুখোশ সম্পূর্ণ খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নূতন কিতাব ও নূতন ভাষা প্রকাশ্য দিবালোকে আনয়ন করিলেন, এবং বিস্মিত জনতাকে দর্শন দান করিয়া তাঁহার কার্য-প্রণালী ও দুর্বোধ্য মতবাদ নির্ভীকভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। বাক্‌বিতণ্ডায় তাঁহার দক্ষতা থাকায় তিনি অদম্য প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হইলেন। জনতার মধ্য হইতে যখনই কেহ তাহার দাবী বা ধর্ম-নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের চেষ্টা করিত, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী শীঘ্রই তাহাকে বুদ্ধিবলে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিতেন। বাদানুবাদে বরাবরই অধিকতর দক্ষতা এবং দুইটি বাক্য হইতে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের যুক্তি ও কুতর্কে অধিকতর দক্ষতা থাকায় তিনি তাঁহার শত্রুকে পরাজিত করিতে কখনও ব্যর্থ হইতেন না। ইহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিস্মিত জনতা দলে দলে তাঁহার নিকট সমবেত হইত। যে সকল বিরোধের শেষে ফর্‌রুখসিয়ার সিংহাসন লাভ করেন, সেগুলি চলিত থাকাকালে ইহাই ছিল অবস্থা। এই শাহজাদা ছিলেন স্বয়ং অত্যন্ত আহমক ও অজ্ঞ। পক্ষান্তরে তাঁহার দুইজন মন্ত্রী নিজস্ব ব্যাপার লইয়া অবিশ্রান্ত ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া অন্য কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতেন না। হুসায়ন আলী খাঁ প্রধানতঃ যুদ্ধ ও অভিযানেই ব্যস্ত থাকিতেন। পক্ষান্তরে অন্য ভ্রাতা আবদুল্লাহ খাঁ তাঁহার আমোদ-প্রমোদ ও অতৃপ্ত রমণী-প্রেমে অবিরত মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বাদশাহের ষড়যন্ত্রের দরুন সময় সময় তাঁহার শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইত সত্য, কিন্তু তখন নিজস্ব এত কাজ তাঁহার

হাতে থাকিত যে তিনি ঐ অপদার্থ লোকটার জালিয়াতি লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় পাইতেন না। কাজেই এই নূতন সম্প্রদায় ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। আমীর খাঁর পুত্র হাদী খাঁ ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন লোক। অন্যান্য বহু লোকের মধ্যে তিনিও ছিলেন ঐ জালিয়াতের অন্যতম শিষ্য। তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের এত জমকালো ফল হইল যে, লোকে এবম্বিধ বড় লোকদের বিশ্বাস ও অকপটতাকে নিজেদের নিঃসন্দিগ্ধ বশ্যতা স্বীকারের এমন কি আরও কিছুটা দূরে যাওয়ার• কৈফিয়ৎহীন যুক্তি বলিয়া ধরিয়া লইল। সেই মহানুভব আমীর এবং তাঁহারই ন্যায় তুল্য অজ্ঞ, খামখেয়ালী অপর কতিপয় লোকের অনুরক্তির ফলে ঐ জালিয়াতের দেহের জৌলুশ ও কৃতিত্ব এত বৃদ্ধি পাইল যে, অত্যল্পকাল মধ্যে এক সময় তাঁহার সভায় উপস্থিত লোকের সংখ্যা পঁচিশ হাজারে দাঁড়াইল। সর্ব ধর্মহীন কয়েক জন আমীরের প্ররোচণায় পড়িয়া বাদশাহ্ ফর্‌রুখ সিয়ার স্বয়ং একবার সেই জালিয়াৎকে দেখিতে গমন করেন। তখন রাত্রিকাল ; কাহারও নিকট তাহা ফাঁস না করিয়া কোন অনুচর না লইয়া মাত্র কয়েক জন খোজা সঙ্গে লইয়া যেন লুকাইয়া ছদ্মবেশে তাঁহার এই অভিযান। শাহ্‌জাদা ছিলেন যেমন আহমক, তেমনি অজ্ঞ ; তাঁহার সাক্ষাৎকারে আগমনের সংবাদ পাইয়া জালিয়াত নোমোদ আত্মবিশ্বাস ও চতুরতার সহিত এমনভাবে ভিতর হইতে তাঁহার নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, যেন খুলিতে কষ্ট হয়। ওদিকে বাদশাহ্ হীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে (ঘর খোলার জন্য) কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। জালিয়াতের সন্তান-সন্ততি ও শিষ্যেরা তাঁহার সমর্থনে দ্বিগুণ অনুরোধ উপরোধ করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে দ্বার খুলিতে সম্মত করান হইল। ফর্‌রুখসিয়ার তাঁহাকে দেখিয়া দেহ নোয়াইয়া কুর্ণিশ করিয়া সম্মুখে আগাইয়া গেলেন। নোমোদ একখানা মৃগ-চর্ম টানিয়া আনিয়া বাদশাহের জন্য পাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ইহাতে রাজা-মিসকীন উভয়েরই কাজ চলে। আপনার যাহা মেহেরবানি বাছিয়া লউন।" ফর্‌রুখ সিয়ার ছিলেন সঙ্কীর্ণ-চিত্ত ; নীচ ভিন্ন তাঁহার অন্য ধারণা ছিল না। লোকটির ত্যাগ ও পবিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া তখন হইতে তিনি তাঁহার পবিত্রতা সম্বন্ধে উচ্চতর মত পোষণ

জালিয়াত সন্দর্শনে বাদশাহ্

করিতেন। বিদায় বেলায় তিনি তাঁহাকে একখানা মূল্যবান গালিচা ও এক হাজার টাকা এবং কিছু আশরফী ভর্তি একটি থলিয়া উপহার দিলেন। লোকটা কিছুই গ্রহণে সম্মত হইলেন না; সহস্রবার অস্বীকৃতির পর বাদশাহ্‌কে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত একখানা কুরআন দিয়া বাধিত করিতে সম্মত করান সম্ভব হলো। নিজের মেহনতের জন্য থলিয়া হইতে সত্তরটি টাকা (ইহাই তাঁহার নিজের লেখা কুরআনের নির্ধারিত মূল্য বলিয়া) কাটিয়া রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট টাকা ফেরত দিলেন। তাজিমের খাতিরে বাদশাহ্ দণ্ডায়মান হইয়া কুরআন খানা গ্রহণ করিলেন এবং তাহা কপোল স্পর্শ করাইয়া ও কুর্ণিশ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নোমোদ বাদশাহ্‌কে আগাইয়া না দিয়া কামরার বাহিরে আসিয়া থলিয়া ও টাকা মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহার সমস্তই যাহারা তাঁহার দিকে হা করিয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ বিতরণের আদেশ দিলেন। এই আত্মত্যাগের কার্যের ফলে তাহাদের মতে তাঁহার চরিত্র এত উন্নত হইল যে, এখন হইতে কিছুই তাহা ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না। ইহা এত নিরেট হইল যে, ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিতর্ক চলিত না; পক্ষান্তরে এত অধিক মর্য্যদা লোকটিকে নির্ভীক করিয়া তুলিল ও সমস্ত বিবেচনার উর্ধ্বে উঠাইল। এখন তিনি তাঁহার নির্ধারিত উৎসব ও উপবাস গোপন রাখা নিজের মর্যাদা হানিকর বলিয়া মনে করিলেন। শহরের ভিতরে তাঁহার পতাকা সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে প্রদর্শন করিতে এবং আড়ম্বরের সহিত তাঁহার নির্দিষ্ট মিলন-স্থানে যাত্রা করিতে তিনি বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। তিনি নিয়ত তাঁহার দলে দলে শিষ্যের পুরোভাগে থাকিয়া ইহা সম্পন্ন করিতেন। এ সময়ে তিনি নির্ভীকভাবে কোন পূর্ব-সতর্কতা অবলম্বন না করিয়াই দৃঢ়তার সহিত সমগ্র শহরে কুচ করিতেন। তিনি এতই নিঃশঙ্ক বোধ করিতেন যে, তাঁহার ঐ সমুদয় হাস্যোদ্দীপক অনুষ্ঠান সম্পাদনের পরে তিনি তাঁহার বিপুল সংখ্যক অনুচর পরিবৃত হইয়া যখন বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন তাহারা তখন উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার ঐ সমুদয় রহস্যাত্মক শব্দ আবৃত্তি করিতে থাকিত।

ফররুখ সিয়ারের রাজত্ব ও ভ্রাতৃদ্বয়ের শক্তি ও সর্বব্যাপিতা শেষ হইলে সিংহাসন মুহম্মদ শাহের ও ওজারত তাঁহার প্রিয়পাত্র মুহম্মদ আমীন খাঁর

কপালে জুটে ; আমীন খাঁর ওজারত মাত্র ৩/৪ মাস ও কয়েক দিন স্থায়ী হয় ; তলপেটে দুঃসহ যন্ত্রণায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে ঘটনাক্রমে সর্বপ্রথম ঐ জালিয়াতের সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি তৎকালে তাঁহার সিংহদ্বারে উপস্থিত কয়েকজন সৈন্যকে তদ্দণ্ডেই যাত্রা করিয়া ঐ কোটনাকে (এই উপলক্ষে তিনি এই ভাষাই ব্যবহার করেন) ধরিয়া আনিতে আদেশ দেন। তিনি বিন্দুমাত্রও বাধা প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হত্যা করার জন্য তাহাদের উপর নির্দেশ ছিল। উজীর যখন এই আদেশ দেন, তখন মধ্যাহ্ন অতীত হওয়ায় উজীর তাঁহার লোকজনকে বিদায় দিয়াছিলেন। কাজেই অত্যল্প লোকই তোরণে উপস্থিত ছিল এবং তাহাদের একাংশ মাত্র জালিয়াতের গৃহে গমন করিয়া প্রাপ্ত আদেশ বিজ্ঞাপিত করিল। ঐ সময় খয়ক শান-নোমোদ (তিনি এই নামেই নিজেকে অভিহিত করিতেন) তাঁহার কক্ষের ভিতরে আহার করিতেছিলেন। সৈন্যদের বাহিরে কথাবার্তা বলিতে শুনিয়া তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইল, তিনি আতঙ্কে হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দিদ ছিলেন অত্যন্ত সুশ্রী; আত্ম-সংবরণের সময় পাইয়া এবং কৌশল উদ্ভাবনে পটু লোক ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত গম ও যবের কয়েকখানা মিশ্রিত পিঠা কয়েক বাসন কলাই ও শাকসব্জিসহ পুত্রের হাতে দিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, "বন্ধুগণ, যেহেতু আপনারা ফকীরের গৃহে আসিয়াছেন। তিনি স্বয়ং না আসা পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করুন।" সৈন্যেরা সংবাদের বৈশিষ্ট্য এবং সংবাদ বাহকের রূপ ও কোমল বয়সে তুলা বিস্মিত ও অবাক হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। ভীষণ পেটের বেদনা ছিল মুহম্মদ আমীন খাঁর বদমেজাজির হেতু। ইতোমধ্যে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পাপের পরাকাষ্ঠায় আক্রান্ত হওয়ার সংবাদটি মুহূর্তে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ইহা সৈন্যদের কর্ণগোচর হইলে তাহাদের বাকী বেতনের জন্য অস্থির হইয়া তাহারা সকলেই নোমোদকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের মনিবের তোরণে অবস্থিত তাহাদের বাসায় প্রত্যাবর্তন করিল। উজীর প্রকৃতপক্ষে সেই বদমেজাজের নিকৃষ্ট পর্যায় দ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া তাঁহার জ্ঞান ও বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলেন ; কিন্তু চক্ষু উন্মুক্ত করিতে পারিবা মাত্রই

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই লোকটি কোথায় ?" তিনি উত্তর পাইলেন, তাঁহার দুর্ঘটনায় তদীয় ভৃত্যবর্গের সকলেই এত অধিক অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহাদের মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে তাহাদের মনিবের অবস্থার প্রতি নিবদ্ধ হয় ; একারণে লোকটিকে ধরিয়া আনিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এই কৈফিয়তে অসন্তুষ্ট হইয়া উজীর পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে আনয়নের অলঙ্ঘ্য আদেশ দান করিলেন। কিন্তু সেই দিন অপরাহ্নে উজীর তাঁহার বদমেজাজের আর একটা ভীষণ মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত এতই নিকটবর্তী মনে হইল যে, লোকে তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিল। নোমোদ কিরূপে পলায়ন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন ; কিন্তু হাদী খাঁ এবং তাঁহার আরও কতিপয় বন্ধু ও অনুচর মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁহাকে উজীরের নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থার সংবাদ জ্ঞাপন করিতে থাকায় তিনি তৎক্ষণাৎ সাহস অবলম্বন করিয়া তাঁহার কিছু অনুচরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা দলে দলে তাঁহার নিকট উপনীত হইলে তিনি তাহাদিগকে উজীর তাহার মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন বলিয়া স্থূল আভাস দান করিলেন। এই সময় সুস্পষ্টরূপে এই সংবাদ তাঁহার নিকট আনীত হয়। এই সংবাদে তিনি গাম্ভীর্যময় সন্তোষ-সহকারে গৃহের বাহিরে আসিয়া তাঁহার দরজার সন্নিহিত এক মসজিদে স্থান গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অনুচর, আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবে তৎক্ষণাৎ মসজিদ ও রাস্তা পূর্ণ হইয়া গেল। ঠিক এই সময় মরণোন্মুখ মন্ত্রীর পুত্র কমরুদ্দীন খাঁ হারেমের বৃদ্ধা মহিলাদের ভয় এবং রমণীদের ন্যায়ই দুর্বলচিত্ত লোকদের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া তাঁহার পিতার দুর্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত ও সেই জালিয়াতের স্বহস্ত লিখিত কয়েকটা তাবিজের মূল্য স্বরূপ ৫০০০ টাকার একটা তোড়া সহ প্রত্যুষে তাঁহার নিজ দেওয়ানকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাবিজ-গুলির জন্য মেহেরবানি হিসাবে তাঁহার নিকট অনুরোধ করা হইল। উজীরের মৃত্যু সংবাদ সংবলিত একখানা সংক্ষিপ্ত মন্তব্যলিপি ইতঃপূর্বেই লোকটার হস্তগত হওয়ায় তিনি এখন পুরাপুরি তাঁহার পক্ষ বিস্তার করিয়া ও উর্ধ্বে উড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ঠিক এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, "আমি ঐ পৌত্তলিকের হৃদয়ে এমন এক তীর নিক্ষেপ করিয়াছি যে, সে কিছুতেই

আরোগ্য লাভ করিবে না। আমার পূর্বপুরুষ এক মস্‌জিদে শাহাদত প্রাপ্ত হন।[২১] এতদ্‌সত্ত্বেও আমি শাহাদৎ বরণের জন্য এই মস্‌জিদে আগমন করিয়াছি। একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "অবশ্য ইতঃপূর্বেই একবার শহীদ হই বলিয়া প্রকৃতপক্ষে আমি এখন ইহা বরণ করিতে পারি না" (এই বাক্য দ্বারা তিনি কনিষ্ঠা ফাতিমার গর্ভস্রাবের প্রতি ইঙ্গিত করেন)। তিনি তখনও কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় মুহম্মদ আমীন খাঁর দেওয়ান ভিতরে আসিয়া একটা তাবিজ নেয়ার মূল্য হিসাবে তাঁহার পদতলে ঐ টাকা রাখিয়া দিলেন। তিনি মুহম্মদ আমীন খাঁর অপরাধ মাফ করিবেন, (এইরূপ ভাবই তিনি প্রকাশ করেন) এই আশা করিয়া পুত্রের তরফ হইতে তাঁহাকে একটা বিনীতবাণীও প্রদত্ত হইল। প্রেরণা-প্রাপ্ত লোকটা উত্তর দিলেন, "একবার নিক্ষিপ্ত তীর ও একবার ফাড়া-নদী ফিরিয়া আসিতে পারে না।" এই উত্তরের ফলে নুতনভাবে অজস্র কাকুতি-মিনতি করা হইলে তিনি তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কুরআনের এই কথাগুলি লিখিতে আদেশ করিলেন, "আমরা বিশ্বাসীদের উপকারার্থ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, কিন্তু জালিমদের জন্য ইহাতে ক্ষতি ও অসুবিধা ভিন্ন কিছুই নাই।" দেওয়ান তাহাকে অর্থ গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি এই বলিয়া ইহা অবিরত প্রত্যাখ্যান করিলেন, "আমার তরফ হইতে আমি ইহা স্পর্শও করিব না, তবে উপস্থিত দরিদ্রলোকেরা ইচ্ছা করিলে ইহা গ্রহণ করিতে পারে।" এই উপমহাদেশীয় ভিক্ষুকেরা কয়েকটা তাম্রমুদ্রার জন্য একটা গোটা শহর পরিভ্রমণে অভ্যস্ত; তাঁহার মুখের কথা বাহির হইতে না হইতেই তাহারা তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত টাকা লইয়া গেল। প্রত্যাবর্তনকালে দেওয়ান পথিমধ্যেই শুনিতে পাইলেন যে, উজীর তাঁহার যথোপযুক্ত স্থানে গমন করিয়াছেন। এই সংবাদ তখন প্রকাশ্যে লোমোদের নিকট নীত হইলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জনতাকে বিদায় দিয়া তৃপ্তি ও বিজয়ী ভাবের সহিত গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার এই মুজিযা লোকমুখে বাহিরে প্রচারিত ও শাখা-পল্লবিত হইয়া সমগ্র শহরে ছড়াইয়া পড়ায় বদ্ধ-মাতাল ও আহমকের প্রচুর ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হইল না।

এই মুজিযার তিন বৎসর পরে তাঁহার যাবতীয় খামখেয়াল ও চাতুরী সহ খোদ নোমোদের মৃত্যু হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নেমা-নোমোদ তাঁহার স্থলবর্তী হইলেন। নোমোদের শিষ্য হাদী খাঁ তাঁহাকে একটি জমিদারী উপহার দেন। তিনি তাঁহার জীবনকালে ভেজিবার ও তাঁহার অপর কয়েক জন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে তাহাদের বিশ্বস্ত সেবার স্বীকৃতি হিসাবে ইহা দান করিয়া যান। এই পারিবারিক সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃবর্গ ও তাঁহার পিতার অপর কয়েক জন অনুচরের সহিত নেমা-নোমোদের কলহ বাঁধিল। এই সকল বিবাদে ভেজিবার সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি একাধিক বার নেমা-নোমোদকে বলিলেন, "বার্ধক্যের দরুন আমার পক্ষে আর বহু বৎসর আপনার অতিথি থাকার সম্ভাবনা নাই। কাজেই আপনি বরং নীরবে চুপ করিয়া থাকুন।" কিন্তু তাঁহার পিতার জীবনকালেই প্রভুত্ব করিতে ও তাঁহার অনুচরদিগকে শাসন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার পুত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে তাহারা তাহাদের ধারণা পরিবর্তন করিতে পারে বলিয়া নেমা-নোমোদ কোন সন্দেহ করিতে না পারায় ভেজিবারের চীৎকারে কর্ণপাত করিলেন না। শেষোক্ত ব্যক্তি প্রত্যেকটা ফিকির ও প্রত্যেকটা জালিয়াতিতে নিজেকে তাঁহার মনিবের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেন। তদুপরি তিনি সর্বদাই অপর ব্যক্তির দক্ষিণহাত রূপে কাজ করেন; কাজেই তিনি এই আচরণে ক্রুদ্ধ না হইয়া পারিলেন না। এই সমুদয় বিবাদ এত তীব্র হইয়া দাঁড়াইল যে, ফায়বোদদের জমায়েত সচরাচর অপেক্ষা অধিক সংখ্যাপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইলে তিনি তাঁহাদের মধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া কথঞ্চিৎ ধীরস্থিরভাবে এই কথাগুলি বলিলেন, "বন্ধুগণ! মৃত নোমোদের হাতের লেখা হইতে আপনারা আমার লেখার পার্থক্য চিনিতে পারেন কি।" বহুলোকে বাস্তবিকই উভয়ের হাতের লেখা চিনিতেন; তাঁহারা 'হ্যাঁ' বোধক উত্তর দিলে তিনি একটা খাস কামরায় গমন করিয়া সেখান হইতে কতকগুলি লেখাভর্তি তাহার আলখেল্লার পেটি বাহির করিয়া আনিলেন; তাহাতে সেই জালিয়াত-প্রকাশিত আইনগ্রন্থের খসড়া মুসাবিদা ও মূল সারাংশ রচিত ছিল। উভয় হস্তে প্রচুর রদবদল, পংক্তির মধ্যবর্তী স্থানে লিখিয়া সংশোধন ও যথেষ্ট লেখা তুলিয়া ফেলা স্পষ্টতঃ পর্যায়ক্রমে উভয় হস্তের লেখা বলিয়া বোধ হইল। দর্শকদের হাতে হাতে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়ার পর তাহাদের

অধিকাংশই তৎক্ষণাৎ একজনের হাতের লেখা হইতে অন্যের লেখার পার্থক্য বুঝিতে পারিল। লোকটা তখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া ঠিক এই কথাগুলি বলিলেন: "বন্ধুগণ! আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, এই নূতন ধর্ম ও সমাজ আপনাদের দীনহীন ভৃত্যের সাহায্যে নোমোদ কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। ইহা আল্লার তরফ হইতে নাযিল হইলে একবারেই আসিত[22] এত অধিক ঘষামাজা এবং এত বেশী পরিবর্তন ও সংশোধনের দরকার হইতনা।" ঐ লেখা ও সাক্ষ্য সকলের পক্ষ হইতে স্বীকৃত হওয়ায় যাহাদের তখনও কিছু কাণ্ডজ্ঞান অবশিষ্ট ছিল, এমন বহু লোকের বিশ্বাস অনেকটা টলিয়া যাওয়ায় তাহারা নিজেদের বিশ্বাসপ্রবণতায় মৃদুহাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন। এই বিষয় লোক মুখে দূরে ছড়াইয়া পড়িলে দলত্যাগ বৃদ্ধি পাইল এবং জালিয়াত আহমক, প্রতারক ও ফেরকার ঐ সকল মিশ্রিত সভা অত্যন্ত সংখ্যাল্প হইয়া পড়িল। এবম্বিধ ভাগ্য বিবর্তনে হতভম্ব হইয়া নেমা-নোমোদ ভেজিবারের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন; কিন্তু বড় বিলম্বে; বিষয়টা দূরে ছড়াইয়া পড়ে। কিরূপে ব্যাপারে নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখিতে পাইয়া নেমা-নোমোদ দোয়াবের একটা জমিদারিতে প্রস্থান করেন। হাদী আলী খাঁ ঐ পরিবারকে উহা ভক্তি-উপহার দান করেন। তিনি নিজেকে পিতার গদীতে উত্তরাধিকারী শাহ্ ফেলার নামে অভিহিত করিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

এই শাহ্ ফেগার ছিলেন একজন আমুদে প্রকৃতির ও অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথাবার্তার লোক। তিনি বিদ্রোহী ছিলেন না। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা দিদ উভয় ব্যক্তি, ভেজিবার ও মীর বাকীরের সহিত এই দরিদ্রের জানাশোনা ছিল। তাঁহাদের সকলের সহিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়; ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদের সকলের সহিত আমার পরিচয় ছিল এবং তাঁহাদের সহিত অনেক কথা আমার আলাপ হইত। এই পাতাগুলিতে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা হয় আমি তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, অথবা বিগত বহু বৎসর ধরিয়া যাহারা তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছেন তাঁহাদের উক্তি। শাহ্ ফেগার প্রধানতঃ মুহম্মদ শাহের আমলে বাস করেন। তিনি এমনকি আহ্মদ শাহের রাজত্বের কয়েক বৎসরও দেখিতে পান। নাদির শাহের প্রস্থানের পরে এই

বাদশাহকে প্রায়ই ফকীর ও অন্যান্য ধার্মিক ব্যাক্তিদের সংসর্গে আনন্দ লাভ করিতে দেখা যায়; তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকট অবাধে যাতায়াতের অধিকার দেন। কিন্তু এই শাহজাদার মৃত্যুর পরে তিনি নওাব জাবিদ খাঁর সহিত পরিচিত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। ইনি ছিলেন আর একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যাক্তি। তোষামোদের খাতিরে কয়েক ব্যক্তি তাঁহার প্রত্যাদেশগুলি 'জাবিদ নামা' নামে একটা পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইহা লেখায় ও বিন্যাস করায় অপর কতিপয় সংশোধনকারীর সহিত শাহ্ ফেগারও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রায় এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দিদের মৃত্যু হয়; কয়েক বৎসর পরে জ্যেষ্ঠ শাহ্ ফেগারও তাঁহার অনুগমন করেন। ইহা আহমদ শাহের রাজত্বের প্রায় প্রথম ভাগের কথা। ফেগারের জীবনকালেই পিতার অধিকাংশ সমর্থক ও স্তাবকের মৃত্যু হয়। ঐ ঘটনার পর হইতে আরও অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। ঐ সকল খামখেয়াল লোকের ন্যায় পরীক্ষিত অল্প কয়েক জন আহমক ব্যাতীত আর কেহই তাঁহার সঙ্গে থাকেন নাই। শাহ্ ফেগারের মৃত্যু ও শাহজাহানাবাদের ধ্বংসের পরে আদ ও সামোদ গোত্রের[২৩] হতাবশিষ্টদের ন্যায় নোমোদের কতিপয় নিকটাত্মীয় ঐ নগরের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া বাঙলায় গমন করেন। ঐ প্রদেশের নিজামৎ বা শাসন কর্তৃত্ব তখন মীর জাফর খাঁর পুত্র মীরনের উপর ন্যস্ত ছিল। সেখানে তাঁহারা এত ভাল সমর্থন লাভ করেন যে, মীরন একখণ্ড ভূমি ছাড়াও দৈনিক ৫ টাকা বৃত্তি দ্বারা তাহাদিগকে আপ্যায়িত করেন; স্থানটি তখন হইতে কদমরসুল নামে অভিহিত হয়। কিন্তু ঐ সমুদয় লোকের অধিকাংশ মীর জাফরের (পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমি তাহার বিশদ বিবরণ দানের আশা রাখি) জীবনকালেই তাঁহাদের ভাগ্যনির্দিষ্ট স্থান নরকে গমন করে; নেমা-নোমোদ ইয়ার এবং জালিয়াতের কতিপয় রমণী ভিন্ন আমার জানা অপদার্থ জালিয়াতের বংশের আর কেহই অবশিষ্ট নাই। তাঁহারা ১১৯৪ হিজরীর এই দিন পর্যন্ত জীবিত আছেন।[২৪] সুতরাং আল্লাহের শুকর, অপদার্থ জালিয়াতের বংশ বিধ্বস্ত হইয়াছে।

সুতরাং আমরা এখন আমাদের সাধারণ ইতিবৃত্তে ফিরিয়া যাইতেছি। তাঁহার বেদনা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া মুহম্মদ আমীন খাঁ তাঁহার চিকিৎসকদের প্রদত্ত আশ্বাস ও উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কিছু উপশম বা

কিছু ঔষধের জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সুতরাং চিকিৎসকেরা পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাকে ক্লিষ্টার (নাড়িভুঁড়ী পরিষ্কার করার জন্য পিচকারী দিয়া উদরে নিক্ষিপ্ত তরল পদার্থ) দানে সম্মত হইলেন। এই প্রতিকার পুনঃ পুনঃ প্রদত্ত হইলেও কোন উপশম হইল না, বরং তাঁহার মুখ দিয়া মল নির্গত হইল এবং তিনি পরলোকগমন করিলেন। লোকে বলে, রসুলের বংশধরদের প্রতি তিনি এত বিতৃষ্ণভাব পোষণ করিতেন, বিশেষতঃ ন্যায়বানদের রাজা হইতে যাহারা উদ্ভূত, তাহাদিগকে এতই ঘৃণা করিতেন যে, পথে এক ব্যক্তিকে 'আলী আল্লার দরবেশ' বলিয়া গান করিতে শুনিয়া তিনি তাঁহার জিহ্বা কর্তনের আদেশ দান করেন[১৫] সাহসীদের রাজার প্রতি নজর হিসাবে কয়েকজন ধার্মিক ব্যক্তি একটা খানার মেজ পাতিয়া কবুল করার নিদর্শনের জন্য বিনীতভাবে অপেক্ষা করায় তাঁহাদের অনুকরণে বিষয়টাকে হাস্যাস্পদ রূপদানের উদ্দেশ্যে তিনিও নিজের বেলায় ঐরূপ একখানা মেজ পাতিবার আদেশ দেন। সাহসীদের মহামান্য রাজা যে অকপট বিশ্বাসীদের বেলায় এরূপ চিহ্ন মঞ্জুর করিয়া থাকেন[১৬] এবং বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান এবং অবিশ্বাস-প্রবণ কতিপয় ব্যক্তিসহ হাজার হাজার লোক যে ইহা লক্ষ্য করিয়াছে, সমগ্র জগতে সকলেরই তাহা জানা আছে। বিশেষভাবে এই দীনহীন ব্যক্তি বহুবার এরূপ নজর দিয়াছে এবং প্রতিবারই কবুলের বিবিধ নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াছে; তজ্জন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লার নিকট সসম্মানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। পাপিষ্ঠ মন্ত্রী তাঁহার সাক্ষাতে ইহা উচ্চারণ করা শুনিতে পারিতেন না। সায়্যিদদের প্রতি তাঁহার এতই বিতৃষ্ণা ছিল যে, এমনকি তাঁহার বন্ধু, ভৃত্য এবং অনুচরবর্গও তাঁহাকে মুয়াবিয়া ও এজীদ[১৭] বলিয়া ডাকিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। এই সকল নামে বরং তাঁহাকে গর্বিত বলিয়াই বোধ হইল। একদা তিনি বলেন যে, তাঁহার ঐ দুইজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ একটা খানার মেজ প্রদান করিতে চাহেন; তাঁহার আশা ছিল, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অনুরক্তির স্বীকৃতি হিসাবে কোন দৃশ্যমান চিহ্ন দ্বারা উহাদের গ্রহণ প্রত্যক্ষ করিবেন এবং অনুরূপভাবে যে সকল নিন্দুক এত উচ্চ দাবীর ভাণ করে[১৮] তাহাদিগকেও কতকটা সংযত করিবেন। হারেমের একটা নিভৃত কক্ষে

ভোজ প্রস্তুত হইলে তিনি স্বয়ং তাঁহার ঐ ভক্ষ-খাদ্য লইয়া তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিসহ তাঁহার ঐ দুইজন ভক্তিভাজন ব্যক্তির নামে ফাতিহা পাঠ করিতে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া সেখানে গমন করিলেন। অতঃপর তিনি ঐ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া এবং তাঁহার একজন বিশ্বস্ত বৃদ্ধা রমণীকে উহার নিকটে পাহারায় বসাইয়া তাহার হাতে ইহার চাবি দিয়া চলিয়া গেলেন। এক ঘণ্টা পরে দরজা খুলিয়া নিদর্শন মিলে কিনা দেখিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য তৎপ্রতি আদেশ রহিল ; তাহা হইলে তিনি পরিষদবর্গসহ তৎক্ষণাৎ সেখানে গমন করিয়া অবিশ্বাসকারীদের প্রত্যয় জন্মাইতে পারিবেন। মেয়ে লোকটা নিজেই ছিল মনে মনে শিয়া, কিন্তু তাহার মত ও নীতি গোপন রাখিত। পূর্ণ এক ঘণ্টা পরে তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী সে দরজা খুলিয়া দেখিল, একটি বৃহদাকার কাল কুকুর নীরবে তাহার উরুর উপরে বসিয়া প্রত্যেকটা বাসন হইতে খাদ্য গ্রহণ ও তাঁহার পদ্‌ লেহন করিতেছে। এই দৃশ্যে অভিভূত হইয়া সে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাহার মনিবের নিকট ছুটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,"মালিক আমার, আপনি একটি নিদর্শনের জন্যে অপেক্ষা করিতেছেন কেন এবং ইহা দেখিয়া আপনি কি করিতে চাহেন ? তিনি খোদ আসিয়া তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা আপনার মেজকে সম্মানিত করিয়াছেন। এবং তিনি বাস্তবিকই প্রত্যেকটা বাসন হইতে আহার্য গ্রহণ করিতেছেন। উপস্থিত সমস্ত লোকজনসহ মুহম্মদ আমীন খাঁ ঐ কক্ষে গমন করিলেন। কিন্তু মেয়ে লোকটা তাহার প্রাণের ভয়ে চুপি চুপি সরিয়া পড়িল। উজীর সেখানে পৌঁছিয়া স্বচক্ষে দেখিলেন, কুকুরটি মনের আনন্দে আহার করিতেছে। এই দৃশ্যে অসীম ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি মেয়ে লোকটিকে হত্যা করিতে চাহিলেন ; কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তিনি ইহাতে বিশ্বাসঘাতকতার আঁচ পাইয়া ক্রোধে ও বিরক্তিতে তাঁহার ওষ্ঠ দংশন করিলেন, কিন্তু কাহারও উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে না পারিয়া অবশেষে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যে স্থান তাঁহার উপযুক্ত, সেখানে গমন করিলেন।

সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা সংবাদ দিয়াছেন যে, আমীর জুমলা আজিমাবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে দরবারের আমীর-ওমরাহেরা তাঁহার

সুযাত্রা কামনা করিতে ও বিদায় লইতে নগরের বাহিরে গমন করিলেন। কিন্তু রুহুল্লাহ্ খাঁর পুত্র মরহুম নিয়ামত উল্লাহ্ খাঁ শহীদদের রাজা হুসায়ন বিন্ আলীর (তাঁহার উপর শান্তি হউক) স্মৃতি স্মরণে মুহর্‌রমের প্রথম দশ দিনের চিরাচরিত শোকানুষ্ঠান ও অন্যান্য আচরণ প্রতিপালনে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইল। তিনি মসিয়ায় ছিলেন বলিয়া আমীর জুমলার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ঘটনাক্রমে মুহম্মদ আমীন খাঁও ঐ সাক্ষাৎকারে হাজির ছিলেন। তিনি আমীর জুমলার এক পার্শ্বে ও নিয়ামত উল্লাহ্ খাঁ অপর পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই কৈফিয়ৎ শ্রবণে মুহম্মদ আমীন খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুরের প্রাসাদে কি কেহ পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছেন?" নিয়ামতুল্লাহ্ খাঁ উত্তর দিলেন, 'জী না, কিন্তু আমি শোক করি শহীদদের রাজার জন্যে।" প্রত্যুত্তরে মুহম্মদ আমীন খাঁ বলিলেন, "হুজুর, দয়া করিয়া বলুন; হুসায়ন ও এজীদ কি একই পবিত্র বংশের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন না? তাহা হইলে একজনকে বাদ দিয়া আমাদের কি আর একজনের জন্য শোক করা উচিত?" নিয়ামতুল্লাহ খাঁ উত্তর দিলেন, "আমাদের তরফের পবিত্র বংশের কনিষ্ঠ পুত্র নিহত হওয়ায় আমরা তাঁহার জন্য মাতম করি। কিন্তু পবিত্র পরিবারের আপনাদের কনিষ্ট পুত্র জয়লাভ করেন। আপনারা কি তজ্জন্য উৎসব করেন?" এই সকল কথায় আলোচনা গরম হইয়া উঠিলে তাঁহারা উভয়েই তাঁহাদের ছোরায় হাত দিলেন; কিন্তু আমীর জুমলা তাহাতে বাধা দিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দিলেন। উজীরের মনোভাবের এরূপ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার পর আমরা এখন জনসাধারণের ব্যাপারে প্রত্যাবর্তন করিতে পারি।

মুহম্মদ আমীন খাঁর মৃত্যু হইলে বাদশাহ্ কোন নূতন উজীর নিযুক্ত না করিয়া আওরঙ্গযীবের দরবারের অন্যতম প্রাচীন আমীর এনায়তুল্লাহ্ খাঁকে ঐ উচ্চপদের সহকারী হিসাবে কার্য করার জন্য নিয়োগপত্র দিয়া একটি মূল্যবান খেলাত দিয়া তাঁহাকে তাঁহার এই নূতন পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। এই সময় মহামান্য বাদশাহের মনোযোগ নিম্নলিখিত সংবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইল: তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য নিজামুলমুলক হায়দরাবাদের শাসনকার্য ... ক্রান্ত ব্যাপারের সুব্যবস্থা করিয়া হুজুরে আসিতেছিলেন। ফরিদাপুর পর্যন্ত আগ-

মনের পর বিজাপুরের কতিপয় বিদ্রোহী আফগান জমিদার ও কর্ণাটের কয়েকজন বিদ্রোহী জমিদার উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছেন জানিতে পারিয়া ঐ সকল অশান্তি দমনের জন্য দ্রুতপদে সেখানে গমন করিয়াছেন। বাদশাহের বিজয় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া ৫০০ আশরফি সহ শাহ রাজার পক্ষ হইতে যুগপৎ এক আরজ পেশ করা হইল। এই সংবাদ শ্রবণের পর বাদশাহ লাহোরের শাসনকর্তা আবদুস সমদ খাঁকে তাঁহার সুবায় গমনের জন্য বিদায় দিলেন এবং কমরুদ্দীন খাঁকে তাঁহার পিতার ইতিমাদুদ্দৌলাহ্ (সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভুষিত করিলেন; কিন্তু নির্ভীক ময়জুদ্দৌলাহ্ হায়দর কুলী খাঁন তাঁহার নাসির জঙ্গ উপাধি ফিরোজ জঙ্গ (যুদ্ধে জয়ী) পরিবর্তিত করাইয়া লইলেন। সাদৎ খাঁকে আকবরাবাদের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করা হইল; মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশকে ইলাহাবাদের শাসনকর্তার পদে উন্নীত করা হয়; তিনি তদভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু তাঁহার জায়গীরের জমির জন্য কতকগুলি অত্যধিক দাবী উত্থাপন করায় এবং আরও কয়েকটি কারণে তাঁহাকে পুনরায় নগর মধ্যে আহ্বান করিয়া তাঁহার কৌশলের জন্য তিরস্কৃত করা হইল। অতঃপর তাঁহাকে পুনরায় অনুগৃহীত করিয়া নূতনভাবে নিয়োগপত্র প্রদত্ত হইল। একই সময় হায়দরাবাদের সরকারী আখবার এই বিচিত্র সংবাদ বহিয়া আনিল: বাদশাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের ৭ই সফর। অসময়ে কর্ণাট

পানিতে কর্ণাট বিধ্বস্ত

প্রদেশে এত বিপুল বারিপাত হয় যে, সমস্ত নদী, হাউজ ও জলাশয়ের পাড়ের উপর দিয়া পানি বহিয়া ডাইনে বামে ১০/১২ ক্রোশ পর্যন্ত স্থান ডুবাইয়া ফেলে। অজস্র লোক ও গবাদি পশু জলমগ্ন হয় ও ভাসিয়া যায়; সমগ্র গ্রামরাজি ও শহরগুলি পানিতে বহিয়া নিয়া মৃত্তিকার সহিত সমান করিয়া ফেলে। ঐ দেশে একটা পর্বত দ্বিধাবিভক্ত হয়। ইহার ধ্বংস স্তূপের নিম্নে চাপা পড়িয়া যাবতীয় অধিবাসীসহ একটা গোটা শহর ও চতুষ্পার্শ্বের সমগ্র জনপদ বিধ্বস্ত হয়। ঐ সংবাদ শ্রবণের পর বাদশাহ তুর্ক আগির খাঁকে সঙ্গে লইয়া শিকারে গমন করিলেন। শিকারের আদ্যোপান্ত তিনি তাঁহার সহিত তুর্কিতে কথাবার্তা বলিলেন; এই সময় তিনি তাঁহার প্রতি কতকটা দয়া ও শুভেচ্ছা প্রদর্শনের দিকে খেয়াল রাখিলেন। ৩/৪ দিন পরে বাদশাহ্ কাহারও মধ্যস্থতা বা

সুপারিশ ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় তাঁহার পদ-মর্যাদা ১৫০০ সওয়ার দ্বারা বৃদ্ধি করিলেন এবং তাঁহার পরিচালনায় আরও ১০০০ সৈন্য স্থাপন করিলেন। তাহাকে যুগপৎ জহরতের কারুকার্য-খচিত একটা সরপেচও উপহার প্রদত্ত হইল। কয়েকদিন পরে আর এক হাজার সওয়ার দ্বারা তাঁহার পদমর্যাদা বর্ধিত ও তাহার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আর এক হাজার সৈন্য স্থাপিত হইল। ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তিনি চারি হাজার সওয়ারের মর্যাদায় উন্নীত ও ৩০০০ সৈন্যের প্রকৃত সেনাপতি হইলেন। একই সময় আকবরাবাদ হইতে সংবাদ আসিল যে, বুন্দেল খণ্ডের জনৈক জমিদারের সঙ্গে মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের জায়গীর লইয়া তাঁহার সহকারী দিলির খাঁর কিছু বিবাদ বাধায় ২০০০ অশ্বারোহীর একটা সৈন্যদল লইয়া স্বয়ং বিবাদমান ভূমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে গমন করেন। কিন্তু সম্মেলন বিবাদে পর্যবসিত হওয়ার পরিণামে যুদ্ধ বাঁধে; তাহাতে তাঁহার প্রায় ৮০০ সৈন্যসহ ঐ কর্মচারিটি নিহত হন। এই সংবাদে বাদশাহ্ মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের পুত্রের নিকট একটা খেলাত ও একটি সরপেচসহ একখানা সান্ত্বনা-লিপি প্রেরণের আদেশ দান করিলেন।

এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনা বর্ণনা করিয়া আমাদের বর্ণনা ব্যাহত করার পর আমরা আমাদের ইতিহাসের ধারার দিকে ফিরিয়া যাইব। আজমীর প্রদেশ ও আহমদাবাদ-গুজরাট শহরের অধিবাসীরা তাহাদের শাসনকর্তা নওয়াব রাজা জয়সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য তাহাদের কয়েকজনকে দরবারে প্রেরণ করিল। মুসলমানদের সহিত রাজার মতবিরোধ সর্বদা লাগিয়াই থাকিত। তাঁহারা দেখিলেন যে, সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের ঘৃণা এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের দরুন রাজা নানাবিধ বাড়াবাড়ির জন্য দোষী। এই সকল অভিযোগের ভিত্তি রহিয়াছে দৃষ্ট হওয়ায় রাজা দুইটা চাকরীই হারাইলেন। হায়দর কুলী খাঁ গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে ইহা অত্যন্ত ব্যাপকরূপে প্রদত্ত হইল; বাদশাহী খালিশা ভিন্ন দেওয়ানী ও হিসাবপরীক্ষা দফতর সহ সমস্ত জিলার ফৌজদারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল; সুরাট (সুরাট) নগর ও বন্দরের কর্তৃত্ব ও (শুল্ক) আদায় ও তৎসঙ্গে যুক্ত করা হইল। কাজেম খাঁ নামক গুজরাটের জনৈক মনসবদার নায়েব-সুবা বা সহকারী শাসনকর্তা

নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার মনসব ৩০০০ সওয়ার দ্বারা বর্ধিত এবং তাঁহার পরিচালনায় আরও ২০০০ সৈন্য স্থাপিত হইল। একটি পতাকা ও একটা নাগারা[২৯] সহ তিনি শুজাত খাঁ উপনামে ভূষিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা মুর্তজা আলী বেগ একহাজারী মনসব ও ৫০০ সৈন্যের সেনাপতিত্ব ও রুস্তম আলী খাঁ উপনাম পাইলেন। বরোদার আশ্রিত কয়েকটা পরগনার নায়েব-সুবার পদও এই সকল গৌরবের সহিত সংযুক্ত করা হইল। হায়দর কুলী খাঁর দেওয়ান রায় রঘুনাথকেও অনুরূপভাবে গৌরবান্বিত করা হইল। প্রথমে তাঁহার পদমর্যাদা ও সৈন্যবলের অধিকার বর্ধিত করিয়া তৎপরে তাঁহাকে গুজরাট ও সুরাট-বন্দরের দেওয়ানীতে যোগদানের আদেশ প্রদত্ত হইল। এযাবত কমরুদ্দীন খাঁ ঐ বন্দরের শুল্ক আদায় করিতেন। হায়দর কুলী খাঁর পদোন্নতির দরুন মুরাদাবাদের ফৌজদারী খালী হওয়ায় ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি উহা প্রাপ্ত হইলেন। খান দুরান ও রাজা জয়সিংহ সেবায়ী মুজাফ্ফর আলী খাঁ নামক জনৈক শরীফ ব্যক্তিকে দরবারে পরিচিত করেন; তাঁহাকে আজমীর প্রদেশের শাসনভার প্রদত্ত হইল; তদুপরি তাঁহাকে একটি রত্ন-খচিত সরপেচ[৩০] একটি খিলাত ও একটি হাতী উপহার দিয়া তাঁহার শাসনকর্তৃত্বে যোগদানার্থ বিদায় দেওয়া হইল। এনায়েৎউল্লাহ্ খাঁর পুত্র আতিয়া উল্লাহ্ খাঁ ডাক বিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন; পীলখানার তত্ত্বাবধায়ক তরবিয়ৎ আলী খাঁ পদচ্যুত হওয়ায় ফজল খাঁ ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। উভয়েই তাঁহাদের খেলাত বা সম্মানজনক পরিচ্ছদ পাইলেন। নিজামুল মুল্কের পক্ষে সাদুদ্দীন খাঁ তাঁহার তাবেদারি জানাইতে আসেন, ঐ সেনাপতির সুপারিশে তাঁহাকে ৩০০০ সৈন্যের পরিচালনা ভার ও একটা নাগারাসহ পঞ্চ হাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত করা হয়, তাঁহাকেও এখন একটা খেলাত দানে সম্মানিত করা হইল।

প্রায় এই সময় সংবাদ আসিল যে, তাঁহার মনিবের চাকরী শেষ হইয়াছে জানিতে পারিয়া রাজা অজিত সিংহের আহমদাবাদস্থ নায়েব বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে তিনি যে অত্যাচারের দোষে দোষী, শীঘ্রই তাহার পুরস্কার পাইবেন; তজ্জন্য স্থলবর্তীর আগমনের পূর্বে ও শেষবারের মত বিদায় লওয়ার পূর্বে তিনি বণিকদিগকে লুণ্ঠন ও শহর লুট

করিয়া এবং যথাসাধ্য ক্ষতি করিয়া অধিবাসিদের উপর পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহার হিসাবে ভুল হইল। নগরে তখন মেহের আলী খাঁ নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। রাজা অজিত সিংহের পক্ষে বখ্‌শী ও নায়েব-সুবা থাকাকালে তিনি হিসাব পরীক্ষা দফতরের হস্তে নাকাল হইয়া এখন অসন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব মনিব ও নূতন শাসনকর্তা হায়দর কুলী খাঁ উভয়ের সঙ্গেই তাঁহার অসদ্ভাব ছিল। হায়দর কুলী খাঁ নিজেও তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার এক বন্ধু সফদর খাঁ বাবীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই দুই ব্যক্তি আপনাদিগকে নায়েব-সুবার অত্যাচার হইতে মুক্ত করার জন্য একত্রে মিলিত হইলেন; যাহাতে তাঁহাদের উৎসাহ প্রকাশ পায় এবং নূতন শাসনকর্তার কৃতজ্ঞতা ও শুভদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কতকটা দাবী করিতে পারেন এমন কোন কাজ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহারা কিছু আফগান ও বহুসংখ্যক অধিবাসীকে তাঁহাদের সাহায্যার্থ আহবান করিয়া নায়েবের উপর আপতিত হইলেন। একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে তাঁহারা তাঁহাকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিলেন; এই যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক রাজপুত নিহত ও অবশিষ্ট আহত হইল। নায়েব সফদর খাঁ বাবীর এক ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন; তিনি সেখানে অবরুদ্ধ হইয়া অবশেষে সর্বাপেক্ষা অধিক অপমানের সহিত নগরের বাহিরে বিতাড়িত হইলেন। তাঁহার স্বদেশ যোধপুরে পলায়নকালে যে কয়েকটা গ্রাম ও

আজমীরে গোলযোগ

জিলা তাঁহার পথে ছিল তিনি সেগুলি লুটিয়া লইতে যত্ন গ্রহণ করিলেন। ঐ পাপিষ্ঠের উপর পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণান্তে মেহের আলী খাঁ ও তাঁহার সহকারী আহমদাবাদের দেওয়ান ও সায়্যিদদের আশ্রিত নাহের খাঁকে রাজকোষের সরকারী অর্থ ও সরকারী কার্যে হস্তক্ষেপে নিবৃত থাকিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। লোকটা নিজেকে শক্তিশালী মনে করিয়া তাঁহাদের ক্ষমতাপত্র দাবী করিলেন ও কলহ করিতে চাহিলেন। ব্যাপারটা লইয়া প্রকাশ্য বিবাদের সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হইল; এমন সময় হায়দর কুলী খাঁর লিখিত ও মোহরযুক্ত সনদ লইয়া শুজাত খাঁ সেখানে উপস্থিত হইলেন; তাহা দেখিয়া নাহের খাঁ শান্তি স্থাপন করার পর শহর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই সামান্য অশান্তিতে দরবারের অভিপ্রেত কয়েকটা পদোন্নতি ত্বরান্বিত হইল।

আজিমাবাদের সুবাদার সায়িদ নসরৎ ইয়ার খাঁ রুকুনুদ্দৌলাহ্ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন; তাহার মনসবও এক হাজার দ্বিগুনী সওয়ার[৩১] দ্বারা বৃদ্ধি করা হইল। শের আফগান খাঁকে ইজ্জতুদ্দৌলাহ্ উপাধি দিয়া মূলতানের শাসন-কর্তার পদে উন্নীত করা হইল। মথুরা ও আকবরাবাদের মধ্যবর্তী চারিটি দুর্গ ছিল দেশ উত্যক্তকারী অজস্র দস্যু ও জমিদারদের আশ্রয়, সাদৎ খাঁ এগুলি অবরোধ ও অধিকার করেন; ইহাতে তাঁহার ৪০০ সৈন্য বিনষ্ট ও বিপুল সংখ্যক অবরুদ্ধ হয়। এই সংবাদ পাইয়া বাদশাহ্ তাঁহাকে একটা খেলাত ও রত্নখচিত একখানা তরবারিসহ একটি অভিনন্দন-পত্র প্রেরণের আদেশ দান করিলেন। ন্যায়-বিচার সম্পাদন সংক্রান্ত ব্যাপারে অটল মনোনিবেশের জন্য যে আগ্রহ ও মেজাজের দৃঢ়তার দরকার, তাঁহার প্রকৃতিতে তাহা সামান্যমাত্র ভূষিত ও তাহা সাধনে বিশেষ ইচ্ছুক না থাকিলেও সৎকার্য সাধনে তাঁহার ইচ্ছা ও ন্যায়বিচারে তাঁহার প্রবৃত্তি প্রদর্শনের জন্য তিনি একটা লম্বা শিকলে একটা ঘণ্টা বাঁধিয়া শিকলটি পানির দিকমুখী অষ্টকোণ বুরুজের বাহিরে ঝুলাইয়া দিবার আদেশ দান করিলেন; তাহা হইলে যে কেহ নিজেকে মজলুম মনে করিবে, অথচ কেল্লার দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিবে না, সে ঐ শিকলের নিকট গিয়া ঘণ্টা বাজাইতে পারিবে। ৯ই শওয়াল সর্বাপেক্ষা আড়ম্বর ও ধুমধামের সহিত বাদশাহের সিংহাসনারোহণ উৎসব সম্পন্ন হইল। এই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে মুজফ্‌ফর আলী খাঁ আজমীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু সঙ্গতি ও উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জামের অভাবে রেওয়ারিতে ঘুরাফিরা করিয়া কালক্ষেপ করিতেছিলেন। ইহা রাজধানীর মাত্র তিন ক্রোশ দূরে। এমন সময় সংবাদ আসিল রাজা অজিত সিংহ যোধপুর হইতে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহীর একটি সৈন্যদলসহ ঐ দেশে যাত্রা করিয়াছেন। কিছু জমিদার ও রাজপুত তাঁহার দলবৃদ্ধি করিয়াছেন। নূতন শাসনকর্তা এখন ব্যগ্রভাবে আরও অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। অজিত সিংহ ইতিমধ্যে আজমীর অধিকার করিয়া সর্বপ্রথম ঢোল শহরৎ দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, সমস্ত দোকানদার ও পরিবার শান্ত থাকিয়া নির্ভয়ে যথারীতি তাহাদের ব্যবসায় চালাইয়া যাইবে; দ্বিতীয়তঃ পূর্বে মুসলমানদের প্রতি

নিজেকে সাধারণের অধিগম্য করার জন্য বাদশাহের বিচিত্র কৌশল

দুর্ব্যবহার করায় তাঁহার চরিত্রে অনেকটা কলঙ্ক স্পর্শে, তাহা দূর করার জন্য তিনি মসজিদসমূহের ইমাম ও ভৃত্যবর্গকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং যথারীতি তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনের সুপারিশ করিয়া ঐ সমুদয় পবিত্র স্থান মেরামতের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করিলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত সরকারী কর্মচারী ও শহরের সমস্ত লোককে একত্র করিয়া তাহাদের মধ্যে বাদশাহের পূর্ণহস্তের ছাপ মারা দস্তখতী শাহী ফরমান প্রদর্শন করিলেন; এতদ্বারা সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সর্বাপেক্ষা গম্ভীর-প্রতিজ্ঞা সহকারে তাঁহাকে আজীবন আজমীর-আহমদাবাদের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। রাজা সাব্বিাদদের অন্যতম বন্ধু ও একজন শক্তিশালী লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দলভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় রফিউদ্দরজাত মরণোন্মুখ হইয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র রওশান আখতার বাদশাহী সিংহাসনে তাঁহার স্থলবর্তী হওয়ার জন্য অভিপ্রেত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই মহারানী-মাতা এই সনদ তাহার হস্তে অর্পণ করেন। হিন্দু রাজা বাদশাহী দেওয়ানকে এই সনদের প্রামাণ্য নকল প্রস্তুত করাইবার আদেশ দান করিলেন। এগুলি তিনি তাঁহার নিজস্ব আবেদনসহ একই খামে মুড়িয়া দুইজন প্রধান উজীর খান দুরান ও জাফর খাঁ উভয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আবেদনের সারমর্ম এইঃ "তাঁহাকে দুইটি শাসন কর্তৃত্বে বঞ্চিত করা প্রদত্ত বিশ্বাসের খেলাফ হইলেও বাদশাহের খুশীর খাতিরে তিনি আহমদাবাদ-গুজরাট প্রদেশ অর্ঘ্যরূপে দান করিয়াছেন। এরূপ আত্মত্যাগের পরেও তাঁহাকে আজমীর প্রদেশের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হইলে তাঁহার নিজ গোত্র ও সমগ্র জগতের চক্ষে এত গভীররূপে তাঁহার মর্যাদাহানি ঘটিবে যে, তিনি আর মুখ দেখাইতে পারিবেন না। সদয়চিত্ত লোকের নিকট সর্বদাই প্রাণের চেয়ে সম্মানের মূল্য অধিক এবং তাঁহার জীবন ও মস্তক ঐ একটি মাত্র বিষয়ে বাজী রাখা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার আশা, তাঁহার অবস্থা বিবেচনায় তাঁহারা ঐ দুইটি প্রদেশের একটির শাসন-ভার তাঁহার হাতে রাখিয়া দিবেন।" এই বৎসরেরই জিলহজ্জ মাসে পাদিশাহ বেগম[২২] ইহলোক ত্যাগ করেন; এই শাহজাদী ছিলেন আওরঙ্গযীবের কন্যা এবং জীনতুন্নেসা নামে পরিচিতা ছিলেন।

আজমীরে অশান্তি

রাজকোষে তখন এত অল্প টাকা ছিল যে, হিন্দুরাজার সহিত তখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইল। এই পত্র লাভে বিশেষতঃ একারণে খান দুরান কলহ-বিবাদে নিরস্ত থাকিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু আজমীর রাজধানীর অঞ্চল-সংলগ্ন প্রদেশ; তদুপরি সেখানে অজস্র প্রাচীন ও পুণ্যবান লোকের কবর ও স্মৃতিস্তম্ভ অবস্থিত; তজ্জন্য বাদশাহের প্রতি অনুরক্ত কোন মুসলমান ভিন্ন অন্য কাহারও হস্তে ইহার ভারার্পণ অশোভন এবং হিন্দু রাজাকে গুজরাট সমর্পণই অধিকতর সঙ্গত বিবেচিত হইল। কিন্তু তাঁহার দরবারের সমস্ত আমীর-ওমরাহসহ খোদ বাদশাহ্ বিশেষতঃ হায়দর কুলী খাঁ রাজার শর্ত মানিয়া লওয়া অপেক্ষা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার উদ্ধত্যের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দানেই অধিকতর ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ইহা এত সহজ ছিল না। অনেক পরীক্ষার পর আমীরদের কেহই ঐ কার্য গ্রহণের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিলেন না। স্বয়ং হায়দর কুলী খাঁ এই উদ্দেশ্যে আকবারাবাদ হইতে সাদৎ খাঁকে আহ্বানের প্রস্তাব করিলেন। এই সেনাপতি ছিলেন একজন সাহসী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক। তিনি তৎক্ষণাৎ বাদশাহের হুকুম তামিল করিয়া এত ত্বরিতগতিতে দরবারে হাজির হইলেন যে, ডাকযোগে আসিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি তাঁহার অশ্বারোহী ও সৈন্যদিগকে তাঁহার পদাতিক, সাজ-সরঞ্জাম ও গোলন্দাজদের লইয়া যথাসাধ্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণের আদেশ দিয়া আসেন। দরবারে পৌঁছিয়া তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁহার ইপ্সিত-অভিযানের জন্য তাঁহাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের সঙ্গতির কথার অবতারণা করিলেন। তখন অচিরে দেখা গেল যে, আমীরদের মধ্যে কয়েক-জন ঐ কার্যে তাঁহার সহগমনে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহার মতের বিরোধিতা করাই লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছেন। একই সময় সংবাদ আসিল যে, তাঁহার নিকট সৈন্যদের প্রাপ্য মিটাইতে না পারিয়া মুজফ্ফর আলী খাঁ তাঁহাদের খোরপোষের জন্য তাহাদিগকে আজমীরের অন্তর্গত ২।৩টি শহর লুণ্ঠনের অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু বিদ্রোহীরা তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাদের সেনাপতিকে বেষ্টন ও অবরোধ করিয়া তাহাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধার্থ তাঁহাকে তাঁহার সর্বস্ব ত্যাগে বাধ্য করিয়াছে, এমন কি তাঁহার ব্যবহারের হাতী-ঘোড়াও বাদ দেয় নাই। এরূপ দুরবস্থায় নিপতিত হওয়ায়, এমন

কি নিজের জীবনের জন্যও আশঙ্কা হওয়ায় তিনি আম্বরে পলায়ন করিয়া রাজা জয়সিংহের সহকারীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান হইতে তিনি তাঁহার অভিষেকের খেলাত ও শাসনকর্তার সনদ দুইই দরবারে ফেরত পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহার অপমানের তখনও শেষ হয় নাই। অজিত সিংহের দুই পুত্র বহু সংখক সৈন্য লইয়া তাঁহার শাসনভুক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া বাদশাহী-মুল্লুকের ৩।৪টি গ্রাম লুণ্ঠন করিলেন। ইতিমধ্যে কিছু দস্যু ও জমিদার একত্রে মিলিত হইয়া এবং তৎকালীন গোলযোগ ও অজিত সিংহের সম্মতির সুযোগ লইয়া নানুন শহরের উপর আপতিত হইল। ঐ স্থানের ফৌজদার বায়যীদ খাঁ আগেই বাহির হইয়াছিলেন; তাহাদের সংখ্যাধিক্যে নিজেকে পরাভূত মনে করিয়া তিনি সর্বশক্তি সহকারে পলায়ন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন বাস্তবিকই শহরের মধ্যে। গুরুতর বিপদ ও অসুবিধার মধ্যেও তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। নিজেদের শাসকদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ঐ দুর্ভাগা স্থানের প্রধান অধিবাসীরা তাঁহাদের সম্পত্তি ও তাহাদের পরিবারের ইজ্জত রক্ষায় যতদূর সম্ভব মহার্ঘমূল্যে তাঁহাদের জীবন বিক্রয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহারা যতক্ষণ পারিলেন সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভারতীয় প্রথানুযায়ী স্বহস্তে তরবারি দ্বারা তাঁহাদের পরিজনদিগকে হত্যা করিয়া নিজেরাও আত্মহত্যা করতঃ সব শেষ করিলেন। পাপিষ্ঠ জালিমেরা অবশেষে শহরটি দখলে আনিয়া এত নিষ্ঠুরভাবে উহা লুণ্ঠন করিল যে, নরনারী কাহারও গায়ে একখানা নেক্‌ড়াও রহিল না; অজস্র লোককে তাঁহারা বন্দী করিয়া লইয়া গেল। এই সংবাদ দরবারে পৌঁছিলে খান দূরান স্বয়ং অজিত সিংহকে শাস্তি দানে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার সাজ-সরঞ্জাম বা পেশখানা[৩৩] শহরের বাহিরে প্রেরিত হইল। কিন্তু দরবারের মোগলদের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের শত্রুতা থাকায় এবং এরূপ অভিযানের পক্ষে সরকারী কোষাগারে কিরূপ অর্থাভাব তৎসম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন বিধায় তিনি আর অগ্রসর না হইয়া নানা প্রকার টালবাহানা করিয়া জনসাধারণকে আমোদিত করিতে লাগিলেন। হায়দর কুলী খাঁ এযাবত তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু অসন্তোষ পোষণ করিতেন; এখন তিনি তাঁহার খেদমতের প্রস্তাব দিলেন এবং ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাঁহার ভাগ্যের অনুসরণের জন্য সর্বাপেক্ষা

পবিত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। এখন তিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ সাজিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য-দলের পশ্চাদ্ভাগ পরিচালনার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার পেশাখানা শহরের বাহিরে লইয়া যাওয়ার আদেশ দান করিলেন। এই কার্যে অকপটচিত্ত হইয়া তিনি তাঁহাকে অনুরোধ ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ অভিযান পরিকল্পনায় খান দুরানের বিশেষ ইচ্ছা না থাকায় তাহাতে কোনই কাজ হইল না। তিনি গোপনে বাদশাহ্‌কে বুঝাইলেন, "রাজা যদি বাদশাহী সৈন্যদলের উপর কোন সুবিধা লাভ করেন, তাহা হইলে কম বেতনের সৈন্যদল, শূন্য কোষাগার এবং দলাদলি ও মতবিরোধপূর্ণ দরবার লইয়া বিশৃঙ্খলা রোধ কঠিন হইবে; এমনকি তিনি পরাজিত ও রণক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তিনি তাঁহার পিতৃ-রাজ্যের দুরারোহ পর্বতরাজি ও গভীর উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; সেখানে তাঁহাকে অনুসরণ করা কাহারও ধৈর্য ও সাহসে কুলাইবে না। গৃহে যখন সাধারণ স্বার্থের খাতিরে উৎসাহের এত অধিক অভাব এবং অনৈক্য ও দুর্বুদ্ধির প্রতি মনের এমনি ঝোঁক যে, কার্যতঃ প্রত্যেকের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তখন এরূপ অভিযান পরিচালনা করা সঙ্গত হইবে না।" এই প্রস্তাব কমরুদ্দীন খাঁ ভিন্ন আর কাহাকেও অভিভূত করিল না। খান দুরান এত অনিচ্ছা প্রদর্শন করায় তিনি অভিযানের ভার লইলেন। কিন্তু ভাবী অভিযানে আবদুল্লাহ্‌ খাঁ ও নজমুদ্দীন আলী খাঁর খেদমত কাজে লাগাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণের জন্য আরজ করিলেন। অনুরূপভাবে তিনি আরও কয়েকটি প্রস্তাব করিলেন। তাহা বাদশাহের মনঃপূত না হওয়ায় এবং আবদুল্লাহ্‌ খাঁকে মুক্তিদানে অধিকাংশ আমীরের নিকট অত্যন্ত অবাঞ্ছিত হওয়ায় কমরুদ্দীন খাঁর অভিযান অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। এই উপলক্ষে কমরুদ্দীন খাঁ ও খান দুরানের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হওয়ায় শেষোক্ত ব্যক্তি কয়েকদিন দরবারে না গিয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের দুইজন প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটা অসঙ্গত বিবেচনায় বাদশাহ্‌ কোন উপায়ে তাঁহাদের পুনর্মিলন ঘটাইয়া অসন্তোষ ও নিরুৎসাহিতা বিদূরিত করিলেন। ইতাবসরে এই সমুদয় ঝগড়াঝাটি ও পুনর্মিলনের মধ্যে অজিত সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইল।

আজমীরে গোলযোগের সমাপ্তি

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজা ও খান দুরানের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পত্র বিনিময় হইল। তাঁহার মন শান্ত ও তাঁহার অনিষ্টকর অভিপ্রায় হইতে তাঁহাকে সংশোধনের জন্য তিনি তাঁহাকে তাঁহার বিদ্রোহের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করিতে বলিলেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি সংশোধিত হন। যুগপৎ সংবাদ আসিল যে, নিজামুল মুল্‌ক হুজুরে অসিতেছেন। কর্ণাটের ব্যাপারের শৃঙ্খলা বিধান করিয়া সুবাদার জিলহজ্জের ১লা তারিখে তাঁহার রাজধানী আওরঙ্গাবাদে[৩৪] প্রত্যাবর্তন করিলেন। বাদশাহের হুজুরে গমনের অভিপ্রায়ে ১৭ই জিলহজ্জ তিনি সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। কিছুকাল পূর্বে বাদশাহ্ দিয়ানত খাঁ নামক জনৈক সম্রান্ত ব্যক্তিকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ানের পদের জন্য প্রস্তাব করেন; বুরহান পুরে পৌঁছিয়া নিজামুল মুল্‌ক তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং একটি খেলাত ও একটা হস্তী উপহার দিয়া তাঁহাকে তাঁহার পদের দখল দান করিলেন। ঐ সুবাদারের আগমন এখন নিশ্চিত বলিয়া তিনি উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যপার সম্পর্কে আর যাবতীয় আলোচনা ও সভা স্থগিত রাখা হইল।

কাবুলে কয়েকটা গোলযোগ দেখা দিলে সরবুলন্দ খাঁ তাঁহার পুত্র খানেজাদ খাঁকে তাহা দমন করিতে প্রেরণ করেন। কাবুল ও পেশওয়ার হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, সেখান হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্তন কালে আমীর জুমলার পুত্র মুহম্মদ আমীন খাঁ যেখানে একবার লুণ্ঠিত হন, তিনিও সেখানে ভ্রমণ-বিরতি করেন। এখন খানেজাদ খাঁর ভাগ্যেও একই দশা ঘটিল; এত অজস্র পার্বত্য আফগান তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল যে, তাহাদিগকে দলে দলে পিপীলিকা ও ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের সঙ্গেই তুলনা করা চলিতে পারে। যুবক আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে অত্যন্ত তৎপর যুদ্ধ বাঁধিল। শাহ মুজাহেদ নামক একজন চরিত্রবান কর্মচারী তাঁহার সৈন্যদল পরিচালনা করেন। তাঁহার প্রায় ৮০০ সর্বাপেক্ষা সাহসী সৈন্যের প্রাণপাতের পরে তিনি আহত ও বন্দী হন। সর্বাপেক্ষা অধিক তৎপরতা প্রদর্শন সত্ত্বেও খানেজাদ খাঁর দুইটি অশ্ব নিহত ও একটি বন্দুকের গুলিতে তিনি স্বয়ং আহত হন। আর যুদ্ধ করা নিরর্থক দেখিয়া তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অল্প কয়েকজন সৈন্য সহ নিজের প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁবু, হস্তী ও কামান-বন্দুকসহ তাঁহার

সমস্ত বোঝাপত্র শত্রুদের হস্তগত হয়। লাহোরের শাসনকর্তা আবদুস সমদ খাঁর পুত্র জাকারিয়া খাঁ কাশ্মীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। খবরে অনুরূপ ভাবে উল্লিখিত হইল যে, ঐ দেশে অশান্তির ও মরহুম মুহতাবী খাঁর পুত্র আশরাফুদ্দীন তাঁহার সহকারীকে বেষ্টন ও অবরোধ করিয়াছেন শুনিয়া আবদুস সমদ খাঁ ঐ উদ্ধত ব্যক্তিকে শাস্তি দানে মনস্থ করিলেন। ৩/৪ হাজার মোগল[২৫] অশ্বারোহী লইয়া তিনি এত দ্রুতবেগে যাত্রা করিলেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে সে দেশে হাজির হইলেন। এরূপ সেনাপতির বিরোধিতা করিতে সাহসী না হইয়া আশরাফুদ্দীন প্রথমে দূরে সরিয়া রহিলেন। তৎপর বিনা প্রতিবাদে ও বিনা রক্তপাতে বিনীতভাবে বশ্যতা স্বীকার করা সমধিক নিরাপদ মনে করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ গোলযোগ প্রশমিত হওয়ায় দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কাশ্মীরে বহু লোক দানস্বরূপ সরকারী কোষাগার হইতে বৃত্তি এবং একই নীতিতে আরও অনেকে জায়গীর-জমি ভোগ করিতেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা বিগত গোলযোগে জড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল, তিনি তাহাদের প্রত্যেকের সমস্ত বৃত্তি কাটিয়া দিবার ও তাহাদের জায়গীর বাজেয়াফ্‌ত করার আদেশ দান করিলেন।

কাশ্মীরে অশান্তি

এই আনন্দময় সংবাদ শাহীপরিবারের পক্ষে একটি আরও প্রীতিকর সংবাদ আনয়ন করে বলিয়া মনে হইল। ১১৩৪ হিজরী সনের নিষিদ্ধ মুহর্‌রম মাসের[২৬] ২৯শে বৃহস্পতিবার বাদশাহের একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল; বিজয়ী সফর মাসের ১৯শে তিনি বাদশাহ্ ফর্‌রুখ সিয়ারের কন্যার পানিপীড়ন করিলেন। বাদশাহের মর্যাদা রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ধূমধাম ও আড়ম্বরের সহিত বিবাহানুষ্ঠান সম্পাদিত হইল। সিংহ রাশিতে কাবিন পঠিত ও ধর্মীয় ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পন্ন হইল। এই সমুদয় উপলক্ষে হিন্দুস্তানে প্রচলিত ভোজ, আতশবাজি, সঙ্গীত ও নৃত্যসহ কিছুকাল ধরিয়া অনুষ্ঠান চলিবার পর শাহজাদী রাজত্বকারী-সম্রাজ্ঞী ও বাদশাহী শয্যার সুগন্ধলিপ্ত কনেতে পরিণত হইলে উৎসব সমাপ্ত হইল।

ইতঃমধ্যে নিজামুল মুল্‌ক (রাজধানীর) কাছে আসিয়া পড়িতেছিলেন; দাক্ষিণাত্যের বিষয়গুলির শৃঙ্খলবিধান, অশচারের সংশোধন ও কর্ণাটের দুর্দান্ত

লোকদিগকে শায়েস্তা করিয়া ঐ সুবাদার সাম্রাজ্যের রাজধানীর দিকে মনোনিবেশ করিলেন। সেখানে পৌছিয়া তিনি রবীউস সানির ১৩ই. বৃহস্পতিবার বাদশাহের হুজুরে কুর্নিশ করার সম্মান লাভ করিলেন। একই বৎসরের ৬ই জমাদিউল আওয়াল রবিবারের মধ্যাহ্নের কিঞ্চিত পূর্বে তিনি উজীরের পদে উন্নীত হইলেন এবং চারিপ্রস্থের বিশেষ খেলাত[৩৭] এবং বাদশাহী রত্নাধার ও অন্যান্য উপহার লইয়া প্রচলিত প্রথায় ঐ উচ্চপদের অভিষেক-পত্র প্রাপ্ত হইলেন। পরবর্তী পরিবারে একই—বৎসরের জমাদীউস সানীর ৩রা তারিখে চিরাচরিত ক্রিয়া-পদ্ধতির সহিত নওরোজ[৩৮] বা নববর্ষ (উৎসব) দরবারে অনুষ্ঠিত হইল। এযাবত বাদশাহের উপাধি ছিল 'সফলতার প্রভু, তাহা এখন আবুলফতহ্ (বিজয়ের জনক) ও নাসিরুদ্দিনে (ধর্মের সহায়) পরিবর্তিত হইল। একই বৎসরের ৬ই রজব খালিশার পদ রাজা গুজর মলকে প্রদত্ত ও সৈন্য সমাবেশের দেওয়ানী শাহ্ স্যদুল্লার উপর অর্পিত হইল। নিজামুল মুলক ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর-প্রকৃতি, সংরক্ষিত ব্যবহারকারী ও অত্যন্ত ক্ষমতা-প্রিয় লোক। ইতিমধ্যে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-গুলির শৃঙ্খলা বিধান করিয়া তৎপরে তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত প্রকৃ-তির অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন। তিনি বাদশাহ্‌কে প্রকাশ্যে গম্ভীর ও গুরুতরভাব ধারণ, তাঁহার নৈতিক চরিত্র সংশোধন; তাঁহার ভৃত্যদের দমন, প্রত্যেক কার্যের জন্য তাঁহার সময় নির্ধারিত ঘণ্টায় বিভক্ত ও বিষয়ের (রাজাদের একটা প্রয়োজনীয় কর্তব্য; এতদ্ভিন্ন তাঁহারা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার প্রত্যাশা করিতে পারেন না) জন্য একটা সময় নির্ধারণ করিতে, এক কথায় যোগ্যতার সহিত কর্তৃত্ব ও রাজত্বের অধিকারী কর্তব্য সমাধা করিতে উপদেশ দিতেন। বাদশাহ্ এই সমুদয় উপদেশ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন, কিন্তু এগুলি তাঁহার নিকট ভাল লাগিত না। ঐ শাহজাদা ছিলেন তখনও যৌবনের উৎসাহে উদ্দীপিত ও রাজত্বের গর্বে গর্বিত; তাঁহার মনের গতি ছিল সম্পূর্ণরূপে সুখভোগ ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি আসক্ত জীবনের দিকে। এই সকল উপদেশ দরবারের অধিকাংশ আমীর, বিশেষতঃ খান দুরানের নিকটও অধিকতর তৃপ্তিদায়ক ছিল না। তাঁহার দ্বারা অপরি-হার্য রূপে অতিক্রান্ত হইবেন বলিয়া খান দুরান দরবারে নিজামুল মুলকের

ন্যায় লোকের উপস্থিতি সহ্য করিতে পারিতেন না। তজ্জন্য উজীর সর্বদাই কুদৃষ্টিতে নিরীক্ষিত হইতেন। তাঁহার সহিত খিটখিটে ভাষায় কথাবার্তা বলা হইত। সভাসদ ও প্রধান খোজাদের প্ররোচণায় একদা হায়দর কুলী খাঁ এতদুর অগ্রসর হইলেন যে, তাঁহার সাক্ষাতে আত্ম-সংবরণ করিতে ভুলিয়া গেলেন। এই সম্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন একজন সাহসী, উচ্চাকাঙ্খী ও অত্যন্ত ক্ষমতা-প্রিয় লোক; তাঁহার জায়গীর, গুজরাটের সুবাদারী ও ঐশ্বর্যের জন্য সমগ্র জগতে বিখ্যাত বোহরা[৩৯] সওদাগর আবদুল গফুরের সম্পত্তির একাংশ বাজেয়াফ্‌ত করিয়া তিনি এত বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন যে তাঁহার ধন-সম্পদ কোটী দ্বারা গণনা করা হইত। তিনি এত গর্বিত ও এত উচ্চাকাঙ্খী হন যে, মরহুম হুসায়ন আলী খাঁর মত বড় হইবার আশা পোষণ করিতেন; তিনি মনে করিতেন, নিজামুল মুলকের ধ্বংস হইতেই এই পরিকল্পনার সূচনা হওয়া উচিত। তাঁহার এই পরিকল্পনা খোদ বাদশাহ ও অন্যান্য আমীর উভয় পক্ষের নিকট হইতে উৎসাহ ও সাহায্য পায়; একদিকে তাঁহারা হায়দর কুলী খাঁর উদ্ধত মেজাজের সাহায্যে নিজামুল মুল্‌কের গাম্ভীর্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চাহিলেন, অন্যদিকে তাঁহার নিকট হইতে গুজরাটের শাসন কর্তৃত্ব কাড়িয়া লইতে এবং নিজামুল মুল্‌কের ন্যায় এরূপ সন্দেহাতীত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী লোকের সহিত তাঁহার বিবাদ বাঁধাইয়া তাঁহার ইপ্সিত অভিযান বন্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। পক্ষান্তরে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসে থাকায় এই অর্থলোভী মন্ত্রী ঐ কর্ম প্রত্যাখ্যান করিবেন বলিয়া বোধ হইল না। পরিশেষে তিনি ঐ অভিযানে বাহির হইলেন।

পর বৎসরে ১১৩৫ হিজরীতে বাদশাহের পরিবারে একটা ঘটনা ঘটিল তাহাতে তাঁহার মন বিবাদক্লিষ্ট না হইয়া পারিল না। ১লা মুহর্‌রম মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে সম্রাজ্ঞী মালেকা জামানী[৪০] শয্যাগতা হইলেন। ঐ মাসের ১৩ই তারিখে হায়দর কুলী খাঁ বরখাস্ত হওয়ায় নিজামুল মুল্‌ক একটা খিলাতে গুজরাটের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইলেন এবং ঐ বৎসরের ২রা সফর মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎ পরে মন্ত্রী তাঁহার ইপ্সিত অভিযানে যাত্রা করিলেন।

বুরহানুল মুল্‌ক সাদত খাঁ আকবরাবাদের শাসন কর্তৃত্ব ভোগ করিতেন। পক্ষান্তরে অযোধ্যার শাসনভার ছিল রাজা গুর্দহর বাহাদুরের হাতে;

তাঁহাকে মালবের শাসনকর্তার পদে বদলি করা হইলে অযোধ্যার শাসন-কর্তৃত্বও সাদৎ খাঁকে প্রদত্ত হয় বলিয়া বোধ হয়। পুনরায় তাঁহার পুরাতন সুবা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি রায় নীলকান্ত নাগর নামক জনৈক সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিজের বদলে আকবরাবাদে রাখিয়া গেলেন। পার্শ্ববর্তী জনৈক জমিদারের সহিত অচিরে এই প্রতিনিধির বিবাদ বাঁধিল; একদিন তিনি হাতীতে চড়িয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইলে জমিদারের প্ররোচনায় জনৈক জাঠ তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিল; একটা উচ্চবৃক্ষে বসিয়া সে নীলকান্তের অজস্র অনুচরের মধ্যে ধীরে-সুস্থে তাঁহার দিকে বন্দুক তাক করিল এবং কার্যসিদ্ধির পর পলায়নের সময় পাইল। সাদৎ খাঁ ইহা জানিতে পারিয়া ঐ দুইটা প্রদেশের দখল লইয়া সেখানে তাঁহার শাসন কায়েম করা পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ স্থগিত রাখিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এই সুযোগে খান দুরান[৩১] ঐ স্থান রাজা অজিত সিংহ সেবায়ীর নামে বরাদ্দ করাইলেন; ফলে নব-লব্ধ অযোধ্যা ভিন্ন সাদৎ খাঁর হাতে আর কিছুই রহিল না।

নিয়োগ-পত্র পাইয়া অজিত সিংহ চূড়ামন জাঠের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি ছিলেন ঐ প্রদেশের একজন শক্তিশালী জমিদার। তদনুযায়ী তিনি তাঁহাকে জমিদারী হইতে বিতাড়িত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার তোন দুর্গ অবরোধ করিলেন। চূড়ামনের ভ্রাতুষ্পুত্র বুদন সিংহকে নিজের দলে ভাগাইয়া নিয়া তিনি এত নিবিড়ভাবে দুর্গ অবরোধ ও উহার প্রাচীরের সম্মুখে এত অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন যে, চূড়ামনের পুত্র মোহকুম সিংহ অবরুদ্ধদের দুর্দশা ভোগের জন্য পূর্ণ দরবারে তাঁহার পিতাকে তিরস্কার করিলেন; এমন কি পিতার প্রতি সমুচিত সম্মান ভুলিয়া গিয়া তৎপ্রতি অসঙ্গত ভাষা ব্যবহারেও কুণ্ঠিত হইলেন না। একমাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ পিতা পুত্রকে তাহার উপযুক্ত শাস্তি দানে বিরত হইলেন, কিন্তু নিজের অসন্তোষ দমন করিতে না পারিয়া হিন্দু জাতির স্বাভাবিক চিন্তাহীনতাবশতঃ বিষপানে মৃত্যুবরণ করিলেন। যুবক তাঁহার অধিকারভুক্ত জনপদ শাসনে অক্ষম ও অজিত সিংহের শ্রেষ্ঠতর শাসন ও প্রতিভার নিকট পরাভূত হইয়া আত্মসমর্পনে সম্মত হইলেন। রাজা তখন

বুদুন সিংহকে জমিদারী শাসনে নিযুক্ত করিয়া দরবার হইতে এই নিয়োগ মঞ্জুর করাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার ছত্রভঙ্গ প্রজাদিগকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া দেশকে পূর্বের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী ও উন্নতিশীল করিতে উপদেশ দিলেন। এত অধিক সহায়তা পাইয়া বুদুন সিংহ মোহকুম সিংহের অনুচরদের অধিকাংশকেই নিজের দলে ভিড়াইতে সমর্থ হইলেন। মোহ্কুম সিংহ নিজেকে বিপন্ন মনে করিয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। বুদুন সিংহ তৎক্ষণাৎ তাহা দখলে আনিয়া উহাকে নিজের বাসস্থানে পরিণত করিলেন। প্রায় এই সময় রাজা গুর্দহর বাহাদুর তাঁহাকে প্রদত্ত সুবা মালবে গমন করিয়া ঐ প্রদেশে চমৎকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন।

আমরা নিজামুল মুলককে তাঁহার নূতন সুবা গুজরাটের দখল লইতে যাইতে রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি বাস্তবিকই একটা উৎকৃষ্ট সৈন্যদল ও একটা উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ বাহিনী লইয়া সেখানে গমন করিতেছিলেন। এই সময় কাজের সুবিধার্থে তিনি হায়দর কুলী খাঁর কিছু সৈন্য ভাগাইয়া নেওয়ার ফন্দি করিলেন। তাঁহার সৈন্যদল প্রধানতঃ তুরানী, মোগল এবং পনি, গজনী ও বনী আফগানদের দ্বারা গঠিত। তাঁহার নিজেরও ঐ সমুদয় গোত্রের কিছু কর্মচারী ও আস্ত সৈন্যদল থাকায় তিনি তাহাদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান লোকদিগকে নির্বাচিত করিয়া নানা ছুতায় তাহাদিগকে হায়দর কুলী খাঁর শিবিরে প্রেরণ করিলেন। তাহারা নিজ জাতির অধিকাংশ লোককে তাঁহার স্বার্থের অনুকূলে আনয়ন করিল। এই ব্যবস্থার ফলে শুজাত খাঁ, মেহের আলী খাঁ ও রুস্তম আলী খাঁ গুজরাটী; সালাবৎ খাঁ ও জবর দস্ত খাঁ বনি আফগানি এবং আসাদ খাঁ গজনীর ন্যায় কতিপয় বিখ্যাত সেনাপতি ও ইরাণী-তুরাণী[৪২] উভয়-জাতীয় বহু সাধারণ সৈন্য হায়দর কুলী খাঁর শিবির ত্যাগ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এরূপ ব্যাপক দলত্যাগে বজ্রাহত হইয়া এই সেনাপতি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেনঃ তৎকালে তাঁহার শরীর শুকাইয়া গেল ও মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। একখানা পর্দাঘেরা কুর্সীতে[৪৩] আরোহণ করিয়া তিনি রাজধানীর পথে যাত্রা করিলেন; তাঁহার ভাগ্যের অনুসরণকারী কতিপয় বন্ধুও অনুরূপ

নিজামুল মুল্‌কের হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য বাদশাহ্ কর্তৃক তাঁহাকে গুজরাটের শাসন কর্তৃত্ব দান

ভাবে গাড়ীতে করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। নিজামুল মুল্ক এভাবে কার্য-ক্ষেত্র ও দেশের অধিকারী হইয়া রাজধানী গুজরাট যাত্রা করিয়া সমগ্র দেশ সহ উহা দখলে আনিলেন। সেখানে স্বীয় শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি উহা তাঁহার মাতুল হামিদ খাঁ ওরফে জংলী শাহজাদার হাতে ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া অত্যল্পকাল পরে তাঁহার দাক্ষিণাত্য[৭৬] সুবা ও তাঁহার রাজধানী আওরঙ্গাবাদ পুনরর্দশনে যাত্রা করিলেন। ইতোমধ্যে যে কয়জন বন্ধু ও যে সামান্য ধনসম্পদ তাঁহার শিবিরে ছিল, হায়দর কুলী খাঁ তৎসহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেনঃ সেখানে পৌঁছিলে কয়েকদিন (দরবার হইতে) কেহই তাঁহার খোঁজ-খবর লইল না।

প্রায় এই সময় ১১৩৫ হিজরীর ১৩ই জমাদিউস্‌সানী রবিবার চিরাচরিত গাম্ভীর্যের সহিত নওরোজ অনুষ্ঠিত হইল। একই বৎসরের ১১ই রজব রোশনাবাদী[৭৭] হইতে বাদশাহের এক কন্যা জন্মিল; তাঁহার নাম রাখা হইল জাহান আফরোজ বানু বেগম। কয়েকদিন পরে হায়দার কুলী খাঁ দরবারে হাজিরা দিলে বাদশাহ্ তাঁহাকে অত্যন্ত সদাশয়তার সহিত অভ্যার্থনা করিলেন এবং তাঁহার অবস্থার প্রতি করুণা দেখাইয়া তাঁহাকে আজমীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। রাজা অজিত সিংহকে তাঁহার বিদ্রোহী স্বভাব ও ঔদ্ধত্যের জন্য শাস্তিদান করাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। এই সেনানায়ক ছিলেন একজন সাহসী ব্যক্তি; অজিত সিংহের প্রতি তিনি আন্তরিক শত্রুতা পোষণ করিতেন। তিনি আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে ঐ হিন্দুরাজার সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার উপযোগী একটা সৈন্যদল ও গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করিয়া ফেলিলেন। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাঁহার সৈন্যদের আক্রমণ করিলেন; কিন্তু অজিত সিংহ বিবাদে অসম্মত হইয়া পলায়ন করিলেন। তখন ঐ বৎসরের শাবানের শেষ ভাগ। এই সময় কোতয়াল কাসেমের পুত্র জনৈক সায়্যিদ এক সোরপোচ প্রহরীর ছোরার এক আঘাতে নিহত হইলেন। অন্যের তরবারিতে সে নিজেও গুরুতররূপে আহত হইল; পিতার বিচারালয়ের সন্নিকটেই এই ঘটনা ঘটিল। একই বৎসরের ১লা শওয়াল রবিবার নিজামুল মুল্ক দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া হুজুরে হাজিরা দিলেন।

২৪শে জিলকদ বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে বাদশাহের এক পুত্র জন্মিল। ১১৩৬ হিজরীর মুহর্‌রমের প্রায় মধ্যভাগে রাত্রিতে আকাশে একটা দীর্ঘপুচ্ছ ধূমকেতুর অবির্ভব হইল; দশ বার দিন পর্যন্ত দেখা যাওয়ার পর তাহা অন্তর্হিত হইল। এই মাসের শেষে বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র ইহলোক ত্যাগ করিলেন।[৪৬]

এই বৎসর দরবারের প্রধান পদগুলিতে অনেক তরক্কী ঘটিল। মুহম্মদ আমীন খাঁর পুত্র কমরুদ্দীন খাঁকে আমরা কিছুকালের, বরং কয়েকদিনের জন্য ওজারতি করিতে দেখিয়াছি; এখন তিনি দ্বিতীয় বখ্‌শী ও গোসল খানার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইতেন। আমীরুল ওমরাহ্‌ খান দুরানকে প্রথম বখ্‌শী করা হইল; ওয়ালাশাহী ও আগাশাহী[৪৭] নামক দেহরক্ষী-দলের সর্দারিও তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। জাফর খাঁ তৃতীয় বখ্‌শী ও সালাবৎ খাঁ চতুর্থ বখ্‌শী নিযুক্ত হইলেন। গৃহস্থালীর ভাণ্ডারীর পদ শের আফগান খাঁকে[৪৮] ও তৎপরে তদীয় ভ্রাতা ও সুলতানিয়া নামক দেহরক্ষী দলের সেনাপতি ন্যায়বান্ লুৎফুল্লাহ্‌ খাঁকে প্রদত্ত হইল। আমীর জুমলা তেরহানকে (পরিত্যক্ত) সদরুস্ সদর বা প্রধান ভিক্ষাদাতা নিযুক্ত করা হইল। খাস তহবিলের যত্ন গ্রহণের দায়িত্বসহ হেরেম বা বেগম-মহলের তত্ত্বাবধায়কের পদ হাফেজ খেদমতকার খাঁর উপর অর্পিত হইল। তিনি ছিলেন আওরঙ্গযীবের আমলের জনৈক খোজা। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে ঐ উভয় পদই রোজ-আফজুন খাঁর হস্তগত হইল। রাজা গুজরমল খালিশা দফতরে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পরে তাহা ইবাদত মন্দ খাঁ ও তৎপরে রাজা বহৎ-মলের হস্তগত হইল। শাহ সাদতুল্লাহ সৈন্য সমাবেশের দেওয়ান ও হায়দর কুলী খাঁ মীর আতশী[৪৯] নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার পরে সাদুদ্দীন খাঁ, পুনরায় হায়দর কুলী খাঁ এই পদ পাইলেন। তাঁহার নিকট হইতে ইহা খান দুরানের ভ্রাতা মুজাফ্‌ফর খাঁর নিকট হস্তান্তরিত হইল। সাদত খাঁকে খাওয়াস[৫০] নামক রক্ষীদলের তত্ত্বাবধায়ক পদ প্রদত্ত হইল; তিনি আহমদ কুলী খাঁকে তাঁহার সহকারীরূপে গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। আমীনু-দ্দৌলাহকে প্রথম ও দাওয়ারদাদ খাঁকে দ্বিতীয় মীর-তোজেক নিযুক্ত করা হইল। মুবারিজ খাঁ ও তাঁহার পরে আগর খাঁ দারোয়ানদের তত্ত্বাবধায়ক

নিযুক্ত হইলেন; মুহসিন খাঁ কোকা[৫১] হইলেন হুজুরের নূতন-পুরাতন পাইকদের অধ্যক্ষ। আলী আহ্মদ খাঁ কোকাকে আরজ মুকারর ও ফয়েজ আলী হামিদ খাঁকে খাল পরিদর্শক[৫২] নিযুক্ত করা হইল। বু-আলী খাঁ কোরবেশী ফরাসখানার ও মুনাওর খাঁ আহাদিয়ান দলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ক্যারেওলিয়ান খান সাদিকের পুত্র ও এনায়েৎ খাঁ রসিদকে পদাতিকের দফতরে নিযুক্ত করা হইল। উপহারের তহবিল রক্ষার ভার বাহরোজ খাঁর উপর, বাদশাহের জেব খরচের তহবিলের ভার জাবিদ খাঁর উপর এবং জওয়াহের খাঁর উপর জওয়াহেরাত দফতর, বহ্তাওয়ার খাঁর উপর, বাবুর্চিখানা দফতর, ওজিবাহ খাঁর[৫৩] উপর কফি দফতর ও ফজলে আলী খাঁর উপর হাতী দফতর[৫৪] অর্পিত হয়। হাল্কা কামানের তত্ত্বাবধায়কের পদের জন্য সায়্যিদ কুতুবুদ্দীন আলী খাঁ এবং সোড়পোচ ও কেল্লার[৫৫] সেনাপতির পদের জন্য ইয়াসিন খাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়। আল্লাহ ইয়ার খাঁকে শাহ-জাহানাবাদ দুর্গের কিল্লাদার, জাফর খাঁর পুত্র কায়ম খাঁকে ডাক ও আখবার দফতরের[৫৬] পরিদর্শক ও হেকিম মাসুদ আলী খাঁকে গুপ্তচর বিভাগের[৫৭] পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কেবল জাফর খাঁই বাদশাহের চিত্তজয় করেন বলিয়া মনে হয়। কাজেই তিনি তাঁহার সম্মান অর্থোপার্জ্জনের কাজে লাগাইলেন। শতকরা কিছু টাকা দালালী পাইলে তিনি যে কোন দরখাস্ত গ্রহণে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। বাদশাহ জগতের সমক্ষে এখন যে নূতন প্রিয়পাত্রী উপস্থিত করিলেন, তাঁহারও ছিল ইহাই রীতি। খুকী নামে বিখ্যাত শাহজান মুহম্মদ ফকীরের[৫৮] এক কন্যা কোন উপায়ে এত গভীরভাবে

বাদশাহের প্রিয়পাত্রী খুকী তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন

বাদশাহের সুনজরে পড়েন যে, তাঁহাকে বাদশাহের কাগজপত্রের দেরাজ ও ব্যক্তিগত মোহরের ভার প্রদত্ত হয়। তিনি দরখাস্তে বাদশাহের উত্তরের নিম্নে দস্তখত দানের অধিকার প্রাপ্ত হন; এগুলি তিনি হারেমের ভিতরে লইয়া যাইতেন। তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তির পূর্ণ সুযোগ লইয়া তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না রমণী। তিনি কবিতা আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতেন এবং অনেক সময় নিজেই উপস্থিত ক্ষেত্রে কিছু 'কবিতা

রচনা করিতেন। তাঁহার এতই সাহস ছিল যে, তিনি তাঁহার রচিত এই দুইটি বয়াৎ গান করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

'রাজদণ্ড এখন বাদশাহের মোরগের হাত হইতে মুরগীর হাতে গিয়াছে।
তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতার জন্য এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে ;
সম্ভবতঃ আমরা আহম্মক লোকটাকে
মাতাল অবস্থায় নৃত্য করিতে দেখিতে পাইব।
তাঁহার প্রচণ্ড তরবারির সহিত রমণীরা
তাহাদের সঙ্গীতের ঢোল[৩৭] বদলাইয়া লইয়াছে'।

বাদশাহ ছিলেন যুবক, তাঁহার দৃঢ়তা ও উদ্যম ছিল না বলিলেই হয় ; তিনি শুধু সুখভোগে ও আলস্যে কাল কাটাইতে চাহিতেন। কাজেই উদ্যম ও দৃঢ়তার দরকার, এমন কোন জরুরী ব্যাপার ঘটিলেই তিনি নম্রতার সহিত তাহা এড়াইয়া যাইতেন এবং উমদাতুল মুল্‌ক আমীর খাঁ[৩৮] ও অপর কয়েকজন খোশমেজাজী ; সুসঙ্গ ও রহস্যপ্রবণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন যুবক আমীরের সঙ্গ ভোগ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। সাম্রাজ্যের ব্যাপারে গুরুত্ব অনুযায়ী যতটা মনোযোগ দানের দরকার, তিনি ততটা দিতেন না। কাজেই বাদশাহের নামে যে ভয়-ভক্তি জন্মাইত, ক্ষমতাবান ও পদাধিকারীদের মন হইতে, কেহ বলিতে পারেন, প্রায় প্রত্যেকের মন হইতে তাহা অল্প অল্প হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেকেই নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ লোক বলিয়া মনে করিতে এবং গৃহে নিজের গালিচায় বসিয়া বাধ্যতা দূর ও স্বাধীনতা অবলম্বনের চিন্তা পোষণ করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে বাদশাহ্‌ তাঁহার নিজের গাম্ভীর্য ও রীতিনীতি অবলম্বন করুক এবং সমপূর্ণরূপে তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী চলুক, নিজামুল মুল্‌ক তাহাই কামনা করিতেন। সংক্ষেপে, যে সকল উৎফুল্ল যুবকের সংসর্গে তিনি এত আনন্দ পাইতেন, তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গ হইতে ছাড়াইয়া নিতে, বিশেষতঃ খুকী যে ক্ষমতা ভোগ করিতেন, তাঁহার ও তাঁহার দলের আমীরদের হাত হইতে তাহা পুনরুদ্ধার করাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু বাদশাহ্‌ বা তাঁহার প্রিয়পাত্রেরা এরূপ প্রস্তাব সহজে পরিপাক করিতে পারিলেন না। নিজামুল মুলকের মনোবৃত্তি ও রীতিনীতিতে তাঁহারা আদৌ খুশী হইতেন না। বরং তাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন

এবং তিনি দৃষ্টির অগোচর হওয়া মাত্রই তাঁহার দেহ লইয়া সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ উপহাস করিতেন।[৭১] এই সমুদয় জানিতে পারিয়া নিজামুল মুল্‌ক দরবার ও দরবারীদের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের সুবায় তিনি ছিলেন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। সেখানে গমন করিয়া তিনি তাঁহাদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি অসুখের ভাণ করিয়া দরবারে গমনে বিরত হইলেন। তিনি জানিতেন, গোলমালে উস্কানি দিতে ও অনিষ্টকর আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারিলে তাঁহার উপস্থিতির দরকার হইবে; এক্ষণে এভাবে প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া তিনি গৃহে পড়িয়া রহিলেন। তিনি ওজারতে ইস্তেফা দিতে চাহিলেন, কিন্তু অত্যন্ত বিজ্ঞ ও পরিণামদর্শী লোক বলিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন; তিনি প্রায়ই দীর্ঘসূত্রী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন। ইতোমধ্যে বাদশাহ্ ও তাঁহার সমমনোভাবাপন্ন আমীরেরা নিজামুল মুলকের এই সঙ্কল্পের বিষয় আঁচ করিতে পারিয়া তাঁহার পদত্যাগ গ্রহণ করিয়া এবং তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইলে তাঁহাকে দরবার হইতে যতদূরে ইচ্ছা বাস করিতে দিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করা সাব্যস্ত হইল। তাঁহাদের এই অভিপ্রায়ের কথা জানিতে পারিয়া উজীর স্বয়ং অত্যন্ত লাভবান হইবেন বলিয়া মনে করিলেন। উভয় পক্ষই তাঁহাদের দাবী কিঞ্চিৎ ছাড়িয়া দিয়া সংবাদ ও পত্র বিনিময় করিতে লাগিলেন। ফলে বাহ্য ঐক্য ও অকপটতা স্থাপিত হইল। ফলে ১১৩৬ হিজরীর ২রা সফর নিজামুল মুল্‌ক পুনরায় দরবারে আসিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করিলে তাঁহাকে উকীল-ই-মুৎলক বা বাদশাহের অপ্রতিহত সহকারী সেনাপতির পদ দ্বারা সম্মানিত, আসফজা[৭২] এই নূতন উপাধিতে ভূষিত এবং সর্বপ্রকার অনুগ্রহ ও সম্মান প্রদর্শন দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইল। এই আপোষ-রফার পরে সুবাদার শিকারে গমনের অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে তিনি দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উহা ছিল এক বিশাল সাম্রাজ্য; সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতেন। সেখানে তাহার কেন্দ্রে বসিয়া তিনি একজন অলস সম্রাটকে সংশোধন ও একদল চিন্তাহীন লম্পট সভাসদকে দমন করার মতলব আঁটিতে লাগিলেন। তখন

নিজামুল মুল্‌ক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট

দিল্লী ত্যাগের পর সপ্তম মাস; এই সময় বাদশাহ তিনি যে দুইটি উচ্চপদ ভোগ করিতেন, বাহ্যতঃ তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া কমরুদ্দীন খাঁকে জুমলাতুল মুল্‌ক' অর্থাৎ সাম্রাজ্যের রাজ্যগুলির উপর সর্বেসর্বা উপাধি প্রদান করিলেন। ঐ শরীফ ব্যক্তি এই উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া নিজামুল মুল্‌ককে যথাসাধ্য পরিতুষ্ট করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কিন্তু এই সমুদয়ই নিছক বাহ্য ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হইল। তাঁহার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই তাঁহার অসন্তোষ সম্পর্কে সচেতন থাকায় মন্ত্রীরা তাঁহার পূর্বেই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত গোপনে বুরহান পুরের নাজিম বা সামরিক শাসনকর্তা মুবারিজ খাঁকে বাদশাহের স্বহস্ত লিখিত একখানা পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে তাঁহার আয়ত্তাধীন যে কোন উপায়ে যুদ্ধ করিয়া নিজামুল মুল্‌ককে হত্যা করার জন্য উপদেশ প্রদত্ত হইল। তাঁহাকে যুগপৎ বলা হইল যে অচিরে তাঁহার নামে দাক্ষিণ্যাত্যের সুবাদারির সনদ প্রেরিত হইবে। নিজেকে বাদশাহী শক্তির দ্বারা সমর্থিত দেখিয়া ও নিজের প্রকৃতিতে তাঁহাকে প্রতিশ্রুত উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষী বলিয়া মুবারিজ খাঁ নিজামুল মুল্‌কের উপর আপতিত হইতে মনস্থ করিলেন। শাহ নিজাম ও শাহ মিনহাজের পরিবার ছিলেন সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী পরিবার। তাঁহারা নিজামুল মুল্‌কের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অন্তরে সুনির্দিষ্ট শত্রুতা পোষণ করিতেন মনে হওয়ায় তিনি তাঁহাদের ও মরহুম দায়ুদ খাঁ পনীর ভ্রাতা ইব্রাহীম পনীর নিকট স্বীয় পরিকল্পনা ব্যক্ত করিলেন। ইহাদের সকলেই তাঁহার সহিত যোগদান করায় তিনি এরূপ অদম্য শত্রুর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপযোগী একটা সুগঠিত বাহিনী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। ঐ সেনাপতি তৎপরতার সহিত তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করিয়া কৌশলে ব্যূহ রচনা করিয়া নিজামুল মুল্‌কের মুকাবিলা করিতে যাত্রা করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার অভিপ্রায় ও তাঁহার বিপুল রণসজ্জার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে ছুটিলেন। উভয় বাহিনী ১১৩৭ হিজরীর মুহর্‌রম মাসের এক মঙ্গলবারে যুদ্ধে যোগদান করিলে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হইল। বাদশাহী পক্ষের ৪০০০ সাহসী লোক নিহত ও চারিটি হস্তী রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইল।

নিজামুল মুল্ক বিজয়মাল্যের অধিকারী এবং দুই পুত্র ও উৎকৃষ্ট বন্ধুবর্গসহ মুবারিজ খাঁ যুদ্ধে নিহত হইয়া অনন্তের পথে দ্রুত পাড়ি দিলেন। এই বিজয় লাভের পর নিজামুল মুল্ক মুবারিজ খাঁর পক্ষে যে সকল লোক নিহত হয়, তাহাদের ফিরিস্তি দিয়া বাদশাহী সৈন্যদের বিজয়-অভিনন্দন জানাইয়া বাদশাহের নিকট এক আবেদন পাঠাইলেন; তৎসঙ্গে এরূপ উপলক্ষে সাধারণতঃ দেয় ভুল নজর হিসাবে কিছু আশরাফি'' পাঠাইতেও তাঁহার ভুল হইল না; পরাজিতদের শিবিরে ধৃত সম্পত্তির কোন অংশও বাদ পড়িল না।

দরবার ও নিজামুল মুল্কের ভিতরের অসন্তোষ ও মতভেদ সুপরিজ্ঞাত ও সুস্পষ্ট হইলেও এযাবত তাহা কপটতা ও দীর্ঘসূত্রতার আবরণে প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু মুবারিজ খাঁর এই পরাজয়ের পরেই অবগুণ্ঠন কতকটা উন্মোচিত হইল। হায়দর কুলী খাঁকে বাদশাহ শক্তিশালী, সাহসী ও তাঁহার স্বার্থের প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত বলিয়া জানিতেন, কাজেই তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়া ঐ শরিফ ব্যক্তি আজমীর ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। সেখানে ১৪ই রবিউস্‌সানী শুক্রবার সূর্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পরে তিনি বাদশাহকে কুনিশ করার সম্মান লাভ করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে মীর আতশী বা প্রধান রাজগৃহাধ্যক্ষ ও বাদশাহের গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলেন। এই সম্মানের সহিত তাঁহার খেলাত স্বরূপ বাদশাহের নিজের গাত্রোস্থিত একটা পরিচ্ছদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইল। ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদের বর্তমান অধিকারী সাদুদ্দীন খাঁ তুরকী সঙ্গে সঙ্গেই পদচ্যুত হইলেন। তিনি নিজামুল মুল্কের সুপারিশে নিযুক্ত হন। এই সুবাদার তাঁহার নিজের শক্তি ও মুবারিজ খাঁর উপর তাঁহার সাম্প্রতিক বিজয়ের উপর বিশ্বাস করিতেন। তিনি এই সমুদয় অবগত হইয়া তাঁহার মাতুল গুজরাটের শাসনকর্তা হামিদ খাঁকে শিনাজি ও কুন্তাজীর সহযোগিতায় শত্রুতা আরম্ভ করার জন্য পত্র লিখিলেন। এই দুইজন মারাঠা সেনাপতিকে তিনি বাদশাহী রাজ্য আক্রমণ চালাইতে নিয়োজিত করেন। এই সংবাদ পাইয়া হামিদ খাঁ স্বাধীনতার দাঙ্গামা বাজাইয়া বিদ্রোহপতাকা উত্তোলন করিলেন। তাঁহার আদর্শ বাক্য হইল, "আজ এই দেশের মালিককে?" দরবারের তৎকালীন কতিপয় অমীরের সমস্ত জায়গীর বাজেয়াফত করিয়া তিনি তাঁহাদের

নায়েবদিগকে পদচ্যুত করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণাসভার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, কিন্তু আদৌ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া এবং কোন পরিকল্পনা স্থির না করা ভিন্ন আর কোনও বিষয় একমত হইলেন না। তুরানীরা সাম্রাজ্যে বেজায় সংখ্যাধিক ও বেজায় শক্তিশালী হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বাদশাহ তাঁহার বন্দী ভূতপূর্ব উজীর আবদুল্লাহ খাঁকে তাহাদের অতি-বর্ধিত প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া বলিলেন, "সময় এখন এমন হইয়াছে যে, এমন কি তিনিও বাদশাহের কিছুটা কাজে আসিতে পারেন। আবদুল্লা খাঁ উত্তর দিলেন, "বাদশাহ যদি কখনও মেহেরবানী করিয়া তাঁহার ভৃত্যের মস্তকোপরি দয়া ও ক্ষমার হস্ত প্রসারিত করেন, তবে তাঁহার বিশ্বস্ত গোলামের বিশ্বাস, তাঁহার হুজুরে কুনিশ করার অনুমতি পাওয়া মাত্রই তিনি ৫।৬ হাজার প্রবীণ লোকের একদল উৎকৃষ্ট সৈন্য মবেত করিতে পারিবেন; তাহাদের সাহায্যে তাহার মন্ত্রীরা তাঁহাদের পরিকল্পিত যে কোন কার্যে তাঁহাকে নিয়োজিত করিয়া তাঁহার উৎসাহ পরীক্ষা করিতে পারিবেন। আবদুল্লাহ খাঁর দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উত্তর বাদশাহের নিকট প্রদত্ত হইবামাত্র ঐ শরীফ ব্যক্তির শত্রু ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাকে কারামুক্ত করার পরিণাম সম্পর্কে আতঙ্কিত হইয়া কোন উপায়ে ঐ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত সায়্যিদের নিকট এক মাত্রা বিষ পাঠাইয়া তাঁহাকে তাঁহার বিখ্যাত পূর্বপুরুষদের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন।

বন্দী আবদুল্লাহ খাঁকে বিষদান

আমরা মুবারিজুল মুল্ক সরবুলন্দ খাঁকে[৮৪] কাবুলের শাসনকর্তার পদ হইতে পদচ্যুত অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি। জাফর খাঁর প্রভাবে নাসির খাঁ ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হন। পদচ্যুত সেনাপতি এখন রাজধানীতে স্বগৃহে গমন করিলেন; তিনি কদাচিৎ দরবারে হাজিরা দিতেন। কিন্তু আবদুল্লাহ খাঁ স্বর্গীয় দয়ার ভবনে গমন করিলে মন্ত্রীরা সরবুলন্দ খাঁর যোগ্যতা ও চরিত্র কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন। খোজা হাফিজ খেদমতকার খাঁর অনুরক্তি ও অকপটতার উপর বাদশাহ সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থা রাখিতেন। তিনিই এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঁহাকে বিদ্রোহী হামিদ খাঁর বিরুদ্ধে

প্রেরণ ও এই উদ্দেশ্যে তাঁহার উপর গুজরাটের শাসন-ভার অর্পণ করা সাব্যস্ত হইল; সেখানে তাঁহাকে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের কথা হইল। কিন্তু দীর্ঘকাল বেকার থাকায় সরবুলন্দ খাঁ তাঁহার সাজ-সরঞ্জাম ও সমস্ত সঞ্চিত অর্থ খরচ করিয়া ফেলেন; কাজেই এই সময় তিনি যুদ্ধযাত্রার অনুপযুক্ত ছিলেন। ইহা জানা থাকায় গুজরাটের সুবাদারীর সনদসহ তাঁহাকে সরকারী কোষাগার হইতে এক ক্রোড়[৬৩] মুদ্রা প্রেরিত হইল। তিনি বিদ্রোহী হামিদ খাঁকে শাস্তি দান ও ঐ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে আদিষ্ট হইলেন।

নিজামুল মুল্‌ক দরবার ও সাম্রাজ্যের তুরানীদের মধ্যে যে ষড়যন্ত্র ও অসন্তোষের বীজ বপন করেন, তাহাতে বিরক্ত হইয়া ইতোমধ্যে বাদশাহ্ তাহাদের সমস্ত লোক ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার বিতৃষ্ণা এত অধিক বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি তাঁহাদিগকে সমস্ত প্রভাবচ্যুত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। শরীফ কমরুদ্দীন খাঁ হইলেন তাঁহার প্রথম অসন্তোষের পাত্র। তিনি অকস্মাৎ তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটি শাসন-কর্তৃত্ব ও কয়েকটি পদ কাড়িয়া লইয়া সেগুলি অন্যান্যের মধ্যে বিতরণ করিলেন। যুগপৎ ইরানী আমীর সাদৎ খাঁ অযোধ্যায় তাঁহার শাসনকর্তার পদে যোগদানের অনুমতি পাইলেন। সেখানে গিয়া তিনি দেশে বশ্যতা ও শৃঙ্খলা স্থাপনের কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকায় সরবুলন্দ খাঁর সহকর্মী দুরবস্থায় নিপতিত হন; তিনি যাহাতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটা সৈন্যদল ও উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তজ্জন্য সরবুলন্দ খাঁ আর একটু অপেক্ষা করেন। তিনি এখন গুজরাটের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যাত্রা করার কথা চিন্তা করিলেন। ইতিমধ্যে ঐ কর্মচারীটির পরিবারের অজস্র বন্ধু ও তাঁহার ব্যক্তিগত সহচরেরা তাঁহার সহিত যোগদান করায় কয়েক দিন পরে তিনি তাঁহার সহকর্মীর অনুগমন করিয়া অবশেষে তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাঁহারা যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন হামিদ খাঁ সরবুলন্দ খাঁ কর্তৃক প্রেরিত একাধিকবারের সদুপদেশ উপেক্ষা করিয়া কুন্তাজী ও পিনাজি নামক গাইমেকোয়ার পরিবারের দুইজন মারাঠাকে কোন উপায়ে তাঁহার ভাগ্যানুসরণে প্ররোচিত করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার নিজ সৈন্যদলে স্থান দান করেন। তাঁহার বখ্‌শী আমান বেগ

ছিলেন ইহার সেনাপতি। কিন্তু স্বয়ং সরবুলন্দ খাঁ অচিরে এই সম্মিলিত সৈন্যদলের সম্মুখীন হইলে তাহারা গুরুতররূপে পরাজিত হয়। খোদ আমান বেগ ছিলেন নিহতদের অন্যতম। অতঃপর পরাজিত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। যুদ্ধ শেষে সরবুলন্দ খাঁর বখশী শেহল হায়ার বেগগ্রামী বাদশাহী সৈন্যদল হইতে প্রেরিত হইয়া যখন এক দ্বার দিয়া আহমদাবাদ নগরে প্রবেশ করিয়া উহা দখল করিতেছিলেন, তখন হামিদ খাঁ অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন ; সেখান হইতে তিনি নিজামুল মুল্‌কের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সুবাদার এরূপ বাধালাভে বিশেষ নিরুৎসাহ না হইয়া অপর কয়েক জন মারাঠা সেনাপতিকে হামিদ খাঁর সহিত মিলিত হইয়া গুজরাটে আক্রমণ চালাইতে নিয়োজিত করিলেন। এই অভিযানের ফলে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটিল। তাহাতে মারাঠারা নজমুদ্দীন আলী খাঁর হাতে অবিশ্রান্ত পরাজিত হইল সর্বত্রই তিনি সাহসের প্রমাণ দিলেন ; এই সাহস ছিল তাঁহার পরিবারে বংশানুক্রমিক এবং তাঁহার যশস্বী ও পবিত্র পূর্ব-পুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত[১১]। অবশেষে ব্যাপারটি ব্যাপক যুদ্ধে পরিণত হইল ; ৬০,০০০ অশ্বারোহী এবং আরব ও অন্যান্য বৈদেশিকের সমবায়ে গঠিত একদল পদাতিকের একটি বাহিনী লইয়া সর্বপ্রকার আয়তনের কয়েক শত কামানের সাহায্যে নজমুদ্দীন আলী খাঁ মারাঠাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া তিনি বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তাহাদিগকে নর্মদার অপর তীরে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত তিনি কখনও তাহাদের অনুসরণে বিরত হন নাই বা তাঁহার ঘোড়া ফিরান নাই। কাম্বায়েৎ বন্দরে (ক্যাম্বে) এই বিরাট জয় লাভ ঘটে। মারাঠারা রণক্ষেত্রে বিপুল সংখক মৃতদেহ রাখিয়া যায়।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত

ইহার পূর্বে তাহারা নুণ্ডর ও পিলনুণ্ডর জনপদে আকস্মিক আক্রমণ চালায় ; এই শহরগুলি ছিল কমরুদ্দীন খাঁর জায়গীর। তাহারা যখন বাস্তবিকই লুটপাটে ব্যস্ত, তখন নজমুদ্দীন আলী খাঁ ও সরবুলন্দ খাঁর পুত্র খানেজাদ খাঁ আকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই বিরাট জয়লাভের পরে মারাঠারা সর্বত্র পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া গুজরাটের প্রত্যেকটি অংশ খালী করিয়া দিল। অবধান করিতে হইবে যে, বিজয়ী বাহিনী অজস্র বলিয়া ইহাকে প্রতিমাসে রাজধানী হইতে পাঁচ লক্ষ

টাকা নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হইত। সরবুলন্দ খাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু হাফিজ খেদমতকার খাঁ ও তাঁহার মৃত্যুর পরে জাফর খাঁ কর্তৃক এই টাকা প্রেরিত হইত। এই সরবরাহের উদ্দেশ্য ছিল ঐ সেনাপতিকে চাঁদার জন্য মাথা না ঘামাইয়া তৎপরতার সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে সমর্থ করা। দেশ যে পর্যন্ত এত অধিক বশে আসে ও এত শান্ত হয় যে, বিজয়ী বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের মত পর্যাপ্ত রাজস্ব আমাদানী হইতে পারে, সে পর্যন্ত এই সরবারাহ চালাইয়া যাওয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু এই বিরাট জয়লাভের সংবাদ পাইয়া খান দুবানের উপদেশে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং যে সকল অজস্র সৈন্য নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে তাহাদিগকে বিদায় দানের আদেশ প্রেরিত হয়। এই আদেশের ফলে সেই বিজয়ী সৈন্যদল বিনষ্ট হয় এবং জয়লাভ হইতে যে সুফলের প্রত্যাশা করা যায়, তাহার সবই নষ্ট হইয়া যায়। কারণ, ঐ আদেশ প্রাপ্তির পূর্বেই বাদশাহী শক্তি সর্বত্র এরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি করে যে, ঐ সমুদয় জনপদের সর্বত্র বিদ্রোহীরা তৎপ্রতি সম্মান ও হতবুদ্ধিতা ব্যতিরেকে তাকাইতে সাহস পায় নাই।

আমরা বলিয়াছি যে, বাদশাহের মনের উপর জাফর খাঁর প্রভাবই ছিল সর্বাধিক; সেই ভদ্রলোকের অনেক সদগুণ ছিল বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তিনি ছিলেন অর্থ গৃধ্নু ও উৎকোচের বশীভূত। ঠিক এই মুহূর্তে প্রকাশ পাইল যে, কাবুলের রক্ষী সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থ প্রতি বৎসর তাঁহার যে বার লক্ষ টাকা পাঠান কর্তব্য তাহা তিনি নিয়মিতভাবে অর্ধেকে হ্রাস করিয়া ঐ ছয় লক্ষ টাকা নিজে আত্মসাৎ করিতেন। যে অজস্র কাজ তাঁহার হাত হইয়া যাইত তাহাতেও তিনি অধিকতর সততার পরিচয় দিতেন না। কেহ মনে করিতে পারেন যে, এরূপ দুঃসাহসিক তসরুফের পরে রাজমন্ত্রীদের প্রত্যেকের সহিত কিভাবে তাঁহার সর্বাপেক্ষা সদ্ভাব ছিল; কিন্তু তাহা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে তাঁহার অভ্যাস এমনভাবে বাদশাহের নিকট উল্লিখিত হয় যে, তাঁহার সম্পূর্ণ অবমাননায় এই ব্যাপারের পরিণতি ঘটে। তিনি তাঁহাকে প্রকাশ্যে কঠোর তিরস্কার করিয়া হিসাব-বিভাগের হস্তে অর্পণ করেন; তাঁহারা তাঁহার নিকট পূর্ণ দুই কোটি টাকা বাকি পড়িয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে ঐ টাকা সরকারী

জাফর খাঁ অপমানিত ও অর্থ প্রত্যর্পণে বাধ্য

কোষাগারে প্রত্যর্পণে বাধ্য করেন। তদুপরি তিনি অপমানিত ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন। খান দুরানের বিশ্বস্ততা এখন স্বীকৃত হওয়ায় অপর কয়েকটি খরচসহ কাবুলে অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থার ভার তৎপ্রতি অর্পিত হয়। শাহ্ আবদুল গফুর[৩৭] নামক তুরানী দলের জনৈক ফকীরের বিরুদ্ধেও অসাধুতা ও উৎকোচের একই অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তিনি বাদশাহের মনের উপর এত অধিক প্রভুত্ব লাভ করেন যে, খালিশা দফতরের অধ্যক্ষ পদে যাঁহাকে ইচ্ছা নিয়োগ ও যাঁহাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করাইতেন। তাঁহার শক্তি ও প্রতিপত্তিতে গর্বিত হইয়া তিনি অনেক অযোগ্য ও লজ্জাকর অপব্যাবহার করেন। তাহা বাদশাহের গোচরে আসিলে তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া সর্বজন সমক্ষে অপমানিত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ ও বাঙ্গালায় নির্বাসিত করেন। অন্যান্য প্রকারের অজস্র দ্রব্যজাত ভিন্ন তাঁহার গৃহে দুই কোটি মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহার সমুদয়ই বাজেয়াফত করিয়া সরকারী কোষাগারে প্রেরিত হয়। খোদ খুকী, সেই সর্বশক্তিমান খুকী হারেমের মধ্যে যাহার উপর বাদশাহী মোহরের ভারার্পিত হয় এবং যিনি এত অধিক প্রভুত্ব লাভ করেন যে, পদ ও চাকরীর জন্য সুপারিশ করিতেন, ঐ দুই ব্যক্তির সহিত তাঁহার সংযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তিনিও অপমানের সহিত বরখাস্ত হন। তাঁহার হারেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় ও তাঁহাকে অর্থ প্রত্যর্পণে বাধ্য করা হয়।

মন্ত্রীবর্গ ও খোদ সাম্রাজ্যের উপর অসদাচরণ ও নিকৃষ্ট রাজনীতি দ্বারা যে সকল দুর্গতি অনীত হয়—তাহার পরে কেহ মনে করিতে ইচ্ছুক হইবেন যে, নব-লব্ধ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দরুণ খান দুরান অধিকতর সতর্ক হইবেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে তিনি শুধু অবমানিত মন্ত্রী জাফর খাঁর প্রতি তাঁহার ঘৃণার দিকেই মনোনিবেশ করিতেন এবং শূন্য পদে কায়েম হইয়া বসিতে না বসিতেই তিনি ঐ অবমানিত মন্ত্রীর পরম বন্ধু সরবুলন্দ খাঁকে গদীচ্যুত করিতে তৎপর হইলেন। শীঘ্রই তিনি তাঁহার স্থলে রাজা অবিসিংহ রাঠোরকে নিযুক্ত করিয়া সর্বাপেক্ষা দ্রুতপদে সেখানে গমন করিতে ও সরবুলন্দ খাঁকে দরবারে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। আরামপ্রিয় ও পৈতৃক রাজ্যের জন্য গর্বিত অবিসিংহ একজন নায়েবকে নূতন সুবার দখল লইতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই প্রতিনিধি সরবুলন্দ খাঁ কর্তৃক দণ্ডিত ও বিতাড়িত হইলে

বৃহত্তর বাহিনীসহ আর একজন নায়েব প্রেরিত হইলেন; তিনিও অনুরূপ অভ্যর্থনা পাইলেন। এভাবে পুনঃ পুনঃ এত অধিক অপমানের সহিত বিফল হওয়ায় অবশেষে অবিসিংহ প্রধানতঃ অশ্বারোহী দ্বারা গঠিত ৫০০০০ লোকের এক সৈন্যদল ও একটা উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ বাহিনীসহ স্বয়ং যাত্রা করিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আজমীরে প্রবেশ করিলেন। রাজধানীর ষড়যন্ত্র ও নিজামুল মুল্‌কের শক্তিতে তুল্য অস্থির ও ভীত হইলেও সরবুলন্দ খাঁ তাঁহার অবশিষ্ট স্বল্পবেতনের স্বল্প সজ্জিত অপর্যাপ্ত সৈন্যদল লইয়াই তাঁহার শত্রুদের মুকাবিলা করিতে মনস্থ করিলেন। আহমদাবাদের বাহিরে আসিয়া তিনি সেখান হইতে কয়েক ফারসাক[৮৮] দূরে শিবির স্থাপন করিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনী এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিল না, এরূপ কয়েকজন বন্ধু ও প্রাচীন সৈন্যের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়া তিনি অবিসিংকে আক্রমণ করিলেন এবং এত অধিক রণকৌশল ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন যে, রাজা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া আর একটু দূরে সরিয়া যাওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন। সরবুলন্দ খাঁ নিজেকে দরবারের শত্রুদের ষড়যন্ত্র এবং কার্যক্ষেত্রে নিজামুল মুল্‌কের শক্তি ও ষড়যন্ত্রের দরুন তুল্য বিপদগ্রস্ত দেখিতে পাইয়া অবিসিংহের পশ্চাদ্বর্তনে সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাকে একটা শিক্ষা দানেই তৃপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার সহিত মিটমাট করিতে মনস্থ করিলেন। এক অপ্রত্যাশিত উপায়ে ইহা সম্পূর্ণ করা হইল। দিবসের প্রায় শেষ ভাগে তিনি একটা সাদা সরল পোষাক পরিধান করিয়া ও মস্তকের চতুর্দিকে একটা সাদা পাগড়ী বাঁধিয়া অল্প কয়েকজন চোপদার বা বর্শাবাহক ও ভৃত্য ভিন্ন অন্য কোন অনুচর সঙ্গে না লইয়াই হিন্দু রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন। অবিসিংহ প্রথমে এই সংবাদে অত্যন্ত বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কিন্তু এরূপ দর্শন দ্বারা যুগপৎ নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বিবেচনা করায় তিনি তাঁহার তাঁবু প্রাচীরের দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া গেলেন এবং চিরাচরিত আলিঙ্গনান্তে তিনি বৃদ্ধ সেনাপতির হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিজের মসনদে বসাইয়া তাঁহার প্রতি যথাসাধ্য সম্মানের পরিচয় দেখাইলেন। কিছু কথাবার্তায় পরে সরবুলন্দ খাঁ হিন্দু রাজার দিকে ফিরিয়া ঠিক এই কথাগুলি বলিলেন: "যুবক,

তুমি শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে, তোমার ও আমার মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুতা বিদ্যমান। এককালে তোমার পিতা ও আমি ভ্রাতৃরূপে পাগড়ী বদল করি।[৬৯] কাজেই আমি তোমাকে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় মনে করি। আমাদের মধ্যে যে সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহার উদ্দেশ্য ছিল সৈনিক হিসাবে আমার সম্মান রক্ষা ও চরিত্র প্রমাণ করা। প্রকৃতপক্ষে তোমার ও আমার মধ্যে কিছুমাত্র শত্রুতা নাই। তোমার পরিবার ও তোমার বংশগত বন্ধু হইয়া কেন যে আমি তোমাকে দর্শন দান করিব না, তাহার কোনই কারণ দেখিনা। বিবাদের বিষয় হইল বাদশাহের চাকরী এবং ঠিক এই চাকরীর খাতিরেই এ দেশে আমার আগমন। এখন যখন ইহা তোমার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে তুমি এখানে সাদরে বরণীয়। তুমি শাসনকার্যে যথোপযোগী শৃঙ্খলা আনয়ন কর, ইহাই আমার অভিপ্রায়। ইহার সহিত আমার নিজের আর কোনই সম্পর্ক নাই। আমি তোমার নিকট শুধু আমার সফরের সাজসজ্জা ও খরচের জন্য কিছু টাকা পাইতে আসিয়াছি।" একজন প্রাচীন সৈনিকের প্রদত্ত এই বক্তৃতায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আশ্চর্যান্বিত হইলেন, হিন্দু রাজাই তাজ্জব হইলেন সকলের চেয়ে বেশী। তাঁহার শত্রু তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে। তথাপি ঐ সেনাপতির উন্নত চরিত্র ও তাঁহার স্মৃতিপটে এতদ্বারা যে কাহিনী উদিত হয়, তাহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধিত করা নিজের ইজ্জত বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার দেওয়ানও খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া তিনি সরবুলন্দ খাঁর যে কোন নির্দেশ পালনের জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ দান করিলেন। সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার অল্প পূর্বে সেনাপতি পুনরায় তাঁহার ও হিন্দু রাজার পিতার মধ্যে এককালীন বন্ধুত্বের উল্লেখ করিয়া উহার বন্ধন নূতন ও তাহা নূতন ভাবে বলবৎ করিবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি তাঁহার নিরাড়ম্বর পাগড়ী খুলিয়া তাহা অবিসিংহের মাথায় পড়াইয়া দিলেন এবং বিবিধ প্রকারের মহামূল্যবান মণিমাণিক্য খচিত শেষোক্ত ব্যক্তির পাগড়ী উঠাইয়া নিজের মাথায় পড়িলেন।[৭০] অতঃপর তাঁহারা বন্ধুতা ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শনস্বরূপ পুনরায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন সরবুলন্দ খাঁ পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেখানে অর্থ ও সাজ-সজ্জা পৌঁছিলে তিনি উক্ত দেশ ত্যাগ

করিয়া রাজধানী অভিমুখে তাঁহার যাত্রারম্ভ করিলেন। কিন্তু এই সব কৌশলে দরবারে অত্যন্ত অসন্তোষের সঞ্চার হইল। তাঁহার নিজ খুশী ও বাদশাহের আদেশের বিরুদ্ধে ঐ সেনাপতি বাদশাহের জনৈক শাসনকর্তার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হন এবং কেবল তৎপরেই রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হন, ইহা জানিতে পারিয়া খান দুরান অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি বাদশাহকে তাহার বিরুদ্ধে এত ক্ষেপাইয়া তুলিলেন যে, তিনি উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহার গতিরোধের জন্য রাজপথের প্রহরীদের প্রতি সাধারণ আদেশ জারি হইল। তাঁহার অসদাচরণের জন্য ক্ষমা লাভ না করা পর্যন্ত তাঁহাকে আর এক পদও অগ্রসর হইতে না দেওয়ার জন্য তাহাদের প্রতি আদেশ রহিল। তদুপরি ২০০ অসাধারণ প্রহরী—অর্ধেক আজমীরের রাস্তার ও অপরার্ধ আকবরাবাদের রাস্তার দিকে প্রেরিত হইয়া সেখানে তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সেনাপতি এই শেষে শহরের নিকট উপস্থিত হইলে বাদশাহী আদেশে তাঁহার গতিরুদ্ধ ও অগ্রগতি নিষিদ্ধ হইল। প্রার্থনা দ্বারা বাদশাহের অসন্তোষ দূর ও দরবারে গমনের জন্য অনুমতি লাভের জন্য সরবুলন্দ খাঁ ঐ নগরে কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। যে সকল দলভাঙ্গা সৈন্য তাঁহার অনুগমন করে, সেখানে তিনি তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল এবং ভীষণ ভাবে তাহাদের বাকী বেতন দাবী করিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশে প্রস্তুত হইল। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ সাদৎ খাঁ তখন সেই নগরে ছিলেন। তিনি যে একবার সরবুলন্দ খাঁর অধীনে চাকরী করেন ও তাঁহার কৃপায় একটি উচ্চতর পদে উন্নীত হন, এই সেনাপতির তাহা স্মরণ ছিল; কাজেই তাঁহার পুরাতন সেনাপতি সম্ভবতঃ অপমানিত হইবেন জানিতে পারিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে এই মর্মে এক ভক্তিপূর্ণ সংবাদ পাঠাইলেন, "তিনি মেহেরবানী করিয়া এই সকল বিদ্রোহীকে তাহাদের বাকী দাবীসহ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলে তদীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও কৃতজ্ঞ শুভাকাঙ্ক্ষী তাহাদের দাবী মিটাইয়া দিবেন।" এই সদাশয় সংবাদ ঐ সেনাপতির দুঃখে সান্ত্বনা দানের পরিবর্তে বরং তাঁহার গর্বে আঘাত হানিল। তিনি ভদ্রভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া উত্তর দিলেন,

"খোদাকে ধন্যবাদ, অবস্থা এখনও তত সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায় নাই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুদের নিকট ভার হইয়া দাঁড়াইবেন।" এই উত্তরের পরে তিনি মহিলা-মহলে[১১] গমন করিলেন। সেখানে তিনি সংস্থান হিসাবে কিছু স্বর্ণ সঞ্চিত রাখেন; তদ্দ্বারা ঐ সকল সৈন্যের বাকী পাওনা মিটাইয়া দিলে গোলমাল স্বতঃই থামিয়া গেল।

সরবুলন্দ খাঁর ন্যায় এরূপ কৃতিত্বপূর্ণ লোকের অবিবেচক ও লজ্জাকর অপমানে এবং সাধারণভাবে মন্ত্রীদের অকৃতজ্ঞ ও অরাজনৈতিক ব্যবহারে নিজামুল মুল্‌ক সতর্ক হইয়া গেলেন। তিনি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া এখন হইতে মারাঠাদিগকে হিন্দুস্তান আক্রমণে লেলাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে পুরাপুরি ব্যস্ত রাখিতে মনস্থ করিলেন। তিনি শাহু রাজার[১২] দরবারের প্রধান ব্যক্তি বাজিরাওর নিকট আবেদন করিলেন। ইনি ছিলেন ঐ অঞ্চলের একজন উচ্চ চরিত্রবান সেনানায়ক এবং শম্ভুরাজা ও ঐ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজির বংশধর বলিয়া উচ্চ বংশজাত লোক। তিনি তাঁহার নিকট মালবের প্রকৃত শাসনকর্তা রাজা গুর্দ-হরের নিকট হইতে ঐ চমৎকার প্রদেশ জয় ও রাজা অবিসিং রাঠোরের হাত হইতে গুজরাট পুনরুদ্ধার করিবার অথবা যাহাতে তাহার শত্রুদের কোন কাজে না লাগে, এমনভাবে ঐ দুইটি দেশ ধ্বংস ও উৎসন্ন করিবার প্রস্তাব করিলেন। এরূপ প্রস্তাব অপেক্ষা মারাঠাদের নিকট আর কিছুই এত স্বাগত নহে বলিয়া বাজিরাও ও অন্যান্য মারাঠা শাসক একটা শক্তিশালী বাহিনী সমবেত করিয়া যুগপৎ মালব ও গুজরাট আক্রমণ করিলেন। শেষোক্ত স্থানে তাহারা অবিসিংহের সহকারীদের উপর কিছু সুবিধালাভ করিয়া দেশের এক বৃহদংশ লুণ্ঠন করিল; কিন্তু মালবের অবস্থা ছিল অন্যরূপ। ক্ষুদ্র একদল সৈন্য লইয়া রাজা গুর্দ-হর ঐ দেশ শাসন করিতেন; সাহসী, এমনকি দুঃসাহসী বলিয়া রাজধানী হইতে বৃথা সাহায্য প্রার্থনার পর তিনি কয়েকবার বাজিরাওর সহিত যুদ্ধ করেন। বাদশাহের নিকট তাঁহার পুনঃ পুনঃ আবেদন ও উজীরদের নিকট তাঁহার নিবেদনে কোনই ফল হইল না। ঐ অনন্ত খণ্ডযুদ্ধের সংগ্রামে তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিঃশেষিত করিয়া সেই সাহসী

নিজামের প্ররোচণায় মারাঠাদের মালব আক্রমণ

ব্যক্তি অবশেষে স্বয়ং কর্তিত হইয়া অস্তিত্বের পোশাক বর্জিত হইলেন। তাঁহার আত্মীয় ও সাহসী চেবিলরামের পুত্র রাজা দিয়া বাহাদুর তাঁহার স্থলবর্তী হইলেন। গুর্দ-হরের পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া তিনি মারাঠাদিগকে উত্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হইতেন না; তাহাদিগকে শান্তি দিতেন না, নিজেও শান্তিতে থাকিতেন না। প্রধান প্রধান মন্ত্রীদের তিনি পত্র লেখেন, "যতদিন তিনি জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি হিন্দুস্থান-অভিমুখী পথে প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবেন। কিন্তু মন্ত্রীসভা বিশ্বাস করিতে পারেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহারা প্লাবনের ন্যায় সমগ্র সাম্রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িবে।" এই সকল আবেদনের কোনটাতেই কোন কাজ হইল না। অবশেষে সেই সাহসী লোকটি এক যুদ্ধে নিহত হইয়া এই নশ্বর জগতের সীমা ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। ১১৪৩ হিজরীতে এই ঘটনা ঘটে। এই মৃত্যুতে বিশেষ ব্যথিত না হইয়া উজীর মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাকে মালবের ব্যাপারের ব্যবস্থা করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। তিনি উজ্জয়িনী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন; কিন্তু মারাঠারা সমস্ত দিকে দেশটি লুণ্ঠন করায় তিনি সেখানে শিকড় গাড়িতে পারিলেন না। তাঁহার উদ্যমহীনতায় অসন্তুষ্ট হইয়া দরবার তাঁহার শাসনকর্তৃত্ব রাজা জয়সিংহ সেবাইকে প্রদান করিলেন। নূতন শাসনকর্তা ধর্মনীতিতে মারাঠাদের পক্ষপাতি ছিলেন বলিয়া তাঁহার শাসনকার্যে পূর্ণ নিরুদ্যম বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু না করিলেও তাঁহার উপদেশই বলবৎ হইল। তিন বৎসর পরে ক্লান্তির দরুণই হউক, কিম্বা রাজনীতিতে কোন নবনীতির বশেই হউক, দরবার খোদ বাজিরাওর উপরই ঐ দেশের শাসন-ভার প্রদান করা সঙ্গত মনে করিলেন: এইরূপে মালব মারাঠা প্রভুত্বের অধীনে চলিয়া গেল। গুজরাটের ভাগ্যও অধিক ভাল ছিল না। অবিসিংহের অযোগ্যতা ও উপেক্ষার সুযোগে মারাঠারা সমগ্র দেশে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। এই বিজয়ের দরুন অধিবাসীদের বিপুল ক্ষতি হয়; তাহাতে উজীরের সমস্ত অযোগ্যতা ও শাসন বিভাগের সমস্ত দুর্বলতাই শুধু সুস্পষ্ট হইয়া

শাসনকর্তা কর্তৃক প্রবল উদ্যমে বাধা দান

মারাঠাদের মালব ও গুজরাট জয়

দেখা দেয়। এরূপ বিশৃঙ্খলার প্রতিকারের জন্য দরকার ছিল সাহসী দৃঢ়হস্ত এবং উৎসাহী, বীরত্বপূর্ণ সংযতকারী বজ্রমুষ্টির। কিন্তু ব্যক্তিগত সাহসশূন্য ও সমস্ত সম্মানবোধহীন একদল লোকের নিকট ইহা ছিল প্রত্যাশার বাহিরে। প্রকৃতপক্ষে সিংহের বিবরে শৃগাল কি বীরত্ব জাহির করিতে পারে? তীক্ষ্ণ ইস্পাতের পাতের মুকাবিলায় কাঠের তলোয়ারের নিকট কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। খান দুরান মনে মনে কল্পনা করেন যে, যে সকল পাপে গোপনে হিন্দুস্তান সাম্রাজ্যের ক্ষতি হইতেছিল, কুটনীতি বলে তাহার প্রতিকার এবং কৌশল ও চাতুরী দ্বারা হৃত জনপদগুলিরও পুনরুদ্ধার সম্ভবপর; তজ্জন্য তিনি আলোচনা-নৈপুণ্য ও ভোজবাজির কৌশলে প্রত্যেকটা জিনিসের আবার শৃঙ্খলা বিধানের প্রত্যাশা করেন। এমনকি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে জর্জরিত ও যথাসময়ে সরসবচনের কামান দাগিয়া নিজামুল মুল্‌ক ও মারাঠাদের ন্যায় শক্তিশালী শত্রুকে দুরস্ত করা যাইতে পারে, এরূপ চিন্তা করার মত আহমকি দেখাইতেও তিনি কসুর করেন নাই। ইহা ছিল ঠিক জলাশয়ের উপরে আগুন জ্বালিবার তুল্য। কিন্তু সাধারণভাবে এই উজীর ছিলেন বেজায় দুর্ভাগা। তাঁহার উদ্ভাবিত প্রত্যেকটা পরিকল্পনা সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও অপমানজনক হইয়া দাঁড়াইত। সুতরাং শাসন-কার্যের দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত থাকায় কলহপ্রিয় আমীরেরা তাঁহাদের স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের পরিকল্পনায় নিশ্চিত হইলেন। বিবাদের ক্ষেত্র ক্রমাগত প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতে লাগিল। বিপ্লবের উপাদান প্রত্যহ অধিকতর বর্ধিত হইয়া তখন স্তূপীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। এরূপ অবস্থায় দরকার ছিল খান দুরান ছাড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তির; অবাধ্যতা ও স্বাধীনতার যে উচ্চ বৃক্ষ চতুর্দিকে অবিশ্রান্ত নূতন শাখা বিস্তার করিতেছিল, তাহা ছাঁটিয়া ফেলার জন্য দরকার ছিল কোন কর্মঠ সাহসী নরপতির সবল বাহুর। তাঁহার রণ-কুঠারের পুনঃ পুনঃ আঘাতে উহাকে ভূপাতিত করিয়া স্বয়ং উহার সমস্ত মূল খুঁড়িয়া তুলিয়া একে একে সেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিবার মত যথেষ্ট বুদ্ধি তাঁহার থাকার প্রয়োজন ছিল। জুলফিকার খাঁ ও হুসায়ন আলী খাঁর মত এরূপ উদ্যোগী মন্ত্রীর প্রবল প্রচেষ্টার চেয়ে ন্যূনতর কিছুই রাষ্ট্রের গরজ মিটাইতে পারিত না। এই দুইব্যক্তি তাঁহাদের

ধনুকের ছিলার মধ্যে অবাধ্যতার ঘাড় মটকাইয়া তৎক্ষণাৎ উহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতেন।

মালব ও গুজরাটের বিজিত জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন মারাঠাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইল। শাসন ব্যবস্থা এখন নিশ্চল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহাতে জীবনের ক্ষীণ চিহ্নমাত্র প্রকাশ পাইত; উহার নীরবতা ও ভীরুতায় উৎসাহিত হইয়া তাহারা এখন আরও রাজ্যলাভে আকাঙ্ক্ষী হইল এবং তাহাদের নিকটতম প্রতিবেশী বাদশাহী শাসনকর্তাদের সহিত কলহ বাধাইতে তাহারা অবিশ্রান্ত ব্যস্ত থাকিত। অল্পে অল্পে তাহারা আকবারাবাদ ও এলাহাবাদ প্রদেশের সীমার অভ্যন্তরে পা বাড়াইল। তাহাদের নিজ বিজয়ের পরবর্তী অঞ্চলের ফৌজদারদিগকে তাড়াইয়া দিল এবং বাদশাহী রাজ্যের ক্ষতি করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাদের সীমানা বিস্তার করিল। মারাঠারা যখন বলপূর্বক অবিশ্রান্তভাবে বাদশাহী রাজ্য দখল করিতেছিল, গজনফর জঙ্গ অর্থাৎ যুদ্ধ-সিংহ উপাধিধারী মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ তখন তাঁহার নিজ গোত্র অর্থাৎ রোহিলা আফগানদের মধ্য হইতে একটা উৎকৃষ্ট বাহিনী ও তাঁহার দুর্গগুলি হইতে একসারি কামান সংগ্রহ করিয়া এলাহাবাদের আশ্রিত রাজ্য বুন্দেল খণ্ড জয় ও এতদঞ্চলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা ছত্রশাল ও নাগাকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে সেখানে প্রবেশ করেন। তিনি দেশের ঠিক মধ্যস্থল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সমস্ত দুর্গ দখলে আনিলেন এবং রাজধানী অধিকার করিয়া তাঁহার নূতন প্রজাদিগকে বশ্যতায় অভ্যস্ত করিবার জন্য সেখানে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। বিতাড়িত রাজন্যবর্গ ও ঐ অঞ্চলের অন্যান্য রাজা সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত থাকায় ঐ মন্ত্রীর প্রতিপত্তি ও সম্মানের ন্যায় তাঁহার ক্রোধেরও থোড়াই তোয়াক্কা করিতেন। কাজেই তাঁহারা বড় নাগপুরের[১৩] (বুন্দেল খণ্ডের পশ্চাতে অবস্থিত বেরার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই নগর ও জনপদ আওরঙ্গাবাদের আশ্রিত বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত) দিকে দৃষ্টিপাত করেন অথবা সম্ভবতঃ বাজিরাও তাঁহার নব-বিজিত রাজ্য মালবে যে প্রথম সেনাপতি রাখিয়া যান, তাঁহারা তাঁহাদের নিকট আবেদন করেন। সে যাহাই হউক, বিতাড়িত রাজারা কিছু টাকা ও তাঁহাদের রাজ্যের একাংশ দানে প্রতিশ্রুত

হইয়া একদল মারাঠা সৈন্য প্রাপ্ত হন এবং তাহাদিগকে লইয়া বুন্দেল খণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ তাঁহার বিজিত রাজ্যে নিজেকে এত নিরাপদ মনে করেন যে ক্ষুদ্র, একদল সৈন্য রাখিয়া তাঁহার আফগানদের বৃহত্তম অংশকে তাহাদের গৃহে সম্মানার্থ বিদায় দেন। তিনি অত্যল্পকাল মাত্র সে দেশে থাকায় ভিতরে প্রবেশের সমস্ত পথঘাট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহার আগমন সংবাদ লাভের পূর্বেই বিতাড়িত রাজারা তাঁহার উপর আপতিত হওয়ার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি অশ্বারোহণ করিয়া তাঁহার হাতের কাছে যে সামান্য সৈন্য পাইলেন, তাহাদিগকে লইয়া অতিকষ্টে যুদ্ধযাত্রার সময় পাইলেন। কিন্তু অচিরে সংখ্যাধিক্যের নিকট পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কোন আশ্রয় স্থানের কথা চিন্তা করিতে বাধ্য হইলেন। ২/৩ দিন ঘুরাফিরার পরে তিনি জৈত-পুর নামক একটি দুর্গের সন্ধান পাইয়া তাঁহার সৈন্য ও অনুচরবর্গ লইয়া সেখানে প্রবেশের সময় পাইলেন মাত্র; তিনি তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইলেন। রাজারা তাঁহাদের মারাঠাদের লইয়া তাঁহাদের কার্যে এতই অভিনিবিষ্ট হইলেন যে, একগাছা খড়ও দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিত না, দুর্গে সর্ব লিঙ্গ ও বয়সের বিরাট জনতা আশ্রয় লওয়ায় অচিরে সেখানে খাদ্যাভাব অনুভূত হইল। শীঘ্রই তাহা পূর্ণ দুর্ভিক্ষে পরিণত হইল। গরু, ঘোড়া ও গাধাগুলি অচিরে ভক্ষিত হইল; বিকট বস্তু ও খাদ্য হইল একটি মৃত পশু সহস্র চক্ষু আকর্ষণ করিত। বাহির হইতে কোন সরবরাহ লাভ বা দুর্গের বাহিরে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। মুহম্মদ খাঁর পরিবারের নিকট এবম্বিধ দুর্দশার কথা দীর্ঘকাল গোপন থাকিতে পারিল না; অবরোধের প্রথম সংবাদ পাইয়াই তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যারা তাঁহাদের বাসস্থান ফিরোজাবাদ ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গমন করিলেন এবং ক্রন্দন ও অশ্রুপাত করিয়া উজীরের সাহায্য ও বাদশাহের মনোযোগ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল না, এবং তাঁহাদের নিদারুণ দুঃখের প্রতি খেয়াল করিল না। নিরাশ হইয়া এই অসহায় পরিবার সর্বশেষ উপায় হিসাবে তাঁহাদের নিজ গোত্র ও কওম—রোহিলা খণ্ডের

মুহাম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ বুন্দেল খণ্ড আক্রমণ করিয়া অবরুদ্ধ হন

আফগানদের দ্বারস্থ হইলেন। মাতা তাঁহাদের প্রধান ব্যাক্তিবর্গের নিকট তাঁহার বোর্কা পাঠাইলেন ও জ্যেষ্ঠ পুত্র কায়ুম স্বয়ং তাঁহাদের নিকট বক্তৃতা দিলেন। এরূপ একটি গণ্যমান্য পরিবারের গভীর বিপদে ব্যথিত হইয়া আফগানেরা ইহার পক্ষে চেষ্টা করিতে ও তাহাদের দেশবাসীদিগকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। মাতা-পুত্র তাহাদের মধ্যে যে সামান্য অর্থ ও জওহেরাত বিতরণ করিতে পারিলেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া তাহারা বিপুল সংখ্যায় একত্র হইল এবং খোদ পুত্রকেই তাহাদের সেনাপতি হিসাবে তাহাদিগকে পরিচালনা করিতে হইবে বলিয়া স্থির করিল। অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া আফগানেরা ঠিক সময়ে সেখানে পৌঁছিয়া অবরোধকারীদের আক্রমণ করিল এবং দুর্গদ্বারে পৌঁছিয়া মুহম্মদ খাঁ ও তাহাদের স্বদেশবাসীদের টানিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে নিরাপদে এলাহাবাদে লইয়া গেল। এই চিরস্মরণীয় যুদ্ধে এই সুযোগ্য পুত্র তাহার পিতার জীবন রক্ষা করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন। অপরপক্ষে মন্ত্রীরাও রাজধানী হইতে অনুরূপভাবে তাহাদের অংশ সম্পন্ন করিলেন। মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ তাঁহার অভিযানে ব্যর্থকাম হওয়ায় এবং একটি যুদ্ধে হারিয়া অবরুদ্ধ হইয়া পড়ায়, তাহার শাস্তি হিসাবে তাঁহারা তাঁহাকে এলাহাবাদের শাসন কর্তৃত্বে বঞ্চিত করিলেন। সর বুলন্দ খাঁর অসদাচরণ ক্ষমা করিয়া এখন ঐ পদ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এই সেনাপতি ঐ চাকরী গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র খানেজাদ খাঁকে নিজ প্রতিনিধিরূপে সেখানে পাঠাইয়া স্বয়ং রাজধানীতে রহিলেন। কিন্তু তিনি বড় একটা দরবারে যাইতেন না, তাঁহার অসন্তোষ এত অধিক ছিল যে, প্রায়ই স্বগৃহে থাকিতেন।

তাঁহার পুত্র বীরত্বের সহিত পিতার জীবন রক্ষা করেন

এক অদ্ভুত দুর্ঘটনায় এই বৎসরের শেষভাগ সমাপ্ত হইল। হায়দর কুলী খাঁর খাসখানায়[৭৪] আপনা-আপনি আগুন লাগায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া উহার মালিকের মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু পর বৎসরের প্রথম ভাগও বিস্ময়কর ঘটনায় কম বিখ্যাত হয় নাই। ১১৩৬ সনের জমাদিউস সানীর ১৮ই বুধবার সূর্যোদয়ের দুই তিন ঘণ্টা পরে প্রবীণ আমীরুল ওমরা শায়েস্তা খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ ইয়ার খাঁ অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় দয়ার প্রাসাদে গমন

১১৩৫ হিজরীর শেষে ও বৎসরের প্রথমে বিচিত্র ঘটনা

করিলেন ; আওরঙ্গযীবের আমলে এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বরাবর শাহজাহানাবাদ বা দিল্লী প্রদেশের শাসনকর্তার পদ ভোগ করিতেন। হায়দর কুলী খাঁর মৃত্যুতে মীর আতশী বা বাদশাহী মহল ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষের পদ খালি হইলে কয়েক দিন পরে এক শুক্রবারে তাহা খান দুরানের ভ্রাতা মুজাফফর খাঁকে প্রদত্ত হইল। একই বৎসর বুরহানুল মুল্‌ক নামীয় বারুদখানা আগুন লাগিয়া উড়িয়া গেল। নিকটবর্তী অট্টালিকাগুলি সহ তৎসঙ্গে উহা ফিরোজ শাহের সমাধির সুড়ঙ্গ উড়াইয়া লইয়া গেল। সমস্তই উহার ভিত্তি হইতে বিছিন্ন হইয়া খানিকটা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। এই বৎসরে সাহসী নজমুদ্দীন আলী খাঁও স্বর্গীয় করুণার প্রাসাদে গমন করিলেন এবং তাঁহার আজমীরের শাসনকর্তার পদ ইতঃপূর্বেই মীর আতশীর উচ্চপদে নিযুক্ত মুজাফফর খাঁকে প্রদত্ত হইল। ১১৪১ হিজরীর ১০ই জমাদিউস্‌ সানী বাদশাহ্‌ জ্বর ও অসুস্থতা বোধ করিলেন। কিন্তু শেষে ইহার সম্পূর্ণ উপশম হইল। একই বৎসরের শাবান মাসে সংবাদ আসিল যে, গুজরাটের মারাঠারা তৎসংলগ্ন রাজা অবিসিংহের দেশে অগ্রসর হইয়াছে। এই হিন্দু রাজা সবেমাত্র ঐ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। এখন তাহার পৈত্রিক রাজ্য আক্রান্ত হইরাছে দেখিয়া তিনি ছুটি লইয়া পূর্ণগতিতে তাঁহার রাজধানী যোধপুর-মার্তায় গমন করিলেন। এই বৎসরের প্রায় শেষের দিকে এক শুক্রবারে পাঞ্জাবের মুচিরা এবং আরও কতিপয় মুসলমান কারিগর একযোগে বিদ্রোহী হইয়া এক বিরাট হাঙ্গামা বাঁধাইল। তাহাদের মধ্যে এক ব্যাক্তি মক্কায় হজব্রত উদযাপন করায় অত্যন্ত সম্মান পাইতেন। হোলির[৭০] দিনগুলির চিরাচরিত বিশৃঙ্খলার সময় তিনি ঘটনাক্রমে হিন্দু জহরীদের হস্তে নিহত হন, তাহাও অন্যায়ভাবে। এক দল অমনোযোগী মন্ত্রীকে তাহাদের অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত না করিতে বরং বিরুদ্ধপক্ষকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক ও ধর্মনৈতিক বিবেচনার প্রতি সামান্য অনুরক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় এবং পরলোকে যে একদিন তাহাদিগকে হিসাব দিতে হইবে, তৎপ্রতি বেখেয়াল দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার শব পাক না করিয়া ও কবর না দিয়া একত্রে তিন

জনৈক নিহত হাজীকে উপলক্ষ করিয়া দিল্লীতে বিরাট রাজদ্রোহ

দিন ফেলিয়া রাখিল। এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

আমীরদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকায় তাঁহাদের কেহই ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতি সুবিচার করার বা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দানের কথা চিন্তা করিলেন না। এরূপ উপেক্ষায় ক্রোধান্বিত হইয়া মুচিরা বিদ্রোহী হইয়া বড় মসজিদ দখল করিল এবং তাহাদের অন্যায়ের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত সেখানে জুমার নামাজ বা যে কোন নামাজ আদায় ও যে কোন সংখ্যক মুসলমানের সমাবেশ নিষিদ্ধ করিল। নগরের কাজী তাহাদিগকে শান্ত করার চেষ্টা করিতে গিয়া শুধু লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলেন। হাঙ্গামা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অবশেষে তৎপ্রতি দরবারের নজর পড়িল। উজীর কমরুদ্দিন খাঁ ও মন্ত্রী জাফর খাঁকে শুক্রবারে মসজিদে নামাজ পড়িতে ও যাহাতে জুমা নামাজ আদায় হয় তাহা দেখিতে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব অনুচর এবং আরও কয়েকজন আমীরসহ সেখানে গিয়া নামাজ পড়িতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এমন সময় মনের ব্যথায় উৎপীড়িত ও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকগুলি তাঁহাদের কুশাসন এবং ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে তাঁহাদের ভীষণ উপেক্ষা ও ঘৃণাজনক উদাসীনতার জন্য তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিতে ও ভৎর্সনা করিতে লাগিল। কথা হইতে কাজে গিয়া তাহারা তাঁহাদের উপর আপতিত হইয়া তাড়াইয়া দিল। জাফর খাঁ নিবিড়ভাবে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীয় আফগান সৈন্যদের ঢালের তলে আশ্রয় লইলেন। মুচিরা তাহাদের আক্রমণ চালাইয়া ঐসকল প্রহরী এবং আমীর ও তাঁহাদের সৈন্যদের উপর তাহাদের চটিজুতা নিক্ষেপ করিতে লাগিল; ফলে তাহারা পুনরায় পলায়নে বাধ্য হইলেন। কেবল উজীরই অটল রহিলেন; কিছু খোলা হাউইবাজি পোড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর নিক্ষেপ করার আদেশ দিলে বিদ্রোহীরা শান্ত হইল এবং কতকটা আতঙ্কিত হওয়ায় হাঙ্গামা খানিকটা হ্রাস পাইল। তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া উজীর বিনীত ভাষায় তাহাদের নিকট আবেদন করিলেন এবং পালাক্রমে কঠোর ও [illegible]

উজির কামরুদ্দীন হাঙ্গামা শান্ত করেন

বাক্য ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইতে সম্মত করাইলেন। কবি বলিয়াছেন ঃ

"কঠোরতা ও নম্রতা যুগপৎ প্রয়োগ করিতে হইবে,

যে চিকিৎসক গিরা খোলেন, তিনি পট্টীও সঙ্গে লইয়া আসেন।"

হাঙ্গামা এত ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, অধিকাংশ আমীরই অপমানিত হন। লোকে আরও অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইতেছিল বলিয়া উজীর চেষ্টা না করিলে কিয়ামতের দিনের ন্যায় কোন গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইতে পারিত।

বর্ষ শেষে শাওয়াল ও জিলকাদ মাসের মধ্যে একত্রে ৪০ দিন যাবত সমগ্র শহরে ভূগর্ভ হইতে এক ঘৃণিত পূঁতিগন্ধ উঠিল; ধনী-দরিদ্র সকলের উপর তাহা সমভাবে ক্রিয়া করায় তাহারা এক ব্যাপক জ্বরে আক্রান্ত হইল; গৃহগুলি রোগীতে ভর্তি হইয়া গেল। দোকান-পাট ও হাট-বাজার বন্ধ হইল, রাজপথগুলি মরু-ভূমি হইয়া দাঁড়াইল এবং শহরটা অধিবাসী-পরিত্যক্ত স্থানের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। লোকে বলিত, তাহারা কখনও এরূপ দুর্যোগ দেখে নাই বা শুনে নাই। পাটনা ও এলাহাবাদ হইতে আরম্ভ হইয়া এই পূঁতিগন্ধ ও রোগ[৩৬] আকবরাবাদ ও দিল্লীতে যায় এবং পানিপথ ও সরহেন্দে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, অবশেষে লাহোরে গিয়া ইহা বন্ধ হয়। আল্লাহ্‌র রহমতে রোগগ্রস্তদের মধ্যে যে অল্প কয়েকজনের শেষমুহূর্ত ইতঃপূর্বেই উপস্থিত হয়, তাহারা ভিন্ন আর কাহারও মৃত্যু হয় নাই। এই বিচিত্র ঘটনার পরে আরও এক বিচিত্রতর ঘটনা ঘটে। এই বৎসর শাহজাহানাবাদ এবং পুরাতন দিল্লী ও উহার উপকণ্ঠে এত কঠোর শীত পড়ে যে তাম্রপাতে পানি জমিয়া সবগুলিই ফাটিয়া যায়। বহমান স্রোতময় নদী পর্যন্ত এভাবে জমিয়া যায়। ১১৪৩ হিজরীর রজব মাসে ক্রমাগত তিন রাত্রিতে এরূপ ঘটে। কয়েকস্থানে বরফপাতও হয়। বাদশাহ-পরিচালিত এক অভিযান দ্বারা এই ভীষণ বৎসর শেষ হয়।

সমগ্র হিন্দুস্থানব্যাপী ছোঁয়াছে রোগ

দিল্লীতে বিচিত্র তুষার

১১৪৫ হিজরীর ৫ই রজব মঙ্গলবার তিনি তাঁহার উজীর কমরুদ্দীন খাঁ, আমীরুল ওমরা খান দুরান ও সমস্ত দরবারসহ শাহ জাহানাবাদ

দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ইয়াজাবাদ, বারহুত ও সোনিপুতের দিকে যাত্রা করিলেন। সোনিপুতে শিবির স্থাপন করিয়া তিনি পূর্ণ এক মাসকাল সাধারণ শিকারের ক্রীড়া-কৌতুকে অতিবাহিত করিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বয়তুল কাটরা নামক স্থান ও বাগানে[৭৭] অবতরণ করিয়া ঐ স্থানের সৌন্দর্যে চিত্তবিনোদন করিলেন। সেখান হইতে তিনি যমুনা নদীর তীরের দিকে অগ্রসর হইলেন; ফেরোখ বখশ নামক স্থান ও বাগানে নদী অতিক্রম করিয়া সেখানে তিনি ১০/১২ দিন অপেক্ষা করিলেন। সেখানে মারাঠারা আকবরাবাদ পর্যন্ত আক্রমণ চালাইয়াছে শুনিতে পাইয়া তিনি সেই লুণ্ঠনকারী জাতিকে শাস্তি দানে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। ক্ষুদ্র হেনিদেন নদী পর্যন্ত আরও দুই মঞ্জিল আগাইয়া গিয়া তিনি বুন্দিলের সেরায়[৭৮] শিবির স্থাপন করিলেন। সেখানে তিনি ৭/৮ দিন বাস করিলেন। কিন্তু তাঁহার যাত্রার সংবাদে লুণ্ঠনকারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ায় ও ঐ অঞ্চল ত্যাগ করায় তিনি তালপুর হইয়া ফরীদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং শাওয়াল মাসে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি প্রসাদৎ গৌরব ও রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত তাঁহার প্রাসাদে অবতরণ করিলেন।

শিকারের ছলে বাদশাহের অভিযানে যাত্রা

বাদশাহের এই শিকারের ব্যাপার আরও গুরুতর কিছুর ভূমিকা বলিয়া বোধ হইল। কারণ, ১১৪৬ হিজরীর ১৩ই রমজানে সূর্যোদয়ের প্রায় ৩½ ঘণ্টা পরে খান দুরানের ভ্রাতা ও বাদশাহী মহলের প্রধান অধ্যক্ষ মুজাফফর খাঁ মারাঠাদিগকে শাস্তি দানে যাত্রা করার আদেশ পাইলেন। তিনি একটা খেলাত পাইয়া তাহা পরিধান করিলেন এবং গৃহে গমনের অবসর না লইয়াই তৎক্ষণাৎ নগরের বাহিরে যাত্রা করিয়া জীবনদাসের বাসস্থানে শিবির স্থাপন করিলেন। গুজরাট ও মালব জয়ের পরেও মারাঠারা রাজধানী হইতে কেহ তাহাদের জবর-দখলের বিরোধিতা করিতে আসিতেছে না দেখিয়া তাহাদের লুণ্ঠন ও আক্রমণ চালাইয়া যায়—ইহা সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তাহারা চৌথ ধার্য করিয়া পরিতৃপ্ত হয় ও তৎপরে একটু বিশ্রাম লয়। সে যাহা হউক, যখন তাহারা দেখিতে পাইল যে, তাহাদের গতিবিধির প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই, তখন তাহারা পুনরায়

আক্রমণ আরম্ভ করিল, ঐ সমুদয় জিলার প্রভুত্ব গ্রহণ করিল এবং ক্রমে আরও দুই একটি জনপদ জবরদখল করিয়া বাদশাহী সীমান্তকে পশ্চাদ্‌গামী অবস্থায় রাখিল। অবশেষে এক পক্ষে অবিশ্রান্ত জবরদখল ও অবিরাম পরিশ্রমের বদৌলতে ও অপরপক্ষে সর্বাপেক্ষা লজ্জাজনক উপেক্ষা ও সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ আলস্যের দরুন তাহারা গোয়ালিয়র পর্যন্ত সমস্ত জনপদের মালিক হইয়া বসিল। ইহা হিন্দুস্তানে একটা বিখ্যাত ও প্রয়োজনীয় দুর্গ এবং আকবরাবাদের অতি সন্নিকটে। এই সকল সফলতায় উৎফুল্ল হইয়া তাহারা নূতন বিজয় ভিন্ন অন্য কিছুর কথাই বলিত না। প্রধানতঃ নিজামুল মুল্‌কের প্ররোচণায়ই তাহারা এরূপ করে। তিনি শত্রুতা ও বিশৃঙ্খলার অঙ্গারে ফুৎকার দিতেন এবং তাহাদিগকে অবিরত নূতন অভিযানে উত্তেজিত করিতেন। সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত ও মন্ত্রীদের ভীরুতা সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়ী থাকায় মারাঠারা নিজামুল মুল্‌কের স্বার্থের পরিপূরক হিসাবে তাহা করে; অবশ্য এরূপ কোন মতলব বা নিমন্ত্রণ ব্যতিরেকেও তাহারা নিজেরাও তাহাই করিত। কাজেই এরূপ শক্তিশালী সমর্থনের নিশ্চিত ভরসা পাইয়া তাহারা গোয়ালিয়রের দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইল এবং একদিকে আকবরাবাদ ও অপর দিকে সুদূর আজমীর পর্যন্ত চৌথ আদায় করিতে লাগিল। খানদুরান এত বুদ্ধিমান ছিলেন যে, এবম্বিধ জবরদখলের পরিণাম অনুভব না করিয়া পারিতেন না, কিন্তু তিনি নিজে তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করা অসঙ্গত মনে করিয়া মুজাফফর খাঁকে এই সমুদয় জবর-দখল বন্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন। এই লোকটা নিজের সাহস ও বীরত্বের জন্য এত গর্বিত ছিলেন যে, তৎসম্বন্ধে অবিশ্রান্ত বকিয়া যাইতেন। বাদশাহ্ যথেষ্ট সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি বাদশাহী সৈন্যদল ও কতিপয় আমীরের সৈনিকবৃন্দ লইয়া যাত্রা করিলেন; সর্বশুদ্ধ ২২০০০ লোক তাঁহারসহগমনে আদিষ্ট হইল। সকলে মিলিয়া এক চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি হইল। তাহাদের বিপুল সংখ্যায় ময়দান ভরিয়া গেল। পূর্ণ ক্ষমতায় অভিষিক্ত হইয়াএক বিরাট বাহিনী ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া মুজাফফর খাঁ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের জিনে পা রাখিয়া মারাঠাদিগকে

মারাঠারা তাহাদের জবরদখল চালাইয়া যাইতে থাকে ও তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাপতিকে অবজ্ঞা করে

যুদ্ধদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহাদের মুকাবিলা করিতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এই লুণ্ঠন- কারীরা শুধু খণ্ডযুদ্ধ ও আক্রমণেই অভ্যস্ত ছিল, তাহারা কখনও মুখোমুখি যুদ্ধ করিত না বলিয়া কিছুতেই তাঁহার সম্মুখীন হইল না। বরং তাঁহাকে নিয়মিত অগ্রগতিতে ও সেরোজ পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবনে নিয়োজিত রাখিল। মুজাফ্ফর খাঁ সেখানে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। মারাঠারা তখন ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার শিবির বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং অবিশ্রান্ত খণ্ডযুদ্ধে তাঁহার আস্তানা এত দুরাবস্থাপন্ন করিয়া তুলিল যে, তাঁহার সৈন্যদলে রসদ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের টান পড়িল। কিন্তু তিনি নিজের নিরাপত্তা বিধান করিয়াই তৃপ্ত রহিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ও বাদশাহের আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের আদেশ আসিলে তিনি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় তাঁহার সৈন্যদল লইয়া আসিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া ১১৪৭ হিজরীর ১০ই মুহর্‌রম মঙ্গলবারে তিনি বাদশাহ্‌কে কুর্নিশ করার সম্মান পাইলেন। তাঁহাকে পূর্ণ এক বাসন মনি ও রত্ন দিয়া অভ্যর্থনা করা হইলে তিনি নিজ প্রাসাদে গমন করিলেন। ইহাই ছিল সর্বদা তাঁহার বাসনার লক্ষ্য। সেখানে তিনি ভিক্ষা দিলেন ও তাঁহার বন্ধুরা দিলেন সদকা।[৭৯] আল্লার অনুগ্রহে এরূপ একজন বিখ্যাত সেনাপতিকে ঐ বিরাট অভিযানের নানাবিধ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করায় তাঁহার প্রতি শুকরিয়া হিসাবে তাঁহার প্রিয়পাত্র ও মোসাহেবেরা দিলেন নজর। ঐ বিপজ্জনক অভিযানে তিনি যে অসাধারণ যোগ্যতা ও আশ্চর্যজনক আচরণের পরিচয় দেন, সকলেই এক বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিলেন। তাঁহার নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ছিল যেন সকলের সর্বাপেক্ষা আকুল আশার বাহিরে এক সৌভাগ্যজনক ব্যাপার, এভাবে তজ্জন্য তাঁহাকে ও আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিল। তথাপি যাহারা তাঁহাকে জানিত ও তাঁহার সহিত যাহাদের সম্পর্ক ছিলনা, তাহারা প্রায়ই নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হইত না ঃ

"তুমি এমন কাজ করিলে! সাহসী লোকদের কি এমনি আচরণ ?"

এই বৎসর আজম শাহের পুত্র শাহজাদা আলী তেবার মগফুর[৮০] স্বর্গীয় রহমতের ভবনের দিকে সফর করেন। সেদিন ৬ই মহর্‌রম; তাঁহাকে তাহার

মাতা কৃপাপুরীর[৮২] নিজের জন্য স্বনির্মিত সমাধিভবনে তাঁহারই নিকটে সমাহিত করা হয়। এই বৎসরের ২৪শে জমাদিউসসানি সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত উজীর কমরুদ্দীন খাঁ ও আমিরুল ওমরা খান দুরান উভয়েই মারাঠাদের শাস্তি দানে নিযুক্ত হন। এই উভয় বীরপুরুষই একত্রে যাত্রা করেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ মারাঠাদের বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ চালনা করিয়া একত্রে নগরে ফিরিয়া আসেন। এই অভিযানের পরিণতি ঘটে মুজাফ্ফর খাঁর অভিযানেরই মত। এই সেনপতিদের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পরে ঐ অভিশপ্ত দস্যুগণ সম্বর শহর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। শাহজাহানাবাদ হইতে ইহার দুরত্ব মাত্র ১০০ মাইল। ঐ স্থানের ফৌজদার ফখরু আপনাকে ও শহর বাসীদিগকে লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করার জন্য তাহাদিগকে চারিটি হাতী তিন লক্ষ টাকা এবং আরও কিছু তৈজসপত্র দানে সম্মত হন এবং যথারীতি তাঁহার কর্তব্য পালন করেন। কিন্তু দস্যুরা তাহাদের প্রাপ্য পুরাপুরি পাইবার পরে তাঁহাকে অক্রমণ করিয়া এমনভাবে লুণ্ঠন করে যে, তাঁহার পিঠের কাপড়খানা ভিন্ন পৃথিবীতে তাঁহার জন্য আর কোনই সম্পতি রাখিয়া যায় নাই। স্থানীয় কাজী বা প্রধান বিচারপতি কাফিরদের বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া জহর-ব্রতের শরণ লইলেন; হিন্দুস্থানে ইহাকে সম্মানের বিষয় বলে; অর্থাৎ তিনি তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার পুত্র-কন্যা ও তাঁহার সমস্ত পরিবারকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিয়া অস্ত্রধারণ করতঃ কয়েকজন বন্ধুসহ তাঁহারা শেষ রক্তবিন্দু পতিত না হওয়া পর্যন্ত নিজের গৃহরক্ষা করিলেন; তিনি যে সাহসীর ন্যায় ব্যবহার কারেন এবং অসাধারণ বীরত্ব ও দৈহিক শক্তির পরিচয় দেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র সাম্রাজ্যে এইরূপ ঘনঘটার পরে প্রকৃতি রাজধানীর অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ১১৪৮ হিজরীর ১৮ই রবিউসসানী বুধবার সন্ধ্যায় একাধিকক্রমে ত্রিশ ঘণ্টা ধরিয়া এত প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হইল যে, রাজধানীর অধিকাংশ গৃহই ভূমিস্যাৎ হইল ও রওশন আরার সারাইর ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী এত ফুটিয়া উঠিল যে, সমস্ত রাস্তা দিয়া ৫ ফুট উচ্চ কয়েকটি জলস্রোত প্রবাহিত হইল। একই সময় আকবারাবাদও একই দুর্যোগে ডুগিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিল।

সাম্রাজ্য যখন উক্ত দুর্যোগে ভুগিতেছিল এবং প্রত্যেকেই গোলমালের সুযোগে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতেছিল, তখন জনৈক জমিদার অর্থাৎ প্রকৃতিতে ও ব্যবসায়ে অশান্ত ও অবাধ্য ব্যক্তি যে—স্বাধীনতা লাভে আকাঙ্ক্ষী হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? অকল্না কোরার জমিদার আজাজো ছিলেন ঐ জিলার ফৌজদারের হুকুমের অধীন। মন্ত্রীসভার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার মালপত্র লুণ্ঠন করিলেন; তদুপরি তাঁহার পরিবারও দখল করিলেন। এই ফৌজদার উজীর কমরুদ্দীন খাঁর ভ্রাতা জান নেসার খাঁ বই আর কেহ নন। অপরাধের গুরুত্বে স্তম্ভিত হইয়া উজীর জমিদারকে শাস্তি দান ও তাঁহার হাত হইতে মৃতের পরিবার ও স্ত্রীকে উদ্ধার করার জন্য তাঁহার জ্ঞাতি আজিমুল্লাহ্ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আজাজো ছিলেন অন্যায়ে অভ্যস্ত; তিনি কতদূর বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা জানিতেন বলিয়া আজিমুল্লাহ্ খাঁকে তাঁহার নির্দিষ্ট বাসস্থান ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার দেশের এক দুরাধিগম্য বলিয়া পরিত্যাক্ত অংশে প্রস্থান করিলেন। এই পশ্চাদ্বর্তনে লোকটিকে সামান্য গুরুত্বের বলিয়া আজিমুল্লাহ্ খাঁর স্পষ্ট ধারণা জন্মিল; তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব তাঁহার সময় নষ্ট করার মত কাজ নহে স্থির করিয়া তিনি সে দেশে অল্প কিছুদিন মাত্র অবস্থান করিলেন এবং তুরানী খাজেম বেগ খাঁকে অপর কয়েকজন সেনাপতিসহ সেখানে রাখিয়া স্বয়ং রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। তাহার প্রস্থানের সংবাদ পাইবামাত্র আজাজো পূর্বাপেক্ষা আরও গর্বিত ও তাঁহার প্রচণ্ড মেজাজের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। নিজের দুর্গগুলি ত্যাগ করিয়া তিনি অকস্মাৎ খাজেম বেগ খাঁ ও তাঁহার সৈন্যদের উপর আপতিত হইয়া তাঁহাদিকে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে কমরুদ্দীন খাঁ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; কিন্তু এরূপ প্রকৃতির অন্যায়ের প্রতিকার করার মত ব্যক্তিগত সাহস ও মনের বল তাঁহার অত্যন্ত কম থাকায় তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদৎ খাঁর নিকট আবেদন করিলেন: মোগল নামের প্রতি তাঁহার কোন ভক্তি ও মুসলমান ধর্মের জন্য কোন উৎসাহ থাকিলে তিনি তাঁহাকে ঐ দুর্দান্ত পাপিষ্ঠকে শাস্তিদানে আগমনের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। সাদৎ খাঁ ছিলেন ব্যক্তিগত

ভাবে একজন সাহসী পুরুষ ও সধর্মের উৎসাহী সমর্থক; কাজেই এই পত্র পাইবামাত্র তিনি ঐ অভিযানে যাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি ইতো-পূর্বেই অন্য কোন কাজে রাজধানী যাত্রা করেন। এমন সময় কমরুদ্দীন খাঁর পত্র পাইয়া প্রধান রাস্তা ছাড়িয়া জমিদারকে শায়েস্তা করার মানসে ডাইন দিকে ফিরিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি এই সেনাপতিকেও নম্রবাক্যে প্রতারিত করিতে চাহিলেন; কিন্তু অপর ব্যক্তি এরূপ ফাঁদে পড়িলেন না দেখিয়া এবং নিজে অত্যন্ত সাহসী ও গর্বিত লোক বিধায় ও তাঁহার বিগত সফলতায় উৎফুল্ল থাকায় তিনি বাধাদান ও যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া শুধু আক্রমণ আরম্ভ করার জন্য শত্রুর আগমন প্রতিক্ষায় রহিলেন; ঘটনাক্রমে সুবেদার যখন দিনের পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তাঁহার তাঁবুতে গমন করিতেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আজাজোর যে সকল চর অতি নিকটে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা গিয়া তাহাদের প্রভুকে সংবাদ দিল, সুবাদার সবুজ পোশাক পরিহিত লম্বমান শ্মশ্রুধারী এক জন দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ লোক; তাহারা আরও বলিল যে, তিনি এই মাত্র তাঁহার তাঁবুতে প্রবেশ করিয়াছেন। জমিদার ঠিক এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার গুপ্তঘাঁটি হইতে সটান বহির্গত হইয়া তাঁহার সৈন্যদের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। এতদ্দর্শনে সাদৎ খাঁ তাঁহার হাতীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে যুদ্ধে নিয়োজিত করার প্রয়াস পাইলেন। তিনি তাহাদিগকে নিকটে ও তখন যে অবস্থায় পাইলেন, সেই অবস্থায়ই তাহাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। ঘটনাক্রমে সাদৎ খাঁ তাঁহার ধূলিময় কাপড় ছাড়িয়া একটি সাদা পোশাক পরিধান করেন; আর যাঁহারা যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রবর্তীদের অন্যতম ছিলেন তাঁহার একজন পুরাতন ও উৎকৃষ্ট কর্মচারী আবু তোরাব খাঁ তুরানী; তিনি সেদিন সবুজ পোশাক পরিধান করেন এবং তাঁহারও লক্ষ্য করিবার যোগ্য দীর্ঘ লম্বমান দাড়ি ছিল। আজাজো ঐ কর্মচারীটিকে হস্তীর উপর দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে খোদ সাদৎ খাঁ বলিয়া মনে করিলেন এবং তাঁহার কয়েকজন পামর অনুচরসহ পূর্ণগতিতে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই অংশে গমন করিলেন। শীঘ্রই হস্তীর কাছে আসিয়া তিনি তাঁহার বর্শা চালনা করিয়া এত জোরে

হন্ধ কর্মচারীটিকে আঘাত করিলেন যে, উহা আদ্যান্ত তাঁহার দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্টদেশ দিয়া বাহির হইয়া হাওদার কাঠে গিয়া বিঁধিল। সাদৎ খাঁর অগ্রবর্তী সৈন্যেরা লোকটির সাহসে ও তাঁহার নির্বাচিত সঙ্গীগণের কৃত হত্যাকাণ্ডে ভীত হইয়া চঞ্চল ও হৃত-সাহস হইতে আরম্ভ করিল। তখন স্বয়ং সাদৎ খাঁ একটি নির্বাচিত দল লইয়া তাহাদের সাহায্যার্থে ছুটিয়া গেলেন এবং আজাজো ও তাঁহার অনুচরদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপের পরে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া তরবারি হস্তে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দুর্জন সিংহ নামে জনৈক হিন্দু কর্মচারী ছিলেন জমিদারের আত্মীয়, কিন্তু দীর্ঘকাল হইতে সাদৎ খাঁর অধীনে চাকরী করিতেছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে তিনি লোকটিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনিবকে তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন এবং ঘোড়া ছুটাইয়া ভর্ৎসনার সঙ্গে তাঁহাকে যুগপৎ আঘাত হানিতে লাগিলেন। একই সময় আজাজো দুর্জন সিংহের আঘাত হইতে একটি ও সাদৎ খাঁর তীর হইতে আর একটি—দুইটি আঘাত পাইয়া পড়িয়া গিয়া পদদলিত হইলেন। এই মুহূর্ত হইতে বিজয়ের মৃদু ফলবায়ু মৃদুভাবে ঐ সেনাপতির অবনত পতাকা তুলিতেছে বলিয়া বোধ হইল এবং তাঁহার সৈন্যদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত পুরাপুরি প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিজয় দান করিল। বিজয়ী সেনাপতি শত্রু-শিবির দখলে আনিয়া জমিদারের মস্তক বাদশাহের নিকট পাঠাইবার ও তাঁহার চামড়ায় খড়ভর্তি করিয়া তাহা উজীরকে উপহার দেওয়ার আদেশ দান করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আবুল মনসুর খাঁর নিকট তাঁহার সৈন্যদলের বৃহত্তম অংশ রাখিয়া ও তাঁহাকে দেশের শাসন-ভার দিয়া রাজধানীর পথ ধরিলেন। এই বৎসরের ৭ই রজব তিনি বাদশাহকে কুর্নিশ করিয়া একখানা বিচিত্র ছোরা ও তরবারিসহ তাঁহাকে ১০০৯টি আশরফি নজর দিলেন। বাদশাহও একটি ছোরা ও রত্নখচিত একখানা তরবারি, একটি অশ্ব ও একটি হাতীসহ একটি মূল্যবান খেলাত দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। দুই মাস পরে তিনি আবুল মনসুর খাঁ, শাহ্ আবদুল্লাহ্ ও তাঁহার অন্যান্য সেনাপতির নিকট হইতে পত্র পাইয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আহূত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জানাইলেন যে, আজাজো তাহার সাহায্যার্থে যে সকল মারাঠাকে আহ্বান করেন, তাহারা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে।

বুদ্ধিমান, চতুর ও সুবক্তা ইয়াদগার খাঁ কাশ্মিরী ছিলেন খান দুরানের একজন বিশিষ্ট বন্ধু, প্রায় এই সময়—একই বৎসরের ৬ই জিলকদ তিনি রাজা জয়সিংহ সেবায়ী (শিবাজী) ও মারাঠা প্রধান সেনাপতি রাজিরাওর নিকট প্রেরিত হন। রাজা শাহ ইতোপূর্বে শেষোক্ত ব্যক্তিকে রাজ্য বিস্তারের আদেশ দিয়া হিন্দুস্তানে প্রেরণ করেন। বাদশাহ দূতের হস্তে মালব ও গুজরাট—দুইটি প্রদেশের সনদ অর্পণ করেন। বাজিরাও পূর্ব হইতেই এগুলি অস্ত্রবলে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। দূতের উপর ঐ সেনাপতিকে উচ্চস্থান ও বিবিধ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়া বাদশাহের চাকরীতে ভাগাইয়া আনার ভার অর্পিত হয়। রাজা জয়সিংহের কাজ ছিল এই ব্যাপারে মধ্যস্থের কাজ করা। এই একই বৎসরের ১৪ই জিলহজ্জ মধ্য রাত্রির প্রায় তিন ঘণ্টা পূর্বে জাফর খাঁ প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অনেক মূল্যবান গুণ, বিশেষতঃ তাঁহার দানশীলতা ও সদায়-প্রকৃতির জন্য খ্যাতি লাভ করেন। শাহবিঘা নামক জনৈক আমীরের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে। তিনি তাঁহাকে তাঁহার বিভাগের উপদেষ্টা করেন; তাঁহাকে তাঁহার ইষ্ট-দরবেশরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিতেন। কিন্তু এখন এই সমস্ত ক্ষুদ্র ঘটনা (প্রকৃতপক্ষে এই দীর্ঘকাল যাবৎ রাজধানীতে যাহা কিছু ঘটে, তাহা এতদপেক্ষা ভাল নামের উপযুক্ত নহে) ছাড়িয়া দিয়া সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে দৃষ্টিপাত করার সময় আসিয়াছে; এরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া অজ্ঞাত ও বিস্মৃত থাকিবার পর তাহা এখন অকস্মাৎ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেখানে বৈদেশিকদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে ও যাহা হিন্দুস্তানের রাজধানীর নিকটবর্তী জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তদ্বারা সমৃদ্ধ একটি রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়; দৃশ্য উন্মুক্ত হয় আজিমাবাদে।

নসরৎ ইয়ার খাঁর পরে কে কে ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা হন, তাহা আমার জানা নাই। আমি শুধু জানি যে, ১১৪০ সনে জাফর খাঁর ভ্রাতা ফখরুদ্দৌলা ঐ প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব পাইয়া সেখানে পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি লেখাপড়া জানিতেন না; তদুপরি তিনি ছিলেন চঞ্চল মস্তিক এবং তাঁহার কার্য ছিল উপেক্ষা ও অজ্ঞতার শামিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গর্বিত ও অত্যন্ত ক্রোধ-প্রবণ এবং যুগপৎ এত অবিবেচক যে, সামান্য

বিষয়ের জন্য তদঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি শাহ্ আবদুল্লার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন। দীর্ঘকাল যাবৎ প্রত্যেক শাসনকর্তা তাঁহাকে সর্বদা তাঁহার সহকারী বা খাজানার সাধারণ ইজারাদাররূপে নিয়োগ করেন। কাজেই তিনি ঐ প্রদেশের সমস্ত সরকারী কার্যের প্রধান হাঁসকল ছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রায় সমস্ত জমিদারের সঙ্গেই তাঁহার সম্পর্ক ছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তিনি সৈন্যদের ও প্রদেশের প্রত্যেকের শুভেচ্ছা অর্জন করেন; সেখানে সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত। ঈর্ষার বশে ফখরুদ্দৌলাহ্ তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটি মিথ্যা দোষারোপ করেন এবং তাঁহাকে এত অস্থির করিয়া তোলেন যে, তিনি আজিমাবাদস্থ তাঁহার (নিজ টাকার ক্রীত) গৃহ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার অপর তীরে প্রস্থান করাই সঙ্গত মনে করেন। সেখানে সেভান শহরের ধারে তিনি একটি কর্দম দুর্গ নির্মাণ ও অনেকটা জমিসহ কয়েকটা গ্রাম ক্রয় করেন; এখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া সেখানে গমন করিলেন। এই প্রস্থানেও সন্তুষ্ট না হইয়া শাসনকর্তা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া নদী অতিক্রম করতঃ তাঁহাকে উক্ত দুর্গে অবরোধ করিলেন; দুর্গটি অধিকার করিয়া তাঁহাকে ধৃত ও উৎপীড়িত করাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। চরম বিপদে পড়িয়া ভদ্রলোক অনৈক্যের বিষয়সহ তাঁহার অবস্থা প্রকাশ করিয়া তাহার নিকটবর্তী প্রতিবেশী অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদৎ খাঁর নিকট আবেদন করিলেন। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে শাহ্ অকস্মাৎ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাহসের সহিত বলপূর্বক ফখরুদ্দৌলার শিবিরের ভিতর দিয়া তাঁহার পথ করিয়া লইলেন। সাহসিক কার্যের দ্বারা তাঁহার প্রস্থানের ব্যবস্থা করিয়া তিনি ফখরুদ্দৌলার বিদ্বেষী মতলব ব্যর্থ করিলেন এবং নিজেকে সৈনিক ও রাজস্ববিদ বলিয়া প্রমাণিত করিলেম। শাহ আবদুল্লাহ্ সাদৎ খাঁর দরবারে উপস্থিত হইলে মর্যাদা ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইলেন; বিদ্বেষী শাসনকর্তা তাঁহার শিকার হারাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে কিছুকাল পরে তিনি খাজা মুতাসিমের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত করিলেন। এই খাজা বা ফকীর খান দুরানের এক ভ্রাতা বই আর কেহ নন। ফকীরের বেশে ও কার্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত ধার্মিক ব্যক্তির আল্লাহর প্রতি

নির্ভরতা সহকারে তিনি প্রথম শ্রেণীর একজন আমীরের যাবতীয় শানশওকতের সহিত আজিমাবাদে বাস করিতেন। শাসনকর্তার উদ্ধতা ও দাম্ভিক ব্যবহারে ও তাঁহার কার্যের ছেবলামিতে মর্মাহত হইয়া তিনি আজিমাবাদ ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার আগমনের কারণ জানিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে শাসনকর্তার জুলুমবাজির বিষয় অবগত করাইলেন। কথাটা ইতঃপূর্বেই মন্ত্রীর কানে আসে; তিনি ফখরুদ্দৌলাকে পদচ্যুত করাইয়া আজিমাবাদের শাসন কর্তৃত্ব বাঙ্গালার সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। শুজাউদ্দৌলার নামে ইহার সনদ প্রেরিত হইল; ইনি তাঁহার শ্বশুর জাফর খাঁর ঐ সুবাদারীতে তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ঐ সকল পূর্বদেশ এখন আমাদের ইতিহাসের মুখ্য বিষয়ে পরিগণিত হইতে যাইতেছে বলিয়া উহাদের প্রত্যক্ষ শাসকের সহিত পাঠকদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া অসঙ্গত হইবে না।

বাঙ্গলায় রাষ্ট্রবিপ্লবের ভূমিকা

তদানীন্তন বাঙ্গালার সুবাদার শুজাউদ্দৌলাহ্ বা শুজাহ্ খাঁ[৮১] ছিলেন দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুরের অধিবাসী ও মূলতঃ একজন আফশার; ইহা ইরানের[৮২] অন্যতম প্রদেশ খুরাসানে বসবাসকারী একটি তুর্ক গোত্র। তিনি ছিলেন ঐ নগরের একজন প্রধান ব্যক্তি; ঐ নগরের আর একজন সম্মানী লোক জাফর খাঁর সহিত কুটুম্বিতা হওয়ায় তিনি ঐ আমীরের সহিত বাস করিতেন। আওরঙ্গযীবের আমলে তিনি দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান হন।[৮৩] কালক্রমে তিনি উহার নিজামৎ বা সামরিক শাসন কর্তৃত্বও লাভ করেন। উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধের দরুন জাফর খাঁর প্রত্যেকটা পদোন্নতিতে অনুরূপভাবে জামাতারও প্রতিপত্তি বাড়িল। শ্বশুর বাঙ্গালা-উড়িষ্যার দেওয়ান ও নাজিম—এই দুইটা স্বতন্ত্র পদের মালিক হইলে শুজাহ্ খাঁর জন্য শেষোক্ত সুবাদারী যোগাড় করিলেন। শুজাহ্ খাঁ সেখানে গিয়া তাঁহার বাসা লইলেন। স্বয়ং তাঁহার শাসনকার্য পরিদর্শনই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; এই দুইজন আমীরের মধ্যে মেজাজ ও মতের এতই গরমিল ঘটিয়াছিল যে, শালীনতা ও যথাযোগ্য মিল-মহব্বতের সহিত একত্র-বাস তাঁহাদের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না। কাজেই জামাতা শ্বশুরের

নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহিলেন। তিনি ছিলেন একজন মাঝামাঝি মেজাজের ন্যায়বিচারপ্রিয় লোক; তাঁহার চরিত্র অনেক মূল্যবান গুণে ভূষিত থাকায় তিনি সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেন। জাফর খাঁ ছিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সকলের নিকট এভাবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের অনৈক্যের আর এক কারণ শুজা খাঁর স্ত্রী, জাফর খাঁর কন্যা ও পরে সরফরাজ খাঁর মাতা যিনতুন্নেসা বেগম [৩] স্বামীকে পছন্দ করিতেন না। এই শাহজাদী ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির মহিলা ও সতীত্বের আদর্শ; কেবল পিতার সহিত এরূপ অসদ্ভাবে থাকার জন্যই তাঁহার মন স্বামীর প্রতি বিরূপ হয় নাই, ইহার বিশেষ কারণ রমণীর ভালবাসার প্রতি শুজাহ্ খাঁর বেজায় ঝোঁক। তাঁহার সহিত পৃথক হইয়া তিনি তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে তাঁহার বাসস্থান মনোনীত করেন। এই নগর তাঁহার পিতার স্থাপিত এবং তাঁহার উপাধি মুর্শিদকুলী খাঁর নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয়। সেখানে তিনি মহাড়ম্বরে অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত বাস করিতেন। ভাগ্য পূর্ব হইতেই তাঁহার পরিবার উৎসন্ন ও ঐ সকল দেশের চেহারা পরিবর্তিত করার জন্য একটি লোককে নির্ধারিত করিয়া না রাখিলে তিনি হয়তো সেখানে শান্তি ভোগ করিতে থাকিতেন। এই সময় মির্জা মুহম্মদ নামক এক ব্যক্তি দরবারে উপস্থিত হন; তাহার পত্নী স্বয়ং আফশার গোত্রের মহিলা বলিয়া শুজাহ্ খাঁর আত্মীয় হইতেন। এই মির্জা মুহাম্মদের সঙ্গে হাজী আহমদ নামে তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মির্জা মুহাম্মদ আলী নামে এক কনিষ্ঠ পুত্র ছিল; শেষোক্ত ব্যক্তি তদবধি আলীবর্দী খাঁ নামে ও মহাবৎ জঙ্গ উপাধিতে পরিচিত। এই মির্জা মুহম্মদ আজমশাহ্ মগফুরের চাকরী করিতেন। তাঁহার মনিবের মৃত্যুর পরে তিনি দীর্ঘকাল যাবত বেকার থাকায় এবং একটা বৃহৎ ও নিঃস্ব পরিবারের ভরণ-পোষণে বাধ্য হওয়ায় সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও খিন্ন হইয়া পড়েন। এই নিদারুণ সংকটে মির্জা মুহম্মদের পুত্র মির্জা মুহাম্মদ আলী তাঁহার মাতা পিতাকে শুজাহ্ খাঁর দরবারে প্রেরণের উপায় অবলম্বন করেন। ঐ শাসনকর্তা একজন আত্মীয়কে বাধিত করিতে খুশী হইয়া মির্জা মুহম্মদকে কয়েক প্রকারে

আলীবর্দী খাঁর পরিবার ও শক্তির উৎপত্তি

অনুগৃহীত করিলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের অধীনে চাকরী দিয়া তৎপ্রতি এত দয়া দেখাইলেন যে, পুত্র মির্জা মুহাম্মদও অনুরূপভাবে বাঙ্গলা-উড়িষ্যার দরবারে যাইতে মনস্থ করিলেন। এরূপ দীর্ঘপথ পর্যটনের আদৌ কোন সঙ্গতি না থাকায় তাঁহাকে এই বাসনা কার্যে পরিণত করিতে চরম অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। অবশেষে তিনি উড়িষ্যার দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ প্রতিভা, অল্পে অল্পে বিশ্বাসভাজন হইবার মত মনের গতি ও সর্বাপেক্ষা নাজুক ব্যাপারের উপযোগী মেজাজের অধিকারী লোক। কিরূপে নিজেকে অতীব সূক্ষ্মরূপে নাজুক ব্যাপার সম্পন্ন করার উপযোগী করিতে হয়, তাহা তাঁহার জানা ছিল। এই সমুদয় বেসামরিক গুণের সহিত অচিরে নির্ভীক বীরত্ব ও অকুতোভয় সাহসের সামরিক গুণ যুক্ত হইল। তিনি এত অধিক সুখ্যাতি অর্জন করিলেন যে, এরূপ চমৎকার প্রজা লাভের জন্য শুজাহ্ খাঁ নিজেকে অভিনন্দিত করিলেন এবং তাঁহার আগমন তদীয় রক্ষকের পরিবারের উত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সূচক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আলীবর্দী নিজেকে বহুবিধ গুণের বিরাট যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বলিয়া প্রমাণিত করেন

ফলে মির্জা মুহম্মদ দিন দিন অধিকতর অনুগ্রহভাজন ও আস্থা ভাজন হইতে লাগিলেন ও সর্বোচ্চ পদগুলিতে উন্নীত হইলেন। এখন এই দুই ব্যক্তির মধ্যে অনুরাগ ও অনুরক্তির চারা বদ্ধমূল হইলে এবং ইহার শক্তি অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষিত ও দৃঢ়ীকৃত হইলে মির্জা মুহম্মদ আলী তাঁহার ভ্রাতা হাজী আহমদকে সমগ্র পরিবারের পত্নী, শিশু ও আত্মীয়বর্গসহ আনয়ন করার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা এখন শাহজাহানাবাদে বাস করিতে-ছিলেন, তদনুযায়ী শেষোক্ত ব্যক্তি তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া বাঙ্গালায় গমন করিয়া তথা হইতে উড়িষ্যার দরবারে গমন করিলেন। সেখানে পৌঁছিলে তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুগৃহীত এবং পদ ও চাকরীতে উন্নীত হইলেন। উভয় ভ্রাতাই যোগ্যতাসম্পন্ন, সর্ববিষয় পারদর্শী ও কঠোরতম প্রতিবন্ধক অতিক্রম করার মত অধ্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা শুজাহ্ খাঁর শাসন এত মজবুত করেন যে পরিণামে ইহা যে, মর্যাদা লাভ করে—তাহার ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদের প্রযত্ন ও পরিশ্রমে রাজস্ব

বিভাগে বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করায় রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার রাজনৈতিক যোগ্যতার সহিত মির্জা মুহম্মদ আলী সৈনিক হিসাবে উজ্জ্বল চরিত্র যোগ করায় এবং তাঁহার পিতা বা ভ্রাতা অপেক্ষা সর্বদা অধিক প্রতিভা প্রদর্শন করায় অচিরেই তাঁহার সমস্ত আত্মীয় ও শুজাহ্ খাঁর চাকরীতে নিযুক্ত সমস্ত লোককে এত অধিক ছাড়াইয়া গেলেন যে, কালক্রমে আত্মীয় ও অপরিচিত সকলেরই তিনি ঈর্ষার পাত্র হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুরুব্বি দরবারে নিজের কতিপয় গোমস্তা রাখিতেন। এই হিংসা আরও চরমে উঠিল তখন, যখন তিনি তাঁহার জন্য মুহম্মদ আলীবর্দী খাঁ[৮৬] উপাধিসহ একটি মসনব আনয়ন করাইলেন; ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে এই সম্মান সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িল।

এতদিন ধরিয়া জাফর খাঁ জামাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহার জীবন শেষ হইয়া আসিতেছিল বলিয়া তিনি যিনতুন্নেসার গর্ভজাত তাঁহার পৌত্র সরফরাজ খাঁর নামে বাঙ্গালার নিজামত আদায়ের পরিকল্পনা করিলেন। এই যুবক রাজপুত্র পূর্ব হইতেই ঐ প্রদেশের দেওয়ান ছিলেন। এই পরিকল্পনা স্থির করিয়া তিনি দরবারে তাঁহার গোমস্তাদিগকে পত্র লিখিলেন। যে বস্তু এখন তাঁহার অন্তরের বাসনা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা লাভ করার জন্য তিনি কোন কষ্ট ও অর্থ ব্যয়েই ত্রুটি করিলেন না। ইহা শেষ হইলে তাঁহার দৌহিত্র ঐ উভয় পদে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন বলিয়া তিনি প্রত্যাশা করিলেন। এই অভিসন্ধি শুজাহ্ খাঁর গোচরে আসিলে তিনি আলীবর্দী খাঁ ও তদীয় ভ্রাতা হাজী আহমদের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। দুই ভ্রাতা একই উপদেশ দানে এবং উত্তরাধিকারিত্ব লাভের একই পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। বাদশাহ্, উজীর ও আমিরুল ওমরা খান দুরানের নিকট আবেদন পত্র লিখিবার প্রয়োজন হওয়ায় অতঃপর তাঁহারা খত-নামা আনয়ন করিলেন। মিষ্টবাক্যে তুষ্ট ও রাজী করাইবার উদ্দেশ্যে এগুলি মার্জিত ও খোশামোদী ভাষায় লিখিত হইল; তাহাতে তাঁহারা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা উভয় প্রদেশের জন্য শুজাহ্ খাঁর নামে দিওয়ান ও নাজিমের পদ প্রার্থনা করিলেন। এই সকল পরিচয়পত্রসহ দূতেরা

বাঙ্গালার সুবাদার জাফর খাঁ তাঁহার নিজ দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর জন্য সনদ লাভের পরিকল্পনা করেন

রাজধানীতে প্রেরীত ও সর্বাপেক্ষা তৎপরতার সহিত কার্যনির্বাহ করিতে আদিষ্ট হইলেন। সামরিক শ্রেণীর অন্যান্য বিশ্বস্ত লোককে কোন ছুতায় শুজাহ্ খাঁর চাকরী হইতে যুগপৎ বিদায় করা হইল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বিভিন্ন পথে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। তাঁহাদিগকে যে সকল নূতন আদেশ প্রেরিত হইবে, তাহা সম্পাদনে যেন দিবারাত্র প্রস্তুত থাকিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহারা পৃথক থাকিবার আদেশ পাইলেন, কিন্তু ইহা শুধু জাফর খাঁর প্রাসাদের নিকটে। কিন্তু বর্ষাকাল নিকটবর্তী বিধায় এবং বন্যার দরুন কটক হইতে মুর্শিদাবাদের সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া আগেই বুঝিতে পারায় সর্বপ্রকার আয়তনের ও সর্বপ্রকার ব্যবহারোপযোগী বিপুল সংখ্যক নৌকার ব্যবস্থা রাখা হইল এবং যাহাতে জাফর খাঁর মৃত্যুর প্রথম সংবাদ পাওয়া মাত্রই শুজাহ্ খাঁ বিনা বাধায় তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদে যাত্রা করিতে পারেন, তজ্জন্য অজস্র মাঝি একত্র করিয়া তাহাদিগকে শেষ পর্যন্ত বেতন দিয়া রাখা হইল। যতশীঘ্র সম্ভব বাঞ্ছিত সনদ লাভের এবং শাহজাহানাবাদ ও মুর্শিদাবাদ উভয় স্থান হইতে প্রত্যহ সংবাদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কটক ও শাহজাহানাবাদের মধ্যে একটি গুপ্তডাক প্রতিষ্ঠিত হইল। অবশেষে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য একখানা পত্র পাইয়া শুজাহ্ খাঁ জানিতে পারিলেন যে, জাফর খাঁ কদাচিৎ ৫/৬ দিন বাঁচিয়া থাকিবেন; তখন তিনি আলীবর্দী খাঁ ও যত বন্ধু ও সৈন্য লওয়া পর্যাপ্ত মনে করিলেন, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সুবিধামত কখনও জলপথে, কখনও স্থলপথে, দ্রুতগতিতে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। জাফর খাঁর কন্যা ভিন্ন আর এক মহিলার গর্ভে মুহম্মদ তকী খাঁ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। তিনি তাঁহাকে কটকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। তিনি যখন এত দ্রুত অধিক তৎপরতার সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি জাফর খাঁর মৃত্যুর সঠিক সংবাদ পাইলেন; কয়েক দিন পরে পথে থাকিতেই, তিনি যে সনদের জন্য দরবারে আবেদন করেন, তাহা তাঁহার হাতে পৌঁছিল। স্থানটি তাঁহার জন্য অধিক সৌভাগ্যজনক মনে হওয়ায় তিনি সেখানে কিছুক্ষণ থামিয়া উহাকে "মুবারক মঞ্জিল" বা সৌভাগ্যজনক ভ্রমণ-বিরতি স্থান বলিয়া অভিহিত করিলেন। সেখান হইতে তিনি সাধারণ রাজভৃত্যের ন্যায় অত্যন্ত

দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কয়েক দিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলেন। সেখানে তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় না লইয়াই সটান চেহেল সতুনে গমন করিলেন। এইরূপ গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য জাফর খাঁ চল্লিশটি স্তম্ভের[৮৭] উপর ইহা নির্মাণ করেন। ওকায়া নিগার বা সংবাদপত্র লেখক, দেওয়ান নবিশ বা সরকারী সংবাদবাহক এবং অপর কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ও নগরের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে ডাকাইয়া আনিয়া তিনি তাঁহার সনদ উপস্থিত করিলেন এবং ঐ দুইজন কর্মচারী দ্বারা তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করাইয়া নিজেকে দুই প্রদেশের বৈধ সুবাদার বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইলেন। অতঃপর তিনি মসনদ অধিকার করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং আনন্দে বাদশাহী নহবৎ বাজাইতে আদেশ করিলেন, অনন্তর তিনি উপস্থিত প্রত্যেকটি লোকের নিকট হইতে স্বীকৃতির নজর ও অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহার পুত্র নিঃসন্দিগ্ধ যুবক সরফরাজ খাঁ তখন নগর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অজ্ঞতা ও নিরাপত্তার ঘোরে গাঢ়নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। তাহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই তাঁহার মাতামহ জাফর খাঁর পদ ও সম্পত্তির অভিপ্রেত ও নিশ্চিত উত্তরাধিকারী; এবং তাঁহার স্বত্বের বিরোধিতা করার মত সাহস পর্যন্ত কাহারও নাই। নগরের অভ্যন্তরে কি হইতেছিল, তিনি তাহারও কিছুই জানিতেন না। তিনি প্রথম সংবাদ পান বাদশাহী নাগারার[৮৮] শব্দ ও সঙ্গীত পরিবেশন করা হইতে। অচিরে তাঁহার নিকট যে সংবাদ আনীত হইল, তাহাতে হতভম্ব ও বিস্মিত হইয়া তিনি হঠাৎ থামিয়া গিয়া তাঁহার প্রধান সভাসদ ও তাঁহার সৈন্যদের প্রধান কর্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের মতে এখন কি করা উচিত?" অধিকাংশ লোক একবাক্যে বলিলেন, "আপনার পিতা যখন তাঁহার সনদ পাইয়া তাহা ঘোষণা করিয়াছেন, কর্তৃত্বের সনদ, প্রাসাদ ও নগরের দখল লইয়াছেন, শান্তিপূর্ণভাবে স্বীকৃত হইয়া কোষাগারের ও মালিক হইয়াছেন, তখন বশ্যতা স্বীকার ভিন্ন আর কিছুই করার নাই।" যুবক তাঁহাদের, এই সর্ব সম্মত মত মানিয়া লইয়া তাঁহার অনুচরবর্গ পিছনে রাখিয়া মাত্র অল্প কয়েকজন ভৃত্যসহ দ্রুতপদে

কিন্তু তাঁহার জামাতা শুজাহ্ খাঁ তাঁহার স্বাধিকার করেন

সরফরাজ খাঁ পিতার বশ্যতা স্বীকার করেন

অগ্রসর হইলেন এবং ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, পিতার পদচুম্বন করিয়া তাঁহার নজর দিলেন ও তাঁহার সিংহাসনারোহণে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া কলহ-বিবাদের সর্বপ্রকার চিন্তা বিসর্জন দিলেন। এই অভিষেক সমাপ্ত হইলে শুজাহ্ খাঁ রাজ্যশাসন ও রাজস্বের শৃঙ্খলাবিধানে তাঁহার মন সংযোগ (এবং তাঁহার চমৎকার মন ছিল) করিলেন।

আলীবর্দী খাঁ ছিলেন তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা; কিন্তু তিনি অনুরূপভাবে আলীবর্দীর ভ্রাতা হাজি আহ্‌মদ এবং তাঁহার প্রবীন দিওয়ান রায় আলম চাঁদের যোগ্যতাও কাজে লাগান। আলম চাঁদ ছিলেন বাস্তবিকই একজন প্রতিভাশালী হিন্দু—তাঁহার উপর যে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা হয়, তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তিনি তাঁহার কতিপয় শুভাকাঙ্ক্ষী, বিশেষতঃ সেকালের বিখ্যাত পোদ্দার জগতশেঠ ফতেহ্ চাঁদকেও তাঁহার মন্ত্রণাসভায় আমন্ত্রণ করেন। ফতেহ্ চাঁদের টাকা কোটীতে গণনা করা হইত, কখনও কেহ তাঁহার সমকক্ষ হয় নাই। এই সমুদয় সাহায্য গৃহীত হইত কেবল সরকারী কার্যে; কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে ও লোকের মধ্যে বিরোধের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না; বরং পক্ষদের ডাকাইয়া আনিয়া ধীরেসুস্থে প্রত্যেকের কাহিনী শুনিয়া নির্ভুলভাবে উভয় পক্ষের যুক্তির সংক্ষিপ্ত সার প্রস্তুত করিতেন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত তাহা হইতে নিজের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া শাস্তি ঘোষণা করিতেন এবং তৎপরতা ও নিয়মানুবর্তিতার সহিত তাহা কার্যে পরিণত করাইতেন। মুকদ্দমার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ফলে উদ্ভুত ন্যায়বিচারের বিরোধী হইলে কোন সুপারিশ বা নিকটতম আত্মীয়ের কোন অনুরোধই কাজে আসিত না। জমিদার ও বাঙ্গালার অন্যান্য ভূম্যধিকারীর প্রতিও তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তা কম বিখ্যাত ছিল না। জাফর খাঁর শাসনে ইহাদের প্রধানতঃ কারাগারে ও অবরোধে রাখা হইত এবং এরূপ নানা রকমে উৎপীড়িত করা হইত যে, তাহা বর্ণনা বা উল্লেখ করিতে কালিকাগজ খরচ করা দুঃখের বিষয় হইবে। কবি সাদী যখন এই বয়াত রচনা করেন, তখন নিঃসন্দেহে এরূপ চরিত্র ও আচরণের কথাই তাঁহার মনে ছিল ঃ

তোমার পরিবার ও তোমার নিজের অপমান হয়
কখনও এমন কাজের জন্য দোষী হইও না;
পাছে লোকে একদিন তোমাকে ও তোমার
পরিজনবর্গকে অভিশাপ দেয়, তাহার ভয় করিও।

নিজের শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া শুজা খাঁ যে সকল জমিদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীকে নির্দোষ এবং অপরাধ বা প্রতারণামুক্ত দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। অন্যান্যকে তিনি তাঁহার হুজুরে আনাইয়া তাঁহার চতুর্দিকে চক্রাকারে বসাইতে আদেশ করিলেন। ইহা করা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "কয়েদের দুর্দশা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া আযাদীর সুখ ও মুক্ত বাতাসের মিষ্টতা প্রত্যর্পণ করিলে আপনারা ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যবহার করিবেন?" হতভাগা লোকগুলি বহু বৎসর ধরিয়া আটক থাকিয়া ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিলেন। সেখানে তাঁহারা বিবিধ উৎপীড়ন ও তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করেন; এই সম্বোধনে তাঁহার সদাশয়তা ও মহত্ত্বে তাঁহারা তাঁহার প্রশংসায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং আল্লাহর নিকট তাঁহার অভগ্ন সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া সর্বসম্মতভাবে উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এখন হইতে তাহারা পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণ নিয়মিতভাবে খাজানা দিবেন। তদুপরি তিনি উপযুক্ত বিবেচনায় যে কোন কাজের আদেশ দিবেন, তাঁহারা বাধ্যতা ও কর্তব্যপরায়ণতার সহিত তাহা সম্পাদন করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা একটি বিশেষ দলিলে লিপিবদ্ধ করিয়া যথাবিধি বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা তাহা আইনে গ্রাহ্য করার ব্যবস্থা করা হইল। তাহারা ইহাতে তাঁহাদের হাত ও মোহর মারিয়া সর্বাপেক্ষা পবিত্র হলফ লইয়া এবং যাহারা ইহার মর্মের বিরুদ্ধে কাজ করিবে, তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা গভীর অভিশাপ দিয়া এই প্রতিজ্ঞা বলবৎ করিলেন। এই ব্যাপার শেষ হইল শুজাহ খাঁ কতকগুলি মূল্যবান খেতাব আনাইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে তাঁহাদের পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী সেগুলি পরিধান করাইলেন। ফলে সেই সভায় উপযুক্ত উপহার পায় নাই, এমন একজন লোকও অবশিষ্ট রহিল না। এই অনুষ্ঠানের পর হইতে জগত শেঠের মারফতে তাঁহাদের খাজানা পাঠাইবার আদেশ দিয়া তাঁহাদের সকলকে গৃহে গমনের জন্য বিদায় দেওয়া হইল।

বঙ্গদেশকে পুস্তকে 'ভূ স্বর্গ' বলা হয়। এবম্বিধ সদয় প্রবৃত্তি ও স্বর্গীয় ন্যায়-বিচার বিতরণের দরুণই উহা এত অধিক সমৃদ্ধি লাভ করে যে, ইহার উপাধির সহিত সম্পূর্ণ তাল রাখিয়া সর্বত্র প্রাচুর্য ও সুখের ভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই সুখী জনপদের অধিবাসীরা ন্যায়বিচার ও দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষে প্রদান করা সম্ভব, শুজাহ্ খাঁর আমলে এরূপ প্রত্যেকটা আরাম ও উপকার ভোগ করে এবং তাহাদের প্রত্যেকেই এক বাক্যে তাঁহার নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিত। জমিদারদের বিদায় দানের পর তিনি পদ ও চাকরী বিতরণের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁকে বাঙ্গালার দিওয়ানের পদে ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ তকী খাঁকে উড়িষ্যার শাসনকর্তার পদে বহাল রাখিলেন। জাহাঙ্গীরনগর ঢাকার শাসনভার তদীয় জামাতা মুর্শিদকুলী খাঁর উপর অর্পিত হইল। তাঁহার বন্ধু ও প্রিয়পাত্র আলীবর্দী খাঁর পরিবারও দয়া ও চাকরী বিতরণের অংশ হইতে বঞ্চিত হইল না। তাঁহার প্রিয়পাত্রের তিন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল; তিনি তাহাদিগকে তাঁহার তিন কন্যা দান করেন। কাজেই সমভাবে তাঁহাদের তরক্কী সাধন করা হইল। হাজী আহমদের দ্বিতীয় পুত্র সয়্যিদ আহমদ খাঁ রঙ্গপুরের ও কনিষ্ঠ জয়নুদ্দীন আহম্মদ খাঁ আকবরনগর বা রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। আর জ্যেষ্ঠ নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁকে সৈন্যদলের বখশীর[৮৯] পদে অভিষিক্ত করা হইল। এগুলি ছিল বিশেষ পদ। শাসন ও রাজস্ব-সংক্রান্ত সাধারণ ব্যাপারে আর আলীবর্দী খাঁ, হাজী আহমদ রায়রায়ান আলম চাঁদ[৯০] জগত শেঠ ফতেহ চাঁদকে লইয়া এক প্রকারের মন্ত্রণাসভা গঠন করেন। ইহাদিগকে শাসনকার্যের সকল প্রকার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় এবং ইহারা তাঁহার মন্ত্রীরূপে কাজ করিতেন। ফখরুদ্দৌলাহ আজিমাবাদের শাসন কর্তৃত্ব হইতে বরখাস্ত হইয়া, ঐ প্রদেশ বাঙ্গালার সুবাদারীর সহিত সংযুক্ত এবং শুজাহ খাঁর বিশেষ মুরুব্বী খান দুরান কর্তৃক ইহার সনদ তাঁহাকে প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত অবস্থা এইরূপেই থাকে।

তিনি আলীবর্দীর আত্মীয়দের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন

নূতন শাসন কর্তৃত্ব পাইয়া শুজাহ্ খাঁ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সেখানে

পাঠাইতে পারেন, একজন উপযুক্ত লোক আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার মন্ত্রণা সভা তাহার নিকট কয়েক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিলেন; তিনি তাহাদের সকলের সম্পর্কেই আপত্তি করিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহার দুই পুত্রের একজনকে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী যিনাতুন্নেসা তাঁহার পুত্র বিচ্ছিন্ন হইতে রাজী হইলেন না; ইনি পূর্ব হইতেই বাঙ্গালার দিওয়ানরূপে কাজ করিতেছিলেন। পক্ষান্তরে অপরিচিত বলিয়া মুহম্মদ তকী খাঁ সম্পর্কেও তিনি আপত্তি করিলেন। সুতরাং অবশেষে তাঁহার স্বামীও একই মতাবলম্বী হইলেন। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, বিহার এমন দেশ যেখানে একজন শক্ত লোকের দরকার; ইহা অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বেরার ও আওরঙ্গাবাদের সমস্ত রাজ্যগুলির সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া ঐ সকল জনপদের শাসনকর্তাদের সহিত ইহার পত্র লেখালেখি করা উচিত, কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এরূপ পদ আলীবর্দী খাঁ ভিন্ন আর কেহই পূর্ণ করিতে পারে না।

আলীবর্দী খাঁ আজিমাবাদের নায়েব নিযুক্ত

তাঁহার পরামর্শদাতাদের কাহারও নিজস্ব কোন অভিমত না থাকায় তিনি তাঁহার মন্ত্রণাসভায় তাঁহার নাম প্রস্তাব করা মাত্র তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহার নির্বাচন মঞ্জুর করিলেন এবং ঠিক প্রয়োজনীয় লোকটিকে বাহির করায় জন্য তাঁহারা তাঁহার বিচক্ষণতার অনেক তারিফ করিলেন। এই নিয়োগ প্রকাশিত হইলে শুজাহ খাঁ আলীবর্দী খাঁকে নূতন উপাধি এবং নূতন সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বাহাদুর বা সাহসী ও মহাবতজঙ্গ বা যুদ্ধে অদম্য উপাধি দিতে, তাঁহার মনসব সর্বশুদ্ধ পাঁচ হাজার সওয়ারে বৃদ্ধি করিতে এবং তাঁহার উপর একটি ঝালরযুক্ত পালকী[১১] একটি পতাকা ও একটা দামামা—এই নূতন সম্মানগুলি অর্পণ করিতে চাহিলেন; এজন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার গোমস্তার মারফতে বাদশাহ ও তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী খান দুরানের নিকট আবেদন করা হইল। নূতন নিয়োগের সংবাদ অবগত করান হইলে যীনত তাঁহার অনুমোদন প্রকাশ করিলেন এবং আলীবর্দী খাঁর উপর একটা দায়িত্ব চাপাইতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার মহলের দ্বারে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহার স্কন্ধের উপর একটি মূল্যবান খেলাত রাখিবার আদেশ দিয়া তিনি যেন নিজের তরফ হইতে[১২] তাঁহাকে

বিহারের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। কেবল এই অভিষেকের পরেই শুজাহ্ খাঁ স্বয়ং তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার নিজের তরফ হইতেও আজিমাবাদের নিয়াবতের খেলাত উপহার দিলেন; তৎসঙ্গে একটি হাতী, একখানা তরবারি ও কিছু রত্নসহ ইহার সনদও যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার অধীনে চাকরী করার জন্য কিছু সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করা হইল। অতঃপর প্রদেশটিকে যথোচিত শৃঙ্খলা ও বশ্যতায় আনয়নের আদেশ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইল। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত যে, এই পদোন্নতির কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁর সহিত তাঁহার বিবাহিতা কনিষ্ঠ কন্যার[৬২] গর্ভে আলীবর্দীর খাঁর এক দৌহিত্র জন্মে। নিজের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি নিজের নামের সহিত মিল করিয়া তাহার নাম মির্জা মুহম্মদ রাখিয়া তাহাকে নিজের পুত্ররূপে দত্তক গ্রহণ করেন ও তাঁহার নিজগৃহে রাখিয়া শিক্ষা দান করেন। সম্মান, মর্যাদা ও অনুগ্রহের সেই আকস্মিক প্রবাহকে তিনি তাহার শুভজন্মের প্রতি আরোপ করিতেন বলিয়া তাহাকে তিনি দ্বিগুণ স্নেহ করিতেন। তাঁহার যাত্রার পূর্বে আলীবর্দী খাঁ তাঁহার দুই জামাতা ও কয়েকজন আত্মীয়কে তাঁহার সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি গ্রহণ করেন এবং অনুকুল সফরের পর আজিমাবাদে প্রবেশ করেন। পূর্ণ এক বৎসরকাল ঐ প্রদেশে অবস্থান করিয়া তিনি তাঁহার উপকারক ও মনিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সর্বপ্রকার সম্মান ও অনুগ্রহের সহিত অভ্যর্থিত ও তাঁহার শাসনকার্যে পুনঃ প্রেরিত হন। অনতিকাল পূর্বে ঐ সমুদয় পদের সনদ ও তাঁহার জন্য তাঁহার উপকারকের পরিকল্পিত ঐ সমুদয় সম্মান তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি দরবার হইতে তাঁহার মর্যাদার অন্যান্য নিদর্শনসহ ঝালরযুক্ত পাল্কী, পতাকা ও দামামা প্রাপ্ত হন। এগুলি তাঁহার আড়ম্বর ও অনুচরদের জৌলুস বৃদ্ধি করিয়া লোক চক্ষে তাঁহার চরিত্র উন্নত করিতে কম সহায়তা করিল না। কিন্তু তিনি তাদ্বারা হতবুদ্ধি হন নাই। উচ্চ দুঃসাহসিক চিত্তে ভূষিত, বরাবর উচ্চ পরিকল্পনায় নিবিষ্টচিত্ত জ্ঞানবান ও পরিশ্রমী লোক বলিয়া তাঁহার অবস্থান কিরূপ অনিশ্চিত,,

আলীবর্দীর দৌহিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র মির্জা মুহম্মদ সিরাজুদ্দৌলার জন্ম ও আলীবর্দী কর্তৃক তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ

তিনি শীঘ্রই তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং নগরে শৃঙ্খলার প্রবর্তন করিয়া, তাঁহার সৈন্যদল বৃদ্ধি করিয়া ও তাহাদিগকে কাজে লাগাইয়া, তাঁহার প্রজাদের চিত্তজয় করিয়া সেনাদলকে নিজপক্ষে আনয়ন করিয়া এবং জমিদার ও অন্যান্য অবাধ্য লোক ও প্রদেশের বিদ্রোহীদিগকে দমন ও সুশৃঙ্খলায় আনয়ন করিয়া তিনি তাঁহার শাসন আরম্ভ করিলেন। সর্বোপরি নিকট-বর্তী প্রদেশগুলিতে যত কৃতিত্বপূর্ণ সৈন্যের কথা তাঁহার কানে আসিল, তাহাদিগকে নিজের চাকরীতে আনয়ন তাঁহার অবধারিত নীতিতে পরিণত হইল। এই সকল উপায়ে তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে একটা সুসজ্জিত বাহি-নীর নেতা হইয়া বসিলেন। নিশ্চিত সফলতা লাভের প্রত্যেকটা উপ-করণেই তাহারা সজ্জিত ছিল। নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিতে ও উচ্চতর কার্য-সম্পাদনে নিজেকে প্রস্তুত করিতে ব্যগ্র হইয়া তাঁহার আশ্রিতদের মধ্যে যাহারা কর্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করিত, তাহাদিগাক দমন করিবার জন্য তিনি সতর্ক থাকিতেন। তিনি তাহাদিগকে অন্যান্যের দৃষ্টান্তে পরিণত করেন। আবদুল করিম খাঁ নামক জনৈক রোহিলা-আফগানকে তিনি তাঁহার চাকরীতে গ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি তাঁহার ১৫০০ স্বদেশবাসীর অধিনায়ক ছিলেন; নিজের শক্তি ও সাহস সম্পর্কে তাঁহার এরূপ ধারণা ছিল যে, তিনি অন্যান্য লোককে পরওয়া করিতেন না বলিলেই হয়। বাস্তবিকপক্ষে তিনি নিজের সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, সত্যিই তিনি তাহার উপযুক্ত ছিলেন। আলীবর্দী খাঁ অনেক দুঃসাধ্য কাজে তাঁহাকে ব্যবহার করেন এবং তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট না হইয়া পারেন নাই; কিন্তু তিনি প্রগলভতার দরুণ বাধ্যতা ও বশ্যতার গালিচার বাহিরে পদক্ষেপ করিলে তিনি তাহা দমন করিয়া তাহাকে বশ্যতার নিয়ম পালনে বাধ্য করিতে চাহিলেন। নিজের পরাক্রমের জন্য গর্বিত হইয়া আফগানটি কোন উপরওয়ালাকে পরওয়া এবং কাহাকেও ভয় করিতেন না। তাঁহার মনিবকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি এমন সব কার্যের জন্য দোষী ছিলেন, যাহাতে অবাধ্য মেজাজ ও শাসন অবজ্ঞাকারী স্বাধীনতার ভাবের দৃঢ় আমেজ পাওয়া যাইত। আলীবর্দী খাঁ ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সহিত আর কপটতা করিলে তাহার প্রগলভতা বৃদ্ধি পাইবে মাত্র এবং অন্যান্যের ঔদ্ধত্যেও প্ররোচণা দিবে এবং তাঁহার

বাড়াবাড়ি ও ঔদ্ধত্য আর দেখিয়াও না দেখিলে তাহা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী, এখন কি বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তৎসঙ্গে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে, তাঁহার ন্যায় এরূপ উচ্চপদে অবস্থিত লোকের পক্ষে একজন উগ্র প্রকৃতি লোকের শাস্তিদান স্থগিত রাখা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে, বরং তাঁহার শাস্তি অন্যান্যদের নিকট সাবধানবাণী রূপে তুলিয়া ধরা উচিত। কাজেই ঐ কার্য সম্পাদনের জন্য দিন স্থির করিয়া আলীবর্দী খাঁ তাঁহার কয়েকজন সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত লোককে দর্শনাগারে উপস্থিত থাকিতে এবং ঐ আফগানটী সেখানে প্রবেশ করিলে, তাঁহাকে তিনি যে ভর্ৎসনা করার ইচ্ছা রাখেন, তাহার উত্তর দানের দুঃসাহস প্রদর্শন করিবামাত্র তাহাদের তরবারি লইয়া তাঁহার উপর আপতিত হইতে আদেশ করিলেন। পরদিন লোকটা সত্যই তাঁহার দশজন সম্ভ্রান্ত অনুচর লইয়া হাজিরা দিলেন; কিন্তু তিনি সর্বদা দ্বারদেশে তাঁহার সাহায্যার্থে ২০০ লোক প্রস্তুত রাখিতেন এবং তিনি নিজেও বিপুল দৈহিক শক্তি ও সাহসের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করা বা লোকটার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এরূপ লোক খুঁজিয়া পাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। অবশেষে এইরূপ তিনজন লোক ঠিক করিয়া তাহাদিগকে উপস্থিত থাকিতে ও তাঁহাকে বধ করিতে আদেশ করা হইল। পরদিন প্রাতে এই হত্যাকার্য সম্পন্ন। হইল ফলে অবাধ্য লোকদের মস্তক হইতে যে ধূম্রজাল নির্গত হইত তাহা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। সৈন্যেরা কাঁপিতে লাগিল। যে সকল জমিদার এযাবত অবাধ্যতা প্রদর্শন করিয়া আসিতে ছিলেন এবং যাঁহারা পূর্বের আমলের দুর্বলতায় সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও ঔদ্ধত্যে অভ্যস্ত হইয়া তদনুযায়ী কার্য করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া কঠোররূপে দণ্ডিত করা হইল। কিছু সমূলে উৎপাটিত হইলেন, কিছু অনুরূপভাবে দোষী হইলেও বশ্যতা ও অনুরক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করায় তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া অনুগ্রহভাজন করিলেন। ফলে তাঁহারা তাঁহার পক্ষভুক্ত হইলেন। এরূপ সদা-সতর্ক তেজস্বী শাসনের দরুন তিনি যুগপৎ শুজাহ্ খাঁর সদিচ্ছা ও ভক্তি রক্ষা করিতে এবং তাঁহার নিজের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইলেন।

কিন্তু ঐ বড় লোকের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করার পূর্বে সাম্রাজ্যের রাজধানীতে বা উহার উপকণ্ঠে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করা বিধেয়; তৎপরে আমরা পুনরায় আলীবর্দী খাঁ ও বাঙ্গলার ব্যাপারের বর্ণনা আরম্ভ করিব।

আমরা ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কাশ্মিরী ইয়াদগার খাঁ রাজা জয়সিংহ সেবায়ীর মধ্যস্থতায় বাজিরাওর সহিত আলোচনা আরম্ভ করার জন্য মারাঠা শিবিরে প্রেরিত হন এবং এই দুইজন দূতের করে ঐ মারাঠা সেনাপতির জন্য মালব ও গুজরাটের শাসন কর্তৃত্বের সনদ অর্পিত হয়। এই অসাধারণ কার্য ব্যবস্থাও বাদশাহের পক্ষে এই অনুকম্পা ইপ্সিত ফল প্রসব করিল না। ইহা মারাঠাদের উচ্চাকাঙ্খার অগ্নিশিখা নির্বাপিত না করিয়া বরং ঐ জাতির প্রগলভতায় ইন্ধন যোগাইয়া এবং নিজেদের সম্বন্ধে তাহাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং তাহাদের বেলায় নূতন জবরদখল ও নূতন ঔদ্ধত্যে প্রেরণা যোগাইয়াছে বলিয়াই বোধ হইল। কাজেই বলের শরণাপন্ন হওয়াই সাব্যস্ত হইল। ১১৪৯ হিজরীর ৭ই জমাদি-উল আওয়াল সূর্যোদয়ের প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে আমিরুল ওমরা খান দুরান ঐ সমুদয় দস্যুকে শায়েস্তা করার জন্য একটা অভিযানে বহির্গত হইলেন। বিদায় লাভের প্রাকালে তাঁহাকে একটা কোমরবন্দ দানে সম্মানিত করা হইল। এই মর্যাদার নিদর্শনের স্বীকৃতি হিসাবে ঐ মন্ত্রী এমনকি গৃহে গমন না করিয়াই তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। তিনি নগরের বাহিরে গমন করিয়া তালপাতে শিবির স্থাপন করিলেন; ইহা শাহজাহানাবাদ হইতে ৯ ক্রোশ দূরে। একই মাসের ২০শে তারিখে প্রধানমন্ত্রী কমরুদ্দীন খাঁ সমভাবে একটা কোমর-বন্দ দ্বারা সম্মানিত হইয়া অনুরূপভাবে একই অভিযানে বাহির হইলেন এবং তাঁহার স্থান পরিবর্তনের[১৬] জন্য তিনি চার বাগে[৫] গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। একই দিনে খান দুরান তাঁহার নিজস্ব সৈন্যদল এবং তাঁহার পরিচালনাধীনে স্থাপিত প্রায় ৪০,০০০ বাদশাহী অশ্বারোহীদের অজস্র দল, বিপুলসংখ্যক কামান এবং অভিযানের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আকবরাবাদ প্রদেশে শিবির স্থাপন করিলেন। সেখানে কয়েকজন বিখ্যাত হিন্দু রাজা সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করায় তাঁহার সৈন্যসংখ্যা এখন এত বিপুল হইয়া দাঁড়াইল যে, তাঁহার সৈন্যদলে ময়দান

আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বিস্ময় ও আতঙ্কে চক্ষু অভিভূত হইল। সকলেই প্রত্যাশা করিল, তিনি সটান শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন; তৎপরিবর্তে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকারী ঐ ব্যক্তি রাজধানী হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ দূরে আলস্যে কালক্ষেপ করিয়াই পরিতৃপ্ত রহিলেন। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে দোদুল্যমান লোকের ন্যায় তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য আশা ও ভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া কি ঘটিতে পারে, তজ্জন্য অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মারাঠাদের বিরুদ্ধে খান দ্‌রান ও উজীর উভয়ের অভিযান

উজীর কমরুদ্দীন খাঁও অধিকতর আন্তরিকতার সহিত ব্যবহার করিলেন না। এই মন্ত্রী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও তাঁহার বেতনভোগী মোগল ও হিন্দুস্তানিদের এক বিরাট বাহিনী লইয়া যাত্রা করেন। তাহাদিগকে তুরানী মোগলদের এক আন্তবাহিনীর সহিত সম্মিলিত করা হয়। ইহারা সকলেই ছিল বাদশাহের পুরাতন ভৃত্য এবং সকলেই এরূপ উচ্চ সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষিত হইতেন যে, গোটা সরহিন্দ প্রদেশ তাহাদের বেতন বাবতে তাহাদিগকে বরাদ্দ করা হয়। এইরূপে বিরাট বাহিনী লইয়া তিনি মারাঠাদের দফারফা করিবার ইচ্ছায় আজমীরের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটা দ্রব্য ও অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক ছিল; ইহারা নিজেদের প্রসিদ্ধ করার সুযোগ লাভ ও তরক্কী প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করিত। তাঁহার যুদ্ধযাত্রার শোভা ও আড়ম্বর কদাচিৎ বর্ণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ প্রদেশের সীমান্তে সামান্যমাত্র অগ্রসর হইয়া তিনি মারাঠাদের আগমন প্রতীক্ষায় হঠাৎ তাঁহার গতিরোধ করিলেন। এমনি ছিল ভণ্ডামি। এখানে মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ তাঁহার সহিত মিলিত হন। তিনি তাঁহার বাসস্থান ফেরোখাবাদ (তাঁহার মুরুব্বী ফররুখ সিয়ারের সম্মানার্থে নির্মিত ও নামে অভিহিত শহর) ত্যাগ করিয়া একটা উৎকৃষ্ট সৈন্যদল লইয়া আসেন। তিনিও মারাঠাদের উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সকল বিখ্যাত যোদ্ধা ও ঐ সকল প্রসিদ্ধ সেনাপতিদের একজনেরও ঐ সমুদয় অভিশপ্ত দস্যুদের বিরুদ্ধে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিবার ও তাহাদের পৌনঃপৌনিক ঔদ্ধত্যের জন্য তাহাদিগকে যথোচিতরূপে শায়েস্তা করিয়া সাম্রাজ্যে সুনাম অর্জন করিবার মত

যথেষ্ট দৃঢ়সংকল্প ছিল না। খান দুরান স্বস্থান ত্যাগ না করিয়া অবিরত পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিতেছিলেন। তিনি ইহার সারমর্ম জয় সিংহকে জানাইতেন। শেষোক্ত ব্যক্তি নিজের মনে আরও যাহা উদয় হইত, তাহা যোগ করিয়া সম্পূর্ণটা উজীরের নিকট পাঠাইতেন। রাজা অবিসিংহ রাঠের শিবিরে না গিয়া তাঁহার রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি নেশায় চুর হইয়া রহিলেন; আফিম ব্যবহার দ্বারা মাতলামী রক্ষিত হইত। তিনি সারাদিন নিদ্রা যাইতেন এবং কি করা কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সারা রাত কাটাইতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি নিজের দীর্ঘসূত্রিতার কথা এতই উত্তমরূপে জানিতেন যে, খান দুরান তাঁহার জন্য লোক পাঠাইলেই তিনি তাঁহার পৈত্রিক রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এরূপ আরও কিছু বাজে ওজর দেখাইয়া নিজের দোষক্ষালন করিতেন।

সাহস ও প্রতিভা দুইটাতেই বাদশাহী সেনাপতিরা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত

পক্ষান্তরে উজীর কমরুদ্দীন খাঁ কখনও নিজের দরুন কখনও শুধু তাঁহার সৈন্যদল রক্ষার বাসনায় তাঁহার বন্ধুবর্গ ও তাঁহার দেশবাসী তুরানীদের সঙ্গে আলোচনায় কাল কাটাইতেন। কিন্তু তাঁহার দ্বিধা অক্ষুণ্ণ রহিল এবং তিনি নিজামুল মুল্কের নিকট হইতে প্রত্যাশিত সাহায্যের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি বাদশাহ ও তাঁহার প্রিয়পাত্র খান দুরানের প্রতি বেজায় বিরক্ত হইয়া দরবার ত্যাগ করেন। কাজেই যে সকল গোলমালে হিন্দুস্থান ধ্বংস হইতেছিল, তৎপ্রতি তাঁহার কোন মনোযোগ ছিল না বলিলেই হয়। তিনি এমন কি মন্ত্রীগণ ও সমস্ত উচ্চপদস্থ লোককে যে কোন উপায়ে চরম অপদস্থ দেখিতে চাইতেন। পক্ষান্তরে বাদশাহ তাঁহার বিরুদ্ধে এত দৃঢ় সন্দেহ পোষণ করিতেন এবং খান দুরান তাঁহাকে এত প্ররোচনা দিতেন যে, তিনি তাঁহাকে কোন অনুরোধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এমনকি তাঁহার দরবারের সমস্ত উচ্চপদস্থ তুরানী সম্পর্কে তাঁহার এত মন্দ ধারণা ছিল যে, তাহাদের কাহারও সহিত আলোচনায় বিরত থাকা তিনি তাঁহার লক্ষ্যে পরিণত করেন। ইতোমধ্যে আস্ত দিন ও রাত আলোচনায় ও অনিশ্চয়তায় অতিবাহিত হইল, কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না। যে সকল মনসবদার ও পদস্থ লোক রাজধানীতে ও শিবিরে দলবদ্ধ হইয়া হাজির

থাকিতেন, ওজর দেখাইতে এত তৎপর হইলেও তাঁহাদের অধিকাংশেরই আদৌ কোন যোগ্যতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাহার ঐ সমুদয় কাপুরুষ আমীর জীবন ও কার্যের কোন নীতিই প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের চিন্তা করার শক্তি ছিল, খান দুরানের মতের বিরোধী হইতে পারে, তাঁহারা এমন উপদেশ জ্ঞাপনের সাহস পাইতেন না। যে বাদশাহের তিনি ছিলেন প্রিয়পাত্র ও যাহার মনের উপর অসীম প্রতিপত্তি লাভের দরুন তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যে অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, সেই বাদশাহ্ নিজেও তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে এমন কোন কিছুর প্রতি কর্ণপাত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার মনে যাহা আসিত, তিনি একদিকে খান দুরান অন্যদিকে কমরুদ্দীন খাঁর নিকট তাহাই লিখিয়া পাঠাইতেন এবং এই দুই ব্যক্তি কষ্ট-কল্পিত যুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক কারণ দেখাইয়া তাঁহাদের গা বাঁচাইতে ত্রুটি করিতেন না। বাদশাহ্ ও খান দুরানের মধ্যে অবিশ্রান্ত পত্র ও আলোচনা বিনিময় হইত এবং ও তার ও শিবিরের মধ্যে প্রকাশ্য যোগাযোগ রক্ষিত হইত। অবশেষে মারাঠাদের সহিত একটা চুক্তি সম্পাদন দরবারের সাধারণ অভিপ্রায় হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল দস্যুকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা তাঁহার সাধ্যাতীত ও তাঁহার সাহসের অনেক বাহিরে, এখন তাহা পুরাপুরি বুঝিতে পারিয়া খান দুরান স্বয়ং শান্তি ও যুদ্ধ উভয়কে প্রগাঢ় অস্পষ্টতায় রাখিয়া দেওয়া, প্রত্যেকটা জিনিস অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিয়া দেয় এমন এক নাজুক নীতির মেঘজালে দুইটিকেই আচ্ছাদিত করা সর্বোত্তম বলিয়া মনে করিলেন। তিনি ভাবিলেন, এরূপ ব্যবস্থাই হইবে রাজনীতির সুচতুর আঁচড়। ইতোমধ্যে তাঁহার জটিল সমস্যা হইতে নিজেকে অব্যাহতি দানের জন্য তিনি কিন্তু রাজধানীতে ফিরিয়া চলিলেন। ব্যাপারগুলি যখন এরূপ দুঃখময় অবস্থায় তখন আল্লাহর এক খোঁচায় এবং অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের বশে সংবাদ আসিল যে সাদৎ খাঁ মারাঠাদিগকে যথাযোগ্যরূপে শায়েস্তা করিয়াছেন; এই সংবাদে সমস্ত দরবারের হৃদয় শান্ত হইল।

অযোধ্যা ভিন্ন সাদৎ খাঁর আর কোন সুবাদারি ছিলনা, বাদশাহী পাইকদের সেনাপতিত্ব ছাড়া আর কোন কাজ বা প্রভুত্বও ছিলনা। সৈন্যের

সংখ্যা এবং অর্থের প্রাচুর্যেও সাম্রাজ্যের অধিকাংশ পদস্থ কর্মচারী অপেক্ষা তিনি হীনতর বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তদুপরি সুবা গঙ্গার উত্তরে বলিয়া যাহারা ঐ বিরাট নদীর দক্ষিণে, তাহাদের সঙ্গে তাঁহার আদৌ কোন সম্বন্ধ থাকার কথা নহে, কোন মারাঠার সহিত সম্পর্ক থাকার কথা আরও কম! কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিগত সাহসের অধিকারী, মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন, সাম্রাজ্যের গৌরবের জন্য ঈর্ষান্বিত, সর্বদা কোন উচ্চ অসম সাহসিক কার্যের জন্য ব্যগ্র এবং সামরিক যশঃ ও খ্যাতিপ্রিয় লোক। এরূপ বিরাট সৈন্যদলগুলির সেনাপতিদের অসম ব্যবহার দর্শনে স্তম্ভিত এবং মারাঠাদের অবিশ্রান্ত জবরদখল ও অনন্ত ঔদ্ধত্যে ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব বিশেষ কার্য হিসাবে সাম্রাজ্যের ইজ্জতের প্রতিশোধ গ্রহণের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইতে মনস্থ করিলেন। এরূপ উচ্চ ধারণায় পূর্ণ হইয়া তিনি তাঁহার সৈন্যদল (এবং ইহাদের নিয়ত প্রস্তুত রাখা হইত) পরিদর্শন করিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিলেন এবং তাঁহার বিবেচনায় যে পরিমাণ গোলাবারুদ ও রসদের দরকার তাহাদিগকে তাহা সরবরাহ করিলেন। তাহাদের সহিত এক সারি কামান যুক্ত করিয়া মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আবুল মনসুর খাঁকে সঙ্গে লইয়া তিনি সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার বন্ধু ও সামন্ত রাজা বাহাদুরকে সাহায্য দানের জন্য যমুনাও অতিক্রম করিতে চাহিলেন। এই রাজা তাঁহার দুর্গে একটা মারাঠাবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া সাদৎ খাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি এই সংক্ষিপ্ত পত্র যোগে তাঁহাকে উত্তর দেন: "কিছুতেই ভয়বিহ্বল হইবেন না, কিছুতেই তাহাদিগকে একটা কানাকড়িও দিবেন না; কারণ, দেখুন, আমি এক্ষুণি আপনার সহিত যোগ দিতেছি।" এটুকু পর্যন্ত লিখিয়া তিনি যাত্রা করিলেন। কিন্তু বুন্দেল খণ্ডের রাজারা মারাঠাদের সহিত যোগদান করায় এবং দুই দলই যমুনার উত্তরণ স্থানগুলি পাহারা দিতে মনোযোগী হওয়ায় ওপারে গমন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা চলিত না। ইতোমধ্যে তাঁহার বন্ধু রাজা গুরুতররূপে পরাজিত হইয়া চরম সঙ্কটে নিপতিত হন। তাছাড়া, বাজিরাও

বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি মলরাও যমুনা অতিক্রমের ব্যবস্থা করিয়া সাদৎ খাঁর পশ্চাদ্দিক ঘুরিয়া আতোয়া প্রদেশে আপতিত হন; সাদৎ খাঁর মনে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ হয় নাই। মলরাও বাস্তবিকই আতোয়া নগরের দ্বার-দেশ হইতে আকবরাবাদের নিকটস্থ মতিবাগের দ্বারদেশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তি দগ্ধ ও লুণ্ঠন করিতেছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই শুধু হত্যা, ধ্বংস ও ভস্ম ভিন্ন কিছুই রাখিয়া আসিলেন না; সেখান হইতে তিনি সাদাবাদ ও জেলাইর শহরের দিকে ছুটিলেন; সেখানেও তিনি অনুরূপ ব্যাবহার করিতে করিতে যাইতেছিলেন! এমন সময় ১১৪৯ হিজরীর ২২শে জিলকদ সাদৎ খাঁ দূর হইতে ধ্বংসের ভয় প্রদর্শনকারী ঝটিকার ন্যায় মারাঠাদের পশ্চাতে হাজির হইলেন। দস্যুদিগকে ছত্রভঙ্গ দেখিয়া তিনি এত বীরবিক্রমে তাহাদের উপর আপতিত হইলেন যে, রণক্ষেত্র হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্তী ইতিমাদ আবাদের বাহিরে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত তাহাদিগকে কখনও হত্যা ও জবাই করা বন্ধ করিলেন না। সর্বত্র মৃতের স্তূপ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল; আট মাইল পর্যন্ত রাস্তাগুলি মৃতদেহে ভরিয়া গেল। তিনজন যশস্বী নেতা বন্দী হইলেন। খোদ মলরাও গুরুতররূপে আহত হইয়া অল্প কয়েকজন অনুচরসহ পলায়ন করিতে পরিয়া নিজেকে সুখী মনে করিলেন। পলা-তকদের অগ্রগামীরা তাঁহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য ফেলিয়া যমুনার দি ক পালাইয়া গেল। তাড়াতাড়িতে ও ত্রাসে এক স্থানকে অন্যস্থান মনে করিয়া যেখানে হাঁটিয়া পার হওয়ার পথ নাই, নদীর এমন অংশের দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহারা ধ্বংসের আবর্তে অন্তর্হিত ও দলে দলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। অত্যল্পলোক তাঁহার সহিত পাল্লা দিতে পারিল; তাহাদের লইয়া মলরাও অতীব কষ্টে বাজিরাওর শিবিরে পৌঁছাইয়া অতীব দুরবস্থায় তাঁহার খেদমতে হাজিরা ছিলেন; মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি তখন গোয়ালিয়রের নিকটস্থ কোটেলি নামক ক্ষুদ্র শহরে শিবির স্থাপন করেন; ইহা সায়্যিদদের বাসস্থান। সেই হতভাগা যখন পলায়ন করিতেছিলেন, সাদৎ খাঁ তখন দৈনিক ১০ ক্রোশ হারে এবং তাঁহারও অধিক বেগে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে-ছিলেন। অবশেষে তিনি আকবারাবাদ হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে চম্বল নদীর এপারে দখলপুর শহরে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন বাজিরাও মুল

বাহিনীসহ শিবির স্থাপন করিয়া আছেন। অবশিষ্ট পলাতকদিগকে খতম করিবামাত্র তিনি মলরাওকে যেভাবে শিক্ষা দিয়াছেন ঐ প্রবীণ সেনাপতিকেও আক্রমণ করিয়া সেভাবে শিক্ষা দান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু নিরর্থক পশ্চাদ্ধাবনের পর সেই অভিশপ্ত জাতির একটা লোককেও আবিষ্কার করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে দুই দিনের বিশ্রাম দান করিলেন। বিশ্রামান্তে তৃতীয় দিনে তিনি প্রচার করিলেন যে, প্রত্যেক সওয়ারকে চারিদিনের রসদ ও পানি লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যাত্রাকালের পরে যদি কাহাকেও তাহার তাঁবুতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার অশ্বের পা কাটিয়া খঞ্জ করা হইবে এবং স্বয়ং তাহাকে শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে অপমানজনকভাবে প্রদক্ষিণ করানো হইবে।[৮৩] ইতিমধ্যে তিনি গরুর চামড়া ও অন্যান্য চামড়ার মশকে পানি ভর্তি করার ও বিপুল পরিমাণে রুটি বোঝাই করার আদেশ দিলেন। উদ্দেশ্য, ইপ্সিত পশ্চাদ্ধাবনে সৈন্যরা যেন খাদ্য বা পানির অভাবে না পড়ে। কিছু হালকা কামান হাতীপৃষ্ঠে এবং কিছু ইস্টকখণ্ড আংটার উপর বসানো—ক্ষুদ্র কামান উটের পিঠে স্থাপন করা হইল। অতঃপর তাঁহার নিজের জন্য পানি-রসদ ও খাবার উট ও অন্যান্য ভারবাহী পশুর পিঠে চাপাইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি চম্বলের বাহিরে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের সঙ্কল্প করিয়াছেন; তাঁহার সৈন্যদের পরিচালকরূপে তিনি নিজে প্রথম নদীতে ঝাঁপ দিবেন এবং তাঁহার লোকদের সামনে সাহস ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। এই অভিযান এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মন দখল করিয়া রহিল। তিনি ইহাতে বাহির হইতে যাইবেন, এমন সময় খান দুরানের পত্র আসিল। এই মন্ত্রী সাদৎ খাঁর বীরত্ব ও চূড়ান্ত আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার যে সফলতা তাঁহাকে এত অধিক লজ্জিত করে, তাহার দংশনে অধীর হইয়া তিনি হয় ঐ সেনাপতির সহিত যোগদান করিয়া অভিযানের সম্মানে শরীক হইতে, নতুবা ইহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত রাখিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজের নিষ্ক্রিয়তা ও অপমানের অংশীদার করিতে চাহিলেন। এই ধারণার বশে তিনি তাঁহাকে কয়েকখানা পত্র লিখিলেন; তাহাতে তিনি সর্বাপেক্ষা পবিত্র হলফে লইয়া তাঁহাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিনি

তাঁহার সহিত যোগদানে যাত্রা করিতেছেন। ঐ সকল দস্যুর ধ্বংস সাধনে তাঁহার সহিত অগ্রসর হইতে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সর্বপ্রথমে সর্বপ্রকার অবিমৃষ্যকারিতা পরিহার করিতে উপদেশ দিলেন। সাদৎ খাঁ সবেমাত্র অশ্বারোহণ করিয়াছেন, এমন সময় মন্ত্রীর এই সকল পত্র পাইয়া অকস্মাৎ তাঁহার গতিরুদ্ধ হইল; তিনি অত্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তথাপি তাঁহার যাত্রা স্থগিত রাখাই সঙ্গত মনে করিলেন। ৩/৪ দিন পরে খান দুরান তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন; মারাঠারা নিকটবর্তী হইলে বাদশাহ তাঁহাকে অপর কতিপয় আমীর ও সেনাপতিসহ সাদৎ খাঁর সহিত যোগদানের আদেশ দেন। উজীর কমরুদ্দিন খাঁ এযাবত রাজধানী হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে আজমীরের রাজপথে শিবিরে অবস্থান করেন। শত্রুদের আগমন প্রতীক্ষায় মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশও তাঁহার সৈন্যদলসহ সেদিকে ছিলেন। সাদৎ খাঁর সহিত খান দুরানের সম্মিলনের পর সাক্ষাৎকার ও অতিথি সৎকারে ৬/৭ দিন চলিয়া গেল। মারাঠারা এই বিলম্ব টের পাইয়া সাদৎ খাঁর পশ্চাদ্ধাবন হইতে পুনরায় দম লইবার সুযোগ পাইল। রাজধানী যথার্থই সৈন্যহীন মনে করিয়া তাহারা অকস্মাৎ সাদৎ খাঁর পশ্চাদ্ভাগ ঘুরিয়া সটান সেদিকে ছুটিল। তাহারা এত অধিক দ্রুতগতিতে ইহা সম্পন্ন করিল যে, ঐ বৎসরের ৮ই জিলহজ্জ ঐ জাতির প্রবীণ সেনাপতি বাজিরাওর পরিচালনায় তোগলকপুরে পৌঁছিল। নগরের বিপুল সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আমোদ-প্রমোদ উভয়—কারণে সেখানে জমায়েত হওয়ায় শহরটি তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। মারাঠারা সকলকেই লুণ্ঠন করিয়া বিপুল লুণ্ঠিতদ্রব্য প্রাপ্ত হইল। খাজা কুতুবুদ্দীনের স্মৃতিস্তম্ভের নিকট রাত্রি যাপন করিয়া মারাঠারা পরদিন—আরাফাতের দিনে[৯৭] জহুরীদের বসতিপূর্ণ রাস্তা লুণ্ঠন করিল এবং ঐ শহরের সমস্ত দোকান লুণ্ঠন করিয়া আগুনে পোড়াইয়া দিল। মধ্যাহ্নে তাহারা আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পালেম শহর লুণ্ঠন করিল।

উজীর খান দুরানের [illegible] আশা উৎসাহ [illegible] হইয়া যায়

এই অনিশ্চয়তার সুযোগে মারাঠারা বাদশাহী সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে ঘুরিয়া রাজধানীর উপকণ্ঠ লুণ্ঠন করে

সেখান হইতে দলে দলে পলাতক ও আহত লোক নগরে পলাইয়া গেল। তাহাদের অনুভূত ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণে নগর পূর্ণ হইল। আর অধিক তদন্ত না করিয়াই নাগরিকেরা তাহাদের সাহস ও বোধশক্তি দুইই হারাইয়া ফেলিল। সকলের চীৎকারে শহর পূর্ণ হইয়া গেল; সবকিছু মিলিয়া অচিরে বিষাদ ও বিশৃঙ্খলার এক অবিশ্রান্ত দৃশ্যে পরিণত হইল। মারাঠাদের এই আকস্মিক আগমন-বার্তা জানিতে পারিয়া বাদশাহ্‌ তাঁহার নিকটে যে অল্প কয়েকজন আমীর ও সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে হঠাৎ বাহির হইয়া মারাঠাদিগকে প্রতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন। এই আদেশ পাইয়া আমীর খাঁ, রাজা বখতমল, মীর হাসান খাঁ গোকতাশ ও জাফর খাঁর ভ্রাতা মুনাওর খাঁ, আহ্‌দী নামক সৈন্যদলের কাপ্তান হিন্দু শিব সিংহ এবং আরও বহু সেনানায়কসহ আকস্মাৎ নগরের বাহিরে গমন করিয়া গাজীকেয়া ও লাল কাটরার নিকটস্থ একটি সুবিধাজনক স্থান পর্যন্ত আগাইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাদের সারি প্রসারিত করিয়া তাঁহারা শত্রুদের যুদ্ধ দান করিলেন। মীর হাসান খাঁ ও শিব সিংহের সাহস যতটা ছিল, অভিজ্ঞতা বা পরিণামদর্শিতা ততটা ছিল না; কিন্তু আমীর খাঁর দুই-টাই ছিল। তাঁহারা আরও আগাইয়া চলায় আমীর খাঁ তাঁহাদিগকে এই বিশেষ সময়ে মূল সৈন্যদল হইতে পৃথক হইয়া মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত কার্য হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে থামিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সংবাদ পাঠাইলেন। অন্যান্যের সহিত তাহাদের একত্র থাকাই তিনি সমধিক ভাল মনে করিলেন। কিন্তু এই উপদেশে ঐ দুই অপরিণামদর্শীর উপর কোনই ফল হইল না। তাঁহারা ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলেন। মারাঠারা প্রথমে একজন বা অল্প কয়েকজন করিয়া দূরে দেখা দিল; তাঁহাদিগকে ময়দানে দূরান্তর হইতে আরও দূরান্তরে না নেওয়া পর্যন্ত এইরূপ চলিল; অতঃপর অকস্মাৎ তাহারা সকলে এক যোগে তাঁহাদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র বর্শা ও লম্বা তরবারি দ্বারা এমন ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল যে, সকলেই অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। একজন আহত সৈনিক কোনরূপে পলায়ন করিয়া আমীর খাঁর নিকট ছুটিয়া গেল এবং সাহস করিয়া তাঁহাকে পশ্চাদ্বর্তীতা ও উপেক্ষার

জন্য তিরস্কার করিয়া বলিল, একজন সায়্যিদ ও একজন ইমাম যখন (শত্রু) কর্তিত হইতেছেন, তখন আপনি এখানে কি করিতেছেন?" আমীর খাঁ ছিলেন সরস বাক্যে উর্বর মস্তিষ্ক ব্যক্তি; তাঁহার মনের গতি এমনি ছিল যে, জগতে কোন কিছুর খাতিরেই তিনি উপহাস করার সুযোগ ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; এমন কি এরূপ সময়ও তিনি ধীরে সুস্থে উত্তর দিলেন, "বন্ধু আমরা বার ইমামেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট; কেহ যদি ত্রয়োদশ ইমাম হইতে চাহে ও কাটা যাওয়া পছন্দ করে, আমাদের তাহাতে কোনই আপত্তি নাই!"[১৮] অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করা মারাঠাদের বৈশিষ্ট্য; হিন্দুস্তানীদের সেই কৌশল জানা না থাকায়[১৯] তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইল। তাহাদের নেতা মীর হাসান খাঁর সঙ্গে যে অল্প কয়েক জন লোক অবশিষ্ট রহিল, তাহাদিগকে লইয়া তিনি আহত ও কদাচিৎ জীবিত অবস্থায় পশ্চাদ্বর্তন করিলেন। পলাতকেরা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বে বঞ্চিত হইয়া হামাগুড়ি দিয়া তাহাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। আমীর খাঁ ও অন্যান্য সেনানায়ক তাঁহাদের নির্দিষ্ট স্থানে সারাদিন অপেক্ষা করিয়া সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তাঁহাদের তাঁবুতে ফিরিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে তোগলকপুর লুণ্ঠন ও শাহজাহানাবাদের আসন্ন বিপদের জনরব বাহিরে ছড়াইয়া পড়ায় রাজধানীর উপকণ্ঠস্থ সৈন্যদলগুলির ভারপ্রাপ্ত আমীরেরা বাদশাহ একাকী রহিয়াছেন ও মারাঠারা অকস্মাৎ অন্তর্ধান করিয়াছে জানিতে পারিয়া সংবাদ-বাহকের অতি দ্রুতগতি সহকারে দরবারে ধাবিত হইলেন। উজীর কমরুদ্দীন খাঁ সকলের চেয়ে নিকটে—মাত্র ৩০ ক্রোশ দূরে থাকায় তিনি প্রথমে আসিলেন; ৯ই জিলহজ্জ মারাঠাদের সহিত তাঁহার একটা খণ্ড যুদ্ধ হইল; পরদিন অর্থাৎ কুরবানির দিনে রাজধানীর নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন; এতদর্শনে মারাঠারা একটু দূরে সরিয়া গেল। সাদৎ খাঁ এখন আকবরাবাদে ঃ তিনি সেই স্থান ছাড়িয়া দুই দিনে ৬৫ ক্রোশ[২০] চলিয়া দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাকালে নগর সন্নিহিত তালপাতে পৌঁছিলেন। খান দুরান তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিয়া কিছুক্ষণ পরে আসিলেন। তৃতীয় দিন মুহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। মারাঠারা ইতঃপূর্বেই সাদৎ খাঁর প্রদত্ত আঘাতের ভার অনুভব করায় ও তাঁহার করবল

হইতে প্রবাহিত পানি[১০১] প্রচুর পরিমাণে পান করায় তাহারা এরূপ অজস্র দলের মধ্যে পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা পছন্দ করিল না; তদুপরি লুষ্ঠিতদ্রব্যে ভারক্রান্ত হওয়ায় তাহারা চতুর্দিকে ঘুরপাক খাইয়া ফিরিয়া চলিল। প্রত্যাবর্তন কালে তাহারা রিভারি ও বাতোদি শহর লুণ্ঠন, দগ্ধ ও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। অতঃপর তাহারা তাহাদের নব-বিজিত (রাজ্য) মালবে ও গুজরাটে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে তাহারা সব কিছু ধ্বংস করিয়া দিল, কিন্তু কোথাও অপেক্ষা করিল না। ঐ সমুদয় গোলমাল ও গতিবিধির ফল এই হইল যে, বাদশাহ্ দেখিলেন, এত বেশী সেনাপতি ও আমীরের মধ্যে একমাত্র সাদৎ খাঁ ভিন্ন আর কেহই মারাঠাদিগকে আক্রমণের বা অনুসরণের চিন্তা করেন নাই, বরং তাঁহাদের সকলেই এক পাও না বাড়িয়া কোন-না-কোন ওজরে যে যেখানে ছিলেন, সেখানে অবস্থান করেন। ইহাতে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমগ্র মন্ত্রণাসভাসহ তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাহাদিগকে চৌথ দান করিয়া তাঁহার সমস্ত উৎকণ্ঠা শেষ করাই যুক্তিযুক্ত হইবে।

সপারিষদ বাদশাহের মারাঠাদের চৌথদানে সম্মতি

নিজামুল মুল্কের প্ররোচনায়ই যে এই আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও এবম্বিধ আচরণের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দান যে কত কঠিন, তৎসম্বন্ধেও বাদশাহ্ সম্যভাবে অবহিত ছিলেন। কাজেই কৌশল অবলম্বনই শ্রেয়ঃতর মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে কয়েকখানা অনুকম্পাপূর্ণ পত্র লিখিলেন। তাঁহাকে আসফজা[১০২] উপাধি দিলেন, তাঁহার মনসব বাড়াইয়া আট হাজার করিলেন এবং তাঁহাকে এত বেশী ফুলাইয়া তুলিলেন যে, নিজামুল মুল্ক দরবারে আসিতে মনস্থ করিলেন। সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নিজামুদ্দৌলাহ্[১০৩] নাসির জঙ্গকে দাক্ষিণাত্য রাজ্যে তাঁহার প্রতিনিধি ও সহকারী হিসাবে রাখিয়া তিনি রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমন-বার্তা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ায় খান দুরান তাঁহার সর্বশক্তি সহকারে তাড়াতাড়ি মারাঠাদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিলেন। সন্ধিতে যাহাতে নিজামুল মুল্কের কোন অংশ না থাকে, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। শর্ত হইল, এখন হইতে মারাঠারা নিজেদের বাদশাহী

দরবারের ভৃত্য বলিয়া গণ্য করিবে এবং বাদশাহের আদেশ ও তাঁহার মন্ত্রীদের নির্দেশ পালন করিবে, কিন্তু নিজামুল মুল্কের সহিত কোন পত্র লেখালেখি করিবে না বা কোন প্রকারে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবে না। ইহাই ছিল চুক্তির সারমর্ম। কিন্তু মারাঠা সেনাপতি দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আলস্য ও ভীরুতা উপলব্ধি করিয়া এবং উজীরের মধ্যে বিচক্ষণতার অভাব অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া উভয় পক্ষের সঙ্গেই সন্ধি করিলেন এবং দরবার ও নিজামুল মুল্ক উভয়ের বেলাতেই নিরপেক্ষ রহিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ১১৫০ হিজরীর ১৬ই রবিউল আউয়াল শাহজাহানাবাদে পৌঁছিয়া বাদশাহকে কুর্নিশ করিলেন। প্রায় এক মাস পরে জয় সিংহ ও বাজিরাওকে পদচ্যুত করিয়া মালব ও গুজরাটের দুই শাসন কর্তৃত্বের খিলাত তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গাযীউদ্দীন খাঁকে প্রদত্ত হইল। পরবর্তী শুক্রবারে লাহোরের বিখ্যাত শাসনকর্তা আবদুল সমদ খাঁর মৃত্যুর সংবাদ আসিলে তাঁহার ভ্রাতা উজীর কমরুদ্দীন খাঁকে সান্ত্বনার খিলাত প্রদত্ত হইল; অনুরূপভাবে লাহোরে ঐ সেনাপতির পরিবারের নিকট সান্ত্বনাসূচক অন্যান্য খেলাত প্রেরিত হইল। তৎসঙ্গে তাঁহার পুত্র জাকারিয়া খাঁকে একটা বিশেষ খেলাত প্রেরিত হইল। তদ্দ্বারা তিনি লাহোর ও মুলতানের শাসনকর্তার পদের মঞ্জুরী পাইলেন। যুগপৎ বাদশাহের আদেশের অনুবর্তী হইয়া নিজামুল মুল্ক বাজিরাওকে শায়েস্তা করিতে যাত্রা করিলেন। (প্রথমে) তিনি আকবরাবাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঐ নগরে তাঁহার নিজের জনৈক আত্মীয়কে তাঁহার প্রতিনিধি নির্ধারিত করিয়া তিনি আকবরাবাদে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া মালবের দিকে যাত্রা করিলেন। আটওয়ার গমন করিয়া তিনি কাল্পিতে ঐ নদী অতিক্রম করিলেন। বুন্দেলখণ্ডে উপস্থিত হইয়া তিনি ঐ দেশের রাজাকে ধৃত করিলেন; সেখান হইতে তিনি ভূপালে গমন করিলেন। ইহা মালবের সামন্ত রাজ্যের একটা শহর। তাঁহার মতলবের কথা শুনিয়া বাজিরাও এক শক্তিশালী সৈন্যদল লইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঐ শহরের ময়দানে নিজামুল মুল্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হইল, কিন্তু উহাদের কোনটাই চূড়ান্ত প্রমাণিত হইল না। শেষোক্ত ব্যক্তি এখন সংবাদ পাইলেন যে, নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ

করিতেছেন। কাজেই তিনি মারাঠাদিগকে তুলনায় ক্ষুদ্রবস্তু মনে করিয়া বাজিরাওর সহিত বিবাদ ভঞ্জনই ভাল মনে করিলেন এবং ঐ সকল শত্রুকে পশ্চাতে রাখিয়া যাবতীয় তৎপরতার সহিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এরূপ বিরাট আকারের যোগাযোগ ও ক্ষতিকে একদল বিশ্বাসঘাতক উচ্চ কর্মচারী নিছক ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া গণ্য করিতেন; শুধু পরস্পরকে ধ্বংস করিতে ব্যগ্র বলিয়া তাহারা কেবল তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারিলে পরিণামের কথা হিসাব করিতেন না। তাঁহাদের উদ্দেশ্যের জন্য দরকার হইলে মুসলমানের শোনিতপাত করিতে ও সায়িদদের একটা গোটা গোত্রকে হত্যা করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। সয়ফুদ্দীন খাঁ ছিলেন মৃত আবদুল্লাহ্ খাঁর সহিত সংশ্লিষ্ট ঐ সমুদয় শরীফ লোকের অন্যতম; তাঁহার পরাজয়ে পৈত্রিক সম্পত্তিতে গমন করিয়া তিনি বাদশাহ-দত্ত একটা জায়গীর ও তাঁহার পরিবারে বংশানুক্রমিক একটা তালুকের জমির[১০৪] সামান্য আয়ে জীবনযাপন করিতেন। কোনরূপে প্রাণধারণের মত এই সামান্য উপজীবিকা তিনি তাঁহার পরিবারস্থ কয়েকজন বৃদ্ধ অক্ষম বা সর্বস্বান্ত ব্যক্তি ও আশ্রিতের সহিত ভাগ করিয়া খাইতেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ভূ-সম্পত্তিটুকুও কমরুদ্দীন খাঁ ও তুরানীদের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা একজন সায়িদের দৃশ্য সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায় এবং তাঁহাদের অন্তরে এই জাতির প্রতি একটা শত্রুতা পোষণ করায় হুসায়ন আলী খাঁর প্রত্যেকটা আত্মীয়কে সমূলে বিনষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই অভিপ্রায়ে কমরুদ্দীন খাঁ জনৈক হাশমত খাঁকে চাক্‌লা শাহারানপুরের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিলেন। সয়ফুদ্দীন আলী খাঁ এবং হুসায়ন আলী খাঁর পরিবারের অন্যান্য লোক ও আশ্রিতেরা যে সমস্ত জমি ও ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতেন, তাহা অধিকার ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ ছিল। ঐ পাপিষ্ঠ সেখানে পৌঁছিয়া আদমের ফরজন্দদের রাজার[১০৫] সম্পত্তির উপর জবরদখল ও অত্যাচারের হস্ত প্রসারিত করিল এবং সয়ফুদ্দীন আলী ও ঐ সকল হতভাগা লোককে তাহাদের নেহাৎ প্রাণধারণের সামান্য সম্বলটুকু হইতেও বঞ্চিত করিতে চাহিল। চরম সঙ্কটে পড়িয়া এবং ঐ পাপিষ্ঠের থাবা হইতে কিরূপে রক্ষা পাইবেন দিশা না পাইয়া তাঁহারা "নৈরাশ্য কোন আইন জানে

না" এই বাক্যের মর্ম অনুযায়ী আত্মরক্ষার্থে বিদ্রোহী হইয়া তাহাদের অত্যাচারীকে হত্যা করিলেন। এই জরুরতের কার্যে উজীর ও তাঁহার ভ্রাতা আজিমুল্লাহ খাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। যে সকল ধৈর্যের সহিত জান নেসার খাঁর হত্যা ও জনৈক দুষ্ট হিন্দু কর্তৃক একজন মুসলমানের স্ত্রী-পরিবার দখল সহ্য করেন, যাহারা জঘন্য অপরাধকেও তুচ্ছ করিয়া দেখেন, যাঁহাদের সম্মান-জ্ঞান ও লজ্জা এতই অল্প যে, কিরূপে এরূপ ঘোর-অন্যায়ের যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষেই এখন এরূপ জরুরী কাজকে এবং একজন সায়্যিদের হস্তে[১০৬] হাশমত খাঁর হত্যাকে সরকারের সম্মানের সহিত অমর্যাদা ও উহার মন্ত্রীদের বিমল চরিত্রের পক্ষে লজ্জাকর বলিয়া পরিগণিত হইল। একজন বিখ্যাত সায়্যিদের রক্তপাত ও নিঃস্ব লোকের একটা আস্ত পরিবারকে তরবারি মুখে নিক্ষেপ না করিলে এরূপ ঘোর অন্যায়ের এখন আর প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারিত না। অভিযানটি এত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইল যে, নিজ ভ্রাতা ২য় আবু সুফিয়ান[১০৭] আজিমুল্লাহ খাঁর মত লোককে নিয়োগ দানের দরকার পড়িল। তিনি বাদশাহের বাহিনীর অবশিষ্ট লোক অর্থাৎ তাঁহার পরিচালনাধীন এক দল তুরানী ও আলী মুহম্মদ খাঁ রোহিলার অধীন একদল রোহিলাকে ফরিদুদ্দীন খাঁ ও ওজমাতুল্লাহ খাঁর আরও কিছু সৈন্যের সহিত সম্মিলিত করিয়া সকলে উপরোক্ত শরীফ সাহেব ও বারের সমস্ত সায়্যিদকে[১০৮] ধ্বংস করিতে যাত্রা করিলেন। শেষোক্ত দুইজন ছিলেন লক্ষ্ণৌর শেখজাদা ও তন্মধ্যে ওজমাতুল্লাহ খাঁ কমরুদ্দীন খাঁর পক্ষে মুরাদাবাদের ফৌজদার। এক পৈশাচিক প্রতিহিংসার তেজে উদ্দীপিত হইয়া ঐ সকল পাপিষ্ঠ সে দেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সৈন্যদের দ্বারা ব্যূহ রচনা করিলেন। সয়ফুদ্দীন আলী খাঁ তাঁহার পক্ষে তাঁহার আশ্রিত ও জ্ঞাতিগণ এবং যে অল্প কয়জন লোক এই নিদারুণ সঙ্কটকালে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া পছন্দ করিল, তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। ক্ষতিগ্রস্ত সায়্যিদ সংখ্যায় অল্প এবং কামান ও অপর কয়েকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যশূন্য হইলেও তিনি তাঁহার সম্মান, প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন এবং তাঁহার নিজের নৈরাশ্য হইতে এত শক্তি সংগ্রহ করিলেন যে, তিনি আজিমুল্লাহ খাঁকে হটাইয়া দিয়া

তাঁহার অনেকটা স্থান দখল করিলেন। তিনি এমন কি এই পাপিষ্ঠকে তাঁহার নরাধমগণসহ দোজখের তলদেশে তাহাদের ভাগ্যনির্ধারিত স্থানে প্রেরণ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় অভিশপ্ত রোহিলা আফগানদের আর একটা বাহিনী সায়্যিদ সাহেবের পার্শ্বদেশে হাজির হইল এবং বন্দুক ও হাউই-বাজি হইতে এত অনল বর্ষণ করিল যে, পুরোভাগে তাঁহাদের প্রভুসহ ঐ সমুদয় সায়্যিদ শাহাদতের পেয়ালা পান করিলেন। ঐ হতভাগ্য সায়্যিদের বিখ্যাত পূর্বপুরুষেরা জানসিতাহ্ শহর নির্মাণ করিয়া সেখানে লোক বসতি করান। তিনিও সেখানে বাস করিতেন। ইহার পর তাঁহারা সেদিকে অগ্রসর হইলেন এবং নিছক ঔদ্ধত্য ও লালসার নির্দেশের বশীভূত হইয়া ঐ সকল হতভাগা সায়্যিদদের গৃহের উপর আপতিত হইয়া শহরটি লুণ্ঠন করিলেন। যে সকল সায়্যিদানী গৃহিনী কখনও রাস্তায় পদক্ষেপ বা মুক্ত বাতাসে তাঁহাদের নগ্নতা[৩৭] প্রকাশ করেন নাই, তাঁহাদের মস্তক দুঃখ ও অপবিত্রতার ভস্ম দ্বারা আবৃত করার পর তাঁহাদের উপর তাহাদের নাপাক হস্ত স্থাপন করিতেও তাহারা লজ্জাবোধ করে নাই। সেই দুর্ভাগা শহর কয়েক দিনের জন্য কিয়ামতের দিনের ধ্বংসের চিত্র হইয়া রহিল। এত সর্বহারা অক্ষম লোকের নিকট হইতে যে অবিশ্রান্ত ক্রন্দন ও শোকধ্বনি উঠিল ও ঐ সমুদয় আবাদহীন বিরান বসতি হইতে যে চীৎকার ধ্বনি উঠিল, তাহা সপ্তম আকাশের বুরুজ পর্যন্ত পৌঁছিল। বিশ্বাসভাজন লোকেরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঐ সকল মহাপাপ অনুষ্ঠানের পরে একত্রে কয়েক দিন পর্যন্ত দিক্ চক্রবালে প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় এরূপ অসাধারণ রক্তিমাভা বিস্তৃত হইয়া থাকিত যে, ঐ সমুদয় হতভাগা লোকের শোনিতে আকাশের প্রান্ত সিক্ত হইয়াছে এবং ঐ সমুদয় উৎপীড়িত মহিলার পক্ষে দিবা-রজনী একচক্ষু অশ্রুবিসর্জন করিতেছে বলিয়া বোধ হইত। সায়্যিদদের উপর অনুষ্ঠিত এই সকল অত্যাচার ও তজ্জনিত দিকচক্রবালের রক্তিমাভা ইতিহাসে পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনুমানের উদ্ভবের কারণ। যাঁহারা প্রাকৃতিক কারণের ব্যাখ্যায় নিপুণ এবং সময় ও প্রাকৃতিক পদার্থের ঐ জ্ঞানের সহিত যে সকল সূক্ষ্ম ঘটনা ও বিশেষ ব্যাপার গ্রহণক্ষত্রাদির ফল তাহার সঙ্গেও পরিচিত, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, উজীরের অন্ধ

জান সিতাহ্ শহর ধ্বংস

একগুঁয়েমির শাস্তি ও সেই অভিশপ্ত আজিমুল্লাহ খাঁ কর্তৃক নবী-বংশধরদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের দণ্ডদান স্বরূপ এই দেশ কোন ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও বিবিধ দুর্দশায় উৎপীড়িত হইবে। তাহারা দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, আকাশের এরূপ রক্তবর্ণ রূপ ধারণ বরাবরই এইরূপ ও অনুরূপ দুর্যোগের পূর্ব-সূচনা করিয়াছে।

ইংরেজী সংস্করণের টীকা

(১) নাসির জঙ্গ অর্থ যুদ্ধে সাহায্যকারী এবং মরজুদ্দৌলাহ অর্থ সাম্রাজ্যের সম্মানিত।

(২) কোন ইউরোপীয়ের কানে ইহা খুব কর্কশ বাজিতে পারে। কিন্তু কোন ভারত উপমহাদেশীয়ের নিকট নহে; কারণ, সে জানে যে, ভাড়াটে জমিতে চালাঘর নির্মাণের চেয়ে সাধারণ আর কিছুই নাই; ইহা সর্বদাই বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং প্রায়ই তলে তলে শর্ত থাকে যে, জমিদার এত দিনের নোটিশ দিয়া জমি দখল করিতে পারিবে; সময় সময় শর্ত নির্ধারিত করা হয়; কিন্তু প্রায়ই হয় না। বড় শহরে ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। গ্রন্থকার ছিলেন একজন সর্বাপেক্ষা গোঁড়া সায়্যিদ। সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি ঐ মন্ত্রী যেরূপ বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, গ্রন্থকারও ঐ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদ্রূপ বিদ্বেষ পোষণ না করিলে এই ব্যাপারে আদৌ তাঁহার দোষ ধরিতেন না।

(৩) এখানে মোগল বংশকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

(৪) খোরাসানের ঐ রাজধানীর নাম তুস; কিন্তু পারস্যের রাজা শাহ আব্বাস বার ইমামের অন্যতম মূসা রেজার জন্য সেখানে একটা স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করেন বলিয়া ঐ স্মৃতিসৌধ আরবীতে মেশহেদ বলিয়া অভিহিত হয়; কালক্রমে ইহা তীর্থযাত্রার বস্তুতে পরিণত হয়। অতঃপর খোদ শহরটাই মেশহেদ নামে অভিহিত হয়। আকারে ও ঐশ্বর্যে ইহা সমগ্র পারস্যের চতুর্থ নগর।

(৫) শাহ আব্বাসের অধীনে কান্দাহারের শাসনকর্তা আলী মর্দান খাঁ তুর্কদের বিরুদ্ধে তাঁহার মনিবের যুদ্ধের সুযোগ লইয়া বিদ্রোহী হন এবং ভারত সম্রাট শাহজাহানের হস্তে নিজের দেহ ও দুর্গ দুইটাই তুলিয়া দেন। তিনি ছিলেন বিপুল ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি। লোকে বলিত,

তিনি স্পর্শ-মণিপ্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে দিল্লী খাল খনন করাইয়া ৮০ মাইল দীর্ঘ শুষ্ক পানিহীন স্থানে পানি সরবরাহ করিয়া তিনি সর্বপ্রকার অর্থেই ইহা প্রাপ্ত হন।

(৬) পেশোয়ার কাবুলের (বর্তমানে পাকিস্তানের) একটা শহর; ইহার গোলাপ ফুল গুণের জন্য বিখ্যাত বলিয়া তাহা হইতে প্রস্তুত আতর বা রৌদ্রে রক্ষিত গোলাব-জলের নির্যাস এত মূল্যবান যে, অকৃত্রিম পাওয়া খুবই কঠিন; আসল পাওয়া গেলে ইহা দিল্লীতে ইহার তিনগুণ ওজনের স্বর্ণেও যখন পাওয়া যায়, তখন কলিকাতায় পাঁচগুণ ওজনের স্বর্ণে বিক্রীত হইত। কাশ্মিরী আতরও প্রায় অনুরূপ তুল্য মহার্ঘ; এমন কি আগ্রা বা আকবরাবাদের আতরও সেখানেই উহার ওজনের ৫/৬ গুণ রৌপ্যে বিক্রীত হইত।

(৭) আমোজা কোন প্রাচীন ফারসী শব্দ হইতে পারে, তবে 'মুকাদ্দাস' আরবী, অর্থ পবিত্র।

(৮) ইমাম মেহদী হইতেছেন হুকুমের মালিক (এই সমুদয় শিয়া ধর্মমত অনুযায়ী); সমগ্র মানব জাতিকে সত্য ধর্মে অর্থাৎ শিয়া ধর্মমতে দীক্ষিত করার জন্য তাহার আবির্ভূত হওয়ার কথা।

(৯) শিয়ারা মাত্র ১২ জন ইমাম বা প্রধান ধর্মাচার্য স্বীকার করে বলিয়া আপনাদিগকে ইমামিয়া বলিয়া অভিহিত করে; প্রকৃত বিশ্বাসী বলিয়া তাঁহারা নিজেদের মু'মেনীনও বলিয়া থাকে।

(১০) ইহা আহল-ই-সুন্নৎ ওয়াল জ'মাত শব্দের অনুবাদ। সুন্নীরা অনেকগুলি হাদীস স্বীকার করে ও যথাসাধ্য দলবদ্ধ হইয়া নামায পড়ে বলিয়া শিয়ারা তাহাদিগকে এই নামে অভিহিত করিয়া থাকে; পক্ষান্তরে শিয়ারা কোন হাদীস মানে না এবং একাকী নামায পড়ে।

(১১) কোন উৎকট শিয়া ব্যতিরেকে কেহ এরূপ বলিতে পারে না। এই দুই বংশের সম্রাটরা কেবল যে শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ীই ছিলেন এমন নহে, তাহারা ছিলেন আরব জাতির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত: পক্ষান্তরে ইমাম হুসায়নের বংশধর ফাতিমিয়া খলিফা বা সম্রাট এবং কাজে কাজেই সায়্যিদদের সম্পর্কে ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে,

তাঁহারা ছিলেন উপরি-উক্ত দুই বংশের নিকৃষ্টতর লোকদের ন্যায়ই মন্দ; মরক্কোর সম্রাট নামে অভিহিত ফাতিমিয়া কসাইদের সম্বন্ধে আমরা প্রত্যহ যাহা দেখিতে পাই, তদ্দ্বারাও এই মন্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় না।

(১২) মুসলমানেরা তাহাদের ধর্মের নাম দেয় ইসলাম বলিয়া; ইব্রাহীম বা হিব্রাহিম যে ধর্মের চর্চা করিতেন এবং যাহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলের মারফতে তদীয় অধঃস্তন পুরুষ আরবদের নিকট হস্তান্তরিত হয়, ইহা তাহা বই নহে। তাঁহারা নিজেদের বলে দীনদার বা ধর্মমতাবলম্বী ব্যক্তি, পক্ষান্তরে গাবর বা পার্শী ও হিন্দুদের ধর্মহীন বলিয়া মনে করে।

(১৩) মা'আসিরে নবভী অর্থাৎ নবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর অভিযান, তাঁহার উক্তি, রীতিনীতি ইত্যাদির বিবরণ সংবলিত একখানা বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

(১৪) এই শব্দগুলির কোন অর্থ বা গুরুত্ব নাই; সে যাহাহউক, এগুলিকে "প্রচ্ছন্ন, হাজির, প্রদর্শিত, ছিল" শব্দ দ্বার অনুবাদ করা যাইতে পারে।

(১৫) সালাম-আলাইকুম সালাম-আলাইকা শব্দের বহুবচন; আরবীতে ইহার অর্থ তোমার বা তোমাদের উপর শান্তি হউক। সমস্ত আগন্তুক অন্যান্য মুসলমানকে ইহা বলিয়া অভিবাদন করে; তাহারা উত্তর দেয় ওয়াআলাইকুম সালাম অর্থাৎ তোমাদের উপরও শান্তি হউক বলিয়া। মুসলমান ভিন্ন ইহা কখনও অপর কাহারও জন্য ব্যবহৃত হয় না। শিয়াদের মধ্যে যাহারা বসিয়া থাকে, তাহারাই আগন্তুকদের সালাম আলাইকুম বলিয়া অভিবাদন করে।

(১৬) ইহা কলিকাতায় আর্মেনিয়ানদের ব্যবহৃত টুপির চেয়ে উঁচু অর্থাৎ ২৪ ইঞ্চিরও অধিক উচ্চ ছিল; ইহা শক্ত-করা মখমলে তৈরী; আর্মেনিয়নেরা ভারতবর্ষে নিজেদের জন্য ইহার প্রবর্তন করে; কিন্তু ইরান বা পারস্যে তাহাদের টুপি অনেকটা নীচু; তবে দুইটিই রোমান পুরোহিতের চতুষ্কোণ টুপির অনুরূপ।

(১৭) হেরার গুহা মক্কার নিকটবর্তী একটা পাহাড়ের নিভৃতাবাস ; হযরত (সঃ)সেখানে ধ্যান করিতে যাইতেন ; ইহাতে ৩/৪ জন লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে। ইহা নীলও শ্বেত বর্ণের স্ফটিক প্রস্তরে গঠিত ; ইহার ছাদ হযরতের মাথায় লাগিত। কিন্তু ১২০০ বৎসর ধরিয়া অসংখ্য হাজীর হাতের স্পর্শের দরুন ময়লা জমিয়া ইহার পুরুতা স্ফটিক প্রস্তর হওয়া সত্ত্বেও, ২/৩ ইঞ্চিতে নামিয়া আসিয়াছে।

(১৮) ইহা ইতিহাসের একটা নিতান্ত অস্পষ্ট বিষয়। হযরতের মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিয়োগ লইয়া আরব সেনাপতিদের মধ্যে ভীষণ বিবাদ দেখা দিলে তাঁহার মৃত্যুর পুর্বে তিনি ঐ বিষয়ে কোন আভাস দেন কিনা, তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা সকলেই নবী-নন্দিনী ফাতিমার নিকট গমন করেন। ফাতিমা নিতান্ত স্বাভাবিক-ভাবে তাঁহার নিজ স্বামী ও হযরতের চাচাত ভাই আলীর অনুকূলে উত্তর দিলে ওসমান অধীর হইয়া ফাতিমা এত নিকটে আছেন না জানিয়া গৃহে প্রবেশের জন্য প্রচণ্ডভাবে দরজায় ধাক্কা দিলে দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহাকে আঘাত লাগে ; তৎফলে পরদিন সকালে তাঁহার একটা পুরুষশিশু ভূমিষ্ট হয় ; তাঁহার মাতা ইতঃপূর্বেই তাঁহার নাম রাখেন মুহসিন বা উপকারী। থয়ফ শান নোমোদ এই মুহসিন বলিয়া ভাণ করেন।

(২০) এই সকল নামের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে পাঠকদের কৌতুহলের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় কোনই লাভ হইবে না। সম্ভবতঃ প্রাচীন ফারসী-ভাষায় উহাদের কোন অর্থ ছিল। অন্যগুলির কোনরূপে কোন অর্থ দান করা গেলেও আধুনিক ফারসীতে ভেজিবার ও ফেগারের কোন অর্থ নাই। নোমোদা-নোমোদ ও নেমা-নোমোদ উপস্থিত হইয়াছিল,—উপস্থিত হইয়াছিল ও উপস্থিত হইতেছে—প্রদর্শিত এবং নোমোদ-দিদ উপস্থিত হইয়াছিল—দেখিয়াছিল বুঝাইতে পারে। নেমানা নেমা নোমোদের স্ত্রী-লিঙ্গ।

(২১) আলীকে তাঁহার পূর্ববর্তী ওসমানের মৃত্যুর জন্য পরোক্ষ দায়ী বলিয়া দৃঢ়রূপে সন্দেহ করা হয় ; মৃতের তিনজন অনুচর কুফার মসজিদে

তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করে। শিয়ারা কুফাকে নজফ বলে; ইহা ছিল একদা আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু বর্তমানে বসরা প্রদেশের একটা ক্ষুদ্র নগর মাত্র ও কেবল আলীর সমাধি দ্বারা পরিচিত।

(২২) অত্যধিক বড় দাবী-দাওয়াপূর্ণ কয়েকটি ধর্মকে ইহকালে এবং আরও বড়গুলিকে পরকালে এই নীতি দ্বারা বিচার করিতে গেলে আমাদিগকে অনেক কিছুই হারাইতে হয়। এই ১৬০০ বৎসর ধরিয়া ধর্ম সৃষ্টি চলিতেছে, তাহাও ইহার জন্মের ২০ বৎসর পরের ন্যায় প্রাথমিক সময় হইতে। সত্যভাবে একথা বলা যায় যে, এই সৃষ্টির কাজ যদি এই বিগত ১০০ বৎসরে শেষ হইয়া থাকে, ইহার নিছক এবং একমাত্র কারণ এই যে, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ এই সকল সৃষ্টিকার্য লইয়া পরস্পরের গলা কাটিয়া এখন এ সকল বিষয়ে এত উৎসাহহীন ও এত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্তমানে যে কোন নূতন ধর্মের অভ্যুদয় ঘটিলে তাহা ঘৃণা ও উপহাসের সহিত গৃহীত হইবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র হাত হইতে একযোগে আসিয়াছে বলিয়া অনেকটা সত্যের সহিত বলা যাইতে পারে যে, জগতে এরূপ আর একটা ধর্ম আছে। এই ১২০০ বৎসর হইল সে আঘাত কাটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘকাল মধ্যে ইহার ধর্মনীতি, ক্রিয়া-পদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র নব-প্রবর্তনও প্রবেশ করিতে পারে নাই।

(২৩) পয়গম্বর হূদ বা হেবার কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত দুইটি গোত্র; একটি ঘূর্ণিবাত্যায় কর্তৃক পড়িয়া বালুকা মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(২৪) আমাদের গ্রন্থকার ঐ পরিবারের রূপ ও কয়েকজন বংশধরের কথা বলিতে এত যত্নবান বলিয়া মুর্শিদাবাদের গোপন কাহিনীর একটা অদ্ভুত ব্যাপার বর্ণনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মাত্র ১২ বৎসর পূর্বে মধ্যরাত্রে কদমরসূল হইতে একটি মনোরম দীর্ঘ মূর্তি বিবিধ ছদ্মবেশে বাহির হইয়া আসিত। কেহ তাঁহাকে ঐ পবিত্র মাজারের সেবাকারী ফিরিশ্‌তা বলিয়া অনুমান করিত

কেহবা তাঁহাকে সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যে একজন সাদাসিদে রমণী বলিয়া ধরিয়া লয়। রমণী হইলে তিনি ছিলেন তাঁহারই সর্বাপেক্ষা খাম-খেয়ালী পূর্বপুরুষের ন্যায়ই তুল্য ধর্মান্ধ ও খামখেয়ালী; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহাকে এত অপরূপ সুন্দরী দেখাইত যে, যাহারা তাহাকে দুঃখভারাক্রান্ত মানুষকে বিহিশ্‌তের আনন্দের পূর্ব-স্বাদ দানের জন্য প্রেরিত কোন স্বর্গীয় জীব বা দূতী বলিয়া মনে করিত, তাহাদের অভিমতই সত্য বলিয়া বোধ হইত। আস্তন্ত সর্বাপেক্ষা সুঠামদেহী এই মহিলা সর্বাপেক্ষা উজ্জল শ্বেতবর্ণের সাটিন-চর্মের নিম্নে এত বিভিন্ন প্রকার নীলাভ শ্রেণীবিভাগ প্রদর্শন করিতেন যে, অজ্ঞ লোকেরা তাহা হইতে সমস্ত ধমনীর অবস্থা শিক্ষা পাইত। এ সমুদয়ের সহিত মধুর সুর মিলিয়া যে অনুরাগময় উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত, স্বর্গ হইতে একমাত্র স্বর্গীয়-প্রাণী দ্বারা আনীত গুপ্ত বিদ্যার সেই কৌশলময় বিবিধ রূপ ভিন্ন আর কিছুর সঙ্গেই তাহার তুলনা চলিত না। তিনি ছিলেন এক দুজ্ঞের্য় জীব অথবা রূপ ও কৌশল ঐ পরিবারে বংশানুক্রমিক ছিল বলিয়া ইহা এক অকাট্য যুক্তিযুক্ত।

(২৫) যিনি এই উপমহাদেশের মফঃস্বলে বহুদিন কাটাইয়ছেন এবং এই মহাদেশের সর্বত্র বিস্তৃত সার্বজনীন সহৃদয়তা ও পরমত-সহিষ্ণুতা সম্পর্কে যাঁহার ধারণা আছে, তিনি এরূপ অসম্ভব গল্পের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করিবে না। কিন্তু উজীরকে ঘৃণা করিতেন বলিয়া গ্রন্থকার তাঁহার নিজের লোকের প্রসঙ্গে এই ঘৃণাকে শিশু-সুলভ বিশ্বস্ততায় রূপ দান করিয়াছেন যে, এই গল্পে ও পরবর্তী গল্পে কোনই আস্থা স্থাপন করা চলে না। সর্বাপেক্ষা ক্ষীণবুদ্ধি লোকের নিকটও ইহার সর্বাপেক্ষা অনিপুণ বিশ্বাসঘাতকতা ও জালিয়াতি স্পষ্ট ধরা পড়িবে।

(২৬) অকপট বিশ্বাস থাকা দূরের কথা, যাহারা সেদিকে খুব সামান্য সজ্জিত (গ্রন্থকার এবিষয়ে নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে), তাহা-দিগকেও গ্রহণের চিহ্ন মঞ্জুর করা হয়। এ সকল চিহ্ন হইল

কখনও অস্পষ্টরূপে স্বর, কখনও লবণ-স্তূপের উপরে ছাপ এবং প্রায়ই ছাদ হইতে পতিত একটা তণ্ডুল কণা ; বার বার এগুলি অনুবাদকের পরিবারেও মঞ্জুর করা হইয়াছে ও লক্ষ্য করা গিয়াছে। এখানে একজন উৎসাহী গোঁড়া মহিলা রহিয়াছেন, তিনি সায়্যিদানী অর্থাৎ সায়্যিদ-দুহিতাও বটেন। প্রত্যেক মুহররমে যে সকল মুজিজা ঘটিতে বাধ্য, সেগুলির সংখ্যা একমাত্র মুর্শিদাবাদ শহরেই গড়ে বৎসরে প্রায় ছয় শতের কম হইতে পারে না।

(২৭) যে এজীদের এখানে এত বদনাম করা হইয়াছে, তিনি ছিলেন যে কোন যুগের শ্রেষ্ঠ রাজণ্যবর্গের অন্যতম। তাঁহার সাম্রাজ্য একদিকে বাগদাদ হইতে গঙ্গা ও অন্যদিকে স্পেন ও ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রদেশ পর্যন্ত সমগ্র আফ্রিকায় বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সৈন্যেরা কনসটান্টি-নোপল অবরোধ করে ; অবরুদ্ধেরা গ্রীক অগ্নি বা বারুদ নামক এক অব্যর্থ সঙ্গতি না পাইলে উহা অবশ্যই তাঁহার হস্তগত হইত। তাঁহার পিতা মুয়াবিয়া ছিলেন আলীর ন্যায় একই মাত্রায় মুহম্মদ (দঃ)-এর সহিত সম্পর্কিত। তাঁহারা উভয়েই রসুলের দুইজন চাচার পুত্র, কিন্তু মুয়াবিয়া তাঁহার কাতিব হিসাবে কাজ করিতেন। মুহম্মদ (দঃ)-এর তিনজন প্রথম উত্তরাধিকারীর পরে এই মুয়াবিয়া সর্ব-প্রথম খেলাফৎ বা সাম্রাজ্যে প্রকাশ্যে আলীর দাবী উপেক্ষা করেন ; অবশ্য রসুলের মালিকী ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে তিনি আলী (রাঃ)-এর অধিকার স্বীকার করিতেন। আলী (রাঃ) এ সম্পর্কে তাঁহাকে পত্র লিখিলে তিনি একখানা সাদা কাগজ দ্বারা উত্তর দেন এবং ওসমানের রক্তাক্ত জামা বর্শাগ্রে গাঁথিয়া উহাকে প্রধান পতাকায় পরিণত করিয়া সসৈন্যে তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেন ; ওসমান ১৭টি ছোরার আঘাত প্রাপ্ত হন। এই আলী (রাঃ) তাহাতে প্রধান উপলক্ষ ছিলেন বলিয়া দৃঢ় সন্দেহ করা হয়। এই মত যে মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত তাহার প্রমাণ এই যে, রসুলের মৃত্যুকালে যে ১৩৪,০০০ যোদ্ধা লইয়া সমগ্র মুসলিম বাহিনী গঠিত ছিল, তন্মধ্যে পূর্ণ ৮০,০০০ লোকই মুয়াবিয়ার পক্ষভুক্ত হয়। সায়্যিদদের ঘৃণা করায় মুহম্মদ

আমীন খাঁর ভৃত্যেরা পর্যন্ত তাঁহাকে ভৎর্সনা করার কারণ এই যে, উপমহাদেশীয় মহলে ও সমস্ত জনতার মধ্যেই নাটকীয় দৃশ্যের প্রতি একটা ঝোঁক বিদ্যমান। স্বভাবতঃ আনন্দ-উৎসুক লোকেরা আইন ও নীতি দ্বারা সারা বৎসর সংযত থাকিয়া মুহর্‌রমের গান ও নাটকীয় কার্যাবলী দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিকার করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। ইহা লক্ষ্যণীয় যে, বাঙ্গালায় খৎনাকরণ, রমযানে রোজা রাখা, ইউরোপীয়দের ছোয়া অন্ন গ্রহণে বিরতি এবং সর্বোপরি মুহর্‌রমে নৃত্যগীত ভিন্ন ধর্মের আর কিছু নাই বলিলেই চলে। সর্বশেষটি এই দেশের বিশ্বাস ও ক্রিয়া-পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২৮) শিয়া বা আলীর পক্ষভুক্ত লোকেরা যদি আলীর স্থানাধিকারী রূপে তাঁহার তিনজন অব্যবহিত পূর্ববর্তীকে প্রত্যাখান করিয়াই তৃপ্ত থাকিত তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ নিজস্ব মত উপভোগে কাহারও কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহারা আরও আগাইয়া গিয়া যে তিনজন লোকের প্রত্যেকেই পয়গম্বরকে রক্ষা করেন, আশ্রয় দেন, সাহায্য করেন, তাঁহাদিগকে অভিশাপ ও গালাগালি করেন। এইজন্য তাহাদিগকে রিফজী বা ভৎর্সনাকারী বলা হয়।

(২৯) নাগারা লোহার পাত দ্বারা নির্মিত একটি বৃহৎ দামামা ও ইউরোপীয় দামামা হইতে দ্বিগুণ বড়; উচ্চপদস্থ লোক ভিন্ন কখনও কেহ ইহা ব্যবহার করে না; ইহা বাদশাহী নহবতের একটি প্রধান যন্ত্র।

(৩০) সরপেষ পাগড়ীর অগ্রভাগে পরিহিত একটি জহরতের কাজ; ইহা এমনভাবে লাগাইতে হয় যেন রত্নটা কপালের উপর ঝুলিয়া থাকে।

(৩১) অর্থাৎ সৈন্য প্রতি দুইটি অশ্ব।

(৩২) পাদেশাহ বেগম অর্থাৎ শাহ্‌জাদী; তাঁহার উপাধি যীনতুন্নিসা অর্থ নারীকুল ভূষণ।

(৩৩) পেশখানা অর্থ অগ্রে প্রেরিত গৃহ বা সাজসরঞ্জাম; বাদশাহের দরবারের সমস্ত আমীরের ও ভারতবর্ষের সমস্ত উচ্চপদস্থ লোকেরই এরূপ অতিরিক্ত পেশখানা থাকিত। যাহাতে তিনি পরবর্তী মঞ্জিলে পৌঁছিয়া শয্যা, খাবার ও প্রত্যেকটা বস্তু প্রস্তুত পান,

তজ্জন্য বরাবরই তাহা অগ্রে সেখানে প্রেরিত হইত। ৩০/৪০টি তাঁবু লইয়া এই সাজ-সরঞ্জাম গঠিত হইত; ইহার কোন কোনটি এত বৃহৎ ছিল যে, ৫০০ লোকের স্থান হইত। বরাবরই এরূপ দুই প্রস্থ থাকিত; একটি মনিবের সঙ্গে যাইত, আর একটি যাইত পরবর্তী মঞ্জিলে।

(৩৪) আওরঙ্গাবাদ অর্থ আওরঙ্গযীবের উপনিবেশ; তিনি যখন ইহা অবরোধ ও অধিকার করেন, তখন ইহার এই নাম হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ নগর ও দুর্গই উহাদের প্রাচীন নাম হারাইয়া নূতন নাম লাভ করিয়াছে; তৎসঙ্গে সেখানে নূতন নূতন অট্টালিকা উঠিয়াছে। এগুলি যে শিবির উহাদের ঘিরিয়া রাখে, তাহাদের ভিটি বই আর কিছুই নহে। এভাবে এ যাবত আওরঙ্গাবাদের নাম কার্কি ছিল। কেলোরিয়া হয় মকসুদাবাদ, হালের মুর্শিদাবাদ; ঢাকা জাহাঙ্গীর নগর, কলিকাতা আলী নগর, বেনারস মাহমুদাবাদ ও প্রয়াগ ইল্লাহাবাদ। কোন বিখ্যাত রাজা কর্তৃক তাঁহার নিজের বাসস্থানরূপে মনোনীত করায় আরও কয়েকটি নগরের নাম পরিবর্তিত হয়, যথা দিল্লীকে বলে শাহজাহানাবাদ ও আগ্রাকে আকবরাবাদ।

(৩৫) যথাযথভাবে বলিতে গেলে কেবল মোগলদের অর্থাৎ যাহারা ভারতে চেঙ্গিজ খাঁর অনুসরণ করে, তাহাদের এই নাম ধারণ করা উচিত। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদলে অজস্র পারসিক বা ইরানী ছিল বলিয়া ভারতীয়েরা তাহাদিগকেও মোগল বলিয়া অভিহিত করিত। যে তুর্ক তৈমুর লঙ্গের অনুসরণ করে, তাহাদিগকে মোগল বলিত আরও বেশী করিয়া। কাজেই সমস্ত শ্বেতবর্ণ মুসলমান ও তাহাদের বংশধরগণ উপমহাদেশে মোগল ও সমস্ত শ্বেতবর্ণ খ্রীষ্টান ফিরিঙ্গী বলিয়া অভিহিত হয়। ভারতীয় হিন্দুরা উত্তরাঞ্চলের সমস্ত বৈদেশিককে তোর্ক বা তুর্ক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে; এই শব্দটির তুলনায় মোগল শব্দটি হালের; ইহা স্মরণ রাখিতেই হইবে, হিন্দুদের নিকট তুর্ক মুখ, তুর্ক ধর্ম ও তুর্কি ভাষা বরাবরই মুসলমান ধর্ম বুঝাইয়া আসিয়াছে।

(৩৬) মুহররমকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলা হয়; হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের পক্ষে যে চারি মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল ইহা উহাদের অন্যতম। যে মাসে যুদ্ধ বা ভ্রমণ (আরবদের পক্ষে ঐ দুইটি বৃত্তিই ছিল তুল্য) আরম্ভ হইত, তাহা ছিল সফর বা বিজয়ী; এই মাসগুলি চান্দ্রমাস হইলেও বৎসরে কয়েক দিন হ্রাস করিয়া সূর্যের গতির সহিত মিল রাখা হইত। কিন্তু মুহম্মদ (দঃ) কর্তৃক পূর্ব ব্যবস্থা রদ করায় একই ঋতুতে পুনরাবর্তনের পরিবর্তে মাসগুলি এখন সম্বৎসরের আদ্যান্ত ঘুরাফিরা করে এবং তাহা কোন প্রকার ঋতুই বুঝায় না।

(৩৭) সাধারণতঃ খেলাত তিন টুকরা লইয়া গঠিত হয়; কাজেই চারি টুকরার খেলাত পার্থক্যের নিদর্শন। শাহী-রত্নাধারে কালী, কলম ইত্যাদিসহ বাদশাহী মোহর থাকিত; তাহা ছিল হাতের ন্যায় প্রশস্ত এবং তাহাতে তারিখসহ বাদশাহের নাম ও উপাধি খোদিত থাকিত। ছোট মোহর বরাবরই কোন নির্দিষ্ট কর্মচারী বা প্রায়ই হারেমের কোন নামজাদা মহিলার হেফাজতে থাকিত; আর একটা মোহর ছিল এক বর্গ ইঞ্চিরও অনেক কম। বাদশাহ স্বয়ং তাহা অঙ্গুরীয়ক রূপে তাঁহার কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতে বহন করিতেন।

(৩৮) ভারতে নওরোজ, নূতন দিন বা নববর্ষ দিবস পড়ে ২১শে বা ২২শে মার্চ তারিখে; নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতির সহিত তাহা শাহ্‌-জাহানাবাদে অনুষ্ঠিত হইত।

(৩৯) বোহ্‌রারা গুজরাটের বিশিষ্ট মুসলমান বণিক সমাজ; তাহারা দাড়ি রাখে, বিশেষ ধরণের পাগড়ী পড়ে এবং কেবল নিজেদের মধ্যে বিবাহ করে। সুরাট বন্দরে প্রায়ই তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হায়দর কুলী খান ইহার যে অংশ দখল করেন, তাহার আয় প্রায় এক কোটি। কিন্তু জমিদারীটি কয়েক কোটি টাকার। এই সওদাগরের 'ইণ্ডিয়ান ম্যান'-এর ন্যায় ১৯ খানা বড় বড় জাহাজ ছিল। প্রতি বৎসরই তিনি ২/১ খানা জাহাজ নির্মাণ করিতেন বা হারাইতেন। কাজেই কখনও এক কুড়ি পুরাইতে পারেন নাই।

(৪০) ইহা দ্রষ্টব্য যে, তাঁহার জন্ম হইতেই তাঁহাকে মালেকা-জামানী বা 'রাজত্বকারী রাণী' নামে অভিহিত করা হয়।

(৪১) খান দুরান একটি উপাধি, অর্থ যুগের প্রভু।

(৪২) কয়েকটি জাতি বা গোত্রের আফগান আছে; যাহারা ফেরোহাবাদের আশেপাশে ও রোহিলাখণ্ডে বসতি স্থাপন করে, তাহাদিগকে রোহিলা বলে; জনৈক সর্দার নাদির শাহের তরবারি হইতে পলায়ন করিয়া তদঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তাহাদের এই নাম ছাড়া ভারতে পারসিকদের ইরানী ও তার্তার বা তাতারদের তুরানী ভিন্ন বিশেষ কোন নাম নাই। শেষোক্ত দুইটি জাতি ও তাহাদের বংশধরদের নির্বিশেষে মোগল বলা হয়।

(৪৩) পর্দাঘেরা কুর্সী বা গাড়িতে বরাবরই রমণী থাকে বলিয়া অনুমিত ও সর্বদাই পবিত্র বিবেচিত হয়।

(৪৪) হিন্দুস্থানীতে 'দেকান' দক্ষিণ বুঝায়।

(৪৫) রোশনাবাদী ছিলেন একজন অপরূপ গুণসম্পন্না নর্তকী; মুহম্মদ শাহ্ তাহাকে অন্তঃপুরে গ্রহণ করেন। গত বৎসর (১৯২৫ খৃঃ?) তাঁহার একখানা ছোট তসবীর ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে একজন সুযোগ্য শিল্পী ইহা প্রস্তুত করেন; তাঁহার কৌশলগুণে মুখমণ্ডলের যাবতীয় সৌন্দর্যের মধ্যেও নর্তকীর দৃষ্টির যাবতীয় স্বাভাবিক চঞ্চলতা প্রকটিত হয়। জাহান আফরোজ বানু বেগম অর্থ বিশ্ব আলোকিতকারী শাহজাদী; গ্রীকেরা রোশনকে রোক্সানা বা রোক্সোনা উচ্চারণ করে; ইহার অর্থ আলোককারী, উজ্জ্বল; হিন্দুস্থানে ইহা নিতান্ত সাধারণ নাম। অনেক সময় আরবী নূর বা আলো হইতে ইহা আরবীতে রূপান্তরিত করা হয় নূরেন বলিয়া।

(৪৬) জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রন্থকার দৃঢ়বিশ্বাসী বলিয়াই কোন ঘটনা ঘটিলে, এত সূক্ষ্মভাবে তাহার সঠিকক্ষণ প্রদানের হেতু; সাধারণতঃ অনুবাদে এগুলি সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। পদোন্নতি সম্পর্কে এই প্রবন্ধ অত্যন্ত ক্লান্তিকর হইলেও কোন কোন বিষয়ে ইউরোপীয়েরা

নূতন জ্ঞান লাভ করিবে বলিয়া অনুবাদকের তাহা কাটছাট করার অধিকার আছে বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

(৪৭) ওয়ালা শাহী ও আগা শাহী নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহারা ছিল দুইটি অশ্বারোহী রক্ষী দল; প্রত্যেকটিতে কয়েক হাজার সওয়ার থাকিত; সুরখ্-পোষ বা লাল-প্রহরীরা ছিল পদাতিক ও তাদের সংখ্যা ছিল ৮০০০।

(৪৮) শের আফগান খাঁর অর্থ সিংহ ছিন্নকারী প্রভু বা সিংহ নিক্ষেপকারী। যে সকল লোক এত সুখ্যাতির সহিত চাকরী করে যে, চিরতরে মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের অধিকারী হয়, তার্তার জাতির বাদশাহেরা তাহাদিগকে তার্খান উপাধি প্রদান করিতেন। সদরুস্-সুদূর খয়রাতী মহল ও ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। খেদমতকার খাঁ সমস্ত কুরআন মুখস্থ বলিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহাকে হাফিজ বা কণ্ঠস্থকারী বলা হইত; ভারতবর্ষ অপেক্ষা তুরস্কেই এই গুণের সম্মান ছিল অনেক অধিক।

(৪৯) মীর আতশী অর্থ অগ্নি-কুণ্ডের অধ্যক্ষ; ইহা অত্যন্ত বিশ্বাসজনক পদ। তিনি প্রাসাদের, অনেক সময় সমস্ত শাহজাহানাবাদ দুর্গের ভিতরে ও আশেপাশে প্রহরী বসান; গোলন্দাজ বাহিনীর পরিচালনা প্রায়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(৫০) খাওয়াস তরবারি, ঢাল ও বর্শা সজ্জিত এক শ্রেণীর বিশেষ প্রহরীদের প্রতি প্রদত্ত নাম।

(৫১) মীর হুসায়ন খাঁর পত্নী একবার যে কোন সময়ের জন্য শিশুকালে মুহম্মদ শাহকে দুগ্ধ দান করায় তাঁহার স্বামীর উপাধি হয় কোকা।

(৫২) কান্দাহারের শাসনকর্তা আলী মর্দান খাঁ এ খাল খনন করান; তিনি ভারত-সম্রাট শাহজাহানকে দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহা ৫ ফুট গভীর ও প্রায় ৩০ ফুট প্রশস্ত; দিল্লীর উত্তরস্থ পাহাড়গুলি হইতে আসিয়া ইহা প্রায় ৪০ ক্রোশ দীর্ঘ একটা ভূ-খণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। আহদিয়ান (একক দল) দলের কোন কর্মচারী নাই; বাদশাহ স্বয়ং তাহাদের

পরিচালক বলিয়া পরিচিত; ইহা তুরস্কের মুতাসারিকা দলের অনুরূপ।

(৫৩) কফি ইউরোপের ন্যায় হিন্দুস্থানে এত না হইলেও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেয়ালায় পান করা হয়; এগুলি ইউরোপীয়দের পেয়ালার ⅓ এর সমান।

(৫৪) খোদ মীর জাফর খাঁ কর্ণেল ক্লাইভকে বলেন, তাঁহার পূর্ববর্তী নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার ১৭০০ হাতী ছিল। তিনি ছিলেন মুহম্মদ শাহের পক্ষে শাসনকর্তা মাত্র। খোদ এই শাহজাদার আরও অনেক থাকিতে বাধ্য। অনুবাদক দাক্ষিণাত্যে ২৫০০০৲ টাকা মূল্যের একটি হাতী দেখিতে পান; লক্ষ্ণৌতে তিনি দুইটি হাতীর ছবি দেখেন; শাহজাহান পর পর এগুলির প্রত্যেকটি দুই লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। দিল্লীতে একটি হাতী পুষিবার খরচ গড়পড়তা দৈনিক ৫৲ টাকা, বাঙ্গালায় পৃষ্ঠে ভার লইয়াও অন্ধ হাতীগুলিকে শ্রবণ-শক্তির সাহায্যে অন্যগুলির অনুসরণ করিতে দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে ঐ জন্তুগুলির বিস্ময়কর সহজাত বুদ্ধি বিচার করা যায়।

(৫৫) কোলার শব্দটি একটি তুর্ক শব্দের বহুবচন; ইহার অর্থ ক্রীতদাস ও সৈন্য দুইই হয়। বাদশাহের টাকায় এই রক্ষীদলকে তাহাদের বাল্যে বা কিশোরে ক্রয় করা হইত।

(৫৬) ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাক ছিল না, তবে সমগ্র হিন্দুস্তানে প্রতি দ্বিতীয় মাইলে পদাতিকের ডাক প্রতিষ্ঠিত হয়। ওকায়া নবিশ ও সোভানাহ্ নবিশ বা সেভানাহ্ নেগারের পদ ছিল প্রায় তুল্যার্থক; তবে প্রথমোক্তের সংবাদ প্রকাশিত হইত, দ্বিতীয়ের প্রদত্ত সংবাদ কেবল কালক্রমেই এরূপ হইত।

(৫৭) যেসকল ইউরোপীয় এই সমুদয় দেশকে অর্ধ-বর্বর বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, বিদ্যাই সম্মান ও উন্নতির নিশ্চিত পথ এবং দেশের রাজন্যবর্গ বিদ্বান ব্যক্তিদের নিজেদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করেন; তাঁহাদের জন্য বরাবরই একটা মসনদ বা সিংহাসন পাতা হয়।

(৫৮) মুসলমান ধর্মাবলম্বী সমস্ত ফকীরই শাহ্ উপাধি, সমস্ত কবিই খল্লস বা তাখাল্লাস ধারণ করিয়া থাকে।

(৫৯) উপমহাদেশে ৫/৬ প্রকারের ঢাক থাকায় উহাদের এতগুলি নামও আছে। এখানে যেটি বুঝাইতেছে, তাহা হইতেছে ক্ষুদ্রতর ইউরোপীয় ঢাকের অনুরূপ এবং ইহা গানের সঙ্গে বাজান হয়। একজন লোক বসিয়া ইহা সমতলভাবে নিজের সম্মুখে রাখিয়া একত্রে বাম হাতের চারি আঙ্গুল দ্বারা তাল রক্ষা করে, পক্ষান্তরে পালা-ক্রমে সূক্ষ্মভাবে আঙ্গুলী চালনা দ্বারা ডাইন হাতে তালের ভাগ বা মনে রাখে। এই ঢাককে ঢোল বলে। গানকারী নর-নারীর ব্যবহৃত আর এক প্রকারের ঢাক আছে; ইহা ২½ ফুট লম্বা ও ইহার ব্যাস এক ফুট, উভয় প্রান্ত সরু কিন্তু এক প্রান্ত অপর প্রান্ত হইতে কিঞ্চিত মোটা। ইহা গায়ে ঝুলাইয়া হেলাইয়া রাখা হয়, ঊর্ধাংশের ব্যাস ৪ ইঞ্চি; মধ্যভাগে বাজাইলে ইহা হইতে এক প্রকার ও পরিধির ধারে বাজাইলে আর এক প্রকার স্বর নির্গত হয়। ঠিক শেষ প্রান্তেও ইহা একই আওয়াজ দেয়, কিন্তু কোমল হইয়া খাদে পরিণত হয়। নিম্নাংশের ব্যাস ঊর্ধাংশের দ্বিগুণ; ইহা হইতে এক প্রকারের উচ্চস্বর বাহির হয়। ইউরোপীয়দের মনোযোগ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় না বলিলেই হয়, ইহার নাম মৃদঙ্গ।

(৬০) এই ইতিবৃত্ত-লেখক আমীর খাঁর রসিকতা করার শক্তির দুই-একটা বিশেষ নিদর্শন বর্ণনা করিবেন। এখানে তাঁহার আশ্চর্যজনক বুদ্ধির একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সুন্নীরা খরগোস খায়, কিন্তু শিয়ারা খায় না; আমীর খাঁ ছিলেন সুন্নী ও সাদৎ খাঁ শিয়া। শিকারীদলের কুকুরগুলি একটি খরগোসকে দৌড়াইয়া ধরিল; কিন্তু এগুলির সাজপোশাক এত উৎকৃষ্ট ছিল যে, উহাকে ছিড়িয়া না ফেলিয়া উহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল; সাদৎ খাঁ বলিয়া উঠিলেন, "হুজুর এমনকি কুকুরেও খরগোস খায় না। আমীর খাঁ উত্তর দিলেন, 'ঠিকই হুজুর, কুকুরে খরগোস খায় না।'

(৬১) নিজামুল মুল্‌ক বরাবরই প্রাচীন প্রথায় জামার উপরে একটি জুববা বা ছোট আস্তিনের উপরে জামা (ওভারকোট) পরিতেন এবং মরহুম আওরঙ্গযীবের দরবারের পুরাতন প্রথায় বাদশাহকে বরাবর কুর্নিশ করিতেন। অর্থাৎ দুই হাত জামার বিপরীত দিকের আস্তিনে ঢুকাইয়া তাহা নাভি পর্যন্ত নিয়া অতঃপর যুগপৎ ভক্তিভরে দেহ বাঁকাইয়া সালাম দিতেন। মুহম্মদ শাহের দরবারের সভাসদেরা চীনা বা তাতারী প্রথাকে উপহাস করিতেন। তাঁহারা শুধু হিন্দুস্তানী প্রথা অর্থাৎ ডাইন হাতের চারি আঙ্গুল কপালে ঠেকাইয়া তৎপরে দেহ অত্যন্ত নত করিয়া অভিবাদন করাই পছন্দ করিতেন। নিজামুল মুল্‌ক যখন দরবারে আসিয়া প্রাচীন প্রথায় তিনবার কুর্নিশ করিতেন, তখন যুবক পারিষদবর্গ নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন; তাঁহারা তাঁহার দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিতেন: 'দেকানের বৃদ্ধ-বাবুর্কের দিকে চাহিয়া দেখুন, তিনি কেমন নৃত্য করিতেছেন, দেখুন।' সর্বোচ্চপদ হইতে অপসারণ অপেক্ষাও এই উপহাসে তিনি নিঃসন্দেহে অধিকতর মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন।

(৬২) সুলায়মানের রাজ-মন্ত্রী আসফের মত সুবিজ্ঞ।

(৬৩) ইংরেজরা যাহাকে সোনার মোহর বা সোনার টাকা বলে, আশরফী তাহার হিন্দুস্তানী প্রতিশব্দ। যে কোন পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাদশাহকে এরূপ কিছু—পাঁচ হইতে পঁচিশ, ১০১ ও ১০০১ পর্যন্ত মোহর নজর দেওয়া হয়। নিম্নপদস্থ লোকেরা শুধু একটি আশরফী ও চারিটি রৌপ্যমুদ্রা বা কেবল পাঁচটী টাকা ভেট দেন। বাদশাহ এগুলি গ্রহণ করিয়া নিয়া যান অথবা স্পর্শ করেন মাত্র। স্পর্শ করা গ্রহণের তুল্য। আশরফী হইল গিনির দ্বিগুণ।

(৬৪) মুবারিজুল মুল্‌ক সরবুলন্দ খাঁর অর্থ রাজ্যের যুদ্ধে অগ্রগামী উন্নত-মস্তক, আমীর।

(৬৫) এক ক্রোড় টাকা হইল একশত লক্ষ বা সোয়া দশ লক্ষ স্টার্লিং।

(৬৬) অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের জামাতা আলী (রাঃ); শিয়া মুসলমানেরা তাঁহাকে শাহ্-ই-মর্দন বা সাহসীদের রাজা ও শের-ই খুদা বা আল্লার সিংহ উপাধি দিয়া তাহার প্রশংসা করিতে অভ্যস্ত।

(৬৭) অথবা দরবেশ আবদুল গফুর বা রাজা আবদুল গফুর। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিন্দুস্তানে কোন মুসলমান ফকীর হইলে শাহ্ বা রাজা উপাধি ধারণ করেন। তুরানী বা তাতারী সম্প্রদায়ের অর্থ অধিকাংশ মুসলমান জাতির অনুসৃত সুন্নী মযহাব; কিন্তু সকলে না হইলেও অধিকাংশ পারসিক বা ইরানী শিয়া মত বা মযহাবের অনুসরণ করে।

(৬৮) পারসিকেরা কেবল আরবী বর্ণমালাই ব্যবহার করে; তাহাতে পা নাই বলিয়া নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তৎপরিবর্তে ফা ব্যবহৃত হয়। কাজেই মূল ফারসী শব্দ পারসঙ (গ্রীকেরা ইহা এভাবেই লেখে) ফার সাঙে পরিবর্তিত হয়; ১২০০ বৎসর পূর্বে পারস্য আক্রমণকারী আরবেরা তাহা লেখে ফারসাঙ ও ফারসাক বলিয়া। দূরত্ব প্রদর্শন ও অশ্বারোহীদিগকে সাহায্য করার জন্য স্থাপিত প্রস্তর হইতে এই শব্দটির উদ্ভব; ঐগুলি পরস্পর হইতে অন্ততঃ চারি মাইল দূরে স্থাপিত হইত।

(৬৯) পাঠকদের জানানো যাইতেছে যে, পাগড়ী বদলের অর্থ চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় পরস্পরের প্রতিশ্রুত ভ্রাতা বলিয়া পরিগণিত হয়।

(৭০) পাগড়ী প্রায় দুই ফুট চওড়া ও ৫০ হইতে ১০০ ফুট লম্বা অতি সূক্ষ্ম মলমলের টুক্‌রা বা পাতলা মসলিন বলিয়া তাহাতে বুটি তোলা যায়; অনুষ্ঠানের পরিচ্ছদে ও খেলাতে ইহা বুটিদার, কিন্তু মনিরত্ন খচিত হইতে পারে না। তবে সরপেষ প্রায়ই রত্ন-খচিত হয়। ইহাকে পাগড়ী ঘিরিয়া কপালের সন্নিকটে বাঁধিয়া রাখা হয় এবং ইহা পরিপাটী রূপে মুখমণ্ডলের সঙ্গে থাকে। হিন্দু রাজা সম্ভবতঃ তাঁহার পাগড়ীর উপরে একটা কালগী ও একটা সেরবন্দ পরিধান করেন, দুইটাই রত্নের কাজ-করা; সেরবন্দ পাগড়ীর সম্মুখ ভাগের উপরে চ্যাপ্টাভাবে স্থাপিত হয়।

(৭১) এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, আমরা হারেম ও হারেম-সেরাকে সর্বদাই পবিত্রস্থান (অন্তঃপুর) বলিয়া অনুবাদ করিয়াছি; ঐ স্থানগুলি অন্যের পক্ষে নিষিদ্ধ স্থান বুঝায় বলিয়া উহাদের অর্থ

ঠিক তাহাই দাঁড়ায়। কিন্তু ইহা পুনরুক্তি করা নিরর্থক নহে যে, অত্যন্ত সম্মানিত স্থান বলিয়া সরকারী টাকা প্রায়ই অন্তঃপুরে রক্ষিত হয় এবং ব্যক্তিগত টাকা এবং রাজার খাস তহবিল বরাবরই সেখানে থাকে; এমনকি অন্য লোককেও সেখানে তাহাদের টাকা রাখে।

(৭২) শাহ রাজার অর্থ যশস্বী রাজা বলিয়া কথিত আছে। যে যুদ্ধপ্রিয় রাজা আওরঙ্গযীবকে এত পরীক্ষায় আনেন ও সমৃদ্ধ সুরাট নগর লুণ্ঠন করিয়া এক কোটি টাকা হস্তগত করেন, তাহার প্রসঙ্গে আমরা এত বেশী হিন্দুয়ানী শব্দের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, এই পুস্তকে উল্লেখিত সেবায়ী, নান্তর ও রাঠোর শব্দ গোত্র বা প্রধান হিন্দু পরিবারের নাম।

(৭৩) বড় নাগপুরকে ইহার আয়তনের দরুন ও বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম শহর ছোট নাগপুর হইতে পার্থক্য করার জন্য এই নামে অভিহিত করা হয়। বড় নাগপুর কলিকাতার ৪/৫ শত ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত এবং পুনার দরবার হইতে স্বাধীন শক্তিশালী এক মারাঠা রাজ পরিবারের বাসস্থান।

(৭৪) খাসখানা চারিদেওয়ালের একটি ক্ষুদ্রকক্ষ; ইহার ছাদ তাঁবুর ন্যায় ও ইহার সমস্ত উপকরণই খাস নামক লম্বা ঘাস; এগুলির শিকড় মাটির অনেক নিম্নে চলিয়া যায় এবং তাহা হইতে একটি মনমাতানো গন্ধ নির্গত হয়। গ্রীষ্মকালে পথিকেরা যখন রাজপথে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে ও দরিদ্র শ্রমজীবী লোকেরা কুটিরে কুটিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তখন এই প্রাচীরগুলিতে অবিশ্রান্ত প্রচুর পানি ছিটান হয় বলিয়া উহাদের অসংখ্য ফাঁকা স্থান দিয়া এক সুগন্ধযুক্ত মৃদুমন্দ বায়ু নির্গত হইয়া আত্মাকে ঘুম পাড়ায়। জেনারেল কর্নাক একবার শুজাউদ্দৌলাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট পান গরমে না শীতে'? হিন্দুস্তানী রাজা

উত্তর দেন, 'কোনটিতেই নহে, আমি নিজে নিজের আবহাওয়া তৈয়ার করি।' -এই কৃত্রিম প্রাচীর মাত্র এক ইঞ্চি পুরো এবং সুতলী দিয়া বাঁধা বলিয়া ঠিক তাঁবুর ন্যায়ই গুদামজাত করা যায় ও ভাঁজ করিয়া রাখা চলে।

(৭৫) হোলী একটি হিন্দু পর্ব; তখন কেবল জুয়াখেলাই হয় না, আশ্চর্য-জনকরূপে বিনীত ও বাধ্য একটি জাতির নিকট প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, এরূপ সর্বপ্রকার হাঙ্গামা এবং বিশৃঙ্খলাও দেখা দেয়। তথাপি সময় সময় এক পক্ষে হিন্দু ও অন্য পক্ষে মুসলমানদের মধ্যে সময় বিবাদ বাঁধে; কারণ, হিন্দুদের পবিত্র দিন সৌর গণনানুযায়ী নির্দিষ্ট বলিয়া তাহার নড়চড় হয় না, কিন্তু মুসলমানদের উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান চান্দ্র বলিয়া সারা বৎসর ধরিয়া ঘুরিতে থাকে। হোলী তিন দিন স্থায়ী হয়; তৃতীয় দিনে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তাহারা উহা দাহ করে অর্থাৎ খড়ের দরজা, বিক্ষিপ্ত কাষ্ঠ ও যে কোন দাহ্য পদার্থ পায় বা ছিনাইয়া লইতে পারে, জনতা উলঙ্গ ও পরস্পরের প্রতি মুঠায় মুঠায় নিক্ষিপ্ত কর্দমাক্ত অবস্থায়, তাহাই দাহ করে। একবার মুহররম অর্থাৎ শোকের দিনে মুসলমান ও হোলী অর্থাৎ ক্রীড়া-কৌতুকের দিনে হিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে; উভয় পক্ষই (একজন ইংরেজ) দেশের সর্দার বা শাসনকর্তার নিকট দরখাস্ত করে; শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করেন, প্রতি বৎসর কোন সময় তোমাদের পর্ব পড়ে? হিন্দুরা বলে, ঠিক এই সময়। আর কখনও নয়। আর তোমাদের শোকানুষ্ঠান প্রতি বৎসর কখন ফিরিয়া আসে? মুসলমানেরা উত্তর দেয়, কখনও এক ঋতুতে, কখনও বা অন্য ঋতুতে। তখন ইংরেজ ভদ্রলোক বলেন, তাহা হইলে তোমাদের শোকই এখন আক্রমণকারী পক্ষ এবং তোমরাই অন্যায় করিয়াছ। এই উত্তরে লোকটার সুবুদ্ধির পরিচয় মিলে; বিবাদও মিটিয়া যায়।

(৭৬) ইহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে, দ্বাদশ শতাব্দীর যে বিখ্যাত প্লেগ রোগে সমগ্র এশিয়া ও সমগ্র ইউরোপ উজাড় হইয়া যায় তাহাও

আরম্ভ হয় এরূপ আর একটা পূঁতি গন্ধ হইতেঃ চীনের উত্তরে ভূ-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া তাহা সমগ্র উত্তর বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে।

(৭৭) বয়তুল কাটরা শাহজাহানাবাদ বা দিল্লী হইতে কিছু দূরবর্তী একটি বসিবার স্থান ও উদ্যানের নাম। ইহা লক্ষ্যণীয় যে, হিন্দুস্থানে সমস্ত বাগান ও উপবেশন-স্থানই সমস্ত আগন্তুকের পক্ষে অবারিত দ্বার। সেখানে প্রবেশ করিয়া নৃত্যগীত ও ভোজদ্বারা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চিত্তবিনোদন করিতে মালিকের অনুমতি লাগে না। বাগান, কৃত্রিম-পুষ্করিণী, কূপ ও চৌবাচ্চা বরাবরই ধার্মিক পুতঃকার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৭৮) সেরা বা সরাই পথিকদের বসার জন্য প্রস্তর, ইষ্টক বা খড়ের তৈরী পান্থশালা; এগুলির নিকটে অনেক গ্রাম ও শহর নির্মিত হয়।

(৭৯) কেহ কোন অভিযান বা সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে এই সকল ক্রিয়া-পদ্ধতি চির-প্রচলিত প্রথা।

(৮০) মগফুর শব্দ অর্থাৎ ক্ষমাপ্রাপ্ত। শব্দটি সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়; ইহার অর্থ মৃত। আলী তেবার অর্থ বিখ্যাত জাতি ও সৌভাগ্যবান।

(৮১) কৃপাপুরী নিশ্চিতই কোন হিন্দু নাম; তিনি ছিলেন অবশ্যই কোন হিন্দু রাজকন্যা, কিন্তু অন্যান্যের ন্যায় মুসলমান নাম গ্রহণ করেন নাই; অথবা তিনি ছিলেন হারেমে গৃহীত কোন নর্তকী।

(৮২) তাঁহার উপাধি ছিল মুআতামেনুল মুল্‌ক শুজাহ্‌উদ্দৌলা শুজাহ্‌ উদ্দীন মুহম্মদ খাঁ বাহাদুর আসাদজঙ্গ, অর্থাৎ রাজ্যের বিশ্বস্ত, সাম্রাজ্যের সাহসী, বীর। যুদ্ধে সিংহ সদৃশ শুজাহউদ্দীন মুহম্মদ খাঁ।

(৮৩) খুরাসান বা ইরান বা পারস্যের পূর্বাঞ্চল ও তাব্রীজ হইতে মেশহেদ পর্যন্ত ঐ সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চল তুর্ক গোত্রগুলিতে পরিপূর্ণ; তাহারা প্রধানতঃ তাঁবুতে বাস করে এবং সৈন্য, মেষপালক ও কৃষক ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করে না বলিলেই হয়। এই সকল সৈন্যই পারসিক বাহিনী পূর্ণ করে। কারণ, বাহ্‌তিয়ারী বা বাহত্রিয়ান প্রভৃতি কয়েকটি পারসিক গোত্র চমৎকার সৈনিক হইলেও মূল পারসিক দিগকে হিসাবে ধরা হয় না; তাহাদিগকে উপহাস করিয়া

তাত, তাআত বা ব্যবসায়ী ও তাজিক বা পুরবাসী বলা হয়। বাহতিয়ারীদের সকলেই গিরিবাসী হইলেও প্রত্যেকেই অশ্বারোহী। করিম খাঁ ছিলেন বাহতিয়ারী বা লোরী, কিন্তু নাদির শাহ্ আফশার।

(৮৪) নাজিম প্রদেশের শাসনকর্তা; তিনি সামরিক লোক; সৈন্য চালনা, দুর্গের শাসন ও বিচার-বিতরণ, পরিদর্শন তাঁহার কর্তব্য। দিওয়ান রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক, কতকটা ফ্রান্সের ইণ্টেণ্ড্যাণ্টের অনুরূপ, কিন্তু নাজিম হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, বরং নাজিমের উপর প্রতিবন্ধক। কিন্তু শাসনকর্তা এই উভয় পদের মালিক হইলে তাঁহাকে সুবাদার বা রাজ-প্রতিনিধি বলে।

(৮৫) যীনাতুন্নিসার অর্থ নারী জাতির ভূষণ; তুর্ক ও তাতার বা তার্তা-রেরা বেগমকে বিয়েম উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহা তুর্কী ভাষা হইতে উদ্ভূত উপাধি ও বেগ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ; বেগ তাতারী তুরস্কে রাজপুত বুঝাইলেও পারস্যে ও ভারতে মোগল অশ্বারোহী সৈনিক ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। রমণীর প্রতি স্বামীর আসক্তি সম্বন্ধে কুখ্যাতি আছে যে, তিনি একত্রে চারি ঘণ্টাও নারী ছাড়া থাকিতে পারিতেন না। পূর্ণ দরবারে এবং বাস্তবিকপক্ষে রাজকার্যে বা বিচার কার্যে নিয়োজিত থাকার সময়ও তিনি আর এক কোঠায় গমন করিয়া পূর্ণ অর্ধঘণ্টা কাটাইয়া ফিরিয়া আসিতেন; তাঁহার এবম্বিধ অনুপস্থিতির কৈফিয়তও কম অদ্ভুত নহে। তিনি বলিতেন, "ভদ্রমহোদয় পৃথিবীতে আমি সর্বাপেক্ষা ক্ষুধার্ত ও সর্বাপেক্ষা অবাধ্য টাট্টু দ্বারা অভিশপ্ত; ইহা আমাকে দানার জন্য অবিরত জ্বালাতন করিয়া থাকে।"

(৮৬) এই সমুদয় শব্দ আলী প্রদত্ত বা তাঁহার দান—খাঁ বা প্রভু বুঝায়; বর্দি ও তুর্কি শব্দ, অর্থ তিনি দেন আর খাঁ অর্থ প্রভু বা রাজ-পুত্র, মুহম্মদ ও আলী দুইটাই আরবী।

(৮৭) চেহেল সেতুন অর্থ ৪০টি স্তম্ভ। প্রস্তর গম্বুজসহ এই অট্টালিকাটি ৪০টি প্রস্তরস্তম্ভের উপর স্থাপিত ও চতুর্দিকে উন্মুক্ত। লোকে

যাহাকে এখন সিরাজুদ্দৌলার প্রাসাদ বলে, উহা তাহার ভিত্তির উপর অবস্থিত ছিল, বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব নাই।

(৮৮) লোহার বিরাট দামামা বা ভেরী।

(৮৯) বখ্‌শী প্রায়ই মেজর জেনারেল বা সহকারী সেনাপতির পদে কাজ করিতেন। এমনকি দিল্লীতেও তিনি ছিলেন বাদশাহী সৈন্যদলের দ্বিতীয় সেনাপতি ও সিপাহ্‌সালার বা প্রধান সেনাপতি।

(৯০) রায় রায়ান উপাধি কেবল হিন্দুদিগকেই প্রদত্ত হইত; ইঁহার অর্থ উপদেষ্টার উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টা।

(৯১) এইরূপ পাল্কির ঝালর (কারণ, সমস্ত পাল্কিতেই একটা ঝালর থাকে) জালের কাজের আকারে নির্মিত হয়। পতাকাটি বৃহৎ এবং বরাবরই হাতীর উপরে বাহিত হয় ও দৈর্ঘের মাঝামাঝি স্থানে লম্বালম্বিভাবে কাটা থাকে। দামামা পেটা লোহায় নির্মিত হয় ও বিলাতী ভেরীর দ্বিগুণ বৃহৎ।

(৯২) এই অভিষেক হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেকে জাফর খাঁর শাসনকর্তৃত্ব ও সম্পত্তির প্রকৃত ও একমাত্র উত্তরাধিকারিণী বলিয়া মনে করিতেন; তাঁহার স্বামী এবং অন্যান্যেরও তাহাই ছিল মত। ভারতবর্ষ বা প্রাচ্যের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই, শাসন কার্যে রমণীর নেতৃত্ব গ্রহণও অসাধারণ নহে। নাবালক তুর্ক সম্রাটের জননী উচ্চ কর্মচারীদের একত্রিত করিয়া পর্দার ভিতর হইতে তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাহাদিগকে তাঁহাদের কর্তব্যে পরিশ্রমী ও তাঁহার পুত্রের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে উপদেশ দেন; পুত্রকে তিনি তাঁহার 'বাচ্চা সিংহ' বলিয়া অভিহিত করেন।

(৯৩) তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন আমীনা বেগম; স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার গুপ্তপ্রণয় ও সাহসিকতার জন্য মুর্শিদাবাদে বিখ্যাত হন। এই মির্জা মুহম্মদ ও বাদশাহ্ কুলী খাঁ ওরফে সিরাজুদ্দৌলাহ্ একই ব্যক্তি। পাঠক বিস্ময় ও আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করিবেন, যে শিশুর শুভজন্মের প্রতি তাঁহার পরিবারের উপর স্তূপীকৃত সমস্ত সম্মান আরোপিত হয়, পৃথিবীতে যাহার আগমনে তাহার পরিবার

রাজ্য ও রাজত্বের দিকে প্রথম পদনিক্ষেপ করে, ঠিক তাঁহারই হাতে ঐ পরিবার ও উহার রাজত্ব দুইই চিরতরে খতম হইয়া যায়।

(৯৪) ইংরেজ পাঠকের জন্য স্থান পরিবর্তন কথাটার ব্যাখ্যা দরকার। সমস্ত হিন্দুস্তানীই গণকের ভবিষ্যৎবাণীতে এবং শুভ ও অশুভ দিনে এবং আর এক প্রকারের ভবিষ্যৎ কথন ইস্তেখারাতে অত্যন্ত ভক্ত বলিয়া নক্ষত্রাদি দ্বারা সঠিকভাবে নির্ধারিত সময় ভিন্ন উর্ধ্বতম হইতে নিম্নতম পর্যন্ত কেহ এক পদও নড়িবে না ; যাত্রার মুহূর্ত উপস্থিত হইলে তাহারা গৃহত্যাগ করিয়া এমনকি মাত্র ২০০ গজ দূরে হইলেও রাস্তার উপর অন্য কোন স্থানে গমন করে ; কাজেই সফর ঐ নির্ধারিত সময়ে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৯৫) চারবাগের নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা রাজধানীর নিকটে চারিটি বাগানের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান ; ইরানের অন্তর্গত ইস্পাহানের নিকটস্থ চারবাগ নামক একটা মনোরম স্থানের অনুকরণে দিল্লীর নিকট ইহা নির্মাণ করা হয়।

(৯৬) হিন্দুস্তানী অশ্বারোহীদের কেবল খাদ্য, কাপড়-চোপড়, অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসজ্জা নহে, অশ্বও যোগাইতে হয়। বন্দুকের গোলাগুলির সম্মুখীন হইতে তাহাদের পশ্চাৎপদতার ইহাই প্রধান কারণ।

(৯৭) আরাফাতের দিন বরাবরই জিলহজ্জ মাসের নবম দিন ; সেদিন মক্কা হইতে হাজীরা কুরবানী করার জন্য ঐ পাহাড়ে গমন করে বলিয়া উহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। কুরবানী হয়—সর্বদাই দশম দিনে। আদম ও হাওয়া (আঃ) কয়েকশত বৎসর বিচ্ছিন্ন থাকার পরে পুনরায় ঐ স্থানে একত্র হইয়া পরস্পরকে চিনিতে পারে বলিয়া খোদ পর্বতটির এই নাম।

(৯৮) ভাণকারী শিয়া হিসাবে আমীর খাঁ শুধু বার ইমাম বা হোসেনের বংশোদ্ভূত প্রধান ধর্মাচার্য স্বীকার করিতেন ; তাঁহাদের ধর্মনীতি অনুযায়ী যে কেহ অন্য কোন ইমাম মান্য করিলে, সে ধর্মভ্রষ্ট ও হত্যার যোগ্য।

(৯৯) অন্যান্য জাতির চেয়ে ভারতীয়েরা অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে কমপটু কিনা, তাহা নিতান্ত সন্দেহজনক; প্রকৃতি তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী হওয়ার উপযুক্ত করিয়াছে; প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় ও মোগলদের চেয়ে অনেক দীর্ঘতর জাঙ্ঘা ও দীর্ঘতর পদ থাকায় তাহারা বরাবরই ভাল অশ্বারোহী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

(১০০) প্রায় ১৫০ মাইল।

(১০১) প্রাচ্যের সর্বত্র এত অধিক আদৃত ফলকগুলি যা ইস্পাতে নির্মিত তাহা তরঙ্গময় দেখায়, কাজেই এইরূপ কোন তরবারিতে যদি ঐ সকল তরঙ্গ খুব ঘন ও পুষ্ট থাকে তবে তাহাকে আবদার বা জলময় এবং খোদ তরঙ্গগুলিকে আব অষ্টনী পানি বলে। কাজেই যিনি পারসিক ও হিন্দুস্তানী তরবারি দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এত অধিক পরোক্ষ উল্লেখ ও রূপক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

(১০২) সুলায়মানের অন্য মন্ত্রী; আসফের পরিবর্তে যে বিজ্ঞ মন্ত্রী বসেন।

(১০৩) পেণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা ডুপ্লের সহায়তায় কয়েকজন অসন্তুষ্ট ব্যক্তি যে রাজাকে তাঁহার নিজ শিবিরে গুপ্ত হত্যা করেন, তিনিই নাসির জঙ্গ।

(১০৪) এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে পাঠকদিগকে জানাইতে হইবে যে, জায়গীর হইতেছে নিকর বা নাম মাত্র খাজানায় অথবা কোন প্রত্যাশিত খেদমতের জন্য প্রদত্ত জমি। দাতার খুশীমত এই দান রদ করা চলে। কিন্তু তালুক লাভকারীর অর্থে ক্রীত বা নির্ধারিত খাজানায় প্রাপ্য হিসাবে তাহার রক্ষিত ভূখণ্ড; পক্ষান্তরে জমিদারী বরাবরই মালিক হয়, ইহা প্রায়ই বংশানুক্রমিক, কিন্তু সর্বদা নহে। আলতেমগার বাতিলের অযোগ্য জায়গীর এবং কাজে কাজেই খয়রাতি জমির বিবরণের ভিতরে পড়ে।

(১০৫) কোন সায়িদের হস্তে কাহারও নিহত হওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়, এই ধারণা ভারতে অজ্ঞাত বলিলেই হয়। কিন্তু ১২০০ বৎসর অতীত হওয়ার পরেও এমনকি মক্কা, মদীনা ও তায়েফের উষ্ট্র চালকদের মধ্যেও ইহা এত বদ্ধমূল যে, তাহাদের উটের পিঠে

পর্যটকদের মাল উঠাইতে-নামাইতে চুরি করিতে ধরা পড়িলে তাঁহাকে ঠিক এই কথাগুলি বলিয়া কখনও ভৎর্সনা করিতে ছাড়ে না ঃ তুমি কিসের জন্ম অভিযোগ করিতেছ, আমি কি তোমার মালিক ও মনীব নহি ; এরূপ দাবী লইয়া বিবাদ বাঁধিলে প্রথমে পড়িবে আঘাত, তৎপরে ছোরা বা ছুরির ঘা।

(১০৬) হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর অন্যতম চাচা আবু সুফিয়ান নিজেকে বরাবর তাঁহার প্রবল শত্রু বলিয়া প্রমাণিত করেন। কিন্তু ধর্মান্ধ ও শিশু-সুলভ শিয়া গ্রন্থকারের চক্ষে তাঁহার আর এক দোষ ছিল—তিনি ছিলেন মুয়াবিয়ার পিতা ; ইনি খেলাফতে আলীর (রাঃ) দাবী নসাৎ করেন এবং তাঁহার বাসস্থান দিমাশ্ক হইতে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করার জন্ম এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন।

১০৭) ভারতের মুসলমানেরা নিজেদের চারিটি কওমে বিভক্ত করে ; মোগল বা বৈদেশিক সাদা আদমী –ইহাদের রাজার জাতি বলা হয় ; পাঠান বা আফগান বা সৈনিক জাতি ; শেখ বা বিদ্বান ব্যক্তি ; এই শেষোক্ত লোকগুলি হয় নবদীক্ষিত হিন্দু নতুবা আরব-দের বংশধর ; শেখজাদা শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝায়। সায়্যিদ বা হয-রতের বংশধর বলিয়া দাবীদারেরা একটা পবিত্র জাতি। জগতের আর কোন দেশেই সায়্যিদ উপাধি এত অধিক মর্যাদা প্রাপ্ত হয় না বা এত অধিক সম্মানিত নহে।

(১০৮) হযরত মুহম্মদ (দঃ)। গ্রন্থাকারের গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা এই গল্পের আদ্যান্ত বিচিত্র বর্ণে প্রকটিত হয়। যিনি এ যাবত তাঁহাকে শান্তিতে বাস করিতে দেন, সেই প্রতিষ্ঠিত বাদশাহের বিরুদ্ধে একজন বেসরকারী লোকের বিদ্রোহ-পতাকা উত্তোলনে ও সশস্ত্র যুদ্ধে তিনি পূর্বাপর কোন দোষ দেখিতে পান না ; অথচ ঐ লোকটীর দল জয়ী হইলে তিনি নিঃসন্দেহে বাদশাহের অনুচরদের জায়গীরাদি প্রত্যাহার ও বাজেয়াপ্ত করিতেন।

(১০৯) সায়্যিদানী অর্থ সায়্যিদ রমণী। তাহারা পাত্রান্তর গ্রহণে নারাজ; তবে অন্যান্য বিষয়ে তাহারা নিশ্চিতই যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করে। এতদসত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাহারা এত বাড়াবাড়ি করে যে, স্বামী-হারা হওয়ার পরে তাহাদের কেহ উপবাসে মৃত্যুবরণ করে কেহ বা বিষ পান করে।

চতুর্থ অধ্যায়

[খান দুরান কাবুল সীমান্তের সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটগুলি উপেক্ষা করায় নাদির শাহের পক্ষে হিন্দুস্তান আক্রমণ সহজসাধ্য হয়—ভারতীয়েরা কান্দাহারের আফগানদিগকে সাহায্য ও আশ্রয় দান করে—ইরানের দরবার হইতে দিল্লীর দরবারে কয়েকটি নিষ্ফল দৌত্য ও অভিযোগ প্রেরিত—নাদির শাহ কর্তৃক দিল্লীতে আর একটা দৌত্য ও তৎপরে দশজন সংবাদবাহক প্রেরণ—কাবুল নাদির শাহের নিকট আত্মসমর্পণ করে—জালালাবাদের লোকেরা তাঁহার দশজন সংবাদবাহককে হত্যা করে—নাদির শাহ জালালাবাদ লুণ্ঠন করেন—কাবুলের সুবাদার নাসির খাঁ পরাজিত ও বন্দীকৃত—পরাজিত হইয়া লাহোরের সুবাদার জাকারিয়া খাঁর আত্মসমর্পণ—শত্রুকে বাধা দানে মুহম্মদ শাহের যাত্রা, কিন্তু অত্যন্ত মন্থরগতিতে—ভারতীয় বাহিনীর বিস্ময়কর অলসতা—কাবুলের চূড়ান্ত যুদ্ধ—ইরানীদের হস্তে খান দুরান নিহত ও সাদৎ খাঁ বন্দী—দুই কোটী টাকা পাইলে নাদির শাহের স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনে সম্মতি, কিন্তু দরবারী ষড়যন্ত্রের ফলে এই সন্ধি বিপর্যস্ত—মুহম্মদ শাহ ইরানী শিবিরে আহূত ও ধৃত—হিন্দুস্তানী সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়—ইরানীদের নগরে প্রবেশ—নাদির শাহের মৃত্যু সংবাদে ইরানীরা আক্রান্ত ও নিহত—ক্রুদ্ধ নাদির শাহ কর্তৃক সাধারণ হত্যাকাণ্ডের আদেশ—হিন্দুস্তানের কয়েকটি জনপদ আত্মসাৎ করিয়া ইহার মুকুট ইহার মালিককে প্রত্যর্পণ—ঐ বিজেতার প্রস্থানের পরে মুহম্মদ শাহ কর্তৃক শাসনকার্য হইতে ইরানীদলকে বিতাড়ণের ইচ্ছা—যে প্রিয়পাত্রকে তিনি তাহাদের ধ্বংসের উপর উন্নীত করিতে চাহেন, তাঁহারই দ্বারা এরূপ কার্য হইতে নিবৃত্তি।

বাঙ্গালার সুবাদার শুজাহ্ খাঁর প্রশংসনীয় চরিত্র—তৎপুত্র সর্‌ফরাজ খাঁ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন—অচিরে আলীবর্দী খাঁ তাঁহাকে বেদখল

দেন—সৈন্যদের নিকট বক্তৃতা দিয়া তাহাদের নিকট তাঁহার সঙ্কল্প প্রকাশ—কৌশলে বাঙ্গালার প্রবেশের গিরি-সঙ্কট অধিকার—তাঁহার কৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যবস্থা—ঘেরিয়ার যুদ্ধে সর-ফরাজ খাঁ নিহত—গওস খাঁ ও তাঁহার দুই পুত্রের বীরত্বব্যঞ্জক মৃত্যু—আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক মুর্শিদাবাদ অধিকার—মৃত নওয়াবের মাতার নিকট তাঁহার অনুপম বক্তৃতা—নূতন সুবাদারের প্রশংসনীয় চরিত্র।]

ইতোমধ্যে খান দুরানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সর্বোচ্চ সীমায় পেঁৗছিল। কিন্তু তাঁহার মনে এমন অদ্ভুত একগুঁয়েমী গড়িয়া উঠে, অথবা স্বভাবতঃই তিনি এত অধিক দুর্ভাগা ছিলেন যে, যাহাতে তিনি হাত দিতেন বা মতলব আঁটিতেন, তাহাতেই অকৃতকার্য হইতেন বা তাহা হইতে কোন ক্ষতি হইত এবং যখনই তিনি কোন কার্য করিতেন পরক্ষণেই তৎসম্বন্ধে বরাবরই তাঁহার অনুতাপের কারণ জুটিত। এমনি ছিল পূর্বের পাতাগুলিতে উল্লিখিত মারাঠাদের সহিত তাঁহার সন্ধি। একটা পরিমাণ হইতে ইহা একটা নমুনা ও একটা স্তূপ হইতে ইহা এক মুষ্টি বলিয়া বুঝিতে হইবে। কাবুলে প্রেরিত সরকারী টাকার দফায় প্রদত্ত তাঁহার পরোক্ষ সম্মতি ঐ প্রদেশের সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটগুলি ও দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথগুলি পাহারা দানে তাঁহার উপেক্ষা এবং পর্বতসঙ্কুল প্রদেশের প্রবেশ পথগুলির পাহারা দানে নিযুক্ত সৈন্যদের অভিযোগের প্রতি তাঁহার সামান্য মনোযোগ ঐ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তিনি যদি ঐ সকল কঠিন গিরিসঙ্কটের পাহারায় নিযুক্ত গিরিবাসীদিগকে অর্থদানে মনোযোগী হইতেন এবং ঐ প্রদেশটি রক্ষার জন্য যদি তিনি অবস্থানুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন, তবে সম্ভবতঃ নাদির শাহ্ হিন্দুস্তান আক্রমণের কথা চিন্তা করিতেন না, করিলেও তাঁহার সাথে যে সকল অপ্রত্যাশিত সুযোগ লাভে তাঁহার যাত্রা এত অধিক ত্বরান্বিত হয়, তাহা পাইতেন না। ঐ গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের শাসনকর্তা নাসির খাঁ ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি; তাঁহার সমস্ত সময় কাটিত শিকারে বা উপাসনায় ও কুরআন পাঠে; ঐ অঞ্চলের প্রহরী ও দুর্গরক্ষী সৈন্যদের বৃত্তি বাবতে বৎসরে ১২ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইত; খান দুরান অনর্থক তাহা বন্ধ করিলে

তিনি কখনও তাঁহার নিকট সামান্য মাত্র আবেদনও করেন নাই। কাজেই শাসনকর্তা ও মন্ত্রী উভয়েই ঐ প্রদেশের উপত্যকা ও সঙ্কীর্ণ লম্বা পথগুলি পাহারাশূন্য রাখিয়া দেন; শাসনকর্তা তৎপ্রতি মনোযোগ দেন নাই, মন্ত্রী সেগুলিকে লইয়া মাথা ঘামাইবার মত এত অধিক জরুরী মনে করেন নাই। কাজেই প্রহরীরা স্বল্প বেতন পাওয়ায় তাহাদের স্থান ত্যাগ করিল; দুর্গরক্ষী সৈন্যেরা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া আক্রমণকারীদের ডাকিয়া আনিল। মন্ত্রীর অমনোযোগিতা ও সরকারের দুর্বলতার সংবাদ লোকমুখে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ায় শাসন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভয়শূন্য হইয়া ও পরিণাম চিন্তা না করিয়া সকলেই শুধু নিজের তরক্কীর চিন্তা করিত। রাস্তা ও গিরিসঙ্কটগুলি উপেক্ষিত হওয়ায় প্রত্যেকেই অলক্ষ্যে যাতায়াত করিত; দরবারে কোন ঘটনার সংবাদ প্রেরিত হইত না। ঐ প্রকারের কোন সংবাদ কখনও তাঁহাদের কর্ণগোচর হইত না কেন, বাদশাহ্ বা মন্ত্রী কেহই তাহা কখনও জিজ্ঞাসাও করিতেন না। কিন্তু এই উপেক্ষার পরে আর একটা উপেক্ষা সংঘটিত হইল, তাহার পরিণাম হইল আরও সর্বনাশী।

ইহা একটা বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, বিখ্যাত সফাভী[১] বংশের রাজাদের কখনও হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌দের নিকট কোন উপকারের জন্য আবেদন করার সামান্যতম উপলক্ষও হয় নাই। বরং হিন্দুস্তানের বাদশাহ্ সুলতান বাবর ও সুলতান হুমায়ুন অমর শাহ্ ইসমাঈল ও তাঁহার ধার্মিক পুত্র (বিহিশ্‌তে স্থান লাভের যোগ্য সেই মূল্যবান রত্ন) শাহ্ তহ-মাসপের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা ঐ সকল রাজাকে লালন-পালন করেন ও তাঁহাদিগকে তাঁহাদের রাজ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন। তথাপি ইহা সঠিক ও কুখ্যাত যে, কখনও কোন গরজ বা নিজস্ব কোন মতলবের জন্য দরকার না হইলেও সফাভী বংশের বাদশাহেরা দৌত্য ও অভিনন্দনের মারফতে হিন্দুস্তানের বাদশাহদের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সম্পর্ক রাখিতেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের মিত্রতা ও সৌজন্যের পরিচয় দিতেন। তথাপি মুহম্মদ শাহের আমলে শাহজাহানাবাদের দরবার এত অশিষ্ট এবং ঐ সমুদয় সদ্ভাব ও মিত্রতার নিদর্শন সম্পর্কে এত অমনোযোগী ছিল যে, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বোধশূন্য এমনকি বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বনকারী বলিয়া

মনে হইত। ইরান সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ থামিয়া গেলে এবং আফগান আক্রমণকারীদের সেখান হইতে বিতাড়িত করিয়া দ্বিতীয় শাহ্ তহমাসপ তদীয় পূর্ব পুরুষদের সিংহাসনে উপবেশন করিলে মুহম্মদ শাহ কোন অভিনন্দন বা মনোযোগের অপর কোন নিদর্শন দ্বারা ঐ ব্যাপারে কোন যথোপযুক্ত যত্ন গ্রহণ দূরের কথা, বরং আফগান মীর ওয়ারেসের সহিত বন্ধুজনোচিত ভাবে পত্র লেখালেখি করিয়া তদ্দারা সংবাদ ও পত্রের দ্বার উন্মুক্ত করেন। অথচ মীর ওয়ারেসের পরিবার যে অল্পকাল কান্দাহারের দখলে ছিল, তখন তাঁহার পুত্র মুলতান আক্রমণ করিয়া ঐ প্রদেশের প্রত্যেকটি বস্তু অগ্নি ও তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। ইহা কম সঠিক নহে যে, তাঁহার রাজধানী ইস্পাহান অধিকার ও আফগানশক্তি বিনষ্ট করার পর শাহ তহমাসপ এই সকল ঘটনার একটা বিবরণপত্র সহ তাঁহার জনৈক আমীরকে হিন্দুস্তানী দরবারে প্রেরণ করেন। পত্রে অভিযোগ করা হয় যে, ঐ সকল অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক পাহাড়িয়াদের জন্য তাহাদের যথাযোগ্য শায়েস্তা হওয়ার পর ইরানী সৈন্যদের ধ্বংসকারী হস্তের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তান সাম্রাজ্য ভিন্ন জগতে আর কোন আশ্রয় অবশিষ্ট নাই। কাজেই হিন্দুস্তানী দরবারের পক্ষে বিজ্ঞোচিত কাজ হইবে ঐ সকল দুষ্ট লোককে তাঁহাদের রাজ্য মধ্যে স্থান দানে অস্বীকৃত হওয়া। কিন্তু এই পত্র বা দৌত্য কাহারও প্রতি কেহ কোন খেয়াল করিল না; বহুদিন পরে একই দূতের মারফতে কেবল একটা দ্বার্থতামূলক তুচ্ছ উত্তর প্রদত্ত হইল। শাহজাদা আব্বাস মির্জা ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করিলে ঐ দরবার হইতে হিন্দুস্তানে আর একটা অনুরূপ দৌত্য ও আর একটি অনুরূপ অনুরোধ প্রেরিত হইল। বহুদিন পরে এই মন্ত্রীকেও পূর্বের পত্রের ন্যায় একখানা পত্রসহ বিদায় দেওয়া হইল। এই বাগাড়ম্বরপূর্ণ পত্রে আসল কথা কিছুই ছিল না। নাদির শাহ্ সিংহাসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে একই স্থান হইতে পুনরায় আর একজন দূত আসিলেন; একজন প্রতিষ্ঠাবান কাজলবাশ[১] এই দৌত্য লইয়া আসেন। কিন্তু রাজদূত রাস্তায় দস্যু-হস্তে লুণ্ঠিত হন; বহু কষ্টে এবং অনেক অনুরোধের পরে তিনি তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার পরিচয়-পত্রগুলি ফেরত পান। ঐগুলির

একটি ছিল তদানীন্তন হিন্দুস্তানের অন্যতম সর্বাপেক্ষা গণ্যমান্য আমীর সাদৎ খাঁর নামে একখানা পত্র ও আর একখানা মুহম্মদ শাহের নামে। সর্বপ্রকার কল্পনাযোগ্য কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি রাজধানী পর্যন্ত তাঁহার সফর সম্পন্ন করিয়া তাঁহার সংবাদ ও পত্র প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গতি ছিল না। মুহম্মদ শাহ্ বা তাঁহার মন্ত্রীদের কেহই তাঁহার দুর্দশার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। ইরান হইতে এত বেশী দূত ও এত বেশী সংবাদ প্রেরিত হয় কেন, এই চিন্তায়ই তাঁহারা সম্পূর্ণ মগ্ন ছিলেন। কিন্তু হুসায়ন খাঁ নামক জনৈক আফগান কান্দাহার দখলে আনিয়া রাজমুকুট মাথায় পরিয়া সেখান হইতে হিন্দুস্তানের অন্যতম প্রদেশ মুলতান আক্রমণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহারা জড়বৎ হইলে একজন প্রাচীন সেনাপতির যোগ্যতা কাজে লাগাই-বার অভিপ্রায়ে দাক্ষিণাত্য হইতে নিজামুল মুল্‌ককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি দ্বিগ্বিজয়ী আওরঙ্গযীবের অধীনে কৃতিত্বের সহিত চাকরী করেন। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা দেখিয়াছেন, এরূপ নেকড়ে বাঘ বলিয়া বিবেচিত হইতেন; জগতের চালচলন সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন এবং দিবারাত্রির পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেও তাঁহারা তাঁহাকে দরবারে রাখিয়া দিলেন; কোন অবাঞ্ছিত জরুরী পরি-স্থিতি দেখা দিলে উহারা তাঁহার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিতে মনস্থ করেন। কারণ প্রায় এই সময় নাদির শাহ্ কান্দাহার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া উহা অবরোধ করেন; সেখান হইতে তিনি পূর্বসংবাদের পুনরুক্তি ও পূর্বের বিষয় সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া পুনরায় তুর্কম্যান মুহম্মদ খাঁকে প্রেরণ করেন। দূত রাজধানিতে পৌঁছিয়া তাঁহার পত্র ও সংবাদ প্রেরণ করিলে তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলা হইল; তিনি তাঁহার গমনের জন্য জিদ ধরিলেও কোন স্পষ্ট উত্তর পাইলেন না। তাঁহারা এমনকি আফগান দূতের প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত করাকে একটি উত্তম রাজনীতি বলিয়া মনে করিলেন। আফগান হুসায়ন খাঁ কান্দাহারের সম্মুখে নাদির শাহের সৈন্যদল পর্যুদস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ শক্তিহীন করার মত এত অধিক দুর্বল করেন কিনা, তাঁহারা তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন;

কারণ, তাহা হইলে আদৌ কোন উত্তর দানেরই দরকার হইবে না। ইতোমধ্যে কান্দাহার আক্রমণ এক দীর্ঘ অবরোধে পরিণত হইল; তথাপি মুহম্মদ খাঁ তাঁহার হাজিরা না দেওয়ায় নাদির শাহ্ তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়া কয়েকজন অশ্বারোহীর মারফতে তাহা প্রেরণ করিলেন। পত্রে এত অধিক বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা এবং যত্নপরতা ও উত্তরসহ দ্রুত প্রত্যাবর্তনের উপদেশ দান করা হইল। কিন্তু এ সমুদয় সত্বেও তাঁহার যাত্রা ত্বরান্বিত হইল না, নানা ছলে তাঁহাকে আটকাইয়া রাখা হইল। তিনি কিছুতেই কোন উত্তর লাভে সমর্থ হইলেন না। কান্দাহার অবরোধ দীর্ঘ হইয়া উঠায় নাদির শাহ্ উহার বিপরীত দিকে একটা শহর নির্মাণের আদেশ দান করিলেন। তিনি উহার নাম দিলেন নাদিরাবাদ। সেখান হইতে নূতনভাবে অবরোধ ও আক্রমণ পরিচালিত হইল; অবশেষে একদল কাজলবাশ মই লাগাইয়া প্রাচীরে উঠিয়া আফগানদিগকে সর্বত্র তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিল এবং হুসায়ন খাঁসহ দুর্গ দখলে আনিল। হুসায়ন খাঁ তাঁহার দিন শেষ করার জন্যে মাজেন্দোরালে[৩] প্রেরিত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে কয়েদ রাখা হইল।

এখানে বলা দরকার যে, ইরানের অন্তর্গত শিরাজে আফগানদের গুরুতর পরাজয়ের পর হইতে তাহারা রাজা ও রাজ্যশূন্য লইয়া ভবঘুরে জীবন-যাপন করিতেছিল; শত্রুদের ভয়ানক চাপে পড়িয়া তাহাদের অধিকাংশই হিন্দুস্থানের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। সেখানে কোন কোন স্থানে তাহারা কৃষি-কার্য, অন্যত্র সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিল; ঐ সাম্রাজ্যের কয়েকটি প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়া তাহারা অন্যান্য প্রজার সহিত মিশিয়া গেল। রোহিলা বলিয়া অভিহিত আলী মুহম্মদ খাঁ ছিলেন তাহাদের অন্যতম। সয়ফুদ্দীন আলী খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি আজিমুল্লাহ খাঁর একটি বিশেষ খেদমত করিয়া উজীর কমরুদ্দীন খাঁর সুনজরে পড়েন ও তাঁহার অনুগ্রহভাজন হন। তিনি তাঁহাকে খালিসা দফতরের অধীনে কিছু নিষ্কর জমি ও কিছু জায়গীর দান করেন। এই লোকটা শুধু একজন আফগানের দত্তক পুত্র ও মূলতঃ একজন হিন্দু আহীর বা মেষপালক হইলেও কোন উপায়ে নিজেকে সাহসী ও যোগ্যতা-সম্পন্ন লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন। যে সকল আফগান দলে

দলে কান্দাহার হইতে অবিশ্রান্ত পালাইয়া আসিত, তাহাদিগকে নিজের অধীনে চাকরী দিয়া ও নিজের পাশে সমবেত করিয়া তিনি তাহাদের দ্বারা একটি সৈন্যদল গঠন করেন এবং তাহাদের সাহায্যে অনোলাহ, সম্বল, মুরাদাবাদ, বাদায়ুন, বেরিলী প্রভৃতি তাঁহার জায়গিরী জমির সংলগ্ন জনপদ দখলে আনিয়া সেখানে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, আফগানদের ভারতে প্রবেশ নিরোধের উদ্দেশ্যে কাবুল পথ বন্ধ করার জন্য মুহম্মদ শাহের নিকট যে প্রস্তাব করা হয়, তাহা ছিল কার্যতঃ তাঁহার সাধ্যের বাহিরে। ঐ অঞ্চলের দুর্গরক্ষী সৈন্যেরা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও রাজধানী হইতে প্রথানুযায়ী প্রেরিত টাকা বন্ধ হওয়ায় এবং দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথ ও গিরিসঙ্কটের প্রহরীরা বেতন না পাওয়ায় ও খোদ শাসনকর্তা লাহোরে বাস করিয়া তৃপ্ত থাকায় এমন লোক কোথায় ছিল যে, ঐ সকল পদাতিক দস্যু ও যে সকল আফগান দস্যু সদলবলে অবিশ্রান্ত যাতায়াত করিতেছিল, তাহাদের প্রতি খেয়াল রাখিবে? যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, কাহারও এরূপ ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলেও এরূপ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করিবার মত শক্তি কোথায়? নাদির শাহের ন্যায় এরূপ একজন লোক বহু বৎসর ধরিয়া পাশে থাকিতে যে যাত্রীদল কখনও তাঁহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই, তাঁহারা যে অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবেন, অথবা নাদির শাহের অভিমত ও পরিকল্পনা সম্পর্কে এত উপেক্ষা-পরায়ণ থাকিবার পর কিছু আফগান দস্যুর গতিরোধ সম্পর্কে চিন্তা করিবেন, তাহা কিরূপে সম্ভব?

এখন আবার নাদির শাহের কথায় প্রত্যাবর্তন করা যাউক। কান্দাহার হস্তগত করার পর ঐ রাজা দুর্গটি বিধ্বস্ত করিয়া উহার অধিবাসীদিগকে নাদিরাবাদে স্থানান্তরিত করার আদেশ দান করিলেন। সেখান হইতে তিনি গজনী ও কাবুলের দিকে যাত্রা করিলেন। সেখানে যাইবার পথে তিনি শেষোক্ত স্থানের কোতওয়ালকে[৪] এই সংবাদ পাঠাইলেন: "জানিয়া রাখ যে, মুহম্মদ শাহের রাজ্যের সহিত আমার কোনই কাজ নাই; কিন্তু এই সীমান্তগুলি আফগানদের অনন্ত খনি বলিয়া এবং ঐ পলাতকদের কিছু লোক তাঁহার ও তোমার সহিত যোগদান করিয়াছে বিধায় আমি শুধু ঐ দুষ্ট জাতিকে বিনষ্ট করিতে চাই; কাজেই তোমার জন্য কোন চিন্তা বা ভয় না করিয়া

আমাকে তোমার মেহমানরূপে গ্রহণের জন্য সব কিছু প্রস্তুত রাখিও।' এই সংবাদের পর তিনি অগ্রসর হইয়া দুর্গের ঠিক প্রাচীর-নিম্নে শিবির স্থাপন করিলেন। তাহাদের নিকট প্রেরিত উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া কাবুলীরা আত্মরক্ষার্থে বিপুল সংখ্যায় কোতওয়ালের নেতৃত্বে দুর্গের বুরুজগুলির উপরে সমবেত হইল। একদল কাজলবাশকে মই লাগাইয়া প্রাচীরে উঠিতে ও দুর্গ-প্রাকারের নিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করিতে আদেশ করা হইলে প্রথম আক্রমণেই বুরুজের লোকেরা প্রাণভিক্ষা চাহিল। প্রাণভিক্ষা মঞ্জুর হইলে তাহারা দরজার বাহিরে আসিয়া দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের তাঁহার প্রজা বলিয়া স্বীকার করিল। একই সময় সংবাদ আসিল যে, কয়েকজন আফগান পর্বতে লুকাইয়া রহিয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে সৈন্য প্রেরিত হইল; তাহারা ঐ পাহাড়িয়াদের যত লোককে পাইল, তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিল। ইতোমধ্যে দূত মুহম্মদ খাঁর নিকট হইতে কোন সংবাদ না আসায় নাদির শাহ্ কয়েকজন গণ্যমান্য কাবুলী বাছিয়া লইয়া একটি বাণীসহ তাঁহাদিগকে মুহম্মদ শাহ্ ও তাঁহার মন্ত্রীদের নিকট প্রেরণ করিলেন। দূতগণ দ্রুতপদে লাহোরের পথে শাহজাহানাবাদে পৌঁছিয়া তাঁহাদের বাণী প্রদান করিলেন; কিন্তু সেখানে কেহই তাহা শুনিতে পাইল না বা কেহ শুনিলেও বুঝিতে চাহিল না। বিশিষ্ট, বিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল লোকেরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখনই এই সকল কাবুলী বা তদঞ্চল হইতে আগত যে কোন বুদ্ধিমান লোক তাঁহাদের মুখ খুলিয়া নাদির শাহ্ সম্পর্কে কোন কিছু বলিতেন, খান দুরান তখনি সমস্ত ব্যাপারটাই হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতেন; "এই রাজধানীর° গৃহের ছাদ অতি উচ্চ। নাগরিকেরা সেখান হইতে দূরে থাকিয়াই নাদির শাহ্ ও তাঁহার মোগলদের দেখিতে পাইতেছে।' তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়পাত্রগণসহ তিনি স্বয়ং এই দৌত্য ও কাবুলীদের বাণীকে উজীর নিজামুল মুল্‌ক, দরবারের তুরানীদল বিশেষতঃ উজীরের আত্মীয় কাবুলের সুবাদার জাকারিয়া খাঁ কর্তৃক উত্থাপিত একটা প্রহসন বলিয়া মনে করিতেন। যাঁহারা দাবী করিতেন, ইহাতে আদৌ কোন গুজব নাই—বরং সমস্তই বাস্তব ঘটনামাত্র,

নাদির শাহ দিল্লীতে আর একটা দৌত্য ও তৎপরে দশজন সংবাদবাহক প্রেরণ করেন

তাঁহারা তাঁহাদিগকে ঘৃণা ও উপহাস করিতেন। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বাস্তবিকই এত গুণহীন এবং তাঁহার সহচরেরাও অধিকতর বুদ্ধিমান নহেন, সেখানে কিরূপে তাঁহারা উচ্চাকাঙ্খী উচ্চ কর্মচারীদিগকে সংযত রাখার ব্যবস্থা করিবেন এবং সাম্রাজ্যের বিষয়-কর্মে শৃঙ্খলা ও বশ্যতার প্রবর্তন করিবেন, তাহা দেখা অসাধারণ ব্যাপার। তাঁহার দূতদের পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্যতায় হতাশ না হইয়া নাদির শাহ্ দশজন পদাতিকের পাহারায় আর একজন লোক প্রেরণ করিলেন। ইহারা জালালাবাদে পৌছিয়া একটা গৃহে অবতরণ করিবামাত্র একদল জনতা তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া প্রথমে নিরস্ত্র করিয়া সকলকেই হত্যা করিল। দশম ব্যক্তি ভিন্ন পলায়ন করিতে পারিল না। সে কাবুলে ফিরিয়া গিয়া যাহাযাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিল। নাদির শাহ্ ইতঃপূর্বেই এই প্রদেশে পূর্ণ সাত মাস অতিবাহিত করেন; এই সময় তিনি আফগান দলগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগাক তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিতে ব্যস্ত থাকেন। জালালাবাদের এই কাণ্ড শুনিয়া তাঁহার সমস্ত ধৈর্য ফুরাইয়া গেল। সেখানে যাত্রা করিয়া তিনি চতুর্দিক হইতে উহা ঘিরিয়া ফেলিয়া উহার সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করার আদেশ দান করিলেন। ইহা নিতান্ত অদ্ভুত কিন্তু সত্য যে, ঐ দশ ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট লোকদের পুরস্কৃত করার জন্য দরবার হইতে বহু খেলাত প্রেরিত হয় এবং অচিরে যে সাধারণ হত্যাকাণ্ড ঘটে, কেবল তাহাই তাহাদিগকে এগুলি পরিধানে বিরত রাখে। ইহাও কম সঠিক নহে যে, নাদির শাহের কাবুল প্রদেশে প্রবেশের প্রথম সংবাদ পাইয়াই খানদুরান ও নিজামুল মুল্‌ক বাহিরে যাত্রা করিয়া তাহাকে বাঁধাদানে আদিষ্ট হন; কিন্তু তাঁহারা কয়েকবার তাঁহাদের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ প্রচার করিয়া নগরে ঘুরাফিরা করিয়া পরিতৃপ্ত থাকেন; এই আচরণ তাঁহাদের নিকট একটা মার্জিত চতুরতা ও শাসন প্রণালীতে একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যম বলিয়া বিবেচিত হয়। জালালাবাদ লুণ্ঠন করিয়া নাদির শাহ্ পেশোয়ার যাত্রা করিলেন; কাবুলের সুবাদার নাসির খাঁ ইহার উপকণ্ঠে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন; তিনি যত সৈন্য সমবেত করিতে পারিলেন, তাহাদের সহিত অজস্র আফগানকে একত্র করিয়া খাইবারের[৩] ন্যায় কঠিন কোন দীর্ঘ

একটা সঙ্কীর্ণ পথ ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় তাঁহাকে বাধাদানে মনস্থ করিলেন; উপত্যকাটিকে তিনি অজেয় বলিয়া কল্পনা করিলেন। নাদির শাহ তাঁহার রণ-সজ্জার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে এই সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠাইলেন: 'আপনাকে জানাইতেছি যে, অমুক দিনে আমি অমুক স্থানে উপস্থিত হইব; আমি সে স্থান অতিক্রম করা না পর্যন্ত আপনি সেখান হইতে সরিয়া গেলে ভাল হইবে।' এই সংবাদে কোনই ফল হইল না। সেইদিনই নাদিরশাহ সেখানে হাজির হইলেন, কি ভারতীয় কি আফগান, যাহারা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডয়মান হওয়ার চেষ্টা করিল, তাহাদের প্রত্যেককেই তিনি তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিলেন! নাসির খাঁ স্বয়ং আহত হইয়া কাজলবাশদের হাতে পড়িলেন, কিন্তু তিনি কে, তাহাদিগকে তাহা জানাইলে তাহারা তাঁহাকে নাদির শাহের নিকট লইয়া গেল; কয়েক দিন পরে তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া একটা খেলাত দানে সম্মানিত করিলেন। পেশোয়ার হইতে নাদির শাহ আটক[১] নদীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; নৌকাযোগে ইহা অতিক্রম করিয়া তিনি মুলতান প্রদেশে প্রবেশ করিলেন; লাহোর ইহার রাজধানী। এই দুর্ভাগ্য প্রদেশটি ইতঃপূর্বেই বিশৃঙ্খলা ও হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যে পরিণত হয়। সরকারের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কয়েক হাজার দস্যু দুইটি বিরুদ্ধ দলে জমায়েত হইয়া নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়; চাঁদা তুলিয়া তাহারা কয়েকটি উৎকৃষ্ট জিলা ধ্বংস করিয়া দেয়। জাকারিয়া খাঁ তাঁহার পরিচালিত সৈন্য ও তাহাদের সহায়তাকারী কামানরাজির জন্য গর্বিত ছিলেন; নাদির শাহ নিকটবর্তী হইলে তিনি নগরের বাহিরে আসিয়া নগরের পাদদেশে ইরাবতী নদীর তীরে একটা সুবিধাজনক স্থান পছন্দ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মূর্খেরা নিজের ক্ষতির সময় ব্যতিরেকে কখনও যুদ্ধ বা শান্তির কিছুই জানে না। নাদির শাহ দূর হইতে ঐ গাদা করিয়া রাখা ভারতীয়-জনতা নিরীক্ষণ করিয়া পানিতে তাঁহার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন এবং যে অল্প কয়েকজন কাজলবাশ তাঁহার হাতের কাছে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া বিপরীত তীরের দিকে আগাইয়া চলিলেন। সেখানে তিনি যে সকল সওয়ার উৎকৃষ্ট ও নিপুণ বলিয়া বোধ হইল, তাহাদের শীর্ষস্থানীয়দিগকে অচিরে পলায়নে বাধ্য করিলেন। এই

কাবুলের সুবাদার জাকারিয়া খাঁ পরাজিত

ধ্বংসক্রিয়া দর্শনে অবশিষ্ট সৈন্য চরম আতঙ্কে পলায়ন করিল। শাসনকর্তা তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উহার প্রাচীরের নিকটে নাদির শাহের তাঁবু পড়িল। জাকারিয়া খাঁ এখন তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহার আচরণের ভুলের জন্য ক্ষমা চাহিয়া ও আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়া ঐ রাজার নিকট একখানা আবেদনপত্র লিখিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি বাহিরে আসিয়া তৎপ্রতি সম্মান দেখাইলে, তাঁহাকে একটা খেলাত দ্বারা সম্মানিত করা হইল। লাহোর হইতে নাদির শাহ সটান শাহজাহানাবাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। মুহম্মদ শাহ্ও অনুরূপভাবে তাঁহার সমগ্র দরবার ও একটা বিরাট বাহিনী লইয়া নগর হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি এত মন্থরগতিতে চলিলেন যে, দুইমাস কাল মধ্যে তিনি কেবল কার্ণল পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ইহা আলী মর্দন খাঁর খোদিত খালের মুখে অবস্থিত এবং রাজধানী হইতে ঠিক চারি দিনের পথ দূরে। সেখানে শিবির স্থাপন করিয়া তিনি তাঁহার অজস্র কামান শিবিরের চারিধারে বসাইতে ও শৃঙ্খলা দ্বারা এগুলিকে পরস্পরের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে আদেশ দান করিলেন। লাহোর হইতে যাত্রা করিয়া নাদির শাহ ভারতীয় বাদশাহের দরবারে মুহম্মদ খাঁ তুর্কম্যানের দৌত্য সম্বন্ধে সংবাদ চাহিয়া তাঁহাকে ২/৩ বার পাঠাইলেন; কিন্তু এই সকল খবরের কোনই উত্তর দেওয়া হইল না, রাজদূতকেও বিদায় না দিয়া শিবিরে রাখিয়া দেওয়া হইল। কেহই এই অদ্ভুত নীতির উদ্দেশ্য অনুমান করিতে সমর্থ হইল না। দীর্ঘকাল পূর্বে খান দুরান রাজা জয়সিংহ সেবায়ী এবং আরও কতিপয় শক্তিশালী রাজার নিকট পত্র লেখেন; সমগ্র রাজপুত জাতির সাহস ও বীরত্বের উপর ঐ মন্ত্রী সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থা রাখিতেন; তাহাদের সাহায্য তিনি অবধারিত বলিয়া গণ্য করিতেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন। প্রত্যেকটা হিন্দু রাজাই তুচ্ছ ছল ও কষ্টকল্পিত ওজর দ্বারা উজীরকে আমোদিত করিয়া তৃপ্ত রহিলেন; প্রত্যেকেই গৃহে বসিয়া রহিলেন, তাঁহাদের কেহই এক ইঞ্চিও নড়িলেন না। সমগ্র দরবারসহ বাদশাহ অধীরভাবে সাদৎ খাঁর উপস্থিতির প্রত্যাশায় রহিলেন; রাজপথে তিনি যে স্থান মাড়াইয়া আসিবেন, আশার চক্ষু তৎপ্রতি নিবদ্ধ হইল। আশ্চর্যের বিষয়, নাদির শাহ

এখন এত অধিক নিকটে থাকিলেও এবং তাঁহার সৈন্যদল বিরাট হইলেও হিন্দুস্তানী বাহিনীতে সরকারী বা বেসরকারী একটা লোকও তিনি কোথায় থাকিতে পারেন, তাহা সঠিকভাবে বলিতে পারিত না। সর্বপ্রথম সংবাদ পাওয়া যায় ঘাসিয়াল[৮] ও সৈন্যদলের অন্যান্য লোকের নিকট হইতে। প্রাতে প্রায় ১১ টার সময় ঘাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনয়নের উদ্দেশ্যে শিবির হইতে বাহির হইয়া তাহারা মাঠে প্রায় ৩।৪ ক্রোশ দূরে অগ্রসর হয়। সেখানে শত্রুপক্ষের কিছু সৈন্যদ্বারা আক্রান্ত ও আহত হইয়া তাহারা শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া মোগলদের বীরত্ব ও তাহারা তাহাদের হাতে কিরূপ প্রচণ্ড মার খায়, তাহার কাহিনীতে শিবির ভর্তি করিয়া ফেলিল। মুহূর্তে শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার ও প্রত্যেকের মনই সাধারণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল এবং প্রত্যেকেই সাদৎ খাঁর আগমন ও প্রত্যাশায় অধীর হইয়া উঠিল। অবশেষে সংবাদ আসিল যে, তিনি নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। ১১৫০ হিজরীর ১৫ই যিলকদ বুধবার খান দুরান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বাদশাহের নিকট লইয়া আসিলেন। বাদশাহ ঐ সেনাপতিকে অনুগ্রহ ও মনোযোগের বিশেষ নিদর্শনের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া খান দুরানের সৈন্যদের পাশে শিবির স্থাপনের আদেশ দান করিলেন। ঐ সেনাপতি সেখানে গমন করিয়া তাঁহার মালপত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল নাদির শাহের কিছু লঘুভার অস্ত্রধারী সৈন্য তাঁহার মালপত্র আক্রমণ করিয়া সেখানে খুব ধ্বংস ক্রিয়া চালাইতেছে। এই সংবাদে সতর্কিত হইয়া সাদৎ খাঁ খান দুরানকে খবর পাঠাইলেন, আমার লোকেরা শত্রুপক্ষের সহিত বাস্তবিকই যুদ্ধে নিরত, আমি তাহাদের সাহায্যে না যাইয়া পারিতেছি না। তিনি তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে যাত্রা করিলেন। ইতোমধ্যে এই সংবাদ খান দুরান কর্তৃক বাদশাহের ও বাদশাহ কর্তৃক নিজামুল মুল্‌কের নিকট প্রেরিত হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "ইতঃপূর্বেই" অপরাহ্ণ তিনটা বাজিয়া গিয়াছে; ইত্যবসরে সাদৎ খাঁর লোকেরা তাহাদের দীর্ঘ যাত্রার দরুণ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইতে বাধ্য; অতএব সেই দিন যুদ্ধ করা অসঙ্গত। তিনি আরও বলিলেন, "মহামান্য

বাদশাহ ঐ সেনাপতিকে আগামী দিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁহার উৎসাহ দমনের আদেশ দিন; ঐ সময় সৈন্যরা একত্রে সমবেত হইয়া ব্যূহ রচনা করতঃ তাহাদের সম্মুখে ঐ অজস্র কামান লইয়া শত্রু পক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া মহামান্য বাদশাহের সৌজন্যে কিছু গৌরবজনক কার্য সমধা করিবে।" নিজামুল মুল্‌কের এই উত্তর একটা বার্তা দ্বারা খানদুরানের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি ইহা নিজামুল মুল্‌কের পক্ষে কোন অবহেলা বা ঈর্ষা বিবেচনায় উত্তর দিলেন, "সাদৎ খাঁ ইতঃপূর্বেই বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন এবং ইতোমধ্যে নিঃসন্দেহে শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন; এমন একজন সাহসী ও এত বিশ্বাসী ভৃত্যকে একাকী শত্রুর সম্মুখীন হইতে দেওয়া (তাঁহাদের পক্ষে) প্রকৃত পক্ষে অনুদারতা ও ভীরুতার কাজ হইবে।" তিনি আরও বলিলেন, "এরূপ অবহেলা রীতিবিরুদ্ধ এবং চাকরীর পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক। অন্যের যাহা অভিরুচি করুক, আমার তরফ হইতে আমাকে গিয়া সাদৎ খাঁকে সাহায্য করিতেই হইবে।" তাঁহার হাতী প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিজস্ব সৈন্যগণ ও কিছু হালকা কামান লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিলেন, তখন বেলা মাত্র ২।৩ ঘণ্টা বাকী। তিনি সাদৎ খাঁর নিকট হইতে প্রায় এক মাইল দূরে স্থান গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পার্শ্বদেশকে যুদ্ধরত দেখিয়া নাদির শাহ তাঁহার সৈন্যদলের একাংশ তাঁহার শিবির পাহারার জন্য রাখিয়া মূল বাহিনীসহ যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ নিজের সঙ্গে রাখিলেন, অপর দুই দলকে ভারতীয় আমীরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সাহসী কাজল বাশেরা দ্রুত বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া শত্রুদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে আহত, নিহত ও অশ্বচ্যুত করিতে আরম্ভ করিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহারা এত অধিক হত্যাকাণ্ড চালাইল যে, ঐ দুইজন আমীর, বিশেষতঃ খান দুরানের সৈন্যেরা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পলাইয়া গেল। খান দুরানের সর্বাপেক্ষা সাহসী ও সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সেনাপতিরা গতায়ু হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা মুজফ্‌ফর খাঁর নেতৃত্বে ইহারা চিরস্থায়ী নিবাসের উদ্দেশ্যে

যাত্রা করিলেন। খান দুরানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী হামীদ খাঁ, শাহজাদ খাঁ, ইয়াদগার খাঁ, বর্মধারী মির্জা আকিল বেগ, তাঁহার দলের অধিকাংশ লোক, মীর মোশাররফের পুত্র মীর গোবলো ও রায় খোশাল চাঁদের পুত্র রতন চাঁদ ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে। খান দুরান স্বয়ং গুরুতররূপে আহত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন; কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে বহন করিয়া সন্ধ্যার গোধূলির সময় সৈন্যদলে পৌঁছিলেন। হিন্দুস্তানের বাদশাহির শিবিরের শৃঙ্খলা এতই সুস্পষ্ট ছিল যে, সেখানে এক শূন্য বিয়াবান ভিন্ন তাঁহারা খান দুরানের শিবিরের কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না; সেই মন্ত্রীর অজ্ঞান ও মরণোন্মুখ দেহকে ছায়াদান করার মত একটা বৃক্ষ পর্যন্ত ছিল না। হিন্দুস্তানীরা ও তাঁহার নিজের লোকেরা ধনরত্ন, আসবাবপত্র, তাঁবু, সাজসজ্জা, অশ্ব ও গবাদি পশু সবই লুটিয়া নেয়, অবশেষে কোন ব্যক্তি একটা ক্ষুদ্র তাঁবু পাঠাইলে খান দুরানকে লম্বা করিয়া মৃত্তিকায় শায়িত করা হইল। উজীর কমরুদ্দীন খাঁ ও নিজামুল মুল্‌ক বাদশাহের হারেমের প্রধান খোজাদের লইয়া তাঁহার দুর্ভাগ্যে সান্ত্বনা দান ও তাঁহাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। খান দুরানের এখন জ্ঞান সঞ্চার হইল; তিনি অতি কষ্টে চক্ষু মেলিয়া নিজে মরিয়া যাইতেছেন দেখিয়া এই কথাগুলি বলিলেন: 'আমার সম্পর্কে বলিতে গেলে, আমার কাজ শেষ হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেরাই ইহা করিয়াছি। এখন আপনাদের নিজ নিজ ব্যাপারের যত্ন নিন। আপনাদিগকে আমায় শুধু অল্প কয়েকটি কথা বলিতে দিন: সাবধান! বাদশাহকে নাদির শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে দিবেন না; নাদির শাহকে নগরের দিকে অগ্রসর হইতে দেওয়া সম্পর্কেও সাবধান হইবেন। এখান হইতেই ঐ আপদ পরিহার করা ও তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া শ্রেয়তর। আপনাদের সাধ্যের প্রত্যেকটা উপায়ে ইহা সম্পাদন করিবেন।' এই কথাগুলি শ্রবণের পর আমীরদ্বয় নিজেদের মধ্যে একটু পরামর্শ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। একই মাসের ১৯ তারিখে খান দুরান ইহজীবন ত্যাগ করিয়া চিরস্থায়ী নিবাসে গমন করিলেন।

খান দুরান নিহত

এদিকে সাদৎ খাঁ তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন; তাঁহার যে সকল সৈন্য হত্যাকাণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়, তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কাজলবাশেরা তখন সাধারণ আক্রমণ চালাইল। তাহাদের মধ্যে জনৈক তুর্কী যুবক ছিল নিশাপুরের[১০] নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী এবং কাজে কাজেই সাদৎ খাঁর শহরবাসী। সে সবলে পথ করিয়া নির্ভীকভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তিনি তখন ধনুক দ্বারা চতুর্দিকে তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। তাঁহার চেহারা স্মরণ হওয়ায় লোকটা তাঁহাকে চীৎকার করিয়া বলিল, "মুহম্মদ আমীন! তুমি কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছ এবং কোন্ সৈন্যদের উপর ভরসা করিতেছ? তুমি কি পাগল?" এই বলিয়া সে মাটিতে তাহার বর্শা গাথিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া তাহার ঘোড়াটিকে উহার সহিত বাঁধিয়া ফেলিল; তৎপরে হাতীর একটা রজ্জু ধরিয়া হাওদার[১] উপরে উঠিয়া সাদৎ খাঁর কণ্ঠে তাহার ছোঁয়া লাগাইল। ইরানের রীতি তাঁহার জানা থাকায় তিনি বশ্যতা স্বীকারের ইঙ্গিত করিয়া লোকটির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন এবং ভাগ্যের পরিহাসে ধৃত হইয়া বন্দীরূপে নাদির শাহের নিকট নীত হইলেন। ঐ রাজা তাঁহার সঙ্গে অল্প কয়েকটি কথা বলিলেন এবং তাহার সহিত অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিলেন। অন্ধকার হইয়া আসায় তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিবিরে প্রস্থান করিলেন। আমীরুল ওমরার পদের প্রতি বরাবরই সাদৎ খাঁর লক্ষ্য ছিল। এখন খান দুরানের মৃত্যুর কথা অবগত হওয়ায় তাঁহার মনে হইল তাহাতে অভিষিক্ত হওয়ার ইহাই অনুকূল সুযোগ; এই অভিপ্রায়ে তিনি নাদির শাহের সহিত সন্ধিশর্ত আলোচনা আরম্ভের বাহাদুরী লইলেন। তাঁহাকে দুই কোটি টাকা দিলে ঐ রাজা শান্তি স্থাপন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হইলেন। শর্ত হইল যে, যেই মাত্র নিজামুল মুল্ক আসিয়া ঐ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন নাদির শাহের তরবারি তৎক্ষণাৎ পুনরায় কোষবদ্ধ হইবে। বাদশাহ ও তাঁহার উপদেষ্টা নিজামুল মুল্ক উভয়েই যখন সন্ত্রাস ও নৈরাশ্যের আস্তিনের ভিতরে তাঁহাদের মস্তক লুকায়িত করেন এবং কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তদ্বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার বিষয়-কর্ম

এই মোড় ধরায় আনন্দিত হইয়া বাদশাহ অবিলম্বে সন্ধি স্থাপনের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া নিজামুল মুল্‌ককে পাঠাইয়া দিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি নাদির শাহের শিবিরে পৌঁছিয়া সাদৎ খাঁর মধ্যবর্তিতায় ঐ রাজার সহিত পরিচিত হইলেন। সেখানে তিনি দুই কোটী টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রফুল্ল মেজাজে স্বীয় প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট তিনি সন্ধির আদ্যান্ত তাঁহার যোগ্যতা ও উৎসাহী আচরণের সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ বিবরণ দাখিল করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি স্বয়তঃ যেরূপ প্রত্যাশা করিতে পারিতেন এই সন্ধিশর্ত আলোচনা তদপেক্ষা অনেক অধিক অনুকুলভাবে সম্পাদিত হইয়াছে মনে করিয়া বাদশাহ্ তাঁহার উপদেষ্টাকে উচ্চ প্রশংসা ও অনুগ্রহ দ্বারা ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিলেন ঃ নিজামুল মুল্‌ক তাঁহার পুরস্কার হিসাবে আমীরুল ওমরার পদ এবং ঐ উচ্চ মর্যাদার খেলাতের জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি ধৈর্যের সহিত তাহা শ্রবণ করিলেন। বাদশাহ্ এযাবত তাঁহার জীবন ও মুকুট দুইটির জন্যই আতঙ্কিত ছিলেন; তিনি এখন এই সেনাপতির উচ্চাকাঙ্খী দাবী পূরণ করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত রাখাই তাঁহার কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ একটা খেলাত আনাইয়া তাঁহাকে ঐ উচ্চপদে অভিষিক্ত করিলেন। পরদিন ২০ তারিখে নাদির শাহের নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়া ঐ রাজা নিজামুল মুল্‌কের উপদেশ ও অনুমোদনক্রমে প্রত্যুষে ইরাণী শিবিরে যাত্রা করিলেন। তিনি নিকটবর্তী হইলে নাদির শাহের পুত্র নাদির উল্লাহ্ মির্জা[১২] ঐ বিজেতার আদেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; কিছুদূর হইতে যুবক শাহজাদাকে দেখিতে পাইয়া মুহম্মদ শাহ তাঁহার তখ্‌ত রওয়া বা ভ্রাম্যমাণ সিংহাসন পাতিবার আদেশ দান করিলেন এবং সেখান হইতে তাঁহাকে পুত্ররূপে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাকে তাঁহার তখ্‌ত রওয়ায়ে লইয়া তিনি নাদির শাহের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতীয় ভূপতিকে দেখিতে পাইয়া ঐ নরপতি গাত্রোত্থান করিয়া গালিচার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া নিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজের মসনদ বা সিংহাসনে নিজের সঙ্গে একত্রে বসাইলেন। তাঁহার প্রতি সর্ব প্রকার সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের পর তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তির সহিত

বিদায় দেওয়া হইল। তিনি তাঁহার নিজ শিবিরে যাত্রা করা মাত্র সাদৎ খাঁর নিকট সংবাদ আসিল যে, তাঁহাকে বাদ দিয়া নিজামুল মুল্‌ককে আমীরুল ওমরার পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। এই সংবাদে ভীষণতম ক্রোধ ও ঘৃণার যাবতীয় বেদনায় তাঁহার মন ভরিয়া গেল; নিছক বিরক্তির বশে তিনি এখন নাদির শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "হিন্দুস্থানী শিবিরে নিজামুল মুল্‌কের ন্যায় কেহই এত বেশী ক্ষমতা রাখে না, কাজ করার এত দক্ষতাও আর আর কাহারও নাই।" তিনি আরও বলিলেন, "দুই কোটী টাকা এমন কি বিরাট ব্যাপার যে, হুজুর এত সামান্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করিতেছেন? দুই কোটী টাকা ভারতে এমনি তুচ্ছ অর্থ যে, আমার ন্যায় হুজুরের গোলামও তাহা প্রদান করিতে পারে; আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত তহবিল হইতে আপনাকে তাহা প্রদান করিব। কিন্তু বাদশাহের শিবির, তাঁহার ও তাঁহার উচ্চ কর্মচারীদের প্রাসাদ এবং রাজধানীর মহাজন ও বণিকদের নিকট হইতে বিপুল অর্থ পাওয়া যাইতে পারে; আপনি কেবল সেখান পর্যন্ত অগ্রসর হইলেই হইল। ইহা খুব দূরে নহে। এখান হইতে মাত্র ৪০ ক্রোশ; এখনি যাত্রা করিতে মর্জি হউক।" এরূপ বক্তৃতায় নাদির শাহের চোখ খুলিয়া গেল এবং তাঁহার দৃষ্টি-সীমা প্রসারিত হইল। তিনি নিজামুল মুল্‌ককে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ দিয়া একখানা টোকা লিখিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি সম্পাদিত সন্ধি ও নাদির শাহের কথায় আস্থা রাখিয়া নিঃসন্দেহে যাত্রা করিলেন। হুজুরে-পরিচয় দেওয়া হইল তিনি দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের জন্য মুহম্মদ শাহকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সন্ধ্যাকালে আসার আদেশ পাইলেন। নিজামুল মুল্‌ক আরজ করিলেন, "সন্ধির শর্ত ত এমন ছিলনা"; কিন্তু তিনি উত্তর পাইলেন, "সেই সন্ধি এখনও বলবৎ আছে।" ঐ রাজা আরও বলিলেন," মুহম্মদ শাহের সাম্রাজ্য, তাঁহার জীবন কিম্বা তাঁহার সম্মানের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিসন্ধি নাই, শুধু তাঁহার সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত।" নাদির শাহের মরজি মাফিক নিজামুল মুল্‌ক কর্তৃক এই আদেশ তাঁহার প্রভুর নিকট প্রেরিত হইল। সেই রাজা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে কতকগুলি অবস্থার চাপে থাকায় ইহা তামিল করিতে বাধ্য হইলেন।

আমীর খাঁ ও ইসহাক খাঁকে সঙ্গে লইয়া কিছু পাইক, ভৃত্য ও খোজাসহ তিনি ইরানী শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আমীর ও মনসবদারগণকে[:৩] তাঁহার সমগ্র গৃহস্থালীসহ তাঁহার অনুগমনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তিনি গতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ভ্রাম্যমান সিংহাসনে বসিয়া তাঁহার গতিবৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার জন্য একটা তাঁবু খাটাইয়া রাখা হয়। তিনি সেখানে পৌছিলে তাঁহাকে তন্মধ্যে অবতরণ করিতে বলা হইল; একটু পরেই তিনি এই সংবাদ পাইলেনঃ আপনার পরিবার, গৃহস্থালী, শিবির, অনুচরবর্গ, আসবাবপত্র এবং অনুরূপভাবে আপনার বিচার-বিভাগ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীবর্গসহ আপনার হারেমের পর্দানশিনদের আনাইয়া নিন।''

পরক্ষণেই আর একটি আদেশ হিন্দুস্থানী শিবিরে প্রেরিত ও প্রচারিত হইল। এই আদেশ দ্বারা হিন্দুস্থানী শিবিরের প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেওয়া হইল যে, ইচ্ছা করিলে, যে যেখানে আছে, অবস্থান করিতে পারিবে অথবা শাহজাহানাবাদ চলিয়া যাইতে পারিবে। এই আদেশ প্রচারের ফলে অধিকাংশই শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিল। মুহম্মদ শাহ তাঁহার পরিবার, গৃহস্থালী ও অন্যান্য কর্মচারীর জন্য লোক পাঠাইলে জনৈক নিশিখ্চ[:৪] কমরুদ্দীন খাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ লইয়া আসিলঃ উজীর তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিলেন। জেলায়ের তহম্যাসপ ছিলেন এই নামের একটি সৈন্যদলের সেনাপতি। শেষোক্ত কার্যের কিঞ্চিৎ পূর্বে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সাদৎ খাঁ বিজেতার নিকট হইতে একটি ও মুহম্মদ শাহের নিকট হইতে আর একটা আদেশসহ রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; তাহাতে ঐ নগরের সহকারী শাসনকর্তা লুৎফুল্লাহ খাঁ সাদেকের প্রতি দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিতে এবং প্রত্যেকটা বস্তু ও প্রত্যেকটা পদ ঐ দুইজন আমীরকে প্রদানের নির্দেশ ছিল। তাঁহাদের প্রস্থানের পরে মুহম্মদ শাহ্কে সঙ্গে লইয়া নাদির শাহ্ নিজে যাত্রা করিলেন। তাহাদের রাজার আটক ও উজীরের প্রস্থানের সংবাদ পাইয়া হিন্দুস্থানী বাহিনীর অধিকাংশ লোকই ভীত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহাদের সকলেই লুণ্ঠনকারী ইরানী সৈন্যদের হস্তে নিহত বা লুণ্ঠিত হইল; কৃষকেরা সর্বত্র তাহাদের উপর আপতিত হইয়া আরও অনেককে হত্যা বা

লুণ্ঠন করিল। তাহাদের অধিকাংশই নিহত হয়; যাহারা রক্ষা পায়, তাহাদের নিরস্ত্র করিয়া দেওয়া হয়। ১১৫৯ হিজরীর ৮ই জিলহজ্জ মুহম্মদ শাহ্ নগরে প্রবেশ করিয়া দুর্গে গমন করিলেন; দুই দিন পরে নাদির শাহ্ তাঁহার অনুগমন করিয়া সেখানে তাঁহার বাসা লইলেন। তাঁহার দরবারের সমস্ত আমীর ও তাঁহার সমস্ত গৃহস্থালীসহ মুহম্মদ শাহ্ তাঁহার প্রাচীন মহল অধিকার করিলেন। আমীর ও পরিজনেরা অভ্যাসমত তাঁহাদের নির্দিষ্ট স্থানে বাসস্থান লইলেন। ঐ মাসের ১০ই তারিখে- কুরবানীর দিনে[১০] প্রধান মসজিদ সমূহে নাদির শাহের জন্য খুৎবা[১৬] পঠিত হইল। পরদিন সর্বত্র এক জনরব ছড়াইয়া পড়িল যে, তিনি আর নাই। কেহ বলিল, তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, কেহ যেন মুহম্মদ শাহের দোষ ঢাকা দেওয়ার জন্য বলিল: তিনি জনৈক কালমাক রমণীর[১৭] হস্তে নিহত হইয়াছেন। সে যাহাই হউক, প্রকৃতপক্ষে তিনি দুর্গে পুরাপুরি জীবিত ছিলেন। দুর্গের দ্বারগুলি দিবারাত্র উন্মুক্ত থাকিলেও এই সংবাদ শহরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া এক ঘণ্টা কালের মধ্যে উহা পূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই মিথ্যা জনরব নগরের আস্তোপ্রান্ত বিস্তৃত হইতে না হইতেই হিন্দুস্থানীদের সশস্ত্র দলগুলি প্রধান রাজপথসমূহে আবির্ভূত হইয়া যত কাজলবাশের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিল, তাহাদের সকলকেই তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিল। জনরবের খবর না পাওয়ায় ও দেশীয় ভাষা জানা না থাকায় শেষোক্ত লোকগুলি কোন ক্ষতির আশঙ্কা না করিয়া দুই বা ততোধিক লোক মিলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া সহজেই নিহত হইল; নিশা সমাগমে হাঙ্গামা থামিয়া যাইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হইলেও ইহা বরং নুতন শক্তি লাভ করিল। ঐ সকল হাঙ্গামাকারী মুহূর্তমাত্রও বিশ্রাম না করিয়া পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর আগ্রহী হইয়া উঠিল। নাদির শাহ্‌কে এই সমুদয় ব্যাপার জানান হইলে তিনি তাঁহার প্রত্যেকটা লোককে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে যে যেখানে ছিল সেখানে সশস্ত্র ও প্রস্তুত থাকার এবং শক্তি দ্বারা শক্তি প্রতিহত করার জন্য আদেশ দান করিলেন। ইহা দ্রষ্টব্য যে, সমগ্র শহরে যত ভারতীয় আমীর স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হন, তাহাদের একজনও ইতস্তত: ঘুরিয়া হাঙ্গামা

নাদির শাহের মৃত্যু সংবাদে ইরানীরা আক্রান্ত

ঘামাইবার তকলিফ স্বীকার করেন নাই ; এরূপ করা দূরে থাকুক, যাঁহারা তাঁহাদের পরিবার ও গৃহের নিরাপত্তার খাতিরে নাদির শাহের নিকট হইতে কিছু কাজলবাশ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বরং ঐ সকল গৃহমধ্যেই তাহাদিগকে হত্যা করান বা নিজেরাই তাহাদিগকে হত্যা করেন। নিহত এত অধিক সংখ্যায় হয় যে, কার্ণলের যুদ্ধে ইরানী বাহিনীতে তিন জনের অধিক নিহত ও ২০ জনের অধিক আহত হয় নাই, কিন্তু এই হাঙ্গামায় নাদির শাহের সাত শতাধিক লোক বিনষ্ট হয়। এখন প্রত্যুষ হইয়া আসায় হাঙ্গামা পূর্বাপেক্ষাও প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিলে নাদির শাহ্ উহা প্রশমিত করার বাসনায় তাঁহার অশ্বে আরোহণ করিয়া দুর্গের বাহিরে আসিলেন ; কিন্তু তাঁহার লোকদের যেভাবে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি ঠিক সেস্থান হইতে সাধারণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করার আদেশ দান করিলেন। দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতিক যখন ঐ ভারাপিত কার্যে যাত্রা করিতে লাগিল, তখন তিনি যেখানেই তাহারা একজন কাজলবাশের মৃতদেহ আবিষ্কার করিবে, সেখানে একটা লোককেও জীবিত না রাখার জন্য তাহাদের প্রতি আদেশ দান করিলেন। মুহূর্তে সৈন্যেরা গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া হত্যা, জবাই ও লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং তাহাদের স্ত্রী-কন্যাদের ছিনাইয়া নেওয়া আরম্ভ করিল। অজস্র গৃহও অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করা হইল। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় যখন নিহতদের সংখ্যা সমস্ত প্রতিযোগিতা ছাড়াইয়া গেল, তখন নাদির শাহের আদেশে সাধারণ ক্ষমা বিঘোষিত হইল এবং সৈনিকেরা সর্বত্র তাহাদের তরবারি কোষবদ্ধ করিল। অজস্র মৃতদেহে গৃহ-সমূহ ও রাস্তাগুলি পূর্ণ হইয়াছিল ; এগুলি সমাহিত না হওয়ায় কয়েক দিনের মধ্যে এত অধিক দুর্গন্ধ উঠিতে লাগিল যে, সমগ্র নগরের বাতাস দূষিত হইয়া পড়িল, বহু স্থানে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল। এই সংবাদে কোতওয়াল মৃত লোকদের কবর দেওয়ার এবং রাস্তাগুলি পরিষ্কৃত ও মুক্ত করার আদেশ পাইলেন। ঐ হাকিম ঐ দেহগুলি স্তূপে স্তূপে আনয়ন করিয়া উহাদের চতুর্দিকে বিধ্বস্ত গৃহগুলির কড়িকাঠ ও বর্গা ফেলিয়া কাঠে আগুন লাগাইয়া দিলেন ; ফলে মুসলমান বা কাফির নির্বিশেষে সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল। কয়েক দিন পরে শহরে কর্কট রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সাদৎ খাঁর মৃত্যু হইল। কিন্তু

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রতিনিধি আবুল মনসুর খাঁ তাঁহার প্রতিশ্রুত দুই কোটী টাকা প্রদান করিলেন; শের জঙ্গ তাহা নাদির শাহের নিকট লইয়া গেলেন; ১০০০ কাজলবাশসহ তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। ঐ রাজা বাদশাহী কোষাগার সমূহে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যে সন্তুষ্ট না হইয়া অধিবাসীদের নিকট হইতে বিপুল চাঁদা তুলিলেন। অতঃপর তিনি হারেম হইতে বাদশাহ শাহজাহানের বংশধরদের মধ্য হইতে এক কুমারী শাহজাদীকে টানিয়া আনিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুল্লাহ মির্জার সহিত বিবাহ দিলেন; এই যুবক শাহজাদা ঐ অভিযানে তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন। স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য তৎপর হওয়ায় তিনি কাবুলের রক্ষী সৈন্যদের বেতন বাবতে বরাবর পৃথকভাবে রক্ষিত কয়েকটি জিলা ও পাঞ্জাবের কয়েকটি জিলাসহ সমগ্র সিন্ধু ও কাবুল প্রদেশ হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া তৃপ্ত হইলেন, কিন্তু (অবশিষ্ট) হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য উহার মালিককে ফিরাইয়া দিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি মুহম্মদ শাহের নিকট হইতে এক মহাড়ম্বর ভোজ পাইলেন; তাহাতে এই রাজা তাঁহার দরবারের কয়েকজন আমীরের প্রত্যেককে এক একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত করিলেন। আমীর খাঁ উমদাতুল মুল্‌কের কাজ ছিল কফি[১৮] দেওয়া। রাজদ্বয়ের হুজুরে কফি প্রস্তুতকালে হঠাৎ তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল: যদি তিনি তাঁহার প্রভু ও মালিক মুহম্মদ শাহকে প্রথম পাত্র না দেন, তবে এরূপ উপেক্ষা উৎসাহ ও সম্মানের অভাব বলিয়া অনুমিত হইবে এবং সন্দেহেরও সৃষ্টি করিবে; পক্ষান্তরে এরূপ করিলে এবম্বিধ পছন্দের দরুন শোনিত পিপাসু ও প্রায় ন্যায়ান্যায় জ্ঞানহীন নাদির শাহ্ তাঁহার দোষ ধরিতে পারেন এবং কাহারও পক্ষে নিরাপদে তাঁহার বিরাগভাজন হওয়া চলিত না। অবশেষে তিনি একটা পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহা মুহম্মদ শাহের হাতে দিয়া বলিলেন, আপনার গোলামের ন্যায় এত সামান্য লোক শাহানশাহের হস্তে কফির পাত্র দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন না; সুতরাং আমার প্রভু ও তাঁহার ভ্রাতা মহামান্য বাদশাহ্ নিজেই তাহা দিন। উভয় ভূপতি তাঁহার কৌশল উদ্ভাবন শক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অজস্র তারিফ করিলেন; হিন্দুস্থানী ও ইরানী সকলেই তাঁহার তারিফ করিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন

মনোরম আচরণকারী ও অত্যন্ত বুদ্ধি কৌশলময় লোক ; তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহাতেই সূক্ষ্মদর্শী রুচির পরিচয় দিতেন। এই ভোজের পরে সমস্ত উচ্চকর্মচারীসহ মুহম্মদ শাহ্‌কে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে একটা বৃত্তাকার গঠন করতঃ নাদির শাহ্ মুহম্মদ শাহকে স্বহস্তে একটা জিলকা[২৯] উপহার দিলেন এবং তাঁহাকে অনেক উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থানের রাজমুকুট প্রত্যর্পণ করিলেন। ঐ হিন্দুস্থানী উচ্চকর্মচারীদের প্রত্যেককে অনুরূপভাবে একটা খিলাতে ভূষিত করিয়া ১১৫২ হিজরীর ৭ই সফর নাদির শাহ্ শাহজাহানাবাদ ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার গমনের পরে মুহম্মদ শাহ তাঁহার নিজ ব্যাপারের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। উজীর কমরুদ্দীন খাঁ ও নিজামুল মুল্‌ক বিশেষতঃ ইসহাক খাঁ নামক জনৈক আমীর তাঁহাকে উপদেশদানে সাহায্য করিতেন ; ইনি হালে শাসনচক্রে যোগদান করেন ; কিন্তু ব্যক্তিগত অনুরক্তি এবং কার্ণলের যুদ্ধে ও নাদির শাহের সহিত সংগ্রামের আশু অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেদমত দ্বারা তিনি বাদশাহের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। তাঁহাকে খালিশার দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। আমীর খাঁকে উমদাতুল মুল্‌ক (রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ) উপাধিতে ভূষিত করিয়া তৃতীয় বখ্‌শীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আজিমুল্লাহ্ খাঁর উপর সদরের পদ অর্পিত হয়। একই মাসের ২৯শে মুর্তজা খাঁ মীর তুর্কীর ও নিজামুলমুল্‌কের ভ্রাতুষ্পুত্র নিয়ামতুল্লাহ খাঁ করাওয়ালবেগীর খিলাত পাইলেন। ৮ই রবিউল আউয়াল ছয় খণ্ডের একটা খিলাত দ্বারা আমীর খাঁর ভ্রাতা হাদী আলী খাঁর উপর পীলখানার অধ্যক্ষ্যের পদ অর্পিত হইল। সাদত খাঁর পুত্র সয়্যিদ সালাবৎ খাঁ সাহসী প্রহরীদলের ও খোদ আমীর খাঁ ওয়ালাশাহীদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ডাক ও আয়কর বিভাগের অধ্যক্ষের পদ হেকীম মাসুম আলী খাঁর উপর অর্পিত হইল। ১৭ই শাবান ইসহাক খাঁ ও সলবত খাঁকে মাহীর মর্যাদা প্রদত্ত হইল ; মীর আতশী সাদুদ্দীন খাঁ তালিকাভুক্ত সাহায্যের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সমুদয় তরক্কীর পরে বাদশাহ তাঁহার নিজস্ব বিষয় কর্মের ব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। দীর্ঘকাল পূর্বে তিনি কেবল কমরুদ্দীন খাঁ

নিজামুল মুল্‌ক নহে, সামগ্রিকভাবে সমস্ত তুরানীদের উৎসাহ ও বিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। নাদির শাহের আক্রমণের গোলযোগের আগাগোড়া তাহাদের ব্যবহারেও এই সকল সন্দেহের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। কাজেই তিনি তাহাদের সঙ্ঘ দুর্বল করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন; কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে কাজ করিতে ভয় পাইয়া কিরূপ কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহার আস্থাভাজন আমীর খাঁ ও ইসহাক খাঁর অভিমত জানিতে চাহিলেন। সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সহিত আমীর খাঁর চরিত্রে অনেকটা সাহসের সংযোগ থাকায় তিনি বাদশাহের প্রকাশ্যে কাজ করার এবং ওজারত হইতে কমরুদ্দীন খাঁকে বরখাস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। বাদশাহের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁহাকে বলিতেন, বাদশাহ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সদাশয়তার শাহীহস্ত তদীয় বিশ্বস্ত ভৃত্যের মস্তক ছায়াবৃত করার জন্য প্রসারিত করিলে এবং ঐ সঙ্কল্পে দৃঢ়তার সহিত অবিচালিত থাকিলে তিনি কোনই সন্দেহ পোষণ করেন না, তবে তিনি যেরূপ সঙ্গত মনে করেন, সাম্রাজ্যের বিষয়কর্ম সেরূপ ব্যবস্থাধীনে আনয়ন করিতে পারেন। তাঁহার উৎসাহ ও যোগ্যতায় এখন বাদশাহ সর্বোচ্চ অবস্থা স্থাপন করিতেন বলিয়া তিনি কমরুদ্দীন খাঁকে পদচ্যুত করিতে মনস্থ করিলেন, এবং নিজামুল মুল্‌ক কখন তাঁহার দাক্ষিণাত্যের সুবায় গমন করিবেন, কেবল সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নাদির শাহের আক্রমণের ফলে সর্বত্র গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তিনি তাঁহার পুত্র নাসির জঙ্গকে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সর্বময় প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া আসেন। তাঁহার ব্যবহার ও আচরণে অবাধ্যতা ও স্বাধীনতার ভাব প্রকাশ পায়, তাহাও এজন্য কম দায়ী নহে, এসকল কারণে সেখানে তাঁহার কর্তৃত্ব-হ্রাস পাওয়ায় তিনি ঐ সকল দেশ পুনরায় পরিদর্শন করিতে কম ইচ্ছুক ছিলেন না। কোন বিশৃঙ্খলার দরুন ঐ সমুদয় জনপদের শান্তি বিপর্যস্ত হইতে পারে, এই ভয়ে তিনি তাঁহার আমীরুল ওমরার পদ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ও কমরুদ্দীন খাঁর জামাতা গাযীউদ্দীন খাঁর নিকট হস্তান্তরিত করিলেন এবং এবম্বিধ হস্তান্তরে বাদশাহের সম্মতি লইলেন। যুবক আমীরকে তাঁহার নূতন পদের খেলাতে অভিষিক্ত দেখিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে গমনের জন্য

বাদশাহের অনুমতি গ্রহণ করতঃ নগরের বাহিরে গিয়া তাঁবুতে তাঁহার বাসা লইলেন। তিনি প্রস্থান করিলে বাদশাহ্ গোপনে ওজারতের কাগজপত্র রাখিবার দেরাজ আমীর খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। এই আমীর ছিলেন কতকটা আশাবাদী প্রকৃতির; তিনি কিন্তু প্রকাশ্য কাজ আরম্ভ করেন এবং কমরুদ্দীন খাঁ সম্পর্কে কিছু অপ্রীতিকর কথোপকথনের অনুষ্ঠান করেন; তাহা তুল্যরূপে একের মর্যাদা ও পদ এবং অপরের উচ্চ পদের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি অচিরে এই সকল নূতন ব্যাপার অবগত হইয়া এরূপ সঙ্কটকালে কি করা কর্তব্য, জানিতে চাহিয়া নিজামুল মুল্‌ককে পত্র লিখিলেন; তিনি তখনও শহরতলিতে শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। সুবাদার উত্তর দিলেন, "মহামান্য বাদশাহের ইচ্ছার প্রতিরোধ বা কাহারও মনিব ও প্রভুর বিরোধিতা করা সঙ্গত ও প্রশংসনীয় নহে; কাজেই মহামান্য বাদশাহের অনুমতি লইয়া তাঁহার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গমন ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই করিবার নাই।" এই সংবাদ পাইয়া উজীর এই সকল কথায় বাদশাহের নিকট একটী আবেদন পাঠাইলেন: "হুজুরের বিশ্বস্ত ভৃত্য কখনও কোন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহেন, এখনও তিনি আদৌ অপরাধী নহেন; কিন্তু সম্ভবতঃ স্বার্থপরায়ণ লোকদের ইঙ্গিতে আপনার বাদশাহী হৃদয়ে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছে বোধ হইতেছে; কিন্তু আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য অকৃতজ্ঞতা বা অবাধ্যতার চিন্তা পোষণ করার মত লোক নহেন বলিয়া তিনি নিজামুল মুল্‌কের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যাইতেছেন। হুজুর। হুজুরের কর্তৃত্বে যে কোন উৎসাহী প্রজার উপর সরকারী কার্যের ভার অর্পণ করিতে পারেন।"এই আবেদন পাঠাইয়া কমরুদ্দীন খাঁ নিজামুল মুল্‌কের শিবিরে গমন করিয়া তাঁবুতে বাসা লইলেন। বাদশাহের চরিত্রে দৃঢ়তা বা স্থিরতা ছিলনা বলিলেই হয়; তিনি এই দরখাস্তের বিষয়বস্তু পাঠে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া আমীর খাঁ ও ইসহাস খাঁ উভয়কেই ডাকিয়া আনিয়া বিষয় কর্মের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি কয়েক দিন পূর্বে যে উত্তর দেন, তখনও সেই একই উত্তর দিলেন। বাদশাহ কিছু না বলিয়া ঐ আমীরকে বিদায় দিলেন[২০]। তাঁহার প্রস্থানের পরে তিনি ইসহাক খাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি

তাঁহার বাদশাহ ও সাম্রাজ্যের মঙ্গলকে মূল্যবান জ্ঞান করেন বলিয়া প্রত্যেকটি পবিত্র বস্তুর শপথ দিয়া তিনি যাহা জনসাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক মনে করেন, গোপন না রাখিয়া এবং ব্যক্তি বা সময়ের খাতির না করিয়া তাহা ব্যক্ত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। ইসহাক খাঁ তাঁহার উন্নতির জন্য আমীর খাঁর নিকট ঋণী ছিলেন; তিনি ঐ আমীরের সহিত অঙ্গীকার করেন যে, তিনি যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি তাঁহার উপকারকের মতের বিরুদ্ধে কখনও কোন উপদেশ দিবেন না। কাজেই তিনি উত্তর দান পরিহার করিয়া নীরব রহিলেন। তাঁহার অনিচ্ছায় বিস্মিত হইয়া বাদশাহ সর্বাপেক্ষা মিষ্ট অনুরোধ ও সর্বাপেক্ষা পবিত্র প্রতিজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন। অপর ব্যক্তি এই সকল কথার উত্তর দিলেন—"আমার বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী কথা বলিলে আমাকে একটি পবিত্র প্রতিজ্ঞা ও একটি গুরুতর চুক্তি ভঙ্গ করিতে হয়, আর যদি আমি ঐ চুক্তির শর্তাবলী মানিয়া চলি, তবে আপনার নিকট অকৃতজ্ঞতার জন্য দোষী হই এবং অনুরূপভাবে জনসাধারণ সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করি; সুতরাং কিছু না বলাই সঙ্গত, হুজুর আমাকে মেহেরবাণী করিয়া মাফ করিবেন।" এই সকল কথায় বিস্মিত হইয়া বাদশাহ পূর্বাপেক্ষা আরও উৎসুক হইয়া পড়িলেন এবং এত বেশী অনুরোধ ও এত অধিক পবিত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ইসহাক খাঁ আর প্রতি-রোধ করিতে সামর্থ্য না হইয়া এভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন: "আমীর খাঁ নিঃসন্দেহে একজন যোগ্য ব্যক্তি এবং সাহসী ও পরিণামদর্শী লোক হইলেও ভারতের উচ্চ কর্মচারীদের মধ্যে যে কোন বিবেচনার চেয়ে সমধিক রসালাপকে পছন্দ করায় এবং ভাষা ও ব্যবহারে অনুচিত চঞ্চলতার সহিত কাজ করা, তাঁহার চরিত্রের একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য: পক্ষান্তরে তাঁহার সাহায্যে আপনার এই দীনহীন ভৃত্যের ন্যায় যাহাদের তরক্কী হইয়াছে এবং তাঁহার সুপারিশে বাদশাহের দ্বার চুম্বন, ব্যক্তিগতভাবে বাদশাহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা ও ইজ্জত লাভের সম্মান পাইয়াছেন, তাঁহারা ও আমি স্বয়ং হিন্দুরাজন্যবর্গ ও হিন্দুস্থানের উচ্চ কর্মচারীবৃন্দ বা দরবারের আমীরদের পক্ষে এখনও যথোচিত গুরুত্ব লাভ করি নাই। এই সমুদয় শক্তিশালী লোকের চক্ষে আমরা এখনও গতকল্যের লোক এবং আমাদের পদ ও মর্যাদা এখনও

গত কল্যের। এই সকল লোক নিজামুল মুল্ক ও কমরুদ্দীন খাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করেন এবং দীর্ঘকাল হইতে তাঁহাদের নির্দেশ পালনে ও তাঁহার মর্জি মুতাবিক চলিতে অভ্যস্ত; (তাঁহাদের) বশ্যতা স্বীকার ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের হুকুম তামিল করার উপলক্ষ হওয়াকে ইহারা সম্মান বলিয়া বিবেচনা করেন। এমতাবস্থায় শুধু আমাদের স্থায় লোকের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এরূপ দুইজন মন্ত্রীর সহিত কলহ করিলে আপনার ভৃত্যের ক্রটিপূর্ণ মনের মতে কোন উপকার হইবে না। অন্যান্যের সম্পর্কে হুজুরের বাদশাহী মনে যাহা স্থির করিয়া থাকিবেন, তাহা নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক দল বলিয়া প্রমাণিত হইবে।" এই সকল কথায়, বাদশাহ যেন গাঢ়নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার সাম্প্রতিক মতলব ত্যাগ করিয়া নিজামুল মুল্ক ও কমরুদ্দীন খাঁর সহিত সদ্ভাবে থাকিতে মনস্থ করিলেন। পরদিন আমীর খাঁ যথারীতি দরবারে আসিয়া বাদশাহের স্বর ও আকৃতিতে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ঐ পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বাদশাহ উত্তর দিলেন," ইপ্সিত কার্য প্রণালী সম্পর্কে আমি ভাবিয়া দেখিলাম, তুরানী আমীরেরাই এখন আমার প্রধান হাঁসকল, উহারই উপর আমার বিষয়কর্ম আবর্তিত হইতেছে; সুতরাং তাঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট করা সঙ্গত কাজ হইবে না, ইহা আমার পক্ষে সম্মান-জনকও হইবে না। কাজেই এই সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের শান্ত ও সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজনীয়; উৎসাহী ও বিশ্বাসী ভৃত্য হিসাবে তোমার চরিত্রকে ঘৃণ্য মনে করে বলিয়া অনুরূপভাবে তোমারও উচিত এখন হইতে যাহাতে বিবাদ বাঁধিতে বা তাঁহাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে, এমন কোন কার্যে বিরত থাকা। এই দুই দিনে যে বিরাট পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, আমীর খাঁ তাহা সম্যক বুঝিতে পারিয়া দ্রুতপদে শহরের বাহিরে নিজামুল মুল্কের নিকট গমন করিয়া তাঁহার ও কমরুদ্দীন খাঁর নিকট যথাসাধ্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদের মর্জিমত কার্য করিতে ইচ্ছুক বলিয়া তাঁহাদের উভয়ের নিকট তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। নিজামুল মুল্ক আমীর খাঁর অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তাঁহার ও কমরুদ্দীন খাঁর মধ্যে হালে কিছু ঔদাস্য দেখা দিয়াছে; কাজেই তাঁহার বিবেচনায় কিছুকালের

জন্য তাঁহার (আমীর খাঁর) ইলাহাবাদে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত ; তিনি আরও বলিলেন, মোটের উপর ইহা আপনার শাসন কর্তৃত্ব ও পদ। আমীর খাঁ তাঁহাদের উপদেশ অনুযায়ী কার্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন ; অনুরূপ ভাবে তিনি বাদশাহের সম্মতি লইয়া রাজধানীর বাহিরে যাত্রা করিয়া শহরতলীতে শিবির স্থাপন করিলেন। সেখানে যুদ্ধের সাজ-সজ্জার ব্যবস্থা, নিজের বিষয়-কর্মের শৃঙ্খলাবিধান এবং তাঁহার অনুপস্থিতে তাঁহার পক্ষে কার্য করার জন্য উপযুক্ত গোমস্তা নিয়োগ করিতে কিছুকাল কাটাইয়া তিনি তাঁহার যাত্রা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। এদিকে ইসহাক খাঁ দরবারে থাকিয়া বাদশাহের মনে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য লাভ করিলেন ; তিনি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করিতেন, নিজামুল মুল্‌ক এবং কমরুদ্দীন খাঁ উভয়েই তৎপ্রতি অত্যন্ত সম্মান করিতেন। এই প্রস্থানের পরে দরবারে আরও কয়েকটা পরিবর্তন ঘটিল। সাদৎ খাঁর জামাতা আবুল মনসুর খাঁকে অযোধ্যার শাসন-কর্তৃত্ব দানে সম্মানিত করা হয় ; তিনি ঐ রাজধানীতে গমন করিয়া তাঁহার শাসনকার্যের সহায়তা ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে, এরূপ সমস্ত কলায় আত্মনিয়োগ করিলেন। জাকারিয়া খাঁ তাঁহার লাহোর ও মুলতানের শাসনকর্তার পদে বহাল রহিলেন ; খোদ নাদির শাহ্‌ তাঁহার এই পদ বজায় রাখিয়া যান। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নূর মোহাম্মদ খাঁ—তিনি সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি নাদির শাহের সঙ্গে গমন করিয়া আফগানদের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযানে পথ-প্রদর্শকরূপে কাজ করায় বিজেতা কর্তৃক শাহ্‌ নওয়াজ খান[১১] উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন ; তাঁহাকে পাঞ্জাবে বহাল রাখা হয়। সেখানে তাঁহাকে প্রদত্ত জিলাগুলি শান্ত করা ও উহাদের রাজস্ব উপভোগ করা ভিন্ন তাঁহার আর কোন কাজ ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

নাদির শাহের প্রস্থানের পরে রাজধানীতে ও সমস্ত প্রদেশে দৃশ্য কিছুকাল নিরানন্দ থাকার পর এখন বাঙ্গালায় তাহা চিত্তাকর্ষক হইয়া দাঁড়াইল। শুজা খাঁকে আমরা বাঙ্গালা, আজিমাবাদ ও উড়িষ্যার সুবাদার রূপে দেখিয়াছি। নাদির শাহের শাহ্‌জাহানাবাদ আগমনের প্রাক্কালে তিনি ইহজীবন ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় দয়ার আবাসে গমন করেন। ঐ সুযোগ্য পুরুষের

সমস্ত সদগুণ বর্ণনা করা কঠিন। এই গ্রন্থে এমন কি উহাদের অল্প কয়েকটা বর্ণনা করা আরও কঠিন হইবে। তিনি কিছু ব্যক্তিগত অনুগ্রহ দ্বারা অপরিহার্য রূপে বাধিত করেন নাই, তাঁহার চাকরীতে এমন একটি লোকও ছিল না। তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্তী দেখিয়া তিনি সামরিক বেসামরিক প্রত্যেক আমীর ও প্রত্যেকটি লোককে এবং তাঁহার চাকরীতে নিযুক্ত প্রত্যেকটা সৈন্য বা অশ্বারোহীকে দুই মাসের বেতন উপহার দেন। তাঁহার গৃহস্থালীর ভৃত্য-বর্গ এমনকি যে সকল মেয়েলোক তাঁহার হারেমে নীচ পরিচারিকারূপে কাজ করে, তাহারাও তাঁহার এই অনুগ্রহ হইতে বাদ পড়ে নাই। মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন পূর্বে তিনি তাহাদের প্রত্যেকের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লোক প্রেরণ করেন। তাহার দানশীলতা এমনি ছিল যে, একবার তাঁহার সহিত যে কোন লোকের দৈবাৎ পরিচয় ঘটিত, সে অবশ্যই তাঁহার নিকট কিছু অনুগ্রহ লাভ করিত। এমন কি, তিনি তাঁহার বাসস্থান বুরহানপুরে যে সকল বৃদ্ধা রমণীকে দেখিতে পান, অথবা যাহাদের কথা তিনি শুনিয়াছেন বলিয়া তাহার স্মরণ হইত, এমনকি তাহারাও তাঁহার বদান্যতা ভোগে বঞ্চিত হইত না, তাহাদের প্রত্যেকেই লাভজনক বৃত্তি পাইত। তিনি এত ন্যায়বিচারক ও এত অধিক সহৃদয় বিচারপতি ছিলেন যে, দরিদ্রতম লোকও তাঁহার নিজম পুত্রের সমকক্ষরূপে তাঁহার নিকট নিশ্চিতরূপে হাজির হইতে পারিত। ভীত চড়ুই শ্যেনপক্ষীর পশ্চাদ্ধাবন হইতে তাঁহার বক্ষে আশ্রয় লাভের নিশ্চিন্নতায় তাঁহার সদাশয়তার উপর পূর্ণ-ভরসায় তাঁহার দিকে উড়িয়া যাইত। ফলে ইতিহাসের সহিত পরিচিত ব্যক্তিরা নওশিরওয়ার[২২] রাজত্বে বাস করিতেছিল বলিয়া মনে করিত। তিনি এত দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, যখনই সামান্য কিছু যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা এমন কি ভদ্রলোকের ভঙ্গি ও ভাষার অধিকারী কোন লোক মুর্শিদাবাদে আসিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপস্থিতি ও তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্যের সংবাদ পাইতেন এবং সাধারণতঃ তাঁহার রাজধানীতে লোকটির কোন বন্ধু থাকার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত ৩/৪ দিন অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার আবেদনক্রমে তিনি বরাবরই নবাগতের দাবী পূর্ণ বা আংশিক

বাঙ্গালার সুবাদার সুজা খাঁর প্রশংসনীয় চরিত্র

মঞ্জুর করিতেন ; নতুবা যদি তিনি লক্ষ্য করিতেন যে, লোকটির কোন পরিচিত লোক বা বন্ধু নাই, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সভাসদদের একত্র করিয়া লোকটির উপস্থিতি ও তাহার ভারার্পিত কার্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিতেন "বাহ্য লক্ষণ দ্বারা যতদূর জানা যায় যে, তাহাতে তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গদের কেহই নবাগতের বিষয় কিছু অবগত নহেন ; "তিনি আরও বলিতেন, "নতুবা তাঁহার পক্ষে ইতঃপূর্বেই আমি কোন দরখাস্ত পাইতাম।" এই অল্প কয়টি কথার পরে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের কেহ যেন লজ্জা পাইয়া দরখাস্ত করে, তজ্জন্য সময় দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটু থামিতেন ; কেহ দরখাস্ত করিলে তিনি সর্বদাই অনুকুল উত্তর দিতেন ; নতুবা তিনি নিজেই লোকটার খোঁজ লইবার এবং যেহেতু তিনি এতদূর হইতে আসিয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে তাঁহার অবস্থার সংবাদ দান ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিত ছিল, ইহা জ্ঞাপন করার জন্য লোক পাঠাইতেন ; অতঃপর তিনি তাঁহাকে গোপনে কিছু টাকা সরবরাহ করিতেন। তাঁহার ভৃত্যদের কেহ এ সমুদয় ব্যাপারে তাঁহাকে প্রতারণা করার মত এত সাহস পাইত না। এরূপ প্রথা এত গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া থাকিলেও এবং সর্বত্র ও যাবতীয় উপলক্ষে নিত্য-অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহার গৃহস্থালীতে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। আমার বক্তব্য এই যে, ভৃত্য বা চোপদারেরা তাহাদের মনিবের নিকট হইতে কাহারও কাছে কোন জিনিস লইয়া গেলে কিছু বখশিসের জন্য তাঁহাকে বিরক্ত করে, এবং অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসের সহিত নিজেদের সংশোধন করে। এই কুপ্রথা এরূপ নীচ-প্রকৃতি লোকের নিকট স্বাভাবিক হইয়া অপেক্ষাকৃত ভাল শ্রেণীর অপর কিছু লোকের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; তাহারা ইহাদের অনুকরণ করিতে লজ্জা বোধ করে না। কখন এরূপ অন্যায় দাবী করা হইলে কিছুই তাহা তাঁহার কর্ণগোচর না হইয়া পারিতনা এবং অপরাধীর চাকরী হইতে বরখাস্ত হওয়া নিশ্চিত ছিল। পক্ষান্তরে সংবাদদাতা পুনরায় পারিশ্রমিক পাইত। তজ্জন্য তাঁহার সংসারে ও রাষ্ট্রে এই লজ্জাকর রীতি অজ্ঞাত ছিল। ইহা সত্য যে, তাঁহার সংসারের লোকে এত সদাশয় ব্যবহার পাইত যে, কখনও অন্যকে প্রদত্ত দ্রব্যের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত না। সন্তুষ্ট ও আরামে থাকায় যাচ্ঞা করার মত নীচে

নামিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইত না বলিলেই হয়। সময় সময় তিনি নবাগতের অভাবের সংবাদ পাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিতেন এবং যদি বুঝিতে পারিতেন যে, সে তাঁহার সহিত চাকরী করিতে চাহে, তাহা হইলে তিনি অনুকম্পা ও সম্মানের সহিত তাহাকে ভর্তি করিয়া লইতেন; কিন্তু সে বাড়ী গেলে তিনি এই অল্প কয়েকটি কথায় ত্রুটি স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে কিছু টাকা পাঠাইতেন: "এত সস্তার দেশে এমন কি এত অল্প উপায়েও কাজ চলিতে পারে; কিন্তু অভাবে পড়িলে আল্লাহ্ তোমার জন্য অনেক কিছু করিতে পারেন।" তাঁহার চাকরীতে নিযুক্ত সমস্ত লোককে তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে জানিতেন এবং তাহাদের প্রত্যেককেই তিনি বিবিধ উপাদেয় খাদ্যপূর্ণ খোঁয়া বা ট্রে পাঠাইতেন। কাহাকেও প্রত্যহ, কাহাকেও একদিন অন্তর, কাহাকেও সপ্তাহে দুই দিন এবং যে কেহ একবার এরূপ সদাশয়তার কার্য দ্বারা সম্মানিত হইতেন, তিনি এ বিষয়ে চিরতরে নিশ্চিত হইতেন; কখনও ইহা এমন কি একবার বন্ধ হওয়ারও দৃষ্টান্ত নাই। ভদ্রলোক হউক কি অন্য লোক হউক, যত লোককে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন গজদন্তের পাতায় নির্মিত তাঁহার একখানা বিশিষ্ট স্মারক-লিপি পুস্তকে তিনি তাহাদের সকলের সম্পর্কে একটা টোকা রাখিতেন; প্রতি রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে উহা একবার পাঠ করিয়া কয়েকটা নামের নীচে তিনি যেরূপ সঙ্গত মনে করিতেন, সেরূপ একটা টাকার অঙ্ক (সময় সময় ইহা বেশ মোটা হইত) বসাইয়া রাখিতেন। অতঃপর তিনি খাজানা দানে বিলম্বকারী কোন জমিদার বা তাঁহার গোমস্তাকে ডাকাইয়া আনিয়া জানাইতেন যে, তিনি অমুক ব্যক্তিকে তাঁহার উপর সাজওয়াল বা দাবী আদায়কারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছা যে, এইটাকে সে দস্তুরি পাইতে পারে। এই অনুরোধ বরাবরই রক্ষিত হইত; অনেক সময় জমিদার স্বয়ং নিজ হইতে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিতেন; এরূপ সুপারিশ করা লোককে বাধিত করা তিনি সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। কিছুকাল পরে তিনি বরাবরই সাজওয়ালকে সে কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করে, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেন। সে সাধুভাবে তাহার লাভের কথা স্বীকার করিলে তিনি তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন এবং তাহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু যদি সে সত্যের অপলাপ বা কোন কিছু

গোপন করিত, তিনি সেই মুহূর্ত হইতে তৎপ্রতি আস্থা স্থাপনে বিরত হইতেন। এভাবে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের লাভবৃদ্ধি করিয়া তিনি তাহাদের নাম কাটিয়া ফেলিতেন এবং আর এক দলের নাম লিখিতেন; তাঁহার সমগ্র জীবনভর তিনি তাহার এই পবিত্র নিয়ম চালু রাখেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে ক্ষমা করুন এবং দয়া করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থান দান করুন! আমিন!

এই চমৎকার লোকটির মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আলাউদ্দৌলাহ্ সরফরাজ খাঁ[১৯] তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তিনি মসনদে[২০] বসিয়া তিন সুবার দখল লন। মূলতঃ শুজা খাঁর নামে লিখিত হইলেও ইনিই নাদির শাহের পত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি কর্তৃক আজিমাবাদের সহকারী শাসনকর্তার পদে উন্নীত আলীবর্দী খাঁ তাঁহার পুত্রকে বিশেষ বিশ্বাস করিতেন না। নাদির শাহের প্রস্থানের পরে সাম্রাজ্যে যে ভাঙ্গন ধরিবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার নূতন মনিবের প্রতি কোন সম্মান দেখাইতেন না বলিলেই হয়; বরং তিনি স্বয়ং তাঁহার পদ লাভের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাস্তবিকই তাঁহার নূতন রাজ্যের সীমান্তে শিবির স্থাপন করেন। তিন প্রদেশের নূতন সুবাদারের নিকট হইতে ভয়ের বিশেষ কারণ ছিল বলিয়া নহে; এই লোকটি ধর্মকর্মে আসক্ত একজন নিছক ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত হন। তিনি অত্যন্ত নিয়মিতভাবে তাঁহার নিরূপিত নামাজ আদায় করিতেন; তিনি পবিত্র রমজান মাস ছাড়াও পুরা তিন মাস রোজা রাখিতেন এবং বৎসরের আদ্যোপান্ত নির্ধারিত কয়েকটা ধর্ম কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করিতেন। কিন্তু যুগপৎ রাজদণ্ড পরিচালনাকারীদের জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও হৃদয়ের প্রশস্ততা তাঁহার নিতান্ত কম ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাঁহার আত্মা ধর্মের এই সকল খুঁটিনাটি কার্যে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকায় তিনি রাজকার্যে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন না; তাঁহার ন্যায় পদস্থ ও মর্যাদাসম্পন্ন লোকের যে সকল সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও যে সকল গুণের অতি দরকার, তিনি তাঁহার নাগাল পান নাই। ইহা সত্য যে, তিনি তাঁহার পিতার দেওয়ান রায়-রয়ান

সরফরাজ খাঁ সুজা খাঁর উত্তরাধিকারী হন

আলম চাঁদের কোন অনিষ্ট করেন নাই ; জগত শেঠ বা হাজী আহমদকেও উৎপীড়ন করেন নাই ; বিগত আমলে বিষয়কর্ম পরিচালনায় এই দুইজন সুযোগ্য ও অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির অপ্রতিহত কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয় ও শাসনকার্যের কর্তৃত্ব এমন কয়েক ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দেন, যাঁহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত ব্যক্তিগত অবিচার ভোগ করেন। ইঁহারা ছিলেন হাজী লুৎফুল্লাহ্, মর্দন আলী খাঁ ও মীর মুর্তজা ও অপর কয়েক ব্যক্তি। দীর্ঘকাল যাবত হাজী আহমদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ থাকায় তাঁহারা সর্বত্র তাঁহার নিন্দা করিতেন এবং এমন ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা তাঁহাকে জ্বালাতন করিতেন[২৬] যে, যে কোন লোক তাহাতে অত্যন্ত কুপিত না হইয়া পারিত না। এই সকল আমীর হাজী আহমদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া প্রত্যহ সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বর্ণে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহারা এতদূর অগ্রসর হন যে, তৎকালে সরফরাজ খাঁর মনে একটা পূর্ণ পরিবর্তন আনয়নে সমর্থ হন। শুজা খাঁর মসনদে আরোহনের সময় হইতেই হাজী আহমদ দেওয়ানের পদ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন ; এই শাহ্জাদা তাঁহার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া মীর মুর্তজাকে প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার নিজ জামাতা হাসান মুহম্মদ খাঁকে প্রদানের জন্য হাজীর জামাতা আতাউল্লাহ খাঁকেও রাজমহলের ফৌজদারীতে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন। তাঁহার অজস্র শত্রুর প্রভাবে ভীত হইয়া ও সর্ব দিক হইতে নিজেকে আক্রান্ত দেখিয়া হাজী আহমদ প্রত্যেকটা বিষয় তাঁহার ভ্রাতা আলীবর্দী খাঁর গোচরে আনিতেন এবং সর্বদাই এত বাড়াইয়া লিখিতেন যে, প্রত্যেকটা ব্যাপার সহস্রগুণ বর্ধিত হইত। তিনি ইতঃপূর্বেই তাঁহার অভিসন্ধি স্থির করায় উৎসাহ ও অনুরক্তির ছদ্মবেশে নূতন সুবাদারকে তাঁহার সৈন্যদলের অধিকাংশ বিদায় দিয়া ব্যয় সঙ্কোচ করিতে সম্মত করাইলেন। দুর্বল-চিত্ত বলিয়া তিনি এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন। যুগপৎ স্বাভাবিক আলস্য এবং সম্ভবতঃ অবিশ্বাস ও ভয়ের দরুন তিনি মনুচেহের খাঁর প্রদত্ত উপদেশে কর্ণপাত করিলেন ; ইনি হাজী আহমদের দুই পুত্র—আজিমাবাদ হইতে যাত্রাকারী জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁ ও তাঁহার রঙ্গপুরের ফৌজদারী হইতে আগত সায়্যিদ আহমদ খাঁকে

থৃত বন্দী করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সুবাদারের মনের অসংলগ্নতা এতই প্রবল ছিল যে, এরূপ উপদেশ শ্রবণের পর তিনি স্বয়ং তাহা হাজী আহমদের নিকট ব্যক্ত করার মত দুর্বলতা প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধ লোকটার আতঙ্ক দূর ও পুনরায় তাঁহার মন পাওয়ায় জন্য তিনি এই আস্থা স্থাপনের কৃতিত্ব গ্রহণের ভাণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্য নির্বাহে আর এক বিচিত্র অসঙ্গতি ছিল। এরূপ বিশ্বাস করার পর তিনি পুনরায় সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে তাঁহাকে প্রকাশ্যে অপমানিত করিলেন। আলীবর্দী খাঁ হাজী আহমদের দৌহিত্র মির্জা মুহম্মদকে দত্তক[২৭] গ্রহণ করেন; তাঁহার সহিত আতাউল্লাহ খাঁর কন্যা অর্থাৎ হাজী আহমদের নাতনীর বাগদান হইয়াছে শুনিতে পাইয়া তিনি চুক্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া কিশোরী কনেকে নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চাহিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার দরবারে তাঁহার নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে একটা দল গঠনেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি উহার শক্তি ও সমর্থন বৃদ্ধির প্রয়াস পাইলেন। তিনি আজিমাবাদে সরকারী অর্থ পরিচালনায় একটা তদন্ত বসাইলেন এবং তাঁহার পিতা আলীবর্দী খাঁকে যে সকল সৈন্য দেন, তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। এত বৎসর কালের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির অনুরক্ত হইয়া পড়ায় তাহারা প্রত্যাবর্তনে ইতস্ততঃ করিতেছে বোধ হওয়ায় তিনি শুজা খাঁ কর্তৃক তাহাদিগকে প্রদত্ত সমস্ত দান ও সাহায্য বাজেয়াপ্ত ও তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট করিতে যত্নবান হইলেন। হাজী আহমদ এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মামুলী অতিশয়োক্তির সহিত নিজে আরও অনেক কথা বানাইয়া লিখিয়া তাঁহার ভ্রাতা আলীবর্দি খাঁর নিকট প্রেরণ করিতেন এবং নিজের উক্তি আরও জোরদার করার জন্য তাহাতে সায়্যিদ আহমদ খাঁর সাক্ষ্য ও মোহরের অনুমোদন যোগ করিয়া দিতেন; এই উপলক্ষে তিনি পিতার আদেশের গুরুত্ব মানিয়া লইতেন। এই সমুদয়ের ন্যায় এরূপ কার্যাবলীর পরেও সরফরাজ খাঁ হাজী আহমদ ও তাঁহার পুত্রদের চিত্তজয়ের প্রত্যাশা করেন।

"বাস্তবিকই কি চমৎকার নীতি এবং অসম্ভব অভিসন্ধির কি চমৎকার পরিকল্পনা!"

আলীবর্দি খাঁ এই সকল চাতুর্যপূর্ণ মতলব সম্পর্কে আগাগোড়া ওয়াকিফহাল থাকিয়া এবং তাঁহার বিষয়কর্ম এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে

যে, ভণ্ডামি ও সহনশীলতার কৌশল দ্বারা তাহার কোন প্রতিকার কদাচিৎ সম্ভবপর বুঝিতে পারিয়া তাহার বন্ধু ইসহাক খাঁর সহিত তাঁহার পরিচয় ও পূর্ব সম্পর্কের সুযোগ লইতে মনস্থ করিলেন। বাদশাহ তখন সম্পূর্ণরূপে তাহার কথামত চলিতেন। বার্ষিক এক কোটি টাকা মামুলী কর এবং সরফরাজ খাঁর ঐশ্বর্য ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও এক কোটি টাকা নজর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তিনি তিন প্রদেশের সনদ তাঁহার নিজ নামে বদলি করাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া তিনি তাঁহাকে গোপনে এক পত্র লিখিলেন। এই সঙ্গে তিনি আর একটি অনুরোধ করিলেন; সরফরাজ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রদেশত্রয় পুনরাধিকারের জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দিয়া তিনি একটা বাদশাহী ফরমান প্রার্থনা করিলেন। তাই পত্রগুলি প্রেরণের পরে তিনি প্রচার করিলেন যে, তিনি ভোজপুরের জমিদারদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে চাহেন; এই লোকগুলি তাহাদের সংখ্যা, লুটপাট ও বিদ্রোহী স্বভাবের জন্য তদঞ্চলে বিখ্যাত ছিল। ঐ জন্যে তিনি তাঁহার সৈন্য সমাবেশ সম্পূর্ণ করিলেন। তাহাদের নিয়ত প্রস্তুত রাখা হইত। যুগপৎ সরফরাজ খাঁকে প্রকাশ্যে তাঁহার ছদ্ম মতলব জানাইবার সূক্ষ্ম কৌশলও তাঁহার জানা ছিল। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করার প্রথম সুযোগ প্রাপ্তি মাত্রই তাহা কাজে লাগাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। অবশেষে নাদির শাহের ইরান গমনের দশ মাস ও শুজা খাঁর মৃত্যুর ঠিক তের মাস পরে তাঁহার অনুরূদ্ধ ভাষায় লিখিত বাদশাহী ফরমান তাঁহার হস্তগত হইল। জনৈক বিখ্যাত জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর তাঁহার অসীম আস্থা ছিল। সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে এখন যুদ্ধ-যাত্রা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি তাঁহার দ্বারা তাঁহার যাত্রার তারিখ নির্ধারিত করাইলেন। ইতিমধ্যে তিনি রাস্তায় এমন প্রতিবন্ধক স্থাপন করিলেন যে, কোন পর্যটক মুর্শিদাবাদ যাইতে পারিত না; গোপনে তিনি তাঁহার বন্ধু জগত শেঠ ফতেহ চাঁদকে[৮] পত্র লিখিলেন যে, অমুক তারিখের মধ্যে তিনি যাত্রা করিতেছেন। একজন বিশ্বস্ত লোক মারফতে পত্রখানা প্রেরিত হইল। তাহাকে একটা নির্দিষ্ট তারিখ দেখাইয়া দিয়া সেদিন পত্রখানা সমর্পণের আদেশ দেওয়া হইল। এই

ভাবে সমস্ত ব্যাপার ঠিক হইলে ১১৫২ হিজরীর জিলহজের শেষভাগে আলীবর্দী খাঁ ভোজপুরের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযানে বহির্গত হইলেন। আজিমাবাদ পার হইতে কিছু দূরে ওয়ারিস খাঁর হাওজের নিকট তাঁহার তাঁবু পড়িল। প্রস্থানকালে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁকে নিজের প্রতিনিধি ও সহকারী নিযুক্ত করিয়া গেলেন। এই গরীবের পিতা সায়্যিদ হেদায়েত আলী খাঁ আসাদজঙ্গকে[১৯] তিনি সেরেস ও কুটুম্বহ জিলার ফৌজদারী করিতে প্রেরণ করিলেন; ঐ আমীরের প্রস্থানের দুই দিন পরে তিনি তাঁহাকে একটা ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, মুর্শিদাবাদ যাত্রায় মনস্থ করিয়া তিনি তাঁহাকে ও জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁ উভয়কেই সর্বশক্তিমান আল্লার হাওলা করিতেছেন। তিনি আরও লিখিলেন, "আমার আশা, আপনি সর্বদা তাঁহার সহিত সদ্ভাবে বাস করিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং জরুরী অবস্থা তাকীদ অনুযায়ী কার্য করিবেন।" যাত্রার প্রাক্কালে তিনি কি হিন্দু কি মুসলমান তাঁহার সমস্ত কর্মচারীকে একত্র করার আদেশ দান করিলেন। তাঁহাদিগকে বিপুল সংখ্যায় একত্রে দেখিয়া তিনি দুই ব্যক্তিকে সভা-মধ্যে হাজির করিলেন—তাঁহাদের একজন ধর্মনিষ্ঠার জন্য পরিচিত শ্রদ্ধাস্পদ মুসলমান; তিনি আসিলেন পবিত্র কালামুল্লাহ্‌ হাতে লইয়া; অপরজন ব্রাহ্মণ; তাঁহার দক্ষিণহস্তে ছিল গঙ্গা জলের একটা পাত্র ও অন্য হস্তে একটা তুলসীর ডাল[২০]। ঐ মতাবলম্বী লোকেরা এই দুইটা প্রতীককে সর্বোচ্চ ভক্তির সহিত নিরীক্ষণ করে ও এগুলি ছুঁইয়া সর্বাপেক্ষা পবিত্র হলফ লইয়া থাকে। মুহূর্তকাল নীরব থাকার পর তিনি মুসলমানদিগকে পবিত্র কুরআন ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিতে এবং হিন্দুদিগকে ঐ সকল প্রতীকের উপর হাত রাখিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর তিনি সভাজনকে সম্বোধন করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন। "আমি এখন আমার ব্যক্তিগত শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। আপনাদিগকে আমি আমার পুরাতন সহচর বলিয়া জানি; আপনাদের বাহুর উপরই আমাকে বিশ্বাস রাখিতে এবং আপনাদের সাহস হইতেই আমাকে সফলতার প্রত্যাশা করিতে হইবে। তজ্জন্য আমার অনুরোধ, যদি আপনারা আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে এবং আমার ভাগ্যের

অনুসরণ করিতে চাহেন, তবে আপনাদের প্রত্যেকে মেহেরবাণী করিয়া সর্বাপেক্ষা পবিত্র হলফ লউন যে, আমি পানিতেই ছুটি বা আগুণেই প্রবেশ করি এবং আমার শত্রু আফগানিয়ারই হউক বা রুস্তমই[11] হউক, আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। অতএব আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমার বন্ধুদের আপনারা বন্ধু ও আমার শত্রুদের আপনারা শত্রু হইবেন এবং আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুকনা কেন, আপনাদের জানমাল দ্বারা অলঙ্ঘ্যরূপে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইবেন।" ঐ সকল প্রাচীন যোদ্ধা তাঁহার শিবিরে প্রতিপালিত এবং তাঁহার নিকট অসংখ্য অনুগ্রহ লাভ করায় দীর্ঘকাল পূর্বেই অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ও সর্বাপেক্ষা পবিত্র চুক্তি সম্পাদনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাদের সকলেই মুসলমানেরা গৌরবান্বিত কালামুল্লাহ তাঁহাদের কপালে ও চক্ষুতে ছোঁয়াইয়া এবং হিন্দুরা ব্রাহ্মণের পা ও তুলসীর জল ছুইয়া এবং তৎপরে গঙ্গাজল পান করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং যেখানে তিনি তাঁহাদের লইয়া যান, সেখানে তাঁহার অনুগমন করিতে একবাক্যে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইতঃপূর্বেই তাঁহার মনের মত করিয়া গঠিত হওয়ায় এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের অনুরক্ত হওয়ায় প্রাচীন কর্মচারীরাই এই সব করিলেন; নবীনেরা নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। আলীবর্দী খাঁ এখন ঐ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের নিকট তাঁহার অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তাঁহার নিজের, তাঁহার ভ্রাতার ও তাঁহাদের পরিবারের প্রত্যেকের যে অপকার করা হইয়াছে, তাহাতে বাধ্য হইয়া ঐ অত্যাচার সমাপ্ত করার জন্য তিনি তাহাদের প্রতি অত্যাচারকারী সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা করিতেছেন। এই কথায় তাহাদের কেহ কেহ চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু বিনা শর্তে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করায় এবং এখন এত অধিক পরিমাণে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় তাহারা দেখিতে পাইল যে, চুক্তি পালন ও তাঁহার ভাগ্যের অনুসরণ করা ভিন্ন তাহাদের জন্য আর কোন পক্ষ নাই। ইতঃপূর্বেই রাত্রি হইয়া পড়ায় সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। পরদিন শুভদিন বলিয়া সূর্যোদয়ের সময় তিনি পূর্বদিকে ঘুরিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। তাঁহার প্রাচীন সৈন্যদের একটা সুগঠিত বাহিনী ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি সরঞ্জাম সজ্জিত একটা উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। কোথাও না থামিয়া অবিশ্রান্তভাবে চলিয়া তিনি শাহাবাদে পৌঁছিলেন। সেখানে একটা দুর্গ-প্রাকার আছে; তাহাতে পাহাড় হইতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। সেখানে একটা নিকটবর্তী উপত্যকায় তিনি তাঁহার সৈন্যদল লুকাইয়া রাখিলেন এবং মুস্তফা খাঁ নামক জনৈক অনুমোদিত উৎসাহ এবং পরীক্ষিত সাহস ও আচরণের আফগান কর্মচারীকে নির্বাচিত করিয়া একশত অশ্বারোহী হ তাঁহার হস্তে সরফরাজ খাঁর একটা আদেশ ও ছাড়পত্র অর্পণ করিলেন। ইহা ছিল প্রথমে অন্য একজন সেনা-নায়কের জন্য নির্ধারিত কিন্তু আলীবর্দি খাঁ কোনরূপে ইহা হস্তগত করেন। রক্ষীরা সংখ্যায় মাত্র ২০০ বন্দুকচি ছিল বলিয়া সতর্ক থাকিত। ঐ কর্মচারী রক্ষী সৈন্যদলকে তাঁহার ছাড়পত্র দেখাইয়া অগ্রসর হইতে তৎপরে ঘুরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া নিজেকে পথের মালিক করিতে আদিষ্ট হইল। এই কৃতকার্যতার পর সৈন্যদলের অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিতরূপে তাঁহাকে তাঁহার নাগারা পিটাইতে বলা হইল। মুস্তফা খাঁ তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া উপত্যকার ভিতরে অগ্রসর হইলে প্রচলিত প্রথানুযায়ী প্রাচীর হইতে তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি কে, ও কি জন্য আসিয়াছেন? তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার নির্দেশ পাইলেন। কর্মচারীটি তাঁহার একজন লোককে ছাড়পত্র ও লিখিত আদেশসহ প্রেরণ করিলেন। জনৈক লেখক তাহা পাঠ করিয়া দরজা খুলিয়া দিতে ও সৈন্যদের ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতে আদেশ করিলেন। মুস্তফা খাঁ ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নাগারা পিটাইবার আদেশ দিলেন; এই সঙ্কেতের সহিত তাঁহার লোকেরা কিছু উচ্চ চীৎকার যোগ করিল। পাহাড়ের পশ্চাতে লুক্কায়িত পশ্চাদ্বর্তী সৈন্যেরা অচিরে এই সংকেত বুঝিতে পারিয়া বিপরীত দিকে ফিরিল। এবং পতাকা উড়াইয়া ও গান গাইয়া যুদ্ধের শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হইয়া সহসা (দুর্গের সম্মুখে) হাজির হইল। রক্ষী সৈন্যেরা এরূপ দৃশ্যে আতঙ্কিত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং বাধা দান করিতে চাইল। তখন মুস্তফা খাঁ তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া বলিল, তাহারা বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করিলে

তিনি সটান তাহাদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিবেন। তাই ভীতি প্রদর্শনে ভয় পাইয়া তাহারা সকলেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং মুস্তফা খাঁর লোকদিগকে দ্বার খুলিয়া দিতে দিল। অতঃপর পশ্চাদ্বর্তী সৈন্যেরা বিনাকষ্টে (গিরিসঙ্কট) অতিক্রম করিয়া সমস্ত সামরিক আড্ডা দখলে আনিল। যে লোকটিকে জগৎশেঠের নিকট লিখিত চিঠির ভার দেওয়া হয়, সে যেদিন ইহা পেশ করার আদেশ পায়, ইহা ছিল সেই দিন। তিনি গর্ভের লেখা পাঠ করিয়া ও তারিখগুলি মিলাইয়া দেখিয়া স্থির করিলেন, তাঁহার বন্ধু আলীবর্দী খাঁ এই সময়ের মধ্যে তেলিগড়ি গিরিসঙ্কটের এই ধারে আসিয়া থাকিতে বাধ্য এবং ৪/৫ দিনের মধ্যেই তিনি মুর্শিদাবাদ রাজ্যে পৌঁছিবেন। বাহ্যদৃষ্টিতে আতঙ্কিত হওয়ার ভাব দেখাইয়া তিনি আলীবর্দী খাঁর নিকট হইতে এইমাত্র প্রাপ্ত চিঠিখানা সরফরাজ খাঁর নিকট পেশ করিয়া বলিলেন, আমার সন্দেহ হয়, তিনি এখন রাজমহলে। যুগপৎ তিনি খোদ ঐ রাজার নামীয় আলীবর্দী খাঁর আর একখানা পত্র দাখিল করিলেন। উহার মর্ম এই: "যেহেতু আমার ভ্রাতা হাজী আহমদকে প্রকাশ্যে বহু অপমান করার পরে আমাদের পরিবারের সম্মান ও সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, সেই পরিবারকে আরও অপমানের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য হুজুরের গোলাম এতদূর আসিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বস্ততা ও বশ্যতা ভিন্ন অন্য কোন ভাব লইয়া নহে। সুতরাং আমার আশা হাজী আহমদ তাঁহার পরিবার ও আশ্রিতদের লইয়া আমার নিকট আসিবার অনুমতি পাইবেন।" এই সংবাদে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া সরফরাজ খাঁ নিষ্ফল ভর্ৎসনায় তাঁহার আক্রোশ প্রকাশ করিয়া তৎপরে তাঁহার মন্ত্রীবর্গ ও সাধারণ কর্মচারীদের এক সভা আহবান করিলেন; সেখানে হাজী আহমদও অনুরূপ ভাবে আহূত হইলেন। আম দরবার-কক্ষ উন্মুক্ত করা হইল। হাজী আহমদকে তিনি কঠোর ভর্ৎসনা ও ভয় প্রদর্শন করিলেন। নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া শেষোক্ত ব্যক্তি শান্তকারী স্বর ধারণ করিলেন। তাঁহাকে শান্ত করার চেষ্টায় তিনি যতদূর অগ্রসর হইলেন যে, যেই মুহূর্তে তিনি শিবিরে পৌঁছিবেন, সেই মুহূর্তেই আলীবর্দী খাঁকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইবেন। এই প্রস্তাব সভায় বিভিন্নরূপে গৃহীত হইল। কেহ কেহ হাজী আহমদকে তাঁহার ভ্রাতার শিবিরে পাঠাইতে আপত্তি করিলেন। কেহবা মনে করিলেন, তাহার প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা পরীক্ষা করা উচিত। বিষয়টা অমীমাংসিত থাকিলে মুহাম্মদ গওস খাঁ নামক একজন চরিত্রবান সুখ্যাতিসম্পন্ন কর্মচারী সকলের চেয়ে এক ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিলেন। তিনি এই বৎসর কাল শুজা খাঁর অনুরক্ত ছিলেন এবং তৎপুত্র সরফরাজ খাঁর নিকটও তিনি একই অনুরক্তি প্রকাশে বাধ্য বলিয়া মনে করিতেন। নিজের ব্যক্তিগত পরাক্রমের জন্য যতটা তাঁহার বিশ্বস্ততার মনোবৃত্তির জন্যও তিনি ততটা গর্ববোধ করিতেন। তিনি তাঁহার স্বর উঁচু করিয়া বলিলেন, "এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে আটক ও বন্দী করিয়া রাখায় কি উপকার হইতে পারে, আমি তাহা বুঝিতে পারি না; তাঁহার ভ্রাতা গেরেফতার হইলেই যে আলীবর্দী খাঁ তাঁহার যুদ্ধ চালানায় বিরত হইবেন বা মন পরিবর্তন করিবেন, তাহাও মোটেই সম্ভবপর নহে। কাজেই হাজী আহমদকে তাঁহার ভ্রাতার নিকট গমনের পূর্ণ অনুমতি দিয়া বিদায় দেওয়া হউক বা না হউক, তাহা সামান্য গুরুত্বের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। যদি আমরা ময়দানে আলীবর্দী খাঁর সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক হই; তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত মিলিত হউন বা না হউন, উহাকে আমরা থোড়াই পরওয়া করি। হাজী আহমদ একজন লোক মাত্র, তদ্‌পেক্ষা বেশী নহেন। কাজেই তিনি তাঁহার ভ্রাতার শিবিরে গিয়া কি ভাবে তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি বা তাহা কিঞ্চিৎমাত্র হ্রাস করিতে পারেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।" মুহাম্মদ গওস খাঁর মত এক বাক্যে অনুমোদিত হইল। হাজী আহমদ বিদায় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রাতার শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সেখানে যাওয়ার পথে তিনি পুনঃ পুনঃ লিখিলেন এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের সাহায্যে ও পরোক্ষে বিশ্বাস জন্মাইলেন যে, মুহম্মদ আলীবর্দী খাঁ (এইরূপই ছিল তাঁহার ভাষা) তাঁহার অন্তরে পূর্বের ন্যায়ই বিশ্বাসী ও উৎসাহী ভৃত্য রহিয়াছেন। "আমার মনিব যেন অস্ত্র হস্তে তাঁহার শক্তিশালী, অথচ অনুরক্ত ও সম্মানের মনোবৃত্তিপূর্ণ একজন ভৃত্যের বিরুদ্ধে যাত্রার কথা চিন্তা না করেন। হুজুর যেন প্রাসাদ হইতে নড়িবার

তকলিফ স্বীকার না করেন। তিনি যাহাতে তাঁহার অভিযোগ বুঝাইয়া দিতে, তাঁহার আবেদন পেশ করিতে এবং নিজেকে একজন সম্মানপূর্ণ, কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন, তজ্জন্য শুধু হুজুরের শাহী চৌকাঠে চুম্বনের মর্যাদা ভোগ করিতে চাহেন। ইহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু হুজুর যদি কতিপয় স্বার্থপর লোকের প্ররোচনায় হুজুরের এই ভৃত্যের প্রদত্ত উপদেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, আমার আশঙ্কা লোকটা নৈরাশ্যের বশে এবং তাহার জানমাল রক্ষার গরজে এমন পন্থা অবলম্বনে সাহসী হইবে, যাহা তাহার পক্ষে ইহকালে ও পরকালে লজ্জাকর বলিয়া প্রমাণিত হইবে।"

হাজী আহমদকে বিদায় দান হইতে অতি সামান্য ফলের প্রত্যাশা থাকায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করায় বা না করার যৌক্তিকতা লইয়া সভায় নানা প্রকার মত উত্থাপিত হইল। অবশেষে যাত্রা করাই সাব্যস্ত হইল; মর্দান আলী খাঁ নামক জনৈক কর্মচারী হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খাঁ উভয়ের প্রতিই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সরফরাজ খাঁর পরিচালনায় সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রা করিয়া ৩/৪ দিনে কোমরায় পৌঁছিল; সেদিন ১১৫৩ হিজরীর ২২শে মুহর্‌রম। সরফরাজ খাঁ দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে আলীবর্দী খাঁর অভিমত ও অভিসন্ধি পরীক্ষা করার জন্য প্রেরণ করেন; তাঁহাদের আনীত বিবরণ শ্রবণের জন্য দরকার হওয়ায় সৈন্যদল ঐ শহরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। ইহারা ছিলেন খোজা মুস্রত ও হুগলীর ফৌজদার শুজাকুলী খাঁ। তাঁহারা শত্রু শিবির হইতে ফিরিয়া আসেন এবং আর একজন প্রতিনিধিকে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া আসেন; ইহার নাম হেকিম মুহম্মদ আলী খাঁ; ইনি আসেন খোদ আলীবর্দী খাঁর তরফ হইতে। তাঁহাদের বিবরণ এই দাঁড়ায়ঃ তিনি ছিলেন তখনও বশংবদ ও কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য। এই সাক্ষ্যের সঙ্গে তাঁহারা যেন তাঁহার জবানি হইতে এই বার্তা যোগ করেনঃ রাজোচিত সদাশয় প্রকৃতির লোকেরা যখন মেহেরবানি করিয়া কাহাকেও উচ্চপদ ও মর্যাদায় উন্নীত করেন, তাঁহারা সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহাকে তাঁহাদের ছাত্র ও আশ্রিত হিসাবে নিরীক্ষণ করেন এবং জগতের পক্ষে তাহার সম্মান ও চরিত্রের যত্ন গ্রহণ

নিজেদের কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এখন ইহা কুখ্যাত যে, আমি আপনার কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য আমার মঙ্গলের জন্য আপনার বিখ্যাত পরিবারের নিকট ঋণী; তাঁহারা আমাকে ধূলার হীনতা হইতে উচ্চ চাকরীর (এই দারিত্ব স্মরণে আমি গর্বিত) গৌরবে উন্নীত করেন। আমি জনসাধারণকে জানাইতে ও আমার অনুরক্তির (যাহা আপনার সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ভৃত্য ভিন্ন আর কাহারও তুল্য নহে বলিয়া আমি মনে করি) জন্য কৃতিত্ব লাভ করিতে চাই বলিয়া আমার আবেদন, অনুগ্রহ পূর্বক আমার দুইটা অনুরোধ রক্ষা করুন। প্রথমতঃ, আপনি কয়েকজন লোক আপনার সাক্ষাৎ হইতে বিতাড়িত ও আপনার মন্ত্রনাসভা হইতে বরখাস্ত করিতে সম্মত হউন; ইহারা আমাদের পরিবারের তরক্কীতে ঈর্ষান্বিত হইয়া নূতন প্রস্তাব দ্বারা আপনার শাহীহৃদয় পূর্ণ করিতে নিরত ব্যাপৃত থাকে; যাহার ফলে বর্তমান অশান্তির উদ্ভব ঘটিয়াছে, সেগুলি এগুলির অনুরূপ। ইহারা হইতেছেন মর্দন আলী খাঁ, মীর মুর্তজা খাঁ, হাজী লুৎফে আলী খাঁ ও মুহম্মদ গওস খাঁ। তাঁহাদের প্রস্থানের পরে আপনার ভৃত্য তাহার দেহ নিরাপদ মনে করিয়া আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাহার কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে। দ্বিতীয় অনুরোধ হইল আপনি যদি মনে করেন, এই অনুগ্রহ এমন ধরনের যে, তাহা মঞ্জুর করা যায় না, তাহা হইলে আপনি মেহেরবানী করিয়া আপনার প্রাসাদে গমন করুন এবং সেখান হইতে তাহাদের প্রতি রণক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া আপনার ভৃত্য—আমার সহিত যুদ্ধ করার আদেশ জারী করুন। জয় তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিলে তাহারা ইহার অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করুক, তাহাতে তাহাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। তাহারা পরাজিত হইলে অবসর গ্রহণ করুক; তখন আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার পদতলে আমার মস্তক স্থাপন করিব। যে কুরআন শরীফের উপর আমি সর্বাপেক্ষা পবিত্র হলফ গ্রহণ করিয়াছি, আমার অকপটতার নিদর্শন স্বরূপ এতৎসঙ্গে আপনাকে সেই গ্রন্থখানা প্রেরিত হইল।"

তাঁহার প্রতারণাপূর্ণ কপটাচরণ

তদনুসারে হেকিম মুহম্মদ আলী খাঁ পবিত্র গ্রন্থখানা[৩২] হাজির করিলেন। কিন্তু সরফরাজ খাঁর হৃদয় ও তাঁহার দরবারের উপর আলোচ্য আমীরদের

প্রতিপত্তিই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহাদের মন হাজী আহমদ এবং তাঁহার ভ্রাতা ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির বিরুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রহিয়াছিল বলিয়া শান্তির প্রস্তাব শিকড় গাড়িতে পারিল না। কিন্তু তখনও অবিলম্বে যুদ্ধের জন্য উৎকৃষ্ট কর্মচারীদের প্রস্তাবানুযায়ী যথোচিত উদ্যোগ আয়োজন করা হয় নাই। এদিকে হাজী আহমদ রাজমহলে পৌঁছিলে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তখন যাত্রা পথে থাকায় তাঁহাকে সটান তাঁহার হাতীতে তুলিয়া লইলেন। হাজী আহমদ যেন তাঁহার প্রস্থান কালের প্রতিজ্ঞা পূরণ করার জন্য তাঁহার ভ্রাতাকে একটা হাতী কয়েকশত গজ ঘুরাইয়া আনিতে সম্মত করাইলেন; অতঃপর তিনি আবার রাস্তায় ফিরিয়া আসিলেন। শত্রুর যাত্রার কথা শুনিয়া সরফরাজ খাঁ ঘরি বা ঘরিয়া নামক গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ইহা ভাগীরথী তীরস্থ একটা বিখ্যাত স্থান। শত্রুরা স্তীতে পানির ধারে শিবির স্থাপন করিয়াছিল; মুহম্মদ গওস খাঁ সেখান পর্যন্ত আগাইয়া গেলেন। তৎফলে নদী তাঁহার ও সরফরাজ খাঁর মধ্যে ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইল। ইহা সর্বত্র হাঁটিয়া পার হওয়া যাইত ও উহার প্রস্থ ছিল এক শরের পাল্লা; তাঁহার ও আলীবর্দী খাঁর শিবিরের দূরত্ব ও ৫।৬ ক্রোশের অধিক ছিল না। ইতোমধ্যে উভয় শিবিরের মধ্যে সংবাদ ও সংবাদ বাহক অবিশ্রান্ত যাতায়াত করিতেছিল। সর-আফরাজ খাঁ আলী-বর্দী খাঁকে পুনরায় অনুগ্রহভাজন করিতে ও তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন। অপর ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় একই ধরনের জওয়াব দিলেন। তিনি বলিলেন, "একদা আপনার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুগ্রহ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণার্থ আমি কখনও আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিসন্ধি করিব না; কিন্তু তাহা কেবল এই শর্তে যে, আমাদের পরিবারের যে সকল শত্রুর বিদ্বেষপূর্ণ প্রস্তাবের বদওলতে ব্যাপার আত্মসন্দেহ ও অনৈক্যের এমন অবস্থায় আনীত হইয়াছে যে, সঙ্কটকাল দেখা দিয়াছে, তাহাদিগকে আপনার চাকরী হইতে বিদায় দিন, অথবা তাহাদিগকে আমার হাতে সমর্পণ করুন যদি ইহার প্রতিও বিরূপ হন, তাহা হইলে দূরে সরিয়া দাঁড়ান এবং ঐ উচ্চস্থানে আপনার তাঁবু খাটাইয়া সেখান হইতে আমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

দেখুন। আমি জয়ী হইলে আপনার নিকট নিশ্চিতই আমার কর্তব্য শোধ করিতে যাইব আর আমি পরাজিত হইলে আপনি যেরূপ সঙ্গত মনে করেন, আমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিবেন।" উভয় পক্ষ তুল্য অসুবিধার অধীনে ছিল বলিয়া বোধ হওয়ায় সাক্ষাৎকার ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু প্রত্যহ এরূপ বন্ধুচিত সংবাদ বিনিময় হইতে থাকিলেও জগত শেঠ আলীবর্দীর সেনাপতিদের মর্যাদানুযায়ী প্রত্যেকের নিকট পত্র লিখিতে ও মহাজনদের মধ্যে প্রচলিত 'টিপ' নামক অর্থ দানের অঙ্গিকার পত্র প্রেরণে ব্যস্ত ছিলেন, ইহার একমাত্র শর্ত ছিল আলীবর্দীকে ধরিয়া নিয়া সরফরাজ খাঁর হাতে তুলিয়া দেওয়া[*]। এই সকল অঙ্গীকার পত্রের কতকগুলি ঠিক সেই দিন সন্ধ্যায়ই অনেকের হস্তগত হয়; অন্যান্যের মধ্যে মুস্তফা খাঁও উহা প্রাপ্ত হন। ঐ কর্মচারীটি তাঁহারই ন্যায় আলীবর্দী খাঁর কয়েকজন উৎসাহী ভক্তসহ সেগুলি তাঁহার নিকট লইয়া গিয়া উহাদের বিষয়-বস্তু তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে মেলিয়া ধরিলেন। ঐ কর্মচারীটী বলিলেন, "যুদ্ধই লক্ষ্য হইলে সময় নষ্ট না করিয়া কাল প্রাতেই আমাদের যুদ্ধ করিতে দিন, নতুবা অবস্থা আজ যেরূপ, কাল তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মোড় ধরিতে পারে।" আলীবর্দী খাঁ এই উপদেশের কথা চিন্তা করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন। পরদিন যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি সেই মুহূর্তেই সৈন্য-দের নিকট গোলা-বারুদ বিতরণের আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈন্যদল তিন ভাগে বিভক্ত করা হইল। একদল নন্দলাল নামক চরিত্রবান হিন্দু কর্মচারীর অধীনে স্থাপিত হইল। তিনি আলীবর্দী খাঁর পতাকারও ভারপ্রাপ্ত হইলেন এবং নদীর এপাড়ে গওস খাঁর সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। অপর দুই দল লইয়া তিনি পদব্রজে নদী অতিক্রম করিলেন। একদল সরফরাজ খাঁর সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে প্রেরিত হইল; তাঁহার অগ্রভাগের সহিত তাহাদিগকে যুদ্ধরত দেখিবামাত্র তাহাদের উপর আপতিত হওয়ার জন্য ইহাদের প্রতি নির্দেশ রহিল। নদীতীর ত্যাগ না করিয়া এই উদ্দেশ্যে তিনি এখন সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। একটা কামানের আওয়াজ শ্রবণ না করা পর্যন্ত নিজেদের লুকায়িত রাখার জন্য অগ্রে প্রেরিত সৈন্যদলের প্রতি আদেশ ছিল; ঐ ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাহাদের যুগপৎ

সরফরাজ খাঁর পশ্চাদ্ভাগ ও শিবির উভয়ের উপর আপতিত হওয়ার কথা। আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁর পরিচালনায় এই দল শেষ রাত্রি ১টার অন্ধকারে উহারা যাত্রারম্ভ করিল। আবদুল আলী খাঁ, মুস্তফা খাঁ, শমশের খাঁ ও অপর কয়েকজন আফগান সেনাপতি ছিলেন তাঁহার অধীনে। আলীবর্দী খাঁ তাঁহার দল লইয়া (জামাতার) অনুসরণ করিলেন, কিন্তু কিছু দূরে থাকিয়া এদিকে আদেশ অনুযায়ী নন্দলাল ধীরে ও নীরবে গওস খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। প্রত্যূষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এই সময়ের মধ্যে আলীবর্দী খাঁ সরফরাজ খাঁর সম্মুখ ভাগের নিকটে আসিয়া একটা কামান দাগিলেন; ইহার আওয়াজ শুনিয়া অগ্রগামী দলটি সরফরাজ খাঁর সৈন্যদের আক্রমণ করিল, পক্ষান্তরে নন্দলাল গওস খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সরফরাজ খাঁ তখন নামাজ পড়িতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার হাতীতে চড়িয়া সটান আলীবর্দী খাঁর দিকে যাত্রা করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রুপক্ষের কিছু লোক তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শিবিরের মধ্যভাগে ঢুকিয়া পড়িল; সেখানে বহু মালপত্র লুণ্ঠিত ও বহু লোক নিহত হইল; অন্যান্যের মধ্যে মির্জা ইরাজ খাঁর পুত্রও নিহত হন। ইতোমধ্যে সরফরাজ খাঁ আগাইয়া চলিলেন। তাঁহার সৈন্যদলের পুরোভাগে থাকিয় তিনি যখন তাঁহার নাগারখানা অতিক্রম করেন, তখন একটী গুলি খাইয়া চিরস্থায়ী নিবাসে গমন করিলেন। মীর কামাল, মীর গদাই, মীর আহম্মদ, মীর সেরাজুদ্দীন, হাজী লুৎফে আলী খাঁ প্রভৃতি কিছু সংখ্যক বিখ্যাত লোক তাঁহার সহগামী হন; তাঁহাদের সকলেই সেই বিপজ্জনক খেলায় তাঁহাদের অস্তিত্বের মূলধন হারাইয়া দ্রুত পরলোক গমন করিলেন। রায়-রায়ান আলম চাঁদ ও মির্জা ইরাজ খাঁ আহত হইয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পক্ষান্তরে গওস খাঁ নদীর অপর তীরে নন্দলালের সহিত যুদ্ধে নিরত থাকিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন; ঐ হিন্দু সেনাপতি তাহাতে নিহত হইলেন। এদিকে সরফরাজ খাঁর মাহুত তাঁহার হাতীর মুখ ঘুরাইয়া দিল। শত্রুরা যখন নদীর ঐ তীরে পলায়ন করিতেছিল, তখন দূর হইতে দেখা গেল, হস্তীটি নগরের দিকে যাইতেছে। গওস এই পলায়নকে তাঁহার মনিবের সাহসের

অভাবের প্রতি আরোপ করিয়া যে কোন উপায়ে হাতীটিকে ফিরাইয়া আনিবার এবং গওস খাঁ যে শত্রুদিগকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছেন এবং এখন যে তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া যাহারা এখনও রণক্ষেত্রে অটল রহিয়াছে, একযোগে তাহাদের উপর আপতিত হওয়ার সময়, তাহা তাঁহার প্রভুকে জানাইবার আদেশ দিয়া তাঁহার নিকট একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। ব্যাপার কিরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া এযাবতকাল আলীবর্দী খাঁ তাঁহার লোকজনের উৎসাহ দমন ও তাহাদিগকে একত্রে রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি সঠিকরূপে জানিতেন যে, সরফরাজ খাঁ নিহত হইয়াছেন; কিন্তু অনুরূপভাবে ইহাও তাঁহার জানা ছিল যে, নন্দলাল পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন এবং গওস খাঁর পরিচালিত সৈন্যদলের দৃঢ়ভাব অক্ষুন্ন রহিয়াছে; তাঁহার সাহস ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আলীবর্দীর কোন সন্দেহ ছিল না। ঠিক এই সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তিনি যে সকল সৈন্যকে সরফরাজ খাঁর শিবির আক্রমণের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান লুণ্ঠিত দ্রব্যপূর্ণ ঐ সমুদয় তাঁবু লুণ্ঠন করিতেছে এবং সর্বত্র এভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের সেনাপতির পক্ষে তাহাদিগকে পুনরায় একত্র করার আর কোনই সম্ভাবনা নাই। ব্যাপার এই সন্দেহজনক অবস্থায় থাকিতে গওস খাঁ প্রেরিত অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, তাঁহার প্রভু আর নাই। অধিকতর মাত্রায় বিস্মিত হইয়া তিনি বিস্ময় ও নৈরাশ্যের সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার পরিবারের প্রতি গওস খাঁর ঘৃণার কথা দীর্ঘকাল পূর্বেই আলীবর্দী খাঁর জানা ছিল। তিনি যে এখন যাহাতে হাত দিবেন, তাহাতেই সফলতা লাভ করিবেন এবং তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করার মত কিছুই নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া গওস খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বংশ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার দুই পুত্র মুহম্মদ কুতব ও মুহম্মদ পীরকে আহবান করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার বুকপিঠের বর্ম ও পিছন দিক হইতে কুলমর্যাদার নক্শা আঁকা ঢাল ঢিলা করিয়া দিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া এই কথাগুলি বলিলেন, "বৎসগণ! যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়া ভিন্ন এখন আমাদের জন্য

আর কিছুই বাকী নাই ; আমাদের জীবন এখন চলিয়া গিয়াছে, ঐ বস্তুর দায়িত্ব আমাদের অস্বীকার করিতে হইবে ; এবং যে সৈন্যদল আলীবর্দী খাঁকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাঁহার দেহের নিকট পেঁৗছিতে পারি কিনা, সেই চেষ্টা করার জন্য আমাদিগকে তাহাদের উপর ধাবিত হইতে হইবে। ঐ সেনাপতি ও তাঁহার পুত্রেরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রণক্ষেত্রের বিজয়ী সিংহ ও সেই যুগের অস্ত্রের রুস্তম[৪]। গওস খাঁর অবশিষ্ট সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের অধিকাংশ ইতোপূর্বেই সরফরাজ খাঁর মৃত্যুর কথা অবগত হইয়া মুখ ফিরাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া নগরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল ; যে লোকটি পরাজয়ের পরে জীবিত না থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হন তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকা মনঃপুত হইল। যে অত্যল্প লোক তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে পছন্দ করিল, তাহাদের লইয়া তিনি সর্বাপেক্ষা ত্বরিত-গতিতে শত্রুদের প্রতি অগ্রসর হইলেন। এই অল্প কয়েকজন লোক লইয়াই তিনি আগাইয়া চলিলেন। ইতোমধ্যে তিনি শত্রুদের নিকটে পেঁৗছিলেন। এমন সময় একটা বন্দুকের গুলির আঘাত পাইলেন। তথাপি তিনি আগাইয়া চলিলেন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত আলীবর্দী খাঁকে বাছিয়া লওয়ার জন্য তাঁহার ঘোড়া চাহিয়া হস্তী হইতে অবতরণ করিতে যাইবেন, এমন সময় পুন-রায় দুইটা বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া প্রাণহীন অবস্থায় রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় পিতাকে গতায়ু দেখিয়া তাঁহাদের ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া মৃত্তিকায় অবতরণ করিলেন এবং তরবারি ও ঢাল লইয়া পদব্রজে শত্রুর দিকে ধাবিত হইলেন। তাহাদের নিকটে আসিতে চতুর্দিক হইতে তাঁহাদের উপর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল ; ফলে তাঁহারা প্রাণহীন হইয়া রক্তে ও ধূলার গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ মুহম্মদ কুতব বীরত্ব ও দৈহিক শক্তির জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন ; মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহার ঢাল বা তলোয়ার ত্যাগ না করিয়াই রণক্ষেত্রে বসিয়া পড়িলেন এবং ঐরূপে যুদ্ধপ্রিয় অবস্থায় তাঁহার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহাকে ঠিক ঐ স্থানেই সমাহিত করা হয়। মীর দিলির আলী সরফরাজ খাঁর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রভু ও বন্ধুর পরে বাঁচিয়া থাকিতে অস্বীকৃত হইয়া যে ১৬জন লোক তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদিগকে লইয়া

শত্রুর দিকে ধাবিত হইলেন এবং বীরত্বের সহিত যুদ্ধের পর নিহত হইয়া পরকালের দ্বারের দিকে তাঁহার সফর আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুস্থানে কখনও অতি অল্প সৈন্য ও অতি অল্প বন্ধুই সরফরাজ খাঁর সৈন্য ও বন্ধুদের ন্যায় এত উৎসাহী বলিয়া প্রমাণিত হয়। মীর সরফুদ্দীন তাঁহার অধীন সৈন্যদল লইয়া সাহসের সহিত খোদ আলীবর্দী খাঁর সম্মুখীন হন এবং তিনি তাঁহাকে দুইটি তীর দ্বারা আঘাত করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজয় ঘটিয়াছে দেখিয়া পশ্চাদ্বর্তন করিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন। ঐ তীর দুইটির একটা তাঁহার হস্তস্থিত ধনুকে আঘাত করে, অপরটিতে তাঁহার ডাইন কাঁধে সামান্য জখম হয়। সংক্ষেপে সরফরাজ খাঁর লোকজনের প্রত্যেকেই প্রভুভক্তি ও সাহসের পরিচয় দেয়। কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়, কেহবা তাহাদের ভাগ্য সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে। আলীবর্দী খাঁ এখন জয়লাভের অধিকারী হইয়া অবিলম্বে তাঁহার ভ্রাতা হাজী আহমদকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। এই মহানগরীর লোকদের শান্ত করার এবং সমস্ত সরকারী দফতরখানা ও সরফরাজ খাঁর সমস্ত মহলে পাহারা বসাইবার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ ছিল। প্রত্যেকটা পাড়ার আশু শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি কঠোর আদেশপ্রাপ্ত হন। তাঁহার আদেশ মুতাবেক হাজী আহমদ বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে ও বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইলেন; ইতোপূর্বেই সেখানে হাঙ্গামা বাঁধে। তিনি তাড়াতাড়ি পৌঁছিয়া সর্বত্র নূতন নওয়াবের কথা ঘোষণা করিলে এগুলির অবসান ঘটিল।

যুদ্ধের দুই দিন পরে ১১৫৩ হিজরীর সফরের প্রায় মাঝামাঝি আলীবর্দী খাঁ ধীরে ধীরে, কিন্তু অত্যন্ত ধুমধামের সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইবার কালে, কিন্তু মসনদের উপর উপবেশনের পূর্বে তিনি ডানদিকে ফিরিয়া জাফর খাঁর কন্যা ও মরহুম সরফরাজ খাঁর মাতা নাফিসা বেগমের আবাস মহলে গমন করিলেন। দ্বারদেশে আসিয়া তিনি একটা সম্মানপূর্ণ ভাবভঙ্গী ও মর্মস্পর্শী স্বর অবলম্বন করিলেন এবং আভূমি দেহ নোয়াইয়া গম্ভীরভাবে কুর্নিশ করিয়া শাহ্‌জাদীর ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহাকে নিম্নোক্ত বাণী পাঠাইলেন: "ভাগ্যপুস্তকে পূর্ব হইতে যাহা লিখিত

সরফরাজ খাঁর মাতার নিকট তাঁহার অনুপম বক্তৃতা

ছিল, তাহা ঘটিয়া গিয়াছে ; এখন আপনার এই অপদার্থ ভৃত্যের অকৃতজ্ঞতা ইতিহাসের অধিবর্ণ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলিতেছি, যতদিন আমার এই দেহে প্রাণ থাকিবে, তত দিন আমি সম্মানের পথ ও সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ বশ্যতার কর্তব্য হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না। আমি আশা করি, আপনার এই দীনহীন, বিনীত ও মনোবেদনা-ক্লিষ্ট গোলামের নীচতা ও কুকার্য কালক্রমে আপনার ক্ষমাশীল চিত্তের আয়না হইতে মুছিয়া যাইবে এবং আপনি কোন দূরবর্তী সময়ে আমার দোষস্খলনার্থ আমি যে পূর্ণবশ্যতা প্রদর্শন করিতে ও কর্তব্যপরায়ণ অনুরক্তির নিদর্শন দেখাইতে স্থির করিয়াছি, তাহা গ্রহণ করিতে মর্জি করিবেন।

এই বক্তৃতায় তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত বলিয়া মনে হইল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে একটা শব্দও না আসায় অতঃপর তিনি চেহেল স্তুন বা চল্লিশ স্তম্ভের পথে আগাইয়া চলিলেন ; সাধারণ দিনগুলি গোয়রান ও নিজের বাসের জন্য শুজা খাঁ এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। আমদরবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি ক্ষমতার মসনদে তাঁহার আসন গ্রহণ করিলেন ও নহবৎ বাজাইতে [৩] আদেশ দিলেন। তিনি সরকারী কর্মচারী, সমর বিভাগের লোক ও মুর্শিবাদের নাগরিকদের নিকট হইতে নজর লইলেন ; তাহারা তাঁহাকে স্বীকৃতির ঐ নিদর্শন দান করিতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু এগুলি ছিল বাহ্য ব্যাপার। স্বীয় প্রভু ও উপকারকের পুত্রের প্রতি তিনি যে ঘোর অকৃতজ্ঞতার জন্য অপরাধী ছিলেন, তজ্জন্য লোকে তাঁহার দেহকে বিভীষিকা ও ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। লোকে এত শীঘ্র তাঁহার সমস্ত গুণ জানিতে পারে নাই। কালক্রমে তিনি এত ধর্মীয় আচরণ ও এত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করেন, শরীফ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এত শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং অপরিচিত ও বন্ধু উভয়ের জন্য এত নির্বিচারে পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ণ ভাব ও সহৃদয়তার বিস্তার করিতেন, শক্তিশালী ও অসহায় উভয়ের চিত্তজয়ের জন্য এত অকপটে আত্মনিয়োগ করিতেন। তাঁহার দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের খেদমতের জন্য এরূপ প্রাণবন্ত গুণগ্রাহিতা, দূরবর্তী জ্ঞাতিক পূর্ব-পরিচিতদের অধিকারের প্রতি এত শ্রদ্ধা, দরিদ্রের প্রতি এত দয়া, মজলুমের প্রতি এত মনোযোগ ও ব্যক্তিগত অনিষ্ট ক্ষমার জন্য এরূপ মনোভাব প্রদর্শন

নূতন সুবাদারের প্রশংসনীয় চরিত্র

করেন; সংক্ষেপে, তিনি নিজেকে এত অমূল্য লোক বলিয়া প্রমাণ করেন যে, যাহারা প্রথমে তাঁহার কথা বিবেচনা করা সহ্য করিতে পারিতনা; তাহারা তাঁহার অমায়িক আচরণে এত মুগ্ধ ও তৎপ্রতি এত আসক্ত হইয়া যায় যে, তাঁহার জমানায় বা অন্য কোন জমানায় এত উৎসাহী অনুরক্তি ও এত অধিক বিশ্বস্ততা বা ভালবাসার দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। মোটের উপর, তাঁহার প্রভু ও উপকারকের পুত্রহত্যা নিঃসন্দেহে একটা জঘন্যতম কার্য ও একটা সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ব্যাপার হইলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, সরফরাজ খাঁর কোন শাসনপ্রতিভা ও কর্তব্যকার্য সম্পাদনের কোন যোগ্যতা ছিল না; তাঁহার শাসন আরও কিছুকাল স্থায়ী হইলে তাঁহার অযোগ্যতার দরুন এত সন্নাকরি বিপদ ও পরপর এত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটিত যে, অজ্ঞাতসারে অসংখ্য হাঙ্গামা ও ব্যাপক গোলমাল দেখা দিত—যাহা সকল জনপদ ও উহাদের অধিবাসীদের উপর ধ্বংস ও বিনাশ আনয়ন করিত। এই সমৃদ্ধ প্রদেশগুলির উপর ইতোপূর্বেই মারাঠাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। অল্প পরেই তাহারা চতুর্দিক হইতে এগুলি আক্রমণ ও অভিযান করে। ঐ সকল দস্যুকে আলীবর্দী খাঁর ন্যায় এমন একজন লোকের সহিত আচরণ করিতে হয়, তাহা এতদঞ্চলের লোকের পক্ষে সৌভাগ্যবান বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিনি তাঁহার বুদ্ধ ও শাসনপ্রতিভা, তাহার পক্ষে তীক্ষ্ণ, অবিরত কর্মরত তরবারির উদ্যম ও তাঁহার কৌশলময় রাজনীতির দ্বারা ঐ সমুদয় লুণ্ঠন দমনের ও পরিশেষে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালার বাহিরে বিতাড়নের ব্যবস্থা করেন; আমরা এই সকল লিখিত পৃষ্ঠার মধ্যে শীঘ্রই সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। এরূপ উদ্যম সরফরাজ খাঁ ও তাঁহার মন্ত্রীদের নিকট প্রত্যাশা করা যাইত, এমন ধরনের ছিল না; কোন সুফলের সহিত এরূপ স্রোতের বিরোধিতা করিতে পারিতেন, তাঁহারা এমন লোকও ছিলেন না। পক্ষান্তরে এত বিনীত ব্যবহার ও এত অধিক নৈতিক পবিত্রতার সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা এবং বিজয় ও সফলতা যত খ্যাতি ও শক্তি অর্পণ করিতে পারে, তাহার সংযোগ সাধিত হয়। সব কিছু মিলিয়া এমন একটা চরিত্র গঠিত হয় যে, তাঁহার সম-সাময়িক ব্যক্তিবর্গ বা উত্তরাধিকারীদের কেহ তাঁহার সমান হওয়া দূরের কথা, অতীতের ইতিহাসেও তাহার তুলনা মিলা ভার।

তাঁহার শাসনের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক সুখের বিষয় এই যে, তাঁহার তিনজন ভ্রাতুষ্পুত্রই যোগ্যতাসম্পন্ন ও এরূপ খুল্লতাত লাভের উপযুক্ত লোক বলিয়া প্রমাণিত হন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই হপ্তহাজারী মনসবদারের পদে বৃত এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও চাকরীতে উন্নীত হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন বলিয়া বোধ হয়। ইতিহাসের সূত্র যখনই তাঁহাদের সময়ে উপস্থিত হইবে, ইহাদের প্রত্যেকের এবং আলীবর্দী খাঁর সন্তান ও পরিবারের তখনই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইবে।

ইংরাজি সংস্করণের টীকা

(১) সফভী পরিবার ; ভারতে ও বাঙ্গালায় ১৭৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে তাহাদের কয়েকটী শাখা ছিল। ইহা ইরানের বাদশাহী খান্দানের উপাধি ; এই বংশ সেখানে প্রায় ২৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া এই তহমাসপ কুলী খাঁ বা নাদির শাহ্ কর্তৃক বিতাড়িত হন। কিন্তু ঐ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাহ্ হায়দর জন্ত—সফী নন।

(২) কাজলবাশ অর্থ লোহিত মস্তক ; প্রথম শাহ ইসমাইল কর্তৃক তাঁহার দেহরক্ষার জন্ত সংগৃহীত ১২০০ সৈন্সের একটী দলকে এই নাম প্রদত্ত হয়। তুর্কেরা ইরান বা পারস্থের সমগ্র জাতিকে উপহাস করিয়া লাল মাথা বলিত।

(৩) উত্তর পারস্থ বা ইরানের একটি প্রদেশ ; প্রাচীনকালে ইহা মাজি কাষ্ঠে পরিপূর্ণ ও অস্থাপি পরিবেষ্টিত থাকায় ইহাকে মাজেন্দারান বলে।

(৪) ঐ দুর্গটি এত দুঃখজনকভাবে উপেক্ষিত হয় যে, তাহাতে একজন সৈন্তও ছিল না। যথাযথভাবে বলিতে গেলে কোতওয়াল হইতেছেন একজন বেসামরিক কর্মচারী—এক রকম শান্তির বিচারক ; তিনি পুলিশ কর্মচারী।

(৫) দিল্লী বা শাহজাহানাবাদের গৃহগুলি সাধারণতঃ প্রস্তরে নির্মিত ; ছাদও অনুরূপভাবে পাথরের এবং বরাবরই চ্যাপ্টা ; ভারতের অধিকাংশ স্থানের যেখানেই গৃহগুলি ইষ্টকে নির্মিত, তাহার ন্যায় দিল্লীর লোকেরাও বৎসরে ছয় মাস ছাদের উপর নিদ্রা যায়।

(৬) আরবে মদীনার পূর্ব দিকে একটী সঙ্কীর্ণ কঠিন উপত্যকা ; উহা ছিল ইহুদীদের বাসস্থান ; হযরত (সঃ) তাহাদিগকে দমন করিতে গিয়া অনেক কষ্ট ভোগ করেন। অধিবাসিরা এমন কি আজিও ইহুদীবাদ হইতে মুক্ত নহে এবং পূর্বের ন্যায়ই তুল্য ভয়ঙ্কর।

(৭) আটকনা বা থামা হইতে আটক শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন কালে সিন্ধু ছিল ইরানের দিকে ভারতের শেষ সীমা; কাবুল হইতে ছাড়পত্র না পাইলে কাহাকেও এই প্রবল নদী অতিক্রম করিতে দেওয়া হইত না। কাবুল অর্থ সম্মতি, আমি রাজী আছি।

(৮) হিন্দুস্থানে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়াকে এক প্রকারের ঘাস খাইতে দেওয়া হয়; সহিসেরা খোলা মাঠ হইতে যথোপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা এগুলি কাটিয়া আনে। একই ঘাস শুকাইয়া খড় করিয়া শহরেও বিক্রীত হয়। যব, বিবিধ শিম প্রভৃতি কয়েক প্রকারের শস্যও সন্ধ্যায় তৎসঙ্গে যোগ করা হয়।

(৯) হিন্দুস্তানী ভাষায় কম্বল অর্থ মোটা কম্বল। ইহা লেপযুক্ত বর্মও বুঝায়। রাজধানীতে এই পোশাকধারী ৩০০০ লোকের একটি দল ছিল। দুই প্রকারের লেপ আছে—একটা কার্পাস তুলার ও আর একটি রেশম-এর পরিত্যক্ত অংশ দ্বারা নির্মিত; কাঁচা রেশম প্রস্তুতকালে এগুলি বরাবরই ছুড়িয়া ফেলা হয়।

(১০) নিশাপুর বা নিশাবুর অর্থ সাপুর—তাঁহার গুল্ম। সাপুর—খোরাসানে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিধ্বস্ত একটি শহর নির্মাণ কালে ঐ স্থানটিকে গোলাব গাছে আচ্ছন্ন দেখিতে পান বলিয়া এই নাম। খোরাসানে ও পারস্যের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আজরবাইজানে আফশার আছে। মাজেন্দারানের খাজার এবং অন্যান্য স্থানের ফেহ্লী, জেন্দী প্রভৃতির ন্যায় আফশারেরা একটি তুর্ক গোত্র।

(১১) হাওদা হস্তীপৃষ্ঠের সিংহাসন বা পাল্কী। ইহাতে দুইজন ও কষ্টে-স্বষ্টে তিনজন লোক বসিতে পারে। ইহা তক্তায় তৈরী এবং অনেক সময় লোহা বা পিতলের ভিতরে স্থাপিত ও এত উঁচু যে, লোকের বুক ঢাকিয়া যায়। আম্বরী নীচু ও ছাদযুক্ত এবং শুধু আড়ম্বরের জন্য।

(১২) নাসিরুল্লাহ্ মির্জার অর্থ রাজপুত্র নাসিরুল্লাহ্; কিন্তু মির্জা নাসিরুল্লাহ্ শুধু লেখক, বিদ্বান নাসিরুল্লাহ্, মিঃ নাসিরুল্লাহ্ বুঝাইবে।

(১৩) ২৫০, ৫০০, ১০০০ হইতে ১০।১২ হাজার সওয়ারের পদমর্যাদা ভোগী সময় বিভাগের লোক ; কার্যতঃ কখনও এত অশ্বারোহী, কিন্তু সাধারণতঃ শুধু ইহার অর্ধেক অশ্বারোহী পরিচালনা করেন ; কখনও বা প্রত্যেকের দুইটি, এমন কি তিনটি অশ্বসহ কার্যতঃ অধিক অশ্বারোহী চালনা করিয়া থাকেন।

(১৪) নিশিখচী হইতেছে আদেশ বলবৎ করাইবার সশস্ত্র লোক ; নাদির শাহের শিবিরে ও দরবারে কয়েক হাজার নিশিখচী ছিল ; কেহ কেহ বলেন, ছয় হাজার। তাহারা সামরিক শাস্তি দেয়। সৈন্য-দলের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া যাহারা পলায়নে সাহসী হয়, তাহাদের প্রত্যেকের মস্তক ছেদন ইহাদের অন্যতম কর্তব্য। রণ-কুঠার, তরবারি ও খঞ্জর নামক বাঁকা ছোড়া ছিল তাহাদের অস্ত্র।

(১৫) হযরত ইব্রাহীমের কুরবানীর স্মৃতিরক্ষার্থ প্রত্যেক মালদার মুসলমান ১০ই জিলহজ্জ স্বহস্তে অন্ততঃ একটি মেষ জবেহ্ করেন ; ইহাকে কুরবানী বলে।

(১৬) প্রতি শুক্রবারে মসজিদে ইমামের প্রদত্ত ভাষণের নাম খুৎবা ; ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাজত্বকারী রাজার শুভাকাঙ্ক্ষিতার উল্লেখ থাকে ; ইহা বরাবরই তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকারের সামিল।

(১৭) দিল্লীর হারেমে দুই শ্রেণীর সশস্ত্র নারীরক্ষী ছিল।

(১৮) হিন্দুস্থানে কফি দান ও পানের নিয়ম ইংল্যাণ্ড হইতে এত স্বতন্ত্র যে, একটি পরবর্তী টীকায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। অনুবাদক তাঁহার উক্তি সম্পর্কে আর একখানা পুস্তক দেখিয়াছেন ; তাহাতে আমীর খাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলী ছিল সমধিক দুর্বল ও সংক্ষিপ্ত। সেগুলি এই : নাদির শাহকে পাত্রটি দানের উপলক্ষ করিয়া তিনি হঠাৎ যেন কোন ভুল স্মরণ করিয়াছেন, এভাবে থামিয়া পাত্রটি এই কৈফিয়ৎ দিয়া মুহম্মদ শাহকে দান করেন, "একজন বাদশাহ্ একজন শাহানশাহ্কে তাঁহার বংশের সম্মান প্রদর্শন করুন ; ঐ কার্যের পক্ষে আমি নিতান্ত নগণ্য লোক।"

(১৯) জিলকা মণি-মাণিক্য খচিত ও মুক্তাবেষ্টিত একটা স্বর্ণালঙ্কার; ইহা ডাইন পাশে বহন করা হয়, কিন্তু লম্বালম্বিভাবে।

(২০) কেহ অপদস্থ না হইলে, বরাবরই একটা পানের বিড়া উপহার দিয়া এবং উহা তাঁহার হাতে উঠাইয়া দিয়া এই বিদায়পর্ব সম্পন্ন হইত। একটা বা দুইটা পান-পাতা (ইউরোপীয়েরা মেহেরবানী করিয়া ইহাকে বেটেল বা বীটল বলে; শব্দটা দেশীয় লোকদের অজ্ঞাত) কিছু কাটা সুপারী ভর্তি করিয়া পাতাগুলি কিছু চুণা বা ঝিনুকের চূর্ণ, সহ মনোরমভাবে গুটাইয়া এই পানের বিড়ি প্রস্তুত হয়; সুপারীকে ইউরোপীয়েরা দয়া করিয়া আয়েক বলে; বেটেলের ন্যায় এই শব্দটিও অজ্ঞাত। এই সমুদয় সাটেনের ন্যায় উজ্জল ও কোমল কেলা বা কলা পাতার (ওরফে প্লেন্টেইন) ভিতরে পুরিয়া দেওয়া হয়। কলা পাতাটী পিরামিডের কোণের ন্যায় চোখা করিয়া ভাঁজ করা এবং যেন প্রেক মারা হইয়াছে, এভাবে একটি লবঙ্গ দিয়া আটকান হয়।

(২১) রাজার প্রিয়পাত্র।

(২২) নওশেরওয়াঁ বরং আন্-নওশিরওয়াঁ পারস্যের সাসানীয় বংশের একজন শেষ রাজা। তিনি ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন এবং রাজত্বকারী লোকদের মধ্যে একজন যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত হন। হযরত (সঃ) তাঁহার রাজত্বে জন্মগ্রহণ করেন, এমন কি তাঁহাকে একখানা পত্রও লেখেন: তিনি উহা ছিঁড়িয়া ফেলেন এবং যুগপৎ তাঁহার ও সাধারণভাবে আরবদের প্রতি যে উপহাস করেন তাহা চারি ছত্রে শাহনামায় দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এতই বিচিত্র যে, তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য পাঠক আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন:

> উটের দুধ, ইঁদুর ও সর্প ভক্ষণ করা হইতে আরবের এই লোকটির অবস্থার এত অধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, সে রাজ-সিংহাসনের উপর উৎসুক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে;

হে আরববাসী ; তোর মুখের উপর থুথু ! তোর মুখের উপর থুথু !!

এই সংবাদ শ্রবণে হযরত (সঃ) বলিয়া উঠেন, আল্লাহ্ তাঁহার রাজ্যও এভাবে ছিন্নভিন্ন করিবেন এবং অচিরে পারস্য সাম্রাজ্য আরবদের হস্তগত ও পারসিক রাজবংশ উৎসন্ন হইয়া যায়।

(২৩) গ্রন্থকার ইংরেজদের নীচ ভৃত্যদের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়; জগতে তাহারা সর্বোচ্চ বেতনভোগী ও সর্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত চাকর; তথাপি তাহাদের মনিবদের অমনোযোগিতায় ভারতে তাহারা সর্বাপেক্ষা অভিযাচক ও সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ অন্যায় অর্থ আদায়কারী। এতদসত্ত্বেও তিনি যদি আসফদ্দৌলার নীচ ভৃত্যদের দেখিতেন, তিনি ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা ভিক্ষাকারী ভৃত্যদের চেয়ে তাহাদের কোন অংশে নিকৃষ্ট দেখিতে পাইতেন না।

(২৪) আলাউদ্দৌলাহ্ একটি উপাধি, অর্থ সাম্রাজ্যের মহান; সরফরাজ খাঁও একটা উপাধি, অর্থ উন্নত শির বা প্রভু।

(২৫) এই শব্দটা এত পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে যে, ইহার ব্যাখ্যা দান প্রয়োজন। কক্ষের সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক স্থানে প্রায় ৬ ফুট লম্বা ও চারি ফুট চওড়া একটা ক্ষুদ্র গালিচা পাতা হয়। ইহার উপরে থাকে এক ইঞ্চি পুরু তুলা-ভর্তি একটি আবরণ ও তদুপরি ঝালরযুক্ত বুটিদার কাপড় বা কিঙখাবের একটা মূল্যবান চাদর। লোকটি খুব বড়, লম্বা, মোটা, গোল একটা তাকিয়ায় তাঁহার পিঠ ঠেস দিয়া ইহার উপরে বসেন। প্রত্যেক পার্শ্বে, তাঁহার প্রায় হাঁটুর ধারে অনুরূপভাবে অত্যন্ত মূল্যবান দুই জোড়া ক্ষুদ্র গদি থাকে, তাঁহার সম্মুখে, কিন্তু কিঞ্চিৎ বামে থাকে মখমলের অসিকোষে একখানা তরবারি এবং তাঁর ডানদিকে একখানা কাটারির বা অপর কোন প্রকার ছোরা।

(২৬) শুজা খাঁ প্রকৃতপক্ষে চারি ঘণ্টাও কোন না কোন নারী ভিন্ন থাকিতে পারিতেন না; তাঁহার জন্য অবিরত নূতন সুন্দরীর সন্ধানে বিরত থাকিতে গিয়া হাজী আহমদ ঐ সকল আমীরের পরিবারেও হানা

দেন ; তজ্জন্য তাঁহারা বরাবরই তাঁহার সম্পর্কে অবজ্ঞার সহিত কথা বলিতেন। সরফরাজ খাঁ নিজেও তাঁহাকে কদাচিৎ কোটনী, বওদ অর্থাৎ নারী-সংগ্রহকারিনী ভিন্ন অন্য নামে অভিহিত করিতেন।

(২৭) তদবধি সিরাজুদ্দৌলাহ্ বা সাম্রাজ্যের বাতি নামে অভিহিত ; তিনি জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

(২৮) জগত শেঠ ব্যক্তিগত নাম বলিয়া বিবেচিত হইলেও এই বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, ইহা একটা উপাধি এবং আমরা জানি, শেঠ শব্দটি জগত শেঠের জন্মভূমি গুজরাটে বণিক ও মহাজন বুঝায়।

(২৯) আসাদ জঙ্গ অর্থ যুদ্ধে সিংহ ; ইহা ছিল আমাদের গ্রন্থকার গোলাম হুসায়ন খাঁর পিতার উপাধি। 'গরীব' কথাটার অর্থ ভদ্র ভাষায় আমি নিজে বা আমার যে কোন দ্রব্য। এরূপ বিনীতভাব প্রকাশক শব্দ সাধারন ও প্রচুর। কিন্তু এগুলিকে যেন সর্বশেষ ব্যক্তি বা দীনতম ব্যক্তি বলিয়া ভুল করা না হয়। কারণ, পদস্থ ব্যক্তিদের নিকট লিখিবার বেলায় রাজা বা সর্বোচ্চপদস্থ ব্যক্তি ভিন্ন কাহারও নিজেদের সম্বন্ধে এত বিনীতভাবে কথা বলার অধিকার নাই।

(৩০) কয়েক প্রকারের তুলসী আছে ; এখানে উল্লিখিতটি দুইহাত লম্বা ; ইহার পাতার উপরিভাগ ময়লা সবুজ ও নীচের দিক গাঢ় বেগুনে রঙের। ইহা অত্যন্ত সুগন্ধি বিলায়।

(৩১) প্রাচীন পারসিক ইতিহাসে আফরাসিয়াব একজন বিখ্যাত তুর্ক দিগ্বিজয়ী ; পারস্য জয় করিয়া তিনি সেখানে রাজত্ব করেন। রুস্তমের অপর নাম রুস্তন। নীলচক্ষু, লোহিত শ্মশ্রু ও শনবর্ণ কেশধারী পারসিক জাতি হইতে উদ্ভূত এই রাজা জাবুলিস্তানে রাজত্ব করিতেন ; ইহা ইরান বা পারস্যের পূর্বাঞ্চলের একটা প্রদেশ। আফরাসি-আব শব্দটি ফারসী অর্থ পানির (জেহন নদীর) অপর পাড়ের (অর্থাৎ তুরানের) লোক ; ইহা নিশ্চিতই পারসিকদের দ্বারা তাহাদের বিজেতাকে প্রদত্ত উপাধি ; তিনি ছিলেন তুর্ক বা সাহিয়ান। কাজে কাজেই তাঁহার অবশ্য কোন তুর্ক নাম থাকিয়া থাকিবে।

(৩২) এই পবিত্র গ্রন্থ ছিল আসলে যথোচিতরূপে ছাটকাট করা সোনালী কাপড়ে মোড়া একখানা ইষ্টক মাত্র।

(৩৩) আমরা সঠিকরূপে জানি এবং ইহাই সার্বজনীন বিবরণ যে, তাঁহার বন্ধু জগত শেঠের সাহায্যে আলীবর্দী খাঁ নিজেই সরফরাজ খাঁর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এই কৌশল প্রয়োগ করেন। তাঁহাদের একজন এখনও জীবিত আছেন; তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়তা দিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি নিজেই ৪০০০ টাকার এরূপ একটা টিপ প্রাপ্ত হন। বিনিময়ে তাঁহাকে শুধু মাটি ও আবর্জনা দ্বারা কামান ভর্তি করিলে বলা হয়। মুর্শিদাবাদে সার্বজনীন জনরব এই যে, প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি কামান ঐ রূপে পূর্ণ করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে, গ্রন্থকার সরফরাজ খাঁর কামান সম্পর্কে একটা শব্দও বলেন নাই।

(৩৪) আমরা ইতোপূর্বেই বলিয়াছি যে, রুস্তম ছিলেন পারস্যের হারকিউলিস—তাঁহারই ন্যায় দৈত্য-দানব ধ্বংসকারী ও জালিমদের বিপর্যস্তকারী; তাঁহার ন্যায় তিনিও ছিলেন একটা দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের পূর্বপুরুষ। তাঁহার মত তিনিও একখানা সিংহচর্ম পরিধান করিতেন, কিন্তু তাহা একটা আঁট-সাঁট কোটের আকারে; তাঁহার ন্যায় রুস্তমের হাতেও একটা যষ্টি থাকিত, তবে উহা ছিল লৌহ নির্মিত ও অষ্টকোনী। সর্বোপরি পারসিক হারকিউলিসের যে নৈতিক চরিত্র ছিল, ইউরোপীয়ের তাহা ছিল না। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন অন্ধের সৈন্য দলে শুধু প্রথম সৈনিক হওয়ার উপযুক্ত।

(৩৫) আমরা পূর্বেই মন্তব্য করিয়াছি যে, এই সঙ্গীত প্রভুত্ব ও রাজত্বের নিদর্শন; সমস্ত সুবাদারেরই ইহা বাজাইবার অনুমতি ছিল। ইহা ২।৩টি নাগারা বা ইউরোপের দ্বিগুণ বৃহৎ লোহার বড় দামামা বা ভেরী, ২।৩টি ঢোল বা সাধারণ ঢাক, ২।৩টি জোর্ণাহ্ বা সানাই, ২।৩টি কের্‌না বা তুরী, একটি বা দুইটি ঝিল বা করতাল লইয়া গঠিত। ইউরোপীয়েরা তুর্কদের নিকট হইতে হালে করতাল ধার করে; কিন্তু তুর্ক, পারসিক ও ভারতীয়েরা অধিকতর সূক্ষ্ম, বিচিত্র ও

বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহা বাজাইত। এই সবগুলিই দুর্গ বা প্রাসাদের তোরণের বা এই উদ্দেশ্যে নির্মিত একটা অট্টালিকার উপরে বাজান হইত। তিনটি উচ্চ খিলানের উপরে বসিয়া যাহা বাজান হইত ইহা তিনপউলিয়া নামে অভিহিত হইত; কিন্তু গ্রাম্যলোকেরা ইহাকে তিরপাউলিয়া বলিত সবগুলি মিলিয়া একটা প্রাণবন্ত ও শ্রুতিমধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিত। লম্বাতুরী এক মাইল দূর হইতে স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইত এবং একমাত্র কোন নাদির শাহের স্বর বলিয়া মনে হইত; তিনি যেন বজ্রনির্ঘোষে তাঁহার সৈন্যদের আদেশ দান করিতেছেন। একটি তাস্‌স দ্বারা ঐকতান বাদ্য আরম্ভ হইত: ক্রমাগতভাবে সবগুলিই তাহাতে যোগ দিত। কিন্তু প্রত্যেক প্রকারের ঢোল আপনা হইতেই পালাক্রমে বাজান হইত। মধ্যে মধ্যে অপরগুলি ও নাগারা দ্বারা উহার আওয়াজ বুলন্দ করা হইত। লম্বা-তুরী বরাবরই এক বা একটা ভাসসংযোগে বাজান হইত।

পঞ্চম অধ্যায়

[মুর্শিদাবাদের দরবারে মহতী পুরস্কার বিতরণ—সরফরাজ খাঁর সম্পূর্ণ সম্পত্তিরূপে দরবারে প্রায় এক কোটি মুদ্রা প্রেরণ—উড়িষ্যা বা কটকের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণে আলীবর্দী খাঁর সঙ্কল্প—উড়িষ্যা বিজয়—ইহার শাসনকর্তার অদ্ভুত পলায়ন—তৎপ্রতি জনৈক হিন্দুরাজার অসাধারণ সদাশয়তা—আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক তদীয় দৌহিত্রের হস্তে উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ—আলীবর্দী খাঁ ও তাঁহার পরিবার কর্তৃক সরফরাজ খাঁর মাতার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন—উড়িষ্যার নূতন শাসনকর্তার অযোগ্য শাসন—তাঁহার ভীষণ অত্যাচার—ভূতপূর্ব শাসনকর্তার জামাতা কর্তৃক কটক পুনরুদ্ধার—নূতন শাসনকর্তা ধৃত ও বন্দী—আলীবর্দী খাঁর উড়িষ্যা যাত্রা—বকর আলী খাঁর পরাজয়—উড়িষ্যায় নূতন ব্যবস্থা—সাহস ও সদাচরণের জন্য আজিমাবাদের শাসনকর্তার সুখ্যাতি লাভ—রোশন খাঁ তেরাহির হত্যার আদেশ—মারাঠাদের বাঙ্গালা অভিযান—তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আলীবর্দী খাঁর সঙ্কল্প—তাঁহার কতিপয় সেনাপতির পশ্চাতে অবস্থান—সৈন্যদলের আফগানদের দলত্যাগের সর্বসম্মত অভিপ্রায়—মারাঠাদিগকে নিষ্কর দানে তাঁহার অবজ্ঞা—পুনরায় তাঁহার আফগান সৈন্যদের অনুরক্তি লাভ—শত্রুর ভিতর দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর—বঙ্গ-বাহিনীর কাটোয়ায় চিরস্মরণীয় প্রত্যাবর্তন—দুইটি হস্তী কর্তৃক ইহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা—মারাঠাদের মুর্শিদাবাদের একাংশ লুণ্ঠন—হুগলী অধিকার—গঙ্গার দক্ষিণস্থ নিখিল বঙ্গ লুণ্ঠন—আজিমাবাদের শাসনকর্তার তাঁহার খুল্লতাতের সাহায্যে গমন—নিজের জনৈক আত্মীয়ের সহিত আলীবর্দী খাঁর কৌশলপূর্ণ সাক্ষাৎ—বাদশাহ্ কর্তৃক আবুল মনসুর খাঁ ও বালাজিরাওকে বাঙ্গালার সাহায্যে প্রেরণ—একটি তরণী-সেতু ভাঙ্গিয়া পড়ায় বিপুল প্রাণনাশ—মারাঠাদের কঠোর শায়েস্তা—আবুল মনসুর খাঁর উদ্ধত ব্যবহার—গ্রন্থকারের পিতার বদনাম—আলীবর্দী খাঁকে সাহায্য করার ছলে বালাজিরাও কর্তৃক বাঙ্গালা লুণ্ঠন—আসন্ন বিপদ হইতে ঘটনাক্রমে

আজিমাবাদের রক্ষা—মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাঁহার ঘরবাড়ী রক্ষার প্রচেষ্টায় জনৈকা মহিলার অসাধারণ সঙ্কল্প—আলীবর্দী খাঁ ও বালাজিরাওর কপট সভা—হোসেন কুলী খাঁর পদচ্যুতি, কিন্তু সুবাদারের কন্যা ঘসেটি বেগম কর্তৃক স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠা—গ্রন্থকারের পিতার অপকার—আলীবর্দী খাঁর পরিবারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ত্যাগ—একটা প্রাচীর নির্মাণ করিয়া আজিমাবাদ নগর সুরক্ষিত করণ—মুস্তফা খাঁর উপর সুবাদারের দৃঢ় আস্থা—মারাঠা সেনানায়কদের ফাঁদে ফেলিতে আলীবর্দী খাঁর সঙ্কল্প—তাঁহাদের অধিকাংশের হত্যা—সর্বত্র নিহত হইয়া মারাঠাদের বাঙ্গালা ত্যাগ—আফগান জাতির বিচিত্র স্বভাব—সুবাদারের সেনাপতি হইতে মুস্তফা খাঁ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত—তাঁহার সহিত মুস্তফা খাঁর প্রকাশ্য সংগ্রাম—আজিমাবাদের শাসনকর্তা তৎকর্তৃক আক্রান্ত—প্রবল উদ্যমে আক্রমণ প্রতিরোধ—তাঁহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ—মুস্তফা খাঁকে কৌশলময় ও চাতুর্যপূর্ণ উত্তর দান—মুস্তফা খাঁর প্রকাশ্য ও সাহসিক প্রত্যুত্তর—আজিমাবাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ ও অধিকার করিয়াও আফগানদের পরাজয়—মুস্তফা খাঁ মস্তকে গুলিবিদ্ধ পুনরায় জয়লাভে বঞ্চিত—ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্যে আলীবর্দী খাঁর যুদ্ধযাত্রা—তৃতীয় বারে বিজয়ী হইয়াও মুস্তফা খাঁ নিহত হওয়ায় আফগানদের পরাভব—ঐ বীরপুরুষের দেহের সহিত অশোভনীয় আচরণ।]

শুজা খাঁ ও সরফরাজ খাঁর সঞ্চিত ধন-সম্পদ কেবল কোটিতেই গণনা করা চলিত। এগুলি অধিকার করিয়া ও নিজেকে এই সকল পূর্বদেশের মালিকে পরিণত করিয়া আলীবর্দী খাঁ দেশে শান্তি স্থাপন ও নিজ শাসন প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিলেন। যুগপৎ তিনি বাদশাহের নিকট হইতে শুজাউল মুল্ক ও হেসামুদ্দৌলাহ উপাধি পাইলেন এবং হপ্তহাজারী মনসবদারিতে সম্মানিত ও মাহী প্রতীকে ভূষিত হইলেন। বাস্তবতঃ তদীয় পরিবারের প্রতি তাঁহার স্নেহের পরিতুষ্টি বিধানের জন্য ইহার প্রত্যেকটি লোককে দরবার হইতে উচ্চ সম্মান প্রদত্ত হইল। জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁকে তিনি আজিমাবাদে রাখিয়া আসেন এবং তাঁহাকে ঐ প্রদেশে সর্বেসর্বা করেন; তিনি হপ্তহাজারী মনসবদারি এবং শাহী ঝালরযুক্ত পাল্কী, দামামা ও পতাকাসহ সাহসী,

সাম্রাজ্যের সম্মান (ইজ্জতুদ্দৌলাহ্) ও 'যুদ্ধে ভয়ঙ্কর' (হয়বত-জঙ্গ) উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁকে তিনি সিলহট ও ইসলামাবাদ-চাটগামসহ জাহাঁগীর নগর-ঢাকা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন; তাঁহাকে তখন দেওয়ানের চাকরী দিয়া সম্মানিত, শাহী প্রতীক দ্বারা ভূষিত এবং সাহসী, সাম্রাজ্যের আড়ম্বর (এহতেশামুদ্দৌলা) ও 'যুদ্ধে চির সাহসী' উপাধি ও উপনাম দ্বারা স্মরণীয় করা হইল। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র সায়্যিদ আহ্মদ খাঁ শুজা খাঁ ও সরফরাজ খাঁর আমলে রঙ্গপুরের ফৌজদারি করেন; সেখানে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করেন; তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতাদের ন্যায় একই পদ ও মর্যাদায় ভূষিত করা হইল; তিনি সাম্রাজ্যের সম্পাদক (মুহাম্মদ্দৌলা সোলাবত-জঙ্গ) ও যুদ্ধে প্রচণ্ড উপাধি ও উপনাম পাইলেন। তৎসঙ্গে শুজা খাঁর জামাতা মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে উড়িষ্যার পুনরুদ্ধার সাধন করিতে পারা মাত্র তাহা তাঁহাকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইল। এই আমীর সরফরাজ খাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনী বিবাহ করেন; ইনি একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তদুপরি ছিলেন একজন প্রতিভাশালী কৌশলী কবি; কবি হিসাবে তিনি যেমন 'সার-সার ছদ্মনামের জন্য গৌরবান্বিত, এমনি একজন মর্যাদাবান আমীর ও একটা বিরাট প্রদেশের শাসনকর্তারূপে প্রাপ্ত 'রুস্তম জঙ্গ' উপাধির জন্যও' গৌরব-বোধ করিতেন। জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মুহম্মদকে আলীবর্দী খাঁ নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, ও নিজের নিকটে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হন। তৎপূর্বে তাঁহাকে সিরাজুদ্দৌলাহ্ শাহ্কুলী খাঁ বাহাদুর' উপাধি ও উপনাম এবং জাহাঁগীরনগর ঢাকার নৌ সেনাপতির পদ প্রদত্ত হয়; এগুলি তিনি বাদশাহের নিকট হইতে তাঁহার জন্য আনাইয়া লন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা ও ভ্রাতুষপুত্র নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁর নিজের কোন পুত্র না থাকায় তিনি মির্জা মুহম্মদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার দ্বারা দত্তক গ্রহণ করান; তিনি তাঁহার জন্য বাদশাহ্ কুলী খাঁ উপনাম ও একরামুদ্দৌলাহ্ উপাধি সংগ্রহ করেন। এই দুই ভ্রাতার প্রত্যেককে হপ্তহাজারী মনসবের পদ দ্বারা সম্মানিত ও এত উচ্চপদের সহিত সংযুক্ত

মর্যাদা ও প্রতীক দ্বারা ভূষিত হন এবং তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই উচ্চ ও ক্ষমতাশালী আমীরে পরিণত হন। আলীবর্দী খাঁ আজিমাবাদের নাজিম নিযুক্ত হইলে শুজা খাঁ ও সরফরাজ খাঁর আমলেই হাজী আহমদের কনিষ্ঠ জামাতা আতাউল্লাহ খাঁ তাঁহার (আলীবর্দীর) স্থানে আকবর নগর রাজমহলের ফৌজদারের পদে অভিষিক্ত হন; এখন তিনি ভাগলপুরের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত; তিন হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিকের একটা বাহিনীর সেনাপতির পদে উন্নীত, হপ্তহাজারী মনসব দ্বারা সম্মানিত এবং কয়েকটা প্রতীক ও 'সাম্রাজ্যের সম্মানিত' ও 'যুদ্ধের দিনে অটল' প্রভৃতি আড়ম্বরময় উপাধি ও জাঁকাল উপনাম দ্বারা ভূষিত হইলেন। নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁর নায়েব বা সহকারী হোসেন কুলী খাঁ তিন হাজারী মনসবের মর্যাদা দ্বারা সম্মানিত হইলেন। তৎসঙ্গে একটি পতাকা ও একটি দামামার সম্মান এবং বাহাদুর বা বীর উপাধি সংযুক্ত করা হইল। আলীবর্দী খাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আতা-ইয়ার খাঁ, ফকীরুল্লাহ্ খাঁ, নূরুল্লাহ্ খাঁ, মীর জাফর খাঁ, মুস্তফা খাঁ এবং আরও কতিপয় আত্মীয়, বন্ধু বা পদস্থ কর্মচারীর প্রত্যেকেই কোন-না-কোন মর্যাদা দ্বারা সম্মানিত, মর্যাদা বা চাকরীতে উন্নীত হইলেন কিম্বা কর্তৃত্বে তরক্কী লাভ করিলেন। মরহুম শুজা খাঁর দেওয়ান রায় রায়ান আলমচাঁদের গোমস্তা চীনরায় নিজেই রায় রায়ান উপাধি দ্বারা সম্মানিত ও আলীবর্দী খাঁর দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রাচীন দেওয়ান রাজা জানকীরাম সৈন্য সমাবেশের দেওয়ান ও খাতাপত্রের পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আমার চাচা ও আলীবর্দী খাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভ্রাতা আবদুল আলী খাঁর পিতা, আমার নানা ও আলীবর্দী খাঁর চাচীর ছেলে সায়্যিদ জয়নুল আবেদীন যেভাবে এগুলি ভোগ করেন, তদ্রূপ ঐ কর্মচারীকে তিনহাজারী মনসবদারি ও বখ্শীর পদসহ 'বাহাদুর' উপাধি দানে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ঐ আমীর আলীবর্দী খাঁর অন্যান্য ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় তুল্য তরক্কীলাভের প্রত্যাশা করিতেন বলিয়া তাঁহার উপর তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বদানে অসন্তুষ্ট হইয়া বিরক্তিভাবে দরবার ত্যাগ করেন এবং আজিমাবাদে গমনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বাস্তবিকপক্ষে সেখানে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্ব হইতেই তিনি বিহার ও বেসোকের তহশিলদারের পদ ভোগ করিতেন। তথাকার শাসনকর্তা

জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁ তাঁহার উপস্থিতিতে নিজেকে সম্মানিত মনে করিয়া তৎসঙ্গে তাঁহাকে ত্রিহুতের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং বন্ধুরূপে তাঁহাকে দরবারে অবস্থান করিতে বলিলেন। আবদুল আলী খাঁকে বখ্শীর পদ প্রদানের কথা; কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে তিনি মুর্শিদাবাদের দরবার হইতে অনুপস্থিত থাকায় তাহা আমার ফুফুর স্বামী নসরৎ আলী খাঁকে ও ২য় বখ্শীর পদ ফকীরুল্লাহ বেগ খাঁকে প্রদত্ত হয়; ইনি ছিলেন আলীবর্দী খাঁর সর্বাপেক্ষা অনুরক্ত ব্যক্তিদের অন্যতম। কৃতজ্ঞতার পুরস্কার হিসাবে ঐ সকল সম্মান বিতরণ ও বিজ্ঞতার নির্দেশ দানের পর আলীবর্দী খাঁ বাদশাহের নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুত কোটি টাকা ও পেশকুশ বা অর্থোপহার প্রেরণ করিলেন। ইহাতে টাকা ও মূল্যবান দ্রব্য ছিল; স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ইসহাক খাঁর মধ্যস্থতায় ইহা গৃহীত হয়। সরফরাজ খাঁর বাজেয়াফ্‌ত সম্পত্তির তিনি যতটুকু সঙ্গত মনে করিলেন ততটুকু বাদশাহের ব্যবহারার্থ পৃথক করিয়া রাখিলেন। সুবাদারের মসনদে উপবেশনের সময় হইতে বাঙ্গালার রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল; তাহা আদায় ও সরফরাজ খাঁর সম্পত্তির দখল লওয়ার দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে বাদশাহের দরবারের দ্বিতীয় শ্রেণীর আমীর মুরীদ খাঁ বাহাদুর রাজধানী হইতে প্রেরিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে আজিমাবাদে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া সসম্মানে পত্র লিখিলেনঃ "আপনার সহিত সত্বিগলিতে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে আমি নিজেই রাজমহল যাত্রা করিতেছি; সেখানে সরফরাজ খাঁর সম্পত্তি ও বাকী পড়া রাজস্ব হুজুরের হাতে অর্পণে ক্রটি হইবে না।" ঐ আমীর যাহাতে বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিতে না পারেন, তাহাই এই অনুরোধের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া রজব মাসে আলীবর্দী খাঁ আকবর-নগর রাজমহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সেখানে বহুদিন অপেক্ষা করার পর তিনি মুরীদ খাঁর সাক্ষাৎ পাইয়া অনেক স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাব-পত্র, কিয়ৎ পরিমাণ মূল্যবান পাত্র ও কিছুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বসহ নগদে কয়েক লক্ষ টাকা ও সত্তর লক্ষ টাকার মণিমুক্তা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। এ সমুদয় পূর্ণ বাজেয়াফ্‌তী সম্পত্তি বলিয়া চালাইয়া দিয়া তিনি ঐ আমীরের হস্তে ইহার একটা কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিলেন। অতঃপর সর্বপ্রকারে তাঁহার মর্যাদা ও উপলক্ষ অনুযায়ী উপহার দিয়া অত্যন্ত সম্মান ও ভদ্রতার সহিত

তাঁহাকে বিদায় দানের পর তিনি উড়িষ্যার প্রকৃত মালিক মুর্শিদ কুলীর হাত হইতে উহা পুনরুদ্ধারের বাসনায় উহার রাজধানী কটকের বিরুদ্ধে একটি অভিযান করিতে ইচ্ছুক থাকায় তাঁহার সৈন্যদল পরিদর্শন করিলেন।

আলীবর্দী খাঁ এখন তাঁহার রাজ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার শাসনকার্যের প্রত্যেকটি শাখা সুব্যবস্থিত করেন। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি একটা বিজয়ী বাহিনী এবং বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসহ এক সারি কামান সজ্জিত করিলেন। এযাবৎকাল তিনি তাঁহার ইপ্সিত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিভা ও মনের গতি সম্পর্কে পূর্বাহ্নে সংবাদ সংগ্রহে অতিবাহিত করেন কিন্তু মুর্শিদ কুলী খাঁ নিজেকে এরূপ শত্রুর সমকক্ষ বিবেচনা না করিয়া তাঁহার অভিসন্ধি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার ও তাঁহার সহিত সন্ধির ব্যবস্থা করার জন্য সুরাটের আগা মুহম্মদ তর্কী নামক জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। দূত অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করায় তাঁহার প্রতিভার প্রতি সম্মানার্থ এবং উভয় চুক্তিকারকের মধ্যে বর্তমান এককালীন পরিচয়ের খাতিরে এই উদ্দেশ্য অচিরে সিদ্ধ হয় এবং দূতকে সম্মান ও সুখ্যাতির সহিত বিদায় দেওয়া হয়। কিন্তু মির্জা বাকিয়ার খাঁর ষড়যন্ত্রে এই সুভসূচনা অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আমীর ছিলেন ইরানের সাফাভী° রাজবংশের অধঃস্তন পুরুষ ও বর্তমানে মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা। কুলী খাঁর বেগমও, তাঁহার জামাতার সহিত যোগ দিয়া বলেন, 'বাঙ্গালা একটি মূল্যবান পুরস্কার এবং সরফরাজ খাঁর ঘাতকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিহিংসা গ্রহণ করা কর্তব্য (বস্তুতঃ তিনি আদৌ ঐ বিজয়ের যোগ্য ছিলেন না)।' মুর্শিদকুলী খাঁ নিজে [ঐকান্তিকভাবে] শান্তি কামনা করিলেও এই দুই ব্যক্তি সজ্ঘবদ্ধ হইয়া এমন চমৎকার চাল চালিলেন যে, প্রায় সমাপ্ত সন্ধি বানচাল হইয়া গেল। তাঁহার মনে এই পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়া আলীবর্দী খাঁ তাঁহাকে লিখিলেন "সেই বিখ্যাত শাসনকর্তার কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট করার কোন ইচ্ছা তাঁহার মনে ছিল না। কিন্তু তাঁহার পক্ষে আর কিছুকাল কটকে অবস্থান কোন পক্ষের জন্যেই শান্তিদায়ক হইবে না; কাজেই তাঁহার প্রত্যাশা, মহামান্য শাসনকর্তা স্বয়ং তাঁহার পরিবার ও মালপত্র লইয়া মুর্শিদাবাদের পথে হিন্দুস্তানে গমন করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিবেন;

তবে কটক হইতে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী দাক্ষিণাত্য রাজ্যে গমন প্রকৃত পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে হইলে অন্য কথা।" এরূপ বার্তা অপর যে কোন লোকের বেলায় বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিত; কিন্তু তাঁহার প্রতিদন্দীর সামরিক প্রতিভা ও উৎকৃষ্ট সৈন্যকে ভয় করিতেন বলিয়া কটকের শাসনকর্তা বিবাদ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সমস্ত অস্থিরতার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার জামাতা অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন বলিয়া এরূপ উদ্ধত ভাষা সহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; একবার বাঙ্গালার ন্যায় দেশে প্রভুত্ব করার সম্ভাবনায়ও তিনি উৎসাহিত হন। তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রস্তাবে শ্বশুরের তেজউদ্দীপিত ও সুখাভিলাষ উত্তেজিত হয়। সুবাদারের বেগম ছিলেন একজন অতি তেজস্বিনী মহিলা। তিনি দৃঢ়তার সহিত এই প্রতিহিংসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার মনোবৃত্তির সমর্থন করেন; কখনও ভৎর্সনা কখনও কাকুতি-মিনতি দ্বারা তিনি তাঁহার ভ্রাতৃহন্তাকে নিরাপদে শাস্তি হইতে অব্যাহতি ও রাজ্য দুইই ভোগ করিতে দেওয়ার অপযশ সম্পর্কে অবিরত ত্যক্তবিরক্ত করিতেছিলেন। তাঁহার স্বামীর চেয়েও এই শাহজাদী খোদ প্রদেশে অনেক অধিক সম্মান পাইতেন; অনুনয়-বিনয় হইতে তিনি শেষে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এমনকি বলিলেন যে, এরূপ ভীরু স্বামী ত্যাগ করিয়া খোদ প্রদেশটি সহকারে তাঁহার ধনসম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাবী তাহার জামাতাকে দান করিবেন বলিয়া ধমক দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইনি ছিলেন যেমন তেজস্বী, তেমনি ষড়যন্ত্রপরায়ণ মেজাজের যুবক। তিনি তাঁহাকে প্রকৃতিতে আলীবর্দী খাঁর প্রতি তাঁহার ঘৃণার সমর্থনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া দেখিতে পান। এই দুই তেজস্বী ব্যক্তির প্ররোচনায় অভিভূত হইয়া সুবাদারের মন পরিবর্তিত হইল। তিনি বাঙ্গালায় তাঁহার প্রতিবেশীকে সংবাদ দিলেন, "তাঁহার গোমস্তা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে প্রাথমিক ব্যবস্থায় সম্মতি দান করিয়াছেন, তিনি তাহাতে রাজী নহেন; কেবল তরবারি দ্বারাই তাহাদের স্ব স্ব দাবী স্থিরীকৃত হইবে।"

আলীবর্দী খাঁর উড়িষ্যা যাত্রা

যুদ্ধ-ব্যতিরেকে কিছুই পাওয়া যাইবে না বলিয়া সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া আলীবর্দী খাঁ তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। তিনি বাঙ্গালার শাসন-

কর্তৃত্ব ও নগর রক্ষণাবেক্ষণের ভার হাজী আহমদ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তাঁহার সৈন্যদল পরিদর্শন করিলেন; তাহাতে সর্বশুদ্ধ দশ বা বার হাজার বাছাই সৈন্য ছিল। অতঃপর তিনি নগর ত্যাগের জন্য নক্ষত্ররাজিতে শুভক্ষণের সন্ধান করিয়া উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন।

এরূপ সংবাদ শীঘ্রই কটকে নীত হইল। মুর্শিদকুলী খাঁ এখন যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার পার্শ্বচরদের মন যাচাই করা সঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও তাঁহার সৈন্যদলের প্রধান কর্মচারীদের একত্র করিয়া তিনি দেওয়ান-ই-আমে আসিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তৎপরে নিজের পার্শ্ব হইতে তাঁহার তরবারি লইয়া দরবারের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিলেন। সমুজ্জ্বল বর্ণে আলীবর্দী কৃত অপরাধ চিত্রিত করিয়া তিনি যেই অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে আলীবর্দী শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভে তৃপ্ত না হইয়া নিহত শাহজাদার ভগিনীর সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চাহেন এবং যুদ্ধ ও তাঁহার নিজ মতের নিকট প্রত্যেককে উৎসর্গ করা ভিন্ন আর কিছুর কথাই বলেন না, এইরূপে তাহার নিন্দাবাদ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "আমার কারণ যেমন ন্যায্য আমার অবস্থা তেমনি গুরুতর। এই অন্যায় বিরোধে আপনাদের অভিপ্রায় অবগত হওয়া ভিন্ন এখন আমার আর কিছুই করিবার নাই। যদি আপনারা আমাকে সমর্থনের পক্ষপাতী হন, চলুন আমরা একযোগে যাত্রা করিয়া একত্রে যুদ্ধ করি, কিন্তু আপনাদের অন্য অভিপ্রায় থাকিলে আল্লার দোহাই তাহা শীঘ্র ও যথোচিত সময়ে খুলিয়া বলুন, যেন আমি তদনুযায়ী কার্য করিতে ও যথাসময়ে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে পারি।" এই ক্ষুদ্র বক্তৃতা অনুমোদনের সহিত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হওয়ায় তাঁহার সৈন্যদলের প্রধান কর্মচারী আবদুল আলী খাঁ সমবেত জনসঙ্ঘের নামে তাঁহাকে নিশ্চয়তা দান করিয়া বলিলেন," তিনি তাহাদের বিশ্বস্ততা ও খুনীর প্রতি তাঁহাদের ঘৃণার উপর নির্ভর করিতে পারেন।" এই অল্প কয়েকটা কথা বলিয়া তিনি উপস্থিত সমুদয় লোক সহ দণ্ডায়মান হইলেন এবং মৃত্তিকায় পতিত তরবারি তুলিয়া লইয়া তাহা সুবাদারের কটিদেশে পরাইয়া দিয়া তাঁহাদের আনুগত্য ও উৎসাহ সম্পর্কে তাঁহাকে নিশ্চিত

করিলেন। এবম্বিধ দৃশ্যে শাসনকর্তার মন শান্ত হইলে তিনি শুধু যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করিয়া এবং নিজ জামাতাকে সঙ্গে লইয়া তিনি কটক ত্যাগ করিয়া তাঁহার দেশের সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বালালোর বন্দর ছাড়াইয়া গিয়া উহার পার্শ্বদেশ দিয়া যে নদী প্রবাহিত হয় তাহা অতিক্রম করিলেন এবং ইহারও বাহিরে কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়া প্রতিরোধের অত্যন্ত যোগ্য বলিয়া বিবেচিত এক জায়গায় স্থান গ্রহণ করিলেন। ইহা একটা খাড়া উচ্চপাড়যুক্ত একটা নদী দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণ বেষ্টিত ছিল। সেখান হইতে একটা বন ও কাঁটাগাছ পূর্ণ জনপদ দৃষ্ট হইত। তাঁহার শিবিরের অবস্থানের প্রতি প্রাকৃতিক আনুকুল্যে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি ন্যূনতম কঠিন অংশে কিছু পরিখা খনন করিলেন এবং আদ্যন্ত পার্শ্বদেশে ছোটবড় ৩০০ কামান বসাইলেন। ফলে তাঁহার শিবির এত ভীতিপ্রদ আকার ধারণ করিল যে, তাঁহাকে স্থানচ্যুত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইল। অবস্থা যখন এইরূপ তখন আলীবর্দী খাঁ মেদিনীপুর হইতে যাত্রা করিলেন। বালালোর বন্দরের দিকে অগ্রসর হইলে একটি অদম্য শিবিরের পূর্ণাঙ্গরূপ তাঁহার চক্ষে পড়িল। লোকমুখে তিনি ইহার একটা আভাস পান মাত্র। তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ফুরাইয়া গেল। এরূপ ক্রোধোদ্দীপ্ত ও এত চমৎকাররূপে পরিখা বেষ্টিত শত্রুকে আক্রমণ করা অসম্ভব; ঐ দৃঢ় আড্ডা হইতে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া আনাই ছিল নিশ্চিত উপায়; কিন্তু তাঁহার অবস্থা তখন সঙ্কটপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। বাঙ্গালার সীমান্তের জমিদারেরা শিবিরে মালপত্র পাঠাইতে অমনোযোগী হইয়া পড়িলেন; সামান্য কিছু শিবিরের নিকটে আসিলে উড়িষ্যার জমিদারেরা তাহার গতিরোধে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। তাহারা তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে ঘৃণা ও তাহার শিবিরকে শত্রু শিবির মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নারায়ণগড়ের শাসনকর্তা প্রেরিত কিছু রসদপত্রও অনুরূপভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতারা কিভাবে সরবরাহ পাইবে, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ফলে রসদপত্র মহার্ঘ এবং পরিশেষে বিরল ও নিকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

এমতাবস্থায় উড়িষ্যার শাসনকর্তার পক্ষে দরকার ছিল শুধু ধৈর্যধারণের। শত্রুরা নিজেদের নিঃশেষিত করুক, ইহা ছিল তাহারও ইচ্ছা। কিন্তু এরূপ বিলম্ব তাহার জামাতা বাবাজির পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। শত্রুদর্শনে উত্তেজিত হইয়া ও তাঁহার দুর্দশার সংবাদ পাইয়া তিনি সম্পূর্ণ রূপে বাহিরে গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন। আলীবর্দী খাঁ ঠিক ইহাই কামনা করিতেছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে শত্রুপক্ষ এই ভুল করায় তিনি তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। মির্জা বাকের অন্ধের ন্যায় সম্মুখে ধাবিত হইতে গিয়া তাঁহার খাতের যে অংশে তাঁহার অধিকাংশ কামান স্থাপিত হয়, তাহা খালী করিয়া ফেলেন; আলীবর্দী খাঁ শীঘ্রই ইহা বুঝিতে পারিয়া সেখানে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া ইহার সবটাই দখলে আনিলেন। কাজে কাজেই যুদ্ধ বাঁধিল এবং বন্দুক ও হাউই বাজির সাহায্যে উহা চলিতে লাগিল। উভয়পক্ষে বিপুল সংখ্যক সাহসী লোক নিহত হইতে লাগিল। তখনি যুদ্ধের ফল সন্দেহজনক হইয়া রহিল। মুর্শিদকুলী খাঁ সাহসের সহিত স্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সন্ধিক্ষণে যে আবেদ খাঁ কটকের সভায় এত বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপে সকলের নজরে পড়েন ও তাঁহার সৌভাগ্যের জন্য তাঁহার শাসনকর্তার নিকট ঋণী ছিলেন, তাহার ধমনীতে এত অধিক আফগান শোনিত ছিল যে, কোন গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতার স্পৃহা না করিয়া পারিলেন না। আমি বলিতেছি, আবেদ খাঁকে তাহার স্থান হইতে সরিয়া যাইতে দেখা গেল। তাঁহার স্বদেশবাসী ও শত্রুর প্রিয় সেনাপতি বিখ্যাত মুস্তফা খাঁর সহিত ইতঃপূর্বেই তাঁহার একটা চুক্তি হয়; তিনি তাঁহার সমগ্র বাহিনীসহ যেন আক্রমণে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু স্বীকৃত সঙ্কেত বামদিকে রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সেদিকে ছুটিলেন এবং তাঁহার সমগ্র সৈন্যদল মুস্তফা খাঁর সন্নিকটে বিন্যাস করিয়া কোন সাধারণ দর্শক যেন যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছেন এভাবে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! কিন্তু এই দলত্যাগেও মুর্শিদকুলী খাঁ ভীত হইলেন না। তাঁহার সৈন্যেরা স্বস্থানে অটল রহিল; বারের একদল সায়্যিদ দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি সর্বত্র বিচরণ করিতেছেন বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের

উৎসাহ প্রদর্শনে ইচ্ছুক ও তাঁহাদের জাতীয় চরিত্র[৬] সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহারা সাহসের সহিত সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং এত জোরেশোরে আক্রমণ চালাইলেন যে, তাঁহাদের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুরা হটিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, কয়েক জন বাঙ্গালী সৈন্য এমনকি প্রকাশ্যে পলায়ন করিল। আলীবর্দী খাঁর সুনাম নষ্ট ও তাঁহার চিরস্থায়ী অপমানে আবৃত হওয়ার সময় উপস্থিত হইল।[৭] তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ মির্জা বাকের ঠিক এই সময় দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার স্থানত্যাগ করিয়া শত্রুদের বাম পার্শ্বে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদিগকে এত বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিলেন যে, তাহারা বাস্তবিকই হটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার সেই আক্রমণের দরুনই তিনি নিজেও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলেন। শত্রুপক্ষের উৎকৃষ্ট সৈন্যদ্বারা এই পার্শ্ব গঠিত হয়, মীর জাফর খাঁ ছিলেন এখানে সেনাপতি। অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া তিনি তাঁহার ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং একটি শক্তিশালী সৈন্যদলের পরিচালনা ভার লইয়া পরাজিত সৈন্যদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। মুসাহিব খাঁ এবং সাহসী ওমর খাঁর নির্ভীক পুত্রদ্বয় আফগান দিলির খাঁ ও আসালত খাঁকে প্রতিরোধ করিতেছিলেন। সেই কঠিন মুহূর্তে মীর জাফর খাঁ এত সাহসের সহিত তাঁহার বল প্রয়োগ করিলেন যে, সেদিন তিনি সামরিক আচরণ ও সৈনিকোচিত বীরত্বের জন্য উচ্চ খ্যাতি লাভ করিলেন। যুদ্ধ তীব্র ও রক্তক্ষয়ী হইয়া উঠিল। মীর মহব্বত আলী ও মীর আকবর আলী নামক সায়ীদদের দুইজন সেনাপতি কয়েকটি মারাত্মক আঘাত পাইয়া নিষ্ঠুর ভাগ্যপ্রদত্ত তিক্ত ঔষধের পেয়ালা তলা পর্যন্ত পান করিলেন; মির্জা বাকের নিজেও ঘাড়ে, মাথায় ও বুকে কয়েকটা বিপজ্জনক আঘাত পাওয়ায় তাঁহাদের সৈন্যেরা ভীত হইয়া চলিয়া গেল। মির্জা বাকের দাঁড়াইয়া থাকিতে অক্ষম হওয়ায় ময়দানের বাহিরে নীত হইলেন। সৈন্যেরা এরূপ সাহসী সেনাপতিদের হারাইয়া আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; তাহারা যুদ্ধ করিল শুধু হত্যাকাণ্ড এড়াইবার জন্য। ভাগ্য তৎপ্রতি বিরূপ হইয়াছে দেখিয়া কিরূপে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তাহা হইল মুর্শিদকুলী খাঁর ও একমাত্র চিন্তা। আহত জামাতাকে একটা পাল্কীতে লইয়া তিনি

বালাসোর বন্দরের দিকে ফিরিলেন; তাহার সঙ্গে তখনও প্রায় ৩০০০ সৈন্য ছিল; তাহাদিগকে লইয়া তিনি সেখানে আশ্রয় লইলেন। ঐ মুষ্টিমেয় লোকের নিকট হইতে তিনি যে কোন কিছুর প্রত্যাশা করেন, তাহা নহে; তিনি শুধু তাহাদিগকে ধোকা দিতে চাহিলেন। তিনি সেখানে গড়বন্দি করিয়া থাকিতে চাহেন এই ভাণ করিয়া তাহাদিগকে শহরের বাহিয়ে লইয়া গেলেন; সেখানে শহরতলীতে কিছু মাটি ফেলিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে নদীর দিকে ফিরিলেন। তিনি যেন নাশতা করিতে চাহেন, এভাবে তাঁহার হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন। তখন নদীতে তীরের ধারে একখানা জাহাজ পাল তুলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তত ছিল। উহার মালিক ছিলেন তাঁহারই পুরাতন বন্ধু ও প্রাচীন সহচর এবং তাঁহারই ন্যায় সুরেত বন্দরের (সুরাট) অধিবাসী। এই বন্ধুটি এত কাল যাবত ভারতের কয়েকটা বন্দরের জন্য জাহাজ নির্মাণ করিয়া অর্থশালী হন: তিনি ছিলেন ঠিক তাঁহারই পার্শ্বে এবং মালপত্র ও শস্যপূর্ণ জাহাজ খানা উহার পালগুলি প্রসারিত করিতেছিল। হাজী মহসেন তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করেন ও সেদিনের বিপদের পুরাপুরি ঝুঁকি ঘাড়ে লন। এখন বলা দরকার যে, জাহাজে বরাবরই পান্‌সী নামে একখানা ছোট নৌকা থাকে; ইহা তীরে যাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। জাহাজের লোকেরা কুলে এক বিরাট জনতা দেখিয়া মুর্শিদ কুলী খাঁর বিষয় সম্পর্কে খোঁজ লওয়ার জন্য তাহাদের পান্‌সী পাঠাইল; তাহাদের মালিক যে এযাবৎ-কাল যুদ্ধে ছিলেন তাহা তাহাদের জানা ছিল না। পানসী দেখিয়া শাসনকর্তা ও জাহাজের মালিক উভয়েরই মত সম্পূর্ণ বদলিয়া গেল। শেষোক্ত ব্যক্তি অঙ্গুলী দ্বারা নৌকাটি দেখাইয়া একটু থামিয়া বলিলেন, এরূপ নৌকা প্রেরণ তাঁহাদের অনুকুলে আল্লাহ্‌র বিশেষ হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে হয়। মুহূর্তে শাসনকর্তা তাঁহার সহিত একমত হইলেন এবং কাহারও সহিত আলোচনা না করিয়া বা দর্শকদের কাহাকেও তাঁহার মতলব সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও আভাস না দিয়া জাহাজের উপরে যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন; মতলব যেন একটু আমোদপ্রমোদ করিবেন ও জাহাজখানা দেখিবেন। কোন কিছু সঙ্গে না লইয়া তিনি তাঁহার জামাতা ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়

পরাজিত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁন জলিপত্তমে পলায়ন

কয়েকজন ভৃত্যমাত্র লইয়া পানসীতে চাপিয়া জাহাজে উঠিলেন; উহা তৎক্ষণাৎ নোঙ্গর তুলিয়া পাল ভরে যাত্রা করিল। আরও ছয় দিনে উহা মসলি বন্দরে (মসলিপত্তন) পৌঁছিল।

কিন্তু অচিরেই শাসনকর্তার মধ্যে অস্থিরতা ফিরিয়া আসিল। তিনি তাঁহার সমগ্র পরিবার, পত্নী ও দীর্ঘকালের সঞ্চিত বিপুল অর্থ পশ্চাতে ফেলিয়া আসেন। এই চিন্তা, বিশেষতঃ তাঁহার পত্নী ও সন্তান-সন্ততির চিন্তা তাঁহার মন পাগল করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কাজেই কটকের সহিত সিকাকোল ও সঞ্জাম শহরের যথেষ্ট সংশ্রব থাকায় তিনি কি করা যায়, চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার জামাতাকে সেদিকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ ঐ নিঃসহায় পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং ইতঃপূর্বে উহার জন্য একজন রক্ষক নির্বাচন করিয়া দেন। ইনি ছিলেন রতিপুরের রাজা এবং জগন্নাথেরই প্রভু। ইহা একটী বিখ্যাত তীর্থস্থান; সারা ভারতবর্ষ হইতে লোকে এখানে তীর্থ করিতে গমন করে। হিন্দুদের মধ্যে যে জাতিভেদ এত সুস্পষ্ট ও যাহা পরস্পরের মধ্যে অস্পৃশ্যতা জন্মায় একটা প্রাচীন আইন দ্বার তাহা তৎক্ষণাৎ সেখানে রহিত হয়। যে পীঠস্থান সর্বাপেক্ষা অধিক ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষিত হয়, সেখানে পরস্পরের যোগাযোগের ব্যবস্থা করা ইহার উদ্দেশ্য। এই হিন্দু রাজা ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁর একজন বিশিষ্ট বন্ধু; তিনি মানব জাতির সাধারণ শ্রেণীর ব্যতিক্রম ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। যে নগণ্য সংখ্যক লোক তাঁহাদের উপকারক ও বন্ধুদের দুর্ভাগ্যের দিনে পূর্বের উপকার ও পূর্বের সম্পর্ক স্মরণ রাখিয়া তদানুযায়ী কার্য করেন, তিনি যেন তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া গর্ব করিতেন। সাম্প্রতিক পরাজয়ের কথা শ্রবণ করিয়া এবং বিজেতারা অচিরে কটকের মালিক হইবে সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুর প্রত্যেকটি দ্রব্য নগর হইতে বাহির করিয়া আনয়নের আদেশ দিয়া কতকগুলি গাড়ী ও একটি শক্তিশালী প্রহরী দল প্রেরণ করিলেন। এ সমস্তই ছিল শাহ মুরাদ নামক তাঁহার গৃহস্থালির জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীর পরিচালনাধীন। তিনি ঠিক সময়ে সেখানে পৌঁছিয়া কেবল ঐ নিঃসহায় পরিবার ও ধন-সম্পদ নহে, এমন কি সমস্ত আসবাবপত্র ও শাসনকর্তার প্রত্যেকটি লোক বা ভৃত্য পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে লইলেন। সময় নষ্ট না করিয়া যাত্রা করিয়া সমগ্র উড়িষ্যা

অতিক্রম করতঃ তিনি তাঁহার জিম্মা ইছাপুরে লইয়া গেলেন ; ইহা সিকাকুল ও গঞ্জামের অধীন একটি শহর ও জিলা। তদুপরি তিনি তাঁহার মনিবের পক্ষে শাসনকর্তার হুকুম তামিলের জন্য সেখানে রহিয়া গেলেন। আরও সৌভাগ্যবশতঃ আনওয়ারুদ্দীন ছিলেন সে দেশের শাসনকর্তা ; মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। কাজেই তিনি ঐ হতভাগ্য পরিবারকে তাঁহার অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ ও সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যত্নবান হইলেন। কয়েক দিন পরে বাকের আলী খাঁ সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহার পত্নী ও ধন-সম্পদ অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত ও সর্বপ্রকার বিপন্মুক্ত হইয়াছে দেখিয়া এত সুস্পষ্ট মুক্তির জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন। সেখান হইতে তিনি তাঁহার শাশুড়ীকে তদীয় আসবাবপত্র ও ধন-সম্পদসহ শ্বশুরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কটকের সংবাদ লাভের জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার শ্বশুরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজামুল মুল্‌কের দেশে আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় লাভ করায় আপনাকে সুখী মনে করিলেন। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তিনি সেখানে অবস্থান করিলেন ; অপর পক্ষে কোন বিশ্রামের কথা আলীবর্দী খাঁর মনে স্থান পাইল না। তাঁহার সফলতার সুযোগ গ্রহণে অভিলাষী হইয়া তিনি কটকের দিকে ধাবিত হইলেন ; ঐ দেশ শাসনে আনয়নের জন্য তিনি এক মাস কাল সেখানে অবস্থান করিলেন। শুজা খাঁর সময় তিনি দীর্ঘকাল এতদঞ্চলে অবস্থান করায় ও প্রত্যেক জমিদারের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকায় ইহা কঠিন কার্য ছিল না। তিনি এখন তাঁহাদের ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাদের সকলের সঙ্গে সদয় ভাবে কথাবার্তা বলিলেন এবং যাহাকে যেরূপ অনুগ্রহের উপযুক্ত বিবেচিত হইল, প্রত্যেককে সেভাবে উপহার দিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। যুগপৎ তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা সায়্যিদ আহ্‌মদ খাঁর জন্য লোক পাঠাইয়া তিনি তাঁহাকে নিজের সম্মুখে কর্তৃত্বের মসনদে বসাইয়া ও তাঁহার স্কন্ধে ঐ অভিষেকের খেলাত পরাইয়া সেই প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত

আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক তাঁহার জামাতাকে উড়িষ্যার শাসনকর্তার পদে নিয়োগ

করিলেন। কিন্তু সায়িদ আহমদ খাঁ যে সকল যুবক কর্মচারীর উপর তাঁহার নিজস্ব সৈন্যদলের পরিচালনভার ন্যস্ত করেন, তাঁহাদের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারায় নওয়াব গুজুর খাঁ নামক তাঁহার একজন প্রধান কর্মচারীকে ইহার সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন; তাঁহার শাসনকর্তা যত সৈন্য সমাবেশ সঙ্গত মনে করেন, তাঁহাকে আরও তত সৈন্য সংগ্রহের অনুমতি প্রদত্ত হইল। এই সমুদয় ব্যবস্থার পর তিনি উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। সেখানে তিনি তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা পুনরায় কর্তৃত্ব ও রাজত্বের মসনদ সুশোভিত করিলেন।

এই বিশ্রামকাল তিনি অবিশ্রান্ত রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপার নির্ধারণে, তাঁহার সৈন্যদলকে নিয়মানুবর্তী করণে ও (যথাস্থানে) স্থাপনে, কৃষকদের নিরুদ্বেগ করণে এবং প্রতেক আমীর ও যে সকল সাধারণ লোক তাঁহার নিকটে আসিত, তাহাদের প্রত্যেককে অনুগৃহীতকরণে ব্যপ্রিত করিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও দত্তকপুত্র মির্জা মুহম্মদ ও তদীয় ভ্রাতাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেন; ভাইটি ছিল তখনও শিশু; তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁকে দিয়া তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করান। যাহাতে দেশের সমস্ত প্রধান আমীর ও প্রধান লোক এবং তাঁহাদের প্রধান আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ তাঁহার দরবারে হাজির থাকে, সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। সরফরাজ খাঁর পরিবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতার হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি নফিসা বেগমের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে নিজের প্রাসাদে লইয়া যান; সেখানে তাঁহাকে মাতা এবং তিনিও তাঁহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার অন্তঃপুরের পূর্ণ কর্তৃত্বসহ তাঁহার হারেমের সমস্ত ব্যবস্থা তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই দত্তক গ্রহণ নফিসা বেগমের কক্ষে কখনও তাঁহাকে সাক্ষাৎ দান বা তৎকর্তৃক কখনও তাঁহাকে একটু দেখিতে পাওয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয় নাই। এমন কি যখন তিনি তাঁহাকে তাঁহার পরিবারের হিসাব দিতেন এবং যখন তাঁহাদের মধ্যে অবিশ্রান্ত মাতা ও পুত্র শব্দ বিনিময় হইতে থাকিত, তখনও তাঁহাদের মধ্যে একটা পর্দা থাকিত; এই শাহজাদী এমন কি তাঁহার পত্নী আলীবর্দী খাঁর ন্যায়ও তত্ত্বানুসন্ধান লইতেন এবং তাঁহাকে না জানাইয়াই তাঁহার (নফিসা বেগমের) আদেশ প্রতিপালিত হইত।

অনুরূপভাবে তিনি তাঁহার পিতা জাফর খাঁ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে ক্রীত প্রত্যেকটি ভূমি বা গৃহসহ তাঁহার খাস তালুক (এই ভূখণ্ড হইতে বিপুল রাজস্ব আমদানী হইত) রক্ষা করিতেন। নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁ কখনও এগুলি স্পর্শ করিতে চাহেন নাই; তিনি এগুলি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে থাকেন। নওয়াজিশ মুহম্মদ ও খোদ আলীবর্দী খাঁ শেষ পর্যন্ত তাঁহার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের কেহই তাঁহাকে ভক্তি ভরে কুনিশ না করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতেন না বা আদিষ্ট না হইয়া কখনও তাঁহার সম্মুখে বসিতে চাইতেন না। সরফরাজ খাঁ যেদিন নিহত হন, ঘটনাক্রমে সেই দিনই তাঁহার জনৈক উপপত্নী এক পুত্র প্রসব করেন; নফিসা বেগম তাহাকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বালকটি অচিরে এমন কি নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁরও অত্যন্ত স্নেহাস্পদ হইয়া দাঁড়ায়; সে যেন তাঁহার নিজ পুত্র এরূপ যত্নের সহিত তাহাকে প্রতিপালন করার ব্যবস্থা হয়। সরফরাজ খাঁর নফিসা বেগম ছাড়া তৎসম মর্যাদা সম্পন্না কোন বিবাহিতা পত্নী ছিলনা, ছিল শুধু উপপত্নী; তাঁহাদের কয়েক জনকে সময় সময় তাঁহার শয্যাভাগিণী করা হইত। তন্মধ্যে যাঁহাদের তাঁহার ঔরষজাত সন্তান ছিল, তিনি তাহাদিগকে সসম্মানে জাহাঁঙ্গীরনগর-ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন; সেখানে তাঁহাদের এত প্রচুর বৃত্তি দান করা হইল যে, তাঁহারা কেবল তথায় নিজেদের মর্যাদানুযায়ী জীবন যাপন করিতে নহে, অপরকে সাহায্য করিতেও সমর্থ হইলেন। সংক্ষেপে ঐ হতভাগ্য শাহজাদার যত লোকজন ছিল, তিনি নিজেকে তাহাদের সকলের রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহারা স্বাধীনভাবে থাকুক কিম্বা তাঁহার অধীনে চাকরী করা পছন্দ করুক, তিনি তাহাদের প্রত্যেককেই সম্মানজনক বেতন দিতেন; যাহাতে তাহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থায় নিরুদ্বেগে ও নিজের ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, তাহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁর সদাশয়তা ছিল অসীম। সুপরিজ্ঞাত ও বিশ্বাসভাজন লোকদের নিকট আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, দেওয়ানী খাতায় যাহাদের নাম তালিকাভুক্ত ছিল ও যাহারা প্রকাশ্যে বৃত্তি পাইত, তাহাদের ছাড়াই তিনি দরিদ্রা, বিধবা ও জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ভরণপোষণে গোপনে মাসিক ৩০,০০০ মুদ্রা ব্যয় করিতেন। এই

সকল লোককে দেয় অর্থ প্রতিমাসে তাঁহার সম্মুখে থলিবদ্ধ করিয়া তাঁহার গৃহস্থালীর বিশ্বস্ত খোজা ও বৃদ্ধা রমনীদের মারফতে তাহাদের নিকট প্রেরিত হইত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি ছিলেন শিলহট ও ইসলামাবাদের ফৌজদারসহ ঢাকা প্রদেশের শাসনকর্তা; কিন্তু তিনি ও তাঁহার নায়েব হোসেন কুলী খাঁ ঢাকায় থাকিতেন না। কাজেই ঐ সকল জনপদের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার ভার হোসেন কুলী খাঁর দেওয়ান রায় গোকুল চাঁদের নিকট হস্তান্তরিত হয়; তিনি একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া নিজের অনেকটা কৃতিত্ব ও সম্মানের সহিত তাঁহার দায়িত্ব পালন করেন। একই সময় আলীবর্দী খাঁর বেগমের ভ্রাতা কাসেম আলী খাঁ রঙপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হন; সেখানে তিনি কৃতিত্ব ও অর্থ দুইই অর্জন করেন।

বাঙ্গালায় যখন এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব সংঘটিত হইতেছিল, সরফুদ্দীন আলী খাঁ ছিলেন তখন পূর্ণিয়ার ফৌজদার, বরং মৌরসী শাসনকর্তা। জাফর খাঁর সময় হইতেই তিনি বাদশাহ্ কর্তৃক এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। হাবভাবে, বিপথে চালিত হইয়া এই আমীর কিছুকাল যাবত আলীবর্দী খাঁকে বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করেন এবং রাজধানী হইতে সৈন্যদল ও সেনাপতিদের সমর্থন লাভের প্রত্যাশায় তিনি প্রচার করেন যে, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে ও বিদ্রোহের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দিতে যাইতেছেন। কিন্তু তিনি ব্যাপার অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছেন ও কেহই তাঁহার ইচ্ছার প্রতি খেয়াল করেন নাই দেখিয়া তিনি স্থির করেন যে, এরূপ জনরবে ও এরূপ অভিপ্রায়ে তাঁহার কোন মঙ্গল হয় নাই। সুতরাং তাঁহার আচরণ উত্তম বলিয়া প্রতীয়মান করার জন্য তিনি পাগলামীর ভাণ করিলেন। কিন্তু আলীবর্দী খাঁ দরবারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক, বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতা আমীর খাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া তাঁহার আচরণে রুষ্ট হওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই।

আমরা জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁকে আজিমাবাদের সরকারের অধিকারে রাখিয়া আসিয়াছি। এই নূতন শাসনকর্তা ছিলেন একজন সুযোগ্য যুবক এবং তিনি যে সম্মান ও উচ্চপদ ভোগ করিতেন, সর্বদিক দিয়া তাহার উপযুক্ত। আমার জনক সায়্যিদ হেদায়েত আলী খাঁ এই কয় বৎসর তাঁহার সরকারের কয়েকটি জিলায় শাসন করেন; তাঁহার বিপুল প্রশংসা শ্রবণ

করিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাকে সর্বপ্রকার ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শনের পর তিনি তাঁহাকে প্রদেশের বখশীর পদ দানের প্রস্তাব করেন। তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্ আপনার এই ভ্রাতার (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং) উপর এই দেশ ও ক্ষমতা ন্যস্ত করায় সৈন্যদলকে নিয়মানুবর্তী করিতে ও এই দেশের ব্যবস্থা একত্রে নিয়মিত করিতে আমাদের সমবেত চেষ্টা প্রয়োগ করা কর্তব্য; এভাবে আমাদের ব্যবস্থা করা দরকার যে, যেন আমরা আমাদের বিদ্বেষীদের প্রতি ঈর্ষার বস্তু এবং আমাদের বন্ধু ও মুরুব্বীদের নিকট প্রশংসা ও উল্লাসের বস্তু হইতে পারি।" স্নেহ ও উৎসাহ উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে এগুলির সঙ্গে তিনি আরও অনেক দয়ার কথা বলিলেন। তিনি আমার পিতাকে সম্মান ও অনুগ্রহ ভারাক্রান্ত করিয়া তাঁহার কথা অনুযায়ী কার্য করিলেন। ফলে তাঁহাদের মিলন প্রত্যহ ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল। সেই যুবক রাজপুত্র যেখানে সদ্ গুণ পাওয়া যাইতে পারে, সেখানেই উহার খোঁজ করিতেন। তিনি তাঁহার চাচা আলীবর্দী খাঁর নিকটেও একজন যোগ্য মন্ত্রীর জন্য আবেদন করিলেন; ইনি ছিলেন পূর্বে তাঁহারই দেওয়ান; ইহার নাম রায় চিন্তামন দাস। ইহাকে পাইবামাত্র তিনি ইহার উপর সমগ্র প্রদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত করিলেন। এত অল্প বয়স্ক লোকের মধ্যে এত অধিক বিচক্ষণতায় বিস্মিত হওয়ার কথা নহে। বয়সে তরুণ হইলেও তিনি অনেক মূল্যবান গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসী, তাঁহার আচরণ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, নিজ কার্য সম্পাদনে অত্যন্ত নিয়ম-নিষ্ঠ, তাঁহার জীবনযাপন পদ্ধতিতে অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র; তাঁহার আদেশ দৃঢ়, অথচ ভদ্র এবং এত চিত্তাকর্ষক ব্যবহারকারী যে প্রত্যেকেরই ভালবাসা ও স্নেহলাভের উপযোগী বলিয়া মনে হইত। তাঁহার চাচা যখন বাঙ্গালা অভিযানে আজিমাবাদ ত্যাগ করেন, তখন সেই প্রদেশের কতিপয় জমিদার স্নেহের বশে তাঁহার অনুগমন করেন; যথা, মোগ-জিলার ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা সুন্দর সিং ও তিরহুত জিলার দুইজন জমিদার; উহারা ছিলেন মূলতঃ বেতী গোত্রের লোক, কিন্তু হালে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। অভিযানে নিজেদের অংশ সমাধা করিয়া ইহাদের সকলেই এখন অনুগ্রহ ও মনিমুক্তা, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি

মূল্যবান উপহারে ভারাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র শাসনকর্তার চাকরীতে গৃহীত এবং তাঁহার খুল্লতাতের প্রতি তাঁহাদের সেবার অনুপাতে তাঁহার অনুগ্রহ ও মনোযোগের পাত্রে পরিণত হন। প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞতা ও অসীম ভদ্রতা ঐ পরিবারে বংশানুক্রমিক গুণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। চাচা-ভাতিজা দুই জনেই অকস্মাৎ ক্ষমতা ও সম্মানের তুঙ্গ শিখরে উন্নীত হইলেও তাঁহারা এই শেষোক্ত গুণ ও দানশীলতার এত অধিক মাত্রার অধিকারী ছিলেন যে, তাঁহাদের সম-সাময়িক কোন আমীর ও মধ্যবিধ রাজাকে তাঁহাদের সহিত তুলনা করা চলে না। প্রত্যেকের খেদমত সম্পূর্ণ করণ ও প্রত্যেকের সদ্‌গুণের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ছিল তাঁহাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমার সমসাময়িক কোন ব্যক্তি বা আমার শ্রুতির মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে পূর্ব কালের এমন কোন লোক তাঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া আমি দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। এই যুবক শাসনকর্তাই বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার মাতা ও এই গরীবের মাতা ছিলেন একই মাতুলের কন্যা এবং আমার মাতা সাময়িক স্নেহের আবেগে প্রায়ই তাঁহাকে তাঁহার দুগ্ধ পান করাইতেন; সেই অনুগ্রহের স্মৃতি প্রদর্শন তাঁহার লক্ষ্যে পরিণত হয়; এজন্য তিনি এই গরীবের প্রতি এত অধিক শ্রদ্ধা ও মনোযোগ প্রদর্শন করিতেন যে, স্নেহবান প্রকৃত ভ্রাতার নিকটও কদাচিৎ তাহা প্রত্যাশা করা যাইত। এত অধিক আড়ম্বর ও ক্ষমতার মধ্যে তিনি মেহেরবানী করিয়া এত অধিক মাত্রায় ইহা স্মরণ করিতেন যে, এই দরিদ্রের সমগ্র পরিবারকে দরবারের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেন অর্থাৎ এই দরিদ্র কৃষকের ভার হ্রাস করিতেন, মনোযোগের সহিত ন্যায়বিচার করিতেন ও প্রত্যেককে তাহার মর্যাদা অনুযায়ী বাধিত করিতেন। আমার পিতা, তাঁহার দুই ভ্রাতা, এই অযোগ্য গরীব ও আমাদের সমস্ত আত্মীয় তাঁহার মনোযোগ ও ক্ষমতার ভাগী হন; প্রকৃতি আলীবর্দী খাঁ এবং তাঁহার তিন জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের যে সকল প্রশংসনীয় গুণ প্রদান করে, যদি ঐতিহাসিক হিসাবে আমাদিগকে বা অপর যে কোন ব্যক্তিকে তাহা বর্ণনা করিতে বা তাঁহারা যে প্রশংসার এত অধিক উপযুক্ত, তাহার আভাস দিতে যাই, তবে

আমাদের বর্ণনা স্ফীত হইয়া একটি গ্রন্থের আকার ধারণ করিত এবং আমাদের অকপটতা এত সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সন্দেহের উদ্রেক করিবে অথবা স্বার্থপর অভিসন্ধির প্রতি আরোপিত হইবে। কাজেই আমরা পাঠককে অনুগ্রহ পূর্বক তাহাদের শাসনকার্যের প্রধান ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের বিবরণের প্রতি মনোযোগ দিয়া তাঁহার নিজস্ব মনোভাব স্থির করিতে রাখিয়া যাইব।

আমরা উড়িষ্যাজয়ী আলীবর্দী খাঁকে একজন অনভিজ্ঞ যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রকে একটি শাসন-পরিষদ গঠন করিয়া দিয়া বিজিত জনপদে রাখিয়া তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনে উৎসুক অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয়, যুবক শাসনকর্তা কৃতজ্ঞতা ও মিতব্যয়িতা উপদেশে কর্ণপাত করিলেন। তিনি সৈন্যদের বেতন হ্রাস এবং যে সকল লোককে তাঁহার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও তাঁহার সরকারের মঙ্গলের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তাঁহার নিকটে রাখিয়া আসা হয়, তাহাদের বেতন ও সুবিধা ও সঙ্কোচ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যে সকল লোক তাহাদের ভাগ্যের উন্নতি সাধনের আশায় তাঁহাদের বন্ধুবর্গ ও গৃহত্যাগ করিয়া আসেন এবং পরিবারের পুরাতন ভৃত্য বলিয়া নিজেদের অধিকতর বিবেচনার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, এরূপ কৃপণতার পরিকল্পনা তাঁহাদের প্রীতি, এমন কি মৌন সম্মতিও লাভ করিতে পারিল না। পক্ষান্তরে নব-বিজিত প্রদেশের যে সকল লোক তাঁহাদের স্থলে তাহাদের খেদমত দিতে চাইল, তাহারা বাড়ীতে থাকার যাবতীয় সুবিধার সহিত সরকার হইতে বেতন লাভের পরিকল্পনায় তৃপ্ত না হইয়া পারিল না। কাজেই যুবক শাসনকর্তার খুল্লতাতের সহিত যে সকল কর্মচারী ও সৈন্য সেখানে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি একে একে চাকরী ত্যাগ করে এবং তাঁহাদের স্থান ক্রমাগত প্রদেশবাসী লোকদের দ্বারা পূর্ণ হইতে দেখে, অতঃপর তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। এই রাজনৈতিক ভুলের সহিত আর একটি তুল্য ক্ষতিকর ভুল সংযুক্ত হয়। একদল কর্মচারী ও সেনাপতি বিতাড়িত শাসনকর্তার সঙ্গে থাকিয়া ঐশ্বর্যশালী হন; তাহাদিগকে কটকনগরে থাকিতে দেওয়া হয়। তাঁহারা সেখানে শান্তভাবে বাস করিতে থাকেন, কিন্তু গোপনে তাঁহাদের পুরাতন মনিবের বিশেষতঃ

তদীয় জামাতা মির্জা বাকেরের প্রতি আনুরক্তি পোষণ করিতেন। অন্যান্য ব্যাপারেও যুবক রাজপুত্রের আচরণ তাঁহাদের অসন্তোষ হ্রাসের উপযোগী ছিল না। ঠিক এই সময় শাহ্ য়্যাহ্য়া নামক জনৈক ফকীর কটকে উপস্থিত হন। এককালে তিনি যুবক শাহজাদার সহিত শাহজাহানাবাদে একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করায় তাঁহার সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা জন্মে। এই লোকটি সমগ্র দাক্ষিণাত্য পর্যটন করিয়া তখন কটকে উপস্থিত হইলেন: সেখানে তিনি অচিরে তাঁহার পূর্ব পরিচিতের প্রিয়পাত্র ও ঘনিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হইলেন। এই ফকীর আদৌ ধার্মিক বা সচ্চরিত্রের লোক ছিলেন না; যুবক শাসনকর্তা তখন যৌবনে অনুগৃহীত এবং ক্ষমতা ও রাজত্বের ধূম্র দ্বারা মাতাল করিয়া তুলিতে পারিত, এরূপ প্রত্যেকটি প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকায় তিনি তাঁহার নুতন প্রিয়পাত্রের অনুপ্রবেশিত সংক্রমণ গ্রহণে সমধিক তৎপর ছিলেন। এই লোকটি অল্পে অল্পে তাঁহার যুবক হৃদয়ে ধনবান লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আবিষ্কারের কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারণা ঢুকাইয়া দিলেন; ভাবখানা এই যেন তাঁহারা বিতাড়িত শাসনকর্তার টাকা বা অর্থ লুক্কায়িত রাখার জন্য অপরাধী। এরূপ অভিযোগ কেবল তাঁহাদিগকে আটক রাখিবার ও তাঁহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করিবার নহে, তাঁহাদের গৃহে সৈন্য পাঠাই-বার এবং দোষ স্বীকার শ্রবণ ও জিজ্ঞাসাবাদ করিবার স্থলে সেখান হইতে রমণীদের ধরিয়া আনিবারও ছুতা যোগাইত। এই কৌশল এতদূর গড়াইল যে, বিদ্বেষ বশে ধনীলোক মাত্রেরই গৃহে জমা টাকা আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া অবধারিত ছিল এবং কোন রমণীর সুন্দর মুখ, মনোরম আকৃতি এমন কি বিশেষভাবে কোমল চর্ম আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেলে তাহার জন্য অপরিহার্যরূপে লোক প্রেরিত হইত। তদুপরি যে কোন স্থানে এরূপ সুন্দরী রমণী আছে বলিয়া শুনা যাইত, ফকীর তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কৌশল জানিত। এইরূপ ও অনুরূপ কলা-কৌশল দ্বারা ফকীর এত গভীরভাবে প্রভুর অনুগ্রহভাজন হইল যে, সকলেই তাহার হুকুম মান্য করিতে লাগিল। তাহার গৃহ তল্লাসী আদালতে পরিণত হইল; সেখানে নিয়মিতভাবে চাবুক মারা ও উৎপীড়নের কাজ চলিত, ফলে মজলুমের ফরিয়াদ আকাশের সীমায় পৌঁছিল। ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে,

বহুসংখ্যক পদস্থ ও বিখ্যাত লোক এক কালে পুরাতন শাসনকর্তার রাজস্বের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় পরে তাঁহাদের নিকট পাওনা বলিয়া কথিত কিছু বাকী টাকা মাফ পান ; এখন তাঁহারা তিরস্কৃত ও হিসাবের বাকী টাকা নূতন সরকারের খাজাঞ্চীখানায় প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এত অধিক অত্যাচারে সকলের ক্রোধের সঞ্চার হইল। সরকার ঘৃণিত, ষড়যন্ত্রগঠিত ও বিজিত রাজধানীর নাগরিকেরা এত অধিক অত্যাচার হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া একবাক্যে মিলিত হইল। কেহ তাহাদের মধ্যে শুধু এক মাথা এক মুখ, এক মন ও এক বাহু আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিত। এরূপ ঐক্য কঠিন বা এরূপ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব ছিল না। এই সময়ের মধ্যে পুরাতন ভৃত্যদের মধ্যে অত্যল্প কয়েকজন মাত্র নূতন শাসনকর্তার সঙ্গে ছিল। এমন কি গুজুর খাঁর অশ্বারোহীদের সংখ্যাও সর্বশুদ্ধ তিনশতের অধিক হইত না। তাঁহার নূতন ভৃত্যেরা সমস্ত বিভাগ ভর্তি করিয়া ফেলে ; সামান্য সংখ্যক বন্দুকচি ও পদাতিক সিপাহীরাও প্রধানতঃ দেশীয় লোক অর্থাৎ মুর্শিদকুলী খাঁর পুরাতন ভৃত্যদের দ্বারা গঠিত হয় ; সর্বোপরি, কি সৈন্য, কি নাগরিক সকলেই মির্জা বাকেরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে মনে মনে অত্যন্ত ভালবাসিত। যুবক শাসনকর্তা ইতোমধ্যে পূর্ণ এক বৎসর কাল সেই দেশে অতিবাহিত করেন। অথচ কোন আলোড়নের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই ; কাজেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতেন। বিশেষতঃ একারণে ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে মতলব সিদ্ধির উপায় সম্পর্কে একত্রে মন্ত্রণা করা কঠিন হইল না। তন্দ্রার এই শেষ মুহূর্তেই এযাবত এত নির্মল বলিয়া প্রতীয়মান আকাশ অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আমরা যাহা সবিস্তার বর্ণনা করিতে যাইতেছি, সেই অবস্থার সৃষ্টি করে।

দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মির্জা বাকের নৈরাশ্য ও বিশ্রামের নিকট হাল ছাড়িয়া দেন নাই। নিজের তেজস্বী মেজাজের প্ররোচণায় তিনি তাঁহার শ্বশুরকে অবিরাম উত্তেজিত করিতেছিলেন। তাঁহার শাসন কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার, বাঙ্গালা জয় ও সরফরাজ খাঁর হত্যার পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল তাঁহার অন্তরের কামনা ; এ সকল বিষয় লইয়াই তিনি অবিরত নিবিষ্ট থাকিতেন। কিন্তু অধিকতর অভিজ্ঞ ও জমানার প্রতি অধিকতর অবিশ্বাসী

ছিলেন বলিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের ক্ষমতা বা এমন কি স্বীয় প্রতিভাকে এরূপ বিরাট পরিকল্পনার উপযুক্ত মনে করিতেন না। আল্লাহ্-নির্ভরতার লেপের ভিতরে গা মুড়ি দিয়া তিনি ঐ সমুদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী মত নামঞ্জুর করিলেন। এখানে বাধা পাইয়া যুবক ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এত অধিক কৌশল ও উৎসাহের সহিত আত্মনিয়োগ করিলেন যে, ঐ সমুদয় দাক্ষিণাত্য রাজ্যে সর্ব প্রকারের কিছু লোককে নিজ স্বার্থের অনুরক্ত করিতে এমন কি কটকের সহিত তাঁহার নিয়মিত পত্র লেখালেখির ব্যবস্থা করিতেও সমর্থ হইলেন। উড়িষ্যা সীমান্তে কয়েকটি জমিদারী ও সামন্ত রাজ্য ছিল; তিনি সেখানে আসিয়া তদঞ্চলে বসতি স্থাপন করিলেন। তিনি নিজেকে ঐ সকল সীমান্তের সভাসদ, বণিক, মহাজন ও সেনাপতিদের এত চমৎকার রূপে অনুগ্রহভাজন করিবার ব্যবস্থা করিলেন যে, কটকে কি ঘটিত, তিনি প্রত্যহ তাহার সংবাদ পাইতেন। সামরিক বাহিনী ও সমস্ত সরকারী বিভাগ, এমন কি যুবক শাহ্জাদার গৃহস্থালী পর্যন্ত প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা গঠিত দেখিয়া তিনি তাহাদের সহিত নিয়মিত পত্র লেখালেখির ব্যবস্থা করিলেন এবং নূতন সরকার কত অধিক ঘৃণিত এবং পুরাতন সরকার ও তাঁহার নিজের জন্য জনগণ কত বেশী দুঃখ করিত, তাহাদের সাহায্যে অচিরে তাহা জানিতে পারিলেন। এই সমস্ত বিষয় আস্তস্ত তদন্ত করা হইলে এবং প্রতিশ্রুতি ও বিবিধ উত্তেজনা দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে তাহাদের মতে দৃঢ় করা হইলে একদিন তিনি তাহাদের জানাইলেন যে, শুজুর খাঁ ও তাঁহার সৈন্যদের উপর আপতিত হওয়ার কোন পথ বাহির না করিলে কিম্বা তাহাদের ও যাহারা তাহাদের সহিত এক মত নাই—এরূপ অপর কয়েক জনের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া আপনা-দিগকে তাহাদের হাত হইতে মুক্ত করিবার কোন উপায় উত্থাপন না করিলে প্রস্তাবিত কার্য কখনও পূর্ণতা লাভ করিবে না। এই সঙ্কেত অনুমোদিত ও একদিন তাহারা বিদ্রোহী হইল। জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া সর্বত্র লোক জমায়েত হইল; গোলমাল বৃদ্ধি পাইলে নূতন শাসনকর্তা তাঁহার জড়তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া বিষয়টা সম্পর্কে তদন্ত করিবার এবং সম্ভবপর হইলে মিষ্ট কথায় হাঙ্গামা শান্ত করিবার আদেশ দিয়া শুজুর খাঁকে প্রেরণ

করিলেন। কিন্তু গোলমাল তখন চরমে পৌঁছিয়াছিল; প্রত্যেকটি রাস্তায় চীৎকার শ্রুত হইল; প্রত্যেকটি স্থানে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠায় বিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দিল। এরূপ অন্যায়ের প্রতিকার চিন্তা করার পক্ষে তখন অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সার্বজনীন বিরক্তিসহ জুলুমের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক ঘৃণা সর্ব শ্রেণীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; সকলেই তাহাদের পুরাতন মনীবদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে ও মির্জা বাকেরকে ফিরিয়া পাইতে চাহিল। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে শাহ্ মুরাদের ন্যায় আর কেহই এত প্রাধান্য লাভ করে নাই; ঠিক সময়ে যিনি মুর্শিদ কুলী খাঁর পরিবার রক্ষা করেন, ইনি সেই ব্যক্তি, তিনি এত ধীর মস্তিকের সহিত সমগ্র দেশে কাজ করেন যে, সরফরাজ খাঁর সামান্য অশ্বপাল হইতে এখন ঐ প্রদেশের একজন সর্বাপেক্ষা গণ্যমাণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন এবং শক্তিশালী একটি বিরোধীদলের নেতৃত্ব করিতেন। আল্লাহ্ স্বয়ং বিপ্লবের আনুকুল্য করিতেছেন বলিয়া বোধ হইল; ইহা মাত্র একদিনের জন্য স্থগিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল। পরদিন প্রাতঃকালে গুজুর খাঁ যখন তাঁহার সাধারণ অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে শাসনকর্তার প্রাসাদে গমন করিতেছিলেন, তখন বিদ্রোহীরা তাঁহার উপর আপতিত হইয়া একটা রাস্তার মধ্যভাগে তাঁহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল। মুহূর্তমধ্যে বিদ্রোহীরা শহরের আশপাশে জনরব ছড়াইয়া দিল যে, মির্জা বাকের নগরে আসিয়াছেন। ঐ যুবক আমীর নিয়ত সচল থাকিতেন, এমনকি সম্ভবতঃ প্রদেশের ভিতরেই ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বিদ্রোহ সার্বজনীন হইয়া পড়িলে তাঁহার নিকট একজন উপযুক্ত লোক প্রেরিত হইল; অচিরে তিনি শহরতলিতে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তিনি তাঁহার মিত্রদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, নগরতোরণের চাবিগুলি শত্রুপক্ষের কতিপয় পুরাতন সৈন্যের দখলে রহিয়াছে; কাজেই তাঁহাদিগকে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন তাহারা ভীত হইয়া চাবিগুলি অর্পণ করে, অথবা সম্ভবপর হইলে যেন তাহাদিগকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লয়— তাহা হইলে সায়্যিদ আহমদ খাঁকে ধৃত করার ফন্দি কার্যে পরিণত করার সুবিধা হইবে। এই যুবকের সহচরেরাও ছিল সকলেই ষড়যন্ত্রকারী; তাহারা ও নাগরিকেরা যে অল্প কয়েকজন বন্দুকচি তাঁহার জন্য তোরণ

রক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাইল যে, যদি তাহারা সরাসরি তোরণ খুলিয়া দেয়, তবে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করা হইবে নতুবা যদি তাহারা মির্জা বাকের তাহাদিগকে খুলিতে বাধ্য করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তবে তাহারা যেরূপ ব্যবহার লাভের উপযুক্ত তাহা পাওয়ার ভরসা রাখিতে পারে। হতভাগ্য লোকগুলি তাহাদের ক্ষুদ্র সংখ্যা সম্বন্ধে অবহিত থাকায় এবং যে জনতা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের ভীতি প্রদর্শনে আতঙ্কিত হইয়া তাহাদের যুবক প্রভুর সনির্বন্ধ অনুরোধ ও প্রতিশ্রুতিতে কর্ণপাত না করিয়া তোরণ খুলিয়া দিল; অতঃপর তাহাদের অধিকাংশই বিদ্রোহীদের সহিত মিশিয়া গেল। মির্জা বাকের নিকটেই ছিলেন এবং তিনি ছিলেন তাঁহার গতিতে অত্যন্ত কর্মঠ। তিনি তৎক্ষণাৎ শহরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রাসাদে গমন করিয়া সায়িদ আহমদ খাঁকে ধৃত ও বন্দী করিলেন। অতঃপর তিনি শেষোক্ত ব্যক্তির মসনদে উপবেশন করিয়া নগরের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের সম্মান গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার বন্দীকে নিবিড়ভাবে তদীয় কক্ষে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার ধনসম্পদ ও আসবাবপত্রের দখল লইলেন। অনুরূপভাবে তিনি বন্দীর পত্নী, পুত্রকন্যা ও পরিবারকে বড়বটি দুর্গে বন্দীখানায় পাঠাইলেন। বিপ্লবের কিছুকাল পূর্বে নূতন সৈন্যদের মুখভাবের পরিবর্তন ও মির্জা বাকেরের নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লওয়া হয়। এ সমুদয় ও গুজুর খাঁর মৃত্যুর খবর আলীবর্দী খাঁর নিকট প্রেরিত হয়। প্রথম সংবাদ পাইবামাত্রই তিনি নগর ত্যাগ করিয়া শহরতলিতে শিবির স্থাপন করেন। সেখান হইতে তিনি হাতের কাছে যে সকল সৈন্য পান তাহাদিগকে লইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্যার্থ দ্রুতপদে যাত্রা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার বন্দী হওয়ার জনরব প্রচারিত হইল। গুপ্তচরদের মারফতে এই সংবাদ পাকা হইলে তিনি তাঁহার যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল; দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজামুল মুল্‌কের গোপন সাহায্য ব্যতিরেকে কিরূপে এরূপ শক্তিশালী বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না; তিনি সম্ভবতঃ এখনও এই ব্যাপারের তলে থাকিতে পারেন। এরূপ হস্তক্ষেপ ব্যাপারটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

করিয়া তোলে; কাজেই তাহা সাবধানে তলাইয়া দেখার ও যাহাতে কোন অনিষ্ট না ঘটে, প্রবল উদ্যমে পূর্বাহ্নে তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখার দরকার ছিল। নিজের মনস্থির করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার রাজমন্ত্রীবর্গ, ও প্রবীণ আত্মীয়দের সহিত আলোচনা করিলেন; শেষোক্তদের মধ্যে যুবক শাসনকর্তার মাতা আলীবর্দীর চক্ষে অত্যন্ত উচ্চস্থান অধিকার করিতেন; তিনি তাঁহাকে নিজের মাতার ন্যায়ই সম্মান করিতেন। যুবকটা ছিলেন তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে প্রিয়তম: তিনি তাঁহার স্নেহ এতদূর গ্রাস করেন যে, মাতা তাঁহার উপর তদীয় হৃদয় সম্পূর্ণ ঢালিয়া দেন। শাহজাদীর স্বামী হাজী আহমদও তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া বিপ্লব সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা দিয়া ইহার পরিণাম অনেক বাড়াইয়া বলেন; পরিশেষে তিনি তাঁহার বাদীর সমগ্র পরিবারসহ তাঁহাকে মুক্তিদানে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মির্জা বাকেরের হস্তে উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব রাখিয়া দেওয়ার জন্য সুবাদারকে অনুরোধ করেন; তাঁহারা উভয়েই যুক্তি দেখাইলেন যে, ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। আলীবর্দী খাঁ কিছুতেই এরূপ মত পোষণ করিতেন না। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, মির্জা বাকেরের নিকট নতি স্বীকার করিলে তাঁহার সম্মানের ক্ষতি হইবে এবং তাঁহার শক্তি ও শাসনকার্যের স্তম্ভ টলিয়া যাইবে; পক্ষান্তরে তাঁহার প্রধান সেনাপতি ও দৃঢ়ভক্ত মুস্তফা খাঁও ছিলেন একই মতাবলম্বী। তিনি তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা করিয়া দৈহিক শক্তিবলে তরবারি হস্তে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। আলীবর্দী খাঁ বিষয়টা মনে মনে ভাবিয়া দেখিবার জন্য কয়েক দিন সময় লইলেন এবং শান্তির চেয়ে যুদ্ধই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী আদেশ জারি করিলেন।

মির্জা বাকের তলে তলে নিজামুল মুল্কের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ থাকায় এবং যুবক শাসনকর্তার মুক্তিসাধন কঠিন কার্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এই অভিযানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়; সৈন্য সংগ্রহ ও সমাবেশ এবং খাদ্য সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করা হয়। যে সকল নূতন সৈন্য চাকরী লাভের আশায় আসিতে পারিত, তাহারা পথিমধ্যেও যোগদান করিতে পারিত বলিয়া তিনি তাঁহার সেনাপতিগণকে তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া হাতের কাছে যে সকল

সৈন্যদল পাওয়া যায়, তাহাদিগকে একত্র করিতে আদেশ দান করিলেন। তদনুযায়ী মুস্তফা খাঁ তাঁহার সৈন্যদলকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহীতে, সমশের খাঁ তিন হাজার, সর্দার খাঁ দুই হাজার, উমর খাঁ তিন হাজার, আতাউল্লাহ্ খাঁ দুই হাজার; হায়দার কুলী খাঁ, ফকীরউল্লাহ্ বেগ খাঁ ও মীর জাফর খাঁ প্রত্যেকে হাজারে, মীর শরফুদ্দীন ও শাহ্ মুহম্মদ মাসুম প্রত্যেকে পাঁচ শতে, নানূলের আমানত খাঁ দেড় হাজারে, মীর কাজেম খাঁ দুই শতে ও ভারী কামানের তদারককারী বাহাদুর আলী খাঁ পাঁচ শতে বর্ধিত করার আদেশ পাইলেন। অপর কয়েকজন হিন্দুকর্মচারীসহ বখ্শী ফতেরাও ও বেহিদুন বেরা বন্দুকচি সংগ্রহে আদিষ্ট হইলেন। এই সকল আয়োজন সম্পন্ন হইলে আলীবর্দী খাঁ তাঁহার ভ্রাতা হাজী আহমদ ও তদীয় বেগমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে গভীরভাবে বিচলিত বলিয়া বোধ হইল এবং বিদায় বেলায় বলিতে শুনা গেল, 'যদি তিনি আদৌ ঐ অভিযান হইতে ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহাদের পুত্রকে সঙ্গে লইয়াই আসিবেন; নতুবা তিনি তাঁহাদিগকে কখনও তাঁহার মুখ দেখাইবেন না।' তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে শাসনকার্য পরিচালনার আদেশ দিয়া ৫০০০ অশ্বারোহী ও ১০০০০ পদাতিক সহ রাজধানীতে রাখিয়া গেলেন এবং নক্ষত্ররাজিতে শুভক্ষণের সন্ধান লইয়া ২০০০০ অশ্বারোহী, প্রাচীন সৈন্যসহ প্রস্থান করিলেন। তাঁহার হালকা ও ভারী কামান টানিয়া লইয়া তিনি ক্রমাগত যাত্রায় আগাইয়া চলিলেন। সীমান্তের নিকট পৌঁছিয়া তিনি প্রচার করিলেন যে, যে কেহ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার শিবিরে লইয়া আসিবেন, তিনি তাঁহাকে লক্ষ টাকা দান করিবেন। ঐ ব্যক্তি কোন সৈন্যদলের সেনাপতি হইলে ঐ টাকা ছাড়াও তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি লোককে দুই মাসের বেতন পুরস্কার দিবেন। এইরূপ বিপুল আয়োজন দীর্ঘকাল যাবত মির্জা বাকেরের নিকট গোপন থাকিতে পারিল না। শত্রুর উচ্চতর শক্তিতে তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস পাইল বলিয়া বোধ হয়। কিরূপে ইহার ব্যবস্থা করিবেন, তিনি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সে যাহা হউক, তিনি যখন সম্পূর্ণরূপে এই অসম সাহসিক কার্যে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ইহাতে বাধা দান করাই স্থির করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে কিছু সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিলেন তাহাদিগকে লইয়া কটক নগর হইতে বাহির হইয়া কিছু দূরে মহানন্দা নদীর অদূরে একটা স্থান নির্বাচিত করিয়া নদীর দিকে পিঠ দিয়া সেখানে নিজেকে গড়বন্দী করিলেন। তাঁহার সম্মুখভাগে তাঁহার পদাতিক সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ক্ষুদ্র ও বৃহত কামান দ্বারা সুরক্ষিত করা হইল। তাঁহার শিবির ও মালপত্র তিনি তাঁহার বন্দীসহ প্রায় ৩/৪ ক্রোশ পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন আদ্যন্ত শ্বেত বস্ত্রাবৃত একটা রথে; কাপড়ের উপরে ছিল সমস্ত রথ ঘিরিয়া শক্ত দড়ির জালির কাজ। বন্দীর সঙ্গে রথের ভিতরে দুইজন তুরাণী মোগল স্থাপিত হয়; কোন শত্রু সৈন্যকে নিকটে দেখিবামাত্র ছোরা হস্তে তাঁহার উপর আপতিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করার জন্য তাহাদের প্রতি আদেশ রহিল। অনুরূপভাবে রথের চতুর্দিকে ৫০০ দক্ষিণা সৈন্য স্থাপিত হইল; শত্রুপক্ষকে নিকটবর্তী হইতে দেখিবামাত্র প্রত্যেকে তাহার বর্শা রথের ভিতর দিয়া ঢুকাইয়া পারিলে তাহাদের মূল বাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার, নতুবা যেভাবে তাহারা সঙ্গত মনে করে, সেভাবে নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করার আদেশ পাইল। আলীবর্দী খাঁ এই সমুদয় বিবরণ অবগত হইয়া কয়েকজন বিজ্ঞ কর্মচারী ও সৈন্যকে পৃথক করিয়া রাখিলেন; তাঁহাদের প্রতি আদেশ হইল যে, যেই মাত্র তাহারা শত্রুব্যূহের মধ্যে চাঞ্চল্য ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিবেন, অমনি তাঁহারা পূর্ণগতিতে ধাবিত হইয়া তাহাদের পশ্চাদ্দেশ ঘুরিয়া শিবিরের যে অংশে সাদা রথ দেখিতে পাইবে, তাহার উপর আপতিত হইবে; ইহার পরে বন্দীকে উদ্ধার করা সহজ হইবে। এটুকু বলিয়া তিনি নিজে মধ্যরাত্রির পরে যাত্রা করিয়া প্রত্যুষে শত্রুপক্ষের পরিখার নিকটে হাজির হইলেন। গড়বন্দী সৈন্যেরাও এই দৃশ্য দর্শনে অবাক; শত্রুদের সংখ্যা ও সামরিকব্যূহ দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহাদের আতঙ্ক এত অধিক ছিল যে, অল্প কয়েকটি কামানের গোলা ও হাউইবাজি তাহাদের মধ্যে প্রেরিত হইতে না হইতেই তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল এবং কেবল আত্মরক্ষাই তাহাদের চিন্তা হইয়া দাঁড়াইল। এই ত্রাসে সাহসী হইয়া শত্রুরা নদী-মধ্যে ছুটিয়া গেল এবং

পশ্চাদ্দিক (ইহা শুধু নদী দ্বারাই রক্ষিত ছিল) পরিখা আক্রমণ করিয়া সজোরে দলে দলে ইহার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। গড়বন্দী সৈন্যেরা এত অধিক সাহস দর্শনে ভগ্ন সাহস হইয়া কেবল পশ্চাদ্বর্তন ও পলায়নের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। মুস্তফা খাঁ ও মীর জাফর খাঁ বন্দী-উদ্ধারে নিযুক্ত হন; ইতঃপূর্বেই তাঁহারা শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগ অভিমুখে অগ্রসর হন: এই সময় তাঁহারা ইপ্সিত স্থান হইতে অর্ধ ঘণ্টার পথ দূরে ছিলেন। কিন্তু এখানে মীর জাফর খাঁর স্ত্রীর ভ্রাতা মুহম্মদ আমীন খাঁ তাহাদের দলত্যাগ করিয়া আসালত খাঁ ও দিলির খাঁ নামক দুইজন কর্মচারী (উভয়েই উমর খাঁর পুত্র) ও দশজন লোকসহ তাহাদের দলত্যাগ করিয়া অন্যান্যের কয়েক শত পদ অগ্রে অগ্রসর হইলেন; তিনিই সর্বপ্রথম সাদা রথের খোঁজে বলপূর্বক শত্রুশিবিরে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে একজন যুবকের সাক্ষাৎ পান; এই লোকটা ছিল বন্দীর চাকরীতে নিযুক্ত এক ব্যক্তির পুত্র এবং সে-ই তাঁহাকে সাদা রথ খানা দেখাইয়া দেয়। এই সাহসী সৈনিক সটান সেই অংশের দিকে ফিরিলেন। ৫০০ মারাঠা অশ্বারোহী ইহা লক্ষ্য করা মাত্রই রথের নিকটে আসিয়া প্রত্যেকে উহার ভিতর দিয়া তাহার বর্শা ঢুকাইয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার পিঠে কোড়া মারিয়া সর্বশক্তি সহকারে পলাইয়া গেল। যে দুই জন মোগল বন্দীকে হত্যা করিতে আদিষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে বসিয়াছিল, রথের ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট এই সমুদয় অজস্র বর্শা দ্বারা তাহাদের একজনকে নিহত ও আর একজনকে আহত করা ভিন্ন আর কোনই ফল হইল না। আহত লোকটি পুনঃ পুঃ আঘাতের শেষ নাই দেখিয়া এবং রথের ভিতর দিয়া অসংখ্য বর্শা প্রবেশ করান হইতেছে দেখিতে পাইয়া সে পুরাপুরি লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল এবং তাহার সঙ্গীর মৃতদেহ দ্বারা নিজের শরীর ঢাকিয়া ফেলিল। যে সকল সৌভাগ্যের কোন কারণ প্রদর্শন চলে না, তাহার একটির বলে বন্দী নিজেও যত দুর পারা যায়, নিচু হইয়া গুড়ি মারিয়া বসিলেন; ফলে তিনি আদৌ কোন আঘাত পাইলেন না। এই সন্ধিক্ষণে ঐ বার জন বীর পুরুষ সেখানে উপস্থিত হইয়া জালির কাজ কাটিয়া পর্দা তুলিয়া ফেলিলেন। বন্দী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে চিনিতে পাইয়া তাঁহাদের সময়োচিত হস্তক্ষেপের জন্য তাঁহা-

দিগকে ধন্যবাদ তাঁহাদের অজস্র তারিফ করিলেন। মুহম্মদ আমীন খাঁ সময়কে মূল্যবান মনে করিয়া তাঁহার ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং বন্দীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহাতে আরোহণের আদেশ করিলেন। তাঁহারা যখন পিঠ ফিরাইয়া কয়েকটা বাক্য বিনিময় করিতেছিলেন, আহত মোগলটি তখন বিপরীত দিকের দ্বার দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িয়া ক্ষিপ্রগতিতে অশ্বপৃষ্ঠে লাফাইয়া উঠিয়া বিদ্যুৎবেগে পলাইয়া গিয়া অচিরে মারাঠাদের সহিত যোগদান করিল; লোকটির সতর্কতায় ঐ বার ব্যক্তি বিস্মিত ও হতভম্ব হইয়া রহিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া গেলে হাসির রোল পড়িয়া গেল: লোকটির উপস্থিত বুদ্ধিতে এমন কি তাহাদের মনে প্রশংসার ভাবেরও উদ্রেক হইল। যাহা হউক, আর একটা ঘোড়ার অভাব থাকায় দিলির খাঁ ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া বন্দীকে তাহাতে চড়াইয়া দিলেন। এই সময় বন্দবাহিনী দৃষ্ট হওয়ায় মীর জাফর সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিল; মুহম্মদ আমীন খাঁ ও তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার জ্ঞাতির মুক্তিতে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া রথের ধারে লইয়া আসিলেন। ঐ সেনাপতি বাদীকে দেখিতে পাইবামাত্র ভূমিতে অবতরণ করিলেন এবং বন্দীকে হাতিতে চড়াইয়া তাঁহার দেহরক্ষীর জন্য স্বয়ং তাঁহার পশ্চাতে বসিলেন। এইরূপে আল্লাহ্‌র এক অসাধারণ বিধানে যে যুবক দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত্যুর জন্য উৎসর্গিত হইয়া শুধু মারাত্মক আঘাতের অপেক্ষায় ছিলেন, পর মুহূর্তে তিনি হস্তী পৃষ্ঠে উপবিষ্ট, আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের সহিত বাহিত, ভয় ও বিস্ময়ের সহিত নিরীক্ষিত ও মানবজাতির অনেক প্রভুরূপে গৃহীত হইলেন। লোকে এরূপ বিচিত্র মুক্তির কথা শ্রবণ করিয়া শুধু একটিবার মাত্র তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে জমা হইতে লাগিল। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইবা মাত্র তাহারা সম্মানের নিদর্শন হিসাবে ভূমিতে মস্তক নত করিতে এবং তাহাদের বিস্ময় ও অনুরক্তি জ্ঞাপনের জন্য বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করিতে লাগিল। "হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্—পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের মালিক! তোমার কার্যপদ্ধতি প্রশংসনীয়! তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর ও যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা, তাহা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দাও ও যাহাকে ইচ্ছা বেইজ্জত কর; সমস্ত মঙ্গল তোমারই

হাতে, নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান।[১০] তাঁহার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র নিরাপদে আছেন এই সংবাদ লইয়া মুহূর্তে আলীবর্দী খাঁর নিকট কয়েকজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। কয়েক মুহূর্ত পরেই যুবক স্বয়ং দেখা দেন এবং মাটিতে নামিয়া তাহার মাতামহ ও খুল্লতাতের উদ্দেশে বিনীত কুর্নিশ করেন। তিনি আরও নিকটে আসিলে সুবাদার তাঁহাকে তাঁহার বক্ষে টানিয়া লন এবং স্নেহভরে, কিন্তু নীরবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন এবং কয়েক মিনিট পর্যন্ত যুবককে তাঁহার বক্ষে জড়াইয়া রাখিয়া তাঁহার বাসনা কান্নায় কান্নায় পূর্ণ করেন। অতঃপর আহ্লাদে আটখানা হইয়া তিনি ঠিক সেখানেই তাঁহার তাঁবু খাটাইবার ও সামরিক বাদ্য বাজাইবার আদেশ দান করিলেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করাইবার জন্য যুবক শাহ্‌জাদাকে হাম্মামে পাঠাইলেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিবা মাত্র তিনি তাঁহাকে একটা শাহী খেলাত পরাইয়া এবং সরপেঁচ জিকা-কলপ ও বড় মুক্তার একটা মালা পরাইয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া হুকুমত ও রাজত্বের মসনদে নিয়া তাহাতে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার দরবার ও সৈন্যদলের প্রধান ব্যক্তিদিগকে তাঁহাকে নজর দান ও বশ্যতা স্বীকার করার আদেশ দান করিলেন। এই অনুষ্ঠানের ফলে বিপুল অর্থ আমদানী হইল। তাহার সমস্তই তিনি কতিপয় অভাবী লোকের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন; তাহাদিগকে ইহা একটা সুলক্ষণের দান বলিয়া গণ্য করিতে অনুরোধ করা হইল। তাঁহারা প্রস্থান করিলে কিছু জায়গা করিয়া উপস্থিত লোকদের জন্য গালিচা পাতা হইল; সকলে মিলিয়া এরূপ অসাধারণ উদ্ধারের জন্য শুকরিয়া নামাজ আদায় করিলেন। বড়বটি হইতে শাহজাদার পত্নী, পুত্রকন্যা ও পরিবার আনয়নের জন্য একটি শক্তিশালী প্রহরী-দলের অধীনে তৎক্ষণাৎ কয়েকখানা গাড়ী প্রেরিত হইল। কিন্তু ইহা কার্যে পরিণত করিতে অনেক অসুবিধা পোহাইতে হইল। মির্জা বাকের ঐ দুর্গে যে রক্ষী সৈন্যদল রাখিয়া যান, তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইল। বন্দীদের সহিত দুর্ব্যবহার, এমনকি তাহাদিগকে অপমানিত করায় যাহারা বিজেতাদের নিকট হইতে অনুরূপ প্রতিদানের আশঙ্কা করে, তাহারা তাহাদের দরজাগুলি বন্ধ-করিয়া রাখার পক্ষপাতী ছিল; পক্ষান্তরে যাহারা

তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করে, উভয় বিবেচনায় পুরস্কারে লাভের প্রত্যাশায় তাহারা দ্বার খুলিয়া দিতে চাহিল। পরিণামে এই দলই প্রবল হওয়ায় দ্বার খুলিয়া বন্দীদিগকে প্রহরীদের হস্তে অর্পণ করা হইল। ইহারা ছিলেন যুবক শাহজাদার পত্নী, তদীয় পরিবার ও আশ্রিত লোকজন। পর্দা-ঘেরা গাড়ীতে তুলিয়া ইহাদের বিজেতাদের শিবিরে আনয়ন করা হইল। সেখানে তাঁহাদের ব্যবহারার্থ এক সারি একত্র করার উপযোগী তাঁবু স্থাপিত হয়। যে সকল বিদগ্ধপ্রাণ এতদিন অনুপস্থিতির নিরানন্দ মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়ায় ও বিচ্ছেদের বিজন প্রদেশে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তাঁহারা এখন বন্ধুত্বপূর্ণতার ঠাণ্ডা শরবতের লম্বা ঢোক গিলিয়া তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিল। কয়েক দিন পরে সুবাদার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হস্তী আর যুদ্ধের সাজসজ্জা, জীন, ঝালর, ঘোড়ার সাজ—একটি পূর্ণ তোষাখানা বিভিন্ন প্রকারের এক প্রস্থ-বস্ত্র ও অন্যান্য বহুসংখ্যক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকর দ্রব্য প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের তাঁহার অভাব ছিল ও তাঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ লোকের দরকার ছিল, তাহা উপহার দান করিলেন। তিনি যখন তাঁহাকে যথাযোগ্য সজ্জিত দেখিলেন তখন মুর্শিদাবাদে তাঁহার শুভ সফর কামনা করিয়া তাঁহাকে সুখ্যাতির সহিত বিদায় দিলেন। সেখানে তাঁহার মাতাপিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁহাদের হৃদয় আনন্দের বন্যায় প্লাবিত করা, সর্বোপরি শোকমগ্ন জননীকে বিচ্ছেদ যাতনা ও গভীর-ভাবে অনুভূত শোক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করার দরকার ছিল। তাঁহার বন্দী দশা হইতেই তিনি দিনের আলো হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজেকে কবরস্থ বলিয়া গণ্য করিতেন। হতভাগিনী শাহজাদী তখনও জানিতেন না যে, তাঁহার কষ্টের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আল্লাহ্ তাঁহার নিজস্ব উপায়ে তাঁহার দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত উপস্থিতির বর্তিকায় তৃপ্তি ও আনন্দের মোমবাতি জ্বালাইবার ও তাঁহার উপস্থিতির কিরণ তদীয় অস্তিত্ব-বেষ্টনকারী নৈশ অন্ধকার উদ্ভাসিত করিবার সুযোগ সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন। তিনি বিদায় হওয়া মাত্রই সৈন্যদলের একাংশ ও সুবাদারের বোঝাপত্র তাঁহার অনুসরণ করিল। ৫০০০ অশ্বারোহী ও উৎকৃষ্ট কর্মচরিগণসহ তিনি কিছুকাল সেখানে অবস্থান করা সঙ্গত মনে করিলেন। দেশ সম্পূর্ণ শান্ত হইয়াছে এবং ইহার রাজস্ব

ও রাজ্যের আয় স্বাভাবিক অবস্থায় আনীত হইয়াছে দেখিয়া যাওয়া ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র তিনি দেশের নিজামৎ মুখলিস আলী খাঁ নামক একজন বিখ্যাত কর্মচারীর উপর অর্পণ করিয়া তাঁহাকে যুবক রাজপুত্রের নায়েব নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে একদল সৈন্য দিয়া বাঙ্গালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা ভক্তিভাজন আফগান সেনাপতি মুস্তফা খাঁর সুপারিশে নিজের মনোনীত নায়েবকে ফেরত আনিয়া সুবাদারের বন্ধু ও বিখ্যাত সেনাপতি পানিপথের শাহ মুহম্মদ মাসুমকে তাঁহার পদ দান করিলেন; সাহস ও আচরণ উভয়ের জন্যই ইনি অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। নূতন নায়েব নাজিম সুবাদারের উপদেশ ও তাঁহার অভিষেকের খেলাত লাভের জন্য কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিলেন। এই মতলব হাসিল হওয়া মাত্র তাঁহার জরুরতের জন্য পর্যাপ্ত বিবেচিত হয়, এরূপ একদল প্রবীণ সৈন্য লইয়া কটকে ফিরিয়া গেলেন। এই সেনাপতিকে সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত বিদায় দানের পর সুবাদার প্রত্যহ তাঁহার দূরত্ব হ্রাস করিয়া ক্রমাগত তাঁহার সফর চালাইয়া গেলেন। তাঁহার বেগম এবং দৌহিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জা মুহম্মদ ওরফে সিরাজুদ্দৌলা ছিলেন তাঁহার সঙ্গে। তিনি মৃগয়া, গুলি ছোঁড়া ও শিকারে অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার সফর ঐ অবিশ্রান্ত আমোদ-প্রমোদে পরিণত হইল।

আলীবর্দী খাঁ যখন উড়িষ্যা জয় এবং তাঁহার দৌহিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে বন্দিত্বের বন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে ব্যস্ত, তাঁহার অপর দৌহিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র আজিমাবাদের শাসনকর্তা জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁ তখন শাহাবাদ প্রদেশের ভোজপুরের দুর্দান্ত বিদ্রোহী অধিবাসিদের বিরুদ্ধে একটা অভিযানে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন; সেখানে রাজা গুরুত সিং ও বাবু অবন্ত সিং নামে দুইজন শক্তিশালী জমিদার দীর্ঘকাল ধরিয়া সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ বাড়াবাড়ির অনুষ্ঠান করিতেছিলেন; তাঁহারা যেন স্বাধীন, এরূপ সম্পূর্ণরূপে কাজ করিতে ছিলেন। এত অধিক অপরাধ ও কর্তৃপক্ষের প্রতি অধিক অবজ্ঞার জন্য আদর্শ শাস্তি হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু আমার পিতা বিখ্যাত ও সাহসী হেদায়েৎ আলী খাঁর সেই দেশে বিরাট সম্পত্তি ছিল; এগুলিও তাঁহার উন্নত চরিত্র

দীর্ঘকালের প্রভুত্বের দরুন বরাবর যে কর্তৃত্ব জন্মে, তাহার সহিত যুক্ত হওয়ায় তিনি সেই প্রদেশে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করেন; কাজেই ঐ অভিযানে তিনি একটা প্রধান অংশ গ্রহণে ব্যর্থ হইবেন না বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়। কিন্তু ঠিক সেই সমুদয় সুবিধার কারণেই তিনি যুবক শাসনকর্তার পুরাতন হিন্দু দেওয়ান ও ভৃত্য চিন্তামন দাসের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়ান। তদুপরি সৈন্যদলের প্রধান বখ্‌শী হিসাবে সমগ্র বাহিনীও শাসনকর্তার উপর সেই আমীর যে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাহাতেও তাঁহার অহঙ্কারে ঘা পড়ে। একটি মাত্র লোকের মধ্যে এত বেশী সুবিধা ও এত অধিক যশ সেই হিন্দুর উৎকট প্রাণে সহ্য হইল না। আমার পিতার আদর্শস্থানীয় বিখ্যাত অভিমত ব্যর্থ করিবার ও তাঁহাকে কোন সুব্যবস্থিত অপমানের চাবুকের অধীনে আনয়নের জন্য তিনি তাঁহার প্রভুর মনের উপর তাঁহার প্রবল প্রভাব কাজে লাগাইলেন। মনিবের কান তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, সে দেশের সমস্ত জমিদার সায়্যিদ হেদায়েত আলী খাঁকে এত অধিক সম্মান করেন এবং অনুরূপভাবে তাঁহার মনিবও তাঁহাকে এতটা হিসাবে নেন যে, এই সকল লোক নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সেই আমীরের দিকে তাঁহাদের আশায় চক্ষু ফিরাইবেন এবং বাহ্য লক্ষণ দ্বারা যতদূর জানা যায়, তাঁহাদের সহিত দীর্ঘকালের সম্পর্কের দরুন তিনিও যেই মাত্র তাঁহাদিগকে বিপন্ন দেখিবেন, অমনি তাঁহাদের পক্ষে শক্তিশালী সুপারিশকারী সাজিবেন; এমতাবস্থায় মাননীয় শাসনকর্তা দেখিতে পাইবেন যে, অত্যন্ত ক্লান্তিকর হওয়া সম্ভব এরূপ একটা অভিযানে প্রচুর অর্থ ব্যয় ও অনেকটা দৈহিক পরিশ্রম সহ্য করার পরে তিনি ঐ লোকগুলিকে পুরাপুরি ক্ষমা করিতে ও তাঁহাদের সম্পত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইবেন; তাঁহার সমস্ত পরিশ্রমের বিনিময় তাঁহাদের তরফ হইতে কিছু সুবিধা ও নিষ্ফল বশ্যতা ভিন্ন তাঁহার আর কোনই ফল লাভ হইবে না। যৎসামান্য সুযোগ পাইলেই জমিদারেরা (বশ্যতা) অস্বীকার ও স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে কিরূপ প্রস্তুত, যাহারা ইহা জানে এরূপ কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোকেই অস্বীকার করিবেনা যে, এমনি হইবে তাঁহার অভিযানের পরিণতি। সামান্য ভাগ্যবিপর্যয় ভোগ করিলেই বশ্যতা স্বীকার করা এবং তাঁহাদের মনিবকে তাঁহার প্রাপ্য স্বরূপ সামান্য অর্থ

না দিয়া বরং একজন রক্ষক লাভের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করাই জমিদারদের নির্ধারিত নীতি। তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধির কারণ থাকিলে হেদায়েৎ আলী খাঁর পক্ষে হস্তক্ষেপ যখন নিশ্চিত এবং আপনি যখন তাঁহার সানুনয় প্রার্থনায় বাধাদানে ইচ্ছুক হইবেন না, তখন আপনার নিকট হইতে বহুদূরে তাঁহার বাসস্থান লওয়া সঙ্গত। মিষ্টকথা ব্যবহার করিয়া আপনি সহজেই ইহা সম্পন্ন করিতে পারেন।" এরূপ ইঙ্গিত তরুণ শাসনকর্তার মনের উপর পুরাপুরি ক্রিয়া করিল। ঐ সকল লোককে শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত ও রাজস্ব নিশ্চিত করাইবার জন্য তিনি ইতঃপূর্বে ঐ আমীরকে নরহত ও সেমাই জনপদে প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। তজ্জন্য তিনি যত শীঘ্র সম্ভব, তাঁহাকে সেখানে যাইতে অনুরোধ করিলেন, ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পূর্ণকর্তৃত্ব প্রদত্ত হইল। তিনি আরও বলিলেন, ঐ সকল জিলা ও মুঙ্গজিলা সম্পর্কে তাঁহার চিত্ত সুস্থির নাই; মুঙ্গজিলার শক্তিশালী জমিদার রাজা সুন্দর সিং পাহাড়ের গোড়ায় বিস্তৃত অঞ্চলের মালিক, ঐ গিরিশ্রেণীর অপর পার্শ্বের শক্তিগুলির সহিত তাঁহার সম্পর্ক অধিক। কাজেই জমিদারদের চালাইতে অভ্যস্ত একজন চরিত্রবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে সেখানে রাখা তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ কর্তৃত্ব গ্রহণে গমন করিয়া ঐ অঞ্চলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন, ইহাই তাঁহার অনুরোধ। তাঁহার মন শান্ত করার ইহাই একমাত্র উপায় এবং তাহা হইতে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে শাহাবাদ ও রোটাস অঞ্চলে স্বয়ং অভিযানে বাহির হইতে পারেন। কিন্তু পক্ষান্তরে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার (শাসন-কর্তার) অনেক অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া তিনি ইতোমধ্যে কনিষ্ট ভ্রাতা মেহেদী নেসার খাঁকে জ্যেষ্ঠের সহকারী হিসাবে তাঁহার বখ্শীর পদে কাজ চালাইবার অনুরোধ করিয়া সেগুলি হ্রাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোথা হইতে তীর আসিয়াছে হেদায়েত আলী খাঁ তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলেও মনিব ও প্রভুর এরূপ বক্তৃতা পুরাপুরি আদেশের শামিল বলিয়া তিনি স্মিতহাস্যে সম্মতি জানাইয়া তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া তাঁহার জিম্মায় বরাদ্দকৃত স্থানে গমন করিলেন। ইত্যবসরে শাসনকর্তা একটি উৎকৃষ্ট বাহিনী ও এক সারি কামান লইয়া তাঁহার অভিযানে বহির্গত হইলেন। অনতিকাল মধ্যে তিনি তদঞ্চলের বিদ্রোহী জমিদার-

দিগকে সম্পূর্ণরূপে অপদস্থ করার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহাদের উপর যে ধ্বংস নামিয়া আসে, তাহারা ছিলেন বাস্তবিকই তাহার উপযুক্ত। তাহাদের নিকট হইতে তাঁহারা বলপূর্বক অর্থ আদায় করেন নাই, ঐ জেলায় এমন কোন বণিক বা অধিবাসী ছিল না বলিলেই হয়। লুণ্ঠিত না হইয়া কদাচিৎ কোন পর্যটক তাঁহাদের জমিদারী দিয়া গমন করিতে সাহসী হইত। বাধা দিলে তাহাদের হত্যা করা হইত। সমস্ত মানব জাতির বিরুদ্ধে তাহারা অবিরত যেরূপ অজস্র জোর-জবরদস্তি চালাইত ও যেভাবে নিরন্তর বলপূর্বক অর্থ আদায় করিত, তাহা বর্ণনা করিতে একখানা গ্রন্থের দরকার হইবে। অবশেষে দুইটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও দুইটি দীর্ঘ অবরোধের পরে বিদ্রোহী জমিদারেরা তাঁহাদের দুর্গ হইতে বিতাড়িত, তাঁহাদের কিল্লা ও বাসস্থানগুলি বিধ্বস্ত এবং দেশ তাহাদের আক্রমণ ও অবিশ্রান্ত অত্যাচার হইতে মুক্ত হইল। যুবক শাসনকর্তা, এই সকল বিরক্তিকর জালিমের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন, কৃষকদের মনে শান্তি দান, রাজস্ব ধার্য ও রাজ্যের আয় পুনরুজ্জীবিত করণে মনোযোগী হইলেন।

শাহাবাদের জমিদারদের বিরুদ্ধে আজিমাবাদের তরুণ শাসনকর্তার সফলকাম অভিযান

এই সমুদয় জনপদ এতকাল ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে রোশন খাঁ তেরাহী নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী আফগান শাসনকর্তা কর্তৃক শাসিত হইত। সাহস ও সেনাপতিত্বের জন্য তিনি তাঁহার দেশবাসীদের মধ্যে খ্যাতিলাভ করেন। পার্শ্ববর্তী আজিমাবাদ ও এলাহাবাদ প্রদেশেও তাঁহার খুব সুনাম ছিল। যখনই তিনি তথাকার জমিদারদের দৈহিক শক্তিতে বশীভূত করিতে পারিতেন না, তখনই তিনি এমন ভাব দেখাইতেন, যেন তাহাদের সহিতও একমত ও একতাবদ্ধ আছেন। সর্বদা এই কৌশলে পূর্ণ ওস্তাদ থাকায় সমস্ত জমিদারের সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। নিজের ব্যক্তিগত কারণে শাহাবাদের জমিদারদের উৎসাহদনে এই লোকটির আপত্তি ছিল। নিজেদের বিশাল জমিদারিতে অসীম প্রতিপত্তি ভিন্ন ঐ পার্বত্য দেশের অপর পার্শ্বের স্বাধীন জমিদার ও রাজন্যবর্গের সহিত তাঁহাদের দীর্ঘকালের সম্পর্ক থাকায় তিনি এতদ্ভিন্ন ইহাকে অসঙ্গত, এবং

অসম্ভব না হইলেও বিপজ্জনক মনে করিতেন। তজ্জন্য তিনি যুবক শাসনকর্তার সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয় তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। এই অভিযানে যে সকল আনুষঙ্গিক অসুবিধা দেখা দিবে বা তাহা হইতে অপরিহার্যরূপে উদ্ভূত হইবে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে সম্পুর্ণরূপে ক্ষমা ও তাঁহাদের রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করিলেন। অকস্মাৎ মঞ্জুর করা যায়, অনুরোধটি এ ধরনের ছিল না, বিশেষতঃ ইত্যবসরে তাঁহার ও জমিদারদের মধ্যে অবিশ্রান্ত পত্র ও সংবাদ বিনিময় হইতেছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি এত অধিক প্রগলভতার সহিত ও এমন ভাষায় তাঁহার অনুরোধ রক্ষার জন্য জিদ ধরিলেন যে, বাস্তব ক্ষমতার অধিকারী ও পর্যাপ্ত যোগ্যতা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল বলিয়া স্বভাবতঃ উদ্ধত ও দাম্ভিক কোন যুবক তাহাতে দোষ না ধরিয়া পারিতেন না। তাঁহার আবেদন যত নির্বন্ধাতিশয়যুক্ত, শাসনকর্তার বিরাগও ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অপর কয়েক ব্যক্তি অচিরে তাঁহার মনোভাব টের পাইয়া ব্যাপার বিষাক্ত করিতে যত্নবান হইল। একদিন শাসনকর্তা ও আফগানের মধ্যে কথোপকথন সচরাচর অপেক্ষা অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিল। আর অধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা না করিয়া আফগানটি শাসনকর্তাকে বিবেচনা করিতেন শুধু বয়সের দিক্ দিয়া। তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করিলেন, যাহা অপর ব্যক্তি সহ্য করিতে পারিলেন না বা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মফস্বলে বাস করিতে অভ্যস্ত থাকায় তিনি ঠিক এই অশিষ্ট ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন: "আপনি এখনও শিশু মাত্র এবং দুনিয়া দেখেন নাই; ইহাতে যে সকল রাষ্ট্রবিপ্লব এত সাধারণ, তৎসম্পর্কেও আপনার কোনই ধারণা নাই। দিবারাতের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য আপনার এখনও জানা নাই। আমায় বিশ্বাস করুন, আজ আমার অনুরোধগুলি রাখুন; নতুবা এমন সময় আসিতে পারে, যখন আমার কথা রাখা সঙ্গত ছিল বলিয়া আপনার মনে হইবে"। এত গ্রাম্যতা ও স্বাধীনতার সহিত উচ্চারিত এরূপ কথায় শাসনকর্তা স্তম্ভিত না হইয়া পারিলেন না। তাঁহার স্বাধীনতা পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ায় তিনি ঐ হিংস্র, উদ্ধত লোকটিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ করিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে যিনি সর্বদা সসম্মানে শাসন করিয়া আসিয়াছেন,

এমন একজন কর্মচারীকে তিনি কাজে লাগাইলেন; ইনি কাদিরিয়া ফকীর শাহ্ শুকুরুল্লার পুত্র মীর কুদ্‌রতুল্লাহ্; তাঁহার সহিত তিনি হাসান বেগ নামক আর একজন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোককে যুক্ত করিয়া দিলেন; ইনি ছিলেন পূর্বে মুঙ্গের দুর্গের শাসনকর্তা। শীঘ্রই সুযোগ জুটিয়া গেল। সন্ধ্যা বেলায় আফগানী শাসনকর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যখন কতকটা অস্থিরতার সহিত দর্শনার্থীদের তাঁবুতে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন ঐ লোক দুইটি অকস্মাৎ তাঁহার উপর আপতিত হইয়া মুহূর্তে তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তিনি এত স্থূলকায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, তাঁহার আসন হইতে উঠিতে পারেন নাই, বরং তৎক্ষণাৎ নিক্ষিপ্ত হন; ঐ অবস্থায়ই তিনি একডুবে অন্তহীন পরলোকে নিমগ্ন হন।

প্রতিপত্তিশালী আফগান রোশন খাঁর হত্যাকাণ্ড

এই অভিযানেই শাসনকর্তা সাহস ও সেনাপতিত্বের পরিচয় দানের পর আমার খুল্লতাত মেহ্‌দী নেসার খাঁকে স্মরণ করা সঙ্গত মনে করেন; এই অভিযানে তিনি যথেষ্ট সৈনিকের কার্য করেন এবং এত অধিক মাত্রায় তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, আমার পিতার সম্মতিক্রমে তাঁহাকে সৈন্যদলের বখ্‌শীর উচ্চপদে অভিষিক্ত করা হয়। এক একটি খেলাত, হস্তী, তরবারি, অশ্ব ও অপরাপর উপহার দানের মামুলী অনুষ্ঠানসহ তাঁহাকে ঐ নিয়োগ-দানে তৃপ্ত না হইয়া তিনি পোশাকের মহার্ঘতা ও সৌন্দর্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসিদ্ধ করিতে যত্ন গ্রহণ করেন; তদুপরি তিনি পূর্ণ দরবারে তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুরূপে তাঁহার সঙ্গে বাস করিবার ও তদীয় পরিবারভুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। উপযুক্ত সম্মানের সহিত এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এখন হইতে তাঁহার সঙ্গে এমন সমাদরের সহিত ব্যবহার করা হইত যে, অচিরে তাঁহার সমস্ত বন্ধু হইতে তিনি স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঐ খ্যাতির বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। আমার ঐ সম্মানিত খুল্লতাতের প্রাপ্য প্রশংসা বর্ণনা করিতে গেলে এই গ্রন্থের কলেবর একটি আস্ত অধ্যায় দ্বারা বর্ধিত হইবে; ইত্যবসরে আমরা পারিবারিক পক্ষপাতিত্ব বা অপরাপর স্বার্থপর অভিসন্ধির জন্য নিন্দাভাজন

মেহ্‌দী নেসার খাঁর প্রশংসনীয় চরিত্র

হইতে পারি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক হইলেও তিনি বিনীত ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং কোন খাতির পাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না বলিলেই হয়। কেবল তাঁহার বন্ধুবর্গ নহে, তাঁহার দেশবাসী ও আত্মীয়দের সাহায্য করা তিনি স্বীয় লক্ষ্যে পরিণত করেন; তাহাদের পক্ষে তিনি আপনাকে বরাবরই মনোজ্ঞ ও উৎসাহী বলিয়া প্রমাণিত করেন। অনাহুতভাবে কোন উপকার করিবার তৎপরতা ভিন্ন তাঁহার সদাশয়তা ও বদান্যতার সহিত কোন কিছুরই তুলনা চলিত না। পক্ষান্তরে তাঁহার বীরত্ব ও সামরিক প্রতিভা ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধতা, জনসাধারণের সহিত তাঁহার ব্যবহারের ভদ্রতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতি তাঁহার বিশ্বস্ততা ও বন্ধুদের প্রতি তাঁহার সদাশয়তার সমকক্ষ ছিল না। এতগুলি প্রিয়গুণের সহিত যুক্ত হয় অমায়িক উচ্চারণ ও মার্জিত ভাব-প্রকাশের প্রবাহ; তাহা মনোযোগ আকর্ষণ করিত ও প্রত্যেকটি হৃদয় মুগ্ধ করিত। প্রকাশ্য আচরণে সম্মান সম্পর্কে বিশেষরূপে অভিমানী হইলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ধৈর্যের ন্যায় ক্ষমার জন্যও তুল্য বিখ্যাত ছিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমা তাঁহার উপর চিরস্থায়ী হউক!

আমরা আমার মাননীয় পিতাকে পার্বত্য রাজন্যবর্গের দমনে নিযুক্ত রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি তাঁহার চরিত্র উন্নত ও যশোলাভ করিতে চাহেন বলিয়া রামগড়ের রাজা হন তাঁহার লক্ষ্যবস্তু; এই রাজা ছিলেন পাহাড়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হিন্দুরাজা। তিনি এত প্রতিপত্তিশালী ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার উপর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কোন প্রভুত্ব ছিল না বলিলেই হয়। এই পরিকল্পনায় পালামো জনপদের জমিদার রাজা সুন্দর সিং ও রাজা জয়কৃষ্ণ রায় এবং সেরেস কোতোয়ন্থ্‌ ও শির গাওতির অপর কয়েকজন জমিদার তাঁহার সহিত যোগদান করেন। এরূপ একটা সজ্ঘ দ্বারা সমর্থিত হইয়া আমার পিতা রামগড় দুর্গ অবরোধ ও পরিশেষে উহা অধিকার করেন। অতঃপর তিনি পার্বত্য দেশে আরও কয়েক মঞ্জিল অগ্রসর হন; ইহা শান্ত করার পরে তিনি ঐ অভিযানের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কিছু বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক সংবাদ আনিল যে, রঘুজী ভোঁসলা পণ্ডিত[১১] স্বীয় প্রধানকে

৪০,০০০ অশ্বারোহী লইয়া বাঙ্গলা জয়ে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা পর্বতের ভিতর দিয়া ঐ দেশে যাওয়ার পথে তাঁহার নিকট দিয়া যাইবেন। এই সংবাদ যেরূপ প্রতীয়মান হইল, তাহা ঠিক হুবহু বিহারের শাসনকর্তার নিকট প্রেরিত হইল। তিনি আবার তাহা নিজ পত্রের সহিত আলীবর্দী খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। এই রাজা ঐ সংবাদে বিশ্বাস না করিয়া পত্রের প্রতি বিশেষ ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্বচ্ছন্দচিত্তে থাকিতে ও নিজ কার্যে মনোনিবেশ করিতে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া উত্তর দিলেন। তৎসঙ্গে লিখিলেন, 'মারাঠারা যখনই উপস্থিত হইবে, তখনই তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য গ্রহণ করা হইবে।' সুবাদারের এই উত্তর আমার মরহুম জনকের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তাঁহার বন্ধুদের সহিত আলোচনা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহারা কিছুতেই এরূপ আক্রমণকারীদের পথ রোধ করার কার্যের উপযুক্ত ছিল না বলিয়া তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে পার্বত্য দেশ ত্যাগের উপদেশ দিলেন: তদনুযায়ী তিনি অবতরণ করিয়া ঐ পর্বত শ্রেণীর পাদদেশে শিবির স্থাপন করিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মারাঠারা ইহার ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিল এবং পার্শ্বে ও ময়ূরভঞ্জের দিকে ঘুরিয়া তাহাদের নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ বাঙ্গলায় পৌঁছিবার পূর্বেই মেদিনীপুর অঞ্চলে আপতিত হইল। সুবাদার তখন মৃগয়া, শিকার ও দেশ দর্শনে কালক্ষেপ করিতে করিতে ৫/৬ হাজার সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। সেদিন তিনি মেদিনীপুরের নিকটে একটি মনোরম স্থানে উপনীত হন; এমন সময় তদঞ্চলের জনৈক বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান সরকারী তহসিলদার পরিচিত করাইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন "মারাঠারা সেখান হইতে ২০ ক্রোশ দূরে উপস্থিত। ৪০ হাজার সওয়ার লইয়া ভাস্কর পণ্ডিত দ্রুতবেগে আগাইয়া আসিতেছেন; আগামী দিন সন্ধ্যায় বা পরদিন প্রত্যূষে সম্ভবতঃ তিনি ঠিক সেস্থানে পৌঁছিবেন"। তিনি আরও বলিলেন, "সংবাদটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তিনি স্বয়ং উহা আনয়নের জন্য তাঁহার কার্যস্থল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।" তাঁহার সংখ্যার স্বল্পতায় ভীত না হইয়া, সামান্যতম

সংশয় না দেখাইয়া ও বাহ্যতঃ অধিক বিচলিত না হইয়া সংবাদ-দাতাকে ঠিক এই কথাগুলি দ্বারা তাঁহাকে উত্তর দিতে শোনা গেল ঃ "সেই নাদিরেরা কোথায় এবং আমি তাহাদের শায়েস্তা করিতে না পারি, এমন স্থানই বা কোথায়"? সুবাদারের নির্ভীকতার এই অসাধারণ অবস্থা, যে লোকটা সংবাদ দেন, ঠিক তাঁহারই নিকট হইতে আমি গ্রহণ করি; এবম্বিধ ভয়-বিহ্বলহীন উদাসীনতায় এমনকি তখনও তিনি বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই; তিনি আরও বলিতেন যে, তিনি তাঁহার দৃষ্টিতে ক্ষীনতম উদ্বেগ, কিম্বা মুখের বর্ণ বা চেহারায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; নির্ভীকতার এই দৃষ্টান্ত এত দীর্ঘকাল অতীত হওয়ার পরে এমনকি তখনও তাঁহার বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। এই অভিযানের বিশদ বিবরণ নিম্নলিখিত রূপঃ রঘুজী ভোঁসলা ছিলেন রাজা শাহুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত একজন রাজা ও মারাঠা সাম্রাজ্যে একজন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সেনাপতি: সেখানে তিনি বেরার রাজ্যের দখলকার ছিলেন; ইহার রাজধানী বড়নাগপুর। নিজামুল মুল্‌কের প্ররোচনায় পড়িয়া কিম্বা সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি যাহা জানিতেন, তদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অকস্মাৎ বঙ্গদেশ আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল হয় ইহা জয় করা, নতুবা চৌথ বা রাজস্বের পুরাপুরি এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত চাঁদা ধার্য করা; হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের বহু জনপদে এই ঘৃণিত দাসত্বচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু বাঙলা এতদিন ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। এই মতলবে তিনি তাঁহার নিজের প্রধানমন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিতকে নির্বাচিত করিয়া তাঁহাকে ২৫০০০ সৈন্যের কর্তৃত্ব দান করেন; লুণ্ঠনেচ্ছুদের যোগদানে তাহা চল্লিশ হাজারে ফাঁপিয়া উঠে। ঐ সৈন্যদল পার্বত্য দেশে ও কঠিন গিরি-সঙ্কটের মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে পথ অতিক্রম করে; এই গিরি-সঙ্কটগুলি অজস্র তোরণের

বর্গীর হাঙ্গামা বা মারাঠাদের বাঙলা আক্রমণ

ন্যায় বাঙলায় প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু আমরা ইতঃপূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, সেখানে কেহই তাহাদের গমনে বাধা দানের চিন্তা করে নাই। এই সেনাপতি উড়িষ্যার পর্বতমালার ভিতর দিয়া কোন সুবিধাজনক পথ না পাইয়া তাঁহার বাম দিকে ঘুরিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে আট দিনের পথ দূরে যে

সকল উপত্যকা প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, উহাদের ভিতর দিয়া পথের সন্ধান করেন। আলীবর্দী খাঁ যখন মুবারক মঞ্জিল নামে অভিহিত একটা স্থানের সন্নিকটস্থ সাহোরার প্রায় কাছাকাছি শিবির স্থাপন করেন, তখন এই সংবাদ তাঁহার নিকট আনীত হয়; তাঁহাকে সঠিকরূপে বলা হয় যে, মারাঠারা ইতঃপূর্বেই উপত্যকার ভিতর দিয়া গমন করিয়া বর্ধমানে আপতিত হওয়ার উপক্রম করিয়াছে। এইরূপ অপ্রত্যাশিত আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ অপ্রস্তুত ছিলেন, তদপেক্ষা অধিক থাকা কঠিন। ইতঃপূর্বেই তিনি তাঁহার সৈন্যদলের একাংশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশ দেন; অভিযান সমাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপন হইয়াছে, এই নিশ্চয়তা পাইয়া বিদায়ী সৈন্যদের অধিকাংশ এবং আরও বহু সৈন্য মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করে। ফলে যে মুহূর্তে এই সংবাদ নিরূপিত হয়, তখন দেখা যায় যে, তাঁহার নিকটে তিন বা চারি হাজার অশ্বারোহী ও প্রায় ৫০০০ হাজার বন্দকচীর অধিক সৈন্য ছিল না। জনাকীর্ণতা ও রসদপত্রের প্রাচুর্যের দিক দিয়া বর্ধমান ছিল বাঙলার অধিকাংশ স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ; তিনি তৎক্ষণাৎ সেদিকে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই রাজধানীর দিকে পিঠ ও শত্রুর দিকে মুখ দিয়া শিবির স্থাপন করা। এই ধারণায় পূর্ণ হইয়া তিনি মুবারক মঞ্জিল ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দিনে বর্ধমান নগরের এই দিকে পৌঁছিলেন; সেই সময় মারাঠারা অন্য দিকে পৌঁছিয়া সটান আগুন লাগাইয়া দিল, ইহার বৃহত্তম অংশ তাহাতে পুড়িয়া গেল। এখানে উভয় বাহিনীর মধ্যে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হইল; সন্ধ্যাকালে প্রত্যেক দল স্ব স্ব শিবিরে ফিরিয়া গেল। শত্রুদের মুখমণ্ডলের ভাব ও তাহাদের সেনাপতির সাহস দেখিয়া ভাস্কর বুঝিলেন, তাঁহার সৈন্যদের বীরত্ব এবং তাহাদের মনিবের ব্যক্তিগত আচরণ ও সাহস সম্পর্কে তিনি ভুল সংবাদ পান নাই। সুতরাং তাঁহার ধারণা হইল, প্রত্যেকটি বস্তুকে যুদ্ধের ঝুঁকির অধীন না করিয়া বিনা যুদ্ধে তাঁহার নিকট কিছু আদায় করাই অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে; ঐ চাঁদা দ্বারা নিজের সম্মান রক্ষা করার পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করিলেন। কাজেই তিনি শত্রুকে সংবাদ পাঠাইলেন, "মারাঠারা বহু দূর হইতে আসায় তাহাদের দীর্ঘযাত্রার দরুন শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; কাজেই তিনি তাহাদিগকে

মাত্র দশলক্ষ টাকা দিলেই তাহারা আনন্দের সহিত তাহাদের দেশে ফিরিয়া যাইবে; এই সামান্য টাকায় কোনরূপে তাহাদিগকে তাঁহার অতিথি হিসাবে সৎকার করা চলিবে মাত্র।" এই প্রস্তাবে আদৌ ইপ্সিত ফল ফলিল না। সুবাদার দেখিলেন, ইহাতে তাঁহার সম্মানে ঘা পড়িতেছে, মুস্তফা খাঁও ইহাতে অনুরূপভাবে স্তম্ভিত হইলেন; তিনি ছিলেন বরাবরই যুদ্ধ করা ও হত্যা করার পক্ষে। কারণ, তিনি জানিতেন, সুনাম রক্ষা করার ইহাই একমাত্র উপায় এবং কেবল এতদ্বারাই সাধারণভাবে সৈন্যদের; বিশেষভাবে তাঁহার নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে পারিত। ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সাহস সম্পর্কে অবহিত থাকায় এবং তাঁহার সেনাপতি দ্বারাও প্ররোচিত হওয়ায় সুবাদার অবজ্ঞা ভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং সাহস থাকিলে শত্রুদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। এই উত্তরে উদ্দীপিত হইয়া উভয় পক্ষ কয়েক দিন খণ্ড যুদ্ধ চালাইল। কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র যুদ্ধ আলীবর্দী খাঁর মেজাজ বা স্বার্থের উপযোগী ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহার গোয়ান, চাকার গাড়ী, বৃহৎ তাম্বু ও এরূপ অন্যান্য দ্রব্য ইত্যাদি তাঁহার শিবিরে রাখিয়া যাইতে এবং এভাবে তাঁহার সৈন্যদের ভারমুক্ত করিয়া সবেগে মারাঠা অশ্বারোহীদের উপর আপতিত হইয়া একদিনের মধ্যে কি করা যায়, তাহা পরীক্ষা করিতে স্থির করিলেন। প্রত্যুষে তিনি ঘোষণা করিলেন, শিবিরের অনুচর বা বোঝা বাহকদের কেহই যেন সৈন্যদের যুদ্ধ যাত্রাকালে তাহাদের সহিত মিশিতে সাহস না করে, তাহা হইলে তাহারা কঠিন শাস্তি পাইবে। অতঃপর তিনি গজারোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার নির্দেশ কোনই কাজে আসিল না। সৈন্যেরা যাত্রা করিতে না করিতেই শত্রুর ভয়ে ভীত শিবিরের অনুচরেরা তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। শত্রুরা এই সুযোগই চাহিতেছিল। মুহূর্তে তাহারা চতুর্দিকে হাজির হইয়া সর্বত্র আক্রমণ চালাইল। কিন্তু বঙ্গ-বাহিনী স্বস্থানে অটল থাকায় নিহত ও আহত করার কাজ তৎপরতার সহিত চলিতে লাগিল; উভয় পক্ষই অনেক সাহসিক কার্য সম্পন্ন করিল। এই সজ্মর্ষে ওমর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসাহিব খাঁ পরিবেষ্টিত ও নিহত হইলেন। এই যুবক তাঁহার পারিবারিক সাহসের

মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আলীবর্দী খাঁর সঙ্কল্প

সহিত তাঁহার নিজস্ব বীরত্বপূর্ণ সাহসের সংযোগ সাধন করেন। ইতঃপূর্বেই তিনি একজন বিখ্যাত ও চরিত্রবান কর্মচারী হন; সেই কঠিন দিনে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিতে চাহেন; কিন্তু শত্রুদের নিবিড়তম অংশের ভিতর দিয়া বড় বেশী দূর অগ্রসর হওয়ায় তাঁহার উপযুক্ত কার্য সম্পাদনের পর পুনঃ পুনঃ আঘাতে অবসন্ন হইয়া বাক্শক্তিহীন অবস্থায় ভূপতিত হন। এতদ্সত্ত্বেও সৈন্যদল শত্রুদের বিরুদ্ধে সুবিধা লাভ করিতে থাকে। সুবাদার তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ সসৈন্যে মুস্তফা খাঁ, শমশের খাঁ ও সর্দার খাঁ দ্বারা রক্ষিত বলিয়া মনে করেন; বেলা সন্ধ্যার দিকে ভাটি পড়িতে আরম্ভ করিলে তিনি বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। এরূপ ব্যাবহার তাঁহাদের সাধারণ আচরণ হইতে বড় বেশী বিসদৃশ বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা অবশ্যই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার সন্দেহ হইল যে, যুদ্ধ অদ্ভুত আকার ধারণ করিতে যাইতেছে। কিন্তু ইতঃপূর্বেই তিনি তাঁহার নিজ শিবির হইতে বড় বেশী দূরে আসিয়া পড়েন, মারাঠাদের প্রধান শিবির হইতে আসেন আরও দূরে; ওদিকে রাত্রি আসিতেছিল। কাজেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অনুচরের অভাবে শত্রুশিবির আক্রমণ কিম্বা প্রকৃতপক্ষে নিজের শিবির পুনরুদ্ধারও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। নিজের অক্ষমতা বুঝিতে পারিলেও তিনি হতাশ না হইয়া যেখানে ছিলেন, সেখানেই রহিলেন। কিন্তু দেখা গেল, স্থানটি কঠিন মৃত্তিকা-গঠিত নিকৃষ্ট স্থান; পূর্বের বৃষ্টিতে তাহা আর্দ্র হইয়া রহিয়াছিল; ফলে কাহারও পা কোথাও ঠিক রাখিতে পারিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ৩/৪টী পাল্কী ও একটা ক্ষুদ্র তাঁবু ভিন্ন কাছাকাছি কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। তাবুটি তৎক্ষণাৎ একটা উচ্চতর ভূখণ্ডে খাটান হইল। স্থানটি ছিল বর্ধমান হইতে ৬।৭ ক্রোশ দূরে। সেদিন যাবতীয় ধনরত্ন সহ সমস্ত বোঝাপত্র মারাঠাদের হস্তে ধৃত ও লুণ্ঠিত হইল; যাহারা পিছনে পড়িয়া ছিল, মারাঠারা তাহাদের প্রত্যেককে কতিত বা আহত করিল; কেবল যাহারা কোনরূপে নিকটবর্তী মাঠে লুক্কায়িত হইবার ব্যবস্থা করিতে পারিল, তাহারাই হত্যাকাণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইল। আফগানদের দলত্যাগের পরে যে সকল সৈন্য তাঁহার সঙ্গে রহিল, মারাঠারা প্রত্যেকে

দিকে তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল ও সন্ধ্যার গোধূলি পর্যন্ত তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে থাকিল; তখন উভয় দল যেখানে ছিল, সেখানেই রহিল। সে রাতে সুবাদারের সঙ্গের লোকজন এত গোলমালের মধ্যে ছিল এবং বিপন্নদের চীৎকার এত বিশৃঙ্খল ও যন্ত্রণা-দায়ক ছিল যে এ সমুদয় দৃশ্য কিয়ামতের দিনের আভাস দিতেছে বলিয়া বোধ হইল। মুস্তফা খাঁ, শমশের খাঁ, সর্দার খাঁ ও অন্য যাবতীয় আফগান সেনাপতি সচরাচর অপেক্ষা অধিক দল পাকাইতেছেন বলিয়া বোধ হইল; তাহারা নিজেরা আনত নয়নে পশ্চাদগমন করিলেন এবং এই সমুদয় পুনঃপৌনিক যুদ্ধে নিজেদের বিপদগ্রস্ত করিতে, এমনকি, আদৌ কোন বিপদের ঝুঁকি লইতে অতি অল্পই ইচ্ছা দেখাইলেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাঁহাদের অসন্তুষ্ট হওয়ার কয়েকটি কারণ ছিল এবং স্পষ্টতঃ নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণাসভার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তাঁহাদের অসন্তোষের প্রধান বিষয়গুলি এইঃ যতই সংক্ষিপ্ত হউক না কেন, অভিযান সমাপ্ত হওয়া মাত্রই বিগত ২।৩টি অভিযানের জন্য সংগৃহীত সৈন্যদের বিদায় দেওয়া হয়। এই অন্যায় রীতিতে বহু সেনাপতি সর্বস্বান্ত, প্রত্যেক কর্মচারী নিরুৎসাহিত ও সমগ্র সৈন্যদল অসন্তুষ্ট হয়। উড়িষ্যার শাসনকর্তার বন্ধনমোচনে বিগত যে অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে, তাহাতে মুস্তফা খাঁ নিবেদন করেন যে, "মাননীয় সুবাদার বড় বড় আশা দিয়া একাধিক বার নূতন সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দেন, কিন্তু বিপদকাল অতীত হওয়া মাত্রই এতগুলি উপযুক্ত কর্মচারী ও তাঁহাদের লোকাদের যে ক্ষতি হয়, তাহা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করিয়াই তিনি সহসা তাহাদের বরখাস্ত করেন।" তিনি প্রকাশ্যে আরও বলেন, 'তিনি শুধু নিজের নহে, অন্যান্যের পক্ষেও কথা বলিতেছেন বলিয়া তাঁহার অনুরোধ, এবার যেন কোন চুক্তি-ভঙ্গ বা ওয়াদা খেলাফ না হয়।" এরূপ একটা অভিযানের সূচনায় এরূপ অভিযোগ দুর্লক্ষণযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের অভিযোগের বিষয় আর ঘটিবে না বলিয়া ওয়াদা করিয়া আলীবর্দী খাঁ তাঁহাদের বিরক্তভাব প্রশমন এবং পুনরায় মুস্তফা খাঁ ও অন্যান্যের অনুগ্রহ লাভ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও যখন বিগত কটক অভিযান সমাপ্ত ও যুবক শাসনকর্তা

কতিপয় সেনাপতির পশ্চাতে অবস্থান

বিপদমুক্ত হন, তখন একজনও বাকী না রাখিয়া সমস্ত নব সংগৃহীত সৈন্যকে কার্য হইতে বিদায় দেওয়া হয়। এবম্বিধ কার্যের ফলে সমগ্র বাহিনীর মন ভাঙ্গিয়া যায় এবং মুস্তফা খাঁ ও সমস্ত আফগান অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এরূপ কপটাচরণ ও নির্লজ্জ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুন সুবাদারের চরিত্র নিন্দিত ও তাঁহার সমস্ত সদ্‌গুণের জ্যোতিঃগুলো যে ভীষণরূপে নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কর্তৃত্বশালী ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার কথা বিকৃত করার চেয়ে অধিকতর কুৎসিৎ আর কিছুই নাই এবং রাজার পক্ষে তাঁহার প্রতিজ্ঞায় কোন সত্য ও বিশ্বস্ততা নাই, ইহা প্রকাশ পাইতে দেওয়ার চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক আর কিছুই নাই। কথা ঠিক রাখিলে সর্বদাই তাঁহার আশ্রিতদের, এমন কি সমগ্র মানব জাতির চিত্ত জয় করা যায়, নিজের প্রভুত্ব বলবৎ হয় এবং জগত তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আতঙ্কে অনুপ্রাণিত হয়। ঘৃণিত হইলেও সুবাদারের এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গই আফগানেরা অভিযোগ করিতে বাধ্য হয়। এরূপ একমাত্র দুঃখ ছিল না—আফগান সেনাপতি রোশন খাঁর মৃত্যুতেও তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করে; আজিমাবাদের তরুণ শাসনকর্তা নিতান্ত নগণ্য বেয়াদবীর জন্য তাঁহাকে তাড়িতাড়ি হত্যা করেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সামরিক নেতা এবং শাহাবাদ প্রদেশ ও সমগ্র ভোজপুরের ফৌজদার। এত অন্যায় ও এত অবিমৃষ্যকারী হত্যাকাণ্ডে চাকরীরত সমস্ত আফগানই রুষ্ট হয়। সকলেরই অভিযোগ ছিল যে, ইহা একটি জঘন্য কার্য এবং ইহার কোন সাফাইয়ের দরকার ছিল না। কিন্তু অসন্তোষের এই সমস্ত বিষয় যেন তাহাদের মনে যথেষ্ট ক্রিয়া করে নাই, এভাবে সুবাদার হালে আর একটা যোগ করেন; তাহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হয়, বিশেষতঃ মুস্তফা খাঁর মনে ইহা গভীরভাবে দাগ কাটে। ইহা এই: বিগত উড়িষ্যা অভিযানে সৈন্যদল ময়ুরভঞ্জের রাজার রাজ্যের ভিতর দিয়া গমন কালে তিনি তাহাদিগকে বেজায় উত্যক্ত করেন: তিনি মির্জা বাকেরের নিকট ব্যক্তিগত বশ্যতার হলফনামা এবং এই বিশেষ সঙ্কটকালে ইহার প্রমাণ দানে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হন বলিয়া বোধ হয়। লোকে বলে, তিনি এমন কি কয়েকটা বাড়াবাড়ির জন্যও দোষী ছিলেন। এরূপ চিহ্নিত কার্যের জন্য তিনি সুবাদারের বিরাগভাজন না হইয়া পারেন নাই; তিনি নিজের তরফে

অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। রাজা এখন নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া মুস্তফা খাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন; তিনিও তাঁহার জন্য জোরেশোরে সুপারিশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সুপারিশ এত বিরূপভাবে গৃহীত হয় যে, তাঁহাকে এমন কি কঠোর তিরস্কার-সহ অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিপাত সহ্য করিতে হয়। কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি দরবারগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে হত্যা করার জন্য মীর জাফরের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। সেনাপতির নিকট তাঁহার আবেদনে আরও ক্রোধের নিদর্শন ভিন্ন অন্য কোনই ফল হয় নাই দেখিয়া রাজা নিজ দায়িত্বে সাক্ষাৎকারের ঝুঁকি লইতে মনস্থ করেন এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকেই আগমন করেন। কিন্তু মীর জাফর ইতঃপূর্বেই কক্ষটি অধিকার করিয়া সশস্ত্র লোক দ্বারা উহা ভর্তি করিয়া ফেলেন। হিন্দুটি প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা তাঁহার উপর আপতিত হইয়া তাঁহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরবর্গকেও খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করা হইল, এ যেন এক মৃগয়া-প্রতিযোগিতা! এই হত্যাকাণ্ডের পরে তাঁহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠন ও উৎসন্ন করা হইল। এই সমস্ত ব্যবস্থায় আত্ম-সম্মানে গভীরভাবে আঘাত লাগিয়াছে অনুভব করিয়া প্রধান সেনাপতি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মারাঠাদের আগমনের অল্প কয়েক দিন পূর্বে এই সমুদয় ব্যাপার সঙ্ঘটিত হওয়ায় কেবল স্বয়ং প্রধান সেনাপতি নহে—আফগান সেনানায়কদের প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট হন। তাঁহারা ও তাঁহাদের সৈন্যেরা চাকরী ত্যাগের জন্য সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষায় থাকেন; তাঁহাদের ইচ্ছা তাঁহারা গোপনও রাখেন নাই। সুবাদার শীঘ্রই ইহা অবগত হন। তিনি এখন সঠিকভাবে বিগত যুদ্ধগুলিতে তাহাদের পশ্চাদ্বর্তীতার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি এরূপ গুরুতর সঙ্কটকালে এত সার্বজনীন দলত্যাগের আবহাওয়ায় ভীত ও হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। প্রধান সেনাপতি কেবল তাঁহার উৎকৃষ্ট বন্ধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁহার সর্বাপেক্ষা সাহসী ও উদ্যমী সেনাপতিদের অন্যতম এবং তাঁহার দেশবাসীদের (সৈন্যদলের অধিকই ইহাদের দ্বারা গঠিত হয়) উপর তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবও ছিল অসীম। এরূপ ব্যাপক অসন্তোষ এ ধরনের ছিল না যে, হঠাৎ বা সহজে

তাহার প্রতিকার করা সম্ভব। তাঁহার অবস্থা এখন এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তিনি স্বল্প পরিসরের ভিতরে আবদ্ধ হইয়া পড়েন; শত্রুহস্তে খণ্ডবিখণ্ড না হইয়া সেখান হইতে বহির্গত হওয়ার উপায় ছিল না। খাদ্যদ্রব্য বা রসদপত্র বলিয়া কোন কিছুও উহার নিকটে আসিতে পারিত না। তাঁহার অবস্থার চরম বিপদ সম্পর্কে এখন পুরাপুরি অবহিত হইয়া তিনি নিজেকে মুক্ত করার জন্য কোন উপায়ই অপরিক্ষীত না রাখিতে মনস্থ করিলেন। তিনি সর্বপ্রথম মীর খয়রুল্লাহ্ খাঁ নামক এওজন চরিত্রবান কর্মচারীকে গোপনে মারাঠা শিবিরে প্রেরণ করিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন দক্ষিনী এবং তখন বর্ধমানের রাজার সৈন্যদলের বখশীর পদে কাজ করিতেন। স্বয়ং রাজার নিকট হইতে তাঁহাকে একটা বার্তা প্রদত্ত হইল; তাহাতে মারাঠা সেনাপতিকে শান্তির পথকে প্রাধান্য দান করিতে বলা হইল। তিনি ছিলেন ভাস্কর পণ্ডিত, তিনি সবেমাত্র বঙ্গ-বাহিনীর সমস্ত তল্পি-তল্পা লুণ্ঠন করেন এবং কাজে কাজেই ইহা যে সকল নিদারুণ সঙ্কটে নিপতিত হয়, তাহা অবগত ছিলেন। তিনি উপেক্ষার সহিত বার্তাটি গ্রহণ করিয়া এই সকল কথায় উত্তর দিলেনঃ "আপনার মনিবকে বলিবেন, আমার সৈন্যেরা বাঙ্গলার সুবাদারের সমস্ত বোঝাপত্র লুট করিয়া তাঁহাকে সম্পুর্ণরূপে ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন; তাঁহার পলায়নেরও কোন সম্ভাবনা নাই। এমতাবস্থায় আপনি কিরূপে সন্ধি ও চুক্তির কথা তুলিতে পারেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি যখন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি, তাঁহার পদের খাতিরে আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে সম্মতি দিতেছি। কিন্তু তাঁহাকে সটান এক কোটি টাকা দিতে ও তাঁহার সমস্ত হস্তী সমর্পণ করিতে বলুন; তাহা হইলে আমরা আমাদের সমস্ত সৈন্য সরাইয়া নিব এবং তাঁহাকে তাঁহার রাজ-ধানীতে তাঁহার সফর চালাইয়া যাইতে দিব।" এরূপ বার্তা নিতান্ত অপমান-জনক। কিন্তু সুবাদারের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ গুরুতর। প্রায় ৫৫০০ অশ্বা-রোহীর মধ্যে বিগত যুদ্ধের পরে যাহারা তাঁহার সঙ্গে থাকে, তিনি কিরূপ চরম সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছেন, তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাদের অধিকাংশই শত্রুপক্ষের নিকট পলায়ন করিতে বা অন্ততঃ তাহাদের সহিত কোনরূপ মিটমাট করিতে ইচ্ছুক ছিল। এইরূপ সংবাদ পাওয়ার পরেই শত্রুর উত্তর

তাঁহার হাতে আসিল। তাঁহার সৈন্যদের হিসাব-রক্ষক জানকীরাম তখন সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিলেন একজন যোগ্যতাসম্পন্ন লোক এবং সুবাদারের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সর্বাপেক্ষা উৎসাহী বন্ধুবর্গের অন্যতম ; তিনি তাঁহার প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ করিতেন। সুবাদারের নীরবতা লক্ষ্য করিয়া তিনিই প্রথমে মুখ খুলিলেন। তিনি বলিলেন, "যে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য হুজুরের নিকট রহিয়াছে, তাহারা তাহাদের ক্ষতির দরুণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। শত্রুরা তাহাদের এভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে, কাহারও সজীব পলায়নের কিম্বা কাহারও এক দিনের খোরাকী লাভের সম্ভাবনা নাই। সময় গতিকে শত্রুপক্ষের দাবী পূরণ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালায় হাতী বিরাট বস্তু নহে ; রাজধানীতে হুজুরের সেরেস্তায় আরও ভাল হাতী আছে এবং তাঁহার কর্মচারী ও ভৃত্যদের আস্তাবলে আরও অনেক হাতী রহিয়াছে। পরিশেষে বৎসর বৎসর তাঁহার নিজ রাজ্য হইতেও একটা আস্তাবল আসে। কোটী টাকার মধ্যে খাজাঞ্চীখানার তৎক্ষণাৎ চল্লিশ লক্ষ টাকা মৌজুদ পাওয়া যাইবে এবং তিনি নিজে বাকী টাকা সংগ্রহের দায়িত্ব লইতেছেন।" এই উপদেশের সুরে আলীবর্দী খাঁ অত্যন্ত স্তম্ভিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি এই উত্তর দিয়া তৃপ্ত হইলেন, "যতক্ষণ তাঁহার দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তিনি কখনও এই অপমান স্বীকার করিবেন না ; তাঁহার সঙ্গে যে মুষ্টিমেয় সৈন্য আছে, তাহাদের দ্বারা তিনি তখনও ঐ দস্যুদিগকে ভালরূপে শিক্ষা দেওয়ার এবং তাঁহার সামরিক খ্যাতির মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আশা রাখেন। তদুপরি তিনি তাঁহার শত্রুকে এত অধিক টাকা দিতে এবং এরূপ শক্তিবৃদ্ধি দ্বারা তাহাদের হাত সবল করিতে যাইবেন কেন? যাহারা এই অভিযানে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে স্বয়ং তাঁহার স্বার্থে নিজেদের শোনিতপাতে নিয়ত প্রস্তুত রহিয়াছে, এই টাকাটা তাহাদিগকে প্রদান করা কি অধিক ভাল হইবে না?" এখানে তিনি একটু দম লইয়া মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেনঃ "মহাশয়, আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আপনার নিজেরই এত লক্ষ টাকা রহিয়াছে ; যাহা হইতে দশ লক্ষ আলাদা করিয়া রাখুন ; আমি ইহার প্রত্যেকটী টাকা আমার বিশ্বস্ত কর্মচারীবর্গ ও আমার সর্বাপেক্ষা সাহসী সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিতে চাই।" অনেকটা ধৈর্যের সহিত একথা বলিয়া তিনি মন্ত্রীকে বিদায় করিয়া দিলেন।

এই সময়ের মধ্যে দিনমান সম্পূর্ণ অতিবাহিত হইল এবং ভীষণ অন্ধকার রাত্রি মৃত্তিকার উপর ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে শিবিরের ভৃত্য, বিশেষত্ব যাহারা সর্বস্বান্ত হয় বা তাহাদের মনিব হারায়, তাহারা অন্ধকারের সুযোগ লইয়া মারাঠাদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। ফলে আমীর, কর্মচারী, চেনাশুনা লোক ও চরিত্রবান সৈন্য ভিন্ন কেহই (সুবাদারের দলে) রহিল না; মীর খয়রুল্লাহ্ এক বাহিনী হইতে অন্য বাহিনীতে যাতায়াত করিতে থাকায় সন্ধি আসন্ন বলিয়া এক জনরব রটিল; কাজেই ইহাদেরও অধিকাংশ নিজেদের ব্যক্তিগত চুক্তিসম্পাদনের সুযোগের সন্ধানে রহিল। মীর হাবীব নামক জনৈক বিখ্যাত লোকও ছিলেন ইহাদের মধ্যে। আলীবর্দী খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকায় তিনি ইতঃপূর্বেই শত্রুপক্ষের সহিত যোগাযোগ আরম্ভ করেন এবং দলত্যাগের জন্য শুধু অনুকূল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। নিশাবসানের দিকে মারাঠারা ক্ষমার আশ্রয়ের নিদর্শন স্বরূপ একটা প্রকাণ্ড স্থানে দুইটা পতাকা টাঙ্গাইয়া দিল; তথা হইতে তাহারা উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল: "যে কেহ তাঁহার ধনেপ্রাণে নিরাপদ হইতে চাহে, তাহার কেবল সেখানে গেলেই হইল।" এই সকল নিশান দেখিয়া যাহাদের দেহে বিন্দুমাত্রও সম্মান বা লজ্জা সরমের বালাই ছিল না, তাহারা নানা ছুঁতায় আস্ত দলে দলে পলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। একটি মাত্রও আঘাত না হানিয়া ইহাই ছিল সুবাদারকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। সৌভাগ্য বশতঃ মারাঠারা নিজেরাই এরূপ সার্বজনীন দলত্যাগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ায় উপায় করিয়া দেয়, পলাতকদের কেহই হস্তপূর্ণ না করিয়া আসিতেছে না দেখিয়া তাহারা তাহাদিগকে লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল; এরূপ কার্যের ফলে কার্যতঃ অধিক দলত্যাগ বন্ধ হইয়া গেল। স্রোত বন্ধ করা বা তাঁহার ব্যাপারের প্রতিকারের কোন উপায় উদ্ভাবন করা অসম্ভব দেখিয়া সুবাদার কোন অনুচর বা মশালচী সঙ্গে না লইয়া মধ্যরাত্রে তাঁহার তাঁবু ত্যাগ করিলেন। বালক সিরাজুদ্দৌলার হাত ধরিয়া তিনি পদব্রজে মুস্তফা খাঁর তাঁবুতে গমন করিয়া বলিলেন: "আপনাকে আমার কিছু বলিবার আছে, কাজেই ঘুম হইতে উঠিয়া আসুন।" সেনাপতি যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত ও যাহা শুনিলেন, তাহাতে অবাক্ হইয়া মুহূর্তে গাত্রোত্থান

করিলেন এবং তাঁহার তাঁবুর দুইটি নিভৃত স্থানের একটাতে গমন করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কি হুকুম। সুবাদার উত্তর দিলেন, "বন্ধু! মুস্তফা খাঁ, আমার কথা শুনুন। মানুষের নিকট তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। কিন্তু আমার অবস্থা এখন এমনি যে, আমার সহজতম ও প্রধানতম করণীয় কার্য হইল মৃত্যুবরণ। কাজেই আমার হাত হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে আপনার পক্ষে অস্বাভাবিক উপায় উদ্ভাবন নিরর্থক। আপনি কি কোন অতীত ব্যাপারের জন্য আমার প্রতি অসন্তুষ্ট? আমি আমার নিজের চেয়েও প্রিয়তর সিরাজুদ্দৌলাহ্ সহ এখানে আপনার নিকটে উপস্থিত। আমরা একাকী, আমাকে এক্ষণি হত্যা করুন। এক আঘাতে আপনার কাজ সমাধা করিয়া আপনার সমস্ত অনিশ্চয়তা হইতে এই দণ্ডে নিজেকে মুক্ত করুন। কিন্তু যদি দীর্ঘকালের কোন বন্ধুত্ব এবং প্রাপ্ত উপকারের জন্য কোন কৃতজ্ঞতার স্মৃতি এখনও আপনার মনে রহিয়া থাকে, এবং এখন অতীতে আমার এমন কোন অপরাধ ক্ষমা করিবার সাধ্য আপনার থাকে ও এই নৈরাশ্যপূর্ণ মুহূর্তে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইতে ইচ্ছুক হন, তবে আমার সহিত নূতন চুক্তি করুন এবং নূতন করিয়া হলফ লউন যে, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। বশ্যতা স্বীকার অপেক্ষা আমি কোন কিছুরই চেষ্টা বাকী না রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাজেই ইহাই আমাকে ঐ বিষয় নিশ্চিন্ত করার এবং মারাঠাদের সম্পর্কে কি করা যায়, তদ্বিষয়ে আমাকে অবাধে চিন্তা করিতে দেওয়ার একমাত্র উপায়।" বক্তৃতার আকস্মিকতা হতবুদ্ধি ও ইহার মর্মের গুরুত্বে বিচলিত হইয়া সেনাপতি উত্তর দিলেন, "এই সব ব্যাপারে আমি একা কিছু বলিতে পারিনা, আমাকে আমার দেশবাসী অন্যান্য কর্মচারীর সহিত আলোচনা করিতে হইবে; তখন আমি আপনাকে তাঁহাদের উত্তর জানাইব।" এত অধিক উদাসিনতায় বিচলিত না হইয়া সুবাদার বলিলেন, "তাহা হইলে করুন, আমার কোনই আপত্তি নাই।" সেনাপতি তখন শমশের খাঁ, সর্দার খাঁ ও অন্যান্য আফগান সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হওয়ার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সমবেত হইবামাত্র তিনি সুবাদারের দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে এই সকল কথায় সম্বোধন করিলেন, "হুজুরের সৈন্যকে

এইমাত্র যাহা বলিলেন, এই কর্মচারীদিগকেও তাহা বলিতে মর্জি হউক।" এই অনুরোধ রক্ষিত হইলে সমবেত লোকে নীরবে শ্রবণ করিলেন, কিন্তু একটি কথাও বলিলেন না। তখন সেনাপতি তাঁহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া ঠিক এই কথাগুলি বলিলেন, "ভাইসব, আপনারা উত্তর দিতেছেন না কেন? আপনাদের মনে কি আছে, বলুন।" ইহাতে শমশের খাঁ ও সর্দার খাঁ উভয়েই অন্যান্য সকলের নামে উত্তর দিলেন: "যেহেতু তিনি মুস্তাফা খাঁ তাঁহাদের সেনাপতি ও তাহাদের জাতির প্রধান ব্যক্তি—তিনি যে উত্তর দিবেন, তাহাই তাঁহাদের নিজস্ব উত্তর বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাতে সেনাপতি বলিলেন, "বন্ধুগণ, যেহেতু আপনারা এই দৃশ্য সম্পর্কে আমার সঠিক অভিমত শুনিতে চাহেন, আমি আপনাদিগকে অকপটে বলিতেছি যে, এযাবত যাহা আমার মনে ছিল, তাহা শুধু মনেই ছিল। এখন তাহা অতীত; বর্তমানে আমার, পরিবারের এবং আমার সমস্ত লোকজনের মস্তক ও জীবন আমি আমার ঐ প্রভু ও প্রতিপালকের পদতলে নিক্ষেপ করিয়াছি এবং যতদিন এই দেহে এই মস্তক সংলগ্ন থাকিবে, ততদিন আমি ইহা আলীবর্দী খাঁ, তাঁহার পুত্রকন্যা ও তাঁহার পরিবারকে চরমপত্র দ্বারা দান করিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, যতদিন মুস্তফা খাঁ জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি স্বীকার করিবেন যে, ততদিন তাঁহার মস্তক মহামান্য সুবাদারের ক্ষুদ্রতম গোলামের[২২] ঘোড়ার পায়ের নালের সহিত বাঁধা থাকিবে; আমি স্বয়ং আপনাদের ইহা বলিতেছি। কিন্তু আমাদের অবস্থা নৈরাশ্যব্যঞ্জক নহে: বন্ধোগণ! আমাদের মধ্যে এত সুপরিচিত প্রবাদ বাক্য—যদি চল্লিশটি তলোয়ার একত্রে সমবেত হয়, তবে উহারা একটা রাজ্য দান করতে পারে' নূতন করিয়া বলার দরকার করে না। আমরা এখনও তিন হাজারের অধিক অশ্বারোহী এবং অবশ্য আমরা যুদ্ধ করিতে পারি, সুতরাং এরূপ হতাশভাবের সহিত এত ভয়-বিহ্বলতা প্রদর্শন চরম ভীরুতা। আমি আশা করি, আল্লাহ্র রহমতে আমরা ঐ সকল কাফিরকে আচ্ছামত প্রহার করিয়া মোটের উপর জয়লাভ করিব। ভদ্রমহোদয়গণ! আমি এখন আপনাদিগকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিলাম, আপনারা আপনাদের পক্ষ গ্রহণ করুন এবং যেরূপ উত্তম মনে হয়, সেভাবে কাজ করুন"। মনোযোগের সহিত এই বক্তৃতা শ্রবণ

করিয়া তাঁহাদের সকলেই মুস্তফা খাঁর সহিত একমত হইলেন এবং সুবাদারের সমর্থনকারীর দল প্রবল হইল। তখন সুবাদার সঙ্কেত দ্বারা[১৩] সবে মাত্র গৃহীত প্রস্তাবের উপর একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা উচ্চারণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। সুবাদার যাহা দেখিলেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রগাঢ় তন্দ্রাভিভূত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি গোলাম আলী খাঁ নামে তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে স্বয়ং আফগানদের ভাবভঙ্গী পরীক্ষা করিতে এবং তৎসম্পর্কে তদীয় মন্তব্য তাঁহার নিকট বর্ণনা করিবার জন্য আদেশ দিয়া সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রেরণ করিলেন। গোলাম আলী খাঁ ছিলেন একজন চরিত্রবান ও বিখ্যাত আমীর; তিনি কিছুকাল আজিমাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তার পদে কাজ করেন এবং তাঁহার পুত্র ইউসুফ আলী খাঁ সরফরাজ খাঁর এক কন্যা বিবাহ করেন; আফগান সেনাপতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই আমীর মুস্তফা খাঁর তাঁবুতে গমন করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তায় কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিলেন। তিনি যখন গাত্রোত্থান করিতেছিলেন, তখন শমশের খাঁ প্রেরিত একটা লোক আসিয়া ঘোষণা করিল যে, গতকল্যের চুক্তি অনুযায়ী তাঁহারা মারাঠাদের নিকট যে সকল চিহ্ন ও পতাকা চাহিয়াছিলেন, সেগুলি আজ আনিয়া পৌঁছিবে; কাজেই এখন তিনি কি করিতে চাহেন, তাহা তিনি (শমশের খাঁ) জানিতে চাহিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে সেনাপতি গত রাতের সমস্ত কার্য পুনরায় বলিয়া এই কথাগুলি দ্বারা তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন: 'যে কেহ আফগানের বাচ্চা হইবে, সে গত রাতের চুক্তি মানিয়া চলিবে'। এতটুকু শুনিয়াই দূত আলীবর্দী খাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যাহা শ্রবণ করেন, তাহা হুবহু বর্ণনা করিলেন; এতচ্ছ্রবণে সুবাদার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহার মন নিশ্চিন্ত হওয়ায় তিনি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বাস্তবিকই এত সঙ্কটজনকমুহূর্তে শক্তিশালী ও উৎসাহী বন্ধুর নিকট হইতে এরূপ বাক্য শ্রবণ কখনও নূতন সাহসে অনুপ্রাণিত ও অতিরিক্ত নির্ভীকতা দান না করিয়া পারে না। সামান্য আলোচনার পরে সুবাদার মারাঠাদের ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া লইয়া মুর্শিদাবাদে

প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার পক্ষদ্বয় শূক ও পালক ছাঁটাই করিবার পরে তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শত্রুর মুকাবিলা করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করেন। এই সময়ে আবার সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল। প্রথম বাঙ্গালী শিবির লুণ্ঠনে একটা ছোট কামান মারাঠাদের হস্তগত হয়; তাহারা ইহা একটা বৃক্ষের উপরে চড়াইয়া শত্রুগৃহের সর্বত্র অবিশ্রান্ত গোলা বৃষ্টি করিতে ও অসংখ্য হাউইবাজি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ফলে সারারাত সৈন্যদলের সর্বাংশে ক্রন্দন ও চীৎকার-ধ্বনি ভিন্ন কিছুই শ্রুত হইল না; ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া দাঁড়ায় যে, বর্ধমানের রাজার দেওয়ান মানিক চাঁদ এরূপ হত্যা ও গোলমালের দৃশ্যে ভয় পাইয়া সূর্যোদয়ের সময় অন্তর্হিত হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার প্রভুর নিকট গমন করাই সঙ্গত মনে করিলেন। ঠিক এই সময় ও রাত্রির সর্বাপেক্ষা অন্ধকার অংশে মারাঠারা পুনরায় বঙ্গবাহিনীর উপর আপতিত হইয়া চতুর্দিকে উহাকে আক্রমণ করিল। ফলে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য সুবাদার অতি কষ্টে তাহার হাতীতে চড়িবার সময় পাইলেন। আক্রমণ এত আকস্মিক ছিল বলিয়া প্রত্যেকেই অস্ত্র গ্রহণার্থ ছুটিয়া যায়; কাজেই ব্যূহ রচনা করার কোন সম্ভাবনা ছিল না; মারাঠারা ইতঃপূর্বেই কেন্দ্রভাগে পর্যন্ত ঢুকিয়া পড়ায় সৈন্যেরা যে বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হয়, তাহার প্রতিকার করাও অসম্ভব ছিল। কেন্দ্রে মীর হাবীব অন্যান্যের ন্যায় সতর্ক ছিলেন না বলিয়া পরিবেষ্টিত, তিনস্থানে আহত হইয়া ভূমিতে নিপতিত ও বন্দী হন। অতঃপর তিনি মারাঠাদের সহিত যোগদান করিয়া তাহাদের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। এই সঙ্কটে সুবাদারের ছোট কামান পরিচালক হায়দর আলী খাঁ বিপুল সংখ্যক শত্রু সাফ করিয়া অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হন। পক্ষান্তরে মুস্তফা খাঁ, শমশের খাঁ ওমর খাঁ সর্দার খাঁ ও রহিম খাঁ এলোমেলোভাবে যুদ্ধ করিলেও এরূপ সাহসিক কার্য সম্পন্ন এবং বিশেষভাবে সর্বাপেক্ষা সাহসী ও অগ্রবর্তীদের মধ্যে হইতে এত অধিক শত্রু নিধন ও জখম করিতে লাগিলেন যে, তৎফলে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহাদের সেনাপতিরা এত অধিক নির্ভীকতায় ভীত

যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রের ভিতর দিয়া সুবাদারের পথ পরিষ্কার

হইয়া তাহাদিগকে সর্বদিক দিয়া বেষ্টনে বিরত হইলেন এবং নিজেদের নূতনভাবে একদলে গঠিত করিয়া চতুর্দিক ঘুরিয়া আসিয়া সৈন্যদলের পার্শ্ব-দেশে আপতিত হইল। এই গতি বিবর্তনের দরুন বঙ্গবাহিনী নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় পাওয়ায় একটা নিবিড় দল গঠন করিয়া শত্রুব্যূহের ভিতর দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু এখন অবশিষ্ট বোঝাপত্রও হস্তচ্যুত হইয়া গেল। কোন পোশাক, কোন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা কোন খাদ্য আদৌ কিছু অবশিষ্ট রহিল না। শীর্ণ অশ্বারূঢ় ২/৩ হাজার সৈন্য ও ক্ষুধা ক্লান্তিতে দুর্বল ৫/৬ হাজার বন্দুকচী সারাপথে যুদ্ধ করিতে করিতে ও সারা রাস্তায় উপবাস থাকিয়া পূর্ণগতিতে অগ্রগমন করিতে লাগিল। মারাঠারা সর্বত্র তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিত। অবিশ্রান্ত আক্রমণে ও অবিরাম খণ্ড যুদ্ধে সর্ব প্রকারে তাহাদিগকে উত্যক্ত করিত; একটার পর একটা করিয়া খণ্ডযুদ্ধের আর বিরাম ছিল না। কিন্তু বঙ্গ-বাহিনী ইহাতে হতাশ হইল না। তাহাদের সেনাপতির দৃঢ়তায় উৎসাহিত ও তাহাদের সেনাপতিগণের বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা প্রত্যেক দিকে মুখ ফিরাইয়া শত্রুদের প্রতিহত করিল। যুদ্ধ করিতে করিতে এবং অবিশ্রান্ত সাহসিক কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিয়ত শত্রুদিগকে ভীত চকিত করিতে করিতে তাহারা ক্রমাগত আগাইয়া চলিল। কিন্তু এই সাহসী সৈন্যেরা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্যের অভাবে তুল্য কষ্ট ভোগ করিল। সৌভাগ্যবশতঃ অত্যন্ত পুণ্য কার্য বিবেচনায় হিন্দুরা বাঙ্গলা হইতে জগন্নাথের পথে বহু অর্থ ব্যয়ে অসংখ্য জলাশয় ও কৃত্রিম পুষ্করিণী খনন করিয়া রাখিয়াছিল। এবং সৌভাগ্যবশতঃ এই সমুদয় পুকুরের প্রত্যেকটা বিবিধ বৃক্ষপূর্ণ উচ্চপাড় বেষ্টিত। প্রত্যেক দিনের যাত্রার পর রাত্রি আগমনে এই সমুদয় পুষ্করিণীর কোন একটাতে সমগ্র বাহিনীর বাসার কাজ চলিত। সৈন্য বা অফিসার প্রত্যেকেই অনাবৃত মৃত্তিকায় বসিয়া পড়িত এবং বৃক্ষপত্র ও মাঠের ঘাস-ভোজন দ্বারা উদরভর্তি করিয়া লম্বা-লম্বিভাবে দেহ এলাইয়া দিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণ করিত। এই সমস্ত সময় খালি মাটি ভিন্ন তাহাদের অপর কোন গালিচা ও বাদলা আকাশ ভিন্ন অপর কোন আচ্ছাদন থাকিত না। সেনাবাহিনীতে কোন আমীর

বা সেনপতি ও সাধারণ সৈনিক অপেক্ষা ভাল অবস্থায় ছিল না। দিনের ন্যায় প্রতি রাত্রেও মারাঠারা শত্রুদের খিরিয়া রাখিত, কিন্তু কামানের গোলায় আহত হইতে পারে, এত নিকটে আসিত না। প্রত্যেকটা তাঁবু প্রত্যেকটা মালপত্র, প্রত্যেকটা বাসন-কোসন ও প্রত্যেক প্রকারের রসদ তাহারা লুটিয়া নেয়। প্রত্যহ প্রাতে চতুর্দিকে দ্রুতগামী সৈন্যদল প্রেরণ ও চতুর্দিকে ১০।১২ ক্রোশের মধ্যে প্রত্যেকটা গ্রাম দগ্ধ ও লুণ্ঠন করা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। ফলে বঙ্গ-বাহিনীর পক্ষে খাদ্যোপযোগী কোন কিছু সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। লোকে জয়লাভ দূরের কথা, তাহাদের প্রাণ রক্ষা সম্বন্ধেই নিরাশ হইতে আরম্ভ করে। দৈনিক সফরে ক্লান্ত ও দৈনিক অনাহারে শীর্ণ হইয়া তাহাদের অস্ত্র-বহনের ক্ষমতা আর ছিল না, উৎসাহের সহিত চলিবার শক্তি ছিল আরও কম। যাবতীয় অর্থ সত্ত্বেও সেনাপতি ও শক্তিশালী সেনানায়কদের অবস্থাও অধিক ভাগ ছিল না, তাঁহারা কোনরূপে প্রকৃতির সাহায্য করিতে সমর্থ হন মাত্র, আর অধিক নয়; সৈন্যদলের অবশিষ্ট লোকে বৃক্ষপত্র, গাছের ছাল পিপীলিকা ও এইরূপ অন্যান্য খাদ্য জোর করিয়া পেটে পুরিত। যে ইউসুফ আলী খাঁ আমাদের জন্য তাঁহার অভিযানের বিশেষভাবে ঐ বিপদসঙ্কুল প্রত্যাবর্তনের বিবরণ রাখিয়া দিয়াছেন, সেই একই ব্যক্তির প্রদত্ত বিশদ বিবরণ সযত্নে লিখিত হইলেও বিশ্বাসের অযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন যে, কাটোয়া পৌঁছিতে তাহাদের তিন দিনের যাত্রায় তিনি একবার মাত্র তিন পোয়া খিচুড়ী[১৪] যোগাড় করিতে সমর্থ হন এবং প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য ভক্ষণে অভ্যস্ত সাতজন আমীর এই খাদ্য ত্যাগ করিয়া খান। আর একদিন তাঁহারা শেকের পারা[১৫] নামক মিঠাইর সাতটী মাত্র টুকরা খাইয়া বাঁচেন। আর একদিন ঐ লোকগুলি নিজেদের জন্য মাত্র আধ সের গলিত মাংস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ইহা যখন ভাজা হইতেছিল, তখন একটা মাত্র গ্রাসের জন্য আরও কয়েক ব্যক্তি আসিয়া জুটে; তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভবপর হয় নাই। এইরূপ দুর্দশার মধ্যেও বঙ্গবাহিনী উহার যাত্রায় অগ্রসর হইতেছিল। ছোট, বড় প্রায় সমস্ত কামান হস্তচ্যুত হওয়ায় এবং কামানের আঘাত না পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারে, শত্রুরা মাত্র এতকুটু

দূরে থাকিয়া অবিশ্রান্ত ঘুরিতে থাকায় যে কোন মুল্যেও কোন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা যাইতে পারিত না। এরূপ অবস্থায় কয়েকজন সেনাপতির এক প্রকার উন্মত্ততা জন্মিল; বিশেষভাবে এক বার মুস্তফা খাঁ তাঁহাদের সতর্ক পশ্চাদ্বর্তিতায় ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহচরদের বলিলেনঃ (ইতোপূর্বেই অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছিল) "মুসলমান ধর্মের প্রতি কি লজ্জা ও আফগান নামের কি অপমান যে, ঐ দক্ষিণী হীনতম ব্যক্তিরা প্রতি দিন ও প্রতিরাত্রে চতুর্দিকে তোমাদের ঘিরিয়া রাখিতেছে ও চাপ দিতেছে। অথচ ঐ কাফিরদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার ও তাহাদের মধ্য হইতে মুক্তির সন্ধানের পরিবর্তে তোমরা নিজেদের দুর্ভিক্ষ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী মৃত্যু দ্বারা ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতে দিতেছ!" এরূপ বক্তৃতা ফলপ্রসূ হইল। তাঁহার পার্শ্ববর্তী লোকদের অধিকাংশই সাহসী লোক বলিয়া উত্তর দিল, তিনি হইলেন তাহাদের সেনাপতি; তিনি তাহাদিগকে পরিচালিত করিলেই তাহারা তাঁহার অনুসরণ করিবে; মুস্তফা খাঁ তাহাদের মনের ভাব এরূপ দেখিয়া তাঁহার ঢাল-তলোয়ার লইয়া তাহাদের পুরোভাগে আসিয়া একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেন তাহারা এতগুলি দর্শক মাত্র, এভাবে তাঁহার সৈন্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের সম্মুখেই ছিল একদল মারাঠা; অনাহারে মৃতপ্রায় হতভাগাদের নিকট হইতে আদৌ এরূপ কোন আক্রমণের প্রত্যাশা না করিয়া তাহারা বাস্তবিকই তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক মাটিতে রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া তাহাদের উপাসনা ও আহারের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; যাহারা তাহাদের এত নিকটে আসিতেছিল, তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতে তাহারা ইচ্ছুক ছিল না বলিলেই হয়। মুস্তফা খাঁ ও তাঁহার লোকেরা এই নির্বিঘ্নতার সুযোগ লইয়া তাঁহাদের অসি নিষ্কাসিত করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ গর্বিত কাফিরদের উপর ছুটিয়া গিয়া তাহাদের এত লোককে হত্যা করিল যে, অন্যেরা চুলার উপরে তাহাদের কেতলি, ঠিক তাহাদের পাশে পাক করা তৈরী খাদ্য এবং খাদ্য ও রসদপূর্ণ বস্তা ফেলিয়া সর্বশক্তিসহকারে পলাইয়া গেল। মুস্তফা খাঁর লোকেরা এখন ময়দান শূন্য দেখিয়া যে যত বেশী বহিতে পারিল, তত বেশী রসদ লইয়া তাহাদের শিবিরে ফিরিয়া

আসিল। অন্যেরা ইহা দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিত বুঝিয়া সকলেই শস্য ও খাদ্যদ্রব্য বোঝাই হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। কাজেই এই তিন দিন উপবাস থাকিবার পর অনাহারে শীর্ণ লোকেরা সেদিন পেট ভরিয়া খানা খাইয়া তাহাদের দুর্বলতা মুক্ত হইল। কিন্তু এই দুঃসাহসিক কার্যের ফলে শত্রুরা সতর্ক হইয়া পড়িল। মুস্তফা খাঁর সৈন্যদের আঘাত খাইয়া তাহারা অধিকতর সাবধান হইল এবং পূর্বের ন্যায় এত কাছে ঘেঁসিলনা, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিছুদূরে সরিয়া রহিল। এত অধিক কষ্ট সহিয়াও সৈন্যদল জিদ করিয়া কাটোয়া অভিমুখে তাহাদের যাত্রা চালাইয়া যাইতে লাগিল। এই সমুদয় যাত্রার একটিতে বাঙ্গালী সৈন্যেরা প্রত্যুষে অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়; সৈন্যেরা ব্যূহ গঠন বা সেনাপতি তাঁহার হস্তীতে আরোহণের সময় না পাইতেই মারাঠারা অকস্মাৎ সতেজে আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সর্বত্র ঢুকিয়া পড়িল। একদল গঠন বা একদলে মিলিত হওয়া অসম্ভব হওয়ায় ঘটনাক্রমে যে যেখানে ছিল, সেখানে থাকিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া প্রত্যেকেই তাহার প্রতিবেশীর সাহায্য করা বা তাহাদের প্রভুর সাহায্যে আসার কথা মনে না করিয়া কেবল নিজেকে বিপন্মুক্ত করার কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। সুবাদার নিজেও একই সংকটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হন। শত্রু পরিবৃত হইয়া তিনিও একাই যুদ্ধ করিতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ একটা অলৌকিক ঘটনা না ঘটিলে তাঁহার সর্বনাশ হইত। আল্লাহ সেদিন এক চিরস্মরণীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিপন্নের সাহায্যে আসেন। প্রচলিত প্রথানুযায়ী সম্মুখ দিকে পতাকা ও নিদর্শন বোঝাই দুইটি হস্তী বরাবর সুবাদারের হস্তীর ঠিক সম্মুখ দিয়া গমন করিত। তাহাদের গজদণ্ডগুলিতে সর্বদা একটা মোটা শিকল বোঝাই করা থাকিত। উহার ঝন্ ঝন্ শব্দে তাহারা আমোদ পাইত বলিয়া মনে হয়।[১৩] এই জন্তুগুলি তাহাদের নিকটে এত বেশী অসাধারণ চেহারা ও গন্ধের অপরিচিত লোক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আল্লাহ-প্রদত্ত আদেশ বাক্য মন দিয়া শ্রবণ করিল; কৌশলের সহিত তাহাদের শৃঙ্খল পরিচালনা করিয়া এমন ভয়ানক হারে চতুর্দিকে এগুলি প্রয়োগ করিল যে, উহাদের প্রত্যেকটার ঘায়ে মানুষ বা অশ্ব দুইটার একটা না একটা ধ্বংস হইতে লাগিল। এই বিচিত্র দৃশ্যে

বিস্মিত হইয়া এবং কাছে ঘেঁসিতে সাহস না পাইয়া মারাঠারা বেশী নিকটে চাপিতে বিরত হইল। তাহারা কিছু দূরে সরিয়া যাওয়ায় কয়েক জন লোক তাহাদের প্রভুর সাহায্যে আসিবার ও তাঁহার হস্তীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবার সময় পাইল। এই বিরাম মুহূর্তের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য সৈন্যও সুবাদারের সাহায্যে ছুটিয়া গেল; এখন অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হওয়ায় তাহারা যে সকল মারাঠা অন্যান্য দলকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের উপর আপতিত হইয়া অনুরূপভাবে তাহাদিগকেও (অন্যান্য দলকে) ছাড়াইয়া লইল। সৈন্যদল এখন বিশৃঙ্খলা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তাহাদের নিয়মিত অগ্রগতি চালু করিল। যে শত্রুদল বলপূর্বক তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্বত্র ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা পুনরায় বিতাড়িত ও তাহাদের অনেকে নিহত হইল। এরূপ দুর্দশা, হত্যা ও কষ্টের অবস্থার দৃশ্যের ভিতর দিয়া সৈন্যদলকে বিরাট সঙ্কটে পরিপূর্ণ এবং অনন্ত ও অদৃষ্টপূর্ব বিপদসঙ্কুল রাস্তায় অগ্রসর হইতে এবং এখনও শত্রুদিগকে প্রতিরোধ ও সর্বত্র তাহাদের সম্মুখীন হইতে হইত। অবশেষে আল্লার সহায়তায় তাহারা কাটোয়ায় পৌঁছিল; এই শহর ও দুর্গ মুর্শিদাবাদ হইতে দুই দিনের পথ দক্ষিণে।

তাহারা যখন নিকটবর্তী হইতেছিল, তখন যাহাদের অতিরিক্ত শস্য বা জমা করার মত ছালা ছিল, তাহাদের প্রত্যেকেই সচরাচর নিয়মে শহরটী শস্য ও সর্বপ্রকার রসদপূর্ণ দেখিবার প্রত্যাশায় সেখানে যাইতে তৎপর হইল; কিন্তু শত্রুরা তাহাদের পূর্বেই সেখানে পৌঁছিয়া অত্যল্পকাল পূর্বে ঐ শহরে আপতিত হইয়া উহা উৎসন্ন ও লুণ্ঠন করে; যে শস্য ও রসদ তাহারা বহিয়া নিতে পারিল না, তাহারা তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। ঐ জনপূর্ণ শহরে এই সম্পত্তিটুকুই পাওয়া গেল। কিছু পরিমাণ অপ্রত্যাশিত খাদ্য-সজ্জিত মেঝের ন্যায় অর্ধদগ্ধ ও আধ-ভাজা শস্য অনাহারে শীর্ণ ঐ বেকারীদের চক্ষু পরিতৃপ্ত করিল। আলীবর্দী খাঁ কাটোয়ায় তাঁহার বাসা লইয়া নগরের শাসনকর্তা হাজী আহমদ ও নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁকে নিজের অবস্থা জানাইয়া এবং তাঁহাদিগকে নগর ও দেশের তত্ত্বাবধান করিবার সর্বোপরি রসদপত্র ও প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একটা যোগান লইয়া

তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সয়্যিদ আহমদ খাঁকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। এই উপস্থিতির সংবাদে পরিবার আনন্দে পূর্ণ হইল। প্রথমে তাঁহারা আলীবর্দী খাঁর প্রত্যেকটি পদচিহ্ন সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলেন : এতদিন ধরিয়া তাঁহার কোনই পাত্তা না পাওয়ায় তাঁহারা তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং যখন তাঁহার নিকট হইতে পত্র আসিল এবং তিনি নগরের এত নিকটে বলিয়া তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তীদের একত্রকারী ও দৃশ্যতঃ সঙ্গতিহীনদের রক্ষক সর্বোচ্চ আল্লার সম্মুখে সিজদা করিলেন এবং তিনি তাঁহাকে এত দীর্ঘ অভিযানের পরে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেই আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে তাঁহারা সয়্যিদ আহমদ খাঁকে এক শত কামান ও রসদবাহী একদল সৈন্য লইয়া প্রেরণ করিলেন; ইহার পিছনে পাঠাইলেন সর্বপ্রকার তাঁবু ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে একদল সাহায্যকারী প্রধান সৈন্য ও রসদবাহী সৈন্যদল লইয়া সয়্যিদ আহমদ তাঁহার খুল্লতাতের সহিত যোগদান করিলেন। এই দৃশ্যে প্রত্যেকেই অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এই অনাহারক্লিষ্ট লোকগুলি ক্ষুধা ও বিপদের পরে প্রাচুর্য আসিয়াছে দেখিয়া সর্বশক্তিমান ঘটনা-নিয়ন্তাকে ধন্যবাদ দান করিয়া এত বেশী পরিশ্রম ও বিপদের পরে বিশ্রাম গ্রহণ করিল। এখন সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতা ও বণিকেরা সর্বপ্রকার রসদপত্র লইয়া সর্বস্থান হইতে দলে দলে শিবিরে সমবেত হইল। দুর্ভিক্ষে ও ক্ষুধায় এত অধিক কষ্ট পাওয়ার পরে গাড়ীবোঝাই শস্য ও খাদ্যদ্রব্য চলাচল করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা দেখিতে ভীড় জমাইল, এমন যেন কৌতুহল উদ্রেকের যোগ্য কোন অসাধারণ দৃশ্য।

এরূপ গৌরবজনক প্রত্যাবর্তনে আলীবর্দী খাঁর সুখ্যাতি বৃদ্ধি না হইয়া পারিল না। ইহাতে তাঁহারা প্রজাবর্গের হৃদয় অত্যন্ত উল্লসিত ও শত্রুরা ভীতিগ্রস্ত হইল। মারাঠা সেনাপতি আতঙ্কিত হইলেন। ব্যাপার এখন অত্যন্ত পরিবর্তিত হইয়াছিল। সুবাদারের সম্মুখে এখন প্রত্যেকটি ইপ্সিত জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। যে সৈন্যদল এত অসুবিধার ভিতরে যুদ্ধ করার সময় তাঁহাকে প্রতিরোধ করে, তাহারা এখন তাহার

সৈন্যদের পরাভবক্ষম হইবে কিনা, এমন কি শত্রুর পক্ষে তাহা সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই তিনি স্থির করিলেন, বাঙ্গলায় এখন তাঁহার অবস্থান অত্যন্ত কঠিন হইবে; তদুপরি বর্ষাকাল আরম্ভ হওয়ায় তিনি বীরভূম অঞ্চলের ভিতর দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করিলেন। কিন্তু মীর হাবীব ইহাতে আপত্তি করিলেন। ক্রমাগত চাকরী করিয়া ও নিজেকে অবিশ্রান্ত বিপদাপন্ন করিয়া তিনি সম্মানিত ও কর্তৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। স্বদেশ ইরান হইতে সামান্য ফেরিওয়ালারূপে এদেশে আসেন ও এত মূর্খ ছিলেন যে, লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না। গুণ ও খেদমতের জোরে তিনি এখন গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং একজন কৌশল উদ্ভাবনক্ষম ব্যক্তি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাপতিরূপে প্রতিপন্ন হওয়ার ব্যবস্থা করেন। আলীবর্দী খাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতার দরুন তিনি এত সহজ শর্তে বাঙ্গলা ত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন যে, মারাঠা সেনাপতিকে বলিলেন, যদি অর্থই তাহার উদ্দেশ্য হয়, তিনি তাঁহার জন্যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহের ভার লইবেন। তিনি শুধু তাঁহাকে কয়েক হাজার অশ্বারোহী দলের জন্য অনুরোধ করিলেন। এই সৈন্য সাহায্যে তিনি আলীবর্দী খাঁর কটোয়ায় অবস্থানের এত সুযোগ লইবেন যে, অকস্মাৎ প্রাচীরহীন অরক্ষিত মুর্শিদাবাদ নগর অভিমুখে অগ্রসর হইবেন; সেখানে শুধু জগত শেঠের[১] গৃহ লুণ্ঠন করিয়াই তিনি তাঁহার সমস্ত কামনা মিটাইবার মত প্রচুর অর্থ তাঁহাকে আনিয়া দিবেন। এই উপদেশ দৃঢ় যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় তাঁহাকে প্রায় ৬০০০ বাছাই অশ্বারোহী সরবরাহ করা হইল। তিনি তদ্দণ্ডেই তাঁহার অভিযানে বাহির হইলেন।

মীর হবীবের নেতৃত্বে মারাঠাদের মুর্শিদাবাদের বিশৃংখলা সৃষ্টি ও গৃহ লুণ্ঠন

কিন্তু সুবাদার যাহাতে ইহার সংবাদ না জানেন, ইহা এত গোপনে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হইল না। তিনি তাঁহার রাজধানীর অবস্থা জানিতেন; ইহা রক্ষার জন্য তাঁহার ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিভার উপর তাঁহার আস্থা ছিল না বলিয়া তিনি ইহার উদ্ধারার্থে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন এবং অত্যন্ত তৎপরতার সহিত সোজা যাত্রা করিলেন। কিন্তু মীর হাবীব ইতঃপূর্বেই এক দিনেই তাঁহার সফর সম্পন্ন করিয়া তাঁহার পূর্বেই সেখানে

উপস্থিত হন এবং জগত শেঠের গৃহ লুণ্ঠন করিয়া পূর্ণ দুই কোটি টাকা ও কিছু পরিমাণ অন্যান্য দ্রব্য লইয়া যান। শহরের অপর কয়েকটি অংশও লুণ্ঠিত হয়। মীর হাবীব স্বগৃহ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহার ভ্রাতা মীর শরীফকে লইয়া যান। কিন্তু আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস পান নাই। কারণ, সুবাদারের প্রাসাদ, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও সহকারী শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ খাঁর প্রাসাদ এবং সাধারণ কর্মচারী আতাউল্লাহ খাঁর প্রাসাদ এত অধিক সৈন্য দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল যে, তাঁহার বেইজ্জতি করা চলিত না। ইতোমধ্যে সুবাদার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা নগর ত্যাগ করিল। তখন প্রায় দ্বিপ্রহর; সন্ধ্যাকালে সুবাদার স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধুবর্গ, সমগ্র দরবার ও সমস্ত প্রজার মধ্যে সার্বজনীন আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। এই সমুদয় ঘটনা ঘটিল ১১৫৫ হিজরীর সফর মাসে।

ইহা লক্ষণীয় যে, সুবাদার যখন তাঁহার রাজধানীর উদ্ধারে অগ্রসর হইতেছিলেন। মারাঠা সেনাপতি তখন বাঙ্গলার বর্ষাঋতুর ভীষণতায় ভীত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। তিনি বীরভূমে পৌঁছিলে মীর হাবীব তাঁহার নাগাল পাইলেন; তিনি তাঁহার দুই কোটী টাকা, লুণ্ঠিত দ্রব্য ও অনেক সদুপদেশ সঙ্গে লইয়া আসেন। তিনি সেনাপতিকে এত সহজ শর্তে বাঙ্গলা ত্যাগ করার জন্যে ভর্ৎসনা করিলেন। সেনাপতি তাঁহার প্রত্যাবর্তনে অবিচলিত থাকিলে তিনি এমন কি নাগপুর দরবারকে তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতা ও দীর্ঘসূত্রতার সংবাদ দিবেন বলিয়াও ভয় প্রদর্শন করিলেন। মীর হাবীব এমন আন্তরিকতা, অথচ এত যুক্তির সহিত কথা বলিলেন যে, সেনাপতির সন্দেহভঞ্জন হইয়া গেল; তাঁহার ভর্ৎসনার নিকট হার মানিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্বর্তন করিলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কাটোয়ায় তাঁহার শিবির স্থাপিত হইল। মীর হাবীব তাঁহার অভিযানের সাফল্যের জন্য জামীন হন; তিনি সেখানে সৈন্যদলের জন্য রসদ সংগ্রহের ভার লন। এই সুচতুর লোকটি এমন কি দেশের জমিদারবর্গ ও হুগলীর অধিবাসী—উভয়ের সন্দেহপত্র লেখালেখি আরম্ভ করিলেন। মারাঠা সেনাপতির সহিত তাহাদের অনেক পত্র ও সংবাদ বিনিময়ের পর হুগলীর অধিবাসিরা অবশেষে

মিটমাট করার জন্য মীর হাবীবের মধ্যস্থতা কাজে লাগাইল। মীর আবুল হাসান ও মীর আবুল কাসেম নামক দুইজন বনিক ছিলেন তাঁহাদের প্রধান; তাঁহারা ছিলেন সুবাদারের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও হুগলীর শাসনকর্তা মুহম্মদ ইয়ার খাঁর অন্তরঙ্গ। মীর হাবীবের পরামর্শে তাঁহারা রাত্রিকালে হুগলীতে আসিতে যত্নবান হইলেন! তখন দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ থাকায় তাঁহারা যেন শাসন কর্তাকে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন; এমন ভাবে একটা গল্প তৈয়ার করিয়া পাঠাইল। নিঃসন্দিগ্ধ লোকটি দ্বার খুলিবার আদেশ দিলে মীর হাবীবের পরিচালনায় প্রায় ১৫ জন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। শাসনকর্তা একাকী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া আটক করিল। ষড়যন্ত্রকারীরা ইতঃপূর্বেই মারাঠা সেনাপতির নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একদল সৈন্যসহ শিব রাও নামক একজন প্রতিপত্তিশালী কর্মচারী প্রাপ্ত হন; তাহারা হুগলীর নিকটে লুকায়িত হইয়া রহিয়াছিল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট শাসনকর্তাকে ধৃত করার সংবাদ পাঠাইলেন। মারাঠা কর্মচারীটী তৎপরতার সহিত শীঘ্র ঐ নগরে পৌছিয়া কর্তৃত্বের মসনদে উপবেশ করিলেন এবং সনিবন্ধ অনুরোধকারীদের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের পর নাগরিকদের অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন। মীর হাবীব আরও বহু মোগল বণিকের নিকট তাঁহাদের দৃষ্টান্ত বিবেচনার জন্য পেশ করিলেন। তাঁহারা সকলেই ইহার অনুসরণ করায় নগর শান্ত হইল। চাঁদা বা দেশের রাজস্ব হইতেই হউক বা এরূপ একটি বিখ্যাত বন্দরের বন্দর-শুল্ক হইতেই হউক, এই অভিযানে অনেক টাকা লাভ হওয়ায় মারাঠা সেনাপতি তাঁহার বাঙ্গলায় প্রবাসের সমস্ত গুরুত্ব ও সমস্ত মূল্য অনুধাবন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কাটোয়াকে তাঁহার প্রধান কার্যালয় করিতে মনস্থ করিলেন। তখন হইতে মীর হাবীব তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ঐ বহুরূপী ব্যক্তিটি ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ লোক; তিনি কখনও কাটোয়ায়, কখনও হুগলীতে থাকিয়া কার্য নির্বাহ করিতেন।

বার মাসের অভিযানে এবং পরিশ্রম, রোগ ও দুর্ভিক্ষে সুবাদারের সৈন্য সংখ্যা অনেক হ্রাস পায়। কাজেই বাঙ্গলার দক্ষিণাংশে যখন এ সমুদয় ব্যাপার ঘটিতেছিল, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, বর্ষাকাল নিকটে আসিয়া

পড়ায় মারাঠাদিগকে তাঁহার দেশ হইতে বিতাড়ণের কথা চিন্তা করার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। নগর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রক্ষা করিয়া তৃপ্ত থাকা ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই করিবার নাই। কাজেই তিনি বাহিরে আসিয়া ইহা হইতে কিছু দূরে আমানীগঞ্জ ও তারাকপুর নামক শহরতলীতে স্থান গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইল; ভাগিরথী হাটিয়া পার হইতে না পারায় কাটোয়া অন্যদিকে রহিল; কিন্তু মুর্শিদাবাদের দিকের দেশ শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইল। কিন্তু একই কারণে সমগ্র বর্ধমান ও মেদিনীপুরে তাহাদের লুণ্ঠন প্রসারিত করার সুযোগ পাইল। সুদূর বাঙ্গালোর বন্দর পর্যন্ত সমগ্র জনপদ হইতে তাহারা চৌথ আদায় করিল; এমন কি এই বন্দরটিও তাহাদের হস্তগত হইল। কিন্তু মেনিদীপুরের ফৌজদার মীর কলন্দর বা উড়িষ্যার নায়েব নাজিম মীর মাসুমও এই সমুদয় ঘটনায় ভীত হইলেন না। তাঁহার সৈন্যের চেয়ে চারিগুণ অধিক লোকে প্রদেশটি আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া পর্বতে গিয়া নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাঁহার দেশ অরক্ষিত রাখিয়া দিলেন। এইরূপে উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও রাজশাহীর একাংশ, এমন কি আকবর নগর শহর ও জিলা শত্রুদের দখলে চলিয়া গেল। মুর্শিদাবাদ নগর ও গঙ্গার অপর দিকস্থ জনপদ ভিন্ন কিছুই আলীবর্দী খাঁর হাতে রহিল না। এই বিরাট রাজধানীর অধিবাসীরা কখনও এইরূপ ধ্বংসক্রিয়া দেখে নাই, এমন কি এরূপ ব্যাপারের কথা শুনেও নাই; তদুপরি তাহাদের শহরে এমন কি একটা দেওয়ালের পর্দাও ছিল না। কাজেই তাহারা তাহাদের ধনসম্পদ ও পরিবারের জন্য অত্যন্ত ভীত হইয়া ঋতুর সুযোগে নদী অতিক্রম করিয়া জাহাঙ্গীর নগর, মালদহ, রামপুর বোয়ালিয়া প্রভৃতি গঙ্গার অপরদিকস্থ জনপদে চলিয়া গেল। তাহাদের বেশীর ভাগ লোকেই সেখানে গৃহ নির্মাণ করিয়া জীবন-যাপন করিতে লাগিল। সহকারী শাসনকর্তা নওয়াজিশ মুহাম্মদ খাঁ পর্যন্ত তাঁহার পরিবার, আসবাবপত্র ও ধনসম্পদসহ নদী অতিক্রম করিয়া গোদাগড়িতে বাস করিতে লাগিলেন। ইহা নগর হইতে একদিনের পথ দূরে; এখানে তিনি নিজের ও পরিবারের জন্য একটা বাসগৃহের

মারাঠাগণ কর্তৃক গঙ্গার দক্ষিণস্থ সমগ্র অঞ্চল লুণ্ঠন

ভিত্তি স্থাপন করিলেন। আলীবর্দী খাঁর আসবাব ও মালপত্রও অনুরূপ ভাবে স্থানান্তরিত করা হইল। নায়েব নাজিম অবশ্য সেখান হইতে নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার খুল্লতাত আলীবর্দী খাঁর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এই সামন্ত এখন তাঁহার সৈন্যদের চিত্তজয় করিতে ও তাহাদের বিশ্বস্ততার জন্য তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে মনস্থ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিশ্রুত দশ লক্ষ টাকা উপহার দান করিলেন; এইরূপে সময়োচিত সদাশয়তা দ্বারা তিনি তাহাদের হৃদয়ে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার বীজ বপন করিলেন।

ইহা লক্ষ্য করা দরকার যে, মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়া সুবাদার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আজিমাবাদের শাসনকর্তাকে এবং এই গরীবের মাতামহের ভ্রাতা ও আলীবর্দি খাঁর সাক্ষাৎ চাচাত ভাই আবদুল আলী খাঁকে বিষয়কর্মের অবস্থা জানাইয়া এবং যত সৈন্য এককালীন যোগাড় করিতে পারেন, তাহা লইয়া তাঁহার সাহায্যে আসিবার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া পত্র লিখিলেন। তাহাতে একথাও বলা হইল যে, আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিতে তাঁহার সামর্থ্যের উপরই তাঁহাদের সকলের নিরাপত্তা নির্ভর করে। আবদুল আলী খাঁর নিকট লিখিত পত্রের হাশিয়ায় তিনি স্বহস্তে এই কথাগুলি লিখিলেন, "আপনার বৃদ্ধ চাচাজির মঙ্গলের জন্য যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, তবে তাহা প্রদর্শনের ইহাই সময়।" যুবক শাসনকর্তা ভোজপুর জনপদ অভিযানে যথেষ্ট সময় ও তাঁহার সমস্ত টাকা ব্যয় করেন; জমিদারদের তাড়াইয়া দিয়া ও তাঁহাদের গৃহ দখল করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। যথোচিত ব্যবস্থা দ্বারা এত একাধিক ও মেহনতের সমস্ত ফল ভোগ করিতে যাইবেন ঠিক এই সময় বাঙ্গলায় গমনের আদেশ আসিল। এই আদেশ পাইয়া তিনি হতভম্ব ও অসন্তুষ্ট হইলেন। এখন তিনি ঐ সমুদয় কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হইলেন। কিরূপে তাঁহার সৈন্যদের বাকী বেতন শোধ করিবেন এবং কিরূপেই বা ইপ্সিত অভিযানের প্রয়োজনীয় লোকজন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবেন, তজ্জন্যও তিনি কম হতভম্ব হইলেন না। কয়েক দিন বিশ্রামের পর তিনি বাঙ্গলা অভিযানে নগর ত্যাগ করিলেন এবং পূর্ব দিকস্থ উপনগরে জাফর

খাঁর বাগানে শিবির স্থাপন করিলেন। সেখানে তিনি এই গরীবের পিতা হেদায়েৎ আলী খাঁ বাহাদুর ও অপর কয়েকজন বন্ধুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সৈন্যদের বাকী বেতন পরিশোধ ও ভাবী অভিযানের ব্যবস্থার উপায় সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা হইল। কিন্তু অর্থাভাবে ঐ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর হইল না। এমতাবস্থায় শাসনকর্তা কৌশলের সন্ধান করিতে বাধ্য হইলেন; তিনি একদা হেদায়েত আলী খাঁকে একটা নিভৃত কক্ষে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তাঁহার চাচা হইলেন তাঁহার পরিবারের সৌভাগ্যের মূল; তাঁহার সাহায্যে গমন অবশ্যই তাঁহার কর্তব্য; তৎপরতার সহিত বাঙ্গলায় গমনের উপর তাঁহার সুনাম নির্ভর করে। কিন্তু কিরূপে তিনি সৈন্যদলের বাকী বেতন শোধ করিবেন, বুঝিতে পারিতেছেন না। হালে বিজিত ও মোটের উপর বে-বন্দোবস্ত দেশ পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হওয়ায় তিনি উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছে: তাঁহার প্রস্থানের পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাহার উপর দেশ শাসন, রাজস্ব আদায় ও অধিবাসিদিগকে শান্ত রাখার গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার ন্যস্ত করিয়া যাইবেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি আরও বলিলেন," আমি আপনার জ্ঞান ও যোগ্যতার উপর ভরসা রাখি। যদি আপনি কোন উপায় উদ্ভাবন ও আমাকে আমার বিপদজাল হইতে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি নিতান্ত বাধিত থাকিব। কারণ, সৈন্যদের সন্তুষ্ট না করিলে তাহারা আমার সঙ্গে অভিযানে যাইবে না, আমাকে নগর ত্যাগ করিতেও দিবে না। পক্ষান্তরে আপনি জানেন যে, যিনি যুগপৎ আমার মনিব, চাকরির দিক দিয়া আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সর্বোপরি আমাদের সমগ্র পরিবার ও বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও মূল, জগতের চক্ষে এবং আমার আত্মীয় ও জ্ঞাতিদের চক্ষে সৈনিক হিসাবে আমার সম্মান ও কর্তব্যপরায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে আমার সুনাম নির্ভর করে যথোপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ সর্বপ্রকার তৎপরতার সহিত তাঁহার সাহায্যে গমনের উপর।" হেদায়েৎ আলী খাঁ উত্তর দিলেন, "তিনি নিজেকে তাঁহার ও তদীয় পরিবারের সর্বাপেক্ষা ভদ্র-লোকদের অন্যতম বলিয়া বিবেচনা

করেন। অবস্থার গুরুত্ব বোধে তিনি তাঁহার প্রতি যেরূপ আদেশ দিবেন, তিনি যথাসাধ্যভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন এবং তাঁহাকে তাঁহার দায়িত্বের যতটুকু অংশ প্রদান করিবেন, এই সংকটে তাহা পালন করিতে সমর্থ হইলে নিজেকে গর্বিত বোধ করিতেন। আশার এই ক্ষীর্ণ আলোকে সন্তুষ্ট হইয়া শাসনকর্তা উত্তর দিলেন," বর্তমানে মাত্র দুইটা ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছেন: প্রথমটা হইল সৈন্যদের বাকী পাওনা পরিশোধ। ইহা একটা ন্যায় বিচারের কাজ; এতভিন্ন সৈন্যেরা তাঁহাকে যাইতে দিবে না এবং ইহা ছাড়া কোন কিছুরই অগ্রগতি হইবে না। দ্বিতীয়টি হইল তাহাতে তিনি তাঁহার পদ ও মর্যাদার উপযোগী যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও যথেষ্ট পরিমাণ কামান লইয়া তাঁহার চাচা সুবাদারের সাহায্যে যাইতে সমর্থ হন, এরূপ যোগ্য ও বিশ্বাসী লোকের হাতে তাঁহার শাসনভার ন্যস্ত করিয়া যাওয়ার সমীচীনতা। এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব অনেক অসুবিধাজনক ছিল বলিয়া হেদায়েৎ আলী খাঁ উত্তর দিলেন, "তাঁহার সঙ্গতি কিরূপ সীমাবদ্ধ এবং সৈন্যদের বাকী বেতন পরিশোধের কাজের পক্ষে তাঁহার আয় কিরূপ অপর্যাপ্ত তৎসম্বন্ধে তিনি (শাসনকর্তা) বে-ওয়াকিফ থাকিতে পারেন না; এতদ্সত্ত্বেও তাঁহার উৎসাহী ভক্ত বলিয়া তাঁহার খেদমতের জন্য তিনি সবকিছু করিতে প্রস্তুত। তবে তিনি যথাসাধ্য যাহা করিতে পারেন, তাহা হইল ঐ বাকী বেতনের একাংশ প্রধান রাজস্ব প্রাপকদের বরাত দেওয়া, অপরাংশ ব্যক্তিগত দায়িত্বে শেঠ ও মহাজনদের নিকট হইতে কর্জ করা। এবং ইহার পরেও যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা নিজ হিসাবে নেওয়া এবং ঐ বিষয় সৈন্যদলের গোমস্তাদের সহিত মতৈক্যে পৌঁছিতে স্বীকার করা; তাহাদিগকে তিনি তাঁহাদের মধ্যে নির্ধারিত সময়ে তাহা প্রদান করিবেন। দেশের শান্তি ও অধিবাসীদের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের দায়িত্ব তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজে গ্রহণ করিবেন এবং কেহ গোলমাল বাধাইতে বা বিদ্রোহী হইতে দুঃসাহসী হইলে তিনি এজন্য দায়ী হইবেন।" এরূপ বক্তৃতায় শাসনকর্তা সন্তুষ্ট না হইয়া পারিলেন না। ইহাতে তাঁহার মন শান্ত হইল; তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ও নিশ্চিত করিয়া উত্তর দিলেন: "সৈন্যদের সন্তুষ্ট করা ও দেশ শান্ত রাখাই ছিল বরাবর

তাঁহার সর্বপ্রধান চিন্তা। এখন এবিষয়ে নিরুদ্বেগ হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বস্তি বোধ করিতেছেন। তিনি ভিন্ন আর কেহই ঐ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সসম্মানে সম্পাদন করিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ; কাজেই ইহা অর্পণের জন্য তিনি আর কাহারও উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না। কারণ ইহা বুঝা যাইতেছে যে, নাজুক সন্ধিক্ষণে তিনি ভিন্ন আর কেহ কোন গুরুত্বপূর্ণ খেদমত করিতে পারিবেন না। হেদায়েৎ আলী খাঁ অবস্থা ও উভয় বক্তার মর্যাদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া উত্তর দিয়া গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার ছোট ভাই ও সৈন্যদলের প্রধান বখশী মেহদী নেসার খাঁ এবং সৈন্যদলের কয়েক জন সেনাপতি ও সেনাবাহিনীর সমস্ত গোমস্তাকে ডাকাইয়া আনিয়া তিনি তাহাদের সমস্ত বাকী প্রাপ্য পরিশোধের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, কিন্তু এই বিপদকালে তাঁহারা তাঁহাদের শাসনকর্তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবেন ও তাঁহার বাঙ্গলা অভিযানে তাঁহার অনুগমন করিবেন বলিয়া তাঁহাদের অঙ্গীকার আদায় করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদের নিজ নিজ বাকী প্রাপ্য নিয়া আপন আপন রশিদ দানের জন্য তাঁহার নিকট তাঁহাদের গোমস্তা রাখিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করাইলেন। এই কঠিন কার্য শেষ হইলে শাসনকর্তা এখন নিশ্চিত মনে একটা শুভদিন নির্ধারিত করিয়া ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৬।৭ হাজার পদাতিক লইয়া বাঙ্গলা যাত্রা করিলেন। তাঁহার সমস্ত চক্ষু ও প্রিয় পাত্রকে ও তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন। প্রদেশের শাসনভার তিনি হেদায়েৎ আলী খাঁর হাতে রাখিয়া গেলেন। তাঁহাকে একটি মূল্যবান খেলাত দ্বারা ঐ পদে অভিষিক্ত করা হইল। তিনি আমার মাতুল মেহদী নেসার খাঁ ও আমার মাতামহের ভ্রাতা আবদুল আলী খাঁকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। আবদুল আলী খাঁ নিজের ব্যক্তিগত অর্থে তাঁহার সৈন্যদলের সমস্ত লোককে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গালায় গমনে অঙ্গীকারাবদ্ধ করান। পাঠকদের নিকট একথা বলা বিরক্তিকর হইবে না যে, তাঁহার যাত্রার অল্প পূর্বে এই আমীর তাঁহার জ্ঞাতি আলীবর্দী খাঁর নিকট হইতে আর এক খানা পত্র প্রাপ্ত হন। তাহাতে পূর্বের ন্যায় একই আমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু সুবাদার ইহার পার্শ্বে স্বহস্তে কবির এই রচনাটি লিখিয়া দেন ঃ

"আমাদের বন্ধুদের নিকট আমরা তাহাদের অনুরক্তির কিছুটা প্রমাণের প্রত্যাশা করি" যে দ্বিতীয় চরণটি শ্লোক পূর্ণ করিত, তাহা না লিখিয়া এখানে তিনি হঠাৎ থামিয়া যান। কিন্ত আমীরদ্বয় যখন এইরূপ অজস্র সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের খুল্লতাতকে তাঁহাদের সালাম দিতে গমন করেন, তখন তিনি আবদুল আলী খাঁকে আলিঙ্গন করিয়া শ্লোকটা সম্পূর্ণ করেন ঃ

"কিন্ত আমরা যাহা সন্দেহ করিতেছিলাম, দেখা গেল, তাহা অমূলক।" এইরূপ সাহায্যকারী সৈন্যদল সত্বেও সুবাদার আরও সৈন্য সমাবেশ করা প্রয়োজন মনে করিয়া তাঁহার সেনাপতিদের পরিচালিত কয়েকটি সৈন্যদলের সংখ্যাবৃদ্ধি করিলেন; তবে নব সংগৃহীত সৈন্যদিগকে তাহাদের গুণানুযায়ী বণ্টনের দিকে দৃষ্টি রাখা হইল। মুস্তফা খাঁর পাঁচ হাজারী সৈন্যদল আট হাজারে বৃদ্ধি করা হইল; তাঁহার মনসবও পাঁচ হাজার সওয়ারে উন্নীত করা হইলঃ তিনি যুদ্ধে ব্যাঘ্র[২৮] উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই সম্মানের সহিত একটা ঝালর যুক্ত পাল্কী ও একটা দামামা যোগ করা হইল। ফখরুল্লাহ বেগ খাঁ, নূরুল্লাহ খাঁ, হোসেন কুলী খাঁর ভ্রাতা হায়দর আলী খাঁ ও সুবাদারের আত্মীয় মীর জাফর খাঁকে 'বাহাদুর' উপাধি প্রদত্ত হইল। এই সম্মানের সঙ্গে তাঁহাদের স্ব স্ব সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া একটা অধিকতর বাস্তব সম্মান যোগ করা হইল। উচ্চতর বেতন এবং সম্মান ও সুখ্যাতির কয়েকটা নিদর্শন সহ এই শেষোক্ত সম্মান অনুরূপ ভাবে গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি বাহাদুর আলী খাঁ এবং আফগান কর্মচারী ওমর খাঁ, শমশের খাঁ ও সর্দার খাঁকে প্রদত্ত হইল। এই সমুদয় পূর্ব-সতর্কতা ভিন্ন কামান-রাজি প্রস্তুত, মেরামত ও ইহার কিছু পরিবর্তন করা হইল। যুগপৎ কয়েকটা রণ-হস্তীকে সুবাদারের হস্তীর সন্নিধানে ও সম্মুখে যাত্রা করিতে শিক্ষাদান করা হইল। সংক্ষেপে, যত আয়োজনের কথা কল্পনা করা সম্ভব, তাহার কিছুই বাদ পরিল না। আলীবর্দী খাঁ অধীরভাবে বর্ষাকালের সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই গুরুতর সঙ্কটকালে দিল্লী দরবারের জনৈক আমীর বাঙ্গলায় তাঁহার উপস্থিতি ঘোষণা করিলেন। ইহার নাম মুরাদ খাঁ; হালে বাঙ্গলার

রাজস্ব অনেক বাকী পড়িয়াছিল; ইনি তাহা চাপ দিয়া আদায় করিতে আসেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ও বাঙালায় প্রবেশ—দুইটিতেই সুবাদারের আপত্তি ছিল। তিনি তাঁহাকে আজিমাবাদে গতিরোধ করিয়া মারাঠা অভিযান শেষ করিতে না পারা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ইতাবসরে তিনি বাদশাহকে (মুহম্মদ শাহ্) লিখিলেন, "মারাঠা অভিযানে সম্পুর্ণ অসমর্থ হওয়ায় বর্তমানে নির্দিষ্ট নিয়মে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যের রাজস্ব পাঠাইবার সাধ্য নাই, একই কারণে তিনি মুরাদ খাঁ বাহাদুরকে মুর্শিদাবাদ (বর্তমানে রণাঙ্গণে পরিণত নগর) হইতে বিদায় দিতে ও মারাঠা লুণ্ঠন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে আজিমাবাদে আরাম করিতে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে আল্লার রহমতে তিনি আশা রাখেন যে, মহামান্য বাদশাহের ভাগ্যের জোরে তিনি ঐ দস্যুদের খুব শিক্ষা দিতে পারিবেন; এরূপ সঙ্কটপূর্ণ সময়ে যদি শাহানশাহ মেহেরবানী করিয়া তাঁহার নিজ চেষ্টায় সাহায্যের জন্য হুজুর হইতে কোন আমীর বা অপর কোন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন, তবে আরও ভাল হয়। কারণ, এই যুদ্ধে তাঁহার কোন ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিলে শত্রুরা দেশ দখল না করিয়া ছাড়িবে না এবং বাদশাহী খাজাঞ্চীখানা ও তোপখানা প্রধানতঃ বাঙ্গলার রাজস্ব ও শিল্পদ্রব্য হইতে সরবরাহ পায় বলিয়া এইগুলি তদ্বারা গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সাহায্য করা ও (বাঙ্গলার) ঘটনাবলী বাদশাহের চিন্তার খোরাকের নিতান্ত উপযুক্ত ও অত্যন্ত জরুরী গরজ: এগুলি এমন ধরনের যে, তাহা সমগ্র সাম্রাজ্যের মঙ্গলের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইবে"। বাদশাহ্ দরখাস্ত পাঠ করিয়া ও ইহার লিখিত বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে অবিসংবাদীরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া কেবল তাঁহার মন্ত্রীদের সঙ্গেই আলোচনা করিলেন না, আমীর খাঁ সুদুর ইলাহাবাদে তাঁহার সুবাদারিতে থাকিলেও ঐ আমীরের উপদেশও চাহিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার অনুরক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে এরূপ (উচ্চ) ধারণা থাকায় বাদশাহ স্বহস্তে তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলেন। প্রত্যুত্তরে আমীর খাঁ সন্দেহাতীত যোগ্যতার অধিকারী বলিয়া আলীবর্দী খাঁকে সাহায্য করার ঔচিত্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমস্ত মন্ত্রীর সহিত এক

মত হইলেন; সুতরাং বাদশাহ অযোধ্যা প্রদেশে সাদৎ খাঁর জামাতা ও উত্তরাধিকারী আবুল মনসুর খাঁকে স্বহস্তে একখানা পত্র লিখিলেন। ঐ সেনাপতির শাসিত জনপদ ছিল বাঙ্গলার সুবাদারের শাসিত অঞ্চলের সংলগ্ন। তিনি একটি উৎকৃষ্ট সৈন্যদল ও একটি উৎকৃষ্ট গোলোন্দাজ বাহিনীর মালিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাদশাহ্ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আলীবর্দী খাঁর সাহায্যে যাত্রা করার আদেশ পাঠাইলেন। তিনি আবুল মনসুর খাঁর যাত্রায় উৎসাহ দানের এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য আমীর খাঁকেও পত্র লিখিলেন। বালাজিরাও ছিলেন সমস্ত মারাঠা সৈন্য-দলের প্রধান সেনাপতি। তাঁহাকেও একখানা পত্র লিখিত হইল। তিনি তাঁহার উপর এই মর্মে আদেশ পাঠাইলেন: "বাদশাহী কোষাগার হইতে চৌথ বাবতে তাঁহাকে প্রদত্ত বিপুল অর্থ তাঁহার উপকারার্থ পাওনা হই-য়াছে; কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে রঘুজী ভেঁসলা বাঙ্গালায় সে উদ্ধত দস্যুদল পাঠাইয়াছে সেখানে তাহাদের লুঠনের দরুন এই টাকা পাইতে অনেক অসুবিধা হইতে পারে। কাজেই তাঁহার উচিত সেখানে গিয়া ঐ লুঠনকারিরা যাহাতে পুনরায় তাহাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশে বিরত থাকে, এমনভাবে তাহাদিগকে শায়েস্তা করা।"

বাদশাহ যখন সুবাদারকে পত্র লিখিতেছিলেন ও মারাঠা সেনাপতিকে উৎসাহিত করিতেছিলেন, আলীবর্দী খাঁ তখন বহুসংখ্যক কামানসহ এক বিরাট বাহিনী সমাবেশ করিতেছিলেন। সর্বশক্তিমান সাহায্যকারীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তিনি তাহার দুই জামাতা তাঁহার জ্ঞাতি আবদুল আলী খাঁ ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত বহু সংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তিসহ নগর ত্যাগ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজিস মুহম্মদ খাঁকে নগরের নায়েব ন্যাজিম নিযুক্ত করিয়া তিনি তাঁহাকে ঐ রাজধানী রক্ষার জন্য তাঁহার সৈন্যদলও যথেষ্ট সৈন্যসহ সেখানে রাখিয়া গেলেন। সুবাদার বর্ষাকালের শেষ ভাগে শহরতলী ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু মাটি তখনও সিক্ত এবং অজস্র খাল-নালা-নদী দ্বারা বিভক্ত; ভাস্করের সহিত যুদ্ধ করার জন্য তাঁহার এমনি আগ্রহ এবং ঐ বাঙ্গলা-উৎসন্নকারীদের বিতাড়িত করার জন্য তাঁহার এমনি স্থির প্রতিজ্ঞা। কয়েকদিনের যাত্রার পরে তিনি বাঞ্ছিত স্থানে উপনীত হইলেন। ইহা ছিল কাটোয়ার সম্মুখে ও উহা হইতে কেবল ভাগিরথী

দ্বারা বিচ্ছিন্ন; মুর্শিদাবাদও এই নদী তীরেই অবস্থিত। ভাস্কর পণ্ডিত নদীর অপর তীরে শিবির স্থাপন করেন; নদীর এই তীরেও তাঁহার সৈন্য ছিল; তাহারা আলীবর্দী খাঁর মুখোমুখি দাঁড়াইল। একাদিকক্রমে আট দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনী নদীর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি গোলা নিক্ষেপ করিল। ভাস্করের মূল বাহিনী ছিল নদীর অপর তীরে; তাঁহার পার্শ্বে ছিল ভাগিরথী ও সম্মুখে ক্ষুদ্রতর নদী অজয়। মীর হাবীব তাঁহার এত চমৎকার খেদমত করেন যে, তাঁহার একখানা এক মাস্তুলিয়া ক্ষুদ্র পোতও নদীর মধ্যভাগে নোঙ্গর করিয়া রহিয়াছিল; উহার কামানরাজি বঙ্গবাহিনীর পার্শ্বদেশে গোলা নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের নদী অতিক্রমের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই আলীবর্দী খাঁ তাঁহার সৈন্যদের এক অন্ধকার রাতে একটি তরণী-সেতুযোগে ভাগীরথী নদী উত্তীর্ণ হওয়ার আদেশ দান করিলেন। অতঃপর অনুরূপ আর একটি নৌকার সেতুর উপর দিয়া অজয় অতিক্রম করিয়া তাহাদের তৎক্ষণাৎ মারাঠা শিবিরে আপতিত হওয়ার কথা। অজয় হইতে বিস্তৃত ভাগিরথীর উভয় তীরস্থ জনপদ মারাঠামুক্ত থাকায় সুবাদার বড় বড় নৌকা দ্বারা একটি সেতু নির্মাণ করিয়া অনেকটা সহজে ও এক রাত্রির মধ্যে তাঁহার সমগ্র বাহিনী নদীর অপর তীরে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর সৈন্যের মধ্যবর্তী নৌকাগুলি এক এক বারে দুই একটা করিয়া নদীর ভাটিতে ছাড়িয়া দিয়া অজয়ের মুখে বিন্যস্ত করা হইল। ঘটনাক্রমে মারাঠারা তখন প্রগাঢ় নিদ্রামগ্ন (এবং তাহাদের ভাগ্যও তদ্রূপ) থাকায় কেহই নৌকাগুলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিল না; অথবা কেহ করিলেও মাঝিরা তাহা-দিগকে কোন একটা উত্তর দিয়া সরিয়া পড়িল। এইরূপ কৌশলে অজয়ে কতকগুলি নৌকা একত্র করা হইল; এগুলি ইহার উপর দিয়া একটা সেতু নির্মাণের কাজে আসিল। সূর্যোদয়ের অল্প পূর্বে মারাঠা শিবিরের প্রায় আধ ক্রোশ উজানে ইহা সম্পূর্ণ হইল। মারাঠারা এই দ্বৈত কৌশলের কোনই সংবাদ পাইল না, কিম্বা ইহার কোন্ একটা সম্পর্কে কোন সন্দেহ করিল না; কাজেই তাহারা কোন প্রকার বাধাদান করিল না। দ্বিতীয় সেতু সমাপ্ত হইলে আলীবর্দী খাঁ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে তাহাদের সৈন্য-

দল লইয়া নীরবে পদব্রজে উহা অতিক্রম করার আদেশ দান করিলেন। ইহারা হইলেন মুস্তফা খাঁ, শমশের খাঁ, উমর খাঁ, রহম খাঁ ও জাফর খাঁ। তিনি স্বয়ং সেতুর মাথায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে তৎপরতার সহিত নদীর অপর তীরে গমনের এবং শত্রুদিগকে বিস্ময়ের ঘোর কাটাইবার সময় না দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের উপর আপতিত হওয়ার জন্য পরামর্শ দান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহারা যখন যুদ্ধ করিবেন, তিনি তখন মূল বাহিনীসহ নদী অতিক্রম করিয়া শত্রুদিগকে ব্যূহ রচনা ও বিশৃঙ্খলার প্রতিকার সাধনের অবসর না দিয়া যথোচিত সময়ে তাঁহাদিগকে সাহায্যদান করিবেন। পরিকল্পনাটি ভালভাবে প্রস্তুত করা হয়; সৈন্যদলের সর্বাপেক্ষা সাহসী ও উৎসুক লোকেরা সেখান হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ইতিমধ্যে সেতু অতিক্রম করিতেছিল; এমন সময় এক অদৃষ্টপূর্ব দুর্ঘটনা ঘটিল; সেতুর মধ্যভাগের এক বা দুইখানা নৌকা ভাঙ্গিয়া গিয়া ডুবিয়া গেল। রাত্রি অন্ধকার বিধায় এবং সেতুর উপরস্থ লোকেরা অগ্রসর হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করায় পার্শ্বাদ্বর্তীরা বেখেয়ালে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া যাওয়ায় বিপুল সংখ্যক লোক পানিতে পড়িয়া অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর আবর্তে নিমগ্ন হইয়া গেল। বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ মতে ১৫০০, কাহারও কাহারও মতে আরও অনেক অধিক সাহসী লোক এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। এরূপ বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যুর পরে সেতুর ভাঙ্গতির কথা প্রকাশ পায়, এবং ইহা মেরামত করা হইয়াছে দেখিবার আশায় লোকে যে যেখানে ছিল, হঠাৎ গতিরোধ করে। আলীবর্দী খাঁর সরবরাহ ব্যবস্থা এত উত্তম ছিল যে, অন্যান্য নৌকা দ্বারা মুহূর্তে ভাঙ্গতি মেরামত করা হইল এবং সর্বাপেক্ষা উৎসুক ও সর্বাপেক্ষা সাহসী সৈন্যেরা আগ্রহভরে সেতু পার হইয়া গেল। রাত্র ভোর হইয়া আসিল, অথচ ২/৩ হাজার লোক মাত্র পার হইল। তাহারা একত্রে আলোচনা করিয়া স্থির করিল, যদি তাহারা শত্রুদিগকে তাহাদের সংখ্যা দেখিবার সময় দেয়, তবে ব্যাপার খারাব হইয়া দাঁড়াইতে পারে; পক্ষান্তরে তাহারা তৎক্ষণাৎ আপতিত হইলে আকস্মিক আক্রমণ হইতে সব কিছুই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। সাহসী সর্দারেরা স্বল্প

সেতু ভাঙ্গিয়া সুবাদারের বিপুল লোক ক্ষয়

আলোচনার পর তাঁহাদের ঢাল-তলোয়ার লইয়া একটি ক্ষুদ্র মুনাজাতঅন্তে পূর্ণবেগে ছুটিয়া মুহূর্তে শত্রু শিবিরে প্রবেশ করিলেন। অমনি আলীবর্দী খাঁ আসিয়াছেন বলিয়া চীৎকার উঠিল এবং সেই বিরাট মারাঠা বাহিনী আর কোন খোঁজ-খবর না লইয়াই তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া চতুর্দিকে পলাইয়া গেল। তখন যে সকল বীর পুরুষ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, তাঁহারা বজ্রের ন্যায় ধ্বংসকর ও আকস্মিক তরবারি দ্বারা তাহাদিগকে দলে দলে বধ ও তাহাদের শব দ্বারা ভূমি আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। আলীবর্দী খাঁ তাঁহার প্রমোদ-পোতে নদী উত্তীর্ণ হইয়া লোক পার করার জন্য সেগুলি ফেরত পাঠাইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে হাতী, কামান, ভারী কামান, গোলা প্রভৃতিও শত্রুর সহিত যুদ্ধোৎসুক বহু সংখ্যক সৈন্য এপাড়ে চলিয়া আসিল। তাহাদের সেনাপতি তাহাদের দ্বারা ব্যূহ রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যদের নাগাল পাইলেন এবং পশ্চাদ্ধাবন চালাইয়া বহু শত্রু সৈন্য নিহত করিলেন। মারাঠারা একজনে ঘোড়ার পিঠে যতটুকু মাল বহন করিতে পারে, ততটুকু মাত্র লইয়া অবশিষ্ট যেখানে ছিল, সেখানে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। তাহাদের যাবতীয় পশুও যাবতীয় শক্তিসহ অবিশ্রান্ত পালাইয়া যাইতে লাগিল, কখনও পিছনে ফিরিয়া চাহিল না কিম্বা শত্রুদের স্বল্প সংখ্যা ও তাহাদের বিশৃঙ্খলার প্রতিও দৃক্‌পাত করিল না। অনেকটা স্থান দৌড়াইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনকারীদিগকে পশ্চাতে ফেলিবার পর তাহাদের কিছু লোক নিশ্বাস গ্রহণের সময় পাইল; তখন তাহারা পশ্চাতে ফিরিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনকারীদিগকে সংখ্যায় অল্প দেখিয়া পুনরায় বিপরীত দিকে ফিরিল এবং প্রায় এক মাইল আগাইয়া আসিয়া খণ্ডযুদ্ধ বাঁধাইল; এমন সময় তাহারা দেখিল, আলীবর্দী খাঁ তাঁহার সমগ্র সৈন্যদল ও কামান গোলা ইত্যাদি লইয়া পূর্ণগতিতে অগ্রসর হইয়াছেন; কাজেই তাহারা আর না দাঁড়াইয়া পিঠ ফিরাইয়া পলাইয়া যাইতে লাগিল।

মারাঠাদের কঠোর দণ্ড

পুলের উপরে যে সকল দুর্ভাগ্য লোক দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়, তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে তাহাদের বন্ধু ও আত্মীয়দের দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া ইহার পরিণাম অত্যন্ত গুরুতর হইতে পারিত। তজ্জন্য আলীবর্দী

খাঁ এই জয়লাভকে আল্লাহ্তালার বিশেষ অনুগ্রহের ফল বলিয়া ধরিয়া লইলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সৈন্যদের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিয়া সেদিনের জন্য মারাঠা শিবিরে অবস্থান করিলেন। নদীতে নিমজ্জিত মৃতদেহগুলি টানিয়া তুলিয়া উহাদের অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া শরিয়ৎ-মুতাবিক ধৌত ও পবিত্র করিয়া কবরস্থ করা হইল। দেখা গেল যে, সেগুলির চেহারা নীল হইয়া গিয়াছে, বর্ষান্তের অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া নিঃসন্দেহে ইহার কারণ। তদুপরি হত ভাগ্য লোকগুলি অস্ত্রশস্ত্র ও বস্ত্রের দরুন ঋজু হইয়া থাকায় তাহাদের এক প্রকারের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ ও শ্বাসরোধ ঘটে। ১১৫৫ হিজরীর শাবান মাসে এই বিখ্যাত জয়লাভ হয়। ভাস্কর পণ্ডিত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন মনে করিয়া পাচেট অঞ্চলের উপত্যকাসমূহে গমন করিলেন; তাঁহার সৈন্যেরা চরম আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলার সহিত হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জিলা এবং তাহাদের অধিকৃত অন্য সমস্ত জনপদ খালি করিয়া দিল। তাহারা সর্বত্র পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া আলীবর্দী খাঁ একটি দিনও বিশ্রাম না করিয়া সর্বত্র তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুদের উৎসাহে ভীত হইয়া ভাস্কর হঠাৎ একটা কণ্টকগুল্ম ও কণ্টকাকীর্ণ মৃত্তিকাপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাদ্ধাবন-কারীরা কদাচিৎ পলাতকদের ৬।৭ ক্রোশ পশ্চাতে ছিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই উভয় পক্ষ সর্প ও বড় বড় লালপিপড়া পূর্ণ বনভূমিতে উপস্থিত হইল। উহা এত অবিশ্বাস্যরূপে লম্বা লম্বা গাছ ও গুল্মাদিপূর্ণ ছিল যে, অরণ্যের কোন অংশেই দুইজন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলিতে পারিত না। এত গভীর বনে তাঁহাদের নিজ নিজ সৈন্যেরা কোথায়, তাহা জানিতে পারা কর্মচারীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই শত্রুর সংবাদ পাওয়া দূরের কথা, এরূপ কঠিন স্থানের ভিতর দিয়া ভাস্কর নিজসীমান্তে গমনের পথ বাহির করিতে না পারিয়া এবং পশ্চাদগামী এরূপ শত্রুকে কিভাবে শিক্ষা দিবেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যাত্রার ব্যবস্থাটি হাবীবের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ সুযোগ্য সেনাপতি তাঁহাকে বিষ্ণুপুরের অরণ্যে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলেন; সেখান হইতে তিনি চন্দ্রকোনার প্রান্তরের মধ্যদিয়া অগ্রসর হইয়া অবশেষে মেদিনী-

পুরের নিকটে বাহির হইলেন। সেখান হইতে তিনি উড়িষ্যায় শাহ মাসুমের বিরোধিতা করিতে সৈন্য পাঠাইলেন। ঐ সেনাপতি মুষ্টিমেয় লোক লইয়া হরিহরপুরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্বলতা অবগত হইয়া তাহারা কয়েকবার তাহাকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দান করিল। তিনি প্রতি বারেই তাহা প্রত্যাখ্যান করায় তাহারা তাঁহার উপর আপতিত হইল। ফলে ঐ সাহসী কর্মচারীটি নিছক তাঁহার সম্মান জ্ঞান ও বিশ্বস্ততার বশে তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ তাঁহার বাসস্থানের বাহিরে আসিয়া একটা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সর্বোচ্চক্রেতার নিকট নিজের প্রাণ বিক্রয় করিয়া বীরের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

ইতিমধ্যে আলীবর্দী খাঁ জানিতে পারিলেন যে, মারাঠারা তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া মেদিনীপুরে হাজির হইয়াছে। কাজেই তিনি সেই দুর্গম জনপদ হইতে পশ্চাদ্বর্তন করিলেন এবং সমগ্র বর্ধমান অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া অগ্রসর হইলেন। এরূপ তৎপরতা ও অধ্যবসায় মারাঠা সেনাপতির আতঙ্ক বৃদ্ধি না করিয়া পারিল না। কাটোয়ার আতঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ না করিতেই তিনি পুনরায় মেদিনীপুর হইতে বালাসোর বন্দরে (বালাসোর) পলায়ন করিলেন। সুবাদার কোন বিশ্রাম গ্রহণ না করিয়াই পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখায় এযাবতকাল তিনি তাঁহার অনুসরণকারীদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এত অধিক একগুয়েমিতে বিরক্ত হইয়া মারাঠারা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার তাহাদের ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিল। তুমুল যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু-সাহসী লোক গতায়ু হইল, কিন্তু ভাস্করের পক্ষেই ক্ষতি হইল বেশী। তাঁহার বিপদ বাড়িয়াছে দেখিয়া তিনি পুনরায় পলায়ন করিলেন; বঙ্গবাহিনীর সর্বাপেক্ষা সাহসী ও উৎকৃষ্ট সওয়ারেরা তখনও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিল। সুবাদার মূল বাহিনী ও পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিতে পারে, এরূপ বড় বড় কামানের বহর লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন। অবস্থা এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, প্রায়শঃ কর্তিত ও তৎপরে অবিশ্রান্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া এবং প্রায়ই শত্রুর প্রচণ্ড আঘাত খাইয়া মারাঠারা ভগ্ন-সাহস হইয়া পড়িল; তাঁহাদিগকে ঘুরাইয়া দাঁড়

করাইতে বা আধ ঘন্টার জন্য অবিচলিত রাখিতে পারা যাইতেছিল না। কাজেই তাহাদের সেনাপতি অবিশ্রান্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিয়া উড়িষ্যার শেষ সীমায় পৌঁছিলেন, এমনকি দাক্ষিণাত্যের সীমান্তের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। সুতরাং সুবাদার চিল্কাহ্রদ পর্যন্ত অনুসরণ চালাইয়া তাঁহার সম্মুখে কোন শত্রু, এমনকি তাহাদের পশ্চাদ্বর্তীদেরও কোন নিদর্শন না দেখিয়া গৌরবমণ্ডিত হইয়া কটকে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে তিনি শাহ্ মাসুমের সাহসিক ও বিশ্বস্ত খেদমতের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পরিবারদের আনয়ন করাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনাদান ও তাঁহাদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করিলেন। সেই সাহসী ব্যক্তির পদ মুস্তফা খাঁর খুল্লতাত আবদুন্নবী খাঁকে প্রদত্ত হইল। তাঁহার সুপারিশে তদীয় মনসব তিন হাজার সওয়ারে উন্নীত করা হইল। এই মর্যাদার সহিত তাঁহার সৈন্যদলের কার্যকরী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে একটা দামামা, একটা ঝালরযুক্ত পাল্কী ও 'বাহাদুর' উপাধি প্রদত্ত হইল। কিছু সংখ্যক অন্য সৈন্য-ও তাঁহার সেবা করিতে আদিষ্ট হইল। শত্রুর গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি কঠোর আদেশ পাইলেন। এই কর্মচারীটি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের আমন্ত্রণে নিজের ও তাঁহার পূর্বপুরুষদের বাসস্থান সামানা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বজাতির দ্বারা গঠিত ও তাঁহার নিজ পরিবারের লোক দ্বারা পরিচালিত একদল উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া বর্ধমান যুদ্ধের অল্প পরে (বঙ্গ) বাহিনীতে যোগদান করেন; বর্ধমানে তিনি সুবাদারের চাকরী করার প্রস্তাব দেন। তাঁহার সৈন্যদলে অন্ততঃ ৫০০০ লোক ছিল; তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিতে আদিষ্ট হয়; তৎসঙ্গে একদল বন্দুকচী এবং স্থানকাল অনুযায়ী যত দরকার মনে হয়, এত কামান-গোলা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংযোগ করা হয়। কিন্তু লোকটা ছিলেন রুক্ষ সৈনিক, শাসনকার্যের কিছু বুঝিতেন না বলিলেই হয়; তজ্জন্য প্রথম মন্ত্রী জানকীরামের পুত্র দুর্লভ রাম তাঁহার পেশকার উপাধিতে ঐ কার্য সম্পাদনে আদিষ্ট হইলেন।

এই সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া যাওয়ার পরে আবুল মনসুর খাঁর আজিমাবাদে উপস্থিতি ও তাঁহার কয়েকটা অনুপকারী কার্যের সংবাদ আসিল: তিনি কিছু ত্যাগ না করিলে এগুলির প্রতিকারের দরকার হইয়া

পড়িয়াছিল। এরূপ সংবাদ সুবাদারের কটক পরিত্যাগ ত্বরান্বিত করায় তিনি দেশ ও উহার অধিবাসীদিগকে নূতন শাসনকর্তার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করিলেন এবং তাঁহার কানে সদুপদেশের দুইটা কর্ণাভরণ পরাইয়া দিয়া মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তনে যাত্রা করিলেন তাঁহার দুই জামাতা, বন্ধুবর্গ ও অবশিষ্ট সৈন্যগণকে তিনি সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তিনি মেদিনীপুর ও বর্ধমান পর্যটন করিলেন; শেষোক্ত স্থানে তিনি আবুল মনসুর খাঁর তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইলেন। আলীবর্দী খাঁ যখন তাঁহাকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছিলেন, ঠিক তখনি এই সংবাদ আসিল। ঐ ছদ্মবেশী সাহায্যকারীর ব্যবহার তাঁহার মনে এমন দাগ কাটে যে, কয়েকদিন পূর্বে তিনি মুস্তফা খাঁকে এই প্রশ্ন করেন: তিনি বলেন, সেনাপতি! আপনি শুনিতে পাইতেছেন যে, অযোধ্যার সুবাদার অনেকটা শত্রুর ন্যায় কাজ করিতেছেন। তিনি যেমন স্বগৃহে আছেন এরূপ নাম মাত্র শিষ্টাচার বিধির সহিত আমার দেশের সবকিছু বিলি করিতেছেন। তাঁহাকে তাঁহার রীতিনীতি বদলাইতে বাধ্য করা দরকার হইলে আমাদিগকে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে? মারাঠারা আমাকে যথেষ্ট কাজ যোগাইয়া থাকেন এ কথা স্মরণ রাখা দরকার।'' সেনাপতি ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, ইহাতে বিশেষ মাথা ঘামাইবার মত কোন কিছু আছে বলিয়া আমি দেখিতেছি না; "হুজুর, এই লোকটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলুন। তিনি বলিয়া চলিলেন, "আর আমাকে অন্যের পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতে দিন। তাহাকে যে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে, তদ্বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন।'' সুবাদার যখন এই উত্তরের উপর চিন্তা করিতেছিলেন, তখন সংবাদ আসিল যে, মারাঠা প্রধান সেনাপতি বালাজিরাও বাদশাহের আদেশে বাঙ্গলার সাহায্যে যাত্রা করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে অল্প কয়েক দিনের পথ দূরে পৌঁছিয়াছেন। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি যাত্রা করিলেন; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রাসাদে অবতরণ করিতে না করিতেই তিনি পুনরায় উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন।

ইতোমধ্যে মারাঠাদের উপর জয়লাভের সংবাদ বাদশাহী দরবারে পৌঁছিলে বাদশাহ সুবাদারের আচরণে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হিস্‌সামুল

মুল্‌ক উপাধি দিয়া স্বহস্তে প্রশংসাপূর্ণ একখানা পত্র লিখিলেন : এই অনুগ্রহের সহিত একখানা মূল্যবান তরবারি, একখানা ছোরা, একটি সরপেচ ও জিক্কা এবং বৃহৎ মুক্তার একটি মালা উপহার দিলেন। এই সকল সম্মানেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি তাঁহাকে নিজ পরিধানের একটা আস্ত পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন। যুগপৎ তিনি তাঁহার প্রেরিত দরখাস্তও মঞ্জুর করিলেন এবং তাঁহার পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তিবর্গকে নূতন উপাধি ও নূতন সম্মান দান করিলেন। নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁ ইতঃপূর্বে 'যুদ্ধ সাহসী' উপাধি ভোগ করিতেন; এখন তাঁহাকে 'সাম্রাজ্যের মাননীয়' উপাধিতে ভূষিত করা হইল; সয়্যিদ আহমদ খাঁ ছিলেন পূর্বে 'যুদ্ধে প্রচণ্ড'; এখন তিনি 'সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়' বলিয়া বিঘোষিত হইলেন; জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁ ছিলেন পূর্বে যুদ্ধে গৌরবান্বিত; তিনি হইলেন 'রাষ্ট্রের সম্মান',। যুগপৎ আতাউল্লাহ্ খাঁকে 'সাম্রাজ্যের সম্মানিত' ও মুস্তফা খাঁকে 'বাহাদুর' উপাধি প্রদত্ত হইল; মুস্তফা খাঁ তিন হাজারী মনসবদারীরও সনদ পাইলেন।

কিন্তু আমরা আজিমাবাদে আবুল মনসুর খাঁর বেজায় অসঙ্গত আচরণের আভাস মাত্র দিয়াছি বলিয়া ঐ বিষয় অধিকতর পরিপূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা আমাদের কর্তব্য। ঐ নগরে তাঁহার উপস্থিতি ঘটে ১১৫৫ হিজরীর শওয়ালের প্রায় প্রারম্ভে এবং তাঁহার বিদায় পরবর্তী মাসের শেষভাগে—আলীবর্দী খাঁ যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত কোন শত্রু দেখিতে না পাইয়া চিল্কা হ্রদে পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করিয়া বিজয়ী বেশে কটকে প্রত্যাবর্তন করেন, প্রায় ঠিক সে সময়ে; সেখানে তিনি আজিমাবাদ হইতে ঐ সকল পত্র প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাহার বিরক্তির উদ্রেক হয়। তিনি যখন ইতিপূর্বেই মুর্শিদাবাদের নিকটে উপস্থিত হন, তখন ঐ নগরীর উপকণ্ঠের বিপরীত দিকে দুইটি মারাঠা বাহিনী দেখা দেয়; উহাদের একটির নেতা রঘুজী ভোঁসলা আসেন বাঙ্গলা লুণ্ঠন করিতে, অপরটির নেতা প্রধান সেনাপতি বালাজি ঐ দেশ রক্ষা ও সাহায্য করিতে আদিষ্ট হন। তথাপি একটির ন্যায় আর একটিও ছিল পূর্ণ বিপজ্জনক। ইহা ঘটে ১১৫৬ হিজরীতে। এরূপ সন্ধিক্ষণে যাহারা আমাদের পরিবারের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়, তাহারা আমার সম্মানিত জনক ও আবুল মনসুর খাঁর সম্পর্কের প্রকৃতিতে শঙ্কারাজনক অলোকপাত

করিবার সুযোগ লাভ করে। সময়ের তাকিদে তিনি যে যৎসামান্য পরিচয় করিতে বাধ্য হন, তাহাই আলীবর্দী খাঁর শ্রবণ সীমার মধ্যে বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিহারের শাসনকর্তার সাক্ষাতে অপরাধে পরিণত করা হয়। এরূপ দোষারোপ ঐ সকল বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এযাবত যে ঘনিষ্টতা বিদ্যমান ছিল, তাহার অবসান না ঘটাইয়া এবং প্রীতি ও অনুরক্তির ভাবকে পারস্পরিক বিরক্তি ও অন্তর্জ্বালায় পরিবর্তিত না করিয়া পারে নাই। এই ভুল বুঝাবুঝি ঘটে নিম্নলিখিতরূপে ; বর্ষাকাল শেষ হইবামাত্র আর্দ্র রাস্তাগুলি শুকাইতে আরম্ভ করিলে আবুল মনসুর খাঁ তাঁহার রাজধানী অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া আজিমাবাদের অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি উৎকৃষ্ট অশ্বারূঢ় ও সুসজ্জিত সুস্থসবল প্রায় ১০০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ মোগলের সমবায়ে গঠিত একটা অত্যন্ত বিশিষ্ট বাহিনী পরিচালনা করিতেছিলেন। মোগলদের সকলেই ছিল উত্তমরূপে অস্ত্রসজ্জিত ও সকলেই তাহাদের স্বদেশী অশ্বে উত্তমরূপে আরূঢ়। ইহাদের অধিকাংশই ছিল নাদির শাহের বাহিনীর দলত্যাগী সৈন্য ও সকলেই দীর্ঘ যাত্রায় ও পৌনঃপৌনিক সফলতায় অভ্যস্ত। তদুপরি ছিল তাঁহার সুব্যবস্থিত অজস্র কামান-গোলা ; এগুলির পশ্চাতে ছিল বাঞ্ছনীয় প্রত্যেকটা দ্রব্যসজ্জিত একটা শিবির।[১৯] যাত্রার প্রাক্কালে তিনি ইলাহাবাদের শাসনকর্তা এবং তাঁহার বন্ধু ও মুরুব্বী আমীর খাঁকে এই মর্মে পত্র লিখিলেনঃ "আপনার বিনীত বন্ধু মহামান্য বাদশাহের বিশেষ আদেশে এবং আপনার নিজস্ব উপদেশ ও অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া মারাঠাদের চাপে পিষ্ট বাঙ্গলায় সুবাদারের সাহায্যার্থে গমন করিতেছেন। কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে যতদূর দেখা যায়, এরূপ অভিযান নানা প্রকার অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইবে ; পক্ষান্তরে ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, আমার সুবা অবিশ্রান্ত বিদ্রোহ ও অশান্তির দৃশ্য এবং অবাধ্যতাও স্বাধীনতায় অভ্যস্ত জমিদারদের দ্বারা পরিপূর্ণ ; তাঁহাদের অবাধ্য ঘাড় নোয়াইতে নিয়ত দৃঢ়হস্তের প্রয়োজনে। আমার অবস্থা যাত্রাতেই বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; আমি আমার স্ত্রী-পরিবার তাঁহাদের মধ্যে রাখিয়া যাইতে পারি না। ভদ্রভাবে নিজের সঙ্গেও নিতে পারি না ; আমার দখলে

বাঙ্গলার সুবাদারের সাহায্যার্থে আবুল মনসুর খাঁর যাত্রা

বা আমার আশেপাশে এমন কোন আশ্রয়স্থানও দেখিনা, যেখানে তাহাদের নিরাপদে রাখিয়া যাইতে পারি। অতএব আপনার বিনীত-ভৃত্যের আরজ আপনি তাহাকে চুনার দুর্গ দিয়া অনুগৃহীত করুন। এই অনুগ্রহের পরে আপনার বিনীত-প্রার্থী এই দুইটি নাজুক বিষয় সম্পর্কে তাঁহার মনে নিশ্চিন্ত হইয়া প্রশান্তচিত্তে তাঁহার অভিযানে অগ্রসর হইবেন।" ঐ পত্রপাঠে আমীর খাঁ অনুরোধ পালন করিলেন এবং আবুল মনসুর খাঁকে চুনারের শাসনকর্তার সনদ পাঠাইয়া তাঁহার নিজস্ব শাসনকর্তাকে স্থানটি খালি করিয়া দিয়া তাঁহাকে উহা সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। এরূপ পরিচয়-পত্র পাইয়া আবুল মনসুর খাঁ বেনারসকে গঙ্গার উপরে একটি তরণী-সেতু স্থাপন করিলেন এবং নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার সমগ্র পরিবারসহ চুনার দুর্গ [২০] দর্শনে গমন করিয়া উহার তারিফ করিলেন। অতঃপর তিনি তন্মধ্যে একটি রক্ষী সৈন্যদল ও নিজস্ব শাসনকর্তা রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী-পরিবারসহ আজিমাবাদের দিকে পথ পর্যটন করিতে লাগিলেন; আজিমাবাদে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে চুনারে ফেরত পাঠান ছিল তাহার উদ্দেশ্য। তাঁহার যাত্রা ছিল তুল্য যুদ্ধপ্রিয় ও সম্ভ্রমব্যঞ্জক। এই গরীবের পিতা সয়্যিদ হেদায়েৎ আলী খাঁ ছিলেন তখন আজিমাবাদ প্রদেশের সহকারী শাসন-কর্তা; সেখানে তিনি তাঁহার মনিব জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁর নিকট হইতে অচিরে এই মর্মে একখানা পত্র পাইলেন, "'যুদ্ধে প্রচণ্ড' আবুল মনসুর খাঁ বাদশাহী দরবার কর্তৃক 'যুদ্ধে অদম্য', 'রাষ্ট্রের নির্ভিক' ও 'সাম্রাজ্যের তরবারির' সাহায্যে আনিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। ঐ সেনাপতি নগরের নিকট আসিবামাত্র আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা, সৎকার, সাদর-সম্ভাষণ ও অনুগৃহীত করিবার জন্য যাহা-কিছু সঙ্গত মনে করিবেন, সবই করিবেন; তিনি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এমন কিছুই যেন না ঘটে।"

আবুল মনসুর খাঁ নিকটবর্তী হইতে থাকিলে আজিমাবাদের সমস্ত লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। নাদির শাহের সৈন্যদলের এই সমুদয় পলাতক—তাহাদের অবাধ্যতা ও ভীষণতার জন্য তদঞ্চলের সর্বত্র যে কুখ্যাতি অর্জন করে, তাহারা উহাকে ভয় করিত। তাহাদের এই বৈশিষ্ট্য এত সুপরিচিত

ছিল যে, নাগরিকেরা যেন শেষ বিচারের জন্য আহুত হইয়াছে, এইরূপ ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়িল। শাহজাহানাবাদের সাধারণ হত্যাকাণ্ডে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুরতার কথা তাহাদের কর্ণগোচর হয়; তাহারা জানিত যে, তাহাদের সহকারী শাসনকর্তা তাঁহার পদ ও মর্যাদার উপযোগী একদল সৈন্য দ্বারা সজ্জিত হইলেও কিছুতেই এরূপ অদম্য অতিথির সহিত প্রতিযোগিতা করার সমকক্ষ ছিলেন না। যে অসংযত সৈন্যদল তাঁহার সঙ্গে আসে, তাহাদের প্রচণ্ডতা ও দৃঢ়চিত্ততা সম্পর্কে তাহারা সর্বোচ্চ অভিমত পোষণ করিত। ঐ সেনাপতির সহিত ন্যূনতম সম্পর্কও না থাকায় সহকারী শাসনকর্তা নিজেও এই ব্যাপারে ভয়শূন্য ছিলেন না। নিজের আত্মসম্মান রক্ষার তাকিদে তিনি কোন মধ্যস্থের সন্ধান করা তাঁহার নিকট সঙ্গত বোধ হইল। তাঁহার সৌভাগ্যবশত এখন তাঁহার মনে পড়িল যে, দরবার হইতে প্রেরিত ও আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক আজিমাবাদে নির্বাসিত আমীর মুরাদ খাঁ আমার সম্মানিত জনকের ন্যায় তেবতেবারী গোত্রের সয়্যিদ; এই ঘটনার দরুন অচিরে যে পরিচয় ঘটে, তৎফলে অনেক পত্র লেখালেখি ও তৎপরে সুদৃঢ় ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি ছিলেন নিজে বাদশাহের একজন আমীর এবং দিল্লীতে আবুল মনসুর খাঁর একজন বড় বন্ধু; সুতরাং আমার পিতা তাঁহাকে আবুল মনসুর খাঁর সহিত পরিচয়কারী ও মধ্যস্থ রূপে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া মনে করিলেন। সুতরাং তিনি মুরাদ খাঁর নিকট অস্পষ্ট ও পরোক্ষভাবে তাঁহার ভয়ের কথা ব্যক্ত করিলেন। এই আমীর ঐ বিষয়ে তাঁহার মন শান্ত করিয়া নিজের উপর তাঁহাকে ঐ সেনাপতির সহিত পরিচিত করাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ঐ অভিপ্রায়ে তিনি নগর ত্যাগ করিয়া নবাগতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাঁহার শিবির হইতে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি আমার পিতাকে ইহা জানাইবার জন্য পত্র লিখিলেন যে, তিনি অবশ্যই নির্ভয়ে এবং যে বিষয়ে এত অধিক ভয় করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্র অস্বস্তি বোধ না করিয়া আসিতে পারেন। এই পত্রের সঙ্গে স্বয়ং সেনাপতির নিকট হইতেও আর একখানা পত্র ছিল। ইহা ছিল সদয় বাক্যপূর্ণ ও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষজ্ঞাপক। এই সকল পত্র দ্বারা উৎসাহিত হইয়া

সহকারী শাসনকর্তা মোনির পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন; সেনাপতির গমন কালে তিনি সেখানে তাঁহার প্রতিসম্মান প্রদর্শন করিলেন। সেনাপতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া অত্যন্ত-দয়া ও সদাশয়তার সহিত কথাবার্তা বলিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার অনুচরবর্গসহ আজিমাবাদে আসিলেন। সেখানে আবুল মনসুর খাঁর একটা প্রাথমিক আদেশই হইল শাসনকর্তা জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁর প্রত্যেকটি বস্তু ও প্রত্যেকটা লোক দুর্গ হইতে বাহির করিয়া নেওয়া। (দুর্গ) দ্বারগুলির দখল লওয়ার জন্য তিনি ইতঃপূর্বেই একদল মোগল প্রহরী প্রেরণ করেন। ফলে শাসনকর্তার বাসা হইতে কোন কিছু বাহিরে আনয়ন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি রাত হইলে আমার পিতা কতিপয় বিশ্বস্ত লোকসহ আমাকে সেখানে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তাঁহার প্রভুর আসবাব ও জিনিসপত্র একস্থানে জড় করার ব্যবস্থা করিল; সেখান হইতে তাহারা সেগুলি নীরবে ও সাবধানে দুর্গের বাহিরে এ উদ্দেশ্যে রক্ষিত একটা গৃহে বহিয়া নিল। কিন্তু সেখান হইতে সেগুলি পুনরায় আরও দূরে আমাদের বাসার নিকটে একটী গৃহে বহন করিয়া নেওয়ার দরকার হইল; এখানে সেগুলি নিরাপদে রহিল। পরদিন আবুল মনসুর খাঁ ধুমধামের সহিত আজিমাবাদে প্রবেশ করিলেন এবং কোথাও না থামিয়া দুর্গে গমন করিলেন; ইহা সামান্য পরিদর্শনের পর তিনি সেখানে নিজের কিছু লোক রাখিয়া তাঁহার মাতুলের সমাধি (সাদৎ খাঁর পিতার নামে পরিচিত স্মৃতিস্তম্ভ) জেয়ারত করিতে গমন করিলেন। ধর্মনিষ্ঠার সহিত স্থানটি পরিদর্শন ও একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা উচ্চারণের পর তিনি বাকীপুরে স্থাপিত তাঁহার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমস্ত সরকারী কর্মচারী, দফতরের প্রধান কর্মকর্তা এবং সমস্ত মনসবদার, জমিদার, জায়-গীরদার ও নগরের সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তি সেখানে তাঁহার অনুগমন করিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে নজর দেন ও তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্র গণ্যদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাঁহারা লক্ষ্য রাখিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত গর্বিত ও দাম্ভিক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ভক্তি গ্রহণ করিলেন না বলিলেই হয়; তাঁহাদের মধ্যে নিম্নতম ব্যক্তির প্রতি যতটুকু মনোযোগ দিলেন,

আবুল মনসুর খাঁর উদ্ধত ব্যবহার

সর্বোচ্চ ব্যক্তির প্রতি তদপেক্ষা অধিক দেখাইলেন না। এই ঘৃণিত ব্যবহারে দর্শকদের প্রত্যেকেই এই দর্শনের সাফল্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শাসনকর্তার সঙ্গেও তিনি কম গর্বিত ব্যবহার করিলেন না। আজিমাবাদে তখন সম্পূর্ণরূপে সুশিক্ষিত কয়েকটা রণ-হস্তী ছিল; মারাঠাদের বিরুদ্ধে সংস্থান হিসাবে শাসনকর্তা সেগুলি সেখানে রাখিয়া দেন। আবুল মনস্থর খাঁ উহাদের সংবাদ পাইবামাত্র আমার মাননীয় পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার নির্ধারিত মূল্যে ঐ জন্তুগুলি তাঁহার নিকট হস্তান্তরের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। হেদায়েৎ আলী খাঁ ঠিক এই ভাষায় উত্তর দিলেন: "প্রভো আমার, আমার মনিব সওদাগর নহেন, আপনার এই গোলামও দোকানদার নহেন; আপনি একজন পরাক্রান্ত আমীর ও সেনাপতি এবং আমার প্রভুও সেনাপতি। তদুপরি আপনার ও তাঁহার মধ্যে এত অধিক সম্পর্ক ও ঐক্য আছে যে, এরূপ দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি পরস্পরের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইতে পারেন, এরূপ মনে করা ক্ষতিকর হইবে। অবশ্য যাহা তাঁহার সম্পত্তি, তাহা তাঁহার বন্ধুরও। সুতরাং হুজুর যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার ভৃত্য হিসাবে আমি তাঁহার স্পষ্ট আদেশ ব্যতিরেকে কিছুই দিতে পারি নাই।" এই বক্তৃতার কোনই সম্মান রক্ষিত হইল না। তিন, চারিটি হস্তী ও তিন, চারিটি কামানের ন্যায় এত সামান্য বস্তুর উপর লুব্ধ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া আবুল মনস্থর খাঁ তাঁহার নিজের লোক দ্বারা সেগুলি আনয়ন করাইয়া নিজের শিবিরে রাখিয়া দিলেন। এবম্বিধ কার্যাবলীর সংবাদ মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলে আলীবর্দী খাঁ এত অধিক অসন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ আগমনে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়া এবং তাঁহার পক্ষে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করাই ভাল হইবে বলিয়া যথোপযুক্ত ভাষায় এক পত্র লিখিলেন। তিনি বাদশাহের নিকটও এই মর্মে এক দরখাস্ত পাঠাইলেন: "আল্লাহর রহমতে ও মহামান্য বাদশাহের প্রসাদে তাঁহার ভৃত্য কি করিতে পারেন, তাহা দেখাইবেন বলিয়া তাঁহার এরূপ সাহায্যকারীর দরকার নাই; এরূপ সাহায্যকারী ও তাঁহার—তদীয় বিশ্বস্ত ভৃত্যের মধ্যে কখনও কোন আন্তরিকতা স্থাপিত হইতে পারে না

বলিয়া তিনি আশা করেন যে, আবুল মনসুর খাঁকে তাঁহার নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রদত্ত হইবে।" এই বিষয় অবগত হইয়া বাদশাহ্ আবুল মনসুর খাঁকে স্বপদে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন; ঐ সেনাপতির গোমস্তার নিকট পত্র দানের সময় তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তাঁহার মনিব ইহা পাওয়া মাত্রই যাত্রা করিলে সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু রাজধানী হইতে এই আদেশ আসিবার পূর্বেই আবুল মনসুর খাঁ ইহার বিষয়বস্তু ও বাদশাহের মনে আলীবর্দী খাঁর আবেদনের ক্রিয়ার কথা জানিতে পারিলেন। একই সূত্রে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, বাদশাহের নিজ আদেশে বালাজি রাও যাত্রারম্ভ করিতেছেন এবং তাঁহার বাঙ্গলা অভিযানে অচিরে আজিমাবাদে তাঁহার প্রত্যাশা করা যাইতেছে; বাঙ্গলায় তিনি আলীবর্দী খাঁর সাহায্য করিতে আদিষ্ট হন। বালাজি রাওর পিতা সাদৎ খাঁর হস্তে গুরুতররূপে পরাজিত হন; অনেক মারাঠা সেনাপতি বিজেতার হাতে বন্দী হন; তাঁহারা তখনও তাঁহার জামাতা আবুল মনসুর খাঁর কারাগারে আটক ছিলেন। তজ্জন্য এই সেনাপতি ও বালাজি রাওর মধ্যে অনেক শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। বালাজি রাওর প্রত্যেকটা গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন বলিয়া তিনি যথাসময়ে তাঁহার রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হওয়া প্রকৃষ্ট মনে করিলেন। কাজেই তিনি কালক্ষেপ না করিয়া আজিমাবাদ ত্যাগ করত মোনিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে তিনি গঙ্গার উপর একটা তরণী-সেতু ফেলিয়া উহা অতিক্রম করিলেন। সেখান হইতে তিনি দীর্ঘ মঞ্জিলে নিজ স্বরাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মোনির হইতে সহকারী শাসনকর্তাকে বিদায় দেওয়া হয়; সম্মানের খাতিরে তিনি এতদূর পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসেন।

আবুল মনসুর খাঁর এই পরিদর্শন গরজের খাতিরে নির্দেশিত হইলেও হিংসুক ও নিন্দুকের দল ইহা অত্যন্ত মন্দ আলোকে চিত্রিত করিল। অনুরূপভাবে ইহাতে এরূপ দুরভিসন্ধি আরোপ করা হইল যে, তাহা ঐ সুযোগ্য ব্যক্তির মনেও স্থান পায় নাই। পক্ষান্তরে মুরাদ খাঁর সফর ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলীবর্দী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের উভয়েরই সন্দেহ হওয়ায় এবং আবুল মনসুর খাঁর কয়েকটা দুষ্কার্য ও কয়েকটা অত্যন্ত অসঙ্গত

আচরণে তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হওয়ায় দৃশ্যতঃ অবিসংবাদিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সহকারী শাসনকর্তার বিরুদ্ধে দোষারোপ তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। তজ্জন্য উভয়েই তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন, যুবক শাসনকর্তাই হইলেন অপর যে কোন ব্যক্তির চেয়ে অধিক। কিন্তু ইহা তিনি তাঁহার মনে লুক্কায়িত রাখিলেন; উপযুক্ত সুযোগের জন্য ইহা সংরক্ষিত রাখা হইল; তাঁহার খুল্লতাত মারাঠাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিলেই যখন তিনি বাহিরের সাহায্যের প্রয়োজনমুক্ত হইবেন, তখনই এরূপ সুযোগ আসিবে বলিয়া তিনি প্রত্যাশা করিলেন। এত অধিক কপটতা সত্ত্বেও তিনি হেদায়েত আলী খাঁর স্থলে তাঁহার দেওয়ান রায় চিন্তামন দাসকে তৎক্ষণাৎ আজিমাবাদের নায়েবের পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু ঐ নগরে পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে তাঁহার অসুখ হইল; কয়েক দিনের অসুখের পরে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হইলে নগরী কিছুকাল শাসনকর্তা বা ক্ষমতাসীন লোক শূন্য রহিল। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে অন্ততঃ ৪০/৫০ হাজার সৈন্য লইয়া বালাজি রাওর নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ আসিল। ইতোমধ্যে জানা গেল যে, তাঁহার সমগ্র পথে তিনি (অধিবাসীদের নিকট হইতে) চাঁদা আদায় করেন: যে কেহ প্রসন্নভাবে চাঁদা দেয়, তাহার দেহ, ভূমি ও মান রক্ষা পায়; কিন্তু যে কেহ আত্মরক্ষার ভাণ করে, তাহার দেহ লুণ্ঠিত, দেশবিধ্বস্ত ও তাহার প্রজাবর্গ তরবারি মুখে নিক্ষিপ্ত না হইয়া যায় নাই।[২১] ইহাতে নাগরিকদের আতঙ্ক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আহমদ খাঁ নামক জনৈক আমীরের ভাগ্যে এমনি ঘটে। তিনি ছিলেন দায়ূদ খাঁ কুরাইশীর পৌত্র। আজিমাবাদ প্রদেশের ইচা ও গাও জিলা ছিল তাঁহার জায়গীর; তিনি দায়ূদ নগরে বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহ শহরটি প্রতিষ্ঠা ও আবাদ করেন। আলীবর্দী খাঁর সাহায্যে গমনে ব্যগ্র মারাঠা সেনাপতি অবরোধে কোন সময় নষ্ট করিবেন না ভাবিয়া এই লোকটা দায়ুদ নগরের সন্নিহিত তাঁহার স্বনির্মিত ও সুরক্ষিত গওসগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন; আত্মরক্ষা করিতে ও চাঁদা না দিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি তাঁহার পরিবার, সৈন্য এবং দেশের সমস্ত বণিক ও ধনবান লোকদের লইয়া তন্মধ্যে গমন করিলেন। ইহা অবগত হইয়া বালাজি রাও তাঁহাকে

শায়েস্তা ও তাঁহার দুর্গ ধ্বংস করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যেরা প্রথমে দায়ুদ নগরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া উহা লুণ্ঠন ও অগ্নিযোগে ভূমিসাৎ করিল; অতঃপর তাহারা ইহার ইস্টকরাজি ও অন্যান্য উপকরণ তৎসন্নিহিত গওসগড় দুর্গের পরিখা ভর্তি করিতে ব্যবহার করিল। দুর্গটি তৎক্ষণাৎ অবরোধ করা হইল। এই যুদ্ধে আহমদ খাঁর গর্ব ও উপস্থিত বুদ্ধি খতম হইয়া গেলে তিনি একটা দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন; নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া তিনি এখন দুর্গ মধ্যস্থ কয়েকজন বণিকের মধ্যস্থতায় মারাঠাদের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন এবং ৫০,০০০ টাকা কর দিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এইরূপ অত্যাচার ও বলপূর্বক অর্থ আদায়ের সংবাদ অচিরে আজিমাবাদের নাগরিকদের কর্ণগোচর হয়। তাহারা ভয় ও আতঙ্কে হতবুদ্ধি হইয়া বিপুল সংখ্যায় আমার মাননীয় পিতার গৃহের নিকটে সমবেত হইল; তাহাদের প্রধান ব্যক্তি আবেদন করিলেন, "নগরে আপনিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি, কেবল আপনিই ঐ চারি প্রাচীরের মধ্যে যে অজস্র সাধু লোক বাস করে, তাহাদের সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সফলতার সহিত নিজের প্রভাব খাটাইতে পারেন।" হেদায়েৎ আলী খাঁ ইতোপূর্বেই তাঁহার পরিবার গঙ্গার[২২] অপর তীরে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহাদের সকলকে একই পদ্ধতিতে তাঁহাদের সম্পত্তি ও পরিবার নিরাপদ করিতে উপদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি সর্বাবস্থায় তাহাদের পাশে দাঁড়াইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহারা তাঁহার এই উপদেশ পালন করিলে ঐ আমীর তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিতে পারে, এই প্রত্যাশায় সমস্ত অধিবাসীসহ অধীর-ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সাধারণ ত্রাসের সময় আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাহাদের জন্য একজন রক্ষক প্রেরিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল। ঠিক ঐ সময় আজিমাবাদে একজন সাধারণ লোক (আল্লাহ্ তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার-পত্র দান করুন!) বাস করিতেন। ইহার নাম সয়্যিদ আলীমুল্লাহ্ তেবতেবা—আমার পিতামহ ও মানব জাতির সর্বাপেক্ষা নগণ্য ব্যক্তি। যখন চীৎকার ও ত্রাস ভিন্ন কিছুই শ্রুত বা দৃষ্ট হইতেছিল না, ঘটনা-ক্রমে তখন তিনি ঐ নগরে উপস্থিত হন। তাঁহার পুত্র আমাদের সম্মানিত

হেদায়েৎ আলী খাঁ বৃথাই হুজুরকে অন্যান্যের সহিত গঙ্গা অতিক্রম করিয়া অপর তীরে তাঁহার বাসা লইতে সানুনয় প্রার্থনা করেন। এই শ্রদ্ধেয় আমীর এরূপ উপদেশে কর্ণপাত করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহা হইবে তাঁহার ব্যক্তিগত মর্যাদার হানিকর এবং ইহাতে আল্লার সঙ্গতিতে অনাস্থা প্রকাশ পাইবে, ইহাই ছিল তাঁহার কৈফিয়ৎ। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালামের ব্যাখ্যায় তাঁহার নৈপুণ্যের দরুন তিনি স্বয়ং আল্লার নিকট হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা পান বলিয়া বোধ হয়; ফলে তিনি তাঁহার অনির্বচনীয় উপায় সম্পর্কে কিছু পূর্বজ্ঞান লাভ করেন। অন্যান্যের ন্যায় আদৌ তিনি ভয় পাইলেন না। তাহাদের কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে নগরে অপেক্ষা করিতে অবিরত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি তাঁহার রীতির খেলাফ করিয়া অতি প্রতুষে অশ্বারোহণ করত একাকী এতদূরে গমন করিলেন যে, সমস্ত প্রাচীর-বেষ্টনী ঘুরিয়া আসিলেন। তিনি যেমন কোন নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন বা উপর হইতে কোন প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, এভাবে প্রত্যাবর্তনের পর আমার পিতাকে প্রফুল্ল-চিত্ত হইতে এবং অধিবাসীদিগকে উৎসাহ দানের জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে নিশ্চয়তা দান করিলেন যে, তাহাদের কেহই আসন্ন ঝটিকার কিছু অনুভব করিবে না। ধন্যবাদ, আল্লাহ্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তিনি যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ব্যাপারটা ঠিক সেভাবেই ঘটে। এমনি ছিলেন সেই প্রশংসনীয় ব্যক্তি! তাঁহার ব্যবহারের মহত্ত্ব ও তাঁহার কথার বিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা যাহা জানি, তাহার সবকিছু উল্লেখ করিতে গেলে অচিরে একখানা পূর্ণ গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। কিন্তু মানব জাতির দীনতম ও নগণ্যতম ব্যক্তি 'মোল্লার ইনসানিয়ৎ' নামে একখানা কবিতা-পুস্তক লিখিতে সাহসী হইয়াছি; তাহাতে তাঁহার অসাধারণ চরিত্র ও কয়েকটি অতিআশ্চর্য উক্তি ও কার্যের একটা ক্ষীণ ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর আভাস দানের চেষ্টা করিতেছি বলিয়া—আমার আশা, কৌতূহলী লোকেরা কৃপাপর হইয়া সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিবেন। বর্তমানে আমাদের কাজ হইল যে অসাধারণ উপায়ে মনোযোগী আল্লাহ্ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অনুগ্রহর্বক হস্তক্ষেপ করেন, তাহা বর্ণনা করা। স্বর্গীয়

করুণার বিকাশ এবং পয়গম্বরদের মহামান্য রাজা ও তাঁহার পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক সন্তানের গুণে গোবিন্দজী নায়েক নামে এক ভদ্রলোক তখন বেনারসে ঘটনাক্রমে বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে ও মহাজনী কারবারে লিপ্ত ছিলেন; তিনি ছিলেন বালাজি রাওর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বেনারস হইতে তাঁহার কারবার আজিমাবাদে ও নিকটবর্তী জনপদে প্রসারিত হয়। আমার সম্মানিত জনক তাঁহার ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির সময় এই উভয় যোগ্যতায়ই তাঁহাকে কয়েকবার নিয়োগের তাঁহার সুযোগ ঘটে। এই উপায়ে তিনি প্রচুর লাভ করেন ও বিবিধ উপকার প্রাপ্ত হন; তৎফলে তাঁহার সম্মানপ্রদ সমৃদ্ধি লাভ ঘটে। এই লোকটি কখনও তাঁহার প্রাপ্ত বহু উপকারের কথা বিস্মৃত হন নাই; কেবল উপকার দ্বারাই উপকার পরিশোধ করিতে হয়—এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন বলিয়া তাঁহার পূর্ব উপকারকের জন্য কিছু সুবিধা আদায় করিবায় উদ্দেশ্যে তাঁহার আত্মীয়তাকে কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন। পূরাপূরি এই সংকল্প লইয়া তিনি দ্রুত বেনারস ত্যাগ করিয়া বালাজি রাওর শিবিরে গমন করিলেন; সেখানে তিনি হেদায়েৎ আলী খাঁর অনুগ্রহে কত অধিক উপকৃত হন এবং কৃতজ্ঞতার বশে কিঞ্চিৎ প্রতিদান দেওয়ার জন্য বর্তমান সুযোগের সুবিধা গ্রহণ তাঁহার কত বেশী কর্তব্য, তাহা তাঁহার জ্ঞাতি প্রধান সেনাপতির নিকট ব্যক্ত করিলেন, তাঁহার স্কন্ধে যে কৃতজ্ঞতার বোঝা এত ভারী হইয়া চাপিয়া রহিয়াছে, তাহা সরাইয়া না নিলেও যাহাতে অন্ততঃ হাল্কা করা যায়, এভাবে সেই আমীরকে ব্যবহার করার জন্য প্রধান সেনাপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া তিনি তাঁহার অনুরোধ শেষ করিলেন। প্রধান সেনাপতি এই অনুরোধে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জ্ঞাতির ঔৎসুক্যের উদ্দেশ্যের তারিফ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হেদায়েৎ আলী খাঁকে অনুকম্পা ও প্রশংসাপূর্ণ একখানা পত্র লিখিলেন; তাহাতে তিনি তাঁহাকে নির্ভয়ে নগরে থাকিতে এবং তাঁহার খাতিরে তিনি নাগরিকদেরও কাহারও কোন ক্ষতি না করিতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের মন শান্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি তাঁহার পত্রের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে প্রস্তুত সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সর্বাপেক্ষা বিচিত্র কয়েকটি দ্রব্য প্রদান করিলেন। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁহার

কথা রক্ষা করেন। আমার পবিত্র-হৃদয় ও নিষ্পাপ-দেহ পূর্বপুরুষদের সদ্‌গুণের প্রতি সম্মানের খাতিরে আল্লাহ্‌ দয়া করিয়া আজিমাবাদ নগরের উপর যে দুঃখ-যন্ত্রণা ভাঙ্গিয়া পড়িতে যাইতেছিল, তাহা দূরে রাখিলেন। আল্লাহ্‌র দয়া ও তাঁহার রাসুলের সদগুণের প্রতি ধন্যবাদ যে, এত অধিক সম্মানের সহিত যে শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া আসিতেছি, তিনি তাঁহার বহু বিদেশবাসের মধ্যে আজিমাবাদে ঘটনাক্রমে দীর্ঘ প্রবাস-জীবনযাপন করেন; প্রত্যেকেই তাঁহার নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা এবং তাঁহার ব্যবহার ও আচরণের দয়ার যথোচিত প্রশংসা প্রকাশে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, মানবজাতির এই সর্বাপেক্ষা নগণ্য ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার পৌত্র এবং তাঁহার প্রত্যেকটি আত্মীয় ও বংশধরদের প্রতি সর্বত্র সে অবিশ্রান্ত সম্মান ও মনোযোগ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সেই শ্রদ্ধেয় পুরুষের সদ্‌গুণ এবং তাঁহার উপস্থিতি হইতে প্রাপ্ত উপকার সম্বন্ধে সর্ব-শ্রেণীর লোকে যে অভিমত পোষণ করে, জগত তাহা তৎপ্রতি আরোপ করিবে। তাঁহার ঐ সকল সদ্‌গুণের প্রতিই আমি বহু অসাধারণ মুক্তি ও দৈবকৃত রক্ষা আরোপ করিয়া থাকি; এগুলির মারফতে আমি একাধিক-বার সর্বাপেক্ষা আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাই।

> "সুযোগ্য ব্যক্তির সদ্‌গুণ অবশ্যই তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে জানিতে ও তাঁহার হিসাবে জমা দিতে হইবে। যিনি তাঁহার ঠিক কবর পর্যন্ত এরূপ সুনাম বহিয়া নেয়, তিনি ভিন্ন আর কেহই এরূপ বিবেচিত হইবার উপযুক্ত নহেন।"

পাঠককে লোকটির গুরুত্ব ও ঘটনার অসাধারণত্বের প্রতি এই প্রসঙ্গান্তরে গমন আরোপ করিতে হইবে। অতঃপর আমরা আমাদের ইতিহাসের সূত্রে প্রত্যাবর্তন করিব। বালাজি রাও জানিতেন, মারাঠারা কখনও লুণ্ঠনের দৃশ্যে সংযত থাকিবে না; নিজেকে নিজের কথার উপযুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিতেও ব্যগ্র ছিলেন বলিয়া তিনি দায়ুদপুর ত্যাগ করিয়া ডাইন দিকে ফিরিলেন এবং আজিমাবাদ এক পাশে রাখিয়া ঐ নগর হইতে কিছু দূরবর্তী টিকারী ও গয়া হইয়া মানপুর ও বিহারের ভিতর দিয়া আগাইয়া চলিলেন। বহর হইতে তিনি আবার মুঙ্গের ও ভাগলপুর হইয়া রাজপথে আসিলেন।

এই দুইটি জনপূর্ণ শহর ও জনপদের অধিবাসিরা মারাঠাদের গমনের দরুন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বহু লোকে গঙ্গার অপর তীরে পালাইয়া গেল; কিন্তু একজন বিখ্যাত মহিলা—(গওস খাঁর পত্নী একজন সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি; তাঁহাকে আমরা গিরিয়ার যুদ্ধে নিহত দেখিয়াছি) তাঁহার বিপুল পরিজনসহ সঙ্গতির অভাবে নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অন্য কোন উপায়ে তাঁহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাও তাঁহার সাধ্যে কুলাইল না। কাজেই তিনি প্রতিরোধ করিতে এবং শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়াও নিজের ইজ্জত রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই বীর রমণী তাঁহার আত্মীয় ও আশ্রিতদের ডাকিয়া একত্র করিলেন এবং তাঁহাদের রমণীদিগকে বেইজ্জত হইতে, এমন কি বেইজ্জত করার চেষ্টা করিতে দেখার চেয়ে ধ্বংস হওয়ার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। তাহা-দিগকে ইচ্ছুক দেখিয়া তিনি তাঁহার গৃহরাজির দ্বার রুদ্ধ করিয়া এবং অবরোধ সৃষ্টির দ্বারা তাঁহার বাসা সুরক্ষিত করিলেন হাতের কাছে তখন যে অল্প কয়েকটি মরিচা পড়া বন্দুক পাওয়া গেল, তাঁহার আশ্রিতদের তাহাই দিয়া সেই শক্তিশালী শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। সমস্ত অধিবাসীই পলায়ন করে অথবা বেইজ্জতি ও লুণ্ঠন বরণে বাধ্য হয়। কেবল সেই ধ্বংসাপন্ন গৃহগুলি হইতেই কিছু বাধা প্রদর্শিত ও বন্দুকের আওয়াজের শব্দ শ্রুত হয়। লুণ্ঠনকারীরা এরূপ অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে বিস্মিত হইয়া বিদ্রোহী পাড়া অবরোধ করিল। গুলিবর্ষণ চলিতে ও তাহাদের কিছুলোক ভূপাতিত হইতে থাকায় তাহারা বলপূর্বক ইহা অধিকার করিবে কিনা, তৎসম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু ইতোমধ্যে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা মারাঠা সেনাপতির কর্ণগোচর হইলে (তাঁহার মনে) কৌতুহল মিশ্রিত সশ্রদ্ধ প্রশংসার ভাবের উদ্রেক হইল। ঐ বিচিত্র ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, জনৈক বিখ্যাত সেনাপতির বিধবা দারিদ্র্য বশতঃ নদীর অপর তীরে বাসা ও জীবিকার ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হওয়ায় বেইজ্জতি ভোগ অপেক্ষা বরং তাঁহার গৃহের ধ্বংসস্তূপের নিয়ে সমাহিত হওয়ার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহার বাসা অবরোধ দ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহরা

মারাঠা বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের ঘরবাড়ী রক্ষায় ভাগলপুরের জনৈক মহিলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা

দৃঢ়তায় উৎসাহিত মুষ্টিমেয় আশ্রিতের সাহায্যে তিনি এত চমৎকাররূপে উহা রক্ষা করিতেছেন যে, এত অধিক বাধা লাভে অত্যন্ত অনভ্যস্ত লুণ্ঠনকারীরা ইহা অধিকারের চেষ্টা করিতে সাহসী না হইয়া শুধু দূর হইতে তাকাইয়া দেখিতেছে ; বালাজি রাও এই সংবাদে সন্তুষ্ট হইলেন ; একজন রমণীর এত অধিক সাহস দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, তাহার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার প্রশংসা করিয়াই তৃপ্ত না হইয়া তিনি দয়া করিয়া দাক্ষিণাত্যের কিছু বিচিত্র বস্ত্র ও কিছু বিচিত্র কিংখাবের উপহারসহ তাঁহার নিকট একটা বাণী প্রেরণ করিলেন। তাঁহার গৃহ ও বাসা নির্বিঘ্ন রাখার জন্য উহার ভার গ্রহণার্থ তাঁহার একদল দেহরক্ষী প্রেরিত হইল। সমগ্র বাহিনী দূরে গমন না করা পর্যন্ত সেখান হইতে স্থানান্তরে গমন না করার জন্য তাহারা আদেশ পাইল। তিনি আরও বলিলেন যে, তিনি কোন অপমান ভোগ করিলে তাহাদিগকে তাঁহার নিকট জবাবদিহি হইতে হইবে। এই আদেশ দানের পর তিনি পার্বত্যভূমি দিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। প্রহরীরা কঠোরভাবে আদেশ প্রতিপালনের পর সসম্মানে বীর রমণীর নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় তাহাদের মূল বাহিনীর সহিত যোগদান করিল। মারাঠা সেনাপতি পাহাড়-বনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া বীরভূমের প্রান্তরে বাহির হইলেন ; এই জনপদ মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে অবস্থিত।

রঘুজী ভোঁসলাও নিজের তরফ হইতে ঐ নগরের নিকটবর্তী হইতেছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের প্ররোচণায় ঐ রাজা আর একদল সৈন্য সজ্জিত করিয়া তাহাদের সহিত পুনরায় বাঙ্গলা আক্রমণ করেন; উহার রাজধানীর নিকটে তাঁহার শিবির স্থাপিত হইল। পক্ষান্তরে বালাজি রাও রহিলেন অন্য দিকে। ফলে ঐ দুর্ভাগ্যদেশ যুগপৎ দুইটি লুণ্ঠনকারী বাহিনীর খপ্পরে পড়িল এবং বন্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বালাজি রাও

মারাঠা প্রধান সেনাপতির সহিত বাঙ্গলার সুবাদারের দ্বিধামূলক সাক্ষাৎ

তখন ভাগলপুরের নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছিলেন বলিয়া আলীবর্দী খাঁ এক বিরাট বাহিনী লইয়া সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ঐ প্রধান সেনাপতি সবে মাত্র তাঁহার বাসায় অবতরণ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দর্শনদানে গমন করিলেন। ইহা ছিল গঙ্গার তীরে। তাঁহার কথা বর্ণিত হইবামাত্র মারাঠা সেনাপতি তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং হিন্দুস্তানী প্রথায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিজের তাঁবুতে আনিয়া নিজের নিকটে একই মসনদে উপবেশন করাইলেন। ফলে ঐ পরাক্রান্ত ব্যক্তিদ্বয় আকাশের দুইটি গ্রহ—মঙ্গল ও বৃহস্পতির মিলনের চিত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। মামুলী অভিনন্দন এবং প্রথানুযায়ী শিষ্টাচার ও উপহারের পর তাঁহারা বিদায় লইলেন। আলীবর্দী খাঁ তাঁহার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরদিন এই দ্বিধামূলক সাক্ষাতের প্রতিদান দেওয়া হইল। বাঙ্গলার সুবাদার তাঁহার অতিথির সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহুদূর পর্যন্ত আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে তাঁহার দর্শন তাঁবুতে আনিয়া নিজের পাশে একই মসনদে বসাইলেন। পান-আতর দেওয়ার পর সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ও মূল্যবান বিবিধ বস্ত্রের কয়েক খানা সরপোষ আনীত হইল, তৎসঙ্গে ছিল নানা প্রকার মনিমাণিক্যখচিত কয়েক বাসন স্বর্ণ; তৎপরে আসিল একটা মুক্তার মালা ও একটা অত্যুচ্চ হস্তী। দেশ শান্ত ও রঘুজীর বিরোধিতা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও কয়েকটি বাক্য বিনিময় হইল। অতঃপর বালাজি রাও বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ শিবিরে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে সুবাদার রঘুজীকে বাঙ্গলার বাহিরে তাড়াইবার ঔচিত্য সম্পর্কে এক বার্তা পাঠাইলেন। অপর ব্যক্তি আজিমাবাদ প্রদেশের এত বৎসরের বাকী পড়া চৌথ দাবী করিয়া এই প্রস্তাবের উত্তর দিলেন এবং এতকাল ধরিয়া ইহা না দেওয়ায় কিছু অভিযোগও করিলেন। বার্তা ও উত্তর বহনের ভার দিল মুস্তফা খাঁ ও বিহারের সুবাদারের উপর। গরজ বড় বালাই বলিয়া বাকী ঋণের সমষ্টি হিসাব করা হইল; ইহা বিরাট অঙ্ক হইলেও পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইল। সুবাদার ইত্যবসরে দুইটা বাহিনীর এক যোগে রঘুজীর বিরুদ্ধে যাত্রা করা উচিত বলিয়া প্রস্তাব করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন সরাসরি যাত্রা করিতে চাহিতেছেন, সেনাপতিকে এইরূপ আভাস দিলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি একজন প্রতিপত্তিশালী লোক মারফতে সংবাদ পাঠাইয়া ইহা নিষেধ করিলেন। নিষেধাজ্ঞা পালন সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় সুবাদার কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বাকী ঋণ শোধ করিলেন এবং ইত্যবসরে তিনি যাহাকে সাধারণ শত্রু বলিয়া অভিহিত

করিলেন, অর্থাৎ রঘুজীর বিরুদ্ধে যাত্রা করার জন্য পুনরায় প্রস্তাব করিলেন। এই মারাঠা ভূপতি তখন কাটোয়া ও বর্ধমানের মধ্যে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন; অচিরে তিনি এই বাস্তব বা অপ্রকৃত স্বার্থ-সমন্বয়ের সংবাদ পাইলেন। এরূপ শক্তিশালী শত্রুদের একজনের সৈন্যদের নিকটই এত পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়ায় নিজেকে তাঁহাদের সমকক্ষ মনে না করিয়া তিনি বাঙ্গলার পশ্চিম অঞ্চল দিয়া সরিয়া পড়াই সঙ্গত মনে করিলেন। সুবাদার এই পশ্চাদ্বর্তনের কথা অবগত হইয়া ভাগিরথী অতিক্রম করিয়া উৎসাহের সহিত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু দুই-একদিন যাত্রার পর তিনি বালাজি রাওর নিকট হইতে একটা বার্তা পাইলেন; তাহাতে তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকট হইতে পৃথক্ না হওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন; কারণস্বরূপ তিনি বলিলেন যে, তাঁহার ধারণা, বাঙালী বাহিনী শত্রুর নাগাল পাইতে সমর্থ হইবে না। তিনি আরও বলিলেন যে, তিনি জিদ ধরিলে তিনি অন্য রাস্তা ধরিতে বাধ্য হইবেন; সেক্ষেত্রে তাঁহার বিবেচনায় অল্পকয়েক দিনের মধ্যেই তিনি পলাতক শত্রুর নাগাল পাইবেন এবং তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবেন। বাস্তবিক পক্ষে পরদিনই তিনি যাত্রা করিয়া অচিরে রঘুজীর নাগাল পাইলেন। এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া প্রান্তর ত্যাগ করত পশ্চিমের গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়া পশ্চাদ-গমনে বাধ্য করিলেন; সেখান হইতে তিনি কয়েকটা উপত্যকা দিয়া নিজ সীমান্তে পৌঁছিবার আশা করিলেন। এই পশ্চাদ্বর্তন কার্যে পরিণত করা হইল, কিন্তু তাঁহার বোঝাপত্রের বৃহত্তম অংশ হারাইয়া, এগুলি তিনি পথে ফেলিয়া গেলেন তাঁহার সহকারী ভাস্কর পণ্ডিতের শিবির ছিল তখন মেদিনীপুরে; প্রভুর এই পলায়নে আতঙ্কিত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শিবির ভাজিয়া উড়িষ্যা সীমান্তের পর্বতরাজির দিকে প্রস্থান করিলেন; সারাপথ তিনি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও ত্রাসের সহিত ছুটিয়া গেলেন। তাঁহার দুর্দশায় বালাজি রাও নিজ তরফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্ণ সুযোগ পাইলেন। এই প্রধান সেনাপতি বাদশাহের আদেশ কার্যে পরিণত ও সুবাদারকে সাহায্য করিবার ভাণে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ও সমগ্র দেশের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করেন। এখন তাঁহার দাবীকৃত বাকী টাকা পাইয়া এবং আরও

কয়েকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে তাঁহার নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার উকীল ও মুস্তফা খাঁর উপর আরও কয়েকটা বিষয়ের ভার ন্যস্ত হয়; উকীল তাহা সমাপ্ত করার জন্য পশ্চাতে থাকিয়া যান। ইতোমধ্যে বালাজি রাওর শিবির ও মালপত্রাদি বহুদূরে চলিয়া যায়। মারাঠা শক্তির শ্রেষ্ঠতা ও সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সম্পর্কে উকীলের এত অধিক বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অসঙ্গত ভাষা ব্যবহার করেন ও চড়া মেজাজে কথাবার্তা বলিতে থাকেন। ঐ সেনাপতি ছিলেন স্বভাবতঃই আকস্মিক ও দাম্ভিক। ইহা তাঁহার সহনশীলতার বাহিরে ছিল বলিয়া তিনি গোমস্তার পোশাক তাঁহার পিঠের উপর টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়াইয়া ফেলিবেন বলিয়া ধমক দিলেন। এই আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করা হইলে গোমস্তা লজ্জা ও অপমানে আচ্ছন্ন হইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহ ও চরিত্রের যে অবমাননা করা হয়, তজ্জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি সভা ভাঙ্গিয়া তাঁহার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু এরূপ কার্যের পরিণাম অত্যন্ত গুরুতর হইবে বলিয়া সুবাদার তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার সেনাপতির অসঙ্গত ব্যবহার 'কর্কশ সৈনিকের স্বাভাবিক হঠকারী মেজাজের আকস্মিক স্ফুরণ' বলিয়া কৈফিয়ৎ দিয়া তাঁহার মন শান্ত করিলেন; অতঃপর তিনি তাঁহাকে একটা অশ্ব ও অপর কয়েকটি দ্রব্যসহ একটা মূল্যবান খেলাত উপহার দিয়া তাঁহার ক্রোধ দূর করিলেন। ইত্যবসরে বালাজি রাও কয়েক দিনের পথ দূরে চলিয়া যান; গোমস্তাকে বিপুল ভক্তি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দেওয়া হইলে তিনি দ্রুত পদে প্রভুর সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। তিনি চলিয়া গেলে সুবাদার মুস্তফা খাঁকে ডাকাইয়া আনিয়া বেশ গুরুতরভাবে বলিলেন, তাঁহার কার্যের ফল অতি গুরুতর হইতে পারিত; তাহা এমন ধরনের ছিল যে, বালাজি রাওর ক্রোধোদ্রেক হইত। সেনাপতি উত্তর দিলেন," প্রভো আমার! সত্য নাকি? সেক্ষেত্রে

১৭৪০-১ খৃঃ আমার প্রভু ও মনিব হুজুর, রঘুকে কথা বলার জন্য বাছিয়া লইতে ও অস্তজনকে আমার নিকটে রাখিয়া দিতে পারিতেন অথবা তদবস্থায় হুজুর বালাজি রাওকে উত্তম-মধ্যম দিতে ও

সাধ মিটাইয়া চাবুক মারার জন্য রঘুকে আমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিতেন।" এই সকল ঘটনা ঘটে ১১৫৫ হিজরীর মুহর্‌রমের শেষ ও সফরের প্রথম দিকে। এখন বালাজি রাও চলিয়া যাওয়ায় এবং রঘুজীর ধন-জনের ক্ষতির এত শীঘ্র পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা না থাকায় সুবাদার তাঁহার অভিযানের সাফল্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেখান হইতে অচিরে তিনি তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতুষ্পুত্র বিহারের সুবাদারকে বিদায় দান করিলেন; সেই আমীর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই (স্বরাজ্যে) প্রস্থান করিলেন।

এই শান্তির সময় মুর্শিদাবাদে কয়েকটা দরবারী ষড়যন্ত্র ও জাহাঁগীর-নগর ঢাকায় কিছু আলোড়ন সম্ঘটিত হইল। গোকুল চাঁদ নামক জনৈক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ছিলেন হুসেন কুলী খাঁর ভৃত্য; নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁর উপর তাঁহার প্রভাবের দরুণ তিনি ঢাকা প্রদেশের প্রধান তহসিলদার ও সেনাবিভাগের রসদ সরবরাহকারীর পদে উন্নীত হন। ইনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাসস্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহার উপকারক ও ভূতপূর্ব প্রভুকে অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদে আগমন করিলেন। তিনি ঐ রাজপুত্রের সহকারী এই বিনীত উপাধিতে অপ্রতিহতভাবে ঐ প্রদেশ শাসন করিতেন। এই লোকটির নিকট অবশ্যই প্রয়োজনীয় প্রমাণ ছিল; ইহার আনীত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের দরুণ ঐ আমীরের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। তিনি কঠোরভাবে তিরস্কৃত ও পদচ্যুত হইয়া দুরবস্থায় পতিত হইলেন। তাঁহার পদ ঐ নগরের শান্তিরক্ষকদের ফৌজদার ইয়াসিন খাঁকে প্রদত্ত হইল; ফৌজদারের পদ মীর কলন্দরের নিকট হস্তান্তরিত হইল। হুসেন কুলী খাঁ চাকরী হারাইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিয়া যাহাতে তাঁহার সুনাম ও সৌভাগ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তজ্জন্য সমস্ত কলা-কৌশল প্রয়োগে মনোযোগী হইলেন। অবশেষে সুন্দর দেহ ও যথাস্থানে প্রদত্ত বিপুল অর্থের বলে তিনি ঘসেটি বিবির এত অধিক অনুগ্রহভাজন হইলেন যে, অচিরে তিনি তাঁহার পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পান। শাহ্‌জাদী নিজের উপর তাঁহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ভার লন এবং তাঁহার পিতা ও স্বামী দুইজনকেই এত সফলতার সহিত চাপিয়া ধরেন যে, সেই সুপুরুষ আমীরের দুষ্কর্ম ক্ষমা

করিয়া তাঁহাকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়; পুনরায় অনুগ্রহভাজন হইয়া তিনি যে খেলাত দ্বারা তাঁহার পূর্বপদে অভিষিক্ত হন, তাহাতে লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া যায়। হুসেন কুলী খাঁ নিজেকে প্রবলভাবে সমর্থিত হইতে দেখিয়া পূর্বাপেক্ষাও শক্তিশালী হইয়া পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ইয়াসিন খাঁকে ভাসাইয়া দিলেন; কিন্তু তিনি যোগ্যতাসম্পন্ন লোক ছিলেন বলিয়া জানা থাকায় ভাগলপুরের ফৌজদার আতাউল্লাহ্ খাঁ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া চাকরী দান করিলেন। গোকুল চাঁদ এত ভাগ্যবান ছিলেন না। তাঁহার ভূতপূর্ব মনিব দৃঢ়রূপে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই তিনি সেই বিশ্বাসঘাতক চাকরকে শাস্তি দান করিলেন। তাঁহাকে হিসাব-পরীক্ষাকারীর দফতরের বিদ্রূপবানের অধীনে স্থাপন করিয়া তাঁহার হিসাব পরীক্ষায় এত অধিক চাতুরী প্রয়োগ করা হইল যে, লোকটার সর্বনাশ হইয়া গেল, তিনি সম্পুর্ণ ধ্বংস হইলেন। চাকরীর সঙ্গে তাঁহার সবকিছুই নষ্ট হইয়া গেল; তাঁহার পদ রাজবল্লভকে প্রদত্ত হইল। এই প্রভুত্বব্যঞ্জক কার্য দ্বারা জনসাধারণকে নিজের পূর্ণ প্রতিপত্তি জ্ঞাপন করিয়া হুসেন কুলী খাঁ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেনুদ্দীন খাঁকে তাঁহার নায়েব নিযুক্ত করিয়া স্বীয় রক্ষাকর্তার নিকটে থাকিবার জন্য মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখন হইতে তাঁহার গৌরবের সীমা রহিল না, তাঁহার এতই প্রতিপত্তি ছিল যে, তাহা চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে বায়ু পরিবর্তন হইল, ভাগ্য তাঁহাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল; তিনি ক্ষমতার তুঙ্গশিখর হইতে অধোমুখে পতিত হইলেন এবং সিরাজুদ্দৌলার আদেশে ঠিক তাঁহারই সম্মুখে নিহত হইলেন। এই নিষ্ঠুরতার জন্য শেষোক্ত ব্যক্তি একই প্রকারে শাস্তিপ্রাপ্ত হন; নিহত ব্যক্তির শোণিত অতীতের ন্যায় সমস্ত গোলযোগের সৃষ্টি করে; কেবল বাঙ্গলার ধ্বংসে এবং আলীবর্দী খাঁর পরিবার ও রাজত্ব নাশেই তাহা শেষ হয়।

আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, বিহারের শাসনকর্তা জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁর খুল্লতাত তাঁহাকে তাঁহার কার্যস্থলে গমনের জন্য বিদায় দেন। তাঁহার প্রদেশের সীমান্তে উপনীত হইবামাত্র তিনি বামদিকে ফিরিয়া তিকারী জেলায় কয়েক দিব অবস্থান করা সঙ্গত মনে করিলেন। আমার বিখ্যাত জনক হেদায়েৎ আলী খাঁর আচরণে তিনি যে অসন্তোষ বোধ করেন,

তাহাই ছিল এরূপ কার্যক্রমের প্রকৃত কারন। যে সকল জনপদে আমার পিতার অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল, স্বয়ং তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা সঙ্গত বলিয়া তিনি ওজর দেখান। পিতা ছিলেন ছোট নাগপুর[৪] পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের শাসনকর্তা; সেরেস ও কোতুম্বা জিলাও ছিল তাঁহার অধীন; এই জিলা দুইটি বহু বৎসর পূর্ব হইতে আমাদের পরিবারকে ইজারা দেওয়া হয়। অনেক সময় তাঁহার প্রভাবে অনুগৃহীত ও সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় ও দীর্ঘকালের কোন সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত থাকায় তদঞ্চলের সমস্ত জমিদার ও বড় বড় ভূস্বামীদের সকলেই তাঁহার অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ রাজা সুন্দর সিংহের সহিত তাঁহার এরূপ সম্পর্ক ছিল: তিনি ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার অনুরক্ত। কাজেই এরূপ শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গকে তদীয় অনুরক্তি হইতে ভাগাইয়া নিয়া তাঁহাদিগকে নিজের ও নিজ সরকারের অনুরক্ত করার দরকার ছিল। কিন্তু তাঁহার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল তিনি ঐ সমুদয় জনপদের রাজস্ব ঠিক এই উদ্দেশ্যে তাঁহার সঙ্গে আনিত জনৈক মন্ত্রীর ব্যবস্থাধীনে রাখিতে চাহেন। ইনি ছিলেন রাজা কিরাত চাঁদ: ইহার পিতা আলম চাঁদ বিগত সুবাদার শুজা খাঁর দেওয়ান ছিলেন। এই সকল উদ্দেশ্যকে একটিতে একাত্র করা যাইতে পারে অর্থাৎ ঐ সমস্ত দূরবর্তী দেশে আমার পিতার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া। এরূপ মতলব আমার পিতার নিকট হইতে দীর্ঘকাল গোপন থাকিতে পারিত না; যাহাতে শাসনকর্তার খেদমতগারদের মধ্যে দণ্ডায়মান হওয়ার সুখভোগ করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার দরবারে গমনের অনুমতি চাহিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। প্রত্যুত্তরে অনুরোধ আসিল তাঁহার পক্ষে এত অধিক তকলিফ স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ, শাসনকর্তা শীঘ্রই আজিমাবাদে গমন করিবেন; সেখানে তিনি সর্বদা তাঁহার সংস্পর্শে সুখী হইবেন। এই উত্তর পাইয়া হেদায়েৎ আলী খাঁ তাঁহার ক্ষতি করা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া শহরে থাকাই সঙ্গত মনে করিলেন। এমন সময় সহসা সংবাদ প্রচারিত হইল যে, মারাঠারা পুনরায় আজিমাবাদে আসিতেছে: অচিরে সংবাদটী অনুমোদিত হইল। উড়িষ্যা ও বাঙ্গলা অভিযানে শাসনকর্তার অধিকাংশ সৈন্য নষ্ট হয়; তাহার অধীনে মুষ্টিমেয়

লোকমাত্র আছে দেখিয়া তিনি ঐ অঞ্চলে নিজেকে নিরাপদ মনে না করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন; ফলে তিনি পর দিনই তাঁহার রাজধানীর নিকট পৌঁছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হেদায়েত আলী খাঁ অশ্বারোহণ করিয়া মামুলী অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। শাসনকর্তা তখন যে স্থানে ছিলেন, তাহাকে মাটিপুরের জুজুর বলা হয়। তিনি ছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে; কিন্তু তাঁহার এত নিকটে পৌঁছার সংবাদ পাইয়া তিনি ঘোড়া থামাইয়া তাঁহার শরীফ অতিথিকে আরও অধিক সম্মানের সহিত আনয়নের জন্য তদীয় মন্ত্রীকে সম্মুখে পাঠাইলেন। শাসনকর্তাকে দেখিতে পাইয়া হেদায়েৎ আলী খাঁ ঘোড়া হইতে নামিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে থাকিতেই তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মন্ত্রীর সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে দুইখানা পত্র বিনিময় হয়, তাহা স্মরণ করিয়া শাসনকর্তা কতকটা বিরত বোধ করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিয়া তাঁহার ঘোড়া হইতে খুব নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া তদবস্থায়ই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। হেদায়েৎ আলী খাঁ তাঁহার ছোট ভাই মেহদী নেসার খাঁকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার পরিচিত অপর কয়েক জন আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া পুনরায় ঘোড়ায় চাপিলেন। শাসনকর্তার অনুচরদের সহিত মিশিয়া তিনি জনতার সঙ্গে নগরে প্রবেশ করিলেন, জনতার সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রাসাদে গমন করিলেন, শেষে জনতার সঙ্গে নিজের বাসায়ও গেলেন। কয়েকদিন পরে কৈফিয়ৎ দান চলিল, পরস্পরের অভিযোগ প্রদর্শিত হইল, ওজর দেখান হইল, সুবিধা দানের প্রস্তাব করা হইল। শাসনকর্তা ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে অনেক খেদমত পাইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাকে যে সকল পদে অভিষিক্ত করা হয়, তাহা হইতে তাঁহার পদত্যাগ কামনা করিতে-ছিলেন। অবশেষে একদিন তিনি সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহান হুজুর (অর্থাৎ আলীবর্দী খাঁ) তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু সন্দেহ পোষণ করেন, ফলে তাঁহার তর্থাৎ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট অনেকগুলি আদেশ আসে। সুতরাং তাঁহার কর্তব্য সুবাদারের মর্জি অনুযায়ী কাজ করা এবং মুর্শিদাবাদ গমনের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে পদত্যাগ করা, সেখানে যে তিনি শীঘ্রই

তাঁহার ক্রোধ শান্ত করার উপায় ও তাঁহার অনুগ্রহ পুনরুদ্ধারের সময় পাইবেন, তাহাতে তাঁহার কোনই সন্দেহ নাই।" তিনি আরও বলিলেন, "তিনি বিবেচনা করেন, ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা তাঁহার বন্ধুর চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে, তিনি অচিরে তাহা অপনোদন করিতে সমর্থ হইবেন; সেক্ষেত্রে কাজে কাজেই তিনি তাঁহার পদগুলি ফিরিয়া পাইবেন।" সতর্ক ভাষায় প্রকাশিত হইলেও এরূপ ভাষণ হেদায়েৎ আলী খাঁর পক্ষে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ বই ছিল না; সেই আমীর এখন তাঁহার চরিত্র ও তাঁহার সম্মানের জন্য ভয় অনুভব করিয়া অনুরোধ পালনে অসম্মত হইলেন এবং স্বভাবতঃই উদ্ধত ও একগুঁয়ে বলিয়া অটল রহিলেন। এরূপ একগুঁয়েমিতে হতভম্ব হইয়া এবং কিরূপে এরূপ লোককে বাগ মানাইবেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া শাসনকর্তা আমার মাতার বাসায় আসিলেন এবং তিনি যে অধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন, তজ্জন্য বহু ওজর দেখাইয়া এবং বহুবার নিজের অকপটতা ঘোষণা করিয়া তিনি ইতোপূর্বে তাঁহার স্বামীর নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই সারমর্ম ব্যক্ত করিলেন। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, তিনি যেভাবে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে সুবাদারের স্পষ্ট আদেশ পালন করিয়াছেন মাত্র। এই সাক্ষাৎকারে কোনই ফল ফলিল না। হেদায়েৎ আলী খাঁ পদত্যাগে অস্বীকৃত হইলেও কয়েকদিন পরে চাকরী ত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিলেন এবং বাদশাহের দরবারে গমনের অনুমতি পাইলেন। কেবল তাঁহার বিষয়কর্মের সুব্যবস্থায় কয়েক দিন কাটিল। তাঁহার সফরের জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি একটা শুভক্ষণের সন্ধান করিলেন; সেদিন ছিল ১১৫৬ হিজরীর ১৫ই রজব। যাহারা তাঁহার ভাগ্যের অনুসরণে সম্মত হয়? তাহাদের সঙ্গে তাঁহার সৈন্যদের একত্র করিয়া তিনি সেনাপতিকে হতবুদ্ধি করিয়া ছাড়িলেন। শালীনতা ও অধীনতার প্রত্যেকটা রীতি ভঙ্গ করিয়া এবং প্রত্যেক মনিব ও প্রভুর তাঁহার চাকরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে সম্মানের প্রত্যাশা করার অধিকার আছে, উহার খেলাফ করিয়া তিনি ঢাক পিটাইয়া ও পতাকা উড়াইয়া সমগ্র শহর পরিভ্রমণ করিলেন; অতঃপর তিনি বাঙ্গলায়

আলীবর্দী খাঁর পরিবারের সহিত হেদায়েৎ আলী খাঁর সম্পর্কচ্ছেদ

সুবাদারের গোমস্তা রায় বালে কিষাণের পুকুর পাড়ের আবাসে শিবির স্থাপন করিতে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার ছোট ভাই ও সৈন্যদের বখশী মেহদী নেসার খাঁ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। শাসনকর্তা এই আমীরকে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করিতেন; তিনি তাঁহাকে কেবল তাঁহার একজন সর্বাপেক্ষা অকপট বন্ধু নহে, একজন সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী কর্মচারী বলিয়াও মনে করিতেন। তাহার সাহস ও সরলতা জনসাধারণেরও শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করে। শাসনকর্তার সহিত এই কর্মচারীটি বহু বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন; ঐ ঘনিষ্ঠতা হইতে তিনি বহু উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারিতেন; তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি তাঁহার চাকরীতে ইস্তেফা দিলেন। তাঁহার ভ্রাতার অবমাননার সমর্থন করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্যের শরীক হইতে মনস্থ করিলেন। শাসনকর্তা বৃথাই তাঁহার পদত্যাগ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, বৃথাই তিনি তাঁহাকে সমস্ত চাকরী ত্যাগের পরিণাম জানাইয়া দিলেন; বৃথাই তিনি তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন ও তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন এবং অন্যান্যকে তাঁহার সহিত কথা বলিতে ও তাঁহাকে অনুরোধ করিতে পাঠাইলেন। ঐ কর্মচারীটি তাঁহার ভ্রাতার অনুসরণে অবিচলিত রহিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহার বাসায় গিয়া বলিলেন, তিনি তাঁহাকে বলপূর্বক তাঁহার প্রাসাদে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। এই সমুদয়ে কোনই কাজ হইল না। কর্মচারীটি নগর ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভ্রাতার সহিত যোগদান করিলেন। দুষ্ট লোক বলিয়া ভোজপুরের জমিদারদের নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়; তাঁহাদের জমিদারী দিয়াই তাঁহার যাওয়ার কথা। তাঁহারা তাঁহাকে আকস্মিক আক্রমণে লুণ্ঠন করার জন্য গোপনে ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছেন বলিয়া সংবাদ রটিলেও তিনি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া ঠিক সেই পথেই গমন করিলেন। এতদূর পর্যন্ত তাঁহার ভ্রাতাকে আগাইয়া দিয়া তিনি নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বেসরকারী লোকের ন্যায় নিজগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। হেদায়েৎ আলী খাঁ ঘোর বর্ষায় যাত্রা করেন; একটা আর্দ্র জনপদের ভিতর দিয়া তাঁহার সফর চালাইয়া তিনি অতি পরিশ্রমে ফররযাবাদে পৌঁছিলেন; উহা ছিল আবুল মনসুর খাঁর বাসস্থান।

পর দিন তিনি ঐ সুবাদারকে সালাম দিতে গমন করিলেন। আমীরের অপদস্থতার জন্য তিনি কতদূর দায়ী, শেষোক্ত ব্যক্তি তাহা জানিতেন বলিয়া তাঁহার প্রতি উচ্চসম্মান প্রদর্শন ও একটা মোটা বৃত্তি দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করা নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু ঐ আমীরের অন্যান্য উদ্দেশ্য থাকায় এবং সেদিনই তাঁহার সফর পুনরারম্ভ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় আর ২।৩ ঘণ্টা মাত্র বিলম্ব করিলেন। বাদশাহের দরবারের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া তিনি একটা দুঃখজনক সফরের পর সেখানে পৌঁছিলেন। আমরা এখন তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া যাইব। তাঁহার ও আবুল মনসুর খাঁর ইতিহাসের অবশিষ্ট অংশ আমাদের পুস্তকের পরবর্তী অধ্যায় সমূহের জন্য সংরক্ষিত রহিল। তাহাতে আমরা মুহম্মদ শাহ ও আহমদ শাহের রাজত্ব এবং সাম্রাজ্যের রাজধানীতে যে সকল বিপ্লব ঘটে, তাহা বর্ণনা করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। বর্তমানে আমরা ১১৯৪ হিজরী পর্যন্ত বাঙ্গলা ও আজিমাবাদের বিপ্লব সম্পর্কে, বিশেষতঃ আলীবর্দী খাঁর যে বিখ্যাত বংশ ঠিক এই প্রদেশগুলিতেই ক্ষমতা, গৌরব ও ঐশ্বর্যের শিখরে পৌঁছিয়া এখন পতিত ও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, তাহার ইতিবৃত্ত একটা আলোচ্য বিষয়ে ও একটিমাত্র খণ্ডে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে হয়। এই কার্য আমরা নিজেদের উপর যাহার ভার ন্যস্ত করিয়াছি—সম্পন্ন হওয়া মাত্র আমরা প্রকৃত সাহায্যকারী ও প্রকৃত অনুগ্রহদাতা সর্বশক্তিমান আল্লার সাহায্যে আমাদের হিন্দুস্থানের ইতিহাসের যে অংশ বিশেষভাবে মুহম্মদ শাহ, তাঁহার পুত্র আহমদ শাহ্ ও তদীয় পৌত্র ২য় আলমগীরের রাজত্ব সংক্রান্ত, তাহা পুনরায় আর এক অধ্যায়ে বিবৃত করিব। যে সকল প্রসিদ্ধ বা খ্যাতনামা ব্যক্তি শাহজাহানাবাদ, লাহোর ও ইলাহাবাদের রঙ্গমঞ্চে বিশিষ্ট লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হন, আমাদের বর্ণনার মাঝে মাঝে তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে; এযাবত কালের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে যে সকল ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে, শেষ দুই খণ্ডের জন্য তাহা সংরক্ষিত রাখিয়া আমরা সঠিকভাবে তাহার যতটুকু জানিতে পারিব, সময় সময় ঠিক ততটুকু উল্লেখ করিব; আল্লাহ্ যেন আমাদিগকে আমাদের ওয়াদা পালনের তওফিক দেন!

শাসনকর্তা আজিমাবাদে পৌঁছিলে মারাঠাদের নিকটবর্তী হওয়ার জনরব দৃঢ়তর হইল। ইহাতে ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার হওয়ায় তাঁহার মনে হইল

সমস্ত অধিবাসীর মন শান্ত করা এবং তাহাদের দেহ ও সম্পত্তি নিরাপদ করার জন্য যে একমাত্র পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, তাহা হইল নগরের চতুর্দিকে একটা প্রাচীর উত্তোলন। ইতোপূর্বেই এরূপ একটা প্রাচীর ছিল সত্য, কিন্তু তাহা এত উপেক্ষিত, ক্ষয়প্রাপ্ত ও তদুপরি এত গৃহপূর্ণ ছিল যে, সেগুলি হইতে ইহা কদাচিৎ চিহ্নিত করিতে পারা যাইত। কাজেই তিনি হুকুম করিলেন যে, (নগরের) চতুর্দিকে একটা গভীর খাদ খনন করিতে হইবে এবং ইহা হইতে খনিত মাটি পুরাতন দেওয়ালের পশ্চাতে ও উপরে ফেলিতে হইবে; তাহা হইলে উহা উচু ও মজবুত হইবে। কিন্তু পুরাতন দেওয়ালের পাশে বা উহার ধারে ইতোপূর্বে নির্মিত গৃহগুলি ধ্বংস না করিয়া ইহা করা সম্ভবপর ছিলনা বলিয়া ইহা মালিকদের মধ্যে অনেক বিরক্তি প্রকাশ ও অনেক অসন্তোষ না ঘটাইয়া পারিল না। ব্যক্তিগতভাবে তাহাদিগকে যে অসুবিধা ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে মোটের উপর তাহাদের যে নিরাপত্তা ও মঙ্গল সাধিত হয়, তাহারা তাহা দেখিতে পাইল না; তাহারা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ও অভিযোগ প্রকাশ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারিল না। কিন্তু কার্যটির উপকারিতা এত স্পষ্ট ছিল যে, তাহাদের অভিযোগে কর্ণপাত করা সম্ভবপর ছিল না। অত্যল্পকাল মধ্যে প্রাচীর মৃত্তিকা হইতে ক্রমশঃ উর্ধ্বে উঠিয়া ভবিষ্যতের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করিল। কালক্রমে দেশ যখনই মারাঠাদের দ্বারা পদদলিত হইত (এবং কয়েক বারই এরূপ ঘটে) তখন কেবল বিপুল সংখ্যক লোকই প্রাচীরাভ্যন্তরে গমন করিয়া নিরাপদ হইত না, এমনকি যে সকল অজস্র গৃহ ও বসতি বাহিরে থাকিত, সেগুলিও দুর্গ প্রাকারের কামানদ্বারা সফলতার সহিত লুণ্ঠন হইতে রক্ষিত হইত, ফলে যে সকল লোক এত প্রকাশ্যে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহারাই কৃতকার্যের ঔচিত্য স্বীকার ও তাহাদের শাসনকর্তাকে উপযুক্ত প্রশংসা দ্বারা ভারাক্রান্ত করিতে অগ্রণী হয়। অবশেষে এই কার্য সমাপ্ত হইলে শাসনকর্তা নিশ্চিন্তে তাঁহার প্রাসাদে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সেখান হইতে তিনি সময় সময় চিত্ত-বিনোদানের জন্য এই গরীবের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমাদের বাসায় আসিতেন; তাঁহাকে তিনি সর্বদাই কিছু উপহার দিতেন। খুল্লতাতের নিকট হইতে তিনি সমগ্র ত্রিহুত পরগণা বা জিলা নিজস্ব জায়গীর অর্থাৎ ভরণ-পোষণার্থ

ভূমিরূপে প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ জনপদ আবাদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন বলিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিয়া স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিতে ও কিছুকাল সেখানে প্রবাস করিতে মনস্থ করিলেন। এই গরীবের চাচা মেহদী নেসার খাঁর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্তি থাকায় তিনি সর্বদাই তাঁহার পদত্যাগে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার যাত্রার দিনে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে আমার জন্য জেদ ধরিলেন। সেখান হইতে তিনি তাঁহার সফরে বহির্গত হইয়া বেলওয়ার জিলায় তাঁহার বাসা লইলেন। একটা প্রাচীন রাজবংশ সেখানে বাস করিতেন; এত দীর্ঘকাল যাবত তাঁহারা ছিলেন সেই দেশের বাশিন্দা। তাঁহার সাহায্যে এখন ইহা সম্পূর্ণরূপে বসতিপূর্ণ ও বর্ধিত হইবে, এই আশায় এখন তাহা তাঁহার বন্ধু মেহদী নেসার খাঁর পরিচালনাধীনে স্থাপিত হইল। অনুরূপভাবে তিনি দেশের আরও কয়েকটি অংশ একই উদ্দেশ্যে এবং একই নির্দেশসহ তাঁহার অন্যান্য বন্ধুর মধ্যে বিতরণ করিলেন। ইহা এত অধিক বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন করা হইল যে, লোকে শীঘ্রই ইহার লোকসংখ্যা ও রাজস্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারিল। তিনি সে দেশে দীর্ঘ প্রবাসে থাকা সঙ্গত মনে করায় তাঁহার পত্নী আলীবর্দী খাঁর কন্যা আমিনা বেগম এবং তাঁহার হারেমের অধিকাংশ মহিলা ও রমনীকে আনাইয়া লইলেন। অনুরূপভাবে তিনি এই গরীবের মাতাকেও অত্যন্ত অনুগ্রহস্বরূপ যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন; তিনি ইহাও বলিলেন যে, যদি তাঁহার খরচ চালাইবার টাকা না থাকে, তবে যেন তিনি তাঁহার খাজাঞ্চীর নিকট আবেদন করেন; সেই সুযোগ্য মহিলার প্রতি তিনি এতই অনুরক্তি পোষণ করিতেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ সম্পর্কে তাঁহার এতই উচ্চধারণা ছিল! নতুবা এরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ অনুরুক্তি কদাচিৎ পিতৃত্ব বা আত্মীয়তার ফল; অনুরূপক্ষেত্রে রক্ত-সম্পর্কের প্রতিও এত অধিক সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শিত হয় না। এই গরীব নিজে ও তাঁহার ছোটভাই আলী নকী খাঁ বাহাদুর উভয়েই আমরা তখন আমাদের বিখ্যাত অগ্রজ সয়্যিদ হেদায়েৎ আলী খাঁর সঙ্গে শাহজাহানাবাদে ছিলাম।

আমরা একাধিকবার মুস্তফা খাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার অর্জিত অসীম প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বলিয়াছি। কাজেই যে নির্ভীক সাহস ছিল তাঁহার চরিত্রের

বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্রের তিনি যে বহু প্রয়োজনীয় খেদমত করেন, তাহা বলা নিরর্থক। তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক এই গুণগুলিই তাঁহার ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এগুলি তাঁহার মর্যাদা আলীবর্দী খাঁর মনে এত অধিক উন্নত করে এবং সমগ্র দেশে তাঁহার প্রভাব এত বেশী বিপুল হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারিত, চাকরীতে এমন কেহই ছিল না। অপিচ সুবাদারের কৃতজ্ঞতাও সীমাহীন হইয়া দাঁড়ায়; প্রত্যহ তিনি তাঁহাকে বিপুল উপহার দিতেন ও তাঁহার মস্তকে সর্বোচ্চ সম্মান জড় করিতেছিলেন। একবার তিনি তাঁহাকে বার লক্ষ টাকা পারিতোষিক দেন। তিনি তাঁহার সৈন্যদল কার্যকরীভাবে ৭০০০ পদাতিকে বর্ধিত করেন; তাঁহার খুল্লতাত উড়িষ্যার শাসনকর্তার সেনাদল পাঁচ হাজারে উন্নীত করা হয়। আরও অনুগ্রহ স্বরূপ তাঁহার পদ ও সৈন্যদল ঐ শাসনকর্তার পুত্র আবদুর রসুল খাঁর নিকট হস্তান্তরিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর ইনি মহাড়ম্বরে গমন করিয়া তাঁহার শাসন কর্তৃত্ব দখল করেন। তাঁহার পাঁচ হাজারী মনসবদারী ও সাত হাজার অশ্বারোহীদল এবং ঝালরযুক্ত পাল্কী ও অন্যান্য সম্মানও পদচিহ্ন ভিন্ন মুস্তফা খাঁ নিজে তদুপরি এত সুবিধা ভোগ করিতেন যে, তিনি অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত বাস করিতেন। তাঁহার আস্তাবলে ৫০টি হস্তী ছিল। কি শাসন, কি রাজস্ব প্রত্যেকটা বিষয়ে ও যাবতীয় সামরিক ব্যাপারে তাঁহার প্রতাপ এত অধিক ছিল যে, ঠিক যখন স্বার্থের বশে ঈর্ষা ও নিন্দায় দরবার পূর্ণ হইতেছিল, তখন খোদ আলীবর্দী খাঁর আত্মীয়েরাও তাঁহাদের কোন মতলব হাসিল করিতে হইলে নিজ স্বার্থের জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইতেন। এমনকি যে হাজী আহমদ ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার তিন কন্যার জামাতাদের পিতা এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা ভোগকারী, তিনি পর্যন্ত সেনাপতির অসীম প্রতিপত্তিতে বিরক্তি বোধ করিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র দ্বারা রাহুগ্রস্ত ও তাঁহার গুরুত্বের নিকট পরাভূত হইয়া তিনি তাহা সহ্য করার চেয়ে বরং নিজেকে তাঁহার ভ্রাতার সংসর্গে বঞ্চিত ও গৃহ-হইতে নির্বাসিত করিয়া যে নগরে তিনি শুজা খাঁর জামানার ন্যায় আদিকাল হইতে বাস করিতে অভ্যস্ত, তাহা ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার নিজ বাড়ী ত্যাগ করিয়া

দূর-দূরান্তরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আজিমাবাদের শাসনকর্তা জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁর সহিত বাস করিতে গমন করিলেন। অসন্তোষের বিষয় ছিল হুগলীর শাসন কর্তৃত্ব, হাজী ইহা নিজের জন্য চাহিলেন। কিন্তু আলীবর্দী খাঁ তাহা হাজীর ২য় পুত্র সয়িদ আহমদ খাঁকে প্রদান করিলেন; উড়িষ্যার শাসন কর্তৃত্ব হারাইয়া ইনি বেসরকারী লোকের ন্যায় প্রায় বিনা আয়ে ও বিনা চাকরীতে দরবারে বাস করিতেছিলেন। আলীবর্দী খাঁ মনে করেন যে, মুর্শিদাবাদের সায়র অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় শুল্ক, আমদানী ও রফতানী দ্রব্যের শুল্ক ও প্রাপ্য হইতেই তাঁহার ভ্রাতা হাজীর জীবিকানির্বাহের যথেষ্ট সংস্থান হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তি এই প্রত্যাখ্যান সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া স্বাস্থ্যের জন্য আজিমাবাদে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করেন ও প্রাপ্ত হন। ইহা ১১৫৭ সনের কাছাকাছি সময়ের কথা।

প্রায় একই সময় (বর্ষাকাল ইতোপূর্বেই শেষ হওয়ায়) মারাঠারা পুনরায় দেখা দিল। ভাস্কর পণ্ডিত আলী ভাকরাওল নামক দাক্ষিণাত্যের এক বিখ্যাত সেনাপতিকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে ৬।৭ হাজার অশ্বারোহীর পরিচালনা ভার প্রদান করেন; এখন তিনি তাঁহার বিশেষ দক্ষতা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিশ হাজার অশ্বারোহীসহ উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার সীমান্তে উপনীত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আলীবর্দী খাঁকে পরাজিত বা তাঁহার নিকট হইতে চৌথ আদায় করিয়া নিজের সুনাম পুনরুদ্ধার করা। কিন্তু এরূপ অবিরাম যুদ্ধাবস্থা ও এত অধিক একটানা অভিযানে ক্লান্ত সুবাদার দেহ-মনের অবিশ্রান্ত ও সমস্ত পরিশ্রমের চাপে নিজেকে অবসন্ন বোধ করিতেছিলেন। এই কারণ ব্যাতিরেকেও তিনি কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হন; তাহা তাঁহার স্বাভাবিক কার্যতৎপরতার পক্ষে ক্ষতিকর ও প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি এখন কোন চতুরতার চোট দ্বারা বেয়াড়া শত্রু-হইতে মুক্ত হইতে মনস্থ করিলেন। কাজেই তিনি প্রচার করিলেন যে, তিনি নিজ দেহকে কিছু শান্তি ও সৈন্যদের কিছু বিশ্রাম দিতে চাহেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিরূপে আক্রমণকারীদের ধ্বংস করা যায় ও কিরূপে মারাঠা সেনাপতি ও তাঁহার প্রধান কর্মচারীদিগকে এমনভাবে ফাঁদে ফেলা চলে যে, কর্মচারী, সৈন্য সকলই শূন্যতার রাজ্যের যাত্রী

হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে মুস্তফা খাঁর সঙ্গে পুনঃ পুনঃ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাস্করের শক্তি ও সতর্কতা এবং বাঙ্গলার মুসলমানদের নিরুদ্যমতা এরূপ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও বিপজ্জনক করিয়া তুলিল; পক্ষান্তরে মুস্তফা খাঁ এ কার্য অস্বীকার করিলেন। তাঁহাকে তাঁহার অংশ সম্পাদনে পরাঙ্মুখ বলিয়া বোধ হইল। কাজেই সুবাদার তাঁহার মনে সম্মান ও মূল্যবান উপহার দেখাইয়া তাঁহার লোভ জাগ্রত করিলেন। ভাস্কর ও তাঁহার প্রধান কর্মচারীদিগকে তাহার জালের ভিতরে আনিতে পারিলে তিনি তাঁহাকে আজিমাবাদ প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার উচ্চাকাঙ্খা উদ্দীপিত করিলেন। মুস্তফা খাঁ ছিলেন যেমন সাহসী ও কর্মঠ, তেমনি মতলববাজ ও কৌশলী; এ সকল সুবিধার সহিত যোগ হয় তাঁহার কথা ও কাজের দক্ষতা; তিনি এত বেশী প্রলোভন প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাশিত কার্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি ভাস্করের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিলেন। শান্তি ও নিরুদ্রপতাই যেন তাঁহার রণ-ক্লান্ত প্রভুর একমাত্র কাম্য, এভাবে তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মিটমাট করার জন্য তাঁহার খেদমত দিতে চাইলেন। এই সকল প্রস্তাবের প্রথম ফল হইল মারাঠা সেনাপতিকে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে কম মনোযোগী ও সাক্ষাৎকারে আসিতে সমধিক ইচ্ছুক করা; ঠিক ইহাই ছিল লক্ষ্যবস্তু। এই সকল প্রস্তাবে ভাস্কর শান্তিকামী মেজাজ প্রদর্শন ও মুস্তফা খাঁর সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় রাজা জানকীরামের সহিত তিনি তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলেন।

মারাঠা সেনাপতি-দিগকে ফাঁদে ফেলার জন্য আলীবর্দী খাঁর সঙ্কল্প

ইনি ছিলেন আলীবর্দী খাঁর দেওয়ান এবং কাজেকাজেই প্রভুর সর্বাপেক্ষা আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি। আলীবর্দী কেবল তাঁহাকেই তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি জ্ঞাপন করেন। ইহা ছিল সাক্ষাতের ছলে যদ্বারা ভাস্কর ও তাঁহার প্রধান সেনানায়কদিগকে নিরস্তিত্বের মরুভূমিতে চালান দেওয়া যাইতে পারে, এমন কোন ফন্দী উদ্ভাবন। ভাস্কর সম্প্রতি কাটোয়ায় আগমন করেন; দূতদ্বয় তাঁহাদের পাঠ সম্যকরূপে আয়ত্ত করিয়া সেখানে গমন করিলেন। এদিকে সুবাদার তাঁহার প্রস্তাবে আরও অধিক

সম্ভাবনা দানের জন্য মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে একদিনের পথ দূরে মনকরায় গমন করিলেন; সেখানে ভাগিরথীর তীরে তাঁহার শিবির স্থাপিত হইল। আলোচনাকারীদ্বয় তখন ভাস্করের সহিত সভা করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে এত দিকে ঘুরাইলেন, তাঁহার ধীশক্তিকে এত কার্যকর রূপে যাদু করিলেন ও সর্বাপেক্ষা পবিত্র হলফ দ্বারা সমর্থিত এত গম্ভীর প্রতিশ্রুতি প্রয়োগ করিলেন যে, যে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা, তাহাতে তাঁহার মঞ্জুরী দানের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি বাঙ্গলার সুবাদারকে দর্শন দানে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি তখনও কিছু সন্দেহ পোষণ করিতেন বলিয়া ও পানির গভীরতা পরীক্ষা করিতে চাহেন বলিয়া তিনি আলী-ভা-করাওলকে বাহ্যতঃ আলীবর্দী খাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দরবারে ও সৈন্যদলের সর্বাংশে তিনি কি দেখেন তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে প্রেরণ করিলেন। ঐ সেনাপতির উপর তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থা স্থাপন করেন বলিয়া তিনি কেবল তাঁহার বিবরণীতে বিশ্বাস করিতে ও তৎপরে তাঁহার সমস্ত সেনানায়কদের লইয়া নিজে সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহাদের সাজান পরিকল্পনায় ফল হইয়াছে দেখিয়া আলোচনাকারীদ্বয় তাঁহাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তনকালে আলী-ভা-কে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া গেলেন। কপটতা আফগান জাতির বৈশিষ্ট্য বলিয়া বোধ হয়; মুস্তফা খাঁ ছিলেন তাহাতে বিশেষভাবে সুদক্ষ; পথে তিনি এত চাতুরীপনার সহিত কথাবার্তা বলিলেন ও আলী-ভার অন্তরে এরূপ দাগ কাটিলেন যে, তিনি সর্বাপেক্ষা আশাপ্রদ অভ্যর্থনা লাভের প্রত্যাশা করিতে প্ররোচিত হইলেন। আলীবর্দী খাঁ নিজেও এই সকল মতের পোষকতা করিলেন; তাঁহার কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তিনি ছিলেন বরাবরই সর্বাপেক্ষা চিত্তহারী লোক; তাঁহার মনোরম আচরণ ও যাদুকরী প্রকাশ ভঙ্গিমায় তিনি ঐ কর্মচারীটির হৃদয়ে এত সাফল্যের সহিত ক্রিয়া করিলেন যে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হৃদয় জয় করিয়া ফেলিলেন। মিষ্ট বচন যাহা আরম্ভ করে, মূল্যবান উপহার তাহা সম্পূর্ণ করিল। লোকটাকে প্ররোচিত করান গিয়াছে দেখিয়া তিনি মুস্তফা খাঁর সহিত তাঁহাকে তদীয় প্রভুর নিকট ফেরত পাঠাইলেন। উভয় কর্মচারী এত সফলতার সহিত

বেড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে পোষিত সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য এত দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করিলেন যে, ইতোপূর্বে তাঁহার দূতের ন্যায় তিনিও দীক্ষিত হইয়া গেলেন। যখন আলোচনা চলিতেছিল ও উহার পানির বর্ণ লুকাইত রাখার জন্য নদীতে উপাদান নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, আলীবর্দী খাঁ বাঙ্গলায় উৎপাদিত হউক কিম্বা বিদেশ হইতে আমদানী করা হউক, বিচিত্র, মূল্যবান বস্ত্র বা রসাল ফল প্রত্যেকটি বস্তুদ্বারা তাঁহাকে অবিরত প্রণোদিত করিয়া মারাঠার মেজাজ খোশ রাখিতে বিরত হন নাই। এত শান্তিকামী ও মার্জিত উপায়ে মাথা নিচু করা হয়, তাহাতে অপর ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে যে বিতৃষ্ণা পোষণ করিতেন, তাহা সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়া যায় এবং তিনি তাঁহার মনে যে অবিশ্বাস পোষণ করিতেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রশমিত ও উৎপাটিত হয়; এক কথায় ঐ মারাঠার মন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি আলীবর্দী খাঁর অনুরাগী হইয়া পড়েন; তাঁহার মন এত সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় যে, ইতোপূর্বেই এত অধিক শক্তির অধিকারী না হইলে ও তাঁহার চিন্তা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অভিযানে নিমগ্ন না থাকিলে তিনি যে তাহার পক্ষে যোগদান করিয়া তাহার খেদমতে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহ। রাজা জানকী রাম হিন্দু ও মারাঠা দুইই বলিয়া তাঁহার সংস্পর্শে গোটা দিনই কাটাইয়া দিতেন এবং ঠিক ঐ কারণে এই ব্যাপারে অত্যন্ত সাহায্যকারী বলিয়া প্রমাণিত হন। অবশেষে বহু পারস্পরিক হলফ বিনিময়ের পর স্বীকৃত হইল যে, ভাস্কর তাঁহার সমস্ত সাধারণ কর্মচারীসহ মনকরার প্রান্তরে বাঙ্গলায় সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; শেষোক্ত ব্যক্তি তখন আমানীগঞ্জে ও ভাস্কর কাটোয়ায় শিবির পাতিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা ছিল দশ ক্রোশ দূরে। উভয় শিবির হইতে মাঝামাঝি দূরে অবস্থিত বলিয়া দুই পক্ষই মনকরা সম্পর্কে একমত হইল। সাক্ষাৎকারের দিন জানাজানি হইবা মাত্র সেখানে খোলা ময়দানে বিরাট আকারের এক মহাড়ম্বর তাম্বু খাটান হইল; ইহার সম্মুখে কিছুটা জমি কানাৎ দ্বারা ঘিরিয়া এক বিশাল প্রাঙ্গন গঠিত হইল। সাক্ষাৎকারের প্রাতে সুবাদার তাঁহার সমগ্র বাহিনীসহ অগ্রসর হইলেন; তাঁহার সৈন্য-দিগকে দূর রাখিয়া তিনি তাম্বুতে গমন করিয়া সেখানে তাঁহার জন্য স্থাপিত

মসনদে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি ও তাঁহার নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র সয়িদ আহমদ খাঁ, আতাউল্লাহ্ খাঁ ও মীর কাজেম খাঁ প্রভৃতি কতিপয় বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন; কিন্তু জানকী রাম, মুস্তফা খাঁ ও মির্জা হেকীম বেগ খাঁ ভিন্ন একটি প্রাণীও গোপন কথা জানিতেন না। ফলে এরূপ সাক্ষাৎকারের দৃশ্য দর্শনের জন্য নগর হইতে সর্বশ্রেণীর অজস্র বিখ্যাত লোক ময়দানে সমবেত হইল; তাহাদের শান্তিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা তাঁহারা প্রতারণার খুব বড় উপায় হইয়া দাঁড়াইলেন। আলোচনাকারী-দ্বয় ছিলেন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাকারী। সর্বাপেক্ষা পবিত্র হলফ দ্বারা প্রতিজ্ঞায় বাধ্য ছিলেন বলিয়া তাঁহারা মারাঠা সেনাপতিকে আনয়ন করিতে আগাইয়া গেলেন। ইত্যবসরে বঙ্গ-বাহিনীর সেনাপতিগণ ও প্রধান কর্মচারীবৃন্দের সকলেই সশস্ত্র ও অশ্বারূঢ় হইয়া তাম্বুর পশ্চাতে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত দূরত্বে স্থান গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেকেই তাঁহার লোকজন লইয়া সর্বত্র প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। অধিকন্তু বিখ্যাত লোক বা সুনামযুক্ত কর্মচারী হিসাবে আরও কয়েকজন তাম্বুর আশেপাশে স্থান গ্রহণ করিলেন। পক্ষান্তরে আরও অনেকে সুবাদারের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন; যে কোন আদেশ পাইলে তাঁহারা তাহা পালন করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কেবল তখনি তিনি তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ও আতাউল্লাহ্ খাঁকে তাঁহার মতলবের কথা অবগত করান সঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহাদিগকে সতর্ক করার চরম মুহূর্ত উপস্থিত হওয়ায় ঠিক এই সকল কথায় মির্জা হেকীম বেগকে এই নাজুক কার্যের ভার প্রদত্ত হইল! "মির্জা! সয়িদ আহমদ খাঁ ও আতাউল্লাহ্ খাঁ তাম্বু দর্শন করিয়াছেন কি? না! তাহা হইলে আমার ইচ্ছা আপনি তাহাদিগকে সেখানে লইয়া যান, এ বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত কি, তাহা যেন আমি শুনিতে পাই। ইহা অত্যন্ত জাঁকাল"। এই আদেশের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করিয়া মির্জা ঐ আমীরদ্বয়কে তাম্বুর ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি সংক্ষেপে তাঁহাদিগকে কি ঘটিতে যাইতেছে, তাহা জানাইয়া প্রস্তুত ও সতর্ক থাকিতে অনুরোধ করিলেন। এক মুহূর্ত পরে তাঁহারা সকলেই পুনরায় বাহিরে আসিয়া সুবাদারকে বলিলেন, তাম্বুটি সম্পূর্ণ মনোরম ও এরূপ সেনাপতির উপযুক্ত। এই কথায় সুবাদার বুঝিলেন যে,

তাহারা ফন্দী অনুমোদন করিয়াছেন ও ইহাতে তাঁহাদের অংশ সম্পাদন করিবেন। এযাবতকাল সুবাদার রাজার হালে বসিয়া ভাস্করের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁহার নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ পাইতেছিলেন। কিন্তু ঐ সেনাপতি যখন তাম্বুর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, ঠিক সে সময় অল্প কিছু সংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তিও কৌতুহলের বশেও তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য ইহার নিকটবর্তী হইলেন; এমন কি সুবাদারের মাহুত পর্যন্ত তাঁহার হাতীকে ইহার প্রাঙ্গণের ভিতরে লইয়া আসিল এবং তাহার প্রভুর পশ্চাতে, কিন্তু তাঁহার মাথার নিকট স্থান গ্রহণ করিল। এই মুহূর্তে ভাস্করের প্রায় ৫০ জন অগ্রগামী কর্মচারী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাম্বুর ভিতরে আসিলেন। তাঁহাদের সকলেই ছিলেন সশস্ত্র; তাঁহাদের এই পূর্ব-সতর্কতাকে তাঁহারা তাঁহাদের তরবারি ছুঁইয়া[২০] চুক্তির শর্ত সম্পাদনের শপথ লইতেন, এই দাবী দ্বারা আপাতরম্য করা হইল। ইহাদের মধ্যে ২২ জন ছিলেন বিখ্যাত ও চরিত্রবান সেনাপতি; ভারতে যাহাদিগকে 'অম্রিক' বলে, অন্যেরা ছিলেন তাঁহাদের অন্তর্গত; অন্যেরা অগ্রসর হইলে তাঁহারাও আগাইয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁবুর প্রাঙ্গণে থামিলেন। এই সময় ভাস্কর তাঁহার ঘোটকী হইতে অবতরণ করিয়া ডাইন হাতে মুস্তফা খাঁর ও বাম হাতে জানকী রামের হাত ধরিয়া তাঁবুর ভিতরে আসিলেন। তাঁহার একদল কর্মচারী তাঁহার লাগালাগি পিছনে পিছনে; তাঁহারা এখন তাঁহার দুইধারে ছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সকলেই ছিলেন সশস্ত্র এবং সকলের হাতই ছিল তাহাদের তরবারির মুষ্টিতে। আর একদল তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ বন্ধ করিল; তাহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিই ছিল ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ। আলোচনাকারিদ্বয় নিজেদের আলাদা করার জন্য এই মুহূর্তের সুযোগ লইলেন। দুইজনেই অল্প কয়েক মিনিটের জন্য চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছেন বলিয়া বাহানা করিয়া সেনাপতির হাত ছাড়িয়া দিলেন। ইত্যবসরে তিনি তাঁবুর প্রাঙ্গণের দৈর্ঘ্যের তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখন সুবাদার স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সকল বিখ্যাত কর্মচারীর মধ্যে সাহসী ভাস্কর পণ্ডিত কে? মির্জা হেকিম বেগ এবং আরও বহু লোকে তাঁহার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া ইহার উত্তর দিলেন; তাঁহাদিগকে এই উদ্দেশ্যে

সেখানে স্থাপন করা হয়। প্রশ্নটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল। সুবাদার তিনবার এই প্রশ্ন করিলেন, তিনবারই আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া ইহার উত্তর দেওয়া হইল। ভাস্কর এখন নিকটে আসিয়া পড়িলে সুবাদার তাঁহার লোকদিগকে ঐ দস্যুদের আক্রমণের আদেশ দান করিলেন। কিন্তু দর্শকদের কেহই অভিপ্রেত দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া তাঁহাদের সকলেই বিস্ময়ে ভয়াভিভূত ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু মীর কাজেম খাঁর এই অবস্থা ছিল না; তিনি তাঁহার আদেশ কি জিজ্ঞাসা করিলে সুবাদার দৃঢ়স্বরে আদেশের পুনরুক্তি করিয়া জওয়াব দিলেন। ঐ সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তরবারি নিকোষিত করিলেন, বরখোরদার বেগ এবং আরও কয়েকজন লোকেও অনুরূপভাবে তরবারি বাহির করিলেন; সকলেই সোজা তাঁহাদের সম্মুখে দৌড়াইয়া গেলেন। মুস্তফা খাঁর ন্যায়ই বলবান ও সাহসী তাঁহার ৫।৬ জন কর্মচারী ঘটনাক্রমে ভিতরে আসিতেছিলেন। অসি-নিষ্কোষিত দেখিয়া তাঁহারাও তরবারি বাহির করিলেন এবং সকলেই একযোগে মারাঠাদের দিকে ধাবিত হইলেন। মীর কাজেম খাঁ সর্বাগ্রে ছিলেন বলিয়া ভাস্করের সহিত তিনিই যুদ্ধ করিলেন এবং এক আঘাতেই তাঁহাকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ইহা যুদ্ধের সঙ্কেত বলিয়া বোধ হইল।

সাক্ষাৎকারে আসিয়া অধিকাংশ সেনা-নায়কসহ মারাঠা সেনাপতি নিহত

অপ্রস্তুত হইলেও মারাঠারাও তৎক্ষণাৎ তাহাদের পক্ষে তরবারি বাহির করিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তাঁহারা এত অধিক তেজস্বিতার সহিত লড়িতে লাগিলেন যে, যুদ্ধ তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড, রক্তক্ষয়ী ও সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়াইল। চতুর্দিকে মস্তক ও হস্ত সঞ্চালিত এবং প্রতি মুহূর্তে বহু লোক ভূপতিত হইতে লাগিল। ফলে যে অজস্র বিখ্যাত ব্যক্তি দর্শক হিসাবে আগমন করেন, তাঁহারা স্রোত ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখিয়া মুহূর্তে প্রকাশ্যে স্বীকৃত তাঁহাদের বীরের চরিত্র ভুলিয়া গিয়া সেই গোলযোগ ও হত্যার স্থান হইতে পশ্চাদ্বর্তন করিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে আকস্মাৎ তাম্বুর দেওয়াল নামাইয়া দেওয়া হইল। মুস্তফা খাঁ মাত্র যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের সময় পান। তিনি তাঁহার অশ্বে কশাঘাত করিয়া তাঁহার সৈন্যদলের পরিচালনা-ভার গ্রহণার্থে

ছুটিয়া গেলেন। তাহাদিগকে লইয়া তিনি বিদ্যুতের ন্যায় মারাঠা বাহিনীর উপর আপতিত হইলেন; তাহারা তখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রভুর নিকট তৎক্ষণাৎ সওয়ার হইয়া তাঁহার সাহায্যে ধাবিত হওয়ার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। সুবাদারের ২০ গজ দূরে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছিল: আর কাহারও প্রতি দৃকপাত না করিয়া প্রত্যেকেই ছিল তাঁহার সম্মুখস্থ শত্রুর উপর নিবিষ্টচিত্ত; তিনি তাঁহার হাতে ঢাল লইয়া ও তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া মসনদে বসিয়াছিলেন; সেই সময় অল্প কয়েক জন ভিন্ন বেশী লোক তাঁহার নিকটে ছিল না। ইহারা তাঁহাকে তাঁহার হস্তীতে আরোহণের জন্য অনুরোধ করিল; তাঁহার নিজেরও তাহাই ছিল অভিপ্রায়। কিন্তু তাঁহার একখানা চটিজুতা পাওয়া যাইতেছিল না। সুবাদার বলিলেন, "খালি মাটিতে পা রাখার পূর্বে আমার অন্য চটিখানা পাইতেই হইবে।" একটা স্বর চেঁচাইয়া বলিল, "প্রার্থনা, ইহাই কি চটি খুঁজিবার সময়?" সুবাদার উত্তর দিলেন, "বাস্তবিকই নহে; তা' নয়; কিন্তু আমি এখন আমার চটি ভিন্ন গেলে তোমরা কাল প্রাতে না বলিয়া ছাড়িবে না যে, আলীবর্দী গণ্ডগোলের সময় বাহিরে যাওয়ার জন্য এতই তাড়াতাড়ি করেন যে তিনি তাঁহার চটি পিছনে ফেলিয়া যান।" অবশেষে তাঁহার চটি খুঁজিয়া বাহির করা হইলে তিনি হস্তীতে আরোহণ করিলেন। ইতোমধ্যে মারাঠাদের সকলেই নিহত হন। হাতীতে বসিয়া তিনি চতুর্দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুস্তফা খাঁ কোথায়? উত্তর হইল, মহামান্য সুবাদার স্বয়ং তাঁহার সাহায্য করিবেন, এই ভরসায় তিনি মারাঠাদের উপর আপতিত হইয়াছেন। তথাপি তিনি নড়িতে চাহিলেন না, বরং লুণ্ঠনকারীর যে মৃত্যু হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিসন্দেহ হওয়ার জন্য তিনি তাহার মস্তক চাহিলেন। তাঁহাকে পুনঃ-পুনঃ বলা হইল যে, তিনি নিহত হইয়াছেন এবং তাঁহার আদেশে ইতো-পূর্বেই বাদ্য বাজান আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি তিনি মস্তক না দেখা পর্যন্ত নড়িতে রাজী হইলেন না। অবশেষে ইহা তাঁহার নিকট আনীত হইলে তিনি ইহার অভিন্নতা নির্ধারণের জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাঁহার হস্তীকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন এবং শত্রুর নাগাল ধরার

জন্য তৎপরতার সহিত যাত্রা করিলেন। মারাঠাদের বিরাট বাহিনী কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন; সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি না থামিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানে একজন মারাঠারও সন্ধান মিলিল না। ব্যাপার এই যে, ভাস্করকে সাক্ষাৎকারে চাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সাধারণ কর্মচারীদের সকলেই তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে বদ্ধপরিকর হন; কাজেই তাহাদের মধ্যে কোন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভিন্ন সকলেই নিহত হন; এই ব্যক্তির নাম রঘু গাইকোয়াড়। মুস্তফা খাঁর প্ররোচণা এবং ভাস্কর ও আলী-ভা কারওয়ালের অনুরোধ ও দৃষ্টান্তে অভিভূত না হইয়া তিনি ভাস্করের সাক্ষাৎকার শেষ হইবামাত্র পরদিন সুবাদারকে দর্শন দান করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিয়া নিজের লোকজনসহ তাম্বুর বাহিরে অবস্থান করেন। তাম্বুর মধ্যে প্রথম গোলমাল শ্রবণ মাত্রই এই লোকটা ঘোড়ায় কোড়া মরিয়া শিবিরে গমন করেন এবং ভাস্করের সমস্ত মালপত্র সঙ্গে লইয়া নিজ সৈন্যগণসহ পলায়ন করেন; তাঁহার নাগাল পাওয়া গেলনা। পথিমধ্যে সমস্ত জমিদার ও কৃষকদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত এবং প্রত্যাবর্তনে তাঁহার কিছু লোক নিহত হইলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেই হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসের ঘূর্ণাবর্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মুক্তির অনুকূল তটে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্যের জন্য বিপুল সংখ্যক মারাঠা গাইকোয়াড়ের উপস্থিতবুদ্ধির নিকট ঋণী। এইরূপে ভাস্করের পরাক্রান্ত বাহিনী একদিনে বিধ্বস্ত হয়। তরবারির ধার হইতে যাহারা রক্ষা পায়, তাহারা নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত হইতে পলায়ন করিয়া অবশেষে সর্বাপেক্ষা দুর্দশাপন্ন অবস্থায় স্বদেশে পৌঁছে।

সর্বত্র নিহত হইয়া মারাঠাদের বাঙ্গলা ত্যাগ

এই অভিযানের পর আলীবর্দী খাঁ তদীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহাতে তাঁহার একটা লোকও নষ্ট হয় নাই, বরং তাঁহার সুনাম এত বৃদ্ধি পায় যে, তাঁহার সৈন্য ও প্রজা—উভয়ের হৃদয়ে তিনি উচ্চাসন লাভ করেন। এত সহসা সেই নিষ্ঠুর লুণ্ঠনকারীদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করায় প্রজারা তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠে; সৈন্যেরাও তাহাদের অপ্রত্যাশিত সফলতায় কম খুশী হয় নাই। তাঁহার আদেশ পালনে

তৎপরতার স্বীকৃতি হিসাবে তিনি তাহাদিগকে দশ লক্ষ টাকা উপহার দিলেন। অতঃপর তিনি রাজধানীতে এই ঘটনার একটা বিবরণ পাঠাইয়া মুস্তফা খাঁকে জঙ্গের মর্যাদায় উন্নীত এবং তাম্বুর যুদ্ধে যাঁহারা এত উৎসাহের সহিত শক্তির পরিচয় দেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে অতিরিক্ত সম্মানে ভূষিত করার জন্য বাদশাহের নিকট আরজ করেন; দৃষ্টান্তস্বলে, মীর জাফর খাঁ—যিনি প্রথম আক্রমণেই মাত্র একটা বড় আঘাত পাইয়াও যুদ্ধ করিতে থাকেন; ফকীরুল্লাহ বেগ খাঁ, হায়দর আলী খাঁ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তির নাম করা হয়। বাদশাহ এই আবেদন পাইয়া অনুরোধ রক্ষা করেন; মুস্তফা খাঁকে বিবিধ সম্মান ও পদ-চিহ্নসহ বাবর জঙ্গ ও তাঁহার উল্লিখিত প্রত্যেকটি লোককে বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হইল। বিশেষভাবে আলীবর্দী খাঁকে তিনি শুজাউল মুল্‌ক (রাজ্যের নির্ভীক) উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজের তোষাখানা হইতে এক প্রস্থ পোশাক, একখানা তরবারি, একটি ছোরা, একটি অশ্ব ও বহুবিধ রত্ন প্রেরণ করিলেন।

এই শেষ অভিযান আলীবর্দী খাঁকে এক বৈদেশিক শত্রু হইতে রেহাই দিল। কিন্তু ইহা গার্হস্থ্য শত্রু খাড়া করিল। ইত্যবসরে মুস্তফা খাঁর শক্তি ও প্রতিপত্তি এত উচ্চে উঠে যে, তাহা প্রজার, এমন কি সমকক্ষেরও সীমা ছাড়াইয়া যায়। তিনি প্রাধান্যের চেয়ে ন্যূনতর দাবী করিলেন না; তাঁহার জাতি বিপুল সংখ্যায় বাঙ্গলায় ঢুকিয়া পড়ে; আলীবর্দী খাঁর সৈন্যদল ও গৃহস্থালীর প্রত্যেকটা অংশ তাহাদের দ্বারা ভর্তি হইয়া যায়। তিনি নিয়ত তাহাদের এত বেশী লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন যে, কেহ তাহার ইচ্ছার বিরোধিতা, এমন কি আফগান নামধারী কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে সাহসী হইত না। তাহাদের সংখ্যা ছিল এতই অধিক ও তাহাদের ঐক্য ছিল এতই নিবিড়। ইহা লক্ষ্যণীয় যে, তাহাদের সংখ্যা, তাহাদের সামান্য জ্ঞান ও বোধশক্তি এবং তাহাদের পার্বত্য দেশের গুহায় জীবন-যাপন প্রণালীর দরুন এই সকল ছিল বন্য পশুর সদৃশ। তাহাদেরই মত তাহারা দ্রুতগামী, অত্যন্ত সাহসী, অতি সামান্য কিছুতেই প্রলোভিত ও পরম লোভী। কৃতজ্ঞতার হকে অবিচলিত ও প্রাপ্ত উপকারে অনভিভূত আফগানেরা তাহাদের উপকারক, এমন কি বন্ধুতার হকেরও ধার ধারে না

বলিলেই হয়; রুটি-লবণের সাধারণের অধিকারের[২৩] প্রতিও তাহারা প্রায় পুরাপুরি উদাসীন। সামান্য বিষয়ের জন্য তাহারা তৎক্ষণাৎ উল্টিয়া যায়, এবং উদাসীন, প্রাণহীন বন্ধু হইতে তৎক্ষণাৎ হিংসাপূর্ণ শত্রু ও একগুঁয়ে দুশ্‌মনে পরিণত হয়। স্বভাবতঃই প্রদত্ত উপকার ও প্রাপ্ত অনুগ্রহ স্মরণ রাখিতে সামান্য ইচ্ছুক মেজাজের লোক বলিয়া তাহারা সহজেই উপকারকের হক ভুলিয়া যায় এবং অনুরূপ সহজেই তাহাকে হত্যা করার এমন কি তাহাদের নিকটতম আত্মীয়দিগকেও বধ করার মতলব থাকায় এবং এ সমস্তই সামান্য পুরস্কারের জন্য ও সামান্য বিষয়ে। অমার্জিত ও অভদ্র-আচরণকারী ও কোন সভ্যতার প্রায় অনুপযোগী এই লোকগুলি মানবজাতির (ক্ষমা ও দয়া যাহাতে সুস্পষ্ট-ভাবে সকলের নজরে পড়ে) কোমলতর ও অধিকতর সদয় মনোবৃত্তির সহিত অপরিচিত। তাহারা ক্রোধে অন্ধ ও প্রতিহিংসায় অদম্য হয়। যে কোন কারণেই হউক, কোন আফগানের মৃত্যু তাহাদের পক্ষে এমনি অপরাধ যে, মৃতের আত্মীয়রা ইতোপূর্বে আপোষ করিতে স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতিপূরণ বা কালাতিক্রম দ্বারাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না; প্রতিশোধের বীজ অঙ্কুরিত ও তাহাদের বুকে উপগত হইতে কখনও বিরত হয় না। মুস্তফা খাঁ নিজেও ছিলেন এরূপ প্রশংসনীয় জাতির লোক। তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের ন্যায় কিছুতেই এত বুদ্ধিহীন না হইলেও তাঁহার সাহসের দরুন তাঁহার অর্থলিপ্সা বৃদ্ধি পায়; তাহার জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য পরীক্ষার্থ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে অবিরাম জলিতে থাকে। তিনি যেমন গর্বিত, তেমনি অর্থলিপ্সু ছিলেন বলিয়া তৎপ্রতি লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে যাবেন। তিনি বরবরই আলীবর্দী খাঁর অনুচরবর্গের সমান একদল অনুচর লইয়া যাত্রা করিতেন। তাঁহার ভৃত্য হইতে তিনি তাঁহার সমকক্ষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন, পরিশেষে তিনি তাঁহার উপরওয়ালা হওয়ার চেষ্টা করেন। এক কথায়, তাঁহার দাবীর বিরোধিতা করার দরুন তিনি স্বীয় প্রভুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। প্রতিকুলাচরণে তাঁহার উচ্চাকাঙ্খা ও ভীষণতা বৃদ্ধি পায়; গরজের বেলায় সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য তাহার সহিত যে কয়েকটা অঙ্গীকার করা হয়, তাহা পালনের জন্য তিনি জিদ করিতে থাকেন। প্রকৃত পদাভিষিক্ত ব্যক্তি

আফগাণ জাতির বিচিত্র চরিত্র

তাঁহার প্রভুর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা হইলেও তিনি বিশেষভাবে আজিমাবাদের শাসনকর্তার পদই তাঁহার অধিকার বলিয়া দাবী করেন। পক্ষান্তরে সুবাদার মনে করেন যে, দরকারের সময় সামান্য খেদমতের জন্য তিনি যে সাধারণ অঙ্গীকার করেন, ঐ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাহা বাধ্যতামূলক বলিয়া জিদ করা অন্যায়। তিনি প্রচুর পরিমাণে সম্মান দান করিয়া লোকটির মুখ বন্ধ করিতে, মিষ্ট কথায় নরম করিয়া তাঁহার বিদ্বেষপূর্ণ অবাধ্য হৃদয় পুনরায় জয় করিতে ও শ্রদ্ধাপূর্ণ বাক্যে তাঁহার ক্রোধ শান্ত করিতে চাহেন। ঐ লুব্ধচিত্তে যে খামখেয়াল অবিশ্রান্ত উদগত হইতেছিল, বিবিধ উপহার ও প্রচুর দয়া দ্বারা তাহা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় এমন কি কয়েক মাস সময় কাটাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু হাওজের দৃশ্য কি তৃষ্ণার্ত লোকের প্রচণ্ড অগ্নি প্রশমিত এবং খোশগন্ধের প্রলোভন ও নিদ্রার যাবতীয় প্ররোচনা কি উপভোগার্থীকে শান্ত করিতে পারে? আজকাল করিয়া কয়েক মাস কাটাইয়া দিলে অবশেষে সেনাপতির সমস্ত ধৈর্য ফুরাইয়া গেল; তিনি প্রকাশ্যে মুখ খুলিলেন: তখনও বিলম্বিত পর্দা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি অতীত বন্ধুতা ও অতীত বন্ধন অস্বীকার করিলেন। অল্প অল্প করিয়া উদাসীনতা বৃদ্ধি পাইল; ১১৫৮ হিজরীর মুহররমের শেষে তিনি দরবারে হাজিরা দেওয়া বন্ধ করিলেন। ইউছুফ আলী খাঁ আমাদের জন্য তাহার সমসাময়িক ব্যাপারের যে বিচিত্র ইতিবৃত্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ঐ নিবৃত্তির কারণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ আলীবর্দী খাঁ সেনাপতির ক্রোধ প্রশমন ও তাঁহার মন শান্ত করার চেষ্টা করিতে থাকিলেও সাধারণের ধারণা ছিল যে, তাঁহার অত্যধিক শক্তিতে স্তম্ভিত ও তাঁহার দাবীতে কুপিত হইয়া আলীবর্দী খাঁ প্রকৃতপক্ষে তলে তলে তাঁহার ধৃষ্টতা খতম করিতে ও তাঁহার অনিষ্টকর অভিসন্ধির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য মতলব আঁটিতেছিলেন। অন্ততঃ আফগানেরা এইরূপ মনে করিতেন। একদা সেনাপতি দরবারে যাইতে প্রস্তুত হইয়া তাঁহার রীতৎনুযায়ী দিলশাহ্ ও হেকিম শাহ্ নামক তাঁহার দুইজন প্রধান কর্মচারীকে অগ্রে পাঠাইলেন। তাঁহারা ভিতরে গিয়া কুর্ণিশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ইউছুফ আলী খাঁ নিজে সেদিন দরবারে ও হুজুরে হাজির

ছিলেন। তিনি বলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহরে মামুলী ভৃত্যেরা ভিন্ন দরবার-গৃহে আর কেহই উপস্থিত ছিল না। ঘটনাক্রমেই ঐ দুই ব্যক্তির উপবেশনের অল্পক্ষণ পরে হুজুরের জনৈক খোজা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, নওয়াব-বেগম (অর্থাৎ সুবাদারের পত্নীর) ভীষণ ভেদ বমিতে[২৭] আক্রান্ত হইয়াছেন। সুবাদার তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া অন্দর মহলে গমন করিলেন। সেখান হইতে তিনি ঐ দুইজন কর্মচারীকে তাঁহার বাহিরে না আসা পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সংবাদদাতারা ইতোপূর্বেই ঘোষণা করিল যে, মুস্তফা খাঁ পথে, এই সংবাদে এই দুই ব্যক্তি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলেন। সুতরাং ইহার তাৎপর্য খেয়াল না করিয়া তাঁহারা কল্পনা করিলেন যে, দরবার-সংলগ্ন একটি কামরায় অকস্মাৎ সেনাপতিকে আক্রমণ করার জন্য কিছু সংখ্যক সশস্ত্র লোক লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে এবং ইহাই বেগম সম্পর্কে প্রেরিত সংবাদের হেতু; তাঁহাদের ধারণায় ইহার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে ক্ষতির পথের বাহিরে থাকিতে সমর্থ করা। তজ্জন্য তাঁহারা সেখানে গমন করিয়া উহা তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন এবং পুরাপুরি এই ধারণা লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের মনিব যখন আসিতেছিলেন, তখন তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদের আশঙ্কার কথা জানাইলেন। এই সংবাদে সেনাপতি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। স্বাধীনতার ভাব অবলম্বন করায় আলীবর্দী খাঁর প্রত্যেকটা কার্যক্রমে তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি আগ্রহভরে একটা ভিত্তিহীন বাজে বিবরণে কান দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সুবাদার ইহা অবগত হইয়া তাঁহার জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁকে তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণতার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিতে ও যে কোন উপায়ে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইলেন। এই আমীর মুস্তফা খাঁর নাগাল পাইয়া বহুবিধ যুক্তি ও অনুরোধ দ্বারা তাঁহার সন্দেহভঞ্জন ও মন শান্ত করার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। সেনাপতি গৃহে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার সৈন্যদল সমাবেশ করিলেন; তাহাতে কয়েক হাজার বন্দুকচী ভিন্ন সর্বশুদ্ধ ৯০০০ অশ্বারোহী ছিল। অতঃপর তিনি তাঁহার চাকরী ত্যাগ করিয়া ও তাঁহার সৈন্যদের বাকী বেতন চাহিয়া সুবাদারকে একটি বার্তা পাঠাইলেন।

অকপটতা ও বিশ্বস্ততার জন্য সমস্ত সৈন্যের নিকট বিশেষভাবে নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁর প্রতিশ্রুতি ও কথার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকায় সুবাদার মুস্তফা খাঁকে শান্ত করার জন্য পুনরায় তাঁহার জামাতাকে পাঠাইলেন। কিন্তু এই বাণীতেও কোনই কাজ হইল না। ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে, তিনি সুবাদারকে আর একটা ভৎর্সণাপূর্ণ বার্তা পাঠাইলেন এবং তাঁহার প্রাপ্য স্বরূপ আজিমাবাদের শাসনকর্তৃত্ব প্রার্থনা করিলেন। এই ব্যবহারে অবাক হইয়া আলীবর্দী খাঁ আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু বিগত বহু বৎসর ধরিয়া সেনাপতির নির্ভীকতা ও সাহস সুখ্যাত থাকায় এবং তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অজস্র ও তাহারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার অনুরক্ত বলিয়া তিনি নিজে এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবসহ তাঁহার জামাতারা সমভাবে হতবুদ্ধি হইয়া কোন মত প্রকাশে সমর্থ হইলেন না। মুর্শিদাবাদ নগরের সব কিছুই বিশৃঙ্খল ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে উভয় পক্ষই রণ-সজ্জা করিল এবং নগর রণাঙ্গনে পরিণত হইল। সুবাদারের প্রতি অনুরক্ত সৈন্যেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া প্রাসাদের দ্বারদেশ হইতে মুস্তফা খাঁর বাসা পর্যন্ত রাজপথগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ইহারা ছিল মীর জাফর খাঁ, হায়দর আলী খাঁ, ফকীরুল্লাহ্ বেগ খাঁ, নূরুল্লাহ্ বেগ খাঁ ও সুপুত্রক ওমর খাঁ আফগানের সৈন্যদলসহ তাঁহার দুই জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁ ও সয়্যিদ আহমদ খাঁ পরিচালিত সৈন্যদল। ন্যূনতর বৃহৎ কয়েকটা সৈন্যদল এবং ফতেহ্ রাও বকশী চাঁদূন ও অপর কতিপয় হিন্দু পরিচালিত বন্দুকচী সৈন্যদলও তাহাদের খেদমতের প্রস্তাব লইয়া আসে। শমশের খাঁ ও সর্দার খাঁ অন্তরে ছিলেন তাঁহাদের দেশবাসীদের, কিন্তু বাহ্যতঃ তাঁহাদের প্রভুর প্রতি অনুরক্ত। তাঁহারা দরবারে আসিতে থাকিলেন এবং দুই পক্ষের সঙ্গেই সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিলেন। সুবাদারের নিজস্ব অভিমত ছিল; ইতোমধ্যে তাঁহার আফগান সৈন্যদের উপর তাঁহার সমস্ত আস্থা নষ্ট হইয়া যায়; তথাপি তিনি তাঁহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করা সঙ্গত মনে করিলেন। তাহাদিগকে আর বিশ্বাস না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও তিনি এই দুইজন আফগান সেনাপতির চিত্ত জয় করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। মুস্তফা খাঁর একগুঁয়েমি ও তাঁহার পরিকল্পনা

সুবাদারের জানা ছিল। তাঁহার ক্রোধ যে তাঁহাকে অধিক শত্রুতায় লিপ্ত করিবে, পূর্ব হইতে তিনি তাহাও জানিতেন। এই উভয় কারণে তাঁহার মনে হইল, ঐ সেনাপতির সহিত মতৈক্যে পৌঁছাই হইল বর্তমান প্রকৃষ্ট পন্থা। যখনই তিনি তাঁহার অজস্র খেদমত, বীরত্বপূর্ণ সাহস এবং তাঁহার স্বার্থের প্রতি তাঁহার দৃঢ় অনুরক্তির কথা চিন্তা করিতেন তখনই তাঁহার মন মধ্যে মধ্যে নরম হইয়া পড়িত। তিনি এত প্রাচীন, এত অনুরক্ত ও এত মূল্যবান ভৃত্যের নিকট বিদায় গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার দলত্যাগে তাঁহার নিজ শক্তির বাস্তব ক্ষতি করিবে তাহাও অকাট্যরূপে স্বীকার্য। কিন্তু এত বিজ্ঞোচিত চিন্তা সত্ত্বেও কিরূপে তিনি একজন বন্ধুকে রক্ষা করিবেন, তাহা জানিতেন না, কিরূপে একজন শত্রুকে অপদস্থ ও ধ্বংস করিবেন তাহাও না। তখন অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছিল! এই শেষোক্ত অসুবিধাও বড় কম ছিল না; মুস্তফা খাঁর স্বজাতির বিপুল অধিক-সাহসী সৈন্য তাঁহার সমর্থন করিত এবং সকলেই তাঁহার নিজ পরিবারের লোক দ্বারা পরিচালিত হইত; কাজেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলিয়া বোধ হইল। একদিন তিনি তাঁহার পুরাতন কৌশল অর্থাৎ মাত্র সিরাজুদ্দৌলাহ্‌কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমনের এবং বিশ্বাসের ঐ নিদর্শন দ্বারা পুনরায় তাঁহার চিত্তজয়ের কথা চিন্তা করিলেন। এমন কি তিনি তাঁহার পাল্কী আনাইয়া যাত্রা করিতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁহার দুই জামাতা ও মীর জাফর খাঁ, হায়দর আলী খাঁ, ফকীরুল্লাহ বেগ খাঁ প্রভৃতি তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হিতৈষীরা ও অপর কয়েক ব্যক্তি ইহার প্রবল বিরোধিতা করেন; তাঁহারা একযোগে তাঁহাকে এরূপ বিপজ্জনক পরীক্ষায় নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলিলেন, তিনি ঐ আফগানের হৃদয়ে কিরূপ দাগ কাটিতে পারেন, তাহা পরীক্ষা করার সময় ইহা নহে। ব্যাপার এত দূর গড়াইয়াছে যে, এভাবে বিশ্বাস ও ভালবাসা প্রদর্শন দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায় না। স্বীয় প্রভুকে গদীচ্যুত করা এবং তাহার উপকারকের ধ্বংস ও মৃত্যুর উপর নিজ ভাগ্য-সৌধ নির্মাণই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহারা আরও বলিলেন, "আমরা আপনাকে আপনার শত্রুগৃহে-আপনার জীবন

বিপন্ন করিতে দিব না বরং আমাদিগকেই অগ্রে হত্যা করুন।" এই সকল অনুরোধ ও যুক্তিতে ভয়াভিভূত হইয়া সুবাদার গৃহে থাকাই সঙ্গত মনে করিলেন। তাহারা যখন কথাবার্তা বলিতেছিলেন, এমন সময় একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক সেনাপতির দল ত্যাগ করিয়া সুবাদারের সম্মুখে হাজির হইল। ইনি আফগান রহীম খাঁ বই নন; এই কর্মচারীটী বরাবর সেনাপতির পতাকা-বাহকের কাজ করেন এবং তাঁহার উৎসাহী সহচর বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ভাগ্যের তাড়নায়ই হউক কিম্বা সুবাদারের চিত্তাকর্ষক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়াই হউক, পক্ষ পরিবর্তন করিল। পক্ষান্তরে যাঁহাদের জাতীয় পক্ষপাতিত্বের উপর ভরসা রাখিতেন, সেনাপতি এরূপ আরও দুইজন সেনা-নায়ক হারাইলেন। ইহারা ছিলেন শমশের খাঁ ও সর্দার খাঁ। এই দুই জন প্রতিষ্ঠাবান কর্মচারী তাঁহার সহিত যোগদান ও তাঁহার ভাগ্যের অনুসরণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তাহারা মনে করেন যে, বাহ্যদৃষ্টিতে যত দূর দেখা যায়, বাঙ্গলা হইতে তাঁহার বিতাড়নের ফলে যে বৃহৎ গোলকটি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ রাহুগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অপসৃত হইবে এবং তাহাতে অন্ততঃ তাঁহাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইবে। এই সমুদয় দলত্যাগে যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় বলিয়া মনে হয়। এই সকল দলত্যাগ সেনাপতির মনে দাগ কাটায় তিনি মুর্শিদাবাদ নগর আক্রমণ করিয়া স্বীয় ভাগ্যকে যুদ্ধের সম্ভাবনার নিকট ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে সতর্ক হইয়াই হউক অথবা অনিবার্য ভাগ্যের প্রেরণায় তাঁহার মনের পরিবর্তন ঘটে বলিয়াই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, চাচার রাজধানীতে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা ভ্রাতুষ্পুত্রকে আজিমাবাদ হইতে বিতাড়িত করা সহজ হইবে মনে করিয়া তিনি ঐ নগরের দিকে তাঁহার মত পরিবর্তন করেন। তজ্জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। এই সঙ্কল্পের কথা জানাজানি হইবামাত্র সুবাদার ইহাকে তাঁহার অনুকুলে আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিলেন। যাত্রার পূর্বে সেনাপতির নিজের ও তাঁহার সৈন্যদলের বাকী প্রাপ্যের হিসাব সংবলিত একখানা কাগজ তাঁহার গোমস্তার মারফতে দরবারে প্রেরিত হইল। ইহা আনুমানিকভাবে পরীক্ষার এবং সেনাদলের রসদ সরবরাহকারীর অভিজ্ঞান-পত্র ও দাগতেসিয়া[২৮] বা অশ্ব শনাক্ত করণের

অভিজ্ঞান-পত্র দ্বারা সমর্থিত হওয়ার দরকার ছিল; হিসাবও তাঁহার খুশীমত প্রস্তুত করা হয়। তথাপি সুবাদার ইহা পরীক্ষার্থ নির্দিষ্ট দফতরসমূহে না পাঠাইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা পরিশোধের আদেশ দান করিলেন। ইহার পরিমাণ পুরা সতর লক্ষ টাকার কম ছিল না। কিন্তু সুবাদার বলিলেন, আমি এই টাকাটাকে খয়রাৎ এবং আসন্ন বিষয় কর্মের সফলতার জন্য প্রদত্ত কুরবানী বলিয়া গণ্য করিতেছি। টাকা পাইবামাত্র সেনাপতি শহরের প্রধান গাড়ীওয়ালাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার যতগুলি গো-যান ও ভারবাহী বলদের দরকার ছিল, তাঁহার সৈন্যদের তাহা সরবরাহে বাধ্য করিলেন। অতঃপর তিনি ধীরে সুস্থে তাঁহার ও তদীয় সৈন্য-দলের মালপত্র বোঝাই করিয়া তাঁহার সেনানিবাসে আগুন লাগাইয়া সামরিক বিন্যাস ও কতকটা আড়ম্বরের সহিত কুচ্‌ করিয়া নগরের বাহিরে গমন করিলেন। সেখান হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে গিয়া তিনি শিবির স্থাপন করিলেন। পরের দিন তিনি পুরা এক মঞ্জিল গমন করিলেন। অধিবাসীরা জানিত, তাহাদের প্রাচীরের অভ্যন্তরে যে কোন যুদ্ধের একমাত্র ফল হইত তাহাদের ধ্বংস; কাজেই যেইমাত্র তাঁহাদের এই প্রস্থানের সংবাদ নগরে পৌঁছিল এবং তিনি চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিত হওয়া গেল, তখন তাহারা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার প্রস্থানকে একটি সৌভাগ্যজনক ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে সুবাদার রহীম খাঁর পদোন্নতি করা সঙ্গত মনে করিলেন; এই পদোন্নতির সহিত আরও অনেক অনুগ্রহ যোগ করা হইল। তিনি শমশের খাঁ ও সর্দার খাঁরও পদোন্নতি করিলেন; তাঁহারা তখনও তাঁহাদের দেশবাসী হিসাবে সেনাপতির প্রতি যে জাতীয় অনুরক্তিটুকু পোষণ করিতেন বিশেষভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তিনি তাহাদের দিল হইতে তাহা অপসারিত করিলেন। দিলশির খাঁ ও আলেফ খাঁ নামক তাহাদের নিকটাত্মীয় তাঁহার চাকরী ত্যাগ করিয়া সেনাপতির চাকরী গ্রহণ করেন; মার্জিত বিচক্ষণতার এক খোঁচায় তিনি ঐ অকৃতজ্ঞতা উপেক্ষা করিয়া গেলেন; তিনি শুধু তাহাদের নাম উল্লেখে বিরত রহিলেন। কখনও তাঁহাদের ঘৃণিত আচরণ তাঁহার সাক্ষাতে উল্লেখিত হইলে তিনি ভৎর্সনা ও উপাধি উচ্চারণ হইতে নিরত্ত

থাকিয়া যৌবন ও পার্থিব অজ্ঞতাকে তাহাদের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য দায়ী করিতেন। ইত্যবসারে মুস্তফা খাঁ রাজমহলে পৌঁছিয়া সেখানে রক্ষিত ভাণ্ডার হইতে যত সঙ্গত মনে করিলেন কিয়ৎ পরিমাণ গোলা-বারুদ সহ তত হস্তী ও কামান গ্রহণ করিলেন। সেই মুহূর্ত হইতে তিনি প্রকাশ্য শত্রু রূপে কাজ করিলেন। আলীবর্দী খাঁ আজিমাবাদের শাসনকর্তৃত্ব সম্পর্কে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় মুস্তফা খাঁ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, একথা এখন প্রচারিত হইয়া পড়ায় ঐ সেনাপতির ভ্রাতুষ্পুত্র উড়িষ্যার শাসনকর্তা আবদুর রসুল খাঁ খুল্লতাতের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইয়া নিসংকোচে পদত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলেন; সেনাপতি তাঁহার দলত্যাগকে পারিবারিক কলহে পরিণত করার ইনি দায়ুদ খাঁ নামক জনৈক আফগানকে নিজের অনুপস্থিতিতে দেশ শাসনের জন্য নিযুক্ত করিয়া নিজস্ব সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন।

ইহা হয়ত অভিনিবেশের যোগ্য যে, এই যুবকের পিতা আবদুন্নবী খাঁ ছিলেন শিয়া-সমাজভুক্ত[২৯]; তিনি আওরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহের অধীনে চাকরী করেন। তিনি ছিলেন একজন শরীফ বংশের লোক এবং কয়েকটি সম্মানজনক গুণের জন্য সম্মানার্হ ছিলেন। মীর আবদুল আজীজ ছিলেন তাঁহার একজন বড় বন্ধু; ইনি ছিলেন লাহোর জনপদের সামানায় বসতি স্থাপনকারী একটি প্রধান সয়্যিদ পরিবারের লোক এবং সরকারের সমর্থনের জন্য যে সকল লোককে তাঁহাদের সৈন্যদলের পুরোভাগে রাখিয়া আসা হয়, তাঁহাদের অন্যতম। আবদুন্নবী খাঁ ছিলেন মুস্তফা খাঁর দেশের লোক ও তাঁহার সহিত নানা বন্ধনে জড়িত, কিন্তু তিনি তাঁহার দাবী সমর্থন করিতেন না। এই কর্মচারীটি আমাকে বলেন যে, একদা তিনি মীর আবদুল আজীজকে একা পাইয়া ঠিক এই সকল বাক্যে তাঁহার নিকট নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেন: "আমার বন্ধু সয়্যিদ! আপনি হয়ত জানেন যে, এই বালক (অর্থাৎ মুস্তফা খাঁ) নেমক হারামী করিতে চাহে সে তাহার মাথায় কয়েকটি খেয়াল ও অদ্ভুত পরিকল্পনা ঢুকাইয়া রাখিয়াছে। পালাক্রমে দুইটি বিপরিত কাঁটা দ্বারা তাড়িত অশ্বের ন্যায় আমি নিজেও ঐ ব্যাপারে বিচিত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে পড়িয়া আছি। যদি আমি ছেলেটির

সহিত যোগদান করি, তবে অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক ও দলত্যাগী নামে পরিচিত হইব ; আমার পরিবারের কেহই কখনও এই কুৎসিৎ নামধারণ করে নাই ; আর আলীবর্দী খাঁর সহিত লাগিয়া থাকিলে আমি স্বজাতির ভৎর্সনা ও আমার নিজ গোত্রের ঘৃণা হইতে রেহাই পাইব না। তাহারা বলিবে, এই লোকটিকে দেখ! আলীবর্দী খাঁর চাকরীতে অধিক অর্থ ও পদোন্নতির আশায় সে যে ব্যক্তি তাহাকে একটা সৈন্যদলে সুপারিশ করিয়াছে ও তাঁহার বর্তমান উন্নতির মূল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করার মত হীনতা দেখাইয়াছে ; সুতরাং এমতাবস্থায় যে উভয় সঙ্কটের পরিণাম আমার পক্ষে লজ্জাকর না হইয়া পারে না, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি আমাকে পুনরাহ্বান করিয়া অনুগ্রহপূর্বক তাহা হইতে উদ্ধার করিতেন, তবে হে বন্ধু, তাহা সর্বতোভাবে আমার পক্ষে অনেক ভাল হইত।" কটক নগরে সমাহিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রতি এই সুযোগ্য লোকটির বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি প্রত্যহ সেখানে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উক্ত অনুরোধ করিতেন। অবশেষে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। মুস্তফা খাঁর চূড়ান্তভাবে দলত্যাগের কিছুকাল পূর্বে তিনি সামান্য অসুস্থতা বোধ করিলেন এবং ৩।৪ দিনের মধ্যে চিরন্তন দয়ার প্রাসাদে নীত হইলেন। যেস্থান ছিল তাঁহার ভক্তির লক্ষ্য, তাহাকে ঠিক সেস্থানেই সমাহিত করা হয়। সেদিন ছিল এক বৃহস্পতিবার ; ঐ দিনে অজস্র লোক তাঁহার স্মৃতিসৌধে গমন ও উহা দর্শন করিয়া থাকে।

এবার আমাদের ইতিবৃত্তে ফিরিয়া আসা যাউক। আলীবর্দী খাঁর চাকরী ত্যাগ করিয়া মুস্তফা খাঁ প্রকাশ্যে তৎপ্রতি শত্রুতা স্বীকার করেন। তাঁহার দলত্যাগের পরে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রসুল খাঁও দলত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার দায়িত্ব ছাড়িয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিতে গমন করেন। এই যুবক তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধনুর্ধর বলিয়া পরিগণিত হইতেন ; তাঁহার খুল্লতাতের ভাগ্যের সর্বাপেক্ষা উৎসাহী অনুচরদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁহার দলত্যাগে উড়িষ্যায় কোন শাসনকর্তা না থাকায় সুবাদার রাজা দুর্লভ রামকে ঐ পদ প্রদান করিলেন ; তিনি তাঁহাকে ভূতপূর্ব শাসনকর্তার উকীল নিযুক্ত করেন এবং তখনও

তিনি কটকে ছিলেন। তিনি তাঁহার জন্য যুগপৎ তিন হাজারী মনসবদারী এবং ঝালরযুক্ত পাল্কীসহ দামামার সম্মুখে আনয়ন করাইলেন। তাঁহাকে ৩০০০ অশ্বারোহীর মনসব প্রদানের পর তিনি তাঁহাকে তাঁহার নূতন পদের সনদ পাঠাইয়া দিলেন। এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা হইলে তিনি আজিমাবাদের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁ ছিলেন তথাকার শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র—প্রকৃতপক্ষে তদীয় খুল্লতাতের বার্ধক্যউজ্জ্বলকারী আলোক, স্বীয় পরিবার ও বংশের গৌরবের জন্য প্রজ্বলিত মোমবাতি। সুতরাং তিনি তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা করিয়া জনৈক বিশ্বস্ত লোকের মারফতে তাঁহাকে একখানা গোপনীয় পত্র পাঠাইলেন; মুস্তফা খাঁর অবলম্বিত পথ হইতে তিনি স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করেন। তিনি গঙ্গার উত্তর পাড়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে ভাবী কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহেন বলিয়া পত্রে তৎপ্রতি ঐ তীর ধরিয়া আসিয়া পূর্ণিয়ার দিক দিয়া বাঙ্গলার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য নির্দেশ ছিল। এই আদেশের উদ্দেশ্য ছিল যুবককে মুস্তফা খাঁর সহিত যুদ্ধ করার প্রলোভন হইতে নিবৃত রাখা; কারণ তিনি তাঁহার প্রকাণ্ড মুখগহ্বরের একটি সহজ গ্রাসে পরিণত হইতে পারেন বলিয়া তাঁহার ভয় হয়। আজিমাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন তখন তিরহুত জিলায়; তিনি সেখানে মুর্শিদাবাদের ঘটনার সংবাদ পান। সুতরাং যেই মাত্র সংবাদ আসিল যে, মুস্তফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া আজিমাবাদে আসিতেছেন (ইতোমধ্যে সুবাদারের গোপনীয় পত্র দ্বারা এই সংবাদ সমর্থিত) তখনই তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে ব্যাপার প্রতিকারের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার অবস্থার প্রকৃতি বুঝাইয়া দিয়া তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের সহিত আলোচনা করিলেন। প্রত্যেকেই নিজের যোগ্যতা বা প্রতিভার প্রেরণা অনুযায়ী নিজের অভিমত দিলেন; কিন্তু বৃহত্তম সংখ্যক লোকই ছিলেন যথা সময়ে তাঁহার খুল্লতাতের আদেশ পালনের পক্ষে। তাঁহারা বিষয়-বুদ্ধির যাবতীয় নীতির খেলাফ করিয়া মুস্তফা খাঁর বিরোধিতা করিবার অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। ঐ সেনাপতির অধীনে অন্ততঃ ১২০০০ এবং সম্ভবতঃ ১৪।১৫

হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল: তাহাদের সকলেই বহু যুদ্ধে পরীক্ষিত প্রবীণ সৈনিক; মুস্তফা খাঁ নিজেও কেবল অসাধারণ সাহস নহে, অনন্য সামরিক প্রতিভার অধিকারী বলিয়াও পরিচিত ছিলেন; তাঁহার এই গুণ-গুলির বিকাশ লাভ কয়েকটি কঠিন অভিযানেও অসাধারণ ঘটনার অবিশ্রান্ত অভিজ্ঞতায়, শুধু তরবারি ও তীর দ্বারা যুদ্ধ করিয়াই তিনি সামরিক সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার প্রক্রি া হইল ঘুসোঘুসি করা; কামান বা আগ্নেয়াস্ত্রের তাঁহার দরকার হয় না, এমন কি খেয়ালেও আসে না। কিন্তু তাঁহার স্বজাতীয় সৈন্যেরা দীর্ঘ ভারী বন্দুক সজ্জিত; জরুরী ক্ষেত্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অশ্বারোহীরা নিজেরাই সুবিধাজনকরূপে সেগুলি ব্যবহার করে। এই সকল জাতীয় সুবিধা ভিন্ন ব্যবহারের প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ তাঁহার পঞ্চাশটি কামানের একটা গোলেন্দাজ বাহিনী এবং তাঁহার নিজস্বই হউক বা তাঁহার কর্মচারীদেরই হউক, ১৫০টি হস্তী আছে। অন্যেরা বলিলেন, তাঁহার প্রত্যেকটি সৈন্য অন্ততঃ ৪।৫ শত টাকা মূল্যের অশ্বে আরোহণ করিয়া থাকে; তাহাদের জিন ও অস্ত্রশস্ত্র স্বর্ণ-রৌপ্য মণ্ডিত; তিনি নিজে স্বর্ণখচিত চারিখণ্ড ইস্পাতের একটা উরস্থান ব্যবহার করেন। উহার কারুকার্য এত চমৎকার যে, ভারতে তাহার জুড়ি নাই বলিলেই চলে। সংক্ষেপে তাঁহার সৈন্যদলকে প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হয়; তাহারা এত সুসজ্জিত বলিয়া প্রমাণিত যে, খুব কম সেনাপতিই ইহার সমকক্ষ সৈন্যদল আছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদের প্রভু কদাচিৎ প্রায় ৩০০০ অশ্বারোহী সমাবেশ করিতে পারেন: তাঁহার ৫।৬ হাজারের বেশী পদাতিক নাই; তাহাদেরও কিছু নানা কাজে তাঁহার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে। ইহাই ছিল পরিষদের অধিকাংশের মনোভাব। কিন্তু কিছু লোক ছিলেন স্বভাবতঃই সাহসী ও আত্ম-সম্মান সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত; তাঁহারা স্বতন্ত্র যুক্তি দেখাইলেন। আমার চাচা মেহদী নেসার খাঁ ইহাদের অন্যতম। সাহস ও সেনাপতিত্বের জন্য তিনি উচ্চ খ্যাতিলাভ করেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, জীবন মৃত্যুর ব্যাপার নির্ভুলভাবে অনিবার্য ভাগ্যের নির্দেশে পরিচালিত হয়। শত্রুকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করা সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। করে

নিছক আল্লাহ্‌র মর্জির উপর। খোদ কুরআন শরীফে ইহা ঘোষিত হইয়াছে ঃ তাহাতে বলা হইয়াছে, আল্লার হুকুমে অনেক সময় অল্পসংখ্যক লোক বহু লোকের উপর জয়ী হইয়াছে। এই আকস্মিক ব্যাপারে এমনকি তাঁহাদের রাজার স্পষ্ট আদেশানুযায়ী হইলেও শত্রুর সাক্ষাৎকার পরিহার করিলে জগতে সুনাম হইবে না, অন্ততঃ তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-বর্গের পরীক্ষায় ইহা টিকিবে না; এরূপ মত পরিণামে অসম্মান ও প্রকৃত ক্ষতির কারণ হইবে। এই কর্মচারীটা কিছু উৎসাহের সহিত এত বেশী কথা বলিয়া একটু দম লইয়া আবার বলিলেন, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত মত কিন্তু অন্যগুলির বেলায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অধিকতর দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন উপরওয়ালাদের মত মানিয়া লইবেন এবং তাঁহাদের মরজী মোতাবেক চলিবেন।

শাসনকর্তা নিজেও অত্যন্ত সাহসী এবং সুক্ষ্মসম্মান জ্ঞান ও প্রভৃত বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন বলিয়া এই শেষোক্ত উপদেশ অনুমোদন করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তিরহুত ছাড়িয়া অবিরাম কুচ করিয়া আজিমাবাদে পৌঁছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাঁহার প্রাসাদে অবতরণ না করিয়াই নগরের সর্বপূর্ব প্রান্তে জাফর খাঁর বাগানে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। সেখানে আবদুল আলী খাঁ ও আমীর খাঁর ভ্রাতা আকীদৎ মন্দ খাঁ প্রভৃতি আজিমাবাদের প্রধান আমীরবৃন্দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা ছিলেন প্রদেশের প্রধান ব্যক্তি এবং তাড়াতাড়ি তাঁহাকে সালাম দিতে আসেন। যুবক শাসনকর্তা বিনয় ও ভদ্রতার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে সমভাব ও ভ্রাতৃসদৃশ সমাদরের (ইহার কোনটাই তাঁহার রীতি বা তাহার সাধারণ প্রকৃতিতে দেখা যাইত না) সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময়োচিত ঘনিষ্ঠতা ও ভক্তির এ সমুদয় অসাধারণ নিদর্শন দ্বারা তিনি এমনভাবে তাঁহাদের চিত্ত জয় করিলেন যে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার ভাগ্যের অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এত ভাল সূচনার পরে তিনি সৈন্য সমাবেশ ও নূতন সৈন্য সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ফয়েজ আলী খাঁর বখ্শী উপাধি ছিল বলিয়া মেহদী নেসার খাঁ ও আবদুল আলী খাঁ উভয়েই নূতন সৈন্য সংগ্রহের জন্য সৈন্যদলের প্রধান

ও দলভাঙ্গা কর্মচারীদের সহিত মন্ত্রণা করিতে নিযুক্ত ছিলেন। একই সময় কয়েক জন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিও সৈন্য সংগ্রহের আদেশ প্রদত্ত হইল। দায়ুদ খাঁ পনীর পৌত্র আহমদ খাঁ কুরাইশী, শাহজাহান ইয়ার শাহ্ আহ্মদুদ্দীন, শাহ্ আমরুল্লাহ, করম খাঁ, গোলাম আলী খাঁ ও কদম হাসান খাঁ ছিলেন এইরূপ লোক। মহতা যশবন্ত, রাজা কিরাত চাঁদ রাজা রামনারায়ণ ও অন্যান্য হিন্দু সেনাপতির নিকটও একেই আদেশ প্রেরিত হয়। তাঁহাদিগকে প্রথমে উৎকৃষ্ট আরোহী ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য সংগ্রহ ও নির্বাচন করিতে নির্দেশ দান করা হইল। তৎপরে তাঁহারা উপস্থিত যে কোন বলিষ্ঠ লোককে তালিকাভুক্ত করিতে পারিতেন। প্রদেশের জমিদারদিগকেও অনুরূপভাবে ডাকিয়া পাঠান হইল; শাসনকর্তার সহিত যাঁহাদের সম্পর্ক ছিল বা যাহারা তাঁহার অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের সৈন্য লইয়া হাজির হওয়ার আদেশ পাইলেন। ইহারা ছিলেন রাজা সুন্দর সিংহ নরহত ও সেমাইর নামদার খাঁ, সরদার খাঁ, কামকার খাঁ প্রভৃতি; ইহারা ছিলেন সুন্দর সিংহের ন্যায়ই পরাক্রান্ত। সেরেস কৌতুকার জমিদার বিষাণ সিংহ, সাহারসিরাম চীনপুরের জমিদার পাহ্লওয়ান সিংহ ও তদীয় ভ্রাতা শত্রুসিংহ এবং আরবুলের জমিদার ভরত সিংহের নিকটও অনুরূপ আদেশ প্রেরিত হইল। ইহাদের সকলেই আসিয়া তাঁহাদের খেদমত দানের প্রস্তাব করিলেন এবং এই শাসনকর্তার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহারা তাহাতে শরীক হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অবিশ্রান্ত এত অধিক জনসমাগম হইল যে, একাদিক্রমে এক মাস ধরিয়া দিবারাত্র তালিকাভুক্তির কাজ চলিল। ফলে যে ঘোড়ায় একবার দাগ দেওয়া হয় অর্থাৎ যাহা পূর্বে চাকরীতে ছিল, তাহার তালিকাভুক্ত হওয়া নিশ্চিত ছিল। ঐ অল্প সময়ে সরকারী খাতাপত্রে পদাতিক ভিন্ন অন্ততঃ ১৪০০০ অশ্বারোহীর নাম উঠে; নূতন ও পুরাতনে মিলিয়া পদাতিকের সংখ্যাও এত হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র অনুমোদন লাভ করিল না। ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, বাস্তবিকপক্ষে পরিখার পশ্চাতে স্থাপিত না হইলে উদাসীনভাবে অস্ত্রসজ্জিত নব সংগৃহীত সৈন্যেরা কখনও মুস্তফা খাঁর উৎকৃষ্ট অশ্বারূঢ় ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রসজ্জিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রবীণ

শাসনকর্তার বাধাদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা

সৈন্যদের ধাক্কা সামলাইতে পারিবে না। অতএব প্রদেশের সর্বাংশ হইতে বিপুল সংখ্যক অগ্রগামী সৈন্য ও মজুর আনাইয়া অচিরে জাফর খাঁর বাগান ও একটি নিকটবর্তী হ্রদের পানি হইতে উপনগরের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নির্মিত একটা বাঁধ বা প্রাচীরের মধ্যবর্তী সমস্ত ভূমি বেষ্টন করিয়া এক পরিখা খোদিত হইল। পরিখার সঙ্গে যুক্ত হইল এক গভীর নর্দমা; ইহা হইতে খনিত মৃত্তিকা কতকটা আর্দ্র প্রমাণিত হওয়ায় কোন চুনবালি বা ইটের কাজ ছাড়াই একটা অতি উৎকৃষ্ট প্রাচীরের কাজ সিদ্ধ হইল। যথোপযোগী দূরত্বে বুরুজ নির্মিত ও কামান স্থাপিত হইল। মধ্যবর্তী পর্দার অংশসহ এগুলির প্রত্যেকটা এক একটা সৈন্যদল পরিচালনাকারী একজন কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হইল। সমগ্র বাহিনীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিয়া উহাদের প্রত্যেকটা এক একজন বিশ্বস্ত সেনানায়কের আদেশের অধীনে স্থাপিত হইল। প্রথমজন ছিলেন এই গরীবের চাচা আবদুল আলী খাঁ, দ্বিতীয় আহমদ খাঁ কুরাইশী, তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী রায় রায়ান আলমচাঁদের পুত্র রাজা কীরাত চাঁদ, চতুর্থ রাজা রামনারায়ন, পঞ্চম খাদেম সুযোন খাঁ ও ষষ্ঠ নাদির আলী খাঁ; ইহাদের সকলেই তাঁহাদের সৈন্যদল সহ পরিখা বা প্রাচীরের পাদমূলে স্থাপিত হইলেন; তাঁহারা দিবারাত্র এগুলি পাহারা দিতেন। রাজার, সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রেতা ও পল্টনের অন্যান্য ভৃত্যকে প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈয়ার রাখিয়া প্রত্যেকটা সৈন্যদলের পশ্চাতে হাজির থাকার আদেশ প্রদত্ত হইল। প্রত্যেক সেনাপতি তাঁহার সৈন্যদের পুরোভাগে তাঁহার তাঁবু গড়াইলেন; তাঁহার পতাকা গাড়া হইল তাঁহার তাঁবুর অগ্রে এবং তাঁহার পদচিহ্ন ও নিশান স্থাপিত হইল প্রাচীরের উপরে। প্রত্যেকেই শত্রুকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে প্রস্তুত হইলেন। নরকুলের সর্বাপেক্ষা অধম আমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকী আলী খাঁর সঙ্গে স্থাপিত হই। পাঁচ মাস পূর্বে আমি আমার পিতার (তাঁহার উপর চিরদিনের জন্য শান্তি হউক) অনুমতিক্রমে শাহজাহানাবাদ ত্যাগ করি। তখন ১১৫৭ সনের জিলকদ মাস। আমি আজিমাবাদের এক পরিবারে বিবাহ করিতে আসি; তাঁহারা দীর্ঘকাল পূর্বে এই আত্মীয়তায় সম্মত হন। কাজেই ১১৫৮ সনের মুহর্‌রম মাসে আমি আমার নিজ বড় চাচা আবদুল আলী

খাঁর কন্যাকে বিবাহ করি, অতঃপর পরবর্তী মাসের ১৫ই তারিখে আমি শাসনকর্তার পরিখায় আমার স্থান গ্রহণ করিয়া আমার চাচার ভাগ্যের সঙ্গে আমার নিজের ভাগ্য গ্রথিত করি; তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি। পক্ষান্তরে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকী আলী খাঁ চাচা মেহদী নেসার খাঁর আদেশের অধীনে কাজ করা পছন্দ করেন। তাঁহার সঙ্গে আনীত প্রায় ১০০ অশ্বারোহী ছিল। তিনি তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিতে অদিষ্ট হন। এই নরাধমের কোন সেনাদল বা বেতন না থাকিলেও আমি সম্মানের খাতিরে এই অভিযানে কাজ করিতে মনস্থ করি; তদ্বারা আমি শাসনকর্তার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহি।

এই সমুদয় আয়োজন সমাধা হইলে দেখা গেল যে, তিনি নগরের বুরুজ ও প্রাচীরের উপরে সৈন্য ও কামান বসাইয়াছেন এবং শিবির হইতে কোন সৈন্যকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু এই পূর্ব সতর্কতায় এতদ্ভিন্ন তাঁহার একটা গৌন অভিপ্রায় ছিল; তাহা এই যে, মুস্তফা খাঁ আকস্মিক আক্রমণ করিলে পরিখায় অবস্থিত লোকদের সম্পত্তি ও পরিবারের আসন্ন ক্ষতি হইত বলিয়া এরূপ কোন ঘটনা হইতে যাহাতে কোন অনিষ্ট না ঘটে পূর্বাহ্নে তাহার উপায় করিয়া লওয়া। শাসনকর্তার আদেশে তখন প্রাচীর তুলিতে যে অজস্র নাগরিক এত বিরক্তি গুঞ্জন করে অথচ এখন ইহা হইতে প্রাপ্ত উপকার স্বীকার করিত। তাহাদের সম্পত্তি ও পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও এই পূর্বসতর্কতা অভিপ্রেত ছিল। এই সমস্ত পূর্বসতর্কতা অবলম্বিত হইলে শাসনকর্তা মুস্তফা খাঁ ইতোপূর্বেই প্রকাশ্যে ও যথেষ্ট পর্যাপ্তরূপে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করায় প্রকৃত পক্ষে আর কোন তদন্তের দরকার না থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মন যাচাই করিয়া দেখিতে এবং তিনি তাঁহার সহিত কতদূর শত্রুতা করিতে চাহেন, তাহা নির্ধারণ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার নিকট একটা যথোপযুক্ত বার্তা লইয়া হাজির থাকার জন্য তিনজন লোক ঠিক করা হইল। ইহাদের প্রথম ব্যক্তি হইলেন কাশ্মীরী হাজী আলম, তখন হইতে তিনি হাজী মুহম্মদ খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন অযোধ্যা

তথাপি মুস্তফা খাঁর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ

নিবাসী দরবেশ তাজুদ্দীন; এলাহাবাদের সুবাদার আমীর খাঁ তাঁহাকে সয়ফ খাঁর মাদ্রাসা ও সমাধির পরিদর্শকের পদের জন্য সুপারিশ করেন; এই অট্টালিকাটী আজিমাবাদ দুর্গের পশ্চিমে নদীর ধারে অবস্থিত একটি মনোরম স্থান; শীতলতা, নির্জনতা, স্বাস্থ্যকরতা ও বৃক্ষের ছায়ার জন্য ইহা এত বিখ্যাত যে, সর্বোচ্চ লোকদের গম্য স্থানে পরিণত হয়। সেই আনন্দজনক স্থানে তিনি একটী মোটা বৃত্তি ভোগ করিতেন। তৃতীয় ব্যক্তির কথা আমার সঠিক স্মরণ নাই; আমার বিশ্বাস তিনি ছিলেন কাবুল প্রদেশের এক কালীন দেওয়ান মুহম্মদ খাঁর পরিবারের বন্ধু ও প্রদীপ আজিমায়গ। এই তিনজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি নিম্নোক্ত বার্তাসহ মুস্তফা খাঁর নিকট প্রেরিত হন। "আপনার মুর্শিদাবাদ ত্যাগ দ্বারা যদি আপনি সম্পূর্ণ রূপে মহামান্য সুবাদারের চাকরীতে ইস্তেফা দিয়া থাকেন এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া এই দেশ ত্যাগ করিতে চাহেন, তবে অতীত বন্ধুতা ও অতীত কালের খাতিরে আমাদের বন্ধুবর্গ ও অতিথিগণকে অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের গৃহে তশরিফ আনিয়া অন্ততঃ ২/৩ দিন অবস্থানের জন্য অনুরোধ করিতেছি; তাহা হইলে আমরা আবার পরস্পরের সঙ্গ ভোগ করিতে পারিব; অধিকন্তু আমাদের মেহমানদের ভবিষ্যৎ সফরের জন্য তাহাদের যত গাড়ী, তাম্বু ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দরকার হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার সময় পাইব। বিশেষতঃ ইহার ফলে আমরা পরস্পরকে বিদায় অভিনন্দনও জানাইতে পারিব। কিন্তু মহান ও মহামান্য সুবাদারের বিরুদ্ধে আপনি যে অসন্তোষ বোধ করিয়াছেন, তাহা যদি এমন ধরনের হয় যে, কোন প্রতিকার সম্ভব এবং আমার মধ্যস্থতা আপনার অসন্তোষের কারণ দূরী করার এবং যে তীর একদা সর্বাপেক্ষা আন্তরিকতাপূর্ণ অনুরক্তি দ্বারা ঐক্যবদ্ধ দুইটি হৃদয়কে আহত করিয়াছে, তাহা টানিয়া তুলিতে সহায়তা করিবে, এরূপ বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্যে আমি আমার খেদমত দানের প্রস্তাব করিতে সুখী হইব। পক্ষান্তরে হুজুর যদি এই প্রদেশ শাসনের জন্য বাদশাহের হুজুর হইতে কোন ফরমান পাইয়া থাকেন, মেহেরবানি করিয়া আমাদিগকে তাহা দেখিতে দিন; তাহা হইলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে

মুস্তফা খাঁর নিকট আজিমাবাদের শাসন কর্তার বুদ্ধিকৌশলময় চিঠি

এই দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা যুদ্ধে ও বিনা প্রতিবাদে হুজুরকে ইহা সমর্পণ করিয়া যাইতে পারি।" দূতেরা দেখিলেন, মুস্তফা খাঁ মুঙ্গের শহরের পূর্বদিকে শিবির পাতিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে তাহাদের বার্তা প্রদান করিলে এই উত্তর দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের বিদায় দেওয়া হইল। ভদ্র মহোদয়গণ, মহাবৎ জঙ্গের[৩০] সহিত আমার সম্পর্ক নূতন করার কিম্বা মুসাফিররূপে এই দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার ইচ্ছা আমার নাই। আপনাদের হস্ত হইতে ইহা ছিনাইয়া নেওয়াই আমার অভিপ্রায়। সনদ ও এই প্রদেশ অধিকার করার স্বত্ব সম্পর্কে আপনাদিগকে খুব উৎকণ্ঠিত মনে হয় বলিয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আপনার চাচা সরফরাজ খাঁর নিকট হইতে বাঙ্গলা কাড়িয়া লইতে যে সনদ দেখান, এরূপ কার্যক্রমের জন্য আমার হাতেও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। এখানে তিনি একটু থামিয়া এই বয়াত যোগ করিলেন:

"এই ব্যাপারে সর্বশক্তিমানের অভিলাষ কি, আমাদিগকে তাহা দেখিতেই হইবে।"

এই ধরণে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া তিনি মৌলভীকে এই প্রশ্ন করিলেন, মৌলভী সাহেব মনে করুন, আপনি এক দিকে অদীক্ষিত কাফির ও অন্যদিকে অভিসম্পাৎকারী শিয়াদের[৩১] দ্বারা পরিবৃত এবং ধরিয়া নিন, হয় ইহাদের, নতুবা উহাদের ধ্বংস করার শক্তি আপনার আছে। আপনার মতে, কাহাকে প্রথমে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করা উচিত? মৌলভী তাঁহার মতলব বুঝিলেন, কিন্তু গোপন করা উচিত নয় মনে করিয়া বিনীতভাবে জওয়াব দিলেন: "কাফিরেরা সশস্ত্র হইলে ও শত্রুতাচরণ করিলে তাহাদিগকে আক্রমণ করা বৈধ। কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বী ও অভিসম্পাৎকারী হইলেও মুসলমানদের হত্যা করা আইন সঙ্গত নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন করা ও তাহাদিগকে তাহাদের ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার করা মানুষের করণীয় সর্বাপেক্ষা পুণ্য কার্যগুলির অন্যতম।" মুস্তফা খাঁ উত্তর দিলেন, "মৌলভী সাহেব কি এইরূপই বলেন? তাহা হইলে আমরা অনেক পৃথক মত পোষণ করি, আমাদের নিজ ওস্তাদদের মতে অভিসম্পাৎকারীরা অনবগত কাফিরের চেয়েও অধম; সুতরাং প্রথমে

তাহাদেরই ব্যবস্থা করিতে হইবে: অতঃপর তাঁহাদের পালা অনুযায়ী অন্যান্যের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতে পারে।" কথোকথন এইরূপ মোড় নেওয়ায় মৌলভী আর একটি কথাও না বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিলেন। দূতেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহারা যাহা শ্রবণ করিলেন, তাহা হুবহু বর্ণনা করিলেন। শাসনকর্তা ইতোপূর্বে যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক ছিলেন; এখন ইহার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন একটা সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে যে, মনের গর্বে মুস্তফা খাঁ নগরের অধিবাসীদের গৃহ বিশেষতঃ শা নকর্তার বন্ধুদের বাসভবনগুলি তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। সংবাদে আরও ছিল যে, প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট গৃহ প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট লোকের জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং জয়লাভের পরে প্রত্যেকটা গৃহ, উহার আসবাবপত্র, ধন-সম্পদ এবং নারী ও বালক-বালিকাসহ নূতন মালিককে প্রদত্ত হইবে। কিন্তু আল্লাহ এই অন্যায় পরিকল্পনা অনুমোদন করেন নাই। ইহা আমার মনে গভীরতম দাগ না কাটিয়া পারে নাই। তখন আমার মন দুঃখ ও অস্থিরতার শিকারে পরিণত হয়। সুতরাং আমি তখন আমার ভাগ্যের জন্য শিরাজের হাফিজের গ্রন্থে সন্ধান করি; তাঁহার বয়াতগুলিকে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী ও অদৃশ্য জনের [৩২] বোধগম্য রসদ বলা যাইতে পারে। যথোচিত অনুষ্ঠানের সহিত ঐ গ্রন্থখানা খুলিয়া পৃষ্ঠার উপরিভাগে প্রথম যে বয়াত পাওয়া গেল, তাহা এই:

"তুমি কি ঐ বিষয়টা আল্লাহ্‌র হাওলা করিয়া নিজেকে নিশ্চিন্ত করিতেছ?
তোমার শত্রু যদি তোমাকে দয়া না করেন, তোমার আল্লাহ করিবে না।"

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া। এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। মুঙ্গেরে পৌঁছিয়া মুস্তফা খাঁ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রসুল খাঁকে তদীয় সৈন্যদল লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইলেও এই ধ্বংসাসন্ন দুর্গের কিঞ্চিত সুনাম ছিল। শাসনকর্তা তাঁহার ক্ষুদ্র রক্ষী সৈন্যদল লইয়া প্রতিরোধে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ঐ কর্মচারিটার মতে সেই দুর্গটি অধিক সমারোহের যোগ্য নহে মনে করিয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার লোকজনের অগ্রে স্থান লইয়া আক্রমাণার্থ উপরে উঠিলেন। মুহূর্তে অবরোধকারীরা প্রাচীরে আরোহণ

করিয়া দুর্গ অধিকার করিল। কিন্তু তাহাদের নেতার এমনি ভাগ্য যে, তিনি যখন দ্বিতীয় দ্বারের নিম্নে দাঁড়াইয়া তাঁহার লোকদিগকে তাড়াতাড়ি করিতে উৎসাহিত করিতেছিলেন, তখন উপর হইতে তাঁহার উপর একখানা প্রস্তর পতিত হওয়ায় তিনি অবিলম্বে নিহত হইলেন; রক্ষী সৈন্যদলের এক ব্যক্তি ইহা ঢিলা করিয়া দিয়াছিল। এরূপ একজন সাহসী কর্মচারীর প্রাণনাশের ক্ষতিপূরণ হইতে পারে, স্থানটি এত লাভজনক ছিল না। আবদুল রসুল খাঁ ছিলেন তাঁহার আশা-ভরসা স্থানীয় লোক; কাজেই মুস্তফা খাঁর প্রাণে ঐ গুরুতর আঘাত বড় বাজিল, কিন্তু তাঁহার সৈন্যরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে তিনি তাহা গোপন করাই সঙ্গত মনে করিলেন এবং সেখানে তিন দিন অপেক্ষা করার পরে এই সফলতার জন্য বাদ্য বাজাইবার আদেশ দানের রীতি প্রতিপালন করিলেন। দুর্গ হইতে কিছু গোলাবারুদসহ কয়েকটি কামান লইয়া তিনি আজিমাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার নিকটবর্তিতায় পরিখার অভ্যন্তরস্থ লোকজনের সতর্কতা দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। বিশেষভাবে শাসনকর্তা দিবারাত্র বিশ্রাম না করিয়া ইহার প্রত্যেকটা অংশ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। উপরোক্ত ছয় জন সেনাপতি যেন ব্যক্তিগতভাবে দিনে[৩৩] ও রাত্রে তাঁহাদের পরিদর্শনে বাহির হন, তিনি মেহদী নেসার খাঁকে তাহা দেখিতে বলিলেন। তিনি স্বয়ং সর্বত্র ঘুরিয়া সময় সময় নিজেও আদেশ দিতেন। এক বৃহস্পতিবারে স্র্যোদয়ের প্রাক্কালে প্রত্যেকেই যখন স্বস্থানে সতর্ক, তখন মুস্তফা খাঁ সেখানে উপস্থিত হইলেন। পরিখা পরীক্ষা করিয়া তিনি নিকটস্থ কয়েকটা আম্র-কুঞ্জে গমন করিলেন। সেখান হইতে তাঁহার সৈন্যদলকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া তিনি বুলন্দ খাঁ রোহিলাকে একদলের সেনাপতিত্ব দান করিলেন, অন্য দল নিজে রাখিলেন। এই ব্যবস্থা করার পর তিনি কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া বুলন্দ খাঁকে চতুর্দিকে ঘুরপাক খাইয়া পরিখার যে অংশ নগর প্রাচীরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সে স্থান দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। এই রণকৌশল দ্বারা তিনি শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে আপতিত হইতেন। মুস্তফা খাঁ স্বয়ং সম্মুখস্থ পরিখা আক্রমণ করিলেন; ইহা ছিল উহার অপর প্রান্ত; রাজা সুন্দর সিংহ, রাজা কীরাত চাঁদ ও অন্যান্য

হিন্দু কর্মচারী ছিলেন এখানে সেনাপতি। বুলন্দ খাঁ ঘোড়ার বাজার ও জাফর খাঁর বাগানের একাংশ লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং পরিখা ঘুরিয়া নাসির আলী খাঁ, তাঁহার পুত্র সয়্যিদ আলী ও মুর্তজা খাঁর জামাতা মির্জা রমজানীর উপর আপতিত হইলেন; ইহারা সকলেই এই অংশে স্থাপিত হন। প্রথম আক্রমণেই নাসির আলী খাঁ তরবারির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সয়্যিদ আলী ও মির্জা রমজানী মুহূর্তে তাঁহার অনুসরণ করিলেন; নহর খাঁ মেওয়াটী আহত হইয়া প্রাণের জন্য পলাইয়া গেলেন। এইরূপ বুলন্দ খাঁ পরিখার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। যাহারা ইহা রক্ষা করিতেছিল তাহারা ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। তাঁহার আফগানেরা তাঁবু ও দোকানরাজি মালপত্রে পূর্ণ দেখিয়া অন্য কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেগুলি লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। ইতাবসরে মুস্তফা খাঁ নিজের তরফ হইতে পরিখা ঘুরিয়া ইহা আক্রমণ ও তৎক্ষণাৎ অধিকার করিলেন; রক্ষী সৈন্যেরা বিপুল সংখ্যায় নিহত হইল। বাবু জোইযার গাজী খাঁ ও সুন্দর সিংহের জামাতা সেখানে ছিলেন; তাঁহারা সসৈন্যে তরবারি মুখে নিক্ষিপ্ত হইলেন; তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকটি ব্যাপার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। যে ৬।৭ হাজার আফগান অশ্বারোহী ভিতরে ভীড় জমাইয়াছিল তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান অল্প কয়েকজন লোক লইয়া সুন্দর সিংহ তাহাদের সহিত মিলিয়া গেলেন। মুস্তফা খাঁ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সম্মুখে আগাইয়া গেলেন; তাঁহার লোকেরা সামান্য শরবৃষ্টি করিলে সেখানে স্থাপিত জুলফিকার খাঁ মেওয়ালী ও হিন্দু কীরাত চাঁদ উভয়েই আহত হইয়া তাঁহাদের যত অধিক লোক তরবারি হইতে রক্ষা পাইতে পারিল, তাহাদের লইয়া পলায়ন করিলেন। এতদ্দর্শনে ঐ অংশ রক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদল ও সেনাপতিরা ভয় সাহস হইয়া চতুর্দিকে পলাইয়া গেলেন। শাসন কর্তার সম্মুখে তখন একটা শুন্য ময়দান পড়িয়া রহিল। নিবিড় একদল সৈন্য লইয়া ইহার একদিক দিয়া মুস্তফা খাঁ ও তাঁহার হাতীতে চড়িয়া অন্য-দিক দিয়া শাসনকর্তা অগ্রসর হইতেছিলেন। এই সময় তাঁহার সঙ্গে ২০০ অশ্বরোহী ও ১৫০ বন্দুকচীর বেশী লোক না থাকিলেও তাঁহাকে

আফগানদের আজিমাদের চতুর্দিকস্থ পরিখা আক্রমণ ও অধিকার

হতভম্ব ও ভয়বিহ্বল মনে হইল না। কামগর খাঁ, জানমেত খাঁর সৈন্যদল, হইতে প্রধানতঃ মীর বদর দেহীর সৈন্যদল হইতে আরও প্রায় আটজন ছিলেন এই দুইশত অশ্বারোহীর অন্তর্ভুক্ত। মীর বদর দেহীকে সাধারণতঃ সাদৎ আলী খাঁ বলা হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অন্যান্য কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। নকী আলী খাঁ মীর আক্রাম এবং আরও ৫।৬ জন লোকের সহিত মেহদী নেসার খাঁ পরিখায় ছিলেন। এই আকস্মিক বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইবার সময় তিনি লক্ষ্ণৌর শাহ্ হামীদ খাঁর সহিত কথা বলিতেছিলেন। এই লোকটা ৭০০ সৈন্য পরিচালনা করিতেন। শাহ্ আমরুল্লাহ্ নামক আর একজন সেনাপতি ও আরও ৭০০ সৈন্য ছিল। মেহদী নেসার খাঁ উভয়কে তাঁহাদের মনিবের সাহায্যে গমনার্থ উৎসাহিত করিলেন; কিন্তু কেহই নড়িতে চাহিলেন না। অগত্যা যে ৫।৬ জন লোক তাঁহাকে ছাড়িয়া যায় নাই তাহাদের লইয়া তিনি সম্মুখে ছুটিয়া গিয়া শাসনকর্তার হাতীর সন্নিকটে দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে মুস্তফা খাঁ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করার জন্য তাঁহার লোকদিগকে দুই হাতে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। তাঁহাকে চীৎকার করিয়া বলিতেও শুনা গেল; ইনি হায়বৎজঙ্গ, তাঁহাকে জীবন্ত আনিতে যত্নবান হইও। হাকিম শাহ্ ছিলেন শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী; তিনি তাঁহার ঘোড়া হইতে ঝাপাইয়া পড়িয়া আরও ২।৩ জন লোক লইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া চলিলেন; এমন সময় মেহদী নেসার খাঁর সঙ্গে যে ছয় জন লোক ছিল, তাহার ৩।৪ জন তাহাদিগকে বাধা দান করেন। তাহারা তীব্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইতিমধ্যে শাসনকর্তা দৃঢ় মনোভাব লইয়া অবিরাম তীর ছুঁড়িতে অগ্রসর হইতেছিলেন। যুগপৎ তিনি আবদুল আলী খাঁকে তাঁহার সমগ্র সৈন্যদল-সহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করিতে আদেশ দিয়া তাঁহার নিকট একজন লোক পাঠাইলেন। এই কর্মচারী এবং পরিখার ঐ অংশের আরও ২।৩ জন সেনাপতি ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের সহিত পরিখা অধিকৃত হওয়ার কথা কিছুই জানিতেন না। তিনি উত্তর দিলেন, পরিখার মধ্যস্থ লোকের পক্ষে অশ্বারোহণ করা অসঙ্গত; তিনি তাঁহার সৈন্যদল লইয়া তাঁহার জায়গায় আসেন; শত্রুরা জোর করিয়া ঢুকিয়া পড়িলে তিনি তাঁহার

কর্তব্য সাধনে ত্রুটি করিলেন না। তিনি যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন আর একজন লোক এই বার্তা লইয়া আসিলঃ "যখন আমার কার্যকর রূপে সম্পন্ন হইবে এবং আমি স্বয়ং নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হইব, তখন আপনার আগমনে আমার কি উপকার হইবে?" এতচ্ছ্রবণে তিনি তদ্দণ্ডেই অশ্বারোহণ করিলেন; যে অল্প কয়েক ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিল, তাহাদিগকে লইয়া তিনি শাসনকর্তার অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ ক্ষুদ্র সংখ্যার মধ্যে আমি ছিলাম একজন; এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় অশ্বারোহী ছিলেন। আমরা অগ্রসর হওয়ার সময় দেখিলাম মুস্তফা খাঁ পশ্চাদ্বর্তন করিতেছেন। তাঁহার সৈন্যরা বিশৃঙ্খলভাবে পরিখার ভিতর হইতে পলায়ন করিতেছে; জয়নুদ্দীন খাঁ দুর্গপ্রাসাদের উপরে দাঁড়াইয়া একদল রোহিলার উপর জোরেশোরে বন্দুকের গুলী ও হাউইবাজি ছুড়িতেছেন। তাহাদের গজারূঢ় সেনাপতিসহ তাহারা বিশৃঙ্খলভাবে চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছে! ইহা দেখিয়া আবদুল আলী খাঁ কি সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিতে পারে, অনুমান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেনঃ "আমাদের মনিব যখন এরূপ যুদ্ধ করিয়াছেন আমরা তাঁহার সৈন্যেরা তখন চুপটি মারিয়া রহিয়াছি।" এই গুটি কয়েক কথা বলিয়া যে অল্প কয়েকজন লোক তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদের সঙ্গে লইয়া তিনি পরিখার কামানের পাল্লার বাহিরে একটি স্থানের দিকে ছুটিয়া গেলেন। মুস্তফা খাঁ তাঁহার সঙ্গীয় লোকজন লইয়া সেখানে প্রতিরোধ করিতেছিলেন এবং হস্ত (সঙ্কেতে) ও কথায় তাঁহার লোকদিগকে একত্র করিতেছিলেন। কিন্তু শাসনকর্তা দুর্গ প্রাকার হইতে আবদুল আলী খাঁর অবিমৃষ্যকারিতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে আসার জন্য অপরিবর্তনীয় আদেশ পাঠাইলেন। সংবাদদাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নিজেকে ও তাঁহার সঙ্গীয় স্বল্প সংখ্যক সাহসী পুরুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে লইয়া যাওয়ার কি অর্থ থাকিতে পারে? আপনার মনিব বলিতেছেন, "আমার নিকটে আসিয়া আপনার ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের একত্র করুন এবং বিজয়ের মালিক আমাদের জন্য আজ কি করেন, তাহা দেখুন। আবদুল আলী খাঁর বন্ধুরা ইতোপূর্বেই তাঁহাকে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করিতেছিলেন কিন্তু কিছুই না

করায় তিনি এত লজ্জিত এবং এত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত ছিলেন যে, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন; ঠিক সেই মুহূর্তে সংবাদদাতা তাঁহার নাগাল পাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিল। ইতোমধ্যে সূর্য মধ্য গগণে উপনীত হয় এবং উত্তাপ এত অসহনীয় হইয়া উঠে যে, মুস্তফা খাঁ ইহার ফল অনুভব করিলেন। তাহার বহু সংখ্যক লোক আহত, সর্বাপেক্ষা সাহসী বন্ধুদের অনেকে নিহত এবং অবশিষ্টেরা ভগ্নোৎসাহ ও গরমে মূৰ্চ্ছিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া পুনরাক্রমণ করা সঙ্গত মনে না করিয়া তিনি মন্থর গতিতে তাঁহার শিবিরে গমন করিলেন; ইহা শত্রুপক্ষ হইতে এক ক্রোশের কম দূরে। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি আম্রকুঞ্জে কামান পাতিয়া পরিখার উপর অবিশ্রান্ত গুলী ছুঁড়িবার আদেশ দান করিলেন।

আমাদের আসিবার পূর্বে কি ঘটিয়াছিল এবং কিরূপে মুস্তফা খাঁ পরাজিত হইয়াছিল, কেবল এই পশ্চাদ্বর্তনের পরেই আমরা তাহা জানিতে পারি। ঐ সেনাপতি অবিলম্বে বলপূর্বক পরিখায় প্রবেশ করিয়া এবং ইহার প্রত্যেকটি অংশ বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্কে পূর্ণ করিয়া মনে করিলেন সব শেষ হইয়াছে। তখন নিজেকে প্রায় একাকী দেখিয়াও শাসনকর্তা তাঁহার লজ্জায় বাঁচিয়া না থাকিতে মনস্থ করিয়া জীবন চড়া দামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাঁহার হাতী হইতে অবিরাম তীর বর্ষণ করিতেছিলেন; ভারী বন্দুকসজ্জিত তাঁহার প্রহরীরা অগ্রসর হইতে হইতে গুলী বৃষ্টি করিতেছিল। অল্প কয়েকজন অশ্বারোহী ও কয়েক জন রোহিলাও অনুসরণ করিয়া তাহাই করিতেছিল। অবশেষে তাঁহারা শত্রুদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল। শাসনকর্তাকে লক্ষ্য করিয়া মুস্তফা খাঁ তিনি কে, তাঁহার লোকগুলিকে তাহা নির্দেশ করিয়া তাঁহাকে জীবন্ত ধরিয়া নেওয়ার আদেশ দান করিলেন। তিনি তখনও কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার অন্যতম সর্বাপেক্ষা সাহসী ও উৎসাহী বন্ধু হেকিম শাহ্ তাঁহার পশ্চাতে ৩।৫ জন সাহসী লোক আকৃষ্ট করিয়া মেহদী নেসার খাঁর দুইজন অনুচরের ৩।৪ জনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার জখমের দরুন প্রাণশূন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন; দিলশাহ

নামক আর একজন সাহসী পুরুষ হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; তাঁহারও এক দশা ঘটিল। মুস্তফা খাঁ এখন নিকটে আসিয়া পড়িলেন এবং উভয় সেনাপতিকে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক বলিয়া বোধ হইল। এমন সময় তাহার মাহুত একটা বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়া হাত পা ছড়াইয়া তাঁহার রক্তে পতিত হইল। জন্তুটির চালক না থাকায় ডাইনে বামে ঘুড়িতে লাগিল; উহাকে এত অধিক ভীত ও বেহুশ বোধ হইল যে, পাছে উহা তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যায় ও তাঁহার হাত হইতে জয় ছিনাইয়া লয়, এই ভয়ে মুস্তফা খাঁ লাফাইয়া পড়িয়া তরবারি হস্তে পায়দল অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রত্যাশা ছিল তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণে অন্যেরাও তাঁহার দেহ ঘিরিয়া একটা বৃত্ত গঠন করিবে এবং তদ্বারা তিনি শাসনকর্তাকে বেষ্টন করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার লোকেরা তাঁহার ইচ্ছা ভুল বুঝিল; তাঁহার মাহুতের ন্যায় তিনিও একই কারণে ভূপতিত হইয়াছেন কল্পনা করিয়া তাহারা' তৎক্ষণাৎ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল; তৎপরে তাহাদের অধিকাংশই পরিখার ভিতর হইতে পলাইয়া গেল। তাহাদের সেনাপতি এরূপ ভাগ্য-বিপর্যয় সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে পদব্রজে তাঁহার সৈন্যদের অনুসরণ করিলেন। কেহই তাঁহার কথা চিন্তা বা স্মরণ করিল না। তিনি পরিখার বাহিরে আসিলে কেবল তখনই তাঁহার কথা তাঁহার লোকদের মনে পড়ায় তাহারা তাঁহাকে একটা ঘোড়া আনিয়া দিল। ইত্যবসরে তাঁহার লোকেরা এখন বিশৃঙ্খল, ছত্রভঙ্গ ও কোন আদেশ শ্রবণের অনুপযোগী হইয়া পড়ায় তিনি আর একটু দূরে গিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে তাঁহার দেহের চতুর্দিকে প্রলুব্ধ করিয়া আনার প্রত্যাশায় বিজয়ের নিদর্শন-স্বরূপ বাদ্য বাজাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করার অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সেনাপতি তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া পলাতকদের অনুসরণ করিলেন। শাসনকর্তা শত্রুদের পরিখার বাহিরে দেখিয়া যত বেশী পারিলেন, তাঁহার লোকদের একত্র করিয়া শত্রুদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া দিবসের অবশিষ্ট অংশ ও সারারাত অশ্বপৃষ্ঠে কাটাইয়া দিলেন। এই সময়ে

জানা গেল যে, রাজা সুন্দর সিংহের সৈন্যদল যথাসাধ্য শত্রুদের বাধা দান করিয়া অবশেষে হতবল ও পরাজিত হয় এবং মুস্তফা খাঁ তাঁহার কথা আর মনে না করিয়া আগাইয়া গিয়া রাজা কীরাত চাঁদকে তাঁহার সৈন্যদলসহ পলায়নে বাধ্য করেন। পক্ষান্তরে বুলন্দ খাঁও সবলে পরিখায় ঢুকিয়া শিবির লুঠন এবং প্রত্যেকটা অংশ আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ করিতেছিলেন। আমি বলি, সুন্দর সিংহ এরূপ ভাবগতিক দেখিয়া এবং একটা পতাকাও দণ্ডায়মান বা একজোড়া নিশানও প্রদর্শিত হইতে না দেখিয়া শাসনকর্তা নিহত হইয়াছেন ও সব ফুরাইয়া গিয়াছে স্থির করিয়া তাহার যত লোক তরবারি হইতে রক্ষা পায়, তাহাদের লইয়া পলায়ন করেন। রাজা বিষ্ণু সিংহ, মুহম্মদ সিংহ ও অপর কয়েকজন স্বল্পখ্যাত সেনানায়ক তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। তাঁহাদের সকলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলাইয়া গেলেন। কেহ কেহ নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন, আরও অনেকে লইলেন জাফর খাঁর বাগানে, নিকটবর্তী কুঞ্জগুলিতে ও নদীর ধারে। এইরূপে পরিখার পুরাপুরি অর্ধাংশে উহা রক্ষার জন্য একজন লোকও রহিল না। সৈন্যদলের রাজার এবং প্রাতঃকালে সেখানে যে সকল তাঁবু, নিশান ও পতাকা দণ্ডায়মান ছিল, এমন কি তাহাদের চিহ্নমাত্রও রহিল না। যতদূর দৃষ্টি চলিত, সমস্তই এক শূন্য বিয়াবনে পরিণত হয়। পরিখার যে অংশ পশ্চিম দিকে নগরের সহিত যুক্ত হয়, সেখানে স্থাপিত অন্যান্য সৈন্য এরূপ ভাব গতিক দেখিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ব দিকে ফিরিল; মুস্তফা খাঁ এখন সেখানে থাকায় তাহারা মনে করিল, সেখানেই সর্বাপেক্ষা অধিক বল প্রয়োগ হইবে। শাসনকর্তা সর্বত্র থাকিতেন ও সর্বত্র তাঁহার আদেশ দিতেন। তিনি আবদুল আলী খাঁর তাঁবু হইতে অল্প দূরে একটা অসুবিধাজনক তাঁবু খাটাইয়া তন্মধ্যে দিন ও ঐ সেনাপতির তাঁবুতে রাত্রি যাপন করিলেন। সেখানে তিনি কিঞ্চিত বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। তখন ঐ সেনাপতি, এই নরাধম, মেহদী নেসার খাঁ, নকী আলী খাঁ ও অপর কয়েকজন প্রহরীসহ তাঁহার দেহ পাহারা দিতেন। একবার আফগানেরা রাত্রি বেলায় পরিখার নিকটে আসিয়া তন্মধ্যে কয়েকটা হাউই-বাজি ছুড়িল। তাহাদের আকস্মিক আক্রমণের ইচ্ছা থাকায় তাহারা

লোকজন কিরূপ সতর্ক ছিল পরীক্ষা করিতে চাহে। কিন্তু মেহদী নেসার খাঁর চতুরতায় এই কৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি সর্বত্র গমন করিয়া আদেশ দিলেন, সৈন্যরা তাহাদের স্থান ত্যাগ করিবে না এবং কিছুর দিকে খেয়াল না করিয়া স্বস্থানে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে। এই আদেশে সৈন্যরা শান্ত হইল এবং ইতিমধ্যে যে গোলযোগ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইল। পরদিন শত্রুরা এত জোরেশোরে কামান দাগিল যে, উহাদের গোলায় বহুসংখ্যক সৈন্য ও অশ্ব বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল, যাহারা কিছু দূরে পরিখার ভিতরে ছিল, প্রতিমুহূর্তে তাহাদের একটা অশ্ব বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট হইতেছিল। কিন্তু যাহারা ইহার ঠিক পাদদেশে ছিল, তাহাদের কোনই ক্ষতি হইল না। একাদিক্রমে পাঁচ দিন পর্যন্ত একই হারে কামান দাগা চলিল। সপ্তম দিনে সফর মাসের এক বুধবারে গুপ্তচরেরা সংবাদ দিল, মুস্তফা খাঁ আগামী দিন শিবির ভাঙ্গিয়া তাঁহার যাত্রা চালাইয়া যাইবেন। এই সংবাদ পাইয়া শাসনকর্তা তাঁহার মন্ত্রণাসভা ডাকিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিজ্ঞতম ব্যক্তিরা মত দিলেন যে, "মুস্তফা খাঁ আর একটা যুদ্ধ পরীক্ষা না করিয়া যাইবার লোক নহেন। কাজেই ইতোমধ্যে সৈন্যদিগকে শত্রুর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দেওয়া ও প্রত্যেকটা আয়োজন করা কর্তব্য। অতঃপর তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটে, তজ্জন্য অপেক্ষা করা যাইতে পারে। পরাজিত সৈন্যগণকে অবশ্যই পরিখার পশ্চাতে রাখিতে হইবে, পক্ষান্তরে যাহারা প্রতিরোধ করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে ইহার বাহিরে আনিয়া পার্শ্বদেশে লইয়া যাওয়া কর্তব্য।" তদনুসারে আবদুল আলী খাঁ, আহমদ খাঁ কুরাইশী, শাহজাহান ইয়ার, খাদেম হোসেন খাঁ এবং আরও কয়েকজনকে যে সৈন্যদলগুলি বাহির হইয়া যাইবে, তাহাদের পরিচালনা ভার প্রদত্ত হইল। যশোবন্ত নগর, নামদার খাঁ তিন ভ্রাতা-সহ মেহিনের রাজা তাহাদের সৈন্যদল ও দেহরক্ষীদের লইয়া মেহদী নেসার খাঁ সহ সর্বত্র শাসনকর্তার সঙ্গে থাকিতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু রাজা কীরাত চাঁদ, জুলফিকার খাঁ প্রমুখ যাঁহারা আফগান তরবারির শক্তি

শাসনকর্তার সদাচরণ

টের পান, তাঁহারা পরিখার মধ্যে থাকিবার আদেশ পাইলেন। সূর্যোদয়ের সময় শাসনকর্তা ফজরের নামাজ পড়িয়া নিজেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার হাওলা করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। আবদুল আলী খাঁ প্রায় ১৫০০ অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন শাসনকর্তার নিজেরও ১০০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ বন্দুকচী ছিল; অল্প কয়েকজন হাউই বাজিকর ও ২।৩টী ক্ষুদ্র কামান ইহাদের অগ্রে যাইত। কিছুক্ষণ পরে মুস্তফা খাঁর অশ্বারোহীরা পরিখার দক্ষিণস্থ আম্র-কুঞ্জগুলি হইতে বাহির হইয়া আসিল, পক্ষান্তরে তাঁহার গোলেন্দাজ বাহিনী পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইল। মেহদী নেসার খাঁ ইহা লক্ষ্য করিয়া আগাইয়া আসিয়া আবদুল আলী খাঁকে ঐ রণকৌশলের সহগামী হইতে বলিলেন; কারণ যে উচ্চভূমি হ্রদের পানি আটকাইয়া রাখিতেছিল শত্রুদিগকে তাহার দখল লইতে বাধা দেওয়া দরকার। নতুবা তাহারা সেখানে স্থান গ্রহণে সমর্থ হইলে তাহারা একটা আশ্রয়ের পিছন হইতে গোলা ছুড়িবে, আর আমরা ছুড়িব খোলা ময়দান হইতে; কাজেই কাহারও পক্ষে নীচের প্রান্তরে মুখ দেখান অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এই উপদেশ আবদুল আলী খাঁর মনঃপূত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ বাম দিকে ঝুঁকিলেন, পক্ষান্তরে শাসনকর্তা রাজপথ ধরিয়া চলিলেন। কিন্তু ডাইন দিকে ঝুঁকিয়া ও আবদুল আলী খাঁ হইতে প্রায় এক কামানের পাল্লা দূরে থাকিয়া। আমি নিজে আবদুল আলী খাঁর সৈন্যদলে ছিলাম; তিনি যখন তাহাদের লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, শত্রুরা তৎপূর্বেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চ ঢিবি ঘুরিয়া ঐ দৃঢ় স্থানটী দখলে আনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের কামান হইতে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই মুস্তফা খাঁর পুত্র মুর্তজা খাঁ বহুসংখক লোক লইয়া তাঁহার ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলেন। কামানের সহায়তা করার জন্য তাহারা ঢিবির দক্ষিণ-বামে স্থাপিত হইল। ঐ সেনাপতি নিজেও বাঁধের শেষ প্রান্তের নিকটবর্তী হইয়া উহার ও রাজপথের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন; শাসনকর্তা ঐ রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি তাঁহার হাতীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হাতী থামাইলেন। একদল

সাহসী আফগান তৎক্ষণাৎ পিতা-পুত্রের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান ভর্তি করিয়া ফেলিল ; তাহারা অবিলম্বে ব্যূহ রচনা করিয়া আলেকজাণ্ডারের প্রাচীরের[৩৪] ন্যায় দুর্ভেদ্য আকৃতি ধারণ করিল। সেখান হইতে তাহাদের লম্বা বন্দুক দ্বারা তাহারা ভীষণ গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। আক্রমণের মধ্যে আমার ডাইনে বামে যাহারা ছিল, তাহাদের অধিকাংশই শহীদ ও নিহত হইল অথবা তাহাদের ঘোড়া হাত পা ছড়াইয়া মৃত্তিকায় শুইয়া পড়িল। ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবদুল আলী খাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। তিনি তাঁহার ঘোড়া হারাইয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকেন। অতএব আমি আমার হাতীকে হাঁটু গাড়িয়া বসিতে আদেশ করিলাম এবং লোকটিকে আমার হাওদার পিছনে লইলাম। কিন্তু হাতী যখন গাত্রোত্থান করিতেছিল, তখন বন্দুকের একটা গুলী আসিয়া আবার তাঁহাকে আঘাত করিল। আমি মনে করিলাম ইহা তাহার দেহের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার কটিবন্ধের ভাঁজ ও কোমরবন্ধের পুরুতা দ্বারা ইহা শ্লথ হয়। সেই মুহূর্তে আর একটা আলো আসিয়া আমার বাহু জখম করে : ইহা মাংস পুড়িয়া ও ছিড়িয়া লইয়া যায়, কিন্তু হাড় রক্ষা পায়। আবদুল আলী খাঁর মাহুত দুইটি বন্দুকের গুলী খাইয়া গড়াইয়া নীচে পড়িল ; কিন্তু মরিল না। রহমান খাঁ আবদুল আলী খাঁর পশ্চাতে বসিয়াছিলেন ; তিনি তাঁহাকে মাহুতের স্থান পূরণ করিতে বলিয়া মাহুতকে পশ্চাতে রহমান খাঁ যেখানে ছিলেন, সেখানে বসাইলেন। যুদ্ধ এখন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল ও প্রতি মুহূর্তে লোক গতায়ু হইতে লাগিল। আবদুল আলী খাঁর একজন কর্মচারীর ইহা ভাল লাগিল না। আমার বিশ্বাস, তাঁহার নাম ছিল মির্জা ফতেউল্লা খাঁ। যে কোন ব্যক্তি কখনও যুদ্ধ করে, তিনি ছিলেন তত্তুল্য সাহসী। স্বয়ং পায়ে আহত হওয়ায় তিনি কদাচিৎ চলাফিরা করিতে পারিতেন। তথাপি অল্প কয়েকজন বন্দুকচী নির্বাচিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে আবদুল আলী খাঁর হাতীর সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে গুলি বর্ষণে উৎসাহ ও নির্দেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের গোলা বৃষ্টি এত প্রচণ্ড বলিয়া প্রমাণিত হইল যে, আমাদের লোকে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পিছনে পড়িতে ও পশ্চাতে লুকাইতে লাগিল। ফলে আবদুল

আলী খাঁ, আহমদ খাঁ কুরাইশী, শাহজাহান ইয়ার ও সাদেক হাসান খাঁর পরিচালনায় কিছু পদাতিকসহ প্রায় ৩০০ অশ্বারোহী মাত্র রণক্ষেত্রে রহিল। ইহা দেখিয়া আবদুল আলী খাঁ শাসনকর্তাকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, ব্যাপার তাঁহাদের প্রতিকূলে যাইতেছে এবং সাহায্য না পাইলে তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিবেন না। কারণ শাসনকর্তার উপস্থিতিতেই তাঁহার লোকেরা পুনরাক্রমণে উৎসাহিত হইবে; কাজেই তাঁহার আশা, তিনি স্বয়ং তাঁহার সাহায্যে আসিবেন। এই সংবাদ পাইয়া শাসনকর্তা অগ্রসর হইতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা হাজী আহমদ তাহা বাতিল করিয়া দিলেন। ফলে কোন সাহায্য আসিতেছে না দেখিয়া যে সকল লোক সেই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের আশা করিতে পারিত না, তাহাদের স্থায় আমরা নিজেদের আল্লাহ্‌র হাওলা করিয়া দিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে মুস্তফা খাঁ তাঁহার হাতীতে চড়িয়া টিবির পশ্চাদ্দিক হইতে আবির্ভূত হইলেন। আমরা সকলেই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, আফগানেরা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এই সময় ফতেউল্লাহ খাঁ তাঁহার বন্দুকচীদের লইয়া আমাদের সহিত যোগদান করিয়া বন্দুক ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম গুলীতেই তিনি মুস্তফা খাঁর মাহত ও পতাকা বাহককে ভূপাতিত করিলেন। পতাকা-বাহক ও পতাকা দুই-ই গড়াইয়া নিচে পড়িল। জানিনা কেন, এই দৃশ্য দেখিয়া আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আমরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছি; সুতরাং আমি আল্লাহ্‌র ভরসা করি। আবদুল আলী খাঁ তাঁহার সঙ্গীয় তিনজন সেনাপতিসহ উত্তর দিলেনঃ আমি ভাবী ঘটনার লক্ষণ স্বীকার করিলাম। এই কথায় তাঁহারা নুতন সাহস সঞ্চয় করিয়া সজোরে তাঁহাদের হাতী সম্মুখে চালাইয়া নিয়া টিবির উপরে উঠিলেন। তাঁহার আফগান সৈন্যগণসহ মুর্তজা খাঁকে সেখানে দেখিয়া তাঁহারা তৎপরতার সহিত তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। সেখান হইতে আমরা দূরে শাসনকর্তাকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার পিতার নিকট হইতে অব্যাহতি পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহুসংখ্যক লোক ছিল; তাহারা সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হাউইবাজি, কামান ও লম্বা বন্দুক দ্বারা অনেক নিধনকার্য সাধন করিতেছিলেন। আমরা তরবারি লইয়া আফগানদের

সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিতেছিলাম। ইহাতে আমাদের সকলেরই সাহস বৃদ্ধি পাইল। এইরূপে জখম ও হত্যা করার কাজ এত তৎপরতার সহিত চলিল যে, মুহূর্তের মধ্যে আমি ৪০।৫০ জন সর্বাপেক্ষা সাহসী আফগানকে আহত ও নিহত করিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে শাসনকর্তার পতাকার উপর বিজয়ের উড্ডীয়মান মৃদুমন্দ বায়ু ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বাস্তবিক পক্ষে ঐ মৃদুমন্দ বায়ু খোদ বাতাস বলিয়াই প্রমাণিত হইল; এই সন্ধিক্ষণে একটি গোলা মুস্তফা খাঁর চক্ষু দিয়া প্রবেশ করিয়া কান দিয়া বাহির হইয়া গেল। ঐ সেনাপতি এমনভাবে উপুড় হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহাকে মৃত বলিয়া ধরিয়া লইল। তাহারা ভগ্নসাহস ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল এবং পরিশেষে চতুর্দিকে পলাইয়া গেল। মুর্তজা খাঁ তাঁহার পিতার হাতীকে আফগান শিবিরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া এরূপ পশ্চাদ্বর্তনের কারণ অনুমান করিয়া হতোসাহস হইয়া ময়দান ত্যাগ করিলেন। অবধান করিতে হইবে যে, মুস্তফা খাঁ সর্বদাই বিশ্বাসীদের রাজা (তাঁহার উপর চিরতরে শান্তির দয়া হউক) ও যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদের প্রতি অসূয়া-জনক বাম চক্ষে তাকাইতেন; কাজেই এখন তিনি তাঁহার ডাইন চক্ষে তাঁহার শাস্তি পাইলেন। ইহা যোগ্য শাস্তিই বটে। এই জয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ আবদুল আলী খাঁ ও অপর কয়েকজন সেনাপতিসহ শাসনকর্তা প্রথমে মাটিতে নামিয়া সিজ্দা করিলেন; তৎপরে ধীরে-ধীরে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ দিলেন। একই সময় এই বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ বাদ্য বাজাইবারও আদেশ হইল। ইতাবসরে শত্রুরা একত্র হইয়া দৃঢ় পদক্ষেপের সহিত পশ্চাদ্বর্তন করিতেছিল। সাধারণের নিকট স্বল্পতম আতঙ্ক বা বিশৃঙ্খলাও প্রকাশ পাইতেছিল না। কিন্তু তাহাদের স্ত্রী-পরিবার ও এতদ্ভিন্ন অনেক বোঝাপত্র সঙ্গে থাকায় যখনই গো-যান বা ভারবাহী পশুগুলিকে কোন প্রতিবন্ধকের দরুন থামান হইত; তৎক্ষণাৎ তাহাদের ২।৩ হাজার লোক অনেকটা ধৈর্যের সহিত থামিয়া যাইত প্রত্যেকটি বস্তু আবার ঠিক না করা পর্যন্ত তাহারা এক পাও আগাইতে। চাহিত না; সবকিছু ঠিক হইয়া গেলে কেবল তখনই তাহারা আবার যাত্রারম্ভ করিত; তাহাদের নির্ভীক মুখভাব পরাজিত শত্রুর মুখভাবের ন্যায় দেখাইত না। তাহাদের মুখভাব শাসনকর্তার মনে দাগ কাটায়

তিনি অত্যধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ না করিয়া তাঁহার লোকজনকে শুধু শত্রুর অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিলেন; কাজেই তাহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল; পাঁচ ঘণ্টায় তাহারা এক ক্রোশ হারে যাইত; শত্রুরা আসিলে প্রতিবারে তাহারাও থামিত ও বাদ্য বাজাইতে থাকিত। দূর হইতে শত্রুর ধূলি যখন আর দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন পর্যন্ত তাহারা এইরূপ করিয়া চলিল। সন্ধ্যাকালে সংবাদ আসিল যে, মুস্তফা খাঁর সৈন্যেরা মাটিপুর নামক পুষ্করিণীর পাড়ে শিবির স্থাপন করিয়াছে; এই স্থানের নিকটে সেনাপতির জীবনের কিছু চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায় তাঁহাকে হাতী হইতে নামাইয়া পাল্কীতে রাখিলেন। তম্মধ্যে তিনি এতদূর সংজ্ঞা লাভ করিলেন যে, ব্যাপার কিরূপ চলিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহা বলা হইলে তিনি ঐসকল পুনঃপৌনিক ভাগ্য বিপর্যয়ে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শত্রুরা শিবির স্থাপন করিয়াছে দেখিবমাত্র শাসনকর্তা স্বীয় তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার কর্মচারীদের অভিবাদন ও নজর গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের পদমর্যাদা ও কৃতিত্ব অনুযায়ী তাহাদের প্রশংসা করিলেন। ফলে প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট হইলেন। সম্ভবতঃ আমি সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে আন্তরিকতার সহিত আলিঙ্গন করিয়া আমাকে আদর অভ্যর্থনায় বোঝাই করিয়া ফেলিলেন। সৈন্যেরা সশস্ত্র থাকিয়া রাত কাটাইল। প্রাতঃকালে সংবাদ পাওয়া গেল, মুস্তফা খাঁ যাত্রা করিয়া গিয়াছেন; ইহা শুনিয়া শাসনকর্তা তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া শত্রুরা যে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল, ঠিক সেখানেই শিবির স্থাপন করিলেন। পরদিন আফগানেরা নোবেৎপুরে শিবির স্থাপন করিল; আমরা এখনও তাহাদের অনুসরণ করিতেছিলাম; তাহারা মুহব্বত আলী পুরে না আসা পর্যন্ত আমরা মঞ্জিলে মঞ্জিলে তাহাদের সঙ্গে রহিলাম।

এখানে আলীবর্দী খাঁর নিকট হইতে তাঁহার আজিমাবাদে পৌঁছার ঘোষণা সংবলিত পত্র আসিল। কিন্তু মুস্তফা খাঁ রঘুজী ভোঁসলাকে হঠাৎ বাঙ্গলা আক্রমণে উৎসাহিত করায় তিনি সেখানে অল্পকাল মাত্র থাকিতে পারিলেন। মুস্তফা খাঁ লেখেন, তিনি অনুভব করেন, সেই দেশে তাঁহারা চাচা-ভাতিজা উভয়ের পক্ষে বেজায় কঠিন বলিয়া প্রমাণিত

হইবেন। কাজেই আলীবর্দী খাঁর পত্রে লেখা ছিল, তুমি যখন মুস্তফা খাঁকে লইয়া পড়িয়াছ তখন তাহাকে খতম কর, পক্ষান্তরে ঐ দুই শত্রুর সম্মুখীন যাহাতে অসম্ভব হয়, এমনভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি মুর্শিদাবাদে চলিয়া যাই। এই পত্র পাইয়া শাসনকর্তা আবদুল আলী খাঁর উপর তাঁহার সৈন্যদলের প্রভুত্বের ভার দিয়া মেহদী নেসার খাঁকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর ঐ সেনাপতির পাল্কী ও কিছু অতিরিক্ত বেহারা লইয়া সারারাত পথ চলিয়া সূর্যোদয়ের সময় তিনি তাঁহার খুল্লতাতের শিবিরের নিকটে পৌঁছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁহাকে সালাম করিয়া কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার নিকট হইতে সিরাজুদ্দৌলাহকে ধার লইয়া স্বীয় সৈন্যদলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তিনি যাইতে না যাইতেই পরদিন আলীবর্দী খাঁ তাঁহার মত পরিবর্তন করিলেন এবং প্রথমে হাতের সর্বাপেক্ষা কাছের শত্রুর হাত হইতে মুক্তি লাভ করাই উত্তম মনে করিয়া পশ্চিম দিকে ফিরিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত যোগদান করিলেন। উভয়েই জেমেনিয়াহ্‌ পর্যন্ত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিলেন; ইহা গাজীপুরের বিপরীত দিকে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটা শহর; গাজীপুর আবুল মনসুর খাঁর শাসনাধীন ও জেমেনিয়ার ন্যায় আফগান অধ্যুষিত। শহরটীতে আগুন লাগাইয়া দিয়া লুণ্ঠন করা হইল। মুস্তফা খাঁ তদঞ্চলের বিখ্যাত দুর্গ চুনারে গমন করিয়াছেন শুনিয়া সংবাদ আসায় চাচা-ভাতিজা তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন শেষ করিয়া আজিমাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেখান হইতে সময় মত মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সুবাদার বাঙলায় চলিয়া গেলেন।

এই প্রত্যাবর্তনে মুস্তফা খাঁ তাঁহার কামান ও অস্ত্রশস্ত্র মেরামত, আহতদের আরোগ্য এবং সর্বত্র হইতে নূতন সৈন্য ও সাহায্যকারী সৈন্য সমাবেশের অবসর পাইলেন। শাসনকর্তাও আজিমাবাদে নিজের পক্ষে তাহাই করিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যদল সংগ্রহ, তাঁহার সৈন্যদের চিত্তজয়, কৃষকদের হৃদয় শান্ত, ইজারাদারদের স্নেহ ও ভাবী অভিযানের জন্য প্রত্যেকটি সামরিক আয়োজন করিয়া কালাতিপাত করিলেন।

কয়েকটি জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্য জাফর খাঁর বাগানে দিন কয়েক মাত্র অপেক্ষা করিয়া আলীবর্দী খাঁ সেখান হইতে বাঙলা যাত্রা করিলেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি মুনাম খাঁ নামক জনৈক বাক্‌পটু সুযোগ্য ভদ্রলোককে তাঁহার দূতরূপে রঘুজী ভোঁসলার নিকট প্রেরণ করেন। এখন রহীম খাঁ নামক একজন গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতিকে তাঁহার সমগ্র সৈন্যদলসহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট রাখিয়া তিনি তাঁহার পথ ধরিলেন। রঘুজী ভোঁসলা ইতোপূর্বেই যাত্রা করিয়া বর্ধমানের প্রান্তরে প্রবেশ করেন। তখন মুনাম খাঁ তাঁহার নাগাল পাইয়া একটি চুক্তি দ্বারা ব্যাপার আপোষ-মীমাংসা করার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মারাঠা সামন্ত প্রস্তাবটি নেহাৎ দায়ে পড়িয়া করা হইয়াছে মনে করায় তাঁহার সহিষ্ণুতার জন্য তিন কোটি টাকার কম চাহিলেন না। আলীবর্দী খাঁ শুধু সময় লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি নানা প্রকার বিলম্ব ও চাতুরী দ্বারা বিনাইয়া বিনাইয়া আলোচনা একত্রে আড়াইমাস পর্যন্ত বাড়াইয়া লইলেন; এই সময়ের মধ্যে রঘুজী নড়িলেন না। ব্যাপার মন্থরগতিতে চলিল, অবশেষে মুস্তফা খাঁর পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ আসিল। এই ঘটনায় আলীবর্দী খাঁ রঘুজীর অযৌক্তিক দাবী প্রত্যাখ্যান করার মত শক্তি লাভ করায় আলোচনা ভাঙিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সৈন্য চালনার ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আমরা এই অভিযান ও আলোচনার বিশদ বিবরণ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিয়া পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে মুস্তফা খাঁর সম্পূর্ণ পরাজয় ও মৃত্যুর কথা বর্ণনা করিব।

ইতিমধ্যে গ্রীষ্মকাল শেষ হইয়া বর্ষাকাল আসিবার উপক্রম হইল। এমন সময় শাসনকর্তা মুস্তফা খাঁর আয়োজনের কথা শুনিয়া ঐ অসহনীয় শত্রুকে খতম করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নগর ত্যাগ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। এই সেনাপতি চুনারগড়ে তাঁহার প্রবাসকালে তাঁহার হাতের টাকার এত সদ্ব্যবহার করেন যে, তিনি তাঁহার পার্শ্বে বহুসংখ্যক রোহিলা সমবেত করেন। অবিলম্বে বর্ষা আসিবে এবং রঘুজী এত শীঘ্র ঐ অঞ্চলে আসিবেন না জানিয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া আজিমাবাদ প্রদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সরকার শাহাবাদের জমিদার বৃন্দ, বিশেষতঃ বাবু অনন্ত সিংহ ও জগদীশপুরের জমিদার সরকারের প্রতি

অসন্তুষ্ট ছিলেন জানিয়া তিনি সরকার শাহাবাদে তাঁহার বাসা লইতে চাহেন। তবে তাঁহার যুদ্ধ করারও ইচ্ছা ছিল। তিনি প্রচুর সুবিধা লাভ করিলে জয়ের পরে সব কিছুই হাতে আসিবে; পক্ষান্তরে যদি দৈবাৎ তিনি নিহত হন, তবে ইতিমধ্যে তাঁহার টাকা ফুরাইয়া যাইবে বলিয়া তাঁহার সমস্ত যাতনার শেষ হইবে, এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ায় তাঁহার যুদ্ধ করারও ইচ্ছা ছিল। তবে তিনি জানিতেন যে, যদি শাসনকর্তা মারাঠাদের ভয়ে তাঁহার রাজধানী ত্যাগে বিলম্ব করেন, পরবর্তী বর্ষায় সোহোন নদী ফুলিয়া উঠিবে, এবং আফগানদের দিকে তাঁহার অগ্রগমনে কার্যকর প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। এই ঘটনার দরুণ তিনি স্বয়ং (মুস্তফা খাঁ) শাহাবাদের জমিদারদের সহিত বুঝাপড়া করিবার পুরাপুরি সময় পাইবেন এবং তাঁহার সৈন্যদলকে সেখানে স্থাপন করিতে ও ঐ জিলার সমস্ত রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হইবেন। কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এরূপ উৎকৃষ্ট বাসস্থানে অবস্থান করায় ও অর্থসরবরাহ পাওয়ায় তিনি রঘুজীর জন্য অপেক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। অথবা ঐ সেনাপতি যদি ইতোপূর্বেই মুর্শিদাবাদের নিকটে হাজির হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার ফলে তিনি সেখানে গমন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার যথেষ্ট সময় পাইবেন। তিনি হিসাব করিলেন যে, অতঃপর আলীবর্দী খাঁকে খুব শায়েস্তা করা যাইবে। তিনি ইহাও জানিতেন যে, তাঁহার নিজ সৈন্যদলের জন্য মারাঠা শিবিরে উৎকৃষ্ট নূতন সৈন্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে; যাহাই ঘটুক না কেন, তিনি তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন।

শাসনকর্তা এই সমুদয় পরিকল্পনা সবই উল্টাইয়া দিলেন; তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলে তিনি ইহাদের প্রত্যেকটাই অনুমান করিয়া তাঁহার শত্রুর পূর্বেই কার্য করিতে মনস্থ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ১৪০০০ অশ্বারোহীর একটা বাহিনী লইয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার দুইজন নূতন বিখ্যাত কর্মচারী ছিলেন; একজন হইলেন সরবুলন্দ খাঁর (পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা যাঁহাকে তাঁহার চাচার সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন, সেই লোক) আত্মীয় শাহ্দীন মুহম্মদ, আর একজন রহীম খাঁ রোহিলা; সাহসী ও সেনাপতিত্বের গুণবিশিষ্ট লোক

বলিয়া আলীবর্দী খাঁ ইহাকে ইহার আস্ত সৈন্যদলসহ রাখিয়া যান। কয়েকদিন কুচ করার পর শাসনকর্তা সোহন নদী হাঁটিয়া পার হইলেন; দ্বিতীয় দিনে তিনি জগদীশপুরের নিকটস্থ প্রান্তরে পৌঁছিয়া একটা খোলা ময়দানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন; ইহার সম্মুখে ছিল একটি ক্ষুদ্র নদী। শত্রুরা তখন খুব নিকটে ছিল বলিয়া আজিমাবাদ বাহিনী সারাদিন সশস্ত্র রহিল, কিন্তু রাত্রে একাংশ মাত্র জাগিয়া কাটাইল। শাসনকর্তা নিজে রাত্রির অধিকাংশ বিবাদের সর্বোচ্চ বিচারকের নিকট প্রার্থনায় অতিবাহিত করিলেন: প্রাতঃকালে ফজরের নামাজ পড়িয়া তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে যুদ্ধের ব্যূহে বিন্যস্ত করিলেন। হালে যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ পরিখার ভিতরে থাকিয়া প্রাচীরের পশ্চাদ্দিক হইতে শত্রুর সহিত যুদ্ধ এত চমৎকাররূপে সফল হয়, তাঁহার পিতা হাজী আহমদ তাহা অবলম্বনের জন্য গো ধরেন; কিন্তু মেহদী নেসার খাঁ এবং পরীক্ষিত সাহস ও সৈন্য চালনায় গুণসম্পন্ন কয়েক জন সেনাপতি তেজস্বিতার সহিত এই উপদেশের বিরোধিতা করিলেন: তাঁহারা এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেন: প্রথমবার আমরা পরাজিত হই ও শত্রু আমাদের উপর জয়লাভ করে; কিন্তু এখন পাল্লা উল্টিয়া গিয়াছে—সে পরাজিত এবং আমরা তাহার বিজেতা; আমরা পুনরায় পরিখার ভিতরে থাকিবার উপদেশের অনুসরণ করিলে সে যে সুবিধা পাইতে চাহে, আমরা তাহাকে ঠিক তাহাই দিব; বর্ষাকাল আসন্ন; এইরূপ দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধের দরুন আমরা অচিরে নগরে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হইব। পক্ষান্তরে আমরা সোহন নদীর অপর পার্শ্বে থাকিব; এই শক্তিশালী নদী দ্বারা রক্ষিত হইয়া সে প্রদেশের পূর্ণ অর্ধাংশের রাজস্ব ভোগ করিবে (অপরাংশ এত ঐশ্বর্যশালী কিনা, আমাদের খুবই সন্দেহ)। কিন্তু ইহাই সব নহে। বর্ষান্তে আপনি দেখিবেন, আপনার শত্রু মারাঠাদের সহিত সম্মেলনের ফলে পূর্বাপেক্ষাও শক্তিশালী হইয়াছে।[৩১] শাসনকর্তা এই উপদেশ পছন্দ করিতেন বলিয়া অগ্রভাগ বা সারির সেনাপতি আবদুল আলী খাঁকে কেহ যেন আপনাকে গড়বন্দি করার জন্য কোন স্থানের খোঁজ করিতে যাইতেছে, এভাবে ধীরে ধীরে যাত্রা করার আদেশ দান করিলেন; কিন্তু যে মুহূর্তে দেখা যাইবে যে, শত্রুরা প্রতারিত হইয়া নিজেদের

কতকটা নিরাপদ মনে করিতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করার জন্য তৎপ্রতি নির্দেশ রহিল। যেরূপ যোগ্যতার সহিত এই আদেশ পরিকল্পিত হয়, তদপেক্ষা কম যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইল না। আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই মুস্তফা খাঁ তাঁহার সৈন্যদলকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম; একদল তিনি স্বয়ং যুদ্ধে পরিচালিত করিলেন, অন্যদল বুলেন্ট খাঁকে প্রদান করিলেন। এই শেষোক্ত কর্মচারীটি যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন আমাদের পশ্চাদ্দিক হইতে একটা কামানের গোলা আসিয়া তাঁহার হাতীকে আঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার সৈন্যদলে একটা চাঞ্চল্য অনুভূত হইল; মুস্তফা খাঁ ইহা টের পাইয়া স্বয়ং তাঁহার সৈন্যদল লইয়া বজ্র ও শিলাসমন্বিত ঝটিকার ন্যায় তরবারি হস্তে দায়ুদ খাঁর উপর আপতিত হইলেন; তিনি তাঁহার অধীনে স্থাপিত কামানরাজি হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। মুহূর্তে আফগানেরা তাঁহার সৈন্যদের পলায়নপর করিল, কেবল ১৭ জন লোক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। ঐ কর্মচারীটি পলায়ন করিতে ঘৃণা বোধ করিয়া ইহাদের লইয়া যথাস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন; তিনি সাহসীদের ক্ষেত্রে পতিত হইয়া পশ্চাতে সম্মানিত নাম রাখিয়া গেলেন। দায়ুদ খাঁর ভাগ্যদর্শনে যে সকল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করিতেছিল, তাহারা গতিবদ্ধ করিল। একটা লোক পর্যন্ত পালাইয়া গেল। মুস্তফা খাঁ এই পলায়মান দলকে তাঁহার পদতলে বিমর্দিত করিয়া তাঁহার বামপার্শ্বস্থ খাদেম হুসেন খাঁর দিকে ফিরিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিল; তাহাতে খাদেম হুসেন খাঁ তাঁহার পার্শ্বে যুদ্ধরত সর্বাপেক্ষা সাহসী ৫০।৬০ জন বীর পুরুষের সহিত নিহত হইলেন। এত অধিক হত্যায় সৈন্যদল ভীত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আবদুল আলী খাঁ যে ক্ষুদ্র একদল লোক তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাহাদিগকে লইয়া প্রতিরোধ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু কামান মৃত্তিকা জুড়িয়া থাকায় ও একত্রবদ্ধ বলদরাজি তাঁহার সামনে বিঘ্ন উপস্থিত করায় তিনি যে রজ্জুগুলি উহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা কাটিয়া ফেলিতে

আফগানেরা তৃতীয় বার জয়ী হইয়াও পুনরায় পরাজিত ও মুস্তফা খাঁ নিহত

আদেশ করিলেন। অতঃপর তিনি আগাইয়া গেলেন। তাঁহার সহচরদের দ্বারা পরিত্যক্ত আমার ভ্রাতা নকী আলী খাঁ সহ আরও ৫।৬ জন ভদ্রলোক লইয়া মেহদী নেসার খাঁ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। শাহজাহান ইয়ার ও রাজা সুন্দর সিংহ এক ডজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পশ্চাতে ছিলেন; তাঁহারাও আমাদের সহিত যোগদান করিলেন। আবার ডাইন দিক হইতে বর্শাধারী ১৫।১৬ জন সৈন্যসহ রহীম খাঁ রোহিলার আগমনে এই দলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিল। এত সৌভাগ্য লাভে নিজেকে নববলে বলীয়ান হইতে দেখিয়া আবদুল আলী খাঁ তখন মুস্তফা খাঁর এবং মুস্তফা খাঁও তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। আমরা যখন অগ্রসর হইতেছিলাম সেই সন্ধিক্ষণে, জানিনা কোথা হইতে একটা বন্দুকের গুলি মুস্তফা খাঁর বুকে লাগিয়া অপর পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইতোমধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র বাহিনীও এত বীরত্বের সহিত বল প্রয়োগ করিল যে, ময়দান নিহত ও আহতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অবশিষ্ট সৈন্যেরা তাহাদের সেনাপতিকে নিহত ও তাঁহার হাতীর চতুর্দিকে এরূপ হত্যাকাণ্ড ঘটিতে দেখিয়া আর যুদ্ধ করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া যাহার মন যেদিকে চাহিল পলাইয়া গেল। এমন কি তাঁহার পুত্র, সেই সাহসী, নির্ভিক সৈনিকও পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে পিঠ ফিরাইয়া পলায়ন করিল। এই সময় শাসনকর্তা আসিয়া তাঁহার ভদ্রলোক দ্বারবান হাশেম আলী খাঁকে হাতীতে উঠিয়া মুস্তফা খাঁর মস্তক নামাইয়া আনিতে আদেশ করিলেন। ইহা করা হইলে মাথাটি তৎক্ষণাৎ বর্শায় গাঁথিয়া সৈন্যদলের ভিতর দিয়া প্রেরিত হইল; অতঃপর ইহা বাদশাহের (মুহম্মদ শাহ) নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু তাহার দেহ আজিমাবাদে প্রেরিত এবং বাজার ও প্রধান রাস্তাগুলির ভিতর দিয়া বহিয়া নিয়া কবরস্থ করার আদেশ হইল। এই আদেশ প্রতিপালিত হইতে যাইতেছিল; কিন্তু মীর মুহাম্মদ মার্সেলী কবর দেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তিনি ছিলেন একজন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সয়্যিদ এবং ধর্মনিষ্ঠা ও সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত ব্যক্তি; ইরানের[৩০] মুস্তারে তাঁহার জন্ম। তিনি একবার উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ভার গ্রহণ করেন। এই ভদ্রলোক দৃঢ়তার সহিত বলেন,

তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, দরবেশদের রাজা আলী মুর্তুজা[৩৩] ঐ শত্রুভাবাপন্ন আফগানদের তরবারি দ্বারা আঘাত করার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন না করায় সেই মহাত্মা স্বয়ং তরবারি গ্রহণ করিয়া আড়াইবার তাঁহার নিজের কটিদেশে আঘাত করেন। আফগানটির দেহ মস্তকচ্যুত করা হইতেছে এবং হাতীর পায়ে বাঁধিয়া নগরের ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া কবরস্থ করা হইয়াছে শুনিয়া এই ধর্মাত্মা বলিলেন, তজ্জন্য তিনি দুঃখিত; কারণ, তাঁহার স্বপ্ন অনুযায়ী তাঁহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া কেবল তৎপরেই সমাহিত করার কথা। এই সকল কথা শাসনকর্তার নিকট বর্ণনা করা হইলে তিনি তাহার দেহ দুই খণ্ড করিয়া এক খণ্ড পশ্চিম ও আর এক খণ্ড পূর্ব দ্বারে টাঙ্গাইয়া রাখার আদেশ দিলেন। এই আদেশ প্রতিপালিত হইলে কিছু কাল পরে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পুঁতিগন্ধময় হওয়ায় তাহা নামাইয়া প্রতেকটি অংশ যেখানে ঝুলিতেছিল, সেখানে প্রোথিত করা হইল। সৈন্যেরা যখন যুদ্ধ করিতেছিল, মুর্তুজা তখন তাঁহার অনুগামী বহু সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন; সম্ভবতঃ কবির উক্তি তাঁহার স্মরণ ছিল।

"মৃত বন্ধুর শবের উপর ক্রন্দনের চেয়ে জীবিতের সহিত আমোদপ্রমোদে বাস করা শ্রেয়স্কর।"

তিনি স্বয়ং এইরূপ চিন্তা করেন এবং হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য হইতে নিজের পথের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু মুস্তফা খাঁর স্ত্রীর ভ্রাতা য়্যাশা খাঁ বন্দী হন। কয়েক দিন কারাবাসের পর তাঁহাকে পরিধানের একটা পরিচ্ছদ ও তাঁহার গৃহে গমনের ব্যয় নির্বাহার্থ কিছু টাকা দিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। শমসের খাঁর ভাগিনেয় ও মুরাদ খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দিলশির খাঁ তিনটি আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হন। একটা ছিল বন্দুকের গুলির; উহা নাভি দিয়া তাঁহার দেহ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। তাঁহাকে মৃত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সেই পথ দিয়া যাওয়ার সময় শাসনকর্তার স্মরণ হয় যে, বাল্যে তিনি ছিলেন তাঁহার খেলার সাথী: তাঁহার মধ্যে প্রাণের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার পাল্কীতে করিয়া তাঁহার তাঁবুতে

লইয়া যাওয়ার আদেশ দেন। সেখানে সুযোগ্য অস্ত্রচিকিৎসকেরা তাঁহার খেদমত করিতে আদিষ্ট হন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। জখমগুলি দুরারোগ্য প্রমাণিত হওয়ায় তৃতীয় দিনে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। সর্দার খাঁর জামাতা আলেফ খাঁ অন্যান্যের সহিত মুর্তুজা খাঁর সঙ্গে পলাইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। শাসনকর্তা এরূপ স্মরণীয় বিজয়ের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট সবিনয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া মুস্তফা খাঁর তাঁবুতে অবতরণ করিলেন। সেখানে তিনি তাঁহার সেনাপতি ও কর্মচারীদের সম্মান ও নজর গ্রহণ করিলেন। রাতে তিনি আমার চাচা আবদুল আলী খাঁর তাঁবুতে গমন করিয়া সবিস্তারে তাঁহার বীরোচিত সাহস ও বিজয় লাভে তাঁহার বিশিষ্ট অংশের বহু প্রশংসা করিয়া আনন্দবোধ করেন। যুদ্ধের পরে আবদুল আলী খাঁ মুস্তফা খাঁর হস্তী, পতাকা ও দামামা হস্তগত করায় শাসনকর্তা বাদ্য বাজাইবার আদেশ দিয়া তাঁহাকে এই সমুদয় রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার পিতামহ সুবাদারের নিকট লিখিত অভিনন্দন পত্রে যাহাতে উপরোক্ত পরিচয় চিহ্নগুলি তাঁহার বন্ধুর জন্য মঞ্জুর করা হয়, এই উদ্দেশ্যে দরবারে তাঁহার স্বার্থের জন্য প্রার্থনা করেন। সুবাদার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সতর্কতা ও বীরত্বে লব্ধ স্মরণীয় বিজয়ের কথা শ্রবণ করিয়া এবং ইহাতে তাঁহার আত্মীয় আবদুল আলী খাঁর বিশিষ্ট অংশের কথা অবগত হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে একটা হাতী, একটা মূল্যবান খেলাত, একখানা ছোরা ও মনিমুক্তাখচিত সোনার মুষ্টিযুক্ত একখানা তরবারি প্রেরণ করিলেন। বীরপুরুষদ্বয় ঐ সকল প্রশংসার নিদর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া এরূপ উপলক্ষে প্রচলিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া উপহারগুলি গ্রহণের জন্য নগরের বাহিরে জাফর খাঁর বাগানে গমন করিলেন। তাঁহাদের খেলাত পরিধান করিয়া তাঁহারা বাঙ্গলার দিকে ভক্তিপূর্ণ কুর্নিশ করিলেন। অতঃপর মহাধুমধাম ও সমারোহের সহিত আজিমাবাদ-নগরে প্রবেশ করার জন্য একত্রে হস্তীতে আরোহণ করিলেন। দুইমাস পরে বাদশাহের নিকট হইতে সাহসী আবদুল আলী খাঁর জন্য একটা দামামা ও একটা পতাকা আসিল।

ইংরেজি সংস্করণের টীকা

(১) যুদ্ধে হার্কিউলেস।

(২) সাহসী প্রভু, সম্রাটের সৈন্য ও সাম্রাজ্যের প্রদীপ। ঢাকার নৌ-সেনাপতির কাজ ছিল বড় নৌকা ও পালের জাহাজের একটা বৃহৎ নৌ-বহর নির্মাণ ও সজ্জিত করিয়া তাহা দিল্লীতে প্রেরণ করা। পালের জাহাজের কয়েকখানি ইউরোপের বৃহত্তম পালের জাহাজের ন্যায় বৃহদাকৃতি হইত। ঢাকার আশেপাশের ৮০টি গ্রাম তাঁহার খরচের জন্য বরাদ্দ করা হয়; এগুলির আয় ধরা হয় ৪০০০০ টাকা; কিন্তু কালক্রমে তাহা হইতে তিন লক্ষের অধিক টাকা আমদানী হইত।

(৩) বাদশাহ কুলী খাঁ ও শাহ্ কুলী খাঁর একই অর্থ; কিন্তু একরামুদ্দৌলার অর্থ সাম্রাজ্যের সম্মান।

(৪) সক্রি-গলী বা সক্রীর গলি একদিকে গঙ্গা নদী ও অন্যদিকে একটা জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী একটা সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ। তলিয়া-গড়িও অনুরূপ পথ; তদুপরি তাহাতে পথ বন্ধ করার জন্য এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীর রহিয়াছে। সক্রিগলির প্রশস্ততা ১০ ফুট হইতে পারে; উপর হইতে বন ঝুলিয়া রহিয়াছে বলিয়া ইহা প্রতিরোধের খুব ক্ষমতা রাখে এবং বিহার হইতে বাঙ্গলায় প্রবেশের পথ বন্ধ করে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহার পার্শে যে গিরিশ্রেণী রহিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিলে আরও বহু পথ পাওয়া যায় এবং প্রকৃত পক্ষে আরও বহু পথ রহিয়াছে। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে রঘুজি ঐ গিরিপথ দুইটি তাঁহার বাম পার্শে রাখিয়া যান; এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি সহজে বাঙ্গলায় প্রবেশ করেন।

(৫) পারস্য বা ইরানের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ হায়দর নিজেকে নিছক দরবেশ বা ফকীর অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠ লোক বলিয়া ভাণ করিতেন ও শুধু সোফ বা কম্বল পরিতেন; তজ্জন্য তুর্কেরা তাঁহাদিগকে সোফী বলিয়া থাকে। কিন্তু এই বংশ সোফী নাম গ্রহণ করে তদীয় বংশধর শাহ সেফী হইতে। তিনিই শাহ অর্থাৎ রাজা বা সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া দিগ্বিজয় করেন।

(৬) বার দিল্লীর উত্তর পূর্ব দিকে সম্পূর্ণরূপে সয়্যীদদের দ্বারা অধ্যুষিত (বিহারের শেখপুরায় যেমন কেবল শেখদেরই বাস) একটা শহর ও জিলা। এই সয়্যীদেরা কতকগুলি গণ্ডমূর্খ বলিয়া সর্বজন বিদিত, কিন্তু অনুরূপভাবে অত্যন্ত সাহসী বলিয়াও পরিচিত। হিন্দুস্তানে জাতিগতভাবে সাহসী বলিয়া বিখ্যাত এরূপ কয়েকটি শহর ও জিলা আছে। লক্ষৌর শাহজাদ্দিয়ানেরা ও বেলগ্রামের নাগরিকেরা এইরূপ।

(৭) তাঁহার বেগম তদীয় হস্তিপৃষ্ঠে রণক্ষেত্র হইতে দুই মাইল দূরে পলায়ন করেন; ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, আলীবর্দী খাঁর নিজের হস্তীটিও এই জন্তুটির অনুসরণ করে।

(৮) ইহা সকলেরই ভালরূপে জানা আছে যে, হিন্দুরা কেবল ইউরোপীয়দের প্রস্তুত খাদ্য নহে তাহাদের পোশাক, পানি, বাসনপত্র, এমনকি স্পর্শ হইতেও বিরত থাকে। তাহাদের নিজেদের ভিতরে কয়েকটা গোত্রের মধ্যেও এই স্পর্শ-রোগ বিদ্যমান। কিন্তু যে মুহূর্তে তাহারা জগন্নাথে হাজির হয়, এমনকি উচ্চ স্থান হইতে নির্গত স্ফটিক পাথরের ষাঁড় দেখিতে পায়, তৎক্ষণাৎ সে সব ফুরাইয়া যায়। সেখানে হিন্দুরা মুসলমানের সহিত একত্রে আহার করে এবং (কি বিরাট আশ্চর্য!) তৈয়ারী খাদ্য লইয়া রাস্তার ঘুরিয়া বেড়ায়।

(৯) মীরজাফর খাঁর প্রথম রাজত্বে এই আমীরের কথা আবার স্মরণ করা যাইবে। আলীবর্দী খাঁর নিকটাত্মীয়রূপে নিহত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁহার জেনানায় পুরাপুরি এক কোটি

টাকা লুকাইয়া রাখেন। মীর জাফরের পুত্র মীরণ এই গুপ্ত ধন-রাশির কথা শ্রবণ করা মাত্র স্বয়ং জেনানায় গমন করিয়া ঐ টাকা লইয়া যান, তদুপরি নিহত আমীরের দুইটি কুমারী কন্যার সতীত্ব নাশ করেন।

(১০) ইহা পবিত্র কুরআনের আয়াতের ভাবানুবাদ। অঙ্গুলী চুম্বন ভারতের আদিবাসীদের রীতি নয়। আরব মুসলমানগণ কর্তৃক এই রীতি ভারতে আমদানী করা হয়।

(১১) রঘুজী ভোঁসলা বেরারের রাজা; ইহা বাঙ্গলার দক্ষিণ পশ্চিমে একটা বৃহৎ দেশ, কিন্তু মারাঠা সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজ্য। দাক্ষিণাত্যে পণ্ডিত কেরানী-লেখক বা বিদ্বান ব্যক্তি। এ রাজারা তাঁহাদের নামের সঙ্গে এই উপাধি যোগ করিয়া থাকেন। মারাটি ভাষায় পরধান সম্ভবতঃ সেনাপতি বুঝায়।

(১২) এই দাস শব্দটি আমেরিকান বা এমন কি ইউরোপীয় অর্থে ব্যাখ্যা না করার জন্য সতর্ক হইতে হইবে। তুর্কদের মধ্যে দাস পুরুষ হইলে সাধারণতঃ জামাতা ও রমণী হইলে পরিবারের কণে হইত। ভারতে কি জর্জিয়ান কি আফ্রিকান দাস হইত পরিবারের আশা-ভরসা স্থল। তজ্জন্য দাস শব্দ শুধু অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত লোক বুঝায়। আরবীতে আব্‌দ ও গোলাম শব্দের ইহাই সচরাচর গৃহীত ব্যাখ্যা; তুর্ক, ফারসী ও ভারতীয় ভাষায়ও তাই।

(১৩) এই সঙ্কেত ছিল, দাঁড়াইয়া মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া নাভির উপরে দুই হাত একত্র করিয়া (সুন্নিদের বেলায়, শিয়াদের বেলায়, দুই দিকে হাত ঝুলাইয়া) শান্ত, সম্মানজনক ভাবধারণ ও ফাতেহা বা কুরআনের প্রথম অধ্যায় পাঠ; ইহা খ্রীস্টানদের Dominical oration (প্রভু সম্পর্কীয় বক্তৃতা) বা lord's prayer (প্রভুর প্রার্থনার তুল্য।

(১৪) খিচুড়ী: ডাইল মিশ্রিত সিদ্ধ চাউলের খাদ্য।

(১৫) কোন সেখের পারার টুকরার ওজনই আধ আউন্সের (পোয়া তোলারও কম) বেশী নহে।

(১৬) এই শিকল ২০ ফুট লম্বা ও ৩০০ পাউণ্ড ওজনের হইতে পারে।

(১৭) ইহার নাম জগত শেঠ আলম চাঁদ, জগতের সর্বাপেক্ষা ধনবান ব্যক্তি (১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দেও)

(১৮) বাবর জঙ্গ।

(১৯) সুপরিচালিত কামান-গোলা সম্পর্কে আমাদের গ্রন্থকারের এসকল কথায় পাঠক যেন বিভ্রান্ত না হন। এসকল কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইলেও ইহা সঠিক যে, ৩০০ বৎসর পূর্বের ইউরোপের কামান-গোলার ন্যায় ঐ সমুদয়ও ছিল অনুরূপ ভারী, মন্দরূপে আরূঢ় ও মন্দরূপে ব্যবস্থিত। কেবল ১৭৬০ খ্রীঃ হইতেই কয়েক জন ভারতীয় অনেকটা ইউরোপীয় কায়দায় তাঁহাদের কামান সামনে স্থাপন ও পরিচালনায় সমকক্ষতা লাভ করেন। ইহা নিশ্চিত যে, গুলিগোলা, গ্রীক অগ্নি বা বারুদ ও বম্বিকিনস, পম্বিকিনস অর্থাৎ পম্বক বা তুনা প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্বে জাসিনিয়ানের আমলে একত্রে ভারত হইতে ইউরোপে নীত হয়; সুতরাং ৫০০০ বৎসর পূর্বের এত প্রাচীন কালেও যে ভারতীয়দের বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, তাহা সুস্পষ্ট।

(২০) চুনারকে দেশীয় লোকেরা চুনার গড় বলিয়া অভিহিত করে। ভারতের প্রায় যাবতীয় দুর্গের ন্যায় একটা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত হইলেও গোয়ালিয়র, রোঠাস, চণ্ডিকোটা প্রভৃতি আরও বহু দুর্গের সহিত ইহাকে তুলনা করা চলে না; ইহার অভ্যন্তরে একাদিক্রমে বহু বৎসর যাবত রক্ষী সৈন্যদলের খোরাক যোগাইবার উপযোগী জমি নাই। বেশী সুবিধাও নাই। এতদ্সত্ত্বেও প্রায় সম্পূর্ণরূপে গঙ্গানদী বেষ্টিত একটা পার্বত্য ভূমির উপর ইহা এত সুখকররূপে অবস্থিত যে, কার্যতঃ ঐ নদী ও উহার উভয় তীরের প্রান্তরের উপর ইহা আধিপত্য করে। বেনারস হইতে ইহার দূরত্ব ১৫ ইংরেজী মাইল।

(২১) বাদশাহের আদেশে সাম্রাজ্যের কোন প্রদেশের সাহায্যে প্রেরিত ঐসকল সুবাদার ও ঐ সমুদয় প্রধান সেনাপতি সম্বন্ধে আমরা

কি মনে করিব? সর্বত্র ঐ প্রদেশকে তাঁহাদের শত্রুরাজ্য বলিয়া গণ্য করা হইতেই বা কি সিদ্ধান্ত করিব? তাহা এই যে, সাম্রাজ্য ইহার পূর্ব-প্রাপ্ত সমস্ত সম্মান ও শাসনরক্ষণে সমস্ত উদ্যম হারাইয়া ফেলে। সুতরাং বিপ্লব আসন্ন হয় এবং অচিরে তাহা ঘটেও।

(২২) এই নদীটি যথেষ্ট প্রতিবন্ধক। সর্বাপেক্ষা শুষ্ক ঋতুতে ইহাতে বালুকা দ্বারা বিভক্ত মাত্র ১৫।২০ ফুট গভীর তিনটি স্রোতস্বতী থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে ঐ স্রোতস্বতীগুলি একত্র হইয়া কয়েক মাইল প্রশস্ত ও অতি বাম গভীর একটা নদীতে পরিণত হয়। নদীটি তখন ঘণ্টা প্রতি ৭ হইতে ১২ মাইল বেগে ধাবিত হয়।

(২৩) এই ঘসেটি বিবি ছিলেন আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেশ মুহম্মদ খাঁর পত্নী। ইনি পুরুষত্বহীন বলিয়া পরিচিত ছিলেন ও স্ত্রীসুলভ আনন্দে মত্ত থাকিতেন। কাজেই তাঁহার পত্নী যে কোন সুদর্শন লোক তাঁহাকে কিছু সান্ত্বনা দিত, তাঁহারই আবেদনে অনুকুলভাবে সাড়া দিতে নিয়ত প্রস্তুত থাকিতেন। কিন্তু তিনি আরও বহুদূর অগ্রসর হন। সারা মুর্শিদাবাদে ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, তিনি নিমন্ত্রণ ও কুটনী পাঠাইতেন এবং কোন বলবান সুদর্শন পুরুষ রাস্তায় সর্বদা নিরাপদ ছিল না। আমাদের গ্রন্থকার আলীবর্দী খাঁর পরিবারের প্রতি নিতান্ত সদয়; তাহা ছিল তাঁহার নিজেরই পরিবার; তিনিও ক্রমে ক্রমে তৎসম্পর্কে কিছু বর্ণনা করিবেন।

(২৪) বেরারের রাজধানী নাগপুরের সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ইহাকে ছোট বলা হয়। মারাঠা সামন্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভোঁসলা পরিবারের রাজারা নাগপুরে বাস করেন। শেষোক্তটি বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে একটা ক্ষুদ্র প্রদেশ, প্রথমটি কলিকাতার ৫০০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে।

(২৫) ভারতে ইহাই সামরিক প্রথা; তুরস্ক প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে সৈন্যেরা তাহাদের তরবারি ছুঁইয়া এবং রুটি লবণ স্পর্শ করিয়াও প্রতিজ্ঞা করে।

(২৬) আরবী প্রস্তাবলীতে রুটী-লবণে সাধারণের অধিকারের কর্তব্য সম্বন্ধে বড় বেশী উল্লেখ আছে ; ভারতীয়েরা অসংখ্য শব্দ, ভাব ও সত্য বলিয়া অবলম্বিত মত সহ সেখান হইতেই তাহাদের ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। তুর্ক বা তারতার বরং তাতার জাতিগুলি কাহারও সহিত রুটি-লবণ খাওয়ার উপর অত্যন্ত জোর দিয়া কথা বলেন ; হিন্দুস্তান বিজেতারা তাহাদেরই অধস্তন পুরুষ।

(২৭) এই আকস্মিক পীড়ায় ২/৩ দিনে, এমনকি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লোকের মৃত্যু ঘটে ; ইহা বাঙ্গলায় ব্যাপক ; লোকে ইহাকে হায়েজা বলে ; শব্দটি আরবী।

(২৮) ঘোড়াটি যে সৈন্যদলের, একখানা গণ্‌গণে লোহা দ্বারা সেই দলের নামের আদ্যাক্ষর উহার উরুতে ছপ মারিয়া তেসেহ্‌রা করা হইত।

(২৯) সমস্ত আফগানই সুন্নী ও তদুপরি ধর্মান্ধ সুন্নী। কথিত আছে, তাহারা যখন ইরানের রাজধানী ও ইস্পাহানের প্রভু, তখন তাঁহাদের সৈনিকবৃন্দ, এমনকি তাহাদের কর্মচারীরাও প্রতি শুক্রবারে মসজিদে আসরের নামাজের পরে মুক্ত করাল হস্তে বলপূর্বক বহির্গমন করিয়া যত শিয়ার সাক্ষাৎ পাইত, তাহাদের হত্যা করা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত করে।

(৩০) আলীবর্দী খাঁর প্রধান নাম ঃ অর্থ—যুদ্ধে মহিমান্বিত।

(৩১) আফগানেরা সুন্নী ; তাহারা আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী এই চারিজনকে প্রথম বৈধ খলিফা বলিয়া স্বীকার করে। পক্ষান্তরে পারসিকেরা ও আলীবর্দী খাঁর পরিবার প্রভৃতি শিয়ারা কেবল চতুর্থ জনকেই স্বীকৃতি দান করে। অপর তিনজনকে অস্বীকার করিয়া এবং অভিশাপ ও গালমন্দ দিয়া তাহারা সুন্নীদের মনে কষ্ট দেয় ও তাহাদিগকে অনমনীয় শত্রুতে পরিণত করে ; কাজেই সুন্নীরা তাহাদিগকে রাফেজী বা অভিসম্পাৎকারী বলিয়া কলঙ্কিত করে।

(৩২) ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য হাফেজের কবিতা সমগ্র পারস্যে ও ভারতবর্ষে আলোচিত হয়। অগাস্টাসের ২০০ বৎসর পরে Surtes Virgiliance (ভার্জিনের কবিতা) ও এভাবে আলোচিত হইত। কিন্তু

কুরআনই হইতেছে সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে ভবিষ্যৎ জানিবার প্রধান গ্রন্থ। বিশেষভাবে শিয়াদের মধ্যে কুরআন ও তাহাদের জপমালা; ইহাতে বিবিধ ক্রিয়া ও আচারযোগে নিষ্পন্ন হয়।

(৩৩) ইহাতে ভারতের আবহাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে; সেখানে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে দিবসের মধ্যভাগে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নের মধ্যে লোকে অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছা যায়। কিন্তু প্রায় সারা রাত স্ফূর্তিযুক্ত, সতেজ ও সর্বদা জাগ্রত থাকে।

(৩৪) কুইন্টে-কার্স (Quinte-Curce) তাঁহার নায়কের এত অনুরাগী যে এ সম্পর্কে একটা কথাও বলেন না। কিন্তু সমস্ত প্রাচ্য ঐতিহাসিকই বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলেকজাণ্ডার কাস্পিয়ান সাগর ও পর্বত-মালার মধ্যে এরূপ একটি প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তুর্ক বা সাইথিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রায় তিন ক্রোশ স্থান বন্ধ করিয়া দেন। এই প্রাচীর এখনও বর্তমান আছে ও দার বন্ধ বা ফাকা বন্ধ নামে অভিহিত হয়। জনশ্রুতিতেও ইহার প্রতিষ্ঠা আস্কান্দর মাকেতন ভিন্ন আর কাহারও প্রতি ".. রোপিত হয় না।

(৩৫) এই স্বস্তরকে সর ... ...পত্রে সুসা বলা হয়; ইহা গ্রীকদের সুসা ও পারস্য সাম্রা... ...একটা প্রাচীন রাজধানী।

(৩৬) আলী হযরত মুহম্মদের সহিত কুরআনে উল্লিখিত একমাত্র জীবিত ব্যক্তি বিধায় তাঁহার উপাধি মুর্তজা বা মনোজ্ঞ ও প্রীতিকর ঃ হযরত মুহম্মদের উপাধি মুস্তফা অর্থ মনোনীত।